ইতি-বৃত্তের উদ্ঘাটন এবং প্রচার
নীর অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য। এই বিষয় আমা-
দের আলোচনা এখন জাতীয় কর্তব্য বলিয়া
প্রত্নতত্ত্ব গবেষণায় অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হই-
য়াছে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দেব
মজুমদার মহাশয় তাঁহার "রাজপুত্র গোবিন্দ নামক
গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের পাণ্ডুলিপিতে সেই সকল
তথ্য বিচার বিতর্ক সহিত সন্নিবেশিত করিয়াছেন।
আমি এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি দেখিয়া বিস্মিত ও
মুগ্ধ হইয়াছি। ইহাতে আমাদের একটি জাতীয়
সম্পদ এবং সমগ্র ভারতের সংস্কৃতির দিক দেখা
দেখিতে পাই পূর্ব ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের
একটি বিশেষ অঙ্গ — আমার মতে এই গ্রন্থটি
দুর্বোধ্য হইবে না। কিন্তু অর্থাভাববশতঃ তিনি
এই অমূল্য গ্রন্থখানি প্রকাশ করিতে পারিতেছেন
না। সাহিত্যানুরাগী যদি এই গ্রন্থখানি
প্রকাশিত করাইতে পারেন, আমার বিশ্বাস
দেশবাসী আমাদের সহৃদয়তার সাক্ষী হইবে।

শ্রীকালিদাস নাগ
২২/১/৫২ ই

College of Science
Cal. 14. 11. [illegible]

কল্যাণবরেষু,

আমার স্নেহাস্পদ শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র
বাগচী ও [illegible] ইঁহারা যোগেশচন্দ্র রায়
বিদ্যানিধি মহাশয় অনেক মূল্যবান তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়াছেন
[illegible] অনেক পরিশ্রম করিয়া যোগেশ [illegible] এবং [illegible]
[illegible] ইঁহারা [illegible] যে যোগেশ
যোগেন্দ্রনাথ [illegible] [illegible] [illegible]
আমি সম্প্রতি "যোগেশবাবু" মহোদয়কে এই-
বিষয় [illegible] লিখিয়াছি। আশা করি
এই গ্রন্থ পাঠে বিশেষ আনন্দ উপভোগ করিবে।

শুভার্থী
শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র রায়

স্বজাতি সেবক শ্রদ্ধেয় শ্রী সুরেশচন্দ্র নাথ মজুমদার মহাশয় তাঁহার নব সংস্করণ- "রাজগুরু যোগিবংশ" লিখিয়া বঙ্গীয় সমাজের বিশেষ করিয়া যোগিসম্প্রদায়ের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। তাঁহার রচিত পুস্তকখানি আমি বিশেষ আগ্রহ ও যত্ন সহকারে পাঠ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। -

শ্রী কল্যাণী মল্লিক।

৭৮|৪ রসা রোড
কলিকাতা - ২৬
৭|৭|৫৪

যোগী জাতি যে মূলতঃ একটি যোগ-প্রধান ধর্মসম্প্রদায় হইতে উদ্ভূত এবং তাঁহাদের যে সুদীর্ঘ অতীতের একটি মহান্ ঐতিহ্য রহিয়াছে, কিছু দিন পূর্ব হইতেই এই আত্ম-চেতনা বাঙলা যোগী জাতির মধ্যে একটি নব জাগরণের সাড়া আনিয়া দিয়াছে। এই আত্ম-পরিচয় লাভের চেষ্টাই শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র নাথ মজুমদার মহাশয়কে বর্তমান গ্রন্থরচনায় অনুপ্রাণিত করিয়াছে। প্রবল স্বজাতিপ্রেম ও নব জাগরণের প্রেরণাই লেখককে গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত করিয়াছে। লেখকের উদ্দেশ্য সাধু, শ্রম ও অনুসন্ধিৎসা প্রশংসনীয়। এই গ্রন্থ রচনা দ্বারা তিনি তাঁহার স্বজাতির যেমন শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন, বাঙলার ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে কৌতূহলী পাঠকের সশ্রদ্ধ ধন্যবাদেরও তিনি অধিকারী হইয়াছেন।

শ্রী শশিভূষণ দাস গুপ্ত

উৎসর্গ-লিপি

আসাম ও বাঙ্গালার (পূর্ববঙ্গ বা পূর্বপাকিস্তানসহ)
অভ্যুদয় পঞ্জিকায় যাঁহার নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত
থাকিবে— যোগিজাতির অনবদ্য কল্যাণ-
কর্মে চিরনিবেদিতপ্রাণ— আসাম-
বঙ্গ যোগি-সম্মিলনীর যিনি
পরমহিতৈষী বান্ধব
ছিলেন—

সেই
ঋষিকল্প ত্যাগী
আচার্য **অম্বিকাচরণ নাথ**
মহাশয়ের পবিত্র স্মৃতির
উদ্দেশে তাঁহারই পরম প্রিয়
জাতির একটি অমূল্য সম্পদ *
প্রামাণিক এই ইতিবৃত্ত-কথা আন্তরিক শ্রদ্ধা
ও কৃতজ্ঞতার অভিজ্ঞানরূপে সমর্পিত হইল।

পোঃ লালা, কাছাড়
৩১শে আষাঢ় (পূর্ণিমা) ১৩৬১
১৬ই জুলাই, ১৯৫৪ ইংরাজি।

বিনীত—
গ্রন্থকার

* কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ, এম-এ, বিদ্যাবাচস্পতি মহোদয়ের অভিমতের অংশ।

'ওঁ'

তৃতীয় সংস্করণের নিবেদন

নাথপন্থী যোগীরা দেশ-বিদেশের একটা গৌরবময় ইতিহাসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, বিশেষ করিয়া ইঁহাদের চেষ্টায় হিন্দুধর্ম্মের একটা গৌরবময় ইতিহাস সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সুপ্রাচীন যুগে ইঁহারা যোগধর্ম্মের চরম উৎকর্ষ সাধন করিয়া বিশ্বের ইতিহাসে সর্ব্বধর্ম্মের মধ্যে হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ধর্ম্ম, দর্শন, সাহিত্য ও সাধনায় যোগিজাতির একটা বিরাট মহিমাময় ঐতিহ্য ছিল। এই মহান জাতির জাতীয় জীবনের প্রথম উষা-মুহূর্ত্ত হইতে আরম্ভ করিয়া আজিকার দিন পর্য্যন্ত সে যে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের একটি বিরাট ইমারত গড়িয়া উঠাইয়াছিল, কালস্রোতের প্রবল আবর্ত্তেও ইহার অস্তিত্ব একেবারে লোপ করিয়া দিতে পারে নাই। ইতিহাসই ইহার অবিনশ্বর সাক্ষী। যদিওবা বর্ত্তমানে সেই ইতিহাস অসম্পূর্ণ, অসংলগ্ন, বিকৃত এবং বিস্মৃতির অন্তরালে রক্ষিত। যে জাতি সুদূর অতীত হইতে নানাবিধ প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়া স্বীয় অস্তিত্ব অক্ষুণ্ন রাখিয়া নিজস্ব বৈশিষ্ট্য গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছিল তাঁহাদের প্রামাণ্য ও ধারাবাহিক ইতিহাস বিস্মৃতির অন্তরাল হইতে আবিষ্কারের সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করিতেই হইবে। নিরপেক্ষ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত মণ্ডলীর গবেষণার ফলে আমাদের সম্বন্ধীয় অনেক অমূল্য তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে সত্য, কিন্তু একমাত্র আমাদের ইতিহাস রচনার গরজেই ইঁহারা একার্য্যে হস্তার্পণ করেন নাই। অন্য

প্রয়োজনের তাগিদের গরজেই ইঁহারা একার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। যাহা হউক এইসব স্বনামখ্যাত সাহিত্যরথীরা নাথ-পন্থের সুপ্রাচীন যুগের গৌরবময় ঐতিহ্য শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত প্রচার করিয়া সকলের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন।

দুঃখের বিষয় কয়েকজন পণ্ডিত দীর্ঘকাল হইতে এই জাতির গৌরবময় ইতিহাসকে কলঙ্কিত করিয়া প্রকাশ করিবার দুরভিসন্ধি ও অশোভন প্রচেষ্টা করিয়া শুধু কুখ্যাত হয়েন নাই, হিন্দুসমাজের গৌরবময় ইতিহাসের পৃষ্ঠায় কালিমা লেপন করিয়াছেন। যাঁহারা সত্যানুসন্ধিৎসা অপেক্ষা অন্যবিধ স্বার্থ বড় করিয়া দেখিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা আমাদের গৌরব-কাহিনী অকুণ্ঠচিত্তে প্রকাশ ও প্রচার করিবেন, এরূপ আশা দুরাশা মাত্র। সেইজন্য নিরপেক্ষ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্যে আমাদের ধারাবাহিক ইতিহাস সঙ্কলনের ভার আমাদেরই গ্রহণ করিতে হইবে। "শুষ্ক পাণ্ডিত্যজাত অহং বুদ্ধি", "নিতান্ত প্রাকৃত জনোচিত দম্ভ", "মিথ্যাভাষণে নির্ল্ল-জ্জতা", ঈর্ষা, পরনিন্দা ইত্যাদি ত্যাগ করিয়া দৃঢ় বিশ্বাস, ঐকান্তিক ইচ্ছা, সরলতা, সাধুতা এবং অবিচলিত কর্ম্মনিষ্ঠা লইয়া সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে কার্য্যক্ষেত্রে নামিলে আমাদের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার সাফল্য অর্জ্জনে বিশেষ বিলম্ব ঘটিবে না বলিয়াই আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে। মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন— "সত্যগ্রহণে আমরা যে পরিমাণ অকৃতকার্য্য হইব আমাদের চেষ্টাও সেই পরিমাণ ব্যর্থ হইবে।" আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র বলিয়াছেন, "যারা কপটাচারী, যাদের মন মুখ এক নয়, তারা সত্য পথে চলাত দূরের কথা, সত্যের সন্ধানই

পায় না। * * * * * অন্ধ গর্ব্বকে উচ্চ আসন দিলে শ্রেষ্ঠ গৌরব কি ধূলিবিলুন্ঠিত হয় না?" কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন— "আমরা ভূরি প্রমাণ-বাক্য রচনা করিতে পারি, তিলপ্রমাণ আত্মত্যাগ করিতে পারি না, আমরা অহংকার দেখাইয়া পরিতৃপ্ত থাকি, যোগ্যতালাভের চেষ্টা করি না। * * * * নিজের বাকচাতুর্য্যে নিজের প্রতি ভক্তিবিহ্বল হইয়া উঠাই আমাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য।"

"যে জাতি চলে না কভু তারি পথ পরে
তন্ত্র মন্ত্র সংহিতায় চরণ না সরে।"—রবীন্দ্রনাথ

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—"হারিয়ে ফেলা জাতীয় বিশেষত্বের বিকাশ যাতে হয় তাই করতে হবে। জগতের মহৎ ও বৃহৎ কার্য্যগুলি দরিদ্রের দ্বারাই সংসাধিত হইয়াছে।" বিশ্ববিখ্যাত জার্ম্মাণ পণ্ডিত মোক্ষমূলার (Max Mullar) বলেন— "যে-দেশের জনসাধারণ স্বীয় দেশের প্রাচীন ইতিহাস ও প্রাচীন সাহিত্য স্মরণে গৌরবান্বিত না হয়, তাহারা জাতীয় চরিত্রের প্রধান অবলম্বনশূন্য হইয়াছে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।" চীন জাতীয়-দলের নেতা সানইয়াৎ সেন বলেন— "বিশ্বপ্রেমের কথা যদি আমরা বলিতে চাই তবে আমাদের প্রথমেই জাতীয়তার কথা বলিতে হইবে। আসুন আমরা আমাদের লুপ্ত জাতীয়তা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করি যেন তাহা আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠে।" তাহা হইলে জাতীয়তাই বিশ্বপ্রেমের মূল উৎস। বিশ্বপ্রেমিক হইতে হইলে আমাদিগকে স্বজাতি ও স্বদেশপ্রেমিক হইতে হইবে।

যোগিজাতি মহান জাতি। এই মহান জাতির গৌরবময় ইতিহাস সম্বন্ধে জনসাধারণ অজ্ঞ। তাহার কারণ এই জাতির ধারাবাহিক কোনও ইতিহাস ছিল না। সেই জন্য অজ্ঞতা হেতু অনেকে সভা-সমিতিতে, সংবাদ-পত্রে ও গ্রন্থাদিতে এই জাতি সম্বন্ধে ভ্রান্ত মন্তব্য প্রকাশ করেন। ইঁহাদের ভ্রান্ত ধারণা দূর করার জন্য এবং স্বজাতি-সাধারণকে স্বীয় ইতিহাস সম্বন্ধে একটা মোটামুটী ধারণা দিবার জন্য এই জাতির ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ইতিহাস সঙ্কলন, প্রকাশ ও প্রচার করা শুধু বাঞ্ছনীয় নহে, একান্ত অপরিহার্য্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের সহায়তার জন্য ১৩৩০ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে ৪৬ পৃষ্ঠাযুক্ত রাজগুরু যোগিবংশের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাতে অধ্যায় বিভাগ ছিল না। ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত ২১৮ পৃষ্ঠাযুক্ত ইহার ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই সম্বন্ধে কাছাড় জিলার তদানীন্তন জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট সুপণ্ডিত মিঃ জে, পি, মিলস, এম-এ., আই. সি. এস. ৪।২।২৯ ইং লিখিয়াছিলেন— "I first met Babu Suresh Chandra Nath Majumder when he was a boy. He and his family are both known to me. He is now doing valuable work on the early history of his caste. His community has probably lived in this part of India from long before historical times. He has an enormous field for research before him but a difficult one in which the evidence is apt to be obscured by prejudice. He realises this, and is working on the right line. I wish him all

success." অর্থাৎ বাবু সুরেশচন্দ্র নাথ মজুমদার মহাশয়ের বাল্যাবস্থায় প্রথমে তাঁহার সহিত আমার দেখা হয়। তিনি এবং তাঁহার পরিবার আমার নিকট পরিচিত। তিনি বর্ত্তমানে তাঁহার জাতির ইতিহাস উদ্ধারের মূল্যবান কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। ঐতিহাসিক যুগের বহু পূর্ব্ব হইতেই সম্ভবতঃ তাঁহার সম্প্রদায় ভারতের এই অঞ্চলে বসবাস করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার সম্মুখে গবেষণার বিশাল ক্ষেত্র বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা অত্যন্ত কঠিন। কারণ পূর্ব্ব সংস্কারজনিত পক্ষপাত দ্বারা উপযুক্ত প্রমাণ-সমূহ লুপ্ত হওয়ার আশঙ্কা আছে। তিনি তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়া তদুপযুক্ত পন্থাবলম্বনে কাজ করিয়া যাইতেছেন। আমি তাঁহার সাফল্য সর্ব্বতোভাবে কামনা করি। শিলচর নর্ম্মাল স্কুলের অধ্যক্ষ রায় ৺অঘোর নাথ অধিকারী বাহাদুর ১৪।২।২৯ তারিখে লিখিয়াছিলেন—"গ্রন্থখানি গবেষণার ভাবেই লিখা এবং ইহাতে উপযুক্ত বিশিষ্টতা রক্ষার সমূহ চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। * * * নীতি-পাঠের ন্যায় ইহা সহজ ও সরল ভাবে পঠনীয়। গ্রন্থখানি ভারতের বিভিন্ন জাতীয়দের নিকট নানা বিষয়ে সুন্দর চিন্তাপ্রবণতার আকর বলিয়া গণ্য হইবে। উক্ত গ্রন্থপাঠে পাঠকের হৃদয়ে আমাদের দেশের বিভিন্ন জাতি-সমন্বয়ের একটী বিশিষ্ট ও বিচক্ষণ দূরদৃষ্টির স্থায়ী বিশ্বাস হৃদয়ে জাগরিত হইবে" (যোগিসখা—ভাদ্র, ১৩৩৫ বাং)। আলোচ্য গ্রন্থখানি যোগিজাতির ইতিহাস। আলোচনা সুনিপুণ ও প্রমাণসম্মত। ইতিহাস হইলেও ইহা উপন্যাস অপেক্ষা মনোরম ও চমকপ্রদ" (আর্য্যদর্পণ—মাঘ, ১৩৩৪ বাং ৩৯২ পৃঃ)। "সুরেশবাবুর

এই বিরাট ইতিহাস সঙ্কলন জাতিতত্ত্বান্বেষিগণের অনুকরণযোগ্য” (সমাজসেবক—বৈশাখ, ১৩৩৪ বাং)। “প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারের এইরূপ চেষ্টা অতীব প্রশংসনীয়। ইহা দ্বারা জাতির ভবিষ্যৎ গড়িবার সুবিধা হয়” (প্রবাসী—ফাল্গুন, ১৩৩৪ বাং)। “আশ্চর্য্য গবেষণাশক্তির পরিচয় দিয়াছেন” (যোগিসখা—কার্ত্তিক, ১৩৩৪ বাং)।

আত্মবিস্মৃতপ্রায় এই মহান জাতির ইতিহাস যত বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত হয়, ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বিশেষ করিয়া জাতির পক্ষে তাহা ততই মঙ্গলজনক। সেইজন্য আরও যথেষ্ট নূতন তথ্য সংগ্রহ করিয়া তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশের উদ্যোগ আয়োজন করিতে না করিতেই বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধের দারুণ অস্বাভাবিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। সেই সময় কলিকাতা দেশবন্ধু হাই স্কুলের তদানীন্তন প্রধান শিক্ষক শ্রীরেবতীমোহন ভৌমিক, বি-টি, শিল্পাশ্রম প্রেসের শ্রীদিগম্বর দেবনাথ ও জার্ম্মান প্রত্যাগত কাগজশিল্পী শ্রীযশোদাকুমার মজুমদার এবং আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনী ইহা প্রকাশের চেষ্টা করিয়া বিশ্বব্যাপী অস্বাভাবিক পরিস্থিতির জন্য সফলকাম হইতে পারেন নাই। এইভাবে মোটামুটি ২৭ বৎসর কাল কাটিয়া যায়। তাহাতে ক্ষতি হয় নাই। দয়াময় পূর্ণব্রহ্ম ভগবান যাহা করেন সবই আমাদের মঙ্গলের জন্য। এই সময় মধ্যে গ্রন্থের জন্য যথেষ্ট নূতন তথ্য সংগৃহীত হইয়াছিল এবং গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি অধ্যায় বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের দ্বারা পরীক্ষা করাইবার সুযোগ হইয়াছিল।

পূর্ণব্রহ্ম ভগবানচিন্তায় নিমগ্ন বার্দ্ধক্যপীড়িত দেহ লইয়া কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ, এম-এ,

বিদ্যাবাচস্পতি মহোদয় আমার সৌভাগ্যক্রমে তৃতীয় সংস্করণের যাবতীয় পাণ্ডুলিপি একাধিকবার পরীক্ষা করিয়া দিয়াছেন। অনবসরের জন্য এবং একসঙ্গে সমস্ত পাণ্ডুলিপি প্রেরণের অসুবিধা থাকায় একার্য্যে তাঁহার কয়েক বৎসর সময় লাগিয়াছিল। তাঁহার আশীর্ব্বাণীগুলির মধ্যে কয়েকটির অংশবিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

শ্রীশ্রীরাধাগিরিধারী

চৌমুহনী

২০।৭।৪৪

প্রীতিভাজনেষু

.........পাণ্ডুলিপি পড়িয়া অত্যন্ত আনন্দ পাইলাম। আপনার সংগ্রহ অপূর্ব। ভগবান আপনাকে দীর্ঘজীবী করিয়া স্বজাতির মঙ্গলসাধনে শক্তি দিউন। ....

আপনাদের

(স্বাঃ) শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ

শ্রীশ্রীরাধাগিরিধারী

চৌমুহনী

১৬।৫।৪৫

প্রীতিভাজনেষু

...........আপনার চেষ্টায় খুব আনন্দ অনুভব করিতে ভগবান আপনার মঙ্গল করুন। ....

আপনাদের

(স্বাঃ) শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ

চৌমুহনী

৯।৯।৪৫

শ্রীশ্রীরাধাগিরিধারী

প্রীতিভাজনেষু

…………ভগবান আপনাকে যে শক্তি দিয়াছেন, তাহার সদ্ব্যবহার করিতেছেন। ভগবান আপনার মঙ্গল করুন। …………

ভবদীয়

(স্বাঃ) শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ

৪৬, রসারোড ইষ্টফাষ্ট লেন

টালিগঞ্জ, কলিকাতা-৩৩

১৬।১০।৫০

শ্রীশ্রীরাধাগিরিধারী

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আপনার সমস্ত পাণ্ডুলিপি আমি বিশেষ আগ্রহের সহিত দেখিয়াছি। ………পাণ্ডুলিপি পড়িয়া আমি বিশেষ আনন্দ পাইয়াছি। আপনার ব্যাপক গবেষণা এবং তজ্জন্য বিপুল পরিশ্রম বাস্তবিকই বিশেষ প্রশংসনীয়। আপনার গ্রন্থখানি যোগি-সমাজের এক অতুলনীয় সম্পদ। ইহা শীঘ্রই প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। ইতি—

বিনীত

(স্বাঃ) শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ

বিদ্যাবাচস্পতি মহোদয় আমার সৌভাগ্যক্রমে তৃতীয় সংস্করণের যাবতীয় পাণ্ডুলিপি একাধিকবার পরীক্ষা করিয়া দিয়াছেন। অনবসরের জন্য এবং একসঙ্গে সমস্ত পাণ্ডুলিপি প্রেরণের অসুবিধা থাকায় একার্য্যে তাঁহার কয়েক বৎসর সময় লাগিয়াছিল। তাঁহার আশীর্ব্বাণীগুলির মধ্যে কয়েকটির অংশবিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

শ্রীশ্রীরাধাগিরিধারী

চৌমুহনী

২০।৭।৪৪

প্রীতিভাজনেষু

............পাণ্ডুলিপি পড়িয়া অত্যন্ত আনন্দ পাইলাম। আপনার সংগ্রহ অপূর্ব। ভগবান আপনাকে দীর্ঘজীবী করিয়া স্বজাতির মঙ্গলসাধনে শক্তি দিউন। ....

আপনাদের

(স্বাঃ) শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ

শ্রীশ্রীরাধাগিরিধারী

চৌমুহনী

১৬।৫।৪৫

প্রীতিভাজনেষু

............আপনার চেষ্টায় খুব আনন্দ অনুভব করিতে ভগবান আপনার মঙ্গল করুন। ....

আপনাদের

(স্বাঃ) শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ

চৌমুহনী
৯।৯।৪৫

শ্রীশ্রীরাধাগিরিধারী

প্রীতিভাজনেষু

…………ভগবান আপনাকে যে শক্তি দিয়াছেন, তাহার সদ্ব্যবহার করিতেছেন। ভগবান আপনার মঙ্গল করুন। …………

ভবদীয়
(স্বাঃ) শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ

৯৬, রসারোড ইষ্টফাষ্ট লেন
টালিগঞ্জ, কলিকাতা-৩৩
১৬।১০।৫০

শ্রীশ্রীরাধাগিরিধারী

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আপনার সমস্ত পাণ্ডুলিপি আমি বিশেষ আগ্রহের সহিত দেখিয়াছি। ………পাণ্ডুলিপি পড়িয়া আমি বিশেষ আনন্দ পাইয়াছি। আপনার ব্যাপক গবেষণা এবং তজ্জন্য বিপুল পরিশ্রম বাস্তবিকই বিশেষ প্রশংসনীয়। আপনার গ্রন্থখানি যোগি-সমাজের এক অতুলনীয় সম্পদ। ইহা শীঘ্রই প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। ইতি—

বিনীত
(স্বাঃ) শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ

ইংরাজি ১২।২।৫২ তারিখে তিনি আবার লিখিয়াছিলেন—"আমার বিশ্বাস শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র নাথ মজুমদার মহাশয়ের রাজগুরু যোগিবংশ ৩য় সংস্করণ আমাদের জাতির একটি অমূল্য সম্পদ। শ্রীযুত প্রমথনাথ নাথ ও শ্রীযুত শরৎচন্দ্র নাথ মহাশয়দ্বয় এই গ্রন্থখানির প্রকাশভার নিয়াছেন জানিয়া আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম।"

প্রবীণ নেতা বৃদ্ধ তাপস শ্রীভারতচন্দ্র নাথ, উকীল ১২।২।৫২ তারিখে লিখিয়াছেন—"আপনার মত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ নেতাই আমাদের ভরসাস্থল। ......শ্রীগুরু গোরক্ষনাথ এই মুমূর্ষু জাতিকে রক্ষা করার জন্য আপনার ভিতর প্রেরণা সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন। ....এই জাতির গৌরবকহিনী প্রচার করিবার আর কেহ নাই।" তিনি আরও বলেন—

"শ্রীমান সুরেশচন্দ্র নাথ মজুমদার মহাশয় রাজগুরু যোগিবংশ লিখিয়া ও প্রচার করিয়া বঙ্গীয় যোগিজাতিকে অন্ধকার হইতে আলোতে আনয়ন করিয়াছেন। এই আত্মবিস্মৃত জাতির বহুসংখ্যক ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম উপাধি প্রাপ্ত হইয়া অর্থের উপাসনায় জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন, লক্ষপতি কোটীপতি হইবার চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু স্বজাতির লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধার করিয়া বিস্মৃত পূর্ব্ব গৌরব সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে প্রকাশ করিবার যথোচিত চেষ্টা কেহই করেন নাই। সুরেশবাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি প্রাপ্ত কিংবা লক্ষ্মীর বরপুত্র না হইয়াও বহু অর্থ, পরিশ্রম ও সময় ব্যয় করিয়া ভারতের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া বহু স্থান হইতে নাথ-গুরুগণের

পূর্ব্বগৌরব সংগ্রহ করিয়া সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়াছেন, তজ্জন্য বর্ত্তমান যোগিজাতি ও তাঁহাদের ভাবী বংশধরগণ চিরকাল তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবেন। সুরেশবাবুকে প্রত্নতত্ত্ব মধুকর বা এবম্বিধ কোনও গৌরবজনক উপাধিতে ভূষিত করিয়া উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য আমি আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনীকে অনুরোধ করিতেছি।" ডক্টর ৺নলিনীকান্ত ভট্টশালী ২।৮।৪৫ তারিখে লিখিয়াছিলেন—"আপনার সুলিখিত অধ্যায় ও কার্ড পাইলাম। মফঃস্বলে বসিয়া আপনি পুরাতত্ত্ব গবেষণার সুকঠিন কার্য্য করিতেছেন, তাহা খুবই প্রশংসার বিষয়।" ডক্টর মাধবচন্দ্র নাথ, ২৭।১১।৪৫ তারিখে লিখিয়াছেন—"আপনার পুস্তকের পাণ্ডুলিপি পাইলাম। আমার মনে দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছে যে, ইহা প্রকাশিত হইলে একটি অমূল্য গ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত হইবে।" ডাঃ নরেন্দ্রনাথ নাথ, ১৩।১০।৫৩ তারিখে লিখিয়াছেন—"আপনি প্রাণ দিয়া জাতীয় চৈতন্য সম্পাদনের ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। পূর্ব্বতন নেতারা সমাজতরণীর হাল ছাড়ার মত ভাব দেখাচ্ছেন, আপনি কেবল হাল ছাড়েন নাই। ………… রাজগুরু-যোগিবংশ আপনাকে অমরত্ব প্রদান করিবে। ………… আপনার দুর্দ্দমনীয় স্বজাতিহিতৈষণার প্রতি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।" শ্রীইন্দ্রকুমার নাথ চৌধুরী, এম-এ, ১০।১১।৪৫ তারিখে বোম্বাই-এর পুণা হইতে লিখিয়াছেন—"আপনি যেভাবে অক্লান্ত ও অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া জাতির ইতিহাস প্রণয়নে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাহাতে আমার মনে হয় জাতির সম্পূর্ণ ইতিহাস আপনি একাই সমাপ্ত

করিয়া যাইতে পারিবেন। আপনার অক্লান্ত ও একাগ্র সাধনার অমৃতধারা জীবন্মৃত ও আত্মবিস্মৃতপ্রায় জাতির আত্মপরিচয়ের এক বিশাল আলোকস্তম্ভ হিসাবে সভ্য-সমাজের সম্মুখে এবং কালের কোলে অক্ষয় ও অনাহতভাবে দেদীপ্যমান হইয়া রহিবে।" তিনি আবার ২৮।৬।৫১ তারিখে লিখিয়াছেন—"আমরা সবাই তৃতীয় সংস্করণের জন্য সাগ্রহ প্রতীক্ষায় রহিলাম। এই বইখানির প্রতিটি শব্দ-যোজনা আমাদের জাতির পক্ষে এক একটি সুবর্ণ-কণিকার মত মূল্যবান হইবে, আমরা এই ভরসাই রাখি। এখন মুদ্রণশালার কারাকক্ষ হইতে মুক্তি পাইলেই হইল।"

ইঞ্জিনিয়ার শ্রীরাজমোহন নাথ, বি-ই, তত্ত্বভূষণ ৬।৬।২৮ ইং আমাকে লিখিয়াছিলেন—"আপনার বহু সাধনার ফল রাজগুরু যোগিবংশের দেশ-বিদেশ আপন-পর সকলের নিকট এরূপ আদর ও সুখ্যাতি আমাদের প্রাণে বড়ই আনন্দ ও সন্তোষপ্রদ সন্দেহ নাই। স্বজাতি-মাতৃকার সেবাযজ্ঞে আপনার ন্যায় কৃতিমান হোতা প্রত্যেক স্বজাতির নমস্য।" ৯।৯।৫২ তারিখে তিনি আবার লিখিয়াছেন—"...... সুরেশবাবুর নাথ-সাহিত্য ও পুরাবৃত্ত গবেষণার পাণ্ডিত্যের নিকট যাইবার শক্তি বা স্পর্দ্ধা আমার নাই। ...... ইহ আমার জ্ঞানের দৈন্যের আন্তরিক স্বীকারোক্তি। বিভিন্ন মাসিক পত্রে প্রকাশিত আপনার প্রবন্ধাবলীতে বিভিন্ন ভাষার যে-সব গ্র বা পত্রিকাদির উল্লেখ থাকে, উহাদের অনেকগুলিই আমি কখনং চোখে দেখি নাই, এমন কি অনেকগুলির নামও শুনি নাই, পা করাত দূরের কথা! আপনি যখন ঐগুলি পাঠ করার সুযো

সুবিধা পাইয়াছেন এবং তাহা হইতে নাথ-ধর্ম্মের ও নাথ-সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যমূলক তথ্য উদ্ধার করিতে পারিয়াছেন, তখন এই বিষয়ে আপনার স্থান আমার অনেক উর্দ্ধে তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। আমার প্রবন্ধ ও গ্রন্থাদি দেখিলেই এই সত্য স্বতঃসিদ্ধরূপে প্রমাণিত হইবে।" আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনীর যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীহরেন্দ্র চন্দ্র নাথ, বি-এল, জমিদার ক্রমাগত এ-সম্বন্ধে আমাকে কয়েকখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, সে-গুলির অতি আবশ্যক অংশ এই—"রাজগুরু যোগিবংশ প্রকাশ করিবার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিব" (১২।৬।৫১)। "রাজগুরু যোগিবংশ প্রকাশ করিবার সর্ব্বান্তঃকরণের প্রচেষ্টা আমার রহিল" (১৬।৬।৫১)। "রাজগুরু যোগিবংশ প্রকাশ করিবার প্রস্তাব আগামী ওয়ার্কিং কমিটীতে করিবার ইচ্ছা আছে" (১৭।৯।৫১)। "রাজগুরু যোগিবংশ প্রকাশিত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়, ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত মত সন্দেহ নাই" (১০।১২।৫১)। "রাজগুরু যোগিবংশ মুদ্রণ সম্পর্কে আগামী ওয়ার্কিং কমিটীর সভায় একটি ধনভাণ্ডার স্থাপন বিষয়ে প্রস্তাব আনয়ন করিব" (১৮।১২।৫১)। "ওয়ার্কিং কমিটীর ১১।২।৫২ তারিখের অধিবেশনের ৯ম প্রস্তাবানুসারে সর্ব্বসম্মতিক্রমে রাজগুরু যোগিবংশ মুদ্রণের পরিকল্পনা করা হইয়াছে। ...... আমি স্বীকার করি যে, রাজগুরু যোগিবংশ মুদ্রণ করা সম্মিলনীর প্রধান কর্ত্তব্য। সম্মিলনী যদি বাঁচিয়া উঠে তবে এ কর্ত্তব্যে কোন দিন সম্মিলনী অবহেলা করিবে না। ... আপনার গ্রন্থ আমাদের সমাজের অমূল্য সম্পদ হইবে এ-কথা সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি" (১৫।১০।৫৩)।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলিয়াছেন—"যাঁহারা নাথ-সাহিত্যের উদ্ধার সাধন করিবেন, তাঁহাদিগকে তিব্বতী ভাষা শিখিতে হইবে, তিব্বত, নেপাল বেড়াইতে হইবে, কোচবিহার, ময়ূরভঞ্জ, মণিপুর, শ্রীহট্ট প্রভৃতি প্রান্তবর্ত্তী দেশ ও প্রান্তভাগে বেড়াইতে হইবে, অনেকবার হতাশ হইয়া ফিরিতে হইবে; কিন্তু যদি সংগ্রহ করিতে পারেন, তবে দেখিতে পাইবেন যে যাঁহারা এ-পর্য্যন্ত কেবল আপনাদের কলঙ্কের কথা কহিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা একেবারেই সত্য কথা কহেন নাই।" বস্তুতঃ এ-কার্য্যে যেমন প্রচুর সময় ও প্রচুর টাকাকড়ির দরকার, তেমনি যথেষ্ট ধৈর্য্য এবং পাণ্ডিত্যেরও আবশ্যক। এসব দিক দিয়া আমার দারিদ্র্যা-পরাধ-বিড়ম্বিত জীবন ও নিজের অযোগ্যতার কথা বিবেচনা করিয়া আমি বহুবার ভাবিয়াছি নাথ-সাহিত্য-সমুদ্রের গবেষণার ক্ষেত্রে উপযুক্ত সম্পাদকের আবির্ভাবরূপ শুভসংযোগ যত বিলম্বেই ঘটুক না কেন, আমার পক্ষে আর অপরাধ বৃদ্ধি করা সঙ্গত ও শোভন হইবে না। কিন্তু অপরিণামদর্শী পঙ্গুর গিরিলঙ্ঘনের আকাঙ্ক্ষার ন্যায় আমার আকাঙ্ক্ষা দুর্দমনীয় হইয়া উঠিল। বিনয়ের খনি কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

"আমি অতি ক্ষুদ্রজীব পক্ষী রাঙ্গা টুনী।
সে যৈছে তৃষ্ণায় পিয়ে সমুদ্রের পানী

*　　*　　*　　*

পক্ষী যেমন আকাশের অন্ত নাহি পায়।
যত শক্তি থাকে তত দূরে উড়ি যায়॥

এই মতে চৈতন্য কথার অন্ত নাই।
যার যত শক্তি সবে তত তত গাই॥"

আমিও সেইরূপ জাতীয় সাহিত্য-সমুদ্রের কণামাত্র পান করিবার ক্ষমতা লইয়া এ-কার্য্যে হস্তার্পণ করিয়াছি। যদি আমার জীবনের মূল্যবান সময়ের (অবশ্য বৈষয়িক কার্য্যের অবসর সময়ের) এই রাজগুরু যোগিবংশ জাতির পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস সম্পাদনে আনুকূল্য করিতে পারে তবে সাধ্যাতীত অর্থব্যয় এবং সুদীর্ঘকালের কঠোর শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

গ্রন্থসম্পাদনে আমি বহুবিধ শাস্ত্র, গ্রন্থ, ইতিহাস, ভূগোল, ব্যাকরণ ও বিবিধ সংবাদপত্রের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি; এবং যথাস্থানে এগুলির স্বীকারোক্তি করারও যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী, সাহিত্যাচার্য্য দীনেশচন্দ্র সেন, ডক্টর বেণীমাধব বড়ুয়া, কর্ণেল উপেন্দ্রনাথ মুখার্জি, অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু, অক্ষয়কুমার দত্ত, ডক্টর শহীদুল্লাহ, ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী, ডক্টর সুকুমার সেন, ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর কল্যাণী মল্লিক, ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত, অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসু, ডক্টর তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত, অধ্যাপক রামচরণ নাথ, অধ্যাপক ব্রজেন্দ্রকুমার দেবনাথ, পুরাতত্ত্ববিশারদ ভোলানাথ নাথ, উকীল ভারতচন্দ্র নাথ, [illegible] নাথ চৌধুরী, মিঃ হডসন, স্যার গ্রীয়ার্সন, মিঃ ব্রীগস্, মিঃ লেবয়েজ হুইলার, মিঃ হেষ্টিংস্, মিঃ মনিয়র উলিয়ামস, ডাঃ

টেসিনটারি, My Sylvain Levi, Mr. N. Farquhar প্রমুখ দেশীয় ও বিদেশীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর নাথপন্থ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ ও গ্রন্থাদি হইতে আমি অশেষ সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। এমন কি অনেক স্থলে ঐসব গ্রন্থাদি ও প্রবন্ধাদির ভাব-ভাষা ও বর্ণনা-ধারারও সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। ইহাদের কয়েক জনের নিকট যখন যে উপদেশ চাহিয়াছি, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ সে উপদেশ দানে বাধিতও করিয়াছেন। আচার্য্য ৺অম্বিকা চরণ নাথ, বি-এল এবং কাছাড়-কেশরী ৺লোচনমণি নাথ মহাশয়দ্বয়ের নিকট জাতীয়তা সম্বন্ধে আমার হাতেখড়ি। ইঁহাদের মূর্ত্তি আমার নিকট দেবমূর্ত্তির ন্যায় নির্ম্মল ও পবিত্র। পর-উপকারের সুধা তাঁহা হইতে ক্ষরিত হইতেছিল। গ্রন্থ-সম্পাদনে ইঁহারা বার্ধক্যপীড়িত দেহ লইয়া যুবজনোচিত উৎসাহে আমার সহিত কঠোর পরিশ্রম করিয়াছেন। আচার্য্যদেবের চেষ্টায় কলিকাতার বিভিন্ন লাইব্রেরী হইতে যথেষ্ট তথ্য সংগৃহীত হইয়াছিল। ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে শ্রদ্ধেয় লোচনমণিবাবু রঙ্গপুর জিলার পলাশবাড়ীর সাবরেজিষ্টার ছিলেন। তখন আমি এসম্বন্ধীয় কাজের জন্য প্রায় তিন মাসকাল তাঁহার বাসায় থাকিয়া, তাঁহার অন্ন ধ্বংস করিয়াছিলাম। সেই সময় তাঁহারই চেষ্টায় গরুর গাড়ী বোঝাই করিয়া জমিদারদের বাড়ী হইতে বিশ্বকোষাদি গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছিল। বলাবাহুল্য ইঁহাদের অবিশ্রান্ত সাহায্য ও অবিরত উৎসাহ না পাইলে আমার উদ্যম শিথিল হইয়া পড়ার বিশেষ আশঙ্কা ছিল।

এই অস্বাভাবিক দিনে স্বজাতি-সাধারণ হইতে অর্থসাহায্য

সংগ্রহ করিয়া এতবড় একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার সন্দেহ নাই। স্বজাতি-সাধারণের দয়ার দানের উপর নির্ভর করিয়া মোটামুটি দেড় বৎসরাধিক কাল পূর্ব্বে গ্রন্থ প্রেসে দেওয়া হইয়াছিল। আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনীর সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীপ্রমথনাথ নাথ, বি-এ ও যোগিসখার প্রাক্তন সম্পাদক শ্রীশরৎচন্দ্র নাথ, বি-এল অনেক বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া অর্থ সংগ্রহ না করিলে এবং স্বজাতি-সাধারণ অকাতরে অর্থ সাহায্য না করিলে, গ্রন্থ যে আর কতকাল বস্তাবন্দী অবস্থায় পড়িয়া থাকিত তাহা একমাত্র পূর্ণ ব্রহ্ম ভগবানই জানেন। শ্রীপ্রমথনাথ নাথ মহাশয় ৮ম, ১১শ ও ১২শ অধ্যায় রচনায় বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছেন এবং যাবতীয় পাণ্ডুলিপি যথা-সম্ভব সংশোধনক্রমে প্রেসে পাঠাইবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া আমার কার্য্যভার লঘু করিয়াছিলেন।

কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ, এম-এ, বিদ্যাবাচস্পতি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত, এম-এ, পি-এইচ-ডি এবং ডক্টর শ্রীকল্যাণী মল্লিক, এম-এ, পি-এইচ-ডি মহাশয়দ্বয় ও মহোদয়া অনু-গ্রহ পূর্ব্বক গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া দিয়া আমাকে কৃতার্থ ও গ্রন্থকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। ডাঃ মল্লিক মহাশয়ার নিকট আমি বিশেষভাবে ঋণী, কারণ অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহার একমাত্র পুত্র এবং তাহার স্বামীর মৃত্যু হওয়ায় তিনি ১৪।১১।৫৩ তারিখে আমাকে লিখিয়াছিলেন—"আমার একান্ত ইচ্ছাসত্ত্বেও ভূমিকা

লিখিতে মনবসান অসম্ভব। আমাকে মার্জ্জনা করিবেন।" নানা কারণে গ্রন্থের ছাপাকার্য্য শেষ হইতে বহু বিলম্ব ঘটায় কয়েক মাস পরে এ-সম্বন্ধে পুনর্ব্বিবেচনার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করায় এই নিদারুণ শোকের মধ্যেও তিনি আমার অনুরোধ উপেক্ষা করেন নাই। দয়াময় পূর্ণ ব্রহ্ম ভগবান মৃতাত্মাদের সদগতি করুন এবং ডাঃ মল্লিক মহাশয়াকে এই নিদারুণ শোক সহ্য করার শক্তি দান করুন —এই প্রার্থনা।

গ্রন্থে প্রকাশের জন্য নাথাচার্য্যগণের এবং মৃত ও জীবিত স্বজাতি হিতৈষিগণের যেসব চিত্র ও ব্লক সংগ্রহ করা হইয়াছিল সেগুলি দীর্ঘকাল পড়িয়া থাকার ফলে কয়েকটি ব্লক মরিচা পড়িয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং কয়েকটি চিত্র অস্পষ্ট হইয়া পড়ায় এগুলি হইতে ব্লক করা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য হওয়ায়, অর্থাভাববশতঃ আমরা সবগুলি প্রকাশ করিতে পারিলাম না ভাবিয়া ব্যথিত হইতেছি। দয়াময়ের কৃপায় চতুর্থ সংস্করণ আবশ্যক হইলে এসম্বন্ধে চেষ্টা করিব।

এসকল হিতৈষী বন্ধুগণের নিকট এবং যেসব শাস্ত্রগ্রন্থ ও সংবাদপত্রাদি হইতে এই গ্রন্থের তথ্যাদি ও উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে তাঁহাদের সকলের নিকট, তাঁহাদের প্রকাশকের এবং উত্তরাধিকারিগণের নিকট এবং যাঁহাদের ভাব-ভাষা ও বর্ণনা-ধারার সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি তাঁহাদের সকলের নিকট সবিনয়ে ঋণ স্বীকার করিতেছি। গ্রন্থমধ্যে স্বীকারোক্তি সম্বন্ধীয় এবং অন্য যে কোনও ত্রুটীবিচ্যুতি লক্ষিত হইলে আশাকরি তাহা মার্জ্জনীয়—সজ্জনাঃ গুণামিচ্ছন্তি।

বিনয়ের খনি কবিরাজ গোস্বামী শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের পাঠক ও শ্রোতাগণের নিকট যে নিবেদন করিয়াছিলেন, তাঁহার ভাষায় রাজগুরু যোগিবংশের পাঠক ও শ্রোতাদের নিকট আমার নিবেদন—

"সব শ্রোতাদের করি চরণ বন্দন।
যা সবার চরণ কৃপা শুভের কারণ॥
* * * * * * * *
শ্রোতাদের পদরেণু করো মস্তকভূষণ।
তোমরা এ অমৃত পীলে সফল হইল শ্রম॥"

লালা, কাছাড়
১শে আষাঢ় শুক্রবার (পূর্ণিমা)
১৩৬১ বঙ্গাব্দ
১৬।৭।৫৪ ইংরাজি

বিনয়াবনত—
শ্রীসুরেশচন্দ্রনাথ মজুমদার

ভ্রম সংশোধন

"সজ্জনাঃ গুণমিচ্ছন্তি"— মধুমক্ষিকার ন্যায় সজ্জন পাঠক-সমাজ ইহার মধ্যে গুণই অন্বেষণ করিবেন, ইহাই বিশেষভাবে আশা করি। কয়েকটী ভুলের একটী শুদ্ধিপত্র নিম্নে দিলাম—

গ্রন্থের ৪৪ পৃষ্ঠার ৪র্থ লাইনে "ঘেরেঙ সংহিতা" স্থলে "ঘেরেণ্ড সংহিতা," ১১ লাইনে "ঘেরেঙ সংহিতা" স্থলে "ঘেরেণ্ড সংহিতা" এবং ১২ লাইনে "ঘেরেঙ নামক" স্থলে "ঘেরেণ্ড নামক" কথাগুলি বসিবে।

গ্রন্থের ১১৪ পৃষ্ঠার ১৭ লাইনে—"তিব্বতে মৎস্যেন্দ্র নাথ বা অবলোকিতেশ্বরের জীবন্তমূর্ত্তি" হইতে ২০শ লাইনে—"সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া থাকেন" কথাগুলি ভ্রমক্রমে ছাপা হইয়াছে। উক্ত স্থলে নিম্নলিখিত কথাগুলি বসিবে—

পুরাতত্ত্ববিশারদ শ্রীভোলানাথ নাথ, এম-এ, মহাশয় বলেন—"এখন প্রায় সকল পণ্ডিতই স্বীকার করেন যে, মৎস্যেন্দ্র নাথ ও অবলোকিতেশ্বর একই ব্যক্তি। * * * * * তিনি নেপাল ও তিব্বতের জাতীয় দেবতারূপে আজও পূজা পাচ্ছেন। লাসানগরীর কথিত কাঞ্চননির্ম্মিত অবলোকিতেশ্বরের সুন্দর জীবন্ত মূর্ত্তি দর্শকের যুগপৎ ভক্তি ও বিস্ময় উৎপাদন করে। * * * * বর্ত্তমানে তিব্বতে যে ধর্ম্ম প্রচলিত তা একরকম পদ্মসম্ভব ও মৎস্যেন্দ্র নাথের পূজা বল্লেই চলতে পারে। প্রসিদ্ধ চীন পরিব্রাজক হুয়েন সাঙ ভারতে অনেক স্থানে অবলোকিতেশ্বরের মন্দির দর্শন করেন,

তন্মধ্যে কাশ্মীরের উদয়নের অবলোকিতেশ্বর বিশেষ প্রসিদ্ধ। কথিত আছে যদি কেহ অবলোকিতেশ্বরকে দেখবার ইচ্ছায় সেখানে উপবাস করে ধন্না দিত তা'হলে অবলোকিতেশ্বর প্রতিমা হতে বার হয়ে জ্যোতির্ম্ময়রূপে দর্শকের সম্মুখে আবির্ভূত হতেন। তিনি আরও লিখেছেন কনৌজসম্রাট শিলাদিত্য গঙ্গার তীরে এক অবলোকিতেশ্বরের অর্চ্চনা করে অভীষ্ট বর লাভ করেছিলেন। তিনি মাদ্রাজ প্রদেশে তিলোদকে বামে তারা শোভিত আর এক সুন্দর অবলোকিতেশ্বরের মূর্ত্তি দেখেন (শৈবধর্ম্ম ও যোগিজাতি)। তিনি আরও বলেন—"কথিত আছে মৎস্যেন্দ্র নাথ সমস্ত পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। এশিয়ায় অবস্থিত চারিটী পুতলক তাঁহার গতিবিধির চারিটা আড্ডাস্বরূপ ছিল। চীন সাম্রাজ্যের পূর্ব্বে অবস্থিত চুছান দ্বীপপুঞ্জের পুটোদ্বীপ তাহার একটী। এখানে অবস্থিত অবলোকিতেশ্বর, কোয়ান্নন (মৎস্যেন্দ্র নাথ) দেবের মন্দির আজও লোকচক্ষুর বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে" (যোগিসখা—আষাঢ়, ১৩৫৯ বাং, ৩৫ পৃঃ)।

কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীরাধাগোবিন্দ
নাথ, এম্-এ, বিদ্যাবাচস্পতি, ভাগবতরত্ন মহোদয়
লিখিত ৩য় সংস্করণের

ভূমিকা

অক্লান্তকর্ম্মা স্বজাতিসেবক শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র নাথমজুমদার মহাশয়ের "রাজগুরু যোগিবংশের" তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এই গ্রন্থখানি সমাজে কিরূপ সমাদর লাভ করিয়াছে, ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

এই সংস্করণে দ্বিতীয় সংস্করণ অপেক্ষা অধিক তথ্য সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে এবং যোগিজাতীয় নেতৃবর্গের মধ্যে অনেকেরই সংক্ষিপ্ত জীবনী লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। ইহাতে গ্রন্থের উপাদেয়ত্ব আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে।

স্মরণাতীত কাল হইতেই যোগিজাতীয় লোকদের মনে বেশ ব্যাপকভাবে এইরূপ একটি দৃঢ়বদ্ধ সংস্কার বিদ্যমান আছে যে, তাঁহাদের বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থা যাহাই হউক না কেন, তাঁহাদের অতীত ছিল গৌরবময় ঐতিহ্যপূর্ণ। এই ঐতিহ্যের বাস্তব স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁহাদের বিশেষ জ্ঞান না থাকিলেও মোটামুটী তাঁহাদের একটি ধারণা আছে যে, এই মহীয়ান ঐতিহ্যের ভিত্তি হইতেছে সমুজ্জ্বল আধ্যাত্মিকতা। হিন্দু সমাজের বিভিন্ন স্তরে, এমন কি অনেক স্থলে ব্রাহ্মণদের মধ্যেও মীন নাথ, গোরক্ষ নাথের নামের

সহিত সংশ্লিষ্ট "তিন নাথের অর্চনার" প্রচলন এবং "দিন গেলে ভাই তিন নাথের নাম লইও" ইত্যাদি গীতের প্রচলন ও তাঁহাদের উল্লিখিত সংস্কারের পরিপোষক। যোগিজাতীয় লোকদের সাধারণ 'নাথ' পদবীও তাঁহাদের অতীত গৌরবময় ঐতিহ্যেরই পরিচায়ক।

ভস্মাচ্ছাদিত তুষের আগুনের মতনই তাঁহাদের এই সংস্কার ছিল অমুজ্জ্বল। সময়বিশেষে কোনও গুরুতর আলোড়নে তাহা বেশ একটু প্রদীপ্তির দিকে উন্মুখ হইত। এমনই এক শুভ মুহূর্ত্তে স্বর্গীয় বিষ্ণুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রমুখ কতিপয় স্বজাতিসেবকের চিত্তে যোগিজাতির প্রাচীন ঐতিহ্যের স্বরূপ উদ্ঘাটনের বাসনা জাগ্রত হয়। কলিকাতাস্থিত সরকারী সংস্কৃত কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ পণ্ডিতাগ্রগণ্য ভরতচন্দ্র শিরোমণি মহোদয়ের সাহায্য ও সহানুভূতি লাভ করিয়া তাঁহারা তাঁহাদের সঙ্কল্প সিদ্ধির পথে উৎসাহের সহিত অগ্রসর হয়েন। নানাবিধ প্রতিকূলতা সত্ত্বেও পূর্ণোদ্যমে তাঁহারা প্রচারকার্য্য চালাইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের প্রবর্তিত আন্দোলনের পরিণতি রূপেই কয়েক বৎসর পরে জাতীয় পত্রিকা 'যোগিসখা'র আবির্ভাব। দৃঢ়সঙ্কল্প অক্লান্তকর্ম্মা স্বনামধন্য ৺অরবিন্দবন্ধু নাথ মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত 'যোগিসখা'র' সেবায় ৺অধরচন্দ্র নাথ, ৺নীরদবরণ নাথ, ৺কালীপদ নাথ, শ্রীযুত ভারতচন্দ্র নাথ, উকীল প্রভৃতি কতিপয় স্বজাতিগতপ্রাণ ভদ্রলোক আত্মনিয়োগ করেন। 'যোগিসখার' মাধ্যমে বিভিন্ন স্থানের যোগিজাতীয় লোকদের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হয়, ভাবের আদান প্রদানের সুযোগও প্রতিষ্ঠিত হয়।

কিছুকাল পরে 'যোগিসখা' প্রবর্ত্তিত আন্দোলন এবং প্রচার-কার্য্য পরিণতি লাভ করে 'আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনীর' প্রতিষ্ঠাতে। এই সম্মিলনীর মাধ্যমেই বিভিন্ন স্থানের স্বজাতীয় নেতৃবৃন্দের পক্ষে বৎসরে অন্ততঃ একবার পরস্পরের সহিত মিলনের এবং জাতীয় উন্নতিমূলক কার্য্যাদি সম্বন্ধে সমবেতভাবে আলাপ আলোচনার সুযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়। কিছুকাল পরে যোগিসখা আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনীর মুখপত্র হয়। এই সময় হইতেই জাতীয় পত্রিকা এবং জাতীয় সম্মিলনী একযোগে কাজ করিতে থাকে।

সম্মিলনী ও যোগিসখার প্রধান প্রধান কাজ হইতেছে সমাজের মধ্যে শিক্ষাসদাচারের উৎকর্ষ সাধন। প্রাচীন ঐতিহ্যের ঐতিহাসিক ভিত্তি বা নির্ভরযোগ্য প্রমাণ আবিষ্কারের জন্য সম্মিলনীর দিক হইতে কোনও সুনির্দ্ধারিত পন্থা অবলম্বিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। অবশ্য নোয়াখালী লক্ষ্মীপুরের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল শ্রীযুত ভারতচন্দ্র নাথ, তাঁহার পরে আসামের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক শ্রীযুত রাজমোহন নাথ, নদীয়ার শ্রীযুত ভোলানাথ নাথ, এম-এ, পুরাতত্ত্ববিশারদ এবং তাঁহারও পরে ইউরোপ-প্রত্যাগত পেপার ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুত যশোদাকুমার মজুমদার প্রভৃতি কতিপয় স্বজাতিপ্রাণ ভদ্রলোক ব্যক্তিগতভাবে কিছু কিছু গবেষণা করিয়াছেন। রাজমোহনবাবুর গবেষণার ফল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ায় বিদ্বৎসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।

কয়েকজন সুপণ্ডিত ব্যক্তি গোরক্ষ নাথাদির এবং তাঁহাদের প্রচারিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখিয়া ভারতের

একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পি, এইচ, ডি, উপাধি লাভ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত বহু প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্ত্য মনীষী নাথ-সম্প্রদায় সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াছেন। তাঁহাদের গবেষণার ফল কেহ কেহ বা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়াছেন; কেহ কেহ বা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকাদিতে প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের মধ্যে যাঁহারা শিক্ষিত এবং অনুসন্ধিৎসু তাঁহারা হয়তো এ সমস্ত গবেষণার কথা জানিতে পারেন; কিন্তু সমাজের সাধারণ লোকগণ তাহার সংবাদ বিশেষ রাখেন না, তাঁহাদের অনেকের সেই সুযোগও নাই। শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র নাথ মজুমদার মহাশয় বিভিন্ন গ্রন্থ এবং পত্রিকাদি হইতে বিভিন্ন মনীষীর গবেষণালব্ধ তথ্য আশ্চর্য্য অধ্যবসায় এবং ধৈর্য্যের সহিত সংগ্রহ করিয়া তাঁহার 'রাজগুরু-যোগিবংশের' বর্ত্তমান সংস্করণে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। এই গ্রন্থখানি আলোচনা করিলে বহু মনীষীর আবিষ্কৃত তথ্যের সন্ধান এক স্থানেই পাওয়া যাইতে পারে।

'রাজগুরু-যোগিবংশে' যে সমস্ত অভিমত সংগৃহীত হইয়াছে তাহাদের কোনও কোনওটী সম্বন্ধে হয়তো কাহারও কাহারও মতভেদ থাকিতে পারে। পরবর্ত্তীকালের গবেষণায় কোনও কোনও অভিমত হয়তো অসমীচীন বলিয়াও পরিগণিত হইয়াছে, কিম্বা ভবিষ্যতে হইতে পারে। স্থলবিশেষে সুরেশবাবু যে নিজস্ব অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, সেই সম্বন্ধেও হয়তো কাহারও মতভেদ থাকিতে পারে। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও গ্রন্থখানির স্বরূপগত মূল্য কিছু ক্ষুণ্ণ হইবে বলিয়া মনে হয় না। বিভিন্ন মনীষীর সুচিন্তিত অভিমত

একত্রে সঙ্কলিত করিয়া সুরেশবাবু সাধারণের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। অনুসন্ধিৎসুগণ তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বিচার করিবার সুযোগ পাইবেন।

সুরেশবাবুর সঙ্কলিত অভিমতগুলির প্রায় সমস্তই যোগিজাতির গৌরবময় প্রাচীন ঐতিহ্যের পরিচায়ক। এই হিসাবে তাঁহার গ্রন্থখানিকে আমাদের একটি জাতীয়-সম্পদ বলিলে অত্যুক্তি হইবে বলিয়া মনে হয় না। জাতি-মাতৃকার সেবার জন্য তিনি যে নৈবেদ্য প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই প্রশংসার্হ।

৺বিষ্ণুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রমুখ জাতীয় সংস্কারের অগ্রদূতগণ যে বীজ রোপণ করিয়া গিয়াছেন তাহাই অঙ্কুরিত এবং পরিপুষ্ট হইয়া জাতীয় পত্রিকা এবং জাতীয় সম্মিলনীরূপ মহীরুহে পরিণত হইয়াছে। 'রাজগুরু-যোগিবংশ' এই বৃক্ষেরই একটি অপূর্ব্ব ফল।

৪৬, রসারোড্ ইষ্টফার্ষ্ট লেন
টালিগঞ্জ, কলিকাতা—৩৩
৪ঠা চৈত্র, বৃহস্পতিবার
১৩৬০ সন

শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ

পরিচায়িকা

স্বজাতিসেবক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র নাথ মজুমদার মহাশয় তাঁহার নবসংস্করণ "রাজগুরু যোগিবংশ" লিখিয়া বঙ্গীয় সমাজের বিশেষতঃ নাথযোগী সম্প্রদায়ের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থ আমি আগ্রহ ও যত্ন সহকারে পাঠ করিয়া তৃপ্তি লাভ করিয়াছি। নাথ-যোগিগণের রচিত বহু সংস্কৃত, বাংলা ও হিন্দী পুঁথি অদ্যাপি বিক্ষিপ্তভাবে সমগ্র উত্তর-ভারতে অনাবিষ্কৃত অবস্থায় আছে; যে সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাও সর্ব্ব-ক্ষেত্রে সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য। বঙ্গীয় প্রাচীন ইতিহাস ও দর্শনের সমন্বয় সাধন করিয়া "নাথপন্থ" সম্বন্ধে গবেষণা করা যে কিরূপ দুরূহ ব্যাপার, তাহা আমিস্বয়ং ভুক্তভোগী হইয়া উপলব্ধি করিতে পারি। এজন্য মজুমদার মহাশয় আমাদের সকলের বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

নাথ-সম্প্রদায় সম্বন্ধে আমি যখন প্রথম ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে গবেষণা আরম্ভ করি, তখন সুরেশবাবুর বইখানির সন্ধান পাই নাই। দেখিতেছি ১৩৩০ বঙ্গাব্দে যাহা ৪৬ পৃষ্ঠার পুস্তিকামাত্র ছিল আজ তাঁহার তৃতীয় সংস্করণ প্রায় ৭০০ পৃষ্ঠাযুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে। ইহা নাথ-সম্প্রদায়ের আনন্দের কথা সন্দেহমাত্র নাই। সুপণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ নাথ, এম. এ., বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয় ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে ২১৮ পৃষ্ঠাযুক্ত দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা লিখিয়া দিয়া গ্রন্থের গৌরব বৃদ্ধি করেন। তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা লিখিয়া দিতে তিনি আমাকে অনুরোধ জানাইয়া বিশেষ দ্বিধায় ফেলিয়াছেন। তবু তাঁহার কথা অমান্য করা সম্ভব নহে বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছি।

আজ স্পষ্ট উপলব্ধি করিতেছি যে নাথ-সম্প্রদায়ের মধ্যে একটী সজীবতা আসিয়াছে। জাতি হিসাবে আজ তাঁহারা নিজেদের পূর্ব্ব গৌরব পুনরুদ্ধারে দৃঢ়সংকল্প। তাই আজ "রাজগুরু যোগিবংশের" ন্যায় গ্রন্থের বিশেষ আবশ্যকতা আছে। আমি সাক্ষাৎভাবে নাথ-সম্প্রদায়ের সহিত যুক্ত না হইলেও, ইহার বহুল প্রকাশ কামনা করি।

শ্রীযুক্ত সুরেশবাবু গ্রন্থের নাম কেন "রাজগুরু যোগিবংশ" রাখিলেন, তাহার উল্লেখ প্রথম বা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে না পাইলেও আজ ইহা অবিসম্বাদিত সত্য যে একদা যোগিজাতি নীচবর্ণ মধ্যে গণ্য ছিলেন না। তাঁহারা যজ্ঞসূত্র ধারণের অধিকারী ছিলেন এবং ধর্ম্মজগতে তাঁহাদের স্থানও নগণ্য ছিল না। নাথগুরুগণের আসমুদ্র হিমাচল গতিবিধি ছিল এবং তাঁহারা বিভিন্ন রাজপরিবারের সহিত যুক্ত হইয়া রাজাদের "গুরু" হন— এই কারণেই গ্রন্থটীর উক্ত নামকরণ সার্থক। বঙ্গদেশে বল্লাল সেনের উৎপীড়নে ভীত হইয়া যোগিজাতি যজ্ঞসূত্র ত্যাগ করিয়া সমাজের অচল জাতিদের সহিত মিশিয়া আত্মগোপন করেন। ইহা হইতেই ক্রমশঃ কালের অলঙ্ঘ্য নিয়মানুযায়ী যোগিজাতির পতন হয়। এক্ষণে মাননীয় সুরেশবাবু ও অন্যান্য কয়েকটী উৎসাহী বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রাচীন ইতিহাস ও নাথগুরুদের সাধনতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া স্বপ্রতিষ্ঠিত হইতে যে একান্ত চেষ্টা করিতেছেন, তাহা অনুকরণযোগ্য। "রাজগুরু যোগি-বংশ" প্রকাশিত করিবার জন্য তাঁহারা বহু পরিশ্রম করিতেছেন; নাথ-সম্প্রদায় তাঁহাদের নিকট এই কারণে চিরঋণী থাকিবে।

যোগবীজ, অমনস্ক, অমরৌঘ শাসন প্রভৃতি অমূল্য গ্রন্থ

নাথগুরুদেরই রচিত ; সেগুলি এখনও লুপ্ত হয় নাই। মজুমদার মহাশয় এই সংস্করণে সেগুলির উল্লেখ করিয়াছেন। এক সময়ে যোগিজাতির মধ্যে সংস্কৃতের চর্চ্চা ছিল। বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শনের মধ্যেও নাথগুরু মীন নাথের রচিত একটি পদের উল্লেখ আছে, যথা ঃ—

কহন্তি গুরু পরমার্থের বাট
কর্ম্ম কুরঙ্গ সমাধিক পাঠ
কমল বিকসিল কহিহ ন জমরা
কমল মধু পিবিবি ধোকে ন ভমরা ॥

আধুনিক বাংলায় ইহার অর্থ হয়—"গুরু পরমার্থের পথ বলিতেছেন ; ইহা কর্ম্মরূপ কুরঙ্গের সমাধি-কপাট। কমল ফুটিলে শামুক (জোংরা-জমরা) তাহা কহে না, কিন্তু কমল মধুপানে ভ্রমরের ভুল হয় না।" এইরূপ সাঙ্কেতিক ভাষাতেই প্রাচীন গুরুরা সাধন-ভজনের কথা বলিতেন। গুরু গোরক্ষ নাথ কৃত সাঙ্কেতিক ভাষায় রচিত বহু পদ হিন্দীতে পাওয়া যায় ; কিন্তু হিন্দীর প্রাচীনতম গদ্য রচয়িতা রূপেই তাঁহার প্রসিদ্ধি আছে। শ্রীগোরক্ষের বাংলা পদ অদ্যাপি কিছু পাওয়া যায় নাই।

শাস্ত্রী মহাশয় বাংলা ভাষায় রচিত অনেকগুলি পদ বা দোহা নেপাল হইতে উদ্ধার করিয়া আনেন এবং তাহাদের হাজার বৎসরের পুরাণো বাংলার নিদর্শন বলেন। লুইপাদ প্রভৃতি দ্বারা রচিত পদগুলি পাইয়া আজ ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, একদা বাঙ্গালী নাথগুরুরা সুদূর নেপালে গমন করিয়া তথায় বাস করিয়া বঙ্গভাষা-

তেই তাঁহাদের ধর্ম্মমত প্রচার করিয়াছেন—ইহা কি বাঙ্গালা দেশের ও বঙ্গভাষাভাষীদের কম গৌরবের কথা? অদ্যাপি বাঙ্গালী শ্রীমৎস্যেন্দ্র নাথের একটি মন্দির ও তাঁহার বিগ্রহ নেপালের বোগমতী গ্রামে সগৌরবে বিরাজ করিতেছে। বৈশাখ মাসের প্রথম দিবসে এই বিগ্রহকে স্নান করাইয়া রাজার তরবারি দান করা হয়; অতঃপর সালঙ্কৃত বিগ্রহটীকে রথে আরোহণ করাইয়া পাটানে লইয়া যাওয়া হয়, একমাস পরে বিগ্রহ বোগমতীতে ফিরাইয়া আনা হয়। ঐ দিন মচ্ছীন্দ্রের কম্বল সর্ব্বসম্মুখে ঝাড়িয়া দেখান হয়; ইহার তাৎপর্য্য মচ্ছীন্দ্র সর্ব্বত্যাগী হইয়াও সদা সন্তুষ্ট, তিনি কিছুই সঞ্চয় করিয়া আনেন নাই। শ্রীমৎস্যেন্দ্র বা মচ্ছীন্দ্র বাঙ্গালা দেশের লোক ছিলেন, সুদূর নেপালে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব সত্ত্বেও শৈবধর্ম্মী ও শৈবযোগী বেশধারী মৎস্যেন্দ্র নাথের এই রথযাত্রাই তাঁহার অসাধারণ প্রভাবের পরিচায়ক।

শ্রীমৎস্যেন্দ্র নাথই মীন নাথ ও লুইপাদ নামেও পরিচিত ছিলেন কি না পণ্ডিতমণ্ডলী ইহা লইয়া বহু বাদানুবাদ করিয়াছেন। ইহার কোনো চরম সিদ্ধান্ত হইবে কি না জানি না। মজুমদার মহাশয় বলেন—"নাথপন্থার ধর্ম্মনায়ক মৎস্যেন্দ্র নাথ এবং সহজপন্থার ধর্ম্মনায়ক লুইপাদ বা মৎস্যান্দ্রাদের সময়ের, ধর্ম্মমতের ও জন্মস্থানের আদৌ মিল নাই। তাহা হইলে সিদ্ধান্ত অনিবার্য্য যে ইঁহারা বিভিন্ন ব্যক্তি নিশ্চিত" (১৭৭ পৃঃ)।

গ্রন্থকারের মতে মৎস্যেন্দ্রের সময় নিঃসন্দেহে ৫২২ খৃঃ অব্দ এবং লুইপাদের সময় ৯৮০—১০৫১ খৃঃ অব্দ। ৩১১ পৃষ্ঠায় কবি অতুল

প্রসাদের গানে "নিতাই গোরা" স্থানে বাংলার আদি লেখক হিসাবে সুরেশবাবু মৎস্যেন্দ্রের নাম বসাইয়াছেন এবং কাহ্নুপাদ, লুইপাদ প্রমুখ নাথাচার্য্য ও সিদ্ধাচার্য্যগণকে বাঙ্গালা গীতি-সাহিত্যের প্রবর্ত্তক বলিয়াছেন (পৃঃ ২৬০)। মনে হয় বিভিন্ন সময়ের ব্যক্তি বলিয়া একজনকে আদিম লেখক—অন্যজনকে গীতিকার বলাই উদ্দেশ্য; কিন্তু কেবল লুইপাদের নামান্তর 'মৎস্যান্ত্রাদ' ছিল না, মৎস্যেন্দ্রও এই নামে পরিচিত ছিলেন। তিব্বতী ভাষায় 'লুই' অর্থে মৎস্যোদর, ভারতীয় কাহিনী মতে মৎস্যেন্দ্র মৎস্যোদর হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়া যোগধর্ম্ম প্রচার করেন। শ্রদ্ধেয় ডাক্তার বিনোদবিহারী দত্ত, এম্. এ., পি. এচ্. ডি মহাশয় আমাকে বলেন যে বঙ্গদেশে মাছ ধরিবার একটী যন্ত্রকে 'লুই' বলে। তিব্বতী কাহিনী মতে শিবই কৌলাগম প্রচারার্থে কৈবর্ত্তরূপে মৎস্যোদরে আবির্ভূত হন এবং পরে মীন, মচ্ছেন্দ্র প্রভৃতি নামে পরিচিত হন। তিব্বতী চিত্রে মৎস্যেন্দ্র নাথকে মৎস্য পরিবৃত হইয়া মৎস্য অন্ত্র আহারে রত দেখা যায়। আবার নেপালে মৎস্যেন্দ্র লোহিত অবলোকিতেশ্বর রূপে এবং মীন নাথ তাঁহার 'সানু' অর্থাৎ কনিষ্ঠ ভ্রাতারূপে পূজা পান। ইহা দ্বারা মৎস্যেন্দ্র ও মীন নাথ ভিন্ন প্রতিপন্ন হন। আমি যে সকল কারণে মীন নাথ, মৎস্যেন্দ্র ও লুইপাদকে একই ব্যক্তি বলিয়া স্থির করিয়াছি তাহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা প্রকাশিত "নাথ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন প্রণালীতে" আলোচিত হইয়াছে।

কামরূপের নদী ব্রহ্মপুত্র বা লোহিত; ঐ দেশবাসীরূপে

মৎস্যেন্দ্রর 'লোহিপাদ' বা 'লুইপা' নামে পরিচিত হওয়া বিচিত্র নহে। নেপালে মৎস্যেন্দ্র সেই কারণেই লোহিত অবলোকিতেশ্বর-রূপে পরিচিত। গ্রন্থকারের মতে—

(ক) মৎস্যেন্দ্র (মীন নাথ)—নাথপন্থার ধর্ম্মনায়ক

(খ) মৎস্যেন্দ্রাদ বা লুইপাদ—সহজপন্থার ধর্ম্মনায়ক।

'কৌলজ্ঞান-নির্ণয়ে' আমরা মীন নাথ ও মৎস্যেন্দ্র নাথ এই উভয়নামই পাই। শ্রীযুক্ত রাজমোহন নাথ মহাশয় তাঁহার 'কদলীরাজ্য' পুস্তিকায় লুইপাদকে দোহা ও কৌলজ্ঞান-নির্ণয়ের রচয়িতা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া তাঁহাকে নব-মৎস্যেন্দ্র নাথ নামে অভিহিত করিয়াছেন।

মজুমদার মহাশয় লিখিয়াছেন—"তাহা হইলে মৎস্যেন্দ্র নাথের সময় দাঁড়ায় ৫২২ খৃঃ অব্দ হইতে ১০ম খৃঃ অব্দ" (পৃঃ ১৭২)। যোগীরা দীর্ঘজীবী হইতেন সন্দেহ নাই; কিন্তু এত দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকিয়া বাংলাভাষার আদিম লেখক অবশেষে সংস্কৃতে 'কৌলজ্ঞান-নির্ণয়' রচনা করেন কি না ইহা বিশেষভাবে আলোচিত হওয়া প্রয়োজন। ইহা দ্বারা নাথগুরুদের সময় সম্বন্ধে ভ্রান্তি থাকিলে তাহাও দূর হইবার সম্ভাবনা। শ্রদ্ধেয় ডাক্তার প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয় "কৌলজ্ঞান-নির্ণয়" সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন; উহা মচ্ছেন্দ্র 'পাদাবতারিত' বলিয়াই প্রকাশিত হইয়াছে। অতএব উহা মৎস্যেন্দ্র নাথের রচিত নহে; কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মমত উহাতে আছে এবং বৌদ্ধধর্ম্মের উল্লেখমাত্র উহাতে নাই। উক্ত গ্রন্থে যে 'অকুলবীর তন্ত্র' সংযোজিত হইয়াছে, উহা 'মীন নাথেন ভাষিতং'। কৌলজ্ঞান নির্ণয়ে মীন নাথ ও মৎস্যেন্দ্র নাথ

উভয় নাম থাকায় সমস্যা জটিল হইলেও তিনি যে উভয় নামেই পরিচিত ছিলেন, ইহাই প্রমাণ হয়। কৌলজ্ঞান নির্ণয়ে শ্রীগোরক্ষ নাথেরও কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু গোরক্ষ নাথ যে মৎস্যেন্দ্র নাথেরই শিষ্য ইহা বিভিন্ন সূত্র হইতে বহুবার প্রমাণ হইয়াছে। 'রাজগুরু যোগিবংশে'র দ্বিতীয় অধ্যায় নাথধর্ম্মের উদ্ভব কাল ১ম ও ২য় খৃঃ অব্দ এবং ইহার প্রবর্ত্তক গুরু গোরক্ষ নাথ (পৃঃ ৩৭, ৫৯) —এইরূপ মতবাদ পাই। তাহা হইলে গোরক্ষ নাথের গুরু শ্রীমৎস্যেন্দ্র নাথের (মীন নাথের) সময় নিঃসন্দেহে ৫২২ খৃঃ অব্দ (পৃঃ ১৬৩, ১৬৪, ১৭২, ১৭৬ ইত্যাদি)। একথা মজুমদার মহাশয় কিরূপে সিদ্ধান্ত করিলেন বুঝিলাম না। দ্বিতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ের মধ্যে সময় বিচারের সামঞ্জস্য থাকিলে ভাল হইত। মৎস্যেন্দ্র ও গোরক্ষ নাথের মধ্যে যে 'গুরু-শিষ্য' সম্বন্ধ ছিল তাহা কাহিনী, নীতিকথা, পুঁথি, মুদ্রিত গ্রন্থ ও সর্ব্বশিষ্য দ্বারা স্বীকৃত বিশেষ তথ্য। স্বীয় গুরুর উদ্ধারার্থে গোরক্ষ নাথ কদলীর দেশে যান ও বিজয়ী হন। ইহা লইয়াই 'গোরক্ষবিজয়' বা 'মীন-চেতন' রচিত হয়। গোরক্ষের অভিশাপে সব কদলী বাতুড় হইয়া যায়, এই অতিবড় সত্য ঘটনাকে শ্রীরাজমোহন নাথ মহাশয় কল্পনা বলিয়াছেন; যুক্তি দেখাইতে পারেন নাই। ইহার জন্য গ্রন্থকারকে বিশেষ দুঃখিত মনে হয় (পৃঃ ৪১৮)। অতএব গুরু মৎস্যেন্দ্র নাথ কদলী রাজ্যের অধিশ্বরী কমলা দেবী ও তাঁহার ষোলশত সঙ্গিনীর মোহে আবিষ্ট হইয়া যোগধর্ম্ম ভুলিয়া গেলে, শিষ্য গোরক্ষ নাথ মৃদঙ্গে 'কায়াসাধ', 'কায়াসাধ' বলিয়া তাঁহার চেতনা আনিয়া দেন

এবং কদলীদের বাদুড় করিয়া দেন—ইহা গ্রন্থকার দ্বারাই স্বীকৃত হইয়াছে। আমি নানা কারণে মৎস্যেন্দ্র নাথকে দশম শতাব্দীর ও গোরক্ষ নাথকে একাদশ শতাব্দীর স্থির করিয়া, জালন্ধরি নাথ বা হাড়িপা (ইনি গোরক্ষ নাথের শিষ্য ছিলেন) এবং রাজা গোপীচন্দ্র (ইনি হাড়িপার শিষ্য ছিলেন) প্রভৃতির সহিত সময়ের সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করিয়াছি। আমার ভ্রান্তি হওয়া বিচিত্র নহে। বর্ত্তমানে নাথ-সম্প্রদায় সম্বন্ধে আরও গবেষণার ফলে নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হওয়ারই সম্ভাবনা। তদ্ব্যতীত মহানাদে ৭ম খৃঃ অব্দে মীন নাথ রাজদণ্ড পরিচালনা করেন কি না (পৃঃ ৪২৭) ইহাও বিবেচ্য। জালন্ধরি, ভর্ত্তৃহরি ও গোপীচন্দ্র রাজা ছিলেন এবং চৌরঙ্গীনাথ রাজকুমার ছিলেন, এসকল বৃত্তান্ত পাওয়া যায়, কিন্তু মহানাদে মৎস্যেন্দ্রর রাজা হইবার যথেষ্ট প্রমাণ আছে কি ?

কৌলজ্ঞান নির্ণয় ও অন্যান্য সূত্র হইতে যোগিজাতিকে কৈবর্ত্ত বলা হয়— ইহা নাথ-সম্প্রদায়ের মনঃক্ষুণ্ণতার বিশেষ কারণ। কিন্তু শিব স্বয়ং মৎস্যেন্দ্রের রূপ ধারণ করিয়া এক মৎস্যের উদর হইতে "কৌলাগম" উদ্ধার করেন; অতএব মৎস্যেন্দ্রই স্বয়ং ভৈরব একথা মনে রাখিলে আর দুঃখের কারণ থাকে না। অপরপক্ষে "মৎস্য" শব্দের অর্থ 'পাশ'; সংসারী ব্যক্তি নানাপাশে আবদ্ধ—তাহা হইতে মুক্ত হওয়াই যোগীর লক্ষণ। অতএব মৎস্যেন্দ্র অর্থে মৎস্য ধরিতে সমর্থ বা পাশমোচনে যিনি সক্ষম। তিব্বতী চিত্রে ৫।৬টী মৎস্য পরিবৃত থাকার অর্থ পঞ্চপ্রাণ ও মনকে যিনি জয় করিয়াছেন এইরূপ যোগীই "মৎস্যেন্দ্র নাথ"।

মহাপুরুষদের জন্মবৃত্তান্ত রহস্যাবৃত থাকাও বিচিত্র নহে; তাই 'মৎস্য' হইতে মৎস্যেন্দ্রের জন্ম বা উদ্ধার; গোরক্ষ নাথ 'ঈশ্বরসন্তান' ইত্যাদি কাহিনীর প্রচলনও বিচিত্র নহে। সম্ভবতঃ সেই কারণেই কৌলজ্ঞান নির্ণয়ে ভৈরব দেবীকে বলিতেছেন ঃ—

অহং সো ধীবরো দেবি! কৈবর্ত্তত্বং ময়াকৃতঃ।
আকৃষ্য তু তদা মৎস্যং শক্তিমান্ সমীকৃতঃ॥

ভৈরব ব্রাহ্মণ হইয়াও ধীবর সাজিয়া তাঁহার দৈবশক্তি জালের দ্বারাই সেই কৌলাগম অপহরণকারী মৎস্যকে তীরে উঠাইয়া শাস্ত্রোদ্ধার করেন। সেই হইতে দেবীর বরে কৈবর্ত্তরাই বিপ্র-নায়ক বলিয়া পরিগণিত হইলেন। ইহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিলে বলিতে হয়—মৎস্যরূপী মায়া বা প্রাণবায়ু দেহ ব্যাপ্ত করিয়া আছে; ধীবরবৃত্তি ধারণ করিয়া সেই মায়াকে বধ করিয়া ব্রহ্মত্ব বা সমাধিলাভ সঙ্গত। অতএব যোগিসম্প্রদায়ের দুঃখ করা অকর্ত্তব্য।

এখানে একটী বিশেষ কথা বলা আবশ্যক মনে হয়। অনেকে ইতিপূর্ব্বে নাথ-যোগীদের বৌদ্ধ বলিতে দ্বিধা করেন নাই। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মে জীবহিংসা নিষিদ্ধ; অতএব কৌলজ্ঞান নির্ণয়ে কাহিনী হিসাবেও জীবহিংসার কোন বৃত্তান্ত থাকা বৌদ্ধদের গ্রন্থে সম্ভব হইত না। ভৈরব ও দেবীর কথোপকথন ইহাতে থাকাতে ইহা যে শৈবধর্ম্মীদের গ্রন্থ, তাহাও প্রমাণিত হয়। নেপালে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল থাকা সত্ত্বেও শ্রীমৎস্যেন্দ্র শৈবযোগীর বেশেই শৈবধর্ম্ম প্রচারার্থে নেপালে গমন করিয়া সফল হন; তাই আজও সেখানে তাঁহার মন্দিরাদি আছে। মৎস্যেন্দ্রের রথযাত্রা এখনও সেখানে সমারোহ

করিয়া সম্পন্ন হয়। গোরক্ষপুরে প্রসিদ্ধ শ্রীগোরক্ষ নাথের মঠ ও মন্দিরাদি আছে। নেপালের মুদ্রায় গুরু শ্রীগোরক্ষ নাথের নাম মুদ্রিত থাকে। অতএব বাঙ্গালী মৎস্যেন্দ্র নাথ ও অবাঙ্গালী গোরক্ষ নাথ অদ্যাপি সুদূর নেপালে সম্মান পাইতেছেন।

গ্রন্থকার নাথ-যোগিগণের মঠ, মন্দিরাদি ও তীর্থের বিবরণ দিয়া এবং শেষাংশে লোকগণনার বিবরণ, মৃত স্বজাতিহিতৈষী প্রভৃতিদের জীবনী প্রদান করিয়া নাথ-সম্প্রদায়ের প্রভূত উপকার করিয়াছেন। আমি যোগিজাতির দৈনন্দিন উন্নতির প্রার্থনা করি, কিন্তু কিভাবে কেবল যোগিগুরুদের সময় নির্দ্ধারণ ব্যাপারে নিজেদের বিব্রত না করিয়া তাঁহাদের দর্শন ও সাধন বিষয়ে মনোযোগী হইয়া সেই পথে অগ্রসর হইতে হইবে, আজ তাহা বিচার করিয়া পথ নির্দ্ধারণের সময় আসিয়াছে। তাহা না হইলে লুপ্তপ্রায় শৈবধর্ম্মী যোগীরা অন্যান্য সাধনপথেই অগ্রসর হইবেন। ইহাতে যোগি-সম্প্রদায়ের পুনরুত্থান সম্ভব হইবে না।

যোগিগণ 'সোঽহম্' মন্ত্রের দর্শন লাভ করেন এবং তাহারা নিখিল বিশ্বকর্ত্তাকে 'নাথ' রূপে ভজনা করিতেন বলিয়া তাঁহাদের ধর্ম্ম 'নাথ-ধর্ম্ম' রূপে পরিচিত—গ্রন্থকর্ত্তা তাহা আমাদিগকে জানাইয়াছেন (পৃঃ ৪১, ৫৯)। এই 'নাথ' শব্দের অর্থ প্রভু বা গুরু; তাই সাধনমার্গে গুরুপূজা দ্বারাই পরম গুরুর সন্ধান পাওয়া যাইবে; একথাও নাথযোগীরা বলিয়াছেন। নাথেরা যোগকে আশ্রয় করেন বলিয়াই তাঁহারা যোগী এবং তাঁহারা অদ্বৈতবাদী ছিলেন (পৃঃ ৪০)। নাথসাধক রুদ্ররূপী মহাদেবের সাধক এবং

নাথ-স্বরূপের যে জ্যোতির্ম্ময়রূপে তাঁহারা কল্পনা করিতেন তাহাও গ্রন্থমধ্যে বর্ণিত হইয়াছে (পৃঃ ৫৯)। নাথধর্ম্মে যে নাদবিন্দুর উপাসনা আছে তাহা প্রণবেরই নামান্তর ; নাদ বা প্রণব হইতে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, তাই নাথবিন্দুর উপাসনা কর্ত্তব্য নাথের নামান্তর জগন্নাথ, নিরঞ্জন প্রভৃতি। 'নাথ' শব্দ খুব সম্ভব বৈদিক 'স্নাত' শব্দের অপভ্রংশ (পৃঃ ৬৩), তাই স্নানের পর দীক্ষা হইলে দীক্ষিতের নামের সহিত 'নাথ' শব্দ যোগ করা বিধেয় বিবেচিত হইত। আবার ন+অথ যোগে 'নাথ' হওয়াও সম্ভব অর্থাৎ যাঁহার 'অথ' অর্থে অনন্তর বা পরে নাই তিনিই 'নাথ' (পৃঃ ৬৪)। বিশেষার্থে 'নাথ' শব্দ হইতে যাঁহার কোন জিজ্ঞাসা নেই—যিনি যোগসিদ্ধ হইয়াছেন ও সত্যের উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনিই 'নাথ' বা 'সর্ব্বজ্ঞ যোগিরাট্' এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যায়। 'নাথ' শব্দের অন্য নানা উৎপত্তির কথা রাজগুরু যোগিবংশের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে। কিন্তু এক্ষণে সেই 'নাথের' পূর্ণ স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া সাধনপথে অগ্রসর হওয়াই কর্ত্তব্য। ইহাই নাথযোগি-সম্প্রদায়ের মুক্তি বা সাধনের পথ উন্মুক্ত করিবে।

নাথযোগী রচিত সংস্কৃত সিদ্ধ-সিদ্ধান্তসংগ্রহে আছে নাথস্বরূপ দ্বৈতাদ্বৈত উপরবর্ত্তী। এই সারগর্ভ পুস্তক সুপণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া কাশী হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। মজুমদার মহাশয় জানাইয়াছেন অশব্দম্ অনপর্শম প্রভৃতি দ্বারা ব্রহ্মের যে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহার সহিত নাথ স্বরূপের পার্থক্য নাই (পৃঃ ৯৪)।

ব্রহ্ম নিত্য ও অনাদি ; যোগিগণ এই ব্রহ্মকেই নিরঞ্জন বলেন এবং তিনিই নাথযোগীর উপাস্য (পৃঃ ৯৫)। বেদে ও বিভিন্ন উপনিষদে নিরঞ্জন তত্ত্ব দেখা যায় ; অতএব নাথধর্ম্মের মূলতত্ত্ব বেদাদি হইতে গৃহীত, গ্রন্থকার তাহাই আমাদিগকে জানাইয়াছেন।

শূন্য পুরাণ গ্রন্থে পাই "নীরেত নিরমল কা আ নাম নিরঞ্জন" অর্থাৎ যাঁহার অঞ্জন বা কালিমা নাই, তিনি নিরঞ্জন। মহাশূন্যে প্রভু একলাই বিরাজ করিতেন, বিশ্বের উপর দয়া হইলে প্রভু আপন কায়া হইতে নিরঞ্জনের সৃষ্টি করিলেন, তখন নিরঞ্জন আদ্যাশক্তির সহায়ে জীবের সৃষ্টি করিলেন। এই নিরঞ্জনের পূজা করেন ধর্ম্ম-পূজারী নামক সম্প্রদায় বিশেষ। এই পূজায় বলিদানের বিধি আছে। ইহার আদি লেখক রামাই পণ্ডিত ; ইহার দ্বিতীয় স্তরে নাথধর্ম্মের প্রভাব দেখা যায়। নাথপন্থী যোগীরা শিব ও ধর্ম্ম নিরঞ্জন উভয়কেই পূজা করিতেন। (বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৩৩৬ প্রকাশিত ভূমিকা পৃঃ ১১৩ দ্রষ্টব্য)। শূন্য পুরাণে আদ্য নাথ, মীন নাথ, চৌরঙ্গী নাথের উল্লেখ পাওয়া যায় (পৃঃ ২২৩ শূন্যপুরাণ)। গোরক্ষ-সিদ্ধান্ত সংগ্রহে আছে "তিষ্ঠতি খেচরী মুদ্রা তস্মিন্ শূন্যে নিরঞ্জনে"। ইহাই নিরঞ্জনের শূন্যমূর্ত্তির সাধনা। এই গ্রন্থও কবিরাজ মহাশয় দ্বারা সম্পাদিত ও কাশী হইতে ১৯২৫ খৃঃ অব্দে প্রকাশিত হয়। নাথধর্ম্মে পঞ্চ আকাশের যে সাধনা আছে তাহা শূন্য হইতে শূন্য গমনের সাধনা, শ্রীগোরক্ষ নাথকৃত সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত পদ্ধতির দ্বিতীয় অধ্যায়ের মধ্যে ইহার বিশেষ বিবরণ আছে। সম্প্রতি এই গ্রন্থখানি আমার দ্বারা সম্পাদিত হইয়া পুণা হইতে প্রকাশিত

হইয়াছে। নাথপন্থের সাধনা এই গ্রন্থে বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। পিণ্ডব্রহ্মাণ্ড সাধন নাথ-যোগীদের একটী বিশেষ সাধন; এই গ্রন্থে তাহার বর্ণনা আছে। কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের সন্ধিস্থানে অর্দ্ধ উর্দ্ধের মিলনস্থান—তাহাই নিরঞ্জনের বাসস্থান। নাথপন্থে কুণ্ডলিনীর জাগরণের যে সাধন আছে সে কুণ্ডলীও বৃত্তাকার বা শূন্যাকার। প্রণব সাধনের মধ্যেও ব্যাপিনী নামক মাত্রাংশ "শূন্য" নামে অভি-হিত হয়। ওঁ কারের স্বরূপ, গোরক্ষসিদ্ধান্ত-সংগ্রহের ৫৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে। এই গ্রন্থে আছে বিষ্ণুর উপাসকের মোক্ষের আশা বৃথা (পৃঃ ৪০); অতএব নাথেরা বৈষ্ণব ছিলেন না। ইঁহাদের বৌদ্ধ বলাও অসঙ্গত; অতএব আদি নাথ বা শিব হইতে উৎপত্তি বলিয়া নাথেরা শৈব এবং যোগ নাথের পুত্র বলিয়া তাঁহারা "যোগী"।

আজ যোগীদের পূর্ব্ব ইতিহাস স্মরণ পূর্ব্বক নূতন করিয়া সাধন-পথে অগ্রসর হইবার সময় আসিয়াছে। সেই কারণে শ্রদ্ধেয় সুরেশ বাবুর "রাজগুরু যোগিবংশ" নানা তথ্যসম্বলিত ও যুগোপযোগী হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে—ইহা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। ইহা দ্বারা নাথ-সম্প্রদায়ের প্রত্যেকেই উপকৃত হইবেন তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। তাই সেই স্বয়ংপূর্ণ দ্বৈতাদ্বৈত বিলক্ষণ, সগুণ নির্গুণের অতীত "নাথ" স্বরূপের নিকটে এই গ্রন্থের বহুল প্রসারের নিমিত্ত প্রার্থনা জানাই।

কলিকাতা
১লা আগষ্ট, ১৯৫৪

শ্রীকল্যাণী মল্লিক

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত
এম. এ., পি. এইচ. ডি. লিখিত ৩য় সংস্করণের

ভূমিকা

বাঙলার যোগিসম্প্রদায় বাঙলার জনসংখ্যার মধ্যেই যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে তাহা নহে, বাংলার ধর্মসংস্কৃতির ভিতরেও এই যোগিসম্প্রদায়ের বিশেষ দান রহিয়াছে। আজ একথা সকলের নিকটেই সুবিদিত যে নাথধর্মকে অবলম্বন করিয়া বহুবৎসর ধরিয়া যে যোগিসম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার বিস্তৃতি শুধু বাঙলাদেশে নয় সমগ্র ভারতবর্ষে, পূর্বে সুদূর বাঙলা হইতে পশ্চিমে সুদূর পাঞ্জাব, কাশ্মীর পর্যন্ত; দক্ষিণে কন্যা কুমারিকা হইতে—এমন কি তাহারও দক্ষিণে সিংহল দেশ হইতে উত্তরে নেপাল, তিব্বত পর্যন্ত; সর্বত্রই গাথায়-ছড়ায়, উপাখ্যানে-নাটকে, জনশ্রুতি ও পরবর্তী পল্লবায়ণে নাথধর্ম ও যোগিসম্প্রদায় সম্বন্ধে আমরা নানা তথ্যের সন্ধান পাইয়া থাকি। এই সব তথ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে আমরা আর কিছু সম্বন্ধে নিশ্চিত না হইলেও ঐ বিষয়ে বেশ নিশ্চিত হইতে পারি যে একটি বিশেষ যুগে এই নাথসম্প্রদায় প্রবর্তিত যোগধর্ম ভারতবর্ষের ন্যায় একটি বিরাট দেশের আনাচে-কানাচে প্রায় সর্বত্রই ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

কিন্তু মূলে যাহা ছিল একটি যোগমার্গের ধর্মসম্প্রদায়, কালের বিবর্তনে তাহাই রূপান্তরিত হইল একটি জাতি মাত্রে। বাঙলার

যোগিসম্প্রদায় এখন অনেকখানেই বাঙলাদেশের অধিবাসী বহু জাতি মধ্যে একটি জাতি মাত্র। ধর্মের পটভূমি এখন লুপ্তপ্রায়। বাঙলাদেশের যোগিসম্প্রদায়ের লোক হিন্দুজাতির ভিতরকার সমপর্যায়ের জাতিগুলির অন্তর্ভুক্ত লোক হইতে যে কিসে কোথায় কতটুকু স্বতন্ত্র তাহা আজ স্পষ্ট বুঝিয়া ওঠা সহজ নয়। কিছুদিন পূর্ব পর্যন্তও কোনও কোনও স্থানে যোগিজাতির ভিতরে মৃতদেহের অগ্নিদাহের পরিবর্তে মাটির নীচে সমাধিস্থ করিবার রীতি প্রবর্তিত ছিল; কিন্তু এখন সে রীতিও লুপ্তপ্রায়; যতদূর জানি প্রায় সর্বত্র অন্যান্য হিন্দুজাতিগুলির ন্যায় যোগিজাতিও মৃতদেহ অগ্নিদাহ করান। বরিশালে আমাদের গ্রামের পাশের গ্রামেই নাথ বা দেবনাথ উপাধিধারী বহু যোগিজাতির লোকের বাস, তাঁহাদের ভিতরে বহু অনুসন্ধান করিয়াও আমি নাথধর্মের কোনও আচার আচরণ বা কিংবদন্তীও সংগ্রহ করিতে পারি নাই। তাঁহাদের অধিকাংশেরই এখন ঝোঁক হইল বৈষ্ণবধর্মের দিকে; খোলকরতাল সংযোগে সন্ধ্যায় হরিনাম সঙ্কীর্তন তাঁহাদের মুখ্যধর্ম; তাছাড়া হিন্দুদের সাধারণভাবে যেমন পালপার্বণ পূজা-অর্চা চলিত আছে, তাঁহাদের মধ্যেও মোটামুটিভাবে সেই সকল জিনিসের প্রচলন রহিয়াছে।

যোগিজাতি যে মূলতঃ একটি প্রধান ধর্ম সম্প্রদায় হইতে উদ্ভূত এবং তাঁহাদের যে সুদীর্ঘ অতীতের একটা মহান ঐতিহ্য রহিয়াছে কিছুদিন পূর্ব হইতেই এই আত্মচেতনা বাঙলার যোগিজাতির মধ্যে একটি নবজাগরণের সাড়া আনিয়া দিয়াছে। জাতীয় আত্ম-

চেতনার জন্যই চাই জাতীয় ইতিহাস। ইতিহাস শুধু অতীতের স্মৃতি মাত্র বহন করে না, সে যোগায় ভবিষ্যতের নিত্য নব প্রেরণা। এই জন্যই অতি স্বাভাবিকভাবে বাঙলার যোগিজাতির ভিতরে আত্মসচেতন পুরুষ যাঁহারা তাঁহারা অনেকেই যোগিজাতির এবং তৎসঙ্গে নাথধর্মের ইতিহাস এবং স্বরূপ পরিচয় জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিয়াছেন। এই আত্মপরিচয় লাভের চেষ্টাই শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র নাথ মজুমদার মহাশয়কে বর্তমান গ্রন্থরচনায় অনুপ্রাণিত করিয়াছে।

ইহার পূর্বে নাথধর্ম এবং বাঙলার যোগিজাতি সম্বন্ধে বিভিন্ন গ্রন্থে এবং বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় বহু গবেষক ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত নানাভাবে আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু কাঁহারও কাঁহারও রচনার মধ্যে নাথসম্প্রদায় ও যোগিজাতি সম্বন্ধে একটু অবজ্ঞার ইঙ্গিত রহিয়াছে; ইহা যোগিজাতির ভিতরে যাঁহারা একটু আত্মসচেতন তাঁহাদিগকে স্বভাবতঃই পীড়িত করিয়া থাকে। এইজন্য বাঙলার যোগিজাতির ভিতরকারই অনেক কৃতিমান বিশেষজ্ঞ নাথধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব এবং তাহার ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনায় প্রয়াসী হইয়া উঠিয়াছেন। ইহা নানা দিক দিয়া আশা ও আনন্দের কথা। ইহা দ্বারা শুধু বাঙলার যোগিজাতিই যে তাঁহার লুপ্ত গৌরবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে তাহা নহে, এই আলোচনা দ্বারা নাথধর্মের অন্তর্নিহিত গূঢ় তত্ত্বসমূহের পুনঃপ্রকাশ এবং পুনঃপ্রচার হইবে, নিরপেক্ষ সত্যেরও আবিষ্কার হইবে।

কিন্তু নাথধর্ম সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা এবং সেই তথ্য হইতে

আবার ঐতিহাসিক সত্য নির্বাচন করা বড়ই কঠিন কাজ। বিশেষ জনপ্রিয়তার জন্য নাথধর্ম ও নাথগুরুগণ সম্বন্ধে ভারতবর্ষের বহু অঞ্চলে এত বিশ্বাস্য এবং অবিশ্বাস্য উপাখ্যানে এবং কিংবদন্তী গড়িয়া উঠিয়াছে যে তাহার ভিতর হইতে সত্যকে বাছাই করিয়া লওয়া অনেক সময় প্রায় অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। অলৌকিক উপাখ্যান একবার গড়িয়া উঠিতে আরম্ভ করিলে জনগণের অবাধ কল্পনা তাহাকে যে কোথায় কতদূর টানিয়া লইবে তাহার কোন স্থিরতা নাই। নাথধর্ম সম্বন্ধে ঐতিহাসিক দৃষ্টি লইয়া যিনিই আলোচনা করিবেন, তাহাকেই তাই প্রতি পদবিক্ষেপে অতিশয় সাবধান হইয়া বিভ্রান্তির সম্ভাবনা হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইবে। আলোচ্য গ্রন্থে অবশ্য গ্রন্থকার তথ্যের সংগ্রহের সহিত নির্বাচনের উপরে তুল্য গুরুত্ব অর্পণ করেন নাই, নানা উৎস হইতে তথ্য সংগ্রহের দিকেই তাঁহার প্রধান দৃষ্টি, নির্বাচনের ভার সবটা না হইলেও অনেকটা পাঠকের উপরেই ছাড়িয়া দিয়াছেন।

নাথধর্মের আলোচনার সময়ে আমাদের আর একটি সত্য সম্বন্ধেও বিশেষভাবে সচেতন থাকিতে হইবে। নাথধর্ম সম্বন্ধে যেখানে যত আলোচনা দেখিয়াছি তাহার প্রায় সব ক্ষেত্রেই নাথধর্মকে মোটামুটিভাবে ভারতবর্ষের সাধারণ যোগধর্ম বা তন্ত্র সাধনার সঙ্গে যুক্ত করিয়া দেখিবার চেষ্টা হইয়াছে। নাথধর্মের তত্ত্বখ্যাপনে বা সাধনার পরিচয়ে তাই সাধারণ কতকগুলি যৌগিক ক্রিয়াকলাপ বা তৎলব্ধ অনুভূতির আলোচনা দেখিতে পাই। কিন্তু আমাদিগকে

ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিতে হইবে, ভারতবর্ষের যোগমার্গে বা তন্ত্রমার্গে সাধারণভাবে যে সকল সাধনার কথা রহিয়াছে তাহার ব্যাখ্যা করিলেই কি নাথধর্মের মূল তত্ত্বের ব্যাখ্যা বা পরিচয় দেওয়া হইবে? ভারতবর্ষে যোগিসম্প্রদায় অনেক রকমের রহিয়াছে, সব সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য এবং সাধনপন্থার ভিতরে মিল যতই থাকুক সূক্ষ্মদৃষ্টিতে পার্থক্যও অনেক আছে। আমি নাথধর্ম সম্বন্ধে যেটুকু আলোচনা করিয়াছি তাহাতে আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে, ভারতবর্ষের সাধারণ যোগপন্থের সহিত মৎস্যেন্দ্র নাথ এবং গোরক্ষ নাথের নাম নানাভাবে যুক্ত থাকিলেও এবং ইঁহারাই যোগমার্গের প্রবর্তক বলিয়া প্রসিদ্ধি থাকিলেও ইঁহাদের প্রবর্তিত এবং প্রচারিত ধর্মমতের ভিতরে একটা উদ্দেশ্য এবং সাধনপন্থার বৈশিষ্ট্য ছিল। দেহভাণ্ডস্থিত অমৃতের রক্ষণ, তাহার ভক্ষণ এবং তাহার সাহায্যে সমগ্র দেহের আপ্যায়ন এবং ক্রমপরিবর্তন—সেই ক্রমপরিবর্তনের ভিতর দিয়া প্রথমে সিদ্ধতনু, তাহা হইতে দিব্যতনু এবং সেই দিব্যতনু হইতে ক্রমে প্রণবতনুতে মৃত্যুঞ্জয়ত্ব লাভ—ইহা নাথধর্মের কেন্দ্রবিন্দু। সিদ্ধবাদ ভারতবর্ষের অতি প্রাচীন মত এবং সাধন-পদ্ধতি, প্রাচীনকালে রসসিদ্ধরূপেই ইহার প্রচলন এবং প্রাধান্য ছিল বলিয়া মনে হয়; রসসিদ্ধবাদই মহেশ্বর সিদ্ধবাদে রূপান্তরিত হইয়া রসায়ন এবং যোগের মধ্যে একটি নিগূঢ় মিলন ঘটাইয়াছে। নাথধর্মের আলোচনায় আমরা বিভিন্ন যোগমত এবং সাধনপদ্ধতির জোলে পড়িয়া নাথধর্মের মৌলিক স্বাতন্ত্র্যের কথা যদি ভুলিয়া যাই তবে নাথধর্মের সত্যকার পরিচয় দেওয়া হইবে না। নাথধর্মের এই

স্বাতন্ত্র্যের দ্বারাই নাথ-সাহিত্যের জাতিভাগও করিয়া লইতে হইবে। চর্যাপদের ভিতরে বর্ণিত যোগপদ্ধতির সহিত নাথসিদ্ধাদের বর্ণিত যোগপদ্ধতির মিল দেখিয়াই উভয়কে একেবারে এক করিয়া লওয়া কোনক্রমে উচিত হইবে না; মিলও যেমন অনেক রহিয়াছে, মৌলিক অমিলও রহিয়াছে। নাথসিদ্ধাগণ জন্ম মৃত্যুতে বিশ্বাসী ছিলেন, পঞ্চভৌতিক দেহকে তাঁহারা সত্য বলিয়া স্বীকার করিতেন, এই মরপাঞ্চভৌতিক দেহকেই যোগের দ্বারা প্রণবতনুতে পরিবর্তিত করিয়া এই দেহেরই অবিনাশিত্ব সাধন করা যায় এই ছিল তাঁহাদের বক্তব্য। চর্যাপদের বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ আদৌ জন্মমৃত্যুতে বিশ্বাসই করিতেন না এবং কায়া সাধনের কথা তাঁহারাও বার বার নানাভাবে বলিয়া থাকিলেও এই দেহেরই অবিনাশিত্ব সাধনের আদর্শ তাঁহারাও কখনও স্বীকার করেন নাই; মহাসুখের অদ্বয় সামরস্যের মধ্যে জন্ম এবং মৃত্যু উভয়ের অস্তিত্ববোধকে নিঃশেষে লয় করিয়া দিবার আদর্শেই ছিলেন তাঁহারা অনুপ্রাণিত।

নাথধর্ম অবশ্য আলোচ্য গ্রন্থের লেখকের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, তাঁহার মুখ্য আলোচ্য বিষয় যোগিজাতির বিবরণ, নাথধর্মের আলোচনা প্রাসঙ্গিকভাবেই আসিয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি, প্রবল স্বজাতিপ্রেম এবং নবজাগরণের প্রেরণাই লেখককে গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত করিয়াছে। ঐতিহাসিক দৃষ্টির পার্থক্য সব সময়ই সম্ভব, এবং লেখকের মতামতের সহিত সর্বত্র একমত না হইবার অবকাশ পাঠকের রহিয়াছে। কিন্তু লেখকের উদ্দেশ্য সাধু, শ্রম ও অনু-

সন্ধিৎসা প্রশংসনীয়। এই গ্রন্থরচনা দ্বারা তিনি তাঁহার স্বজাতির যেমন শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন, বাংলার ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে কৌতূহলী পাঠকের সশ্রদ্ধ ধন্যবাদেরও তিনি অধিকারী হইয়াছেন।

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত
৮।৭।৫৪

কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ
শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ, এম-এ, বিদ্যাবাচস্পতি
মহোদয় লিখিত ২য় সংস্করণের

ভূমিকা

রাজগুরু যোগিবংশের একটি ভূমিকা লিখিবার নিমিত্ত শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র নাথ মজুমদার মহাশয় সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়াছেন। আমার লিখিত ভূমিকা দ্বারা তাঁহার পুস্তকের কি গুরুত্ব বৃদ্ধি হইবে বলিতে পারি না; তথাপি তাঁহার অনুরোধের মর্যাদা রক্ষার্থে আমাকে যৎকিঞ্চিৎ লিখিতে হইতেছে।

দেশে একটা জাগরণের সাড়া পড়িয়াছে। সকল জাতিই এখন নিজ নিজ উন্নতিসাধনে প্রয়াস পাইতেছে। দেশের পক্ষে ইহা মঙ্গলের লক্ষণ; ব্যষ্টির উন্নতিতেই সমষ্টির উন্নতি। যে সকল জাতির মধ্যে সর্বপ্রথম এই জাগরণের সাড়া পড়িয়াছিল, যোগিজাতি তাঁহাদের অন্যতম। রাজগুরু যোগিবংশ যোগিজাতির জাগরণের ইতিহাস।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদিগের অনুসন্ধানের ফলে এক্ষণে প্রায় নিঃসন্দিগ্ধরূপেই জানা যাইতেছে যে, এতদ্দেশীয় যোগিজাতির আদিপুরুষগণ ধর্মজগতে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন; তাঁহারা একটি ধর্মসম্প্রদায়েরও প্রবর্তক ছিলেন। তাঁহাদের প্রবর্তিত নাথ-ধর্ম বিশেষ বিস্তৃতিলাভও করিয়াছিল; এই নাথ-সম্প্রদায় এক সময়ে ভারতে গুরু-সম্প্রদায় বলিয়াই খ্যাতিলাভ করিয়াছিল এবং অনেক প্রবল প্রতাপ নরপতিও তাঁহাদের শিষ্যত্ব

লাভ করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছিলেন। এ সকল এখন ঐতিহাসিক সত্য, জাতি-বিশেষের স্পর্ধাজ্ঞাপক অমূলক উচ্ছ্বাস নহে। যোগিজাতির পূর্বপুরুষগণের রচিত ধর্মবিষয়ক সংস্কৃত গ্রন্থরাজি এখনও একেবারে দুষ্প্রাপ্য হয় নাই; তাঁহাদের নামে প্রসিদ্ধ তীর্থমঠাদি এখনও বিলুপ্ত হয় নাই; তাঁহাদের গৌরবসূচক কিম্বদন্তীসমূহ এবং গান, দোহা প্রভৃতি এখনও একেবারে বিস্মৃতির অতল জলে নিমজ্জিত হয় নাই। কেবল ধর্মজগতে নয়, সাহিত্যক্ষেত্রেও তাঁহারা বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। সুবিজ্ঞ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার এক অভিভাষণে বলিয়াছিলেন, প্রাচীনতম বাঙ্গালা রচনা যাহা পাওয়া যায়, তাহা নাকি যোগিজাতিরই জনৈক মহীয়ান পূর্বপুরুষের। প্রাচীন নাথ-গুরুগণের নিকটে সমগ্র হিন্দু জাতিও কম ঋণী নহেন। জনৈক নেপালরাজের আহ্বানে মীন নাথ নেপালে যাইয়া তত্রত্য বৌদ্ধধর্মের মধ্যে ব্রাহ্মণ্যধর্ম অনুপ্রবিষ্ট করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। বৌদ্ধধর্মের সহিত হিন্দুধর্মের সংঘর্ষণ উপস্থিত হইলে নাথ-গুরুগণের প্রভাব হিন্দুধর্মের প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছিল বলিয়াও ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে।

কালের দুর্লঙ্ঘনীয় নিয়মে এই সমুন্নত-জাতিরও অধঃপতন হইতে আরম্ভ হইল; অবশেষে কোনও এক ঘটনা উপলক্ষে এই জাতি সমাজের নিম্নস্তরে অবস্থাপিত হইল। বহুকাল এইভাবে থাকার ফলে, স্বভাবতঃ যাহা হয়, যোগিজাতির ভাগ্যেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। কিন্তু যাঁহারা নিরপেক্ষভাবে এই জাতির

আভ্যন্তরীণ ক্রিয়াকলাপাদির প্রতি লক্ষ্য করিবেন, তাঁহারাই দেখিতে পাইবেন, এই অধঃপতিত অবস্থায়ও যোগিগণ তাঁহাদের পূর্বপুরুষগণের শাস্ত্রীয় আচারাদি অনেক পরিমাণে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের নাথ পদবী এখনও পূর্বতন নাথ-গুরুদিগের সহিত তাঁহাদের সংযোগসূত্ররূপে বিদ্যমান রহিয়াছে।

বহুকাল যাবৎ যোগিজাতীয় লোকগণ স্বজাতির পূর্বতন গৌরবের কথাও জানিত না, নিজেদের বর্তমান দুরবস্থাকেও দুরবস্থা বলিয়া মনে করিতে পারিত না। প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে যখন সর্বপ্রথমে জাগরণের সাড়া পড়িল, তখনই তাঁহাদের পূর্বতন ইতিহাসের অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। কিন্তু প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসু পণ্ডিতগণের স্বতঃপ্রবর্তিত ও রাজপুরুষগণের প্রবর্তিত অনুসন্ধানের ফলেই এই জাতি সম্বন্ধে অনেক ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। স্বজাতিহিতৈষী সুরেশচন্দ্র অন্যান্য বিবরণের সঙ্গে সেই সমস্ত তথ্যেরই কতকগুলি মাত্র তাঁহার পুস্তকে অতি নিপুণ ভাবে সন্নিবিষ্ট করিয়া স্বজাতির পরমোপকার সাধন করিয়াছেন। **যোগিজাতি সম্বন্ধে ইতঃ পূর্বে অনেক পুস্তকই প্রকাশিত হইয়াছে বটে; কিন্তু রাজগুরু যোগিবংশের ন্যায় তথ্যপূর্ণ পুস্তক আর প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।** গ্রন্থকার দীর্ঘজীবী হইয়া উত্তরোত্তর স্বজাতির মঙ্গল সাধন করুন, ইহাই শ্রীভগবচ্চরণে প্রার্থনা।

কুমিল্লা | **শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ**
১০।৩।৩৪ ইং

প্রকাশকদ্বয়ের নিবেদন

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র নাথ মজুমদার মহাশয় সম্পাদিত "রাজগুরু যোগিবংশ" ভগবৎকৃপায় প্রকাশিত হইল। আমাদের এই গ্রন্থ প্রকাশের কারণ ও উদ্দেশ্য কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন এবং এই গ্রন্থের "রাজগুরু যোগিবংশ" নামকরণই বা হইল কেন তাহাও জানিবার কৌতূহল অনেকের হইতে পারে। আমরা সংক্ষেপে এই জিজ্ঞাসার উত্তর প্রদান করিতেছি।

যোগিজাতির গৌরবময় ঐতিহ্য সত্ত্বেও এই জাতি সম্বন্ধে অনেকে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন এবং অজ্ঞতাপ্রসূত একদেশদর্শী অভিমত প্রচার ও প্রকাশ করিয়া এই জাতিকে হীন প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন। যোগিজাতির শ্রেষ্ঠতা-প্রতিপাদক নানা তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশ করিয়া ঐ সকল ব্যক্তির ভ্রান্ত ধারণা দূর করিবার চেষ্টা এই গ্রন্থ প্রকাশের একটি উদ্দেশ্য।

সুদীর্ঘকালের পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে গ্রন্থকার যোগিজাতির অতীত ইতিহাসের যে সকল বিক্ষিপ্ত উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর না হওয়াতে একমাত্র জাতির কল্যাণ উদ্দেশ্যেই প্রকাশকদ্বয় গ্রন্থের মুদ্রণ ও প্রকাশনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনীর ওয়ার্কিং কমিটী এই গ্রন্থ প্রকাশের অনুকূলে এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া গ্রন্থকারকে যে আশা ও আশ্বাস দিয়াছিলেন, নানা কারণে—হয়তো আর্থিক অসুবিধা

হেতু তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। গ্রন্থকারের এই নৈরাশ্য দূর করিবার মানসে এবং তাঁহাকে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা কার্য্যে আরও উৎসাহিত করিবার উদ্দেশ্যে আমরা গ্রন্থ প্রকাশের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছি। "শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র নাথ মজুমদার মহাশয় তাঁহার 'রাজগুরু যোগিবংশ' নামক গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের পাণ্ডুলিপিতে যে সমস্ত তথ্য নিপুণতার সহিত সন্নিবেশিত করিয়াছেন আমি সেই পাণ্ডুলিপি দেখিয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছি। ইহা যে আমাদের একটি স্বজাতীয় সম্পদ এবং সমগ্র ভারতের সংস্কৃতির দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে ইহা যে ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের একটি বিশেষ অঙ্গ আমার মনে এই ধারণা দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছে।" পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ নাথ, এম-এ, বিদ্যাবাচস্পতি, ভাগবতভূষণ মহাশয়ের এই উৎসাহবাণী গ্রন্থ প্রকাশে আমাদিগকে আরও উৎসাহিত করিয়াছে।

নাথ বা যোগিজাতির কৃষ্টি ও সংস্কৃতির ধারা, এই জাতির সামাজিক রীতিনীতির বৈশিষ্ট্য, ইহাদের সামাজিক স্বাতন্ত্র্য ও আকৃতি-প্রকৃতিগত বিশেষত্ব হিন্দুসমাজভুক্ত অন্যান্য জাতির নিকট রহস্যময় বলিয়া বোধ হয়। এই জাতির বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য কাহারও কাহারও মনে হিংসা-দ্বেষ-ঘৃণাভাবেরও উদ্রেক করিয়া থাকে। সুতরাং এই জাতির অতীত ইতিহাস আবিষ্কার করিবার আবশ্যকতা আছে। মৎস্যেন্দ্র নাথ, গোরক্ষ নাথ ও অন্যান্য নাথাচার্য্যগণের প্রবর্ত্তিত ও প্রচারিত সুমহান্ নাথধর্ম্মের উদারতা ও বিশালতা প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণকে বিস্ময়-বিমুগ্ধ করিয়াছে।

সুতরাং নাথধর্ম্ম ও নাথজাতি সম্বন্ধে গভীর গবেষণা করিয়া প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটন করিবার প্রচেষ্টা অধুনা পরিলক্ষিত হইতেছে। প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে একেবারে চরম্ কথা বলা সহজ নহে; সেইজন্য প্রত্নতত্ত্ববিশারদ পণ্ডিতগণও অনেক সময় 'হয়তো', 'বুঝি', 'বোধ হয়', 'অনুমান করি'—ইত্যাদি সংশয়সূচক শব্দ বা বাক্য ব্যবহার করিয়া থাকেন। প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ বা গ্রন্থ সাধারণতঃ অসম্পূর্ণতা, পক্ষপাতিতা, একদেশদর্শিতা, অপ্রাসঙ্গিকতা, অসংলগ্নতা, কালনিরূপণে অসঙ্গতি প্রভৃতি দোষে দুষ্ট হইয়া থাকে। সমালোচনার কষ্টিপাথরে ঐ সকল দোষত্রুটি ঘর্ষিত হইলে সত্যের সুবর্ণ জ্যোতির ক্রমশঃ বিকাশ হইবার সম্ভাবনা। তাহা ছাড়া প্রত্নতত্ত্বের গবেষণামূলক আলোচনা জ্ঞানপিপাসু ও তত্ত্বানুসন্ধিৎসু ব্যক্তির মনে নব প্রেরণার সঞ্চার করিয়া সত্যসন্ধানে তাঁহাকে প্রত্নতত্ত্বের গহন বনে প্রবেশ করিতে প্রোৎসাহিত করিয়া থাকে। "রাজগুরু যোগিবংশ" উল্লিখিত দোষমুক্ত না হইলেও উহার পাঠে ও আলোচনায় প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে একটা আন্দোলন ও আলোড়নের সৃষ্টি হইবে; তদ্দর্শনে যোগ্যতর ব্যক্তিগণ নাথধর্ম্ম ও নাথজাতি সম্বন্ধে গভীরতর গবেষণায় প্রবৃত্ত হইবেন। যোগিজাতির অতীত কাহিনীর দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া এই জাতির গৌরবময় ঐতিহ্য বুঝিবার, বুঝাইবার, জানিবার ও জানাইবার একটা বলবতী আকাঙ্ক্ষা যোগিজাতীয় শিক্ষিত যুবকমণ্ডলীর অন্তঃকরণে জাগরিত হইবে— প্রধানতঃ এই আশাতেই আমরা গ্রন্থ প্রকাশের এই দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। আলোচ্য

গ্রন্থখানিকে আমরা যোগিজাতির ধারাবাহিক প্রামাণিক ইতিহাস বলিবার স্পর্দ্ধা করি না, বা ইহাতে সমাবিষ্ট তথ্যাবলীর মধ্যে শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য বিধানে গ্রন্থকারের সূক্ষ্মবুদ্ধিতার, বিশ্লেষণ-শক্তির ও প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের সম্যক্ পরিচয় আছে বলিয়াও গর্ব্ব করি না; তথাপি আমরা আশা করি এবং বিশ্বাসও করি যে তাঁহার সংগৃহীত উপাদানসমূহ চিন্তাশীল গবেষককে প্রচুর চিন্তার খাদ্য যোগাইয়া দিবে।

যোগ্যতার্জ্জনে নিশ্চেষ্ট বা যোগ্যতাহীন ব্যক্তি শুধু কীর্ত্তিমান্ পূর্ব্বপুরুষগণের দোহাই দিয়া সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারেন না। গুণগ্রাহী বা গুণের পক্ষপাতী বিদ্বৎসমাজ তাঁহার এই অন্যায় দাবী স্বীকার করিবেন কেন? 'সংসারে সেই বড় হয় বড় গুণ যার'; 'ন জাতিঃ পূজ্যতে রাজন্ গুণাঃ কল্যাণকারকাঃ' ইহাই চিরপ্রসিদ্ধ ও সর্ব্বজনসম্মত আদর্শ। এই সুমহৎ আদর্শের অনুবর্ত্তী না হইয়া যিনি শুধু জাত্যভিমানের দাবীতে সমাজে মানমর্য্যাদার অন্বেষণ করেন তিনি উপহাসাস্পদই হইয়া থাকেন। জাতির গৌরবময় ঐতিহ্য এক শ্রেণীর লোকের মনে যেমন অসার আভিজাত্য বোধ ও আত্মম্ভরিতা জাগাইয়া দেয়, তেমনি আবার জাতির মহিমামণ্ডিত অতীত ইতিহাস আর এক শ্রেণীর লোককে মহিমময় পূর্ব্বপুরুষগণের যোগ্যতা ও মহত্ত্ব অর্জ্জনে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলে। এইরূপ ইতিহাস রচনার উপাদান-সম্বলিত গ্রন্থখানি প্রকাশ করিয়া আত্মবিস্মৃত যোগিজাতির অসাড় অন্তঃকরণে চেতনার সঞ্চার করাও আমাদের আর এক উদ্দেশ্য।

এক্ষণে "রাজগুরু যোগিবংশ" গ্রন্থের এই নামকরণ সম্বন্ধে একটি কথা বলিয়াই নিরস্ত হইব। মীন নাথ, গোরক্ষ নাথ প্রমুখ নাথ-ধর্ম্মাচার্য্যগণ জাতিভেদ মানিতেন না; তাঁহারা সর্ব্বত্র সমদর্শী ছিলেন; সর্ব্ব জীবের ও সর্ব্ব পদার্থের মধ্যে ভগবৎসত্ত্বার উপলব্ধি করিতেন। ভগবান পরমাত্মারূপে সর্ব্বভূতের অন্তঃকরণে অবস্থিত —ইহাই ছিল তাঁহাদের অনুবর্ত্তিত ও প্রচারিত ধর্ম্মের আদর্শ। তাঁহাদের এই অত্যুদার ধর্ম্মাদর্শে আকৃষ্ট হইয়া জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকলেই নাথগুরুগণের সুমহান্ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতেন। নাথগুরুগণের ত্যাগমূলক আদর্শে ও তাঁহাদের সার্ব্বভৌম ধর্ম্মমতে আকৃষ্ট হইয়া নেপাল, রাজপুতানা প্রভৃতি বহু রাজ্যের প্রবলপ্রতাপ নরপতিগণও তাঁহাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। এখনও অনেক যোগিরাজ ও যোগিমোহন্ত পুরুষানুক্রমে ভারতের বহু রাজবংশের গুরুপদে অধিষ্ঠিত আছেন। এই কারণেই গ্রন্থকার তদীয় গ্রন্থের নাম রক্ষা করিয়াছেন— "রাজগুরু যোগিবংশ"। প্রচারিত ধর্ম্মের মহত্ত্ব, উদারতা ও সার্ব্বভৌমতা বিবেচনায় নাথগুরুগণকে বিশ্বগুরু বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য— ডাঃ শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত, এম্-এ, পি-এচ-ডি, পরমভাগবত শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ, এম-এ, বিদ্যাবাচস্পতি, ভাগবতভূষণ মহাশয়দ্বয় এবং পরম বিদূষী ডাঃ শ্রীমতী কল্যাণী মল্লিক, এম-এ, পি-এচ-ডি মহোদয়া গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া আমাদিগকে বিশেষ উৎসাহ দান ও গ্রন্থের গৌরব

বৃদ্ধি করিয়াছেন। তজ্জন্য ইঁহাদের নিকট আমরা অশেষ কৃতজ্ঞতাঋণে আবদ্ধ। আমরা ইঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

তাহার পর 'সাধনা প্রেস লিমিটেডে'র ম্যানেজিং ডাইরেক্টর শ্রীমান দেবদাস নাথ, এম-এ, বি-এল গ্রন্থের প্রুফ্ সংশোধনে ও বিষয়বস্তু সন্নিবেশে অশেষ পরিশ্রম স্বীকার করিয়া আমাদের যে সহায়তা করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাকে আমরা আশীর্ব্বাদ জানাইতেছি। তাহার আনুকূল্য ও সহায়তা না পাইলে এই গ্রন্থ-প্রকাশে আমরা সমর্থ হইতাম কিনা সন্দেহ।

আমাদের অজ্ঞতা ও অযোগ্যতাবশতঃ গ্রন্থে অনেক দোষত্রুটি থাকা সম্ভব। গুণগ্রাহী পাঠক যেন আমাদের অনিচ্ছাকৃত দোষত্রুটি মার্জ্জনা করেন। এই গ্রন্থপাঠে পাঠকসমাজ সামান্য প্রেরণা পাইলেও আমাদের শ্রম সার্থক হইল বলিয়া মনে করিব।

দোল-পূর্ণিমা,
১৩৬১ সাল।
৮ই মার্চ্চ, ১৯৫৫।

বিনীত
শ্রীপ্রমথনাথ নাথ
শ্রীশরৎচন্দ্র নাথ

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

নবম অধ্যায়

দশম অধ্যায়

পুরাণের প্রধান রুদ্র মহান্‌কে যদি মহারুদ্র (মহান্ + রুদ্র = মহারুদ্র) ধরা যায় এবং তৎপত্নী কলাকে যদি সূর্য্যবতী ও তৎপুত্র যোগনাথকে যদি আগমসংহিতা-আদিনাথ ধরা হয়, তাহা হইলে চন্দ্রাদিত্য পরমাগমের বর্ণনার সহিত ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণের ও আগমসংহিতার বর্ণনার একটী সামঞ্জস্য করা যায়।

প্রাচীনতম পুরাণ ও স্মৃত্যাদি শাস্ত্রে যোগিজাতির কোন স্বতন্ত্র উৎপত্তি-বিবরণ না থাকাতে কেহ কেহ এই জাতিকে আধুনিক জাতি বলিয়া মনে করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যোগিজাতি আধুনিক জাতি নহে। প্রাচীনতম বেদাদি গ্রন্থে ব্রাহ্মণাদি মৌলিক চারি জাতি ব্যতীত যে সকল জাতির উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে এই জাতির উল্লেখ নাই। মৌলিক জাতিগুলির অনুলোম-বিলোম * সংমিশ্রণে যে সঙ্কল সঙ্কর জাতির উৎপত্তি পরবর্ত্তী পুরাণাদিতে বর্ণিত হইয়াছে, তন্মধ্যেও যোগিজাতির উল্লেখ নাই। মন্বাদি গ্রন্থে সঙ্করবর্ণ ব্যতীত যে সকল হীনতর বাহ্য সঙ্করবর্ণের উল্লেখ আছে, তন্মধ্যেও এই জাতি ধৃত হয় নাই। বাস্তবিক যোগিজাতি কোন সঙ্কর বা হীনতর বাহ্য জাতি নহে। এই কারণেই যোগিজাতির নাম এই সকল হীন জাতির মধ্যে গণিত হয় নাই। ব্রাহ্মণজাতি আর্য্যভাষী ভারতীয় জনগণের একটা শ্রেষ্ঠ বিভাগ। যোগিজাতি চিরকাল উক্ত ব্রাহ্মণজাতির আদর্শে স্থান পাইয়া আসিতেছেন। সেইজন্য প্রাচীনতম পুরাণ ও স্মৃত্যাদি শাস্ত্রে এই জাতির স্বতন্ত্র কোন উল্লেখ নাই। স্বতন্ত্র উল্লেখের আবশ্যকতাও ছিল না। যোগচর্চ্চা করিয়া ইহারা যোগী নামে খ্যাত হইয়াছেন।

"বহবো রুদ্রজাঃ সর্ব্বে যোগধর্ম্মপরায়ণাঃ।"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ)

* অনুলোম বিলোম } সংমিশ্রণ—উচ্চতর বর্ণের পুরুষের সহিত নিম্নতর বর্ণা নারীর এবং নিম্নবর্ণের পুরুষ ও উত্তমবর্ণের নারীর মিলনকে অনুলোম-বিলোম সংমিশ্রণ বলা হয়।

প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণজাতি ভিন্ন অন্য কোন জাতির কেহ যোগ সাধনা করিতে পারিতেন না। এই প্রথার অন্যথাচরণ করিয়া জনৈক অব্রাহ্মণ অনধিকার চর্চ্চা করিয়াছিলেন বলিয়া রামচন্দ্র তাঁহার শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন।

(রামায়ণ)

গোরক্ষবিজয়, গোপীচাঁদের সন্ন্যাস, ধর্ম্মপুরাণ প্রভৃতিতে নাথসিদ্ধাগণকে অযোনিজ বলা হইয়াছে।

হরগৌরী ও নাথ সিদ্ধাগণের বিবরণ নাথসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ্। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের 'গোরক্ষবিজয়' গ্রন্থে দেখা যায়, আদ্যের শরীর হইতে (কোন কোন পুঁথিতে 'আদ্য' স্থলে 'অনাদ্য' আছে) নাথ সিদ্ধাগণের জন্ম হয়; যথা—

বদনে জন্মিল শিব জোগিরূপ ধরি।
সিরেতে উত্তম জটা শ্রবণেতে কোড়ি ॥
নাভিতে জন্মিল মীন গুরু ধনন্তরি।
সাক্ষাতে সিদ্ধার ভেস অনন্ত মুরারি ॥
হাড়িফার জর্ম্ম হইল হাড় হোতে।
সর্ব্ব অঙ্গ সিদ্ধার ভেস দেখি এ সাক্ষাতে ॥
কর্ণ হোতে জন্মিল কানফা সিধাই। (১)
অতি খরতর হই জন্মিল তথাই ॥ (২)
জটা ভেদি নিকলিল জতি গোর্খনাথ।
সিদ্ধঝুলি সিদ্ধ কাথা তাহার গলাত ॥
সকল সরিরে হইল জগতের মাই।
পূর্ণসার চন্দ্র যেন অনুমানে পাই ॥ (৩)

(১) সিদ্ধাই। (২) "জন্মিল জোগাই"। (৩) "দ্বিতীয়ার চন্দ্র যেন অনুমানে পাই"। ২ নং টীকাটি গোরক্ষবিজয়ের তৃতীয় পাণ্ডুলিপি এবং

জন্মিলেক এক কৈন্যা পরম সোন্দরি।
নতুন যৌবন কন্যা নাম থুইল গৌরি ॥
এ সকল জন্মিয়া বসিল ঠাই ঠাই।
সাক্ষাতে বসিয়া আছে জগতের মাই ॥

'গোরক্ষবিজয়' ৬।৭ পৃঃ

উপরোক্ত বৃত্তান্ত হইতে আমরা হরগৌরী, মীননাথ, গোরক্ষনাথ হাড়িপানাথ, কানুপানাথের জন্মবিবরণ পাইতেছি। এখানে শিবকে আস্থের বদন, মীননাথকে নাভি, হাড়িপাকে হাড়, কানুপাকে কণ্ঠ এবং গোরক্ষনাথকে জটারূপে কল্পনা করা হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। ধর্ম্মপুরাণের সৃষ্টি কাহিনীতেও দেখা যায় নিরঞ্জনের নাভি হইতে মীননাথ, ললাট হইতে গোরক্ষনাথ, হাড় হইতে হাড়িপাজালন্ধরি, কর্ণ হইতে কানুপা এবং চরণ হইতে চৌরঙ্গীনাথের জন্ম হইয়াছে। এখানেও বিভিন্ন সিদ্ধাকে নিরঞ্জনের দেহের বিভিন্ন অংশরূপে যে কল্পনা করা হইয়াছে তাহা ধরিয়া লওয়া কষ্টকর হইবে না।

ঢাকা সাহিত্য পরিষদের "গোপীচাঁদের সন্ন্যাসে" আছে :—

"গোর্খখ্য (৪) নাথ জন্মিল শিবমুণ্ডে।
কাণে কানেফা (৫) হৈল হাড়ে হাড়িফা জন্মিল
মিন্নাথ (৬) জন্মিল নাভিকুণ্ডে।
একাছিল পঞ্চানন্দ শির্দ্ধা হৈল চারিজন
তবে চৈতন্য পাইল শঙ্কর।

৩ নং টীকাটি ২য় পাণ্ডুলিপি হইতে গৃহীত। অন্যান্যগুলি ১ম পাণ্ডুলিপির তিনখানি পুঁথির সাহায্যে উক্ত "গোরক্ষবিজয়" সম্পাদিত হইয়াছে।
(৪) গোরক্ষনাথ। (৫) কানুপা। (৬) মীননাথ।

অনাষ্ঠ সাগরের কুলে শিব নিজ নাম বোলে
গ্যান শাধি (৭) অমর হইল। (৮)
এইরূপে শির্দ্ধাগণ জন্ম নৈল চারিজন
শির্দ্ধার প্রধান মহেশ্বর।"

(গোপীচাঁদের সন্ন্যাস—৬পৃঃ)

এখানে গোরক্ষনাথকে শিবের মস্তক, কানুপাকে কর্ণ, হাড়িফাকে হাড় এবং মীননাথকে নাভিরূপে কল্পনা করা হইয়াছে।

যাহা হউক উপরোক্ত বিবরণ এবং নাথ-সাহিত্যের অন্যান্য বিবরণ দ্বারা নিঃসন্দেহে সিদ্ধান্ত করা যায় যে মীন (মৎস্যেন্দ্র) নাথ, গোরক্ষনাথ, হাড়িপা, কানুপা ও চৌরঙ্গী নাথ সমসাময়িক ছিলেন।

তারপর নিরঞ্জনের আজ্ঞায় হরগৌরীকে সহধর্ম্মিণীরূপে পাইলেন। তৎপরে সকলে আসিয়া পৃথিবীতে বাস করিতে লাগিলেন।

(বিবরণ ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য)

(ক) ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের বিবরণ

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের ব্রহ্মখণ্ডের নবম অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, ব্রহ্মা বিশ্ব-সৃষ্টিমানসে স্বীয় পত্নী সাবিত্রীতে বীর্য্যাধান করেন। সাবিত্রী দিব্য শতবর্ষ গর্ভ ধারণ করিয়া চতুর্বেদ, বিবিধশাস্ত্র, ব্যাকরণ, রাগ, রাগিণী, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, বর্ষ, মাস, তিথি, দণ্ড, ক্ষণ, দিন, রাত্রি, সন্ধ্যা, বার, পুষ্টি, দেবসেনা, মেধা, জয়া, বিজয়া, ষট্‌কৃত্তিকা, যোগ, করণ, ব্রাহ্ম, পাদ্ম ও বরাহ নামক কল্পত্রয়, চতুর্ব্বিধ প্রলয়, কাল, মৃত্যুকন্যা, সর্ব্ববিধ ব্যাধি প্রসব করিয়া স্তন্য দান করেন। অতঃপর বিধাতার পৃষ্ঠদেশ হইতে ধর্ম্ম জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বামপার্শ্ব হইতে তৎকামিনী অলক্ষ্মী জন্মগ্রহণ

(৭) জ্ঞান সাধনা করিয়া। (৮) 'হইল অমর'—পড়িতে হইবে।

করেন। শিল্পীশ্রেষ্ঠ ও মহাবল-পরাক্রান্ত অষ্টবসু তাঁহার নাভিদেশ হইতে জন্মগ্রহণ করেন। তৎপর বিধাতার মানস হইতে ব্রহ্মতেজোময় পঞ্চবর্ষীয় শিশুতুল্য জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার নামে চারিটি পুত্র আবির্ভূত হন। তৎপর তাঁহার মুখ হইতে রূপবতী স্ত্রী শতরূপা সহ ক্ষত্রিয়গণের বীজতুল্য দিব্যরূপধারী কণকপ্রভ শ্রীমান্ সায়ম্ভুব মনু আবির্ভূত হইয়া বিধাতার আজ্ঞা পরিপালনার্থ তাঁহার সম্মুখে সস্ত্রীক দণ্ডায়মান হইলেন। বিধাতা হর্ষান্বিত হইয়া পুত্রগণকে সৃষ্টিবিস্তার কার্য্য করিতে বলিলে মনু ভিন্ন অপর সকলে তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া কৃষ্ণপরায়ণ হইয়া তপস্যার্থ বনে প্রস্থান করিলেন। তাহাতে বিধাতা ক্রুদ্ধ হইলেন। কোপান্বিত বিধাতার ব্রহ্মতেজে প্রজ্জ্বলিত ললাটদেশ হইতে একাদশ রুদ্রের উৎপত্তি হইল। তাঁহাদের একজনের নাম কামাগ্নি রুদ্র। তিনি নিখিল বিশ্বের সংহারকারক ও তমোগুণান্বিত বলিয়া কথিত। ব্রহ্মা রজোগুণান্বিত এবং শিব ও বিষ্ণু সাত্ত্বিক গুণান্বিত। গোলকপতি শ্রীকৃষ্ণ নির্গুণ ও প্রকৃতিপর বটেন। যাঁহারা অত্যন্ত অজ্ঞ, তাঁহারা শুদ্ধ সত্ত্ব-স্বরূপ নির্ম্মল বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ মহাদেবকে তমোগুণান্বিত বলিয়া কহিয়া থাকেন। একাদশ রুদ্রের অপর দশ জনের নাম—বেদেও যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা এই :— মহান্, মহাত্মা, মতিমান্, ভীষণ, ভয়ঙ্কর, ঋতুধ্বজ, ঊর্দ্ধকেশ, পিঙ্গলাক্ষ, রুচি ও শুচি :—

চুকোপ হেতুনা তেন বিধাতা জগতাং পতিঃ।
কোপাসক্তস্য চ বিধের্জ্জলতো ব্রহ্মতেজসা॥ ১৮
আবির্ভূতা ললাটাচ্চ রুদ্রা একাদশ প্রভোঃ।
কালাগ্নিরুদ্রঃ সংহর্ত্তা তেষামেকঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ১৯
সর্ব্বেষামেব বিশ্বানাম্ স এব তামসঃ স্মৃতঃ।
রাজনশ্চ স্বয়ং ব্রহ্মা শিববিষ্ণুশ্চ সাত্ত্বিকৌ॥ ২০

গোলোকনাথঃ কৃষ্ণশ্চ নির্গুণঃ প্রকৃতে পরঃ।
পরমাজ্ঞানিনো মূর্খা বদন্তি তামসং শিবম্॥ ২১
শুদ্ধসত্ত্ব স্বরূপঞ্চ নির্ম্মলং বৈষ্ণবাগ্রণীম্।
শৃণু নামানি রুদ্রানাম্ বেদোক্তানি চ যানি চ॥ ২২
মহান্ মহাত্মা মতিমান্ ভীষণশ্চ ভয়ঙ্করঃ।
ঋতুধ্বজশ্চোর্দ্ধকেশঃ পিঙ্গলাক্ষঃ রুচিঃ শুচিঃ॥ ২৩
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, ব্রহ্মখণ্ডম্, ৮ম অঃ)

তৎপর ব্রহ্মার দক্ষিণ কর্ণ ইহতে পুলস্ত্য, বাম কর্ণ হইতে পুলহ, দক্ষিণ নেত্র হইতে অত্রি, বাম নেত্র হইতে ক্রতু, নাসিকারন্ধ্র হইতে অরুণী, মুখ হইতে অঙ্গিরা ও রুচি, বাম পার্শ্ব হইতে ভৃগু, দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে দক্ষ, ছায়া হইতে কর্দ্দম, নাভি হইতে পঞ্চশিখ, বুক্ষ হইতে বঢ়ু, কণ্ঠদেশ হইতে নারদ, স্কন্ধদেশ হইতে মরীচি, গলা হইতে আপান্তরতম, রসনা হইতে বশিষ্ঠ, অধরোষ্ঠ হইতে প্রচেতাঃ, বাম কুক্ষি হইতে হংসী ও দক্ষিণ কুক্ষি হইতে যতি জন্মগ্রহণ করেন *। ব্রহ্মা এই সকল পুত্রকে সৃষ্টিকার্য্য করিতে বলিলে, নারদ নানা কথায় সংসারাশ্রমের হেয়তা প্রতিপাদন করিয়া তাহাতে অস্বীকৃত হন এবং তজ্জন্য ব্রহ্মা কুপিত হইয়া তাঁহাকে অভিশাপ প্রদান করেন।

অতঃপর ব্রহ্মা অপর পুত্রগণকে সৃষ্টিকার্য্যে অদেশ করেন। নারদ ছাড়া তাঁহারা সকলেই সৃষ্টিকার্য্য করিয়াছিলেন। মরীচির মানস হইতে প্রজাপতি কশ্যপের জন্ম হইল। অত্রির নেত্রমল হইতে ক্ষীরোদ সাগরে চন্দ্র জন্মিলেন।

* পুলস্ত্যো দক্ষকর্ণাচ্চ পুলহো বামকর্ণতঃ।
দক্ষনেত্রাত্তথাত্রিশ্চ বামনেত্রাৎ ক্রতুঃ স্বয়ং॥ ২৪
অরুণী নাসিকারন্ধ্রাদঙ্গিরাশ্চ মুখাদ্রুচিঃ।
ভৃগুশ্চ বামপার্শ্বাচ্চ দক্ষোদক্ষিণপার্শ্বতঃ॥ ২৫
ছায়ায়াঃ কর্দ্দমো জাতো নাভেঃ পঞ্চশিখস্তথা।
বক্ষসশ্চৈব বোঢ়ুশ্চ কণ্ঠদেশাচ্চ নারদঃ॥ ২৬

পুলস্ত্যের মানস হইতে মৈত্রাবরুণ উৎপন্ন হইলেন। মনু স্বীয় পত্নী শতরূপাতে আকুতি, দেবহূতি, প্রসূতি নামে তিন কন্যা এবং প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে দুই পুত্র উৎপাদন করেন। পরম ধার্ম্মিক ধ্রুব উত্তানপাদের তনয়। মনুকন্যা আকুতি রুচিকে, প্রসূতি দক্ষকে ও দেবহূতি কর্দ্দমকে সম্প্রদান করা হয়। দেবহূতি ও কর্দ্দমের পুত্র কপিল। প্রসূতি হইতে দক্ষবীজে ষাইটটি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। দক্ষ আটটি কন্যা ধর্ম্মকে, একাদশ কন্যা পূর্ব্বোক্ত একাদশ রুদ্রকে, সতীনাম্নী কন্যা শিবকে, ত্রয়োদশ কন্যা কশ্যপকে এবং সপ্তবিংশতি কন্যা চন্দ্রকে সম্প্রদান করেন। ধর্ম্মকে যে আট কন্যা সম্প্রদান করা হয়, তাহাদের নাম— শান্তি, পুষ্টি, ধৃতি, তুষ্টি, ক্ষমা, শ্রদ্ধা, মতি ও স্মৃতি। শান্তির পুত্র সন্তোষ, পুষ্টির পুত্র মহান, ধৃতির পুত্র ধৈর্য্য; তুষ্টির পুত্র হর্ষ ও দর্প, ক্ষমার পুত্র সহিষ্ণু, শ্রদ্ধার পুত্র ধার্ম্মিক, মতির পুত্র জ্ঞান ও স্মৃতির পুত্র জাতিস্মর। দক্ষের যে একাদশ কন্যা রুদ্রগণকে প্রদান করা হয়, তাঁহাদের শিবভক্ত বহু পুত্র জন্মিয়াছিল :—

"নামানি রুদ্রপত্নীনাং সাবধানং নিবোধ মে।
কলা কলাবতী কাষ্ঠা কালিকা কলহপ্রিয়া ॥ ১৩
কন্দলী ভীষণা রাস্না প্রাম্লচা ভূষণা শুক্লী।
এতাসাং বহবঃ পুত্রা বভূবুঃ শিবপার্ষদাঃ ॥" ১৪

(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, ব্রহ্মখণ্ড, ৯ম অধ্যায়)

এই বর্ণনা হইতে বুঝা গেল যে, মানব সৃষ্টির সময়ে রুদ্রগণ ব্রহ্মার ললাট হইতে উৎপন্ন হন এবং তাঁহারা দক্ষ প্রজাপতির এগারটি কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। পরপৃষ্ঠায় কুলজী হইতে বিষয়টি আরও স্পষ্টভাবে বুঝা যাইবে :—

মরীচিঃ স্কন্ধদেশাচ্চৈবাপাস্তরতমো গলাৎ।
বশিষ্ঠো রসনাদেশাৎ প্রচেতা অধরোষ্ঠতঃ ॥ ২৭
হংসী চ বামকুক্ষেশ্চ দক্ষকুক্ষের্যতিঃ স্বয়ম্।
সৃষ্টিং বিধাতুম্ স বিধিশ্চকারাজ্ঞাং সুতান্ প্রতি।
পিতুর্ব্বাক্যং সমাকর্ণ্য তমুবাচ স নারদঃ ॥ ২৮

একাদশ রুদ্রের কুলজী

বিরাট পুরুষ

ওঁ ব্রহ্মাসাবিত্রী — ওঁ শিবদুর্গা — ওঁ বিষ্ণুলক্ষ্মী

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
মহান্	মহাত্মা	মতিমান্	ভীষণ	ভয়ঙ্কর	ঋতু	উর্দ্ধকেশ	পিঙ্গলাক্ষ	রুচি	শুচি	কালাগ্নি
কলা	কলাবতী	কাষ্ঠা	কালিকা	কলহপ্রিয়া	কন্দলী	ভীষণা	রাম্না	প্রমাদা	ভূষণা	শুক্লী

(হিন্দু সমাজ—বৈশাখ, ১৩৩০ বাং)

এই রুদ্র ও রুদ্রপত্নীগণ হইতে বহু শিবভক্ত পুত্র উৎপন্ন হয়। এই রুদ্রগণ হইতেই যোগিজাতির উৎপত্তি চিরপ্রসিদ্ধ। "বল্লালচরিত" গ্রন্থে এ সম্বন্ধে বিশদ বর্ণনা আছে।

(খ) বল্লালচরিতের বিবরণ (১)

গোপালভট্টলিখিত ও শশিভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় কর্ত্তৃক অনূদিত "বল্লালচরিত" নামক গ্রন্থে সর্ব্বজাতির উৎপত্তি-বিবরণ মধ্যে যোগিজাতির উৎপত্তি ও বিস্তৃতি সম্বন্ধে নিম্নরূপ লিখিত আছে :—

অথ সর্ব্বজাতিনামুৎপত্তির্লিখ্যতে।
ব্রাহ্মণো মুখদেশাচ্চ বাহুদেশাচ্চ ক্ষত্রিয়াঃ।
উরুদেশাত্তু বৈশ্যাশ্চ পাদাচ্ছূদ্রাস্তু ব্রহ্মণঃ।
পুলস্ত্যো দক্ষকর্ণাচ্চ পুলহো বামকর্ণতঃ।
দক্ষনেত্রাত্তথাত্রিশ্চ বামনেত্রাৎ ক্রতুঃ স্বয়ম।

* * * *

রুদ্রা একাদশ চৈব ললাটাৎ ক্রোধ সম্ভবাঃ।
বহবো রুদ্রজাঃ সর্ব্বে যোগধর্ম্ম পরায়ণাঃ। ৩৯।৪৪

* * * *

মনোশ্চ শতরূপায়াং তিস্রঃ কন্যাঃ প্রজজ্ঞিরে
আকূতির্দেবহূতিশ্চ প্রসূতিস্তাঃ পতিব্রতাঃ॥ ৪৭

* * * *

আকূতিং রুচয়ে প্রদাদ্দক্ষায় চ প্রসূতিকাম্।
দেবহূতিং কর্দ্দমায় যৎ পুত্রঃ কপিলঃ স্বয়ম্॥ ৪৯

---

(১) মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন—"আনন্দ ভট্টের বল্লালচরিত বল্লালের রাজত্ব সময়ের প্রধান প্রধান ঘটনা সমূহের ঐতিহাসিক বিবরণগ্রন্থ।"

অধ্যাপক ডাঃ বেণীমাধব বড়ুয়া বলেন—"বল্লালচরিত হইতে যে সকল আভাষ পাওয়া যায়, তাহাতে অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই যে, খৃষ্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে নাথপন্থী যোগী সন্ন্যাসীগণ রুদ্রজ ব্রাহ্মণরূপে গৌড়, বঙ্গ ও ত্রিকলিঙ্গের সর্ব্বত্র সমাদৃত হইতেন। তাঁহাদিগের দ্বারা পূজাকার্য্য সম্পাদন করাইতে পারিলে সকলে চরিতার্থ বোধ করিতেন। বৌদ্ধ, রামাৎধর্ম্ম প্রভৃতি

দক্ষস্য ষষ্টিকন্যাশ্চ প্রসূত্যাস্তু প্রজজ্ঞিরে ।
অষ্টৌ ধর্ম্মায় প্রদদৌ রুদ্রায়ৈকাদশ ততঃ ।। ৫০
শিবায়ৈকাং সতীনাম্নীং কশ্যপায় ত্রয়োদশঃ ।
সপ্তবিংশতি কন্যাশ্চ দক্ষশ্চন্দ্রায় দত্তবান্ ।। ৫১
শৃণু নামানি রুদ্রাণাম্ তেষাং স্ত্রীণাং যথাক্রমম্ ।
মহান্ মহাত্মা মতিমান্ ভীষণশ্চ ভয়ঙ্করঃ ।।
ঋতুধ্বজ ঊর্দ্ধকেশঃ পিঙ্গলাক্ষো রুচিঃ শুচিঃ ।
কালাগ্নিশ্চেতি পত্নীনাস্তেষাং নাম হি লিখ্যতে ।। ৫২।৫৩
সূর্য্যবতী প্রমোচাচ ভূষণাকলহপ্রিয়া ।
কন্দলী ভীষণা রাম্না কাষ্ঠাকালী কলাশুকী ।। ৫৪

* * * *

রুদ্রজা যোগিনঃ সর্ব্বে তেষাং ভেদো হি লিখ্যতে ।
কন্‌ফট অওঘড় মচ্ছেন্দ্রা শারঙ্গীহার কানিপাঃ ।।
ডুরীহারা ঘোর পন্থী সংযোগী চ ভর্ত্তৃহরিঃ ।
যোগিনাম্ সম্প্রদায়াহি চরন্তি ভারতে তথা ।। ৫৬।৫৭
রুদ্রাণাং বহবঃ পুত্রাঃ শিব গোত্রাশ্চ পার্ষদাঃ ।
বিস্তরেণ পুরাণে তু বর্ণিতাস্তে যথাক্রমম্ ।।
মহারুদ্রাৎ সূর্য্যবত্যাম্ বিন্দুনাথো বভূব হ ।
তয়োস্তৎ যোগনাথাচ্চ নাথ বংশ সুবিস্তৃতঃ ।।
মীনগোরক্ষাদি সিদ্ধাঃ সর্ব্বত্র সর্ব্ববিশ্রুতাঃ
নাথজনাঞ্চ সর্ব্বেষাং নাথাস্তং নাম-কীর্ত্তিতম্ ।। ৬০

সকল সম্প্রদায়ের লোকেরা মৎস্যেন্দ্রনাথ প্রমুখ নাথ নামধেয় সিদ্ধ যোগি-প্রবরগণের আদর্শ অবনত মস্তকে স্বীকার করিয়াছিলেন ।”

(বঙ্গীয় যোগিসমাজের মর্ম্মস্থল, প্রাণস্পন্দন ও গতিবিধি)

শ্রীআদিনাথ-মৎস্যেন্দ্র সারদানন্দ ভৈরবাঃ।
চৌরঙ্গী মীন গোরক্ষ বিরূপাক্ষ বিলেশয়াঃ।
মন্থানভৈরবো যোগী সিদ্ধবোধশ্চ কন্থড়ী॥
কোরণ্ডকঃ সুরানন্দঃ সিদ্ধপাদশ্চ চর্পটী।
কণেরিঃ পূজ্যপাদশ্চ নিত্যনাথো নিরঞ্জনঃ॥
কাপালী বিন্দুনাথশ্চ কাকচণ্ডীশ্বরো ময়ঃ। (১)
অক্ষয়ঃ প্রভুদেবশ্চ ঘোড়াচুলী চ টিণ্টিনী।
ভল্লাটির্ণাগবোধশ্চ খণ্ডঃ কাপালিকস্তথা। (২)
ইত্যাদয়ো মহাসিদ্ধা হঠযোগ প্রভাবতঃ।
খণ্ডয়িত্বা কালদণ্ডং ব্রহ্মাণ্ডে বিচরন্তি তে॥ ৬১-৬৫

* * * *

ব্রাহ্মণীষু চ জাতানামশৌচং ব্রহ্মবৎ স্মৃতম্।
যোগিনাঞ্চ গৃহস্থানামশৌচং দশরাত্রকম্॥ ১৩৯

বঙ্গানুবাদ :— অনন্তর সকল জাতির উৎপত্তিবিবরণ লিখা যাইতেছে। ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য, চরণ হইতে শূদ্র, দক্ষিণ কর্ণ হইতে পুলস্ত্য, বাম কর্ণ হইতে পুলহ, দক্ষিণ চক্ষু হইতে অত্রি, বাম চক্ষু হইতে স্বয়ং ক্রতু * * * এবং ক্রোধহেতু ললাট হইতে একাদশ রুদ্র উৎপন্ন হইয়াছেন। এই রুদ্রদিগের বহু পুত্র জন্মে, তাঁহারা সকলেই যোগধর্ম্মে নিরত হন। ৪৪ * * * শতরূপার গর্ভে মনুর তিন কন্যা জন্মিয়াছিলেন—আকূতি, দেবহূতি ও প্রসূতি। তাঁহারা সকলেই পতিপরায়ণা ছিলেন। * * * মনু রুচিকে আকূতি, দক্ষকে প্রসূতি এবং কর্দ্দমকে দেবহূতি নাম্নী দুহিতা প্রদান করিয়াছিলেন। * * *

---

(১) কাকচণ্ডীশ্বরাহ্বয় ইতি পাঠান্তরম্।
(২) হঠপ্রদীপিকা—১ম উপদেশে এই শ্লোক আছে।

প্রসূতির গর্ভে দক্ষের ৬০ কন্যা জন্মে; তন্মধ্যে ধর্ম্মকে আটটি কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন; পরে রুদ্রদিগকে ১১টি; শিবকে সতী নামে একটি, কশ্যপকে ১৩টি এবং চন্দ্রকে ২৭টি কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন। রুদ্রগণের নাম—মহান্, মহাত্মা, মতিমান্, ভীষণ, ঋতুধ্বজ, ঊর্দ্ধকেশ, পিঙ্গলাক্ষ, রুচি, শুচি ও কালাগ্নি। তাঁহাদের পত্নীগণের নাম—স্বর্ষবতী (ক), প্রমোচা, ভূষণা, কলহপ্রিয়া, কন্দলী, ভীষণা, রাম্না, কাষ্ঠা, কালী (খ) ও শুকী * * * যোগিগণ সকলেই রুদ্র হইতে জন্মিয়াছেন। তাহাদের শ্রেণীবিভাগ লিখিত হইতেছে—কনফট্, অওঘড়, মচ্ছেন্দ্র, শারঙ্গীহার, কাণিপা, ডুরীহার, অঘোরপন্থী, সংযোগী (৩) ও ভর্ত্তৃহরি। যোগিজাতির এই সকল সম্প্রদায় ভারতবর্ষে বর্ত্তমান আছেন। রুদ্রদিগের অনেকগুলি পুত্র ও অনুচর ছিলেন। তাঁহারা সকলেই

(ক) ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে ইহার নাম কলাবতি লিখিত হইয়াছে।

(খ) ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে ইহার নাম কালিকা লিখিত হইয়াছে।

(৩) ইহাদিগকে আশ্রমী যোগী কহে। নেপাল, দেরাদুন, বহর, উড়িষ্যা ও বঙ্গদেশে ইহারা অধিকাংশ বাস করিয়া থাকেন। বঙ্গদেশ ব্যতীত উক্ত কয়েক স্থানের যোগীরা পূর্ব্বপুরুষানুক্রমে যজ্ঞসূত্র, যোগপট্ট ও রুদ্রাক্ষমালা ধারণ, গৈরিকবস্ত্র পরিধান ও ললাটে রক্তচন্দন লেপন করিয়া থাকেন এবং গুরুর ন্যায় সর্ব্বস্থানে পূজনীয় হইয়া আসিতেছেন। কেবল বঙ্গদেশের যোগীরা বল্লালের অন্যায় শাসনে অগত্যা যজ্ঞসূত্রাদি ত্যাগ করিয়া অনেক স্থলে শূদ্রভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন (পুনরায় ইহারা ক্রমশঃ যজ্ঞসূত্রাদি গ্রহণ করিতেছেন * * *); কিন্তু এরূপ অবস্থাতেও তাঁহারা পূর্ব্বপুরুষানুক্রমে ব্রাহ্মণবৎ দশাশৌচ পালন, অন্নপ্রাশন-বিবাহ প্রভৃতি সংস্কার অনুসরণ, পিতৃমাতৃ-শ্রাদ্ধে অন্নের পিণ্ডদান, সামবেদোক্ত কার্য্যানুষ্ঠান, স্বয়ং চণ্ডীপাঠ, শিবপূজা এবং শালগ্রাম-শিলা স্পর্শ পূর্ব্বক তাঁহার পূজা ও দেবদেবীকে অন্নের ভোগাদি প্রদান করিয়া আসিতেছেন। এক্ষণে ইহারা সরকারি চাকুরি, চিকিৎসা ও ব্যবসায় বাণিজ্যাদি করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিয়া থাকেন।

শিবগোত্রীয় (৪)। তাঁহাদের বিষয় পুরাণে যথাক্রমে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে মহান্ রুদ্রের ঔরসে সূর্য্যবতীর গর্ভে বিন্দুনাথ (৫) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের (মহান্ ও সূর্য্যবতীর) এবং সেই যোগনাথ (বিন্দুনাথ) হইতে নাথবংশ বিস্তারিত হইয়া পড়িয়াছে। মীননাথ এবং গোরক্ষনাথ প্রভৃতি যোগসিদ্ধ পুরুষেরা সর্ব্বত্র সকলের পরিচিত। নাথবংশীয় সকল পুরুষেরই নামে শেষে "নাথ" শব্দ দিয়া তাহাদিগের নাম বলা হয়। (যোগী) আদিনাথ (৬) মৎস্যেন্দ্রনাথ (৭), সারদানন্দ নাথ, ভৈরব (৮), চৌরঙ্গী (৯), মীননাথ, গোরক্ষ

(৪) যোগিমাত্রেরই 'শিব'-গোত্র অথবা 'অনাদি'-গোত্র এবং যোগিনী অর্থাৎ যোগীদিগের স্ত্রীমাত্রেরই 'কাশ্যপ' গোত্র। শিব অথবা অনাদিগোত্রের প্রবর পাঁচটি—শিব, শম্ভু, সরোজ, ভূধর, আপ্লুবৎ এবং কাশ্যপ গোত্রের প্রবর তিনটি—কাশ্যপ, অপসারু, নৈধ্রুব।

(৫) ইঁহার দেহত্যাগ করিবার পর তাঁহার পুত্র আগ্নিনাথ (মতান্তরে আদিনাথ) পিতামহ ও মাতামহকে দেহসংস্কারের বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে মহা যোগী মহারুদ্র বলিলেন, যোগিদেহের সমাজ দিতে হইবে; কিন্তু মহামুনি কশ্যপ বলিলেন, তাহা নহে; বিন্দুনাথ সংসার আশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন, অতএব তাঁহার দেহ অগ্নিসংস্কারে সংস্কৃত হইবে। তখন আগ্নিনাথ মাতা কৃষ্ণার অনুমতি লইয়া দেবর্ষি নারদকে আনাইয়া এই সমস্ত বিবরণ তাঁহাকে জ্ঞাপন করিলেন তাহাতে তিনি মহারুদ্র ও কশ্যপ উভয়ের মান রাখিবার জন্য এই ব্যবস্থা করিলেন যে, মৃতদেহ প্রথমতঃ মন্ত্রপূত করিয়া মুখাগ্নি করিবে এবং তাহার পর সমাজ দিবে। তদবধি নারদ গোস্বামীর ব্যবস্থাই যোগীদের মধ্যে চলিয়া আসিতেছে। পূর্ব্বে গঙ্গার গর্ভে, তদভাবে শ্মশানে বা শিবালয়ের মধ্যে সমাজ দেওয়া হইত; কিন্তু ইংরাজ রাজত্বে গঙ্গার গর্ভে সমাজ দেওয়া রহিত হওয়ায় অধিকাংশ স্থলেই কশ্যপ মুনির ব্যবস্থাই চলিতেছে অর্থাৎ মন্ত্রপূত করিয়া মুখাগ্নির পর মৃতদেহ ভস্ম করা হয়।

(৬) আদিনাথ স্বয়ং মহাদেব। ইঁহা হইতে নাথ বংশ উৎপন্ন হইয়াছে। বিন্দুনাথের এক পুত্রের নামও আদিনাথ (মতান্তরে আগ্নিনাথ)।

(৭) মৎস্যেন্দ্র নাথ আদিনাথের শিষ্য। ইনি পূর্ব্বে মৎস্যরূপী ছিলেন

নাথ (১০) বিরূপাক্ষ, বিলেশয়, মন্থান ভৈরব, সিদ্ধবোধ (১১), কন্থড়ী, কোরণ্টক, সুরানন্দ, সিদ্ধপাদ, চর্পটী, কণেরি (১২) পূজ্যপাদ, নিত্যনাথ, নিরঞ্জন, কাপালী (১৩), বিন্দুনাথ, কাকচণ্ডীশ্বর, ময় (১৪) অক্ষয় (১৫), প্রভুদেব, ঘোড়াচুলী (১৬), টিণ্টিনী, ভল্লটি, (১৭), নাগবোধ (১৮), খণ্ড, কাপালিক—এই সকল ব্যক্তি হঠযোগ (১৯) বলে বিখ্যাত সিদ্ধপুরুষ হইয়া যমদণ্ড খণ্ডনপূর্ব্বক ব্রহ্মাণ্ডে বিচরণ করিয়া থাকেন। * * * যে সকল জাতি ব্রাহ্মণীর গর্ভজাত, তাহাদিগের ব্রাহ্মণের

আদিনাথ কর্ত্তৃক পার্ব্বতীর নিকট বর্ণিত যোগোপদেশ শুনিয়া ইনি স্থিরভাবে থাকাতে আদিনাথ তাঁহাকে জল দ্বারা প্রোক্ষিত করেন। তাহাতেই তিনি দিব্যকায় লাভ করেন এবং সিদ্ধ হন।

(৮) গ্রন্থান্তরে শাবর ও আনন্দভৈরব এইরূপ পাঠভেদ ও পদচ্ছেদ দেখা যায়।

(৯) চৌরঙ্গী প্রথমে হস্তপাদহীন ছিলেন; পরে মৎস্যেন্দ্রনাথের কৃপায় হস্ত ও পদ প্রাপ্ত ও সিদ্ধ হন।

(১০) গুরু গোরক্ষনাথ আদিনাথের পৌত্র এবং মৎস্যেন্দ্রনাথের পুত্র বলিয়া খ্যাত। কিন্তু বস্তুতঃ শিষ্য বলিয়াই বোধ হয়। ইনি হঠযোগ বিষয়ে চারিটি উপদেশ দিয়া গিয়াছেন।

(১১) মতান্তরে সিদ্ধি ও বুদ্ধ নামে দুইজন সিদ্ধপুরুষ।

(১২) মতান্তরে কাণেরী।

(১৩) মতান্তরে কপালী।

(১৪) কেহ কেহ ময় নামক কোন সিদ্ধপুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না।

(১৫) মতান্তরে অল্লাস।

(১৬) মতান্তরে ঘোড়াচোলী।

(১৭) মতান্তরে ভালুকী।

(১৮) মতান্তরে নারদেব।

(১৯) প্রাণায়াম প্রভৃতি ক্রিয়ার অভ্যাস দ্বারা চিত্তবৃত্তি নিরোধপূর্ব্বক পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করাকে হঠযোগ বলে। হঠপ্রদীপিকা প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার প্রক্রিয়া সকল লিখিত আছে।

রক্তবস্ত্র পরিধানং যোগচিন্তা ভবেৎ ধ্রুবম্।
নাথস্তেষাং গুরুপ্রোক্ত শ্চিন্তয়েৎ পরমং গুরুম্।
পরাপর গুরুস্তং হি পরমেষ্ঠি গুরুস্তথা।
রক্তবস্ত্রং সমালোক্য ন তত্ত্বং কুরুতে যদি।
নিশ্চিতং পাতকে ঘোরে চ্যুতো ভবতি দুর্মতিঃ।

* * * *

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি ততোধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাৎ যোগী পরেশ্বরঃ

* * * *

নাম য়োগী পঞ্চ বিপ্রা যোগ যোগী সহস্রশঃ।
বিন্দুনাথো মম কায়ঃ তস্মাৎ যোগী নিরঞ্জনঃ।

* * * *

অনাদি নিধনঃ কালো যোঽষ্ট যোগয়তশ্চ হ।
পূর্ব্বস্মাৎ স্থূল সূক্ষ্মশ্চ এতন্নাম যোগী ভবেৎ।

* * * *

অনাদি গোত্র যোগী চ উৎপত্তী রুদ্র কুলকে।
তত্রৈব শিবগোত্রস্ত কাশ্যপ গোত্রে বিবাহিতং।

* * * *

ইত্যেবং হি প্রকারেণ নাথবংশে নরোত্তমঃ।
সিদ্ধরুদ্রো মহাযোগী প্রাভবন্ যতি জাপকাঃ।

* * * *

জন্তূনাং মানবঃ শ্রেষ্ঠ স্তচ্ছ্রেষ্ঠো হি দ্বিজোত্তমঃ।
দ্বিজশ্রেষ্ঠো ব্রহ্মচারী তস্মাচ্ছ্রেষ্ঠো দণ্ডী ভবেৎ।

তচ্ছে্ষ্ঠঃ পরমহংস স্তচ্ছে্ষ্ঠোহি সন্ন্যাসিকঃ।
তচ্ছে্ষ্ঠো যোগ যোগী চ তত্ত্বত্বং কথয়ামি তে।

* * *

যোগং করোতি যোগী যঃ তপস্যাং সন্ন্যাসী তথা।
অষ্ট প্রকারা যোগাঃ চ সংসারে সাধনোত্তমাঃ।

* * * *

"যোগিদেহং ভস্মং কৃত্বা স যোগী নরকং ব্রজেৎ।"

দেবী কহিলেন,—যোগীদের মাতা, পিতা কে, কোথায় কিরূপে তাহাদের জন্ম আমাকে বলুন।

মহাদেব তদুত্তরে বলিলেন,—ঈশ্বর হইতে যোগ ধর্ম্মপরায়ণ একাদশ জন রুদ্রের জন্ম হয়। তাহার প্রথম রুদ্রের নাম মহান্, তাঁহার পুত্র বিন্দুনাথ। বিন্দুনাথের পুত্র আইনাথ বা আদিনাথ। ইনি রুদ্রকুলের প্রকাশক। এই বংশে গোরক্ষনাথ, মীননাথ, ছায়ানাথ, সত্যনাথ প্রভৃতি সিদ্ধ মহাপুরুষগণের জন্ম হয়। কশ্যপ মুনির কন্যা কৃষ্ণাকে বিন্দুনাথ বিবাহ করেন। যোগিগণ ত্রিদণ্ডী ও যোগপট্ট ধারণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা গায়ে ভস্ম মাখেন, ললাটে অর্দ্ধচন্দ্র ধারণ করেন, রক্তবস্ত্র পরিধান করেন এবং যোগচিন্তা-রত থাকেন। নাথ তাঁহাদের গুরু। নাথগুরুর উপদেশে তাঁহারা পরম গুরুর চিন্তা করিয়া থাকেন। তাঁহারা পরাপর গুরু ও পরমেষ্টি গুরু।*

যোগীদের রক্তবস্ত্র দেখিয়া যদি কেহ তাঁহাদের তত্ত্ব না লয় অর্থাৎ আদর অভ্যর্থনা না করে, তবে তাহার ঘোর পাতক হয়। * * * যোগী তপস্বী হইতে শ্রেষ্ঠ; জ্ঞানী হইতে শ্রেষ্ঠ; কর্ম্মী হইতেও শ্রেষ্ঠ; সুতরাং 'যোগী' পরমেশ্বরতুল্য।

* * * * * *

যিনি কেবলমাত্র 'যোগী' অর্থাৎ যিনি 'জন্মহিসাবে' যোগিকুলে জন্মগ্রহণ

করিয়াছেন, কিন্তু যোগিকুলের কোন কাজ করেন নাই, তিনি পাঁচজন বিপ্রের সমান ; আর যিনি যোগসাধন করেন, সেই যোগযুক্ত যোগী সহস্র বিপ্রের সমান। বিন্দুনাথ আমার কায়তুল্য ; সুতরাং তিনি যোগী ও নিরঞ্জনতুল্য।

* * * . . * * *

প্রাণিগণের মধ্যে মানব শ্রেষ্ঠ। মানবের মধ্যে দ্বিজগণ শ্রেষ্ঠ ; দ্বিজ হইতে ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী হইতে দণ্ডী, দণ্ডী হইতে পরমহংস, পরমহংস হইতে সন্ন্যাসী, এবং সন্ন্যাসী হইতে যোগপরায়ণ যোগীই শ্রেষ্ঠ—এই তত্ত্ব আমি কহিলাম। যোগী যোগ-সাধনা করেন, সন্ন্যাসী তপস্যা করেন। অষ্ট প্রকার যোগ সংসারে উত্তম সাধনোপায় বটে। যোগীদের মৃতদেহ ভস্ম করিলে নরকগামী হইতে হয়।"

আগমসংহিতার বিবরণ হইতেও দেখা গেল, ঈশ্বর হইতে একাদশ রুদ্রের উৎপত্তি হইয়াছে। তাঁহাদের প্রধানতম রুদ্র মহাযোগী হইতে বিন্দুনাথের জন্ম হইয়াছে। বিন্দুনাথের পুত্র আয়িনাথ বা আদিনাথ হইতে রুদ্রকুলের বিস্তৃতি হইয়াছে। আরও জানা গেল যে বিন্দুনাথ কশ্যপ দুহিতা কৃষ্ণার পাণিগ্রহণ করেন এবং তাঁহার বংশীয়গণ ত্রিদণ্ডী যোগপট্ট ধারণ এবং রক্তবস্ত্র পরিধান ও গাত্রে ভস্ম লেপন করেন। এখানে একাদশ রুদ্রের সকলের নাম দেওয়া হয় নাই। কেবল সর্ব্বপ্রধান রুদ্রের নাম মহাযোগী বলা হইয়াছে এবং তাঁহারা ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন বলিয়া কথিত হইয়াছে। বল্লালচরিত ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে যাঁহাকে মহান্ রুদ্র বলা হইয়াছে, তাঁহাকেই আগমসংহিতাকার মহাযোগী (মহান + যোগী) বলিয়াছেন। রুদ্রগণের যোগধর্ম্মপরায়ণতা হেতু মহান্ রুদ্রের নামের শেষে যোগী শব্দ সংযোগ করিয়া মহাযোগী শব্দ উদ্ধৃত হইয়াছে—ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা নিশ্চয়ই ঈশ্বরত্ব গুণবিশিষ্ট ছিলেন; সেইজন্য তাঁহাকে ঈশ্বর বলা হইয়াছে। সুতরাং ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ ও বল্লাল-চরিতের বর্ণনার সহিত আগমসংহিতার বর্ণনা মূলতঃ একই। এই আগমসংহিতায়

যোগিজাতির অত্যন্ত মাহত্ম্য ও প্রাধান্য বিষয়ে নানা কথা বর্ণিত আছে। গ্রন্থবাহুল্য ভয়ে সমুদায় উদ্ধৃত হইল না। গীতায় যোগীকে তপস্বী, জ্ঞানী ও কর্ম্মী হইতে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। এ গ্রন্থেও তদ্রূপ বর্ণনা আছে। অধিকন্তু যোগিজাতিকে ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে।

চন্দ্রাদিত্য পরমাগমের বিবরণ

"কৈলাসোপবনে কহি পার্ব্বতী সহ শঙ্করঃ।
ভ্রমণেনাতুরী ভূত্বা বিশ্রম্য বটমূলকে ॥
সুখাসীনা কদাচিত্তু দেবী পপ্রচ্ছ শঙ্করং।
কথং যোগী ভবেদ্দেব যোগধর্ম্ম প্রকাশকঃ।
এতন্মে কথ্যতাং সর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং প্রভো ॥"

ঈশ্বর উবাচ :—

শৃণু দেবি! প্রবক্ষ্যামি সিদ্ধানাং যৎ কৃতং ময়া।
যোগশাস্ত্র-প্রকাশার্থং তৎ সর্ব্বমকরোৎ পুরা ॥
বিশেষেণ যথা যোগী শৃণু ত্বং জগদীশ্বরী।
সূর্য্যবংশো ময়া সৃষ্টঃ স্থাবরা জঙ্গমাশ্চ যে ॥
সূর্য্যবংশে মহামায়ে। সুধন্বাশ্চাভবন্নৃপঃ।
সত্যকালে ধাম্মিকঃ স সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥
তস্যাত্মজা সূর্য্যবতী সাপি শাস্তবতী ভবেৎ।
সুশীলা সুধৃতিঃ কন্যা শিবভক্তা শুভাননা ॥
পিতুঃ স্থানেঽবদৎ কন্যা শৃণু ত্বং হি মদ্বচঃ।
পতিস্বীকারং দেবেশে করিষ্যে মম মানসং ॥
জগৎকর্ত্তা মহাদেবো নাম মৃত্যুঞ্জয়ো ধ্রুবম্ ॥

মমগর্ভে তস্য বীর্য্যাৎ পুত্রঃ সমুদ্ভবেদ্ যদি।
তদা মে শরীর শুদ্ধি র্জীবনং সফলং ভবেৎ ॥

রাজোবাচ ঃ—

যন্মানসং কৃতং মাতঃ তৎ শৃণুম্ব ব্রবীমি তে।
মহাদেবং সমুদ্দিশ্য তপস্ব দুহিতঃ সদা॥
গৃহবাসং পরিত্যজ্য গচ্ছস্ব হি তপোবনং।
জপহোমৈ র্মহাদেবং হর্ষয়াঞ্জলি কর্ম্মণা।
অবশ্যং জায়তে ভদ্রং আশুতোষো মহেশ্বরঃ॥
শ্রুত্বৈতদ্বচনং কন্যা জগাম সা তপোবনং।
শ্রীফলস্য বনং গত্বা জপহোমৌ কৃতৌ পুরা॥
জপহোমপূজনৈশ্চ তুতোষ মাং প্রযত্নতঃ।
বভূব দর্শনং দেবি। ববন্দে মাং সযত্নতঃ॥
তব গর্ভে মম বীর্য্যাৎ যোগনাথো ভবিষ্যতি।
ইতি দত্বা বরং তস্যৈ গতোঽহং নিজমন্দিরং।
কামাতুরাং স্বর্য্যবতীং দদর্শাহং বনস্থিতাং।
যত্র তিষ্ঠতি সা কন্যা তত্র যাতো মুহুর্মুহুঃ॥
মৃণালে স্থাপিতং বীর্য্যমেকদা নর্ম্মদাতটে।
দিনমেকং রাজকন্যা গতা চ নর্ম্মদাতটে॥
সমূলং বৃন্তসহিতং বুভুজে সা চ কন্যকা।
অতস্তু মম বীর্য্যাত্তু যোগনাথোঽভবৎ পুনঃ।
বনমধ্যে স্বর্য্যবত্যা উদরে যোগবর্দ্ধকঃ॥
সূর্য্যতুল্যো মহাতেজা রূপেণ পৃথিবীতলে।
কৃতাঙ্কতনয়া কন্যা জগাম মম সন্নিধৌ॥

সূর্য্যবতী উবাচ :—

-কন্যা প্রোবাচ হে দেব ত্রিপুরাসুরঘাতক ।
অহং কুমারিকা নারী বিবাহো ন কৃতো ময়া ॥
ন জানেঽহং পুনঃ কস্য বীর্য্যাৎ কোঽস্তি মমোদরে ।
দেব দেব ! মহাদেব ! পতিশ্চ ন কৃতো ময়া ॥
যোগেশ্বর ! মহাদেব ! নাথ মৃত্যুঞ্জয়স্তব ।
কস্য বীর্য্যাৎ মম পুত্রো মহাদেব ! ব্রবীষি মে ॥

ঈশ্বর উবাচ :—

সূর্য্যবত্যা বচঃ শ্রুত্বা কথ্যতে যৎকৃতং ময়া ।
আকর্ণয় রাজসুতে ! ত্বং সৌভাগ্য বিবর্দ্ধনে ॥
পুত্রং দত্ত্বা মম স্থানে স্বস্থানে গমনং কুরু ।
বরাননে বরং পুত্রং মম স্থাপয় সন্নিধৌ ।
ময়া চ রক্ষ্যতাং পুত্রো যোগশিক্ষা প্রদীয়তে ॥
আদৌ গায়ত্রীং জপ্ত্বা চ মন্ত্রং জপ্ত্বা ততঃ পরম্ ।
ত্র্যক্ষরতি মহামন্ত্র শ্চাগমোক্ত বিধানতঃ ॥
গুপ্তমন্ত্রশ্চ দাতব্যো হরিণী দীর্ঘলোচনে ॥
যোগনাথেতি সংজ্ঞা স্যাৎ দিব্যজ্ঞানোদয়ো ভবেৎ ।
যোগী পরমহংসঃ স্যাৎ নির্ব্বাণমোক্ষমাপ্নুয়াৎ ॥
শিবতুল্যো ভবেদ্‌যোগী যোগেশ ইতি বিশ্রুতঃ ।
পুত্রং দত্ত্বা রাজপুত্রী জগাম নিজ মন্দিরম্ ।
শঙ্করেণ যোগনাথ উপদিষ্টঃ পরং তপঃ ॥
কৃত্বা সিদ্ধোঽভবৎ ভক্ত্যা দ্বিতীয় প্রমথাধিপঃ ॥
দিনমেকং বদামি তং শৃণু সূর্য্যবতী সুত
যোগেশ্বর ! মন্ত্রসিদ্ধিস্তবাসীচ্চ ন সংশয়ঃ ॥

গচ্ছাবাসং গৃহাণ ত্বং যোগধর্ম্মং পরায়ণং।
মাতা যত্র স্থিতা যোগিন্ গচ্ছ ত্বং তত্র পুত্রক॥
অনুজ্ঞয়া যোগনাথো মাতুঃ সমীপমাগতঃ।
সনকো গৌতমো ব্যাসো বশিষ্ঠো নারদস্তথা॥
কাশ্যপেয়ো মুনিশ্রেষ্ঠঃ শ্রীকল্পেঽস্মিন্ বনে স্থিতঃ।
মার্কণ্ডেয়ো মহাযোগী শুকঃ সনাতনস্তথা॥
বিষ্বকসেনো মুনিশ্রেষ্ঠঃ সনকো গৌতমাদয়ঃ।
কাশ্যপেয়ো বশিষ্ঠশ্চ দেবতুল্যোব্যপহিতঃ॥
ব্যাসাদভূৎ শুকদেবঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
কশ্যপাদভবন্ পুত্রা বক্ষাদি মুনিপুঙ্গবাঃ॥
সুরতী নাম যা কন্যা যোগনাথ বিবাহ্নিতা।
সা কন্যা শক্তিগর্ভা চ প্রাদুরাসীৎ সুলক্ষণা॥
মমাজ্ঞয়া যোগনাথো বিবাহমকরোৎ পুরা।
তস্যাঃ গর্ভেঽভবন্ পুত্রা আদিনাথাদি ষোড়শঃ॥
আদিনাথ-মীননাথ-সত্যনাথ সচেতনাঃ।
কপিলো নানকশ্চৈব ষড়েতে গৃহবাসিনঃ॥
গিরিপুরীভারত্যাদি শৈলনাগা সরস্বতী।
রামানন্দী-শ্যামানন্দী-সুকুমারাচ্যুতস্তথা॥
এ তে দশ গৃহং ত্যক্ত্বা ভ্রমন্তি দিগ্‌দিগন্তরম্।
যোগনাথাৎ সমুৎপন্না যোগীত্যাখ্যাং বিলেভিরে।
ত্রিশূলং ডমরুং কৈশ্চিৎ ধ্রিয়তে রক্ত চেলকম্।
বিভূতিভূষিতাশ্চৈব নাদ যজ্ঞোপবীতকাঃ॥
কুণ্ডলং ধ্রিয়তে কেন পানপাত্রং কৃতং করে।
যত্নবান্ গৃহবাসেষু বিপ্রবদাগমাদিষু॥

বিপ্র ইব মহাযোগী দেবকার্য্যরতঃ সদা।
বঙ্গভূমি-প্রবাসস্থ বহবস্তস্য পুত্রকাঃ ॥
তত্র যোগী সদানন্দো মহাদেব-প্রিয়ঙ্করঃ।
পূর্ব্ববাসং পরিত্যজ্য শ্রীপুরে চাবসৎ সদা।
পূর্ব্বোষিতং পরিত্যজ্য যোগপট্টস্য ধারকঃ ॥
বপুর্বিভূতিভূষঞ্চ দণ্ডকমণ্ডলৌ করৌ।
খট্টাঙ্গমসি পাশঞ্চ শৃঙ্গঞ্চ ডমরুং তথা।
সর্ব্বস্মাদুত্তমো যোগী গুরুর্ভবতি নিশ্চিতং ॥"

(ইতিচন্দ্রাদিত্য-পরমাগমু, দ্বাবিংশতিতমোঽধ্যায়।)

একদা পার্ব্বতী কৈলাসপর্ব্বতের উপবনে মহাদেবের সহিত ভ্রমণ করিতে করিতে পরিশ্রান্ত হইয়া বিশ্রামার্থ এক বটবৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন। তথায় সুখাসীন হইয়া বিগত ক্লান্তি হইলে পর পার্ব্বতী মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন,— "মহাদেব! যোগধর্ম্ম প্রকাশক যোগিজাতির জন্ম কিরূপে হইল, তাহা আমাকে সবিশেষ বলুন, শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে।" তদুত্তরে মহাদেব কহিলেন, "দেবি! সিদ্ধদের সম্বন্ধে এবং যোগধর্ম্ম প্রকাশ বিষয়ে ইতঃপূর্ব্বেই আমি সমস্ত বিধান করিয়াছি; এখানে বিশেষ করিয়া বলিতেছি শুন,—স্থাবরজঙ্গমাত্মক জীবসকল এবং সূর্য্যবংশীয় নরপতিগণকে আমিই সৃষ্টি করিয়াছি। হে মহামায়ে! সত্যযুগে সূর্য্যবংশে সুধন্ব নামে ধার্ম্মিক, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় এক নরপতি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার শান্তস্বভাবা, সুশীলা, সুবুদ্ধিমতী, শিবভক্তিপরায়ণা সূর্য্যবতী নামে এক সুন্দরী কন্যা জন্মগ্রহণ করে। একদা এই কন্যা পিতার নিকট গিয়া কহিল, 'হে পিতঃ! দেবাদিদেব মহেশ্বরকে পতিত্বে বরণ করিতে আমার একান্ত বাসনা হইতেছে। মহাদেব জগৎকর্ত্তা এবং মৃত্যুঞ্জয়। আমার গর্ভে মহাদেব কর্ত্তৃক সন্তান উৎপন্ন হইলে আমার শরীর শুদ্ধি ও জীবন সফল হইবে।' রাজা কন্যার বচন শুনিয়া কহিলেন, 'বৎসে, তুমি গৃহবাস পরিত্যাগ করতঃ অরণ্যে গিয়া

জপ, হোম ও পুষ্পাঞ্জলি দ্বারা মহাদেবের পূজা ও তাঁহার উদ্দেশ্যে তপস্যা কর; তাহা হইলে আশুতোষ-মহেশ্বর অবশ্য তোমার মঙ্গলবিধান ও মনস্কামনা পূর্ণ করিবেন।' পিতার বচন শুনিয়া সূর্য্যবতী শ্রীফলের তপোবনে গমন করতঃ জপ, হোম ও পূজা দ্বারা আমাকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে দর্শন করিয়াছিলাম এবং তিনি যত্নপূর্ব্বক আমার বন্দনা করিয়াছিলেন। 'আমার বীর্য্যে তোমার গর্ভে যোগনাথ নামক পুত্র উৎপন্ন হইবে'—সূর্য্যবতীকে এই বর দিয়া আমি নিজস্থানে প্রত্যাগমন করিলাম। তপোবনস্থিতা মৎপরায়ণা সূর্য্যবতীকে আমি মধ্যে মধ্যে দেখিতে যাইতাম। একদা নর্ম্মদাতটে—পদ্মপত্রে আমার তেজ স্থাপন করিলাম। একদিন রাজকন্যা উক্ত পদ্মপত্র দ্বারা জলপানকালে আমার উক্ত তেজ পান করিয়া ফেলেন। তাহাতে আমার তেজে সূর্য্যতুল্য তেজস্বী যোগনাথের জন্ম হয়। উক্ত পুত্রকে অঙ্কে ধারণ করিয়া সূর্য্যবতী আমার নিকট আসিয়া বলিলেন, 'হে ত্রিপুরাসুরঘাতক দেব, আমি কুমারী কন্যা; আমার বিবাহ হয় নাই; কাহাকেও বিধিমতে এখনও পতিত্বে বরণ করি নাই; তবে এ পুত্র কি প্রকারে, কাহার বীর্য্যে আমার গর্ভে উৎপন্ন হইল—ইহা বলিয়া আমার সন্দেহ ভঞ্জন করুন।' সূর্য্যবতীর কথায় আমি যাহা করিয়াছিলাম, তাহা বলিলাম। তারপর তাহাকে বলিলাম, 'হে ভাগ্যবতী, আমার বরপুত্রকে আমার নিকট রাখিয়া যাও। আমি তাহাকে রক্ষা করিব ও যোগ শিক্ষা দিব। প্রথমতঃ গায়ত্রী প্রদান করতঃ আগমোক্ত বিধানে ত্রক্ষরী-মন্ত্র ও গুপ্ত মন্ত্রে দীক্ষিত করিব। ইহার নাম যোগনাথ হইবে; তাহার দিব্য-জ্ঞানোদয় হইবে। যোগনাথ যোগী, পরমহংস ও আমার তুল্য হইয়া নির্ব্বাণ মোক্ষ লাভ করিবে। রাজপুত্রী ইহা শুনিয়া পুত্রকে আমার নিকট রাখিয়া গেলেন এবং আমা কর্ত্তৃক যোগনাথ পরম যোগে উপদিষ্ট হইয়া পরমসিদ্ধ ও দ্বিতীয় প্রমথাধিপতুল্য হইয়াছিল। তাহার পর আমি যোগনাথকে তাঁহার মন্ত্র সিদ্ধি হইয়াছে জানাইয়া তাঁহাকে গৃহে মাতৃসকাশে যাইতে অনুজ্ঞা

করিলাম। যোগনাথ আমার আদেশে গৃহে গিয়া পরে মাতার তপোবন শ্রীফলের বনে গেলেন। তথায় সনক, গৌতম, ব্যাস, বশিষ্ঠ, নারদ, কাশ্যপেয়, মার্কণ্ডেয়, মহাযোগী, শুক, সনাতন, বিষ্বকসেন প্রভৃতি মহাত্মাগণের সহিত মিলিত হইলেন। কশ্যপ হইতে দক্ষাদি মুনিগণের উৎপত্তি হয়। কশ্যপের সুরতী নাম্নী কন্যাকে যোগনাথ বিবাহ করেন। সেই কন্যা শক্তিগর্ভা সুলক্ষণা ছিল। আমার আজ্ঞায় এই বিবাহ হয়। সেই কন্যার গর্ভে যোগনাথের আদিনাথাদি ১৬ যোলটী পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে আদিনাথ, মীননাথ, সত্যনাথ, সচেতননাথ, কপিলনাথ, নানকনাথ, এই ছয়জন গৃহবাসী ছিলেন। আর গিরিনাথ, পুরীনাথ, ভারতীনাথ, শৈলনাথ, নাগনাথ, সরস্বতীনাথ, রামানন্দ-নাথ, শ্যামানন্দীনাথ, সুকুমারনাথ, অচ্যুতনাথ—এই দশজন গৃহাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া দিগ্ দিগন্তর ভ্রমণ করিতেন। যোগনাথ হইতে উৎপন্ন বলিয়া ইহারা 'যোগী' এই আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ ত্রিশূল, ডমরু, রক্তবস্ত্র, বিভূতি, যজ্ঞোপবীত ও নাদ ধারণ করিতেন। কেহ কেহ কর্ণে কুণ্ডল ও হাতে পানপাত্র (কমণ্ডলু) ধারণ করিতেন। কেহ বা ব্রাহ্মণবৎ আগমাদি বিহিত কার্য্যে ও গৃহবাসে যত্নবান্ ছিলেন। বিপ্রতুল্য মহাযোগী বেদাদিকার্য্যে রত ছিলেন। বঙ্গভূমিতে তাঁহার বাস ছিল এবং তাঁহার বহু পুত্র ছিল। তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে মহাদেবের প্রিয়ভূত সদানন্দনাথ পূর্ব্ববাস পরিত্যাগ করিয়া শ্রীপুরে বাস করিয়াছিলেন। তিনি যোগপট্টধারী, বিভূতিভূষিতদেহ, দণ্ডকমণ্ডলুহস্ত, অসি, পাশ, শৃঙ্গ, ডমরু ও খট্টাঙ্গধারী ছিলেন। তিনি সর্ব্বোত্তম যোগী হওয়াতে গুরুপদে বৃত হইয়াছিলেন।"

চন্দ্রাদিত্য পরমাগমের মতে সূর্য্যবংশের রাজকন্যা ও মহাদেব হইতে যোগনাথ বা বিন্দুনাথের উৎপত্তি। ইহা সত্যযুগের ঘটনা। সত্যযুগে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি বর্ণবিভাগ ছিল না এবং বর্ণবিভাগ না থাকাতে বর্ণসঙ্করও ছিল না। তখন উত্তম, মধ্যম, অধম বলিয়াও কিছু ছিল না; সকলেই উত্তম ছিলেন।

বর্ণবিভাগ ত্রেতাযুগে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে *। সুতরাং সত্যযুগের সুধন্বা ক্ষত্রিয় ছিলেন না। তিনি উত্তমবর্ণ ব্রাহ্মণই ছিলেন। সুতরাং সূর্য্যবতী ছিলেন ব্রাহ্মণকন্যা। তিনি মহাদেবকে পতিলাভার্থ তাঁহার সাধনায় রত হন; ফলে মহাদেবের বীর্য্যে যোগনাথের উৎপত্তি। এ সন্তান ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কিছুই নহেন। বেদপুরাণাদিতে মহাদেবকে মহারুদ্র বলা হইয়াছে। বল্লাল-চরিতের মতেও সূর্য্যবতী রুদ্রগণের একতমের পত্নী। অতএব চন্দ্রাদিত্য পরমাগমের পল্লবিত বিবরণ সঙ্কুচিত করিলে রুদ্র হইতে যোগিজাতির উৎপত্তি —এ গ্রন্থানুসারেও সিদ্ধ হয়।

জাতিমুক্তাৰ বিবৰণ

কামৰূপৰ অসমীয়া পণ্ড চন্দত লিখা জাতিমুক্তা নাম পুথিত যোগিজাতিৰ উৎপত্তি সম্বন্ধে লিখিছে :— *

"বিদায় ভৈলেক তথা কৰি নমস্কাৰ।
কি হৈব কি হৈব বুলি চিন্তিত অপাৰ ॥
অন্তৰীক্ষে গৈয়া স্থিত শিব শৰীৰত।
ক্ষণে কামভাব ভৈল স্থিৰ নোহে চিত ॥
বসন্তৰ চুম্বে পুষ্প মধু মধুকৰ।
এহিমতে আন্দোল কামত হৈল হৰ ॥

* নির্ব্বিশেষাঃ কৃতে সর্ব্বা রূপায়ুশীল-চৈষ্টিতৈঃ
* * * *
বর্ণাশ্রম ব্যবস্থাশ্চ নতদাসন্ ন সঙ্করঃ ॥ ৬০
* * * *
তুল্যরূপায়ুষঃ সর্ব্বে অধমোত্তম বর্জ্জিতাঃ। ৬১
বর্ণানাং প্রবিভাগশ্চ ত্রেতায়াং সংপ্রবর্ত্তিতঃ ॥
(বায়ুপুরাণ—৬৬-৫৭ অ-উ)

মহাতেজ বলবুদ্ধি বাঢ়িল প্ৰচুৰ ।
হৰিষ-বদন হৈয়া ভৈলা কামাতুৰ ॥
ধ্যানত্যাগ মন্তি হৰ ভৈলেক নিশ্চয় ।
ক্ষণে দুৰ্গা পাশ যাইবো হেন মনে লয় ॥
কৈলাশক মনে হৰ কৰিলেক গতি ।
এথা যেন মনত ভাৱিলা ভগৱতী ॥
শিৱস্থানে গৈলা কাম ৰতি দুই জন ।
তাহাৰ প্ৰমাণ মই কৰো তেত্তিক্ষণ ॥
সৰ্ব্বাঙ্গসুন্দৰীৰূপে তেখনে হইল ।
আসিতে দেখিয়া পাছে তাঙ্ক জিজ্ঞাসিল ॥
সৰ্ব্বাঙ্গ পোৰয় মোৰ স্থিৰ নোহে প্ৰাণ ।
শীঘ্ৰে দিয়া আলিঙ্গন নেভাৱিও আন ॥
কি বোলা বোলহ বুলি দড়াইলা নিকটে ।
দেৱী বোলে বাণী হৰ থেকিলা সঙ্কটে ॥
মহা কামাতুৰ হৈয়া যাইবো মোৰ স্থান ।
এহি বুলি মহামায়া ভৈলা অন্তৰ্দ্ধান ॥
ৰূপে চিত মগ্ন ভৈলা স্থিৰ নোহে মন ।
কামে শিৱবিন্দু পাত ভৈলন্ত তখন ॥
দেৱ বীৰ্য্য নষ্ট যায় পৰিয়া ভূমিত ।
শতাধিক যোগিনী গৈয়া লৈলন্ত মুঠিত ॥
কি কৰিবো বুলিয়া কৰিব খোজে পান ।
দেখে হস্তে ভ্ৰমে তিনি অংশে বিদ্যমান ॥
একত্ৰ কৰিয়া পান কৈলা পুনৰ্ব্বাৰ ।
চাৰি অংশ বিন্দু ভৈলা গৰ্ভৰ আকাৰ ॥

ক্ষণেকে পুৰুষ চাৰি ভৈলা উৎপত্তি।
কৰযোৰে শিৱক যে আৰম্ভিলা স্তুতি ॥

যোগিনীৰ গৰ্ভে জাত তোমাৰ কুমাৰ।
কিবা নাম শিক্ষা দীক্ষা দিওক আমাৰ ॥
তুষ্ট হৈয়া শিক্ষা দিবো বোলো ত্ৰিলোচন।
উত্তম হৈয়াই মোৰ গাৱে উৎপণ ॥
দ্বিজবৰ্ণ হুয়া তোৰা থাক চাৰিজন।
শিক্ষা দিবো দীক্ষা ক্ৰিয়া লৈয়োক এখন ॥
সূত্ৰ আনি ব্ৰহ্মগ্ৰন্থী দিলা ত্ৰিপুৰাৰি।
মূল মন্ত্ৰ দিয়া দিলা কান্ধত উত্তৰী ॥
বিপ্ৰক্ৰিয়া দিয়া মন্ত্ৰ দেন্ত পুনৰ্ব্বাৰ।
আগম-নিগম মন্ত্ৰ কৰিলা উদ্ধাৰ ॥

* * * *

নাথ পদ নাম অন্তে ভৈলা তাসম্বাৰ।
যোগিনীৰ গৰ্ভজাত যোগী নাম তাৰ ॥
সামবেদী শিৱগোত্ৰ কৰে নিৰূপণ।
এহি মতে যোগিজাতি ভৈলা উৎপণ ॥"

(যোগী বা কাটনি জাতির ইতিহাস)

"জাতিমুক্তাৰ বৰ্ণনা মতেও যোগিজাতি মহাদেৱৰ পৰাই উৎপত্তি হৈছে। কিন্তু, ইয়াৰ বিৱৰণী নিচেই চমু। আৰু ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত্ত পুৰাণ আদিৰ বৰ্ণনাৰ সদৃশ স্পষ্ট ন হয়। জাতিমুক্তাৰ কাহিনী যদিও অতিশয় ৰূপক, তথাপি মূল কথাটো একেই আছে। ইয়াতো যোগিজাতিক দ্বিজবৰ্ণীয়, শিৱগোত্ৰীয় আৰু সাম-বেদীয় বুলি উক্ত কৰিছে। আৰু তওঁবিলাকৰ নামৰ সোহত নাথ উপাধি

থকা আৰু উত্তৰী (উপবীত) লোৱাৰ কথাও উল্লিখিত আছে। সুতৰাং এই বৰ্ণনাৰ দ্বাৰা আদিতে থকা অসমীয়া যোগিজাতিৰ অস্তিত্বৰ কথা সুন্দৰৰূপে প্ৰমাণিত হয়।" (যোগিপ্ৰদীপিকা)

মহাবিরাটতন্ত্রের বিবরণ

মহাবিরাটতন্ত্রে যোগিজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে হরগৌরীর কথোপকথনের কিয়দংশ এইরূপ :—

অবধৌতো হ্যহং সাক্ষাৎ সত্যং সত্যং বরাননে।
তজ্জাতো যোগিবংশশ্চ সর্ব্বেষাং পরমোমতঃ ॥

(মহাবিরাটতন্ত্র)

অর্থাৎ মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন—হে বরাননে! আমিই সাক্ষাৎ অবধৌত (অর্থাৎ মহাদেব ও অবধৌত—এতদুভয়ের মধ্যে কোন ভেদ নাই)। সেই অবধৌত হইতে উৎপন্ন যোগিবংশ সকল বংশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

বিদেশীয় পণ্ডিতের মত

চট্টগ্রামের প্রত্নতত্ত্ব-সংগ্রাহক মিঃ হ্যামিন্টন্ সাহেব বঙ্গদেশের সেন্সাস্ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট্ মহাশয়ের নিকট যোগিজাতি সম্বন্ধে ১৯০১ সনে যে সুদীর্ঘ রিপোর্ট প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন—"যুগী" শব্দ "যোগী" শব্দেরই রূপান্তর বা অপভ্রংশ মাত্র। সচরাচর দেখা যায়, বঙ্গভাষায় ওকারের পরবর্তী কোন ব্যঞ্জনবর্ণে ইকার কিম্বা ঈকার থাকিলে সেই ওকারের স্থানে সর্ব্বত্রই উকার উচ্চারিত হইয়া থাকে * ;—যেমন টোপী, গোপী, কোটী, কোলী,

* পূর্ব্ব-বাঙ্গালার কোন কোন অঞ্চলের লোকে ওকার মাত্রেরই স্থানে উকার উচ্চারণ করিয়া থাকে। তাহারা ঘোড়া, চোর, কোঠাবাড়ী, লোকনাথ, গোল, গোলাপ, জোড়া, টোকা, ঢোল, দোয়াত, খোরাকী, দোষ, দোতালা ঘোট, যোগাড়, যোগ প্রভৃতি সমুদয় ওকারবিশিষ্ট শব্দের ওকার স্থানে উকার উচ্চারণ করিয়া থাকে।

গোষ্টি, ডোরী, কোকিল, ঢোলী, ডোলী, বোলী, মোদী, কোষ্ঠী, রোটি, লোভী, কোনী, যোনি, ভোগী, রোগী, যোগী প্রভৃতি শব্দস্থানে যথাক্রমে টুপী, গুপী, কুটী, কুলী (যথা কোলাকুলী), গুষ্টি, ডুরী (যথা ডুরীহার), কুকিল, ঢুলী, ডুলী, বুলী (যথা ব্রজবুলী), মুদী, কুষ্ঠী, রুটী, লুভী, কুনী, যুনি (যথা পদ্মযুনি), ভুগী (যথা ভুক্তভুগী), রুগী, যুগগী প্রভৃতি শব্দ উচ্চারিত হইয়া থাকে। অতএব 'যুগী' জাতির বিশুদ্ধ নাম যোগিজাতি। (১)

হ্যামিল্টন্ সাহেব যোগিজাতির উৎপত্তি ও বিস্তৃতি সম্বন্ধে যে সকল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল (২)। আগমসংহিতা, চন্দ্রাদিত্য পরমাগম, মহাবিরাট তন্ত্র, কূর্মপুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রোদ্ধৃত বচনাদি ও অপরাপর বহুবিধ প্রমাণাদি হইতে প্রতীয়মান হয় যে বিন্দুনাথ বা যোগনাথ নামক কোনও প্রসিদ্ধ যোগী এই জাতির আদিপুরুষ ছিলেন। এই জাতির

---

1. "The Jugis of Bengal proper do the same, and their occupation, their use of the Padabi 'Nath' etc., all point to a connection between them and the Jogis of other parts of the Province. The change from 'O' to 'U' is seen in many Bengali words besides 'Jugi."

Census Report of Bengal. Part I, P. 433

2. "It will appear from the above quotations and references that Bindunath or Yoganath who was a great sage and ascetic (Yogi), is regarded as the ancestor of the Yugi race. The origin of the race cannot be traced further back.....................
It appears that this Yoganath became a house-holder marrying a daughter of Kashyapa. As Yogis are generally Saivas, the descendants of Yoganath naturally took up 'Siva' or 'Rudra' as the 'Gotra name' and as Yoganath married a daughter of Kashyapa's house, all subsequent brides were supposed to belong to the Kashyapa gotra."

উৎপত্তির ইহা অপেক্ষা আর প্রাচীন ইতিবৃত্ত পাওয়া যায় না। * * * যোগনাথ কশ্যপের কন্যাকে বিবাহ করিয়া গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করিয়াছিলেন। যোগিগণ সাধারণতঃ শিবের উপাসক বলিয়া তাঁহাদের গোত্রের নাম 'শিবগোত্র' রাখিয়াছেন এবং যোগনাথ কশ্যপ পরিবারের কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়া পরবর্ত্তী কন্যাগণ সকলেই কাশ্যপ গোত্রীয় বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন।

"It is not quite sure whether the term 'Yogi' was applied to the ten sons alone of Yoganath who left the world and became ascetics wandering from land to land or to all the sixteen including the six who continued the life of worldly men. The text quoted is vague on the point."

"It appears further that one of these ten wandering ascetics returned to a householder's life and settled in Bengal. One of his sons, however, went to leave in Sripur and became a worldly preceptor, a good Yogi."

* * * * *

"It is apparent, however, that the Yugis (Naths) of Bengal are quite different from the 'Yungis' mentioned in the 'Sabda Kalpadrum.' They are apparently at first descendants of Saiva ascetics who turned to worldly life, and probably they came from the vicinity of Benares where Saivaism prevailed. With their settlement in lower Bengal which led to their taking to the occupation of weaving, they became lowered in the estimation of the higher classes of society who did not recognise the dignity of labour. Degradation may also have been due to the anathema of the ruling prince, whose displeasure the leaders of the caste incurred ; that is quite probable."

(Ethnological Report on Yogi caste of Chittagong by Mr. Hamilton in 1901)

যোগনাথের যে দশজন পুত্র গৃহত্যাগী হইয়া দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণ করিতেন কেবলমাত্র তাঁহারাই 'যোগী' বলিয়া কথিত হইতেন ; না তাঁহার ১৬ জন পুত্রে মধ্যে অপর যাঁহারা গৃহস্থাশ্রমে অবস্থান করিয়াছিলেন, তাঁহারাও 'যোগী' নাে অভিহিত হইতেন—তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। এ বিষয়ে চন্দ্রাদিত পরমাগমের উদ্ধৃত বচন একটু অস্পষ্ট।

"ইহাও জানা যায় যে, গৃহত্যাগী দশ পুত্রের মধ্যেও একজন বঙ্গদে আগমনপূর্ব্বক পুনঃ গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করেন। তাঁহার এক পুত্র শ্রীপুরে (? গিয়া বাস করেন। তিনি গৃহীযোগী ও সৎগুরু হইয়াছিলেন।.........

ইহাও স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, বঙ্গদেশের 'যুগী' নামে কথিত জা (অর্থাৎ নাথগণ) শব্দ কল্পদ্রুমোল্লিখিত যুঙ্গী জাতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক তাঁহারা (নাথগণ) যে গৃহস্থাশ্রমী শৈবযোগীদের বংশধর ছিলেন, তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। সম্ভবতঃ তাঁহারা শৈবধর্ম্মপ্রধান বারাণসীর নিকট হইতে বঙ্গদেশে আগমন করিয়া থাকিবেন এবং বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হইতে বস্ত্রবয়নে ব্রতী হন। এ জন্য তাঁহারা এতদ্দেশীয় উচ্চজাতীয় লোকদিগের নিক নিন্দনীয় হইয়া পড়েন, কারণ এ দেশের উচ্চশ্রেণীর লোকেরা ব্যবসায়ের প্রা সম্মান প্রদর্শন করেন না। অথবা ইহাও একান্ত সম্ভবপর যে, এই জাতি নেতৃগণ স্বেচ্ছাচারী ভূপতির কোপানলে পড়িয়া হিন্দুসমাজে নির্ব্বাসন লা করিয়াছেন।"

মিঃ হ্যামিল্টন আরও বলেন :—

"Yogis or ascetics are still regarded as the highest spiritua preceptors, and those of the Yogi race who followed the trad tions of their early ancestors and became actual Yogis (asce tics) may have been accepted as spiritual leaders of certai communities. Sudras, dedicated to religious life, could nc well have styled themselves Yogis as a class. Sankaracharjy

probably found certain rites and customs amongst the ordinary Yogis who were Saivas, which did not commend themselves to the reformed religion of that great mind, and hence it is not impossible that he expressed disapproval thereof. But this cannot be held to be the sole cause of a general degradation of the caste itself. The Pal dynasty reigned (in Bengal) from the 8th to the 10th century. They are said to have been Buddhists, but they regarded all the ascetics (Yogis) with favour. It is quite probable that the descendants of Yogis, called the Yugi caste, settled and flourished in Bengal under the Pal kings."

('Census Report of Chittagong' by Mr. Hamilton 1901)

বঙ্গানুবাদ—"প্রকৃত যোগিগণ এখনও সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মগুরুরূপে সমাদৃত হইয়া থাকেন এবং যোগিবংশের যে সকল ব্যক্তি পূর্ব্বপুরুষগণের দৃষ্টান্ত অনুসরণপূর্ব্বক প্রকৃত যোগিপদবাচ্য হইতে পারিতেন, তাঁহারা সম্প্রদায় বিশেষের ধর্ম্মগুরুর আসন লাভ করিতেন। ধর্ম্মানুশীলনে যে সকল শূদ্র জীবন উৎসর্গ করিত, তাহারা জাতিগতভাবে যোগী আখ্যা লাভ করিতে পারিত না। সাধারণ শৈব-যোগিগণের মধ্যে শঙ্করাচার্য্য হয়তো এমন কতকগুলি আচার ও ক্রিয়াকাণ্ড লক্ষ্য করিয়াছিলেন যাহার সহিত সেই মহামনস্বীর সংশোধিত ধর্ম্মমতের সামঞ্জস্য ছিল না; সুতরাং অনুমান হয়—শঙ্করাচার্য্য শৈবযোগীদের এই সকল আচারনীতি গ্রহণীয় নহে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। (শঙ্করা-চার্য্যের) এই বিরুদ্ধ অভিমত সমগ্র যোগিজাতির অধঃপতনের একমাত্র কারণ বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না। পালরাজগণ খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দী হইতে ১০ম শতাব্দী পর্য্যন্ত বাঙ্গালা দেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহারা বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন বলিয়া কথিত আছে; কিন্তু তাঁহারা যোগিগণের প্রতি সুপ্রসন্ন ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন। অধুনা 'যুগীজাতি' নামে পরিচিত যোগিবংশ-

ধরগণ এই পালরাজগণের রাজত্বকালে বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।"

যে যোগিজাতি একদা সমাজের উচ্চস্তরে আসীন ছিলেন, আজ তাঁহাদের কি শোচনীয় পরিণাম! হিন্দু-সমাজের অবিচারে আজ তাঁহারা লাঞ্ছিত, অবহেলিত ও অপমানিত। তাই বলিতে ইচ্ছা হয়:—

"হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান
অপমানে হ'তে হবে তাহাদের সবার সমান।"

—রবীন্দ্রনাথ

দ্বিতীয় অধ্যায়

নাথযোগিগণের ধর্ম্ম

যোগধর্ম্ম—উদ্ভবকাল	বৈদিক যুগ, এবং ইহার প্রবর্ত্তক মহাদেব।
শৈবধর্ম্ম—উদ্ভবকাল	বৈদিক যুগের অন্তকাল, এবং ইহার প্রবর্ত্তক গুরু গোরক্ষনাথ।
নাথধর্ম্ম—উদ্ভবকাল	সম্ভবতঃ ১ম কি ২য় খৃঃ অব্দ এবং ইহার প্রবর্ত্তক গুরু গোরক্ষনাথ। বঙ্গদেশে (পূর্ব্ববঙ্গ বা পূর্ব্ব পাকিস্তান-সহ) নাথধর্ম্মের প্রবর্ত্তনকাল সম্ভবতঃ ৩য় কি ৪র্থ খৃষ্টীয় শতাব্দী।

"ভারত আমার, ভারত আমার, যেথায় মানব মেলিল নেত্র।
মহিমার তুমি জন্মভূমি মা, এশিয়ার তুমি তীর্থ ক্ষেত্র।"

—দ্বিজেন্দ্রলাল

নাথযোগিগণ যোগধর্ম্ম, শৈবধর্ম্ম ও নাথধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। ইঁহারা প্রাচীন ভারতীয় (পাকিস্তানসহ) সমাজকে—বিশেষ করিয়া হিন্দু সমাজকে দীক্ষিত, নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিয়াছেন। কেবলমাত্র তাহাই নহে, ইঁহারা যোগ-দর্শনের প্রতিষ্ঠা করিয়া যোগবিভূতি দ্বারা জগতের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিলেন। ইঁহারা এশিয়ার, বিশেষ করিয়া ভারতের, ধর্ম্মজগতে একচ্ছত্র প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানেও ইঁহারা স্থানে স্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত আছেন। ইঁহাদের প্রচারিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

যোগধর্ম্ম

দেবাদিদেব মহাদেব সর্ব্বজ্ঞানের আধার। বেদও তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞানী মহারুদ্র বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। যোগশাস্ত্র তাঁহারই কথিত। ইহা *জগতের

আদি ধর্ম্ম। আদি সভ্য মানব জ্ঞানের জন্য যখন লালায়িত হন, এবং জগৎ প্রপঞ্চের তত্ত্ব উদ্ঘাটনের জন্য সকলে যখন ব্যগ্র হন, তখন মহাদেব জগতের কল্যাণের জন্য দয়া করিয়া স্বীয় সন্তান (রুদ্রবংশধর) গণের নিকট এই যোগ-ধর্ম্মতত্ত্ব প্রকাশ করেন। ইঁহারা এই ধর্ম্ম আচরণ ও প্রচার করিয়া জগতে যোগী নামে খ্যাত হন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম-এ, সি-আই-ই মহোদয় নাথপন্থ সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন—" * * * শিব তাঁহাদের দেবতা। তাঁহাদের বহিগুলি হর-পার্ব্বতীর সংবাদে তন্ত্রের আকারে লেখা। তাঁহারাই সেগুলি কৈলাশ হইতে নামাইয়া লইয়া আসেন। * * * নানারূপ আসন করিয়া যোগ করা তাঁহাদের ধর্ম্ম। * * * ক্রমে নাথপন্থ খুব প্রবল হইয়া উঠিলে বৌদ্ধেরা ও হিন্দুরা নাথদের উপাসনা করিত" (প্রবাসী—বৈশাখ, ১৩২২ বাং, ১৬৬ পৃঃ)। "নাথপন্থ এককালে খুব প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র নাথযোগীরা গিয়াছিলেন এবং লোককে আপন ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। সিন্ধু, কচ্ছ, গুজরাট প্রভৃতি দূরদেশেও নাথেরা গিয়াছিলেন। (সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা—১৩২৮ বাং, ১ম সংখ্যা, ২৪ খ পৃষ্ঠা)। শাস্ত্রী মহাশয়ের বক্তব্য এখনও শেষ হয় নাই। তিনি ভাবাবেগে আবার বলিয়াছেন—"The Yogis are now trying to take holy thread and become Brahmins. They do not know what they were. They were real Yogis being descendants of the Naths. That influential class to which belonged Matsyendra Nath, Goraksha Nath, Chowrangi Nath and others. Their ancestors had numerous followers; princes bowed before them. Many Naths are still worshipped in temples and holy places in Nepal and Tibbet. Goraksha Nath is still worshipped as the principal deity by the Gorakha as a race." (Introduction to Modern Buddhism)

অর্থাৎ আজকাল যোগীরা পবিত্র যজ্ঞোপবীত ধারণ করতঃ ব্রাহ্মণ হওয়ার চেষ্টা করিতেছেন। অতীতে তাঁহারা যে কি ছিলেন, তাহা এখন তাঁহারা

জানেন নাই। যে গৌরবান্বিত মহাবংশে মৎস্যেন্দ্রনাথ, গোরক্ষনাথ, চৌরঙ্গী নাথ প্রমুখ আচার্য্যগণ আবির্ভূত, তাঁহারাও সেই নাথবংশজাত প্রকৃত যোগী ছিলেন। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষদের অসংখ্য শিষ্য ছিল। রাজা মহারাজা পর্য্যন্ত ইঁহাদের চরণ বন্দনা করিতেন। নেপাল ও তিব্বতের মন্দিরে মন্দিরে ও তীর্থে তীর্থে আজও অনেক নাথের পূজা অর্চ্চনা হইতেছে। গোর্খাজাতি আজও গোরক্ষনাথকে সর্ব্বপ্রধান উপাস্য দেবতা বলিয়া পূজা করিয়া থাকে। শাস্ত্রী মহাশয় আরও বলিয়াছেন, "নাথপন্থ নামে এক প্রবল ধর্ম্মসম্প্রদায় বহুশত বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালায় এবং পূর্ব্বভারতে প্রভুত্ব করিয়া গিয়াছেন" (প্রবাসী—বৈশাখ, ১৩২২ বাং, ১৬৬ পৃঃ)। বৃহত্তর ভারত পরিষদের উদ্বোধন উপলক্ষে মাননীয় শাস্ত্রী মহাশয় ইহার সভাপতি মহোদয়কে লিখিয়াছিলেন—" * * * বঙ্গের যে শৈব কৌল বৌদ্ধ যোগিগণ এই সেদিনও ভারতের বাহিরে ভারতগৌরব প্রচার করিল, তাঁহাদিগকে আমরা 'জুগী' বলিয়া ঘৃণা করিতেছি" (প্রবাসী—অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩ বাং)।

যোগীরা বৌদ্ধ ছিল,—শাস্ত্রী মহাশয়ের এই উক্তির সহিত আমরা একমত নহি। তথাপি শাস্ত্রী মহাশয়ের উক্তির মধ্যে একটি অতি বড় ঐতিহাসিক সত্য নিহিত রহিয়াছে যাহা বঙ্গের ঐতিহাসিকগণ সানন্দে একবাক্যে স্বীকার করিতে এখনও সম্মত নহেন। ধর্ম্মক্ষেত্রে ভারতের বাহিরে যে বৃহত্তর ভারত গড়িয়া উঠিয়াছিল, সেই গৌরবের শ্রেষ্ঠাংশ যে বঙ্গের (পাকিস্তানসহ) নাথদের প্রাপ্য, শাস্ত্রী মহাশয়ের উক্তির মধ্যে তাহাই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। উক্ত উক্তিতে এই ইঙ্গিতও আছে যে, ধর্ম্মক্ষেত্রে পুনরায় বৃহত্তর ভারত গড়িতে হইলে নাথাচার্য্যদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা আবশ্যক।

যোগধর্ম্মে এক পরমাত্মা স্বীকৃত হইয়াছে। তিনিই এই চরাচর বিশ্বের স্রষ্টা, পাতা ও লয়-কর্ত্তা। এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড পরমাত্মা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, তাহাতে স্থিত আছে এবং তাহাতেই বিলীন হইবে। তিনি সর্ব্বঘটে বিরাজ

করেন। তিনি এক হইয়াও বহুরূপে উপাসিত (ঋগ্বেদ—১।১৬৪।৭৬)। আত্মা মায়ামোহিত হইলে জীব সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। মায়ামোহিত জীবাত্মা আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ দুঃখের অধীন হয়। এই ত্রিবিধ দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া পরমাত্মা স্বরূপে অবস্থিত হওয়াই যোগের চরম ও পরম উদ্দেশ্য। পতঞ্জলি প্রমুখ যোগিগণ যোগের এক একটা বিধিবদ্ধ প্রক্রিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। পতঞ্জলির যোগসূত্র যোগদর্শন নামে খ্যাত। ভারতের গৌরব করিবার জন্য সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক, বেদান্ত মীমাংসা নামক যে ষড়দর্শন আছে, পতঞ্জলির যোগদর্শন তাহার দ্বিতীয় বটে। যোগধর্ম্ম এমন এক উদারতাপূর্ণ বিরাট ধর্ম্ম যে জগতের যাবতীয় ধর্ম্ম ইহার গণ্ডীর ভিতর দাঁড়াইতে পারে। সাংখ্যদর্শনে যোগমতের আভাষ আছে। এজন্য সাংখ্যদর্শনকে সাংখ্যযোগও বলে। বেদান্ত মতও যোগমতের অনুকূল। যোগিগণ অদ্বৈতবাদী। ব্রহ্মস্বরূপ হওয়া যোগের চরম উদ্দেশ্য। "সোহহং, তত্ত্বমসি, অহং ব্রহ্মাস্মি" প্রভৃতি বাক্য যোগীদেরই বাক্য বটে। বেদান্ত-প্রণেতা ব্যাসদেব লয়যোগের বিবরণ তাঁহার অনেক গ্রন্থে দিয়াছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় যোগধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। গীতার সমস্ত বর্ণনাই কোন না কোন যোগের বর্ণনায় পরিপূর্ণ। সেজন্য গীতাকে যোগশাস্ত্র কহে।

বিখ্যাত জাপানী পণ্ডিত ওকাকুরা কাকুজু বলেন—ভারতে যোগবিদ্যার উদ্ভবকাল অন্ধকারসমাচ্ছন্ন। অতি পুরাকালেও ইহার বিদ্যমানতার আভাষ পাওয়া যায়। কিন্তু যখন বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সমন্বয় সাধনের আবশ্যকতা উপলব্ধি হইয়াছিল, সে সময়ে ইহা শাস্ত্রাকারে প্রণীত হইয়াছে (Ideal of the East)। বৈদিক যুগেই যোগধর্ম্মের উদ্ভব হইয়াছে। সে সময় জাতি বিভাগ ছিল না। কালক্রমে হিন্দুসমাজে অসংখ্য জাতির সৃষ্টি হইয়া এক ও ঐক্যবদ্ধ হিন্দুজাতিকে ধ্বংসের পথে দ্রুত টানিয়া নিয়াছে। এ ভাবেই আর্য্যদের আদর্শ যোগধর্ম্মাচারীদল কালক্রমে যোগিজাতিতে পরিণত হইয়াছে।

ভারত যে ষড়্দর্শনের গৌরব করে, যোগদর্শন তাহার অন্যতম। এই যোগদর্শন যোগীদের একটা অবদান। যোগিগণই সর্ব্বপ্রথম "সোঽহম্" মন্ত্রের দর্শন লাভ করেন। তাঁহারাই চিত্ত-স্থৈর্য্য, দেহ-স্থৈর্য্য, আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি এবং প্রকৃতির উপর প্রাধান্য লাভের উপায় উদ্ভাবন করেন। ফেজের অধিবাসী ইবন বতুতা সাহেব (১৩২৪-৫৪) খৃঃ অব্দে মরক্কো হইতে চীন দেশ পর্য্যন্ত ভ্রমণকালে বলেন, হিন্দুস্থানের একজন যোগী ঘন পদার্থের আকৃতি ধারণ পূর্ব্বক মাটী হইতে শূন্যে উত্থিত হইয়া তাঁহার মাথার উপর অবস্থান করিয়া রহিয়াছিলেন (Lee's Translation—page 161)। ট্যানার এপলোনিয়াস ও তাঁহার সঙ্গী জ্যামিস সাহেব দৃঢ়ভাবে বলেন, তাঁহারা ওয়াইজম্যান পাহাড়ে যোগী (ব্রাহ্মণ) দিগকে শূন্যে নির্বিস্ময়ে বিচরণ করিতে দেখিয়াছেন (Indian Antiquary, Vol—IX, page 297)। 'এক যোগপন্থী সাধু কুম্ভক অবলম্বনে মৃতের ন্যায় অবস্থান করিতেছিলেন। কেহ বলিতেন, তাঁহার বয়স তিন শত বৎসর আবার কেহ কেহ বলিতেন, তাঁহার বয়স চারি শত বৎসর (Indian Pandits in the Land of Snow—page 64)।

রাজযোগ, লয়যোগ, হঠযোগ, পবনবিজয়, স্বরোদয়, যঠচক্র প্রভৃতি যোগের নানাবিধ গ্রন্থ যোগীরা প্রণয়ন করিয়া স্বীয় ধর্ম্মমত জনসমাজে প্রচার করেন। তাঁহাদের এই তত্ত্ব আজ পাশ্চাত্য দেশেও শ্রদ্ধার সহিত আলোচিত হইতেছে। তাহার ফলে পাশ্চাত্যবাসীরা মেসমেরিজম, হিপনটিজম, উইলফোর্স প্রভৃতি বিদ্যাদ্বারা জগৎবাসিগণকে আশ্চর্য্যান্বিত করিতেছেন। রাষ্ট্রবিপ্লব, ধর্ম্মবিপ্লব ও দৈবোৎপাত দ্বারা সেই বিরাট সাহিত্যের বহুল পরিমাণে ক্ষতি হইয়াছে। বিদ্বেষ্টৃগণের বিদ্বেষবশেও সেই বিরাট সাহিত্যের অনেক অংশের বিলোপ সাধিত হইয়াছে। তথাপি এখনও সেই সাহিত্যের যে ধ্বংসাবশেষ আছে তাহাও নিতান্ত কম নহে। যোগিগণ, তাঁহাদের শিষ্যগণ এবং বিভিন্ন পণ্ডিতমণ্ডলী যোগীদের অনুকরণে যোগচর্চ্চা করিয়া যোগশাস্ত্রের প্রভূত উন্নতি সাধন

করেন এবং অনেক যোগশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া মানবজাতির কল্যাণ সাধন করেন। চর্চ্চার একান্ত অভাবে আজ আমরা এই অমূল্যধন হইতে একেবারে বঞ্চিত হইয়া পড়িতেছি। সেজন্য যোগশাস্ত্র বর্ত্তমানে দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। এগুলি সংগ্রহ করিতে পারিলে মানবজাতির পরমোপকার সাধিত হইবে। নিম্নে কতকগুলি সংস্কৃত ভাষায় যোগশাস্ত্রের অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল—

গোরক্ষ সংহিতা—প্রসন্নকুমার কবিরত্ন সঙ্কলিত ও অনুবাদিত। ইহা সূত্র আকারে লেখা। ইহার ১ম খণ্ডে যোগাঙ্গ ও ৩য় খণ্ডে ধ্যান-ধারণা সম্বন্ধীয় বিবরণ আছে। এ সম্বন্ধে সাহিত্যাচার্য্য রায় দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর বলেন—"তাঁহার (গোরক্ষনাথের) রচিত অনেক সংস্কৃত পুস্তক আছে। তন্মধ্যে গোরক্ষ সংহিতাই শ্রেষ্ঠ" (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য)।

সিদ্ধসিদ্ধান্ত পদ্ধতি—গোরক্ষনাথ কৃত। নাথেরা গুরুশিষ্যে এবং সাধকে সাধকে অভিবাদন প্রত্যভিবাদন করিতে জোড়হাতে 'আদেশ' বলিয়া থাকেন। উক্ত গ্রন্থের একস্থানে আছে,—

"আত্মেতি পরমাত্মেতি জীবাত্মেতি বিচারতঃ।
ত্রয়ানমেক সংভূতিরাদেশঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥"

অর্থাৎ আদেশ শব্দের অর্থ আত্মা, পরমাত্মা ও জীবাত্মার এক সংভূতি। এই এক সংভূতি পদ দ্বারা ব্রহ্মাকে বুঝাইতেছে। সুতরাং শিষ্য গুরুকে, গুরু শিষ্যকে বা একজন সন্ন্যাসী অন্য একজন সন্ন্যাসীকে 'আদেশ' অর্থাৎ 'তুমি ব্রহ্মা স্বরূপ' এই বলিয়া পরস্পর পরস্পরকে সম্মান করেন (মুক্তাশ্রম—৪০ ও ৪১ পৃঃ)।

যোগবীজ—গোরক্ষনাথ কৃত। ইহার একস্থানে যোগ কাহাকে বলে, তাহার সংজ্ঞা এরূপ দেওয়া হইয়াছে,—

"যোঽপান প্রাণয়োর্যোগঃ স্বরজরেত স স্তথা।

সূর্য্যা চন্দ্রমসো যোগঃ জীবাত্ম-পরমাত্মনোঃ ।।
এবং তুদ্বন্দ্বজালস্ত সংযোগো যোগ উচ্যতে ।”

(ভারতসভ্যতায় নাথধর্ম্মের দান—
. পুরাতত্ত্ব-বিশারদ শ্রীভোলানাথ নাথ, এম-এ)

এখানে সুস্পষ্টভাবে উক্ত হইয়াছে, জীবাত্মা ও পরমাত্মার সংযোগই যোগ। যে নাথপন্থ জীবাত্মা ও পরমাত্মা স্বীকার করেন, তাঁহাদিগকে কেহ কেহ :বৌদ্ধ বলিতেও কুণ্ঠা বোধ করেন না। •

অমরৌঘ প্রবোধ—গোরক্ষনাথ কৃত। ইহার আরম্ভ ও শেষ অংশে আছে,—

“ওঁ নমোঽস্ত্বাদিনাথায় মিননাথায় বৈ নমঃ।
নমশ্চারঙ্গিনাথায় সিদ্ধবুদ্ধায় ধীমতে ।।
লয়াদি প্রতিপন্নানাং কলহোৎসুকচেতসাম্ ।
গোরক্ষেণ কথিতঃ প্রবোধঃ প্রত্যয়াত্মকঃ ।।
লয়যোগ হঠৈশ্চৈব মন্ত্রযোগ স্তৃতীয়কঃ ।
চতুর্থোরাজযোগশ্চ দ্বিধাভাব বিবর্জ্জিতঃ ।”

*　　*　　*　　*

“শ্রীমদ্ গোরক্ষনাথেন সদামরৌঘ বর্ত্তিনা।
লয়মন্ত্র হঠাঃ প্রোক্তাঃ রাজযোগায় কেবলং ।।
কায়েনৈব পরীক্ষোৎ বাক্ পঠঃ কিং করিষ্যন্তি।
চিকিৎসা পাঠমাত্রেণ যোগিনঃ কিং করিষ্যতি ।।”

(ভারতসভ্যতায় নাথধর্ম্মের দান—
পুরাতত্ত্ব-বিশারদ শ্রীভোলানাথ নাথ, এম-এ)

এখানে দেখা যাইতেছে, শরীর ও মনকে বিশুদ্ধ করিয়া রাজযোগ অনুষ্ঠানের উপযুক্ত করিবার উপায় স্বরূপ গোরক্ষনাথ লয়মন্ত্র হঠযোগ বলিতেছেন।

যাঁহারা গোরক্ষনাথ এবং তাঁহার সম্প্রদায়কে হঠযোগী বলেন, তাঁহাদের বুঝা উচিত, ইঁহাদের চরম উদ্দেশ্য হঠযোগ ছিল না।

ঘেরেণ্ড সংহিতা—ইহাতে যোগের উপযুক্ত আসনসমূহের মধ্যে ৩২টীকে প্রধান বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। তাহার মধ্যে তিনটী আসনের নাম নাথগুরুর নামানুসারে রাখা হইয়াছে; যথা—'(১৩) মৎস্যম্' '(১৪) মৎস্যেন্দ্র' '(১৫) গোরক্ষ'।

জার্ম্মানীর বার্লিন নগর হইতে Richand Set Midt এই সংহিতা প্রথমে জার্ম্মান ভাষায় অনুবাদ করেন। পরে ইহার ২য় সংস্করণ জার্ম্মান ভাষায় ১৯২১ খৃঃ অব্দে Faquire and Faquirtun নামে প্রকাশিত হয়। ভুবনচন্দ্র বসাক ১৮৭৭ খৃঃ অব্দে কলিকাতা হইতে ইহা প্রথম সম্পাদন করেন। ঘেরেণ্ড সংহিতার লেখক ছিলেন, ঘেরেণ্ড নামক একজন বাঙ্গালী মুনি।

গোরক্ষ বোধ—এই পুঁথিখানি সুপ্রসিদ্ধ ভাষাতত্ত্ববিদ্ গ্রীয়ারসন্ সাহেব যোধপুররাজের পুস্তকাগারে দেখিয়াছিলেন। "যোধপুররাজ মানসিংহ গোরক্ষ-রচিত গ্রন্থাদি সংগ্রহ করেন" (নাথপন্থ—২৯)।

হঠযোগ প্রদীপিকা—স্বাত্মারাম যোগীন্দ্র কৃত। ইহার প্রারম্ভে আছে—"প্রণম্য শ্রীগুরুং নাথং স্বাত্মারামেন যোগিনা। কেবলং রাজযোগায় হঠযোগং প্রকাশতে ॥ হঠবিদ্যাং হি গোরক্ষ-মৎস্যেন্দ্রাদ্যাবিজানতে স্বাহত্মারামোথ বা যোগী জানিতে তৎ প্রসাদতঃ ॥

ইহা চারি পরিচ্ছেদে ও ৩৮২ শ্লোকে সম্পূর্ণ। গোরক্ষ শতকের শ্লোকগুলির অধিকাংশই যেন ইহাতে ছড়াইয়া রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। গোরক্ষ-পদ্ধতির মূল অংশে এবং টীকাভাগেও হঠযোগ প্রদীপিকার অনেক শ্লোক ও শ্লোকের ছায়া ইহাতে পাওয়া যায়। 'হঠযোগ প্রদীপিকা' ১৫শ শতাব্দীর লেখা। (১৯১৫ খৃঃ অব্দে পঞ্চম সিংহ ইহার ইংরাজী অনুবাদ করেন। ইহা এলাহাবাদের The Sacred Books of the Hindus পুস্তকখানা হইতে প্রকাশিত হয়।)

গোরক্ষ-উপনিষদ—হিন্দীতে রচিত।

গোরক্ষ পিষ্টীকা—গোরক্ষনাথ কৃত। "ইহাতে রসায়নের আলোচনা আছে" (পল্লীশ্রী—১৩৩১ বাং, ২য় সংখ্যা)।

সিদ্ধসিদ্ধান্ত পদ্ধতি—গোরক্ষনাথকৃত। হিন্দী সংস্করণ। ইহাতে 'আদেশ' একটি সংজ্ঞাত্মক শব্দরূপে গৃহীত হইয়াছে। গোরক্ষনাথ 'আদেশে'র এইরূপ অর্থ করিয়াছেন,—

"ভুগতি গিয়ান দয়া ভণ্ডারণ, ঘট ঘট বাজে নাদ,
আপি নাথ নাথী সভজাকি, রিদ্ধি সিদ্ধি ঐ রামদা।
সংযোগ, বিয়োগ দুইকার চলাবে লেখে আর ভাগ আদেশ
তিসৈ" ইত্যাদি।

"প্রত্যক্ষ অর্থাৎ সাক্ষাৎ অনুভূতি পরমাত্মার দয়ার ভাণ্ডার স্বরূপ; এই অনুভূতি চরাচর প্রভৃতি সমুদয় বিশ্বে বিঘোষিত হইয়াছে। সেই পরমাত্মা সাক্ষি স্বরূপে, কখন বা এই বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা স্বরূপে, কখনও বা সিদ্ধি স্বরূপে বিরাজমান রহিয়াছেন। কিন্তু যোগীরা সংযোগ বিয়োগ রূপে দুই-কর্ম্মের নির্ণয় করিয়া উহাদের সত্য অংশ গ্রহণ করেন; এবং পরে নিরালম্ব হন। পরমাত্মাকে আমি নমস্কার করি।"

"এক মাই জুগতি বিয়াই, তিন চেলে পরবান,
ইক সংসারী, ইক ভণ্ডারি, ইক ন্নায়ে দিবান।
জিব তিস্ ভাবৈ, তিব চলাবৈ, জিব হোবৈ ফুরমাণ,
ওহু বেখে, ওনা নদবীন আবৈ, বহু তা এহু বিড়ান।
আদেশ তিসে আদেশ।"

"এক মাতা স্বাক্ষি-স্বরূপ হইয়া তিন জন অনুচরকে প্রমাণরূপে প্রকটীভূত করিয়াছেন; তাহার এক চেলার নাম সংসারী, একের নাম ভাণ্ডারী এবং অপরের নাম বিচারক, অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষকে সাক্ষী করিয়া তিন গুণ প্রকাশ

করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে একের নাম তমঃ, অন্যের নাম রজঃ এবং তৃতীয়ের নাম সত্ব। যে ব্যক্তি যে গুণসম্পন্ন, সে সেই গুণের কাজ করে, অর্থাৎ সেই গুণের দ্বারা সে সেইরূপ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। যাহার মধ্যে যে গুণ প্রধান, সে সেই গুণের সুখ্যাতি করে। অন্য গুণের কার্য্য সে জানে না; এই প্রকারে খণ্ডন করিলে তাহার কিছুই নিশ্চয় হয় না। আমি পরমাত্মাকে নমস্কার করি" (অধ্যাপক অমূল্য বিদ্যাভূষণ, প্রবাসী—ফাল্গুন, ১৩২৮ বাং, নাথপন্থ)। "নাথ-যোগীদের সিদ্ধসিদ্ধান্ত পদ্ধতি পুঁথিতেও হঠযোগ সংজ্ঞা, বজ্রোলী মুদ্রা, খেচরী মুদ্রা, কুণ্ডলিনী সাধন প্রভৃতির কথা আছে। প্রাণায়ামাদির পূর্ণ বিবরণও ইহাতে আছে" (নাথপন্থ—৯পৃঃ)।

মিশ্রবন্ধু বিনোদ—গোরক্ষনাথ রচিত ২৭ খানি ছোট ছোট গ্রন্থের নাম উক্ত গ্রন্থের ৪৪ পৃষ্ঠায় আছে। ইহার একখানি গদ্য গ্রন্থের কিয়দংশ এইরূপ—

"শ্রীগুরু পরমানন্দ তিনকে দণ্ডবৎ হৈ। হৈঁ কৈ সে পরমানন্দ আনন্দ স্বরূপ হৈ সরীর জিনহি কো। জিনহিকে নিত্যগায়েতে সরীর চেতনি অরু আনন্দময় হোতু হৈঁ। মৈঁ জুহৈ গোরিষসে। মছন্দর নাথকো দণ্ডবৎ করত হৌঁ। হৈঁ কৈ সে বৈ মছন্দর নাথ। সত্মাজোতি নিশ্চল হৈ অন্তহকরণ জিনি কো দ্বার তৈ ছহ চক্র জিনি নীকী তরহ জানৈ।

পরাধীন উপরাতি বন্ধন নাহী, সুআধীন উপরাতি মুকতি নাহী, চাহি উপরাতি পাপ নাহী, অচাহি উপরাইতি পুনি নাহী, ক্রম উপরাতী মল নাহী, নিহক্রম উপরাইতি নিরমল নাহী, দুব উপরাতি কুবধি নাহী, নিরদোষ উপরাতি সবধি নাহী, ঘোর উপরাইতি মন্ত্র নাহী, নারায়ণ উপরাইতি ঈসট নাহী, নিরঞ্জন উপরাইতি ধ্যান নাহী" (প্রবাসী—ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩২৮ বাং)।

গোরক্ষনাথ কৃত কয়েকখানি সংস্কৃত যোগশাস্ত্র—গোরক্ষ বোধ, দত্ত গোরক্ষ সংবাদ, গোরখনাথজীকা পাদ, গোরক্ষ নাথজীকে স্ফটক গ্রন্থ, জ্ঞান সিদ্ধান্ত যোগ, যোগেশ্বরী সাখী, বিরাট পুরাণ, গোরখসার, গোরক্ষ যোগতন্ত্র, গোরক্ষ

শতক বা জ্ঞান শতক, চতুর শীত্যাসন, জ্ঞানামৃত, যোগচিন্তামণি, যোগমহিমা, যোগ মার্ত্তণ্ড, যোগসিদ্ধান্ত পদ্ধতি, বিবেক মার্ত্তণ্ড, গোরক্ষ কল্প, গোরক্ষ সহস্র নাম, হঠযোগ, গৌরক্ষ কৌমুদী, গোরক্ষ গীতা" (প্রবাসী—ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩২৮ বাং)। "গোরক্ষের নামে সপ্তবিংশ গ্রন্থ প্রচলিত আছে"—নাথপন্থ।

গ্রন্থ	গ্রন্থকার
গোরক্ষসিদ্ধান্ত সংগ্রহ	
বন্ধ ত্রয় বিধান	(১) বিন্দুনাথ (২) বিলেশয় নাথ (হঠ-প্রদিপীকা ধৃত)
খেচরী বিদ্যা (মহাকাল যোগশাস্ত্রোক্ত) ...	(১) আদিনাথ
অমৃতসিদ্ধ যোগ	বিরূপাক্ষনাথ
মহেশ সংহিতা	(১) মহেশ (২) মহানন্দ (৩) মীননাথ (৪) মূলদেব
ভগবতী গীতা	(১) ভবদেব মিশ্র (২) ভবানী সহায় (৩) ভালুকী (৪) ভুবন (৫) মৎস্যেন্দ্র-নাথ (৬) মন্থান-ভৈরব (৭) মহাদেব
জ্ঞান তারাবলী ...	চিদ্রূপানন্দ নাথ
প্রণবার্থ প্রকাশিকা ...	ব্রহ্মানন্দ যোগীনাথ
ত্রিপুরার্চ্চণ পদ্ধতি ...	দক্ষিণামূর্ত্তি নাথ
পরমশিবাদ্বৈত কল্পলতিকা	সম্ভবানন্দ নাথ
বীরভদ্র ...	অরুণগিরি নাথ
কালশক্তি বিলাস ...	পরিপূর্ণানন্দ নাথ (১)
সিদ্ধসিদ্ধান্ত সংগ্রহ ...	

(১) 'জ্ঞানতারাবলী' হইতে 'কালশক্তি বিলাস' পর্য্যন্ত এই ছয়খানি গ্রন্থের নাম "ভারত সভ্যতায় নাথধর্ম্মের দান" হইতে সংগৃহীত।

গ্রন্থ	গ্রন্থকার
যোগসংগ্রহ টীকা	পূর্ণানন্দ
যোগসার	মল্লিনাথ ও সুন্দর দেব উদ্ধৃত।
যোগসার সংগ্রহ	কৃষ্ণগুরু
যোগসার সংগ্রহ	বিজ্ঞান ভিক্ষু
যোগসার সমুচ্চয়	হরি সেবক
যোগসিদ্ধান্ত চন্দ্রিকা	....

যোগসূত্র (যোগানুশাসন সূত্র বা সাংখ্যপ্রবণ বা পাতঞ্জল) ইহার ২৫ খানি টীকা আছে।

সুন্দর দেব কৃত হঠসঙ্কেত চন্দ্রিকায় নিম্নলিখিত যোগশাস্ত্রের উল্লেখ আছে ঃ—

"হঠ-প্রদীপিকা, যোগচান্দ্রিকা, যোগ চিন্তামণি, সনাতন সিদ্ধান্ত, যোগসার সমুচ্চয়, সঙ্কেত শিক্ষা, যোগ সংগ্রহ, যোগ রহস্য, বিরক্ত-সর্ব্বস্ব, নাড়ীশুদ্ধি, শক্তি-বোধ, শক্তিজাগর, হঠযোগ, পবন যোগসংগ্রহ, তন্ত্রবীজ, সুত সংহিতা, হঠরত্না-বলী, শিব সংহিতা, ত্রিপুর সমুচ্চয়, কুম্ভক পদ্ধতি, মানসোলস, স্বরোদয়, জীবমুক্তি-বিবেক, সিদ্ধান্ত শেখর, যোগতত্ত্ব প্রকাশ, যোগতারাবলী, যোগশিক্ষোপনিষৎ, ঈশ্বর গীতা, নন্দীপুরাণ, আত্মপুরাণ, ব্রহ্মবিন্দুপনিষৎ, যোগদীপিকা, বায়ুসংহিতা, যোগযাজ্ঞবল্ক্য, কালিকাপুরাণ, অমৃতবিন্দুপনিষৎ, যোগসার, যোগবীজ, হৈমাস্ত্রী, কেবলতন্ত্র, নকুলীশ-যোগপরায়ণ, ঈশ্বরীতন্ত্র, যোগভাস্কর, স্পর্শ-যোগশাস্ত্র, সিদ্ধসোপান, রসপ্রদীপ, অমানস্ক, সদাশিব গীতা, ঈশ্বর মীননাথ সংবাদ, যোগহৃদয়, তন্ত্রচূড়ামণি, বিদ্যারণ্য" ('শৈবধর্ম্ম ও যোগিজাতি'—পুরাতত্ত্ব-বিশারদ শ্রীভোলানাথ নাথ, এম-এ)।

গ্রন্থ	গ্রন্থকার
যোগানুশাসন	আধারেশ্বর
যোগসিদ্ধি প্রক্রিয়া	পদ্মনাথ কর্ত্তৃক উদ্ধৃত

গ্রন্থ			গ্রন্থকার
যোগাবলি	...	...	রামানন্দতীর্থ
যোগসূত্র টিপ্পণ	...	...	বৃন্দাবন শুক্ল
যোগোপদেশ	...	...	পরাশর
রাজমার্ত্তণ্ড (যোগসূত্র বৃত্তি)		...	ভোজদেব, বণরঙ্গ মল্ল
রামেশ্বর দর্শন	...	...	...
যোগসূত্র বৃত্তি	...	...	ক্ষেমানন্দ, নারায়ণ তীর্থ ও সদাশিব
রাজযোগ	...	...	রামচন্দ্র পরমহংস
যোগহৃদয়	...	...	সুন্দর দেব উদ্ধৃত
যোগাখ্যান	...	...	যাজ্ঞবল্ক্য
রাজযোগোৎসব	...	...	ঈশ্বর যোগাচার (মল্লিনাথ কর্ত্তৃক "কুমার সম্ভব" টীকায় উদ্ধৃত)
লঘুচন্দ্রিকা	...	...	নারায়ণ ভট্ট
বর্ণপ্রবোধ	...	...	দত্তাত্রেয়
বশিষ্টসার	...	...	(১) তীর্থ শিব (২) বিরূপাক্ষনাথ (হঠদীপিকাধৃত)
বিবেকমার্ত্তণ্ড	...	...	রামেশ্বর ভট্ট
শব্দানুবিদ্ধ সমাধি পঞ্চক		...	শারদানন্দ (হঠপ্রদীপিকাধৃত)
সিদ্ধসিদ্ধান্ত	...	...	নিদ্মানন্দ সিদ্ধ
স্পর্শ-যোগশাস্ত্র (সুন্দর দেব ধৃত)		...	আত্মারাম যোগীন্দ্র
স্বরোদয়	...	...	ব্যাস
হঠতত্ত্ব কৌমুদী	...	...	সুন্দরদেব
হঠপ্রদীপিকা বা হঠদীপিকা		...	(১) স্বাত্মারাম (২) চিন্তামণি

গ্রন্থ		গ্রন্থকার
হঠপ্রদীপিকা জ্যোৎস্নাটীকা	...	(১) ব্রহ্মানন্দ (২) উমাপতি (৩) রামানন্দতীর্থ (৪) ব্রজভূষণ (৫) মহাদেব
হঠযোগ বিবেক ...	...	বামদেব
হঠযোগ সংগ্রহ ...	...	মথুরানাথ
হঠযোগাধিরাজ ...	...	শিব
হঠযোগাধিরাজ টীকা ...	...	রামানন্দতীর্থ
হঠযোগাধিরাজ সংগ্রহ ...	...	রামানন্দতীর্থ
হঠরত্নাবলী (সুন্দর দেব ধৃত)		
হঠসঙ্কেত চন্দ্রিকা ...	...	(১) শঙ্করদাস (২) সুন্দরদেব
শিব সংহিতা ...	...	শিবপ্রোক্ত
শিব সংহিতা টীকা ...	...	সদানন্দ
ষটচক্রক্রম বা		
ষটচক্র নিরূপণ বা ষটচক্রভেদ	...	পূর্ণানন্দ
ষটচক্রভেদ টীকা ...	...	রমানাথ সিদ্ধান্ত
ষটচক্রসাজ্জন রঞ্জিনী ...	...	রামবল্লভ
ষটচক্রদীপিকা ...	...	ব্রহ্মানন্দ
ষটচক্র দীপিকাবৃত্তি ...	...	পূর্ণানন্দ
ষটচক্রধ্যানপদ্ধতি ...	...	ব্রহ্ম চৈতন্য যতি
ষটচক্রভেদ টিপ্পনী ...	...	শঙ্কর
ষটচক্রবিবৃতি টীকা ...	...	বিশ্বনাথ, রামদেব
ষটচক্রস্বরূপ ...	...	...
ষটচক্রাদি সংগ্রহ ...	...	মথুরানাথ
ষোড়শ মুদ্রালক্ষণ ...	...	গুরু যোগী

গ্রন্থ	গ্রন্থকার
সদাচার প্রকরণ	শঙ্করাচার্য্য
সমরসার স্বরোদয়	রাম
সাংখ্য প্রবচন বা পাতঞ্জল যোগসূত্র , ...	
সাংখ্য যোগদীপিকা	...
সিদ্ধখণ্ড	(১) রামচন্দ্র সিদ্ধ (২) সিদ্ধিপাদ
যোগতত্ত্ববোধ বা যোগতত্ত্বোপনিষদ্ ...,	
যোগতরঙ্গ	(১) রামশঙ্কর (২) বিশ্বেশ্বর দত্ত
যোগতারাবলী	(১) শঙ্করাচার্য্য (২) শুক
যোগদর্পণ (হেমাদ্রি কর্ত্তৃক উদ্ধৃত) কৃষ্ণনাথ ও ভবদেব কর্ত্তৃক তট্টীকা	
যোগদীপিকা (সুন্দরদেব উদ্ধৃত)	
যোগপদ্ধতি	ধরণীধর
যোগপ্রদীপ	দেবীসিংহ দেব
যোগবিন্দুটিপ্পন	ভবদেব
যোগবীজ (সুন্দরদেব উদ্ধৃত)	
যোগভাস্কর ঐ	
যোগমণি প্রদীপিকা	
যোগমণিপ্রভা বা যোগসূত্রবৃত্তি ...	রামানন্দনাথ সরস্বতী
যোগরত্ন সমুচ্চয়	...
যোগরত্নাকর	বীরেশ্বরানন্দ
মুদ্রা প্রকাশ	কৃপারাম
াজ্ঞবল্ক্যগীতা বা যোগী াজ্ঞবল্ক্য	যাজ্ঞবল্ক
যাগকল্পম্	কুলমণি শুক্ল

গ্রন্থ	গ্রন্থকার
যোগকল্পলতা … …	মথুরানাথ শুক্ল
যোগগ্রন্থ … …	(১) দত্তাত্রেয় (২) বেঙ্কটাচার্য্য
যোগগ্রন্থটীকা … …	গুণাকর মিশ্র
যোগচন্দ্রটীকা … …	রামানন্দ তীর্থ
যোগচন্দ্রিকা … …	(১) গোবর্ধন যোগীন্দ্র (২) নারায়ণ তীর্থ
যোগচন্দ্রিকা বা যোগসূত্র টীকা …	অনন্ত
যোগচিন্তামণি … …	(১) গোরক্ষ মিশ্র (২) বাল শাস্ত্রিন গোর্দে (৩) শিবানন্দ সরস্বতী (৪) গদাধর মিশ্র
যোগচিন্তামণি টীকা … …	ভবানী সহায়
যোগচূড়ামণি … …	…
যোগচূড়ামণ্যুপনিষদ্ … …	…
যোগজ্ঞান … …	আনন্দ সিদ্ধ
দত্তাত্রেয় সংহিতা … …	দত্তাত্রেয়
দেহস্থ স্বরোদয় … …	নাগবোধ (ক্ষেমরাজ ও স্বাত্মারাম উদ্ধৃত)
নাড়ীজ্ঞান দীপিকা … …	…
ন্যায়রত্নাকর বা নবযোগকল্লোল …	ক্ষেমানন্দ দীক্ষিত
পবনবিজয় … …	শিব
পাতঞ্জল বা পাতঞ্জলসূত্র (যোগসূত্র দ্রষ্টব্য)	
পাতঞ্জলরহস্য … …	ধরানন্দ যতি
	প্রভুদেব (হঠদীপিকাধৃত)
যোগরসায়ণ … …	শিব-ভাষিত

গ্রন্থ	গ্রন্থকার
যোগরহস্য (সুন্দরদেব উদ্ধৃত)	
যোগবর্ণন	মথুরানাথ শুক্ল
যোগবাচস্পত্য (ব্যাসদেবকৃত যোগসূত্র ভাষ্য টীকা)—	বাচস্পতি মিশ্র
যোগবাশিষ্ঠ	বশিষ্ঠ প্রোক্ত
যোগবার্ত্তিক	বিজ্ঞান ভিক্ষু
যোগবিবেক	(১) হরিশঙ্কর (২) বৃন্দাবন শুক্ল
যোগবিবরণ	বশিষ্ঠ
যোগবিবেক টিপ্পন... ...	রামানন্দতীর্থ
যোগবিজয়	মার্কণ্ডেয়
যোগবীজ	শিব
যোগবৃত্তি	ভোজরাজ
যোগবৃত্তি সংগ্রহ	উদয়ঙ্কর
যোগশত ব্যাখ্যানম্ ...	সনাতন গোস্বামী
যোগশাস্ত্র	(১) দত্তাত্রেয় (২) পতঞ্জলি (৩) বশিষ্ঠ
যোগশিক্ষা	* হরিহর
যোগ সংগ্রহ	(১) ভবদেব ভট্ট (২) কৃষ্ণ শুক্ল

(বিশ্বকোষ হইতে সংগৃহীত)

* 'গোপীচাঁদের সন্ন্যাসে' (১১ পৃঃ) দেখা যায় গোরক্ষনাথের অন্য নাম হরিহর। তিনিই কি ইনি ?

শৈবধর্ম্ম

প্রবর্ত্তক—গুরু গোরক্ষনাথ

উদ্ভবকাল—বৈদিক যুগের অন্তকাল।

বৈদিক সাহিত্য হইতে জানা যায়, জগতের আদি কারণ পরমাত্মা এক হইয়াও অনাদিকাল হইতে বহুরূপে বিরাজিত; এই বহুরূপেও তাঁহার একত্ব অক্ষুণ্ণ। তিনি একরূপেও বহুরূপ এবং বহুরূপেও এক। তাঁহার এই বহুরূপের মধ্যে একটি রূপ নিরাকার। আদিতে যোগধর্ম্মে পরমাত্মার এই নিরাকার স্বরূপের উপাসনার কথাই জানা যায়। বেদার্থের পরিপূরক এবং প্রকাশক পুরাণেও পরতত্ত্বের সাকার ও নিরাকার রূপের কথা দৃষ্ট হয়। বেদের রুদ্রই পুরাণের শিব। পরমাত্মার স্বাভাবিকী শক্তিই তাঁহার প্রকৃতি। শক্তির বা প্রকৃতির যোগেই তিনি সৃষ্ট্যাদি লীলা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। শৈবোপসানার যোনিলিঙ্গ রুদ্ররূপী বা শিবরূপী পরমাত্মার এবং শক্তির বা প্রকৃতিরই পরিচায়ক। সম্ভবতঃ সাধারণের উপাসনার সুবিধার জন্যই যোগিগণ পরবর্ত্তীকালে যোনি-লিঙ্গের উপাসনার প্রবর্ত্তন করেন। এইরূপে যোগধর্ম্মাচারী যোগিগণ পৌরাণিক যুগে শিব ও তাঁহার লিঙ্গোপাসক শৈব হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। শিবোপাসক হইলেও তাঁহারা যোগধর্ম্ম ত্যাগ করেন নাই। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা জ্ঞান-মার্গের সাধক ছিলেন, তাঁহারা পরমাত্মার স্থলে শিবকে বসাইয়া যোগের বিধানানুসারে জীব শিবের সংযোগসাধনে তৎপর রহিলেন। যোগীদের লিঙ্গা-রাধনা অশাস্ত্রীয় নহে। যোগসাধনকালে বানলিঙ্গ তাঁহাদের সদারাধ্য বলা হইয়াছে,—

"বানলিঙ্গং সদারাধ্যং যোগিনাম্ যোগসাধনে।
কৌলিকানাং কুলাচারঃ পশূনাম্ শক্রনিগ্রহে॥"

বানলিঙ্গের স্তোত্র মধ্যেও আছে—

"পরিত্রাণায় যোগিনাম্ কৌলিকানাং প্রিয়ায় চ ॥
কুলাঙ্গনানাং ভক্তায় কুলাচার রতায় চ ॥
কুলভক্তায় যোগায় নমো নারায়ণায় চ।
মধুপান প্রমত্তায় যোগেশ্বরায় নমো নমঃ।"

(শব্দকল্পদ্রুমধৃত—যোগসার বচন)।

আর যাঁহারা তাহাতে অশক্ত হইলেন, তাঁহারা অনুষ্ঠানবহুল পূজাপদ্ধতি অনুসারে শিব ও শিবলিঙ্গের উপাসনায় রত রহিলেন। এইরূপ পূজাপদ্ধতিও যোগের সংশ্রবশূন্য ছিল না।

পুরাণে শিবের যে যে নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে তাহার কতিপয় নাম (যথা—শিব, কপর্দ্দী, ঈশান, স্বয়ম্ভু, আশুতোষ, বৈদ্যনাথ, ত্র্যম্বক) বেদেও পাওয়া যায়। পুরাণাদিতে মহাদেবের যে রূপ, বর্ণ ও যে যে গুণ বর্ণিত হইয়াছে, বেদেও তাঁহার সেই রূপ, বর্ণ ও গুণাবলী বর্ণিত হইয়াছে। বেদেও তাঁহার উপাসনা দেখা যায়। শিব সর্ব্বমঙ্গল বিধায়ক, সর্ব্বজ্ঞানের ভাণ্ডার ও সর্ব্বশক্তিমান। প্রলয়কালে এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব তাহাতেই লয়প্রাপ্ত হইবে।

অতি প্রাচীনকাল হইতে দাক্ষিণাত্যে শৈবধর্ম্মের প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। লঙ্কাধিপতি রাবণ শৈব ছিলেন। রামচন্দ্র রাবণ রাজাকে পরাজিত করার জন্য সমুদ্রকূলে শিবশক্তি দুর্গার পূজা করেন। শিবগীতায় উল্লেখ আছে যে রামচন্দ্র অগস্ত্য কর্ত্তৃক শিবমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া শিবারাধনা করেন এবং লঙ্কাবিজয়ের পর রামেশ্বরে রামেশ্বর নাথ শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। বালি ও যবদ্বীপ শিবোপাসনা প্রচলিত দেখা যায়। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্য হইতে শৈবধর্ম্ম বালি ও যবদ্বীপে প্রতিষ্ঠিত হয় (২)। উত্তর ভারত, হরিদ্বার,

(২) Anam and Cambodia Encyclopedia Britanica, Java and Sunda Islands (Encyclopedia Britanica)

কাশী, কাশ্মীর রাজ্য, বেলুচিস্থান প্রভৃতি স্থানে শৈবধর্ম্মের প্রভাব যথেষ্ট দেখা যায়। হিমালয়ের কৈলাস গিরি শৈবদের সর্ব্বপ্রধান তীর্থস্থান। কৈলাসের পর হরিদ্বার ও কাশী। সুদূর আরব ও মিশরেও শৈবধর্ম্মের প্রাধান্য ছিল। উইনকিথ সাহেব বলেন, মোক্কেশ্বর শিবের নামানুসারে মক্কার নামকরণ হইয়াছে (Hindu and the Purans origin of Mecca on mount Cancasus). ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে মোক্কেশ্বর শিবের বিবরণ পাওয়া যায়। মিশর দেশেও সীরস্ দেবের লিঙ্গ পূজা বিশেষরূপে প্রচলিত ছিল। তাঁহার ভার্য্যা আইসীস্। ওসীরস—'ঈশ্বর' অর্থাৎ শিব শব্দের এবং আইসীস্—'ঈশী' অর্থাৎ পার্ব্বতী শব্দের নামান্তর মাত্র। তথাকার লিঙ্গ পূজার সহিত ভারতীয় লিঙ্গ পূজার প্রায় সর্ব্ববিষয়ে সাদৃশ্য ছিল। প্রাচীন ফিনিসিয়া, আসীরীয় ও বাবিলন রাজ্যবাসীরাও লিঙ্গমূর্ত্তির উপাসনা করিত। প্রাচীনকালে খৃষ্টানদিগের মধ্যেও লিঙ্গ পূজা প্রচলিত ছিল। চীন, তিব্বত প্রভৃতি দেশেও শৈবপ্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। তিব্বতের দেবমন্দিরগুলি আজও লিঙ্গ নামে অভিহিত হয়। যথা :— ভাঙ্গিয়ালিঙ্গ, কুণ্ডলিঙ্গ, ডোমচকলিঙ্গ, জামলিঙ্গ ইত্যাদি। চীনের পর্ব্বতগুলির নামের শেষে লিঙ্গ শব্দ দেখা যায়, যথা :— পাংলিঙ্গ। লিঙ বা লিং লিঙ্গ শব্দের রূপান্তর। এইভাবে দেখা যায়, লিঙ্গপূজা একদিন এশিয়া-খণ্ডের নানাস্থানে প্রচলিত ছিল।

শৈবদের মধ্যে চারিটি সম্প্রদায় আছে। যথা—কাপাল, কালমুখ, পাশুপত ও শৈব। ইহাদের দর্শনগুলির নাম :— লকুলীশ, পাশুপত দর্শন, শৈব দর্শন, প্রত্যভিজ্ঞ দর্শন, রসেশ্বর দর্শন। মহাভারতে ও স্কন্দপুরাণে পাশুপত শৈবের বিশেষ উল্লেখ আছে। শৈব সম্প্রদায়ের ভিতর লকুলীশ পাশুপত সম্প্রদায়ের নাম বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। সায়ন সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে এই ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমত আলোচনা করিয়াছেন। পর্ত্তুগীজরা কাথিয়াবাড়ের সোমনাথ হইতে ১২৭৪—৯০ খৃঃ অব্দে এক বিশাল শিলালিপি ইউরোপে নিয়াছেন। ঐ লিপি

চিন্ত্রা প্রশস্তি নামে খ্যাত। ডাঃ বুলার লিপির তর্জ্জমা করিয়াছেন। লিপিতে লেখা আছে, পাশুপত সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক লকুলীশ স্বয়ং শিব অবতার। হেমবতী লিপিতে ও মহীশূরের বেলগমী লিপিতে এ সম্বন্ধীয় উল্লেখ আছে। তাঁহার চারি শিষ্য—(১) কুশিক (২) গর্গ (৩), কৌরিশ্য ও (৪) মিত্র। ইঁহাদের নামে চারিটি শৈবশাখা ভারতের চারিদিকে বিস্তৃত হইয়াছিল। কৌশিক (কুশিক) ও গার্গ্য (গর্গ) গোত্রের নাথ উপাধি-ধারী ব্রাহ্মণ বোম্বাই রাজ্যে আছেন (শৈবধর্ম্ম ও যোগিজাতি)।

শৈবধর্ম্ম যোগধর্ম্মের রূপান্তর। এই ধর্ম্মও একদিন একচ্ছত্র প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। এখনও শৈবতীর্থসমূহ ভারতে সংখ্যায় ও মাহাত্ম্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছে। বেদের রুদ্রকে পুরাণাদিতে শিব বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। চতুর্ব্বেদ টীকাকার আচার্য্য সায়ন বলেন—"বেদ শিবের উচ্ছ্বসিত। সমস্ত পাণিনি ব্যাকরণই শিব মুখ-নির্গত বলা হয়। এজন্য শিবের আর এক নাম ব্যাকরণোত্তর (Monier Willioms)। শৈবদর্শন মতে মহাদেব, পরমেশ্বর ও জীবগণ পশু। ইহাতে কর্ম্মফল স্বীকৃত হইয়াছে।

শিবমূর্ত্তি অপেক্ষা শিবলিঙ্গের উপাসনাই অত্যন্ত ব্যাপক। জগতের সর্ব্বত্রই এই লিঙ্গোপাসনার নিদর্শন পাওয়া যায়। শৈবনাথগণ একদিন ইহার প্রচারার্থ দিগদিগন্তে ধাবিত হইয়াছিলেন। নাথভ্রমণকারীরা ভারতের বাহিরের "দুর্গম গিরি কান্তার মরু-দুস্তর পারাবার" অতিক্রম করিয়া কাস্পিয়ান সাগরের তীরস্থ রাশিয়ার ভুবনবিখ্যাত তৈলাঞ্চল বাকু পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। বাকুতে তাঁহারা একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কালের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া আজও ইহা উন্নতশিরে দাঁড়াইয়া ভক্তমণ্ডলীকে আহ্বান করিতেছে (Gorakh Nath and Medieval Hindu mysticism—page 31 & 72 and cyclopaedia of India Vol. II)

"প্রাচীন ভারতবাসীরা সেই সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারীর অব্যয়াত্মার নিরাকারত্ব

অপনোদন করিয়া ক্রমে লিঙ্গরূপে তাঁহার সাকারত্ব কল্পনা করিয়া আসিতেছেন এবং তাহাই ক্রমে জগদ্বাসীর উপাস্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। শুধু ভারতে নহে, সুপ্রাচীন চীন, গ্রীক ও রোমকজাতির মধ্যেও লিঙ্গোপাসনা প্রচলিত ছিল" (বিশ্বকোষ)। অধ্যাপক ডাঃ বেণীমাধব বড়ুয়া বলেন—"বুদ্ধের আবির্ভাবের দুই তিন শতাব্দী পূর্ব্ব হইতে আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বাঞ্চল শৈবজাতীয় বহু শ্রমণ-ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের লীলাক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল" (সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা—২য় সংখ্যা, ১৩৩১ বাং)। খৃষ্টপূর্ব্ব ৩২৭ শতাব্দীতেও শৈবধর্ম্মের প্রভাব ছিল (Coli Hercluem Pliny H. N.)। খৃষ্টের প্রথম শতাব্দীতেও কণিষ্ক, যাস্ক, বাসুদেব প্রভৃতির যে মুদ্রা পাওয়া যায়, তাহার উপর অর্দ্ধনারীশ্বর শিবমূর্ত্তি অঙ্কিত দেখা যায়। আফ্রিকা হিন্দুদের কাছে শঙ্খদীপ বা কুশদ্বীপ নামে পরিচিত ছিল। এই নদীর তীরে "ওসিরিস" ও "আইসিসের" বিখ্যাত মন্দির জগদ্বিখ্যাত ছিল এবং হিন্দুস্থান (ভারত) হইতে অনেক সন্ন্যাসী সেখানে তীর্থফল লাভের জন্য গমন করিতেন। শিবের এক নাম ঈশ্বর এবং গৌরীর আর এক নাম 'ঈশী', বা 'ঈশানী'। 'ওসিরিস' ও 'আইসিস' শব্দ ঈশ্বর ও 'ঈশী' বা 'ঈশানী' শব্দের রূপান্তর মাত্র। এই সব বিবেচনা করিলে বেশ বুঝা যায়, বুদ্ধদেবের জন্মের বহুপূর্ব্বে দেশবিদেশে শিবোপাসনা প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধধর্ম্মে দেশ প্লাবিত হইলেও শৈবধর্ম্ম জাগ্রত ছিল। চীন পরিব্রাজক হুয়েন সাঙ্ (৬২৯-৬৪৫ খৃঃ অব্দ) তাঁহার সিয়ুকী গ্রন্থে এ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছেন। রেভারেণ্ড বিল সাহেব সিয়ুকী গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন।

বেদে শৈবধর্ম্মের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বৈদিক যুগের অন্ত্যকালে শৈবধর্ম্মের উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। তাহা না হইলে বেদে ইহার উল্লেখ থাকিত না। গোরক্ষনাথ শৈবধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ছিলেন (জার্ণেল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল—১৮৭৮ খৃঃ অব্দ, ১৩৯ পৃঃ ভট্টশালীর গোপীচাঁদের সন্ন্যাস—সম্পাদকীয় মন্তব্য—৬৬ পৃঃ এবং ময়নামতীর গান-ভূমিকা দ্রষ্টব্য)।

নাথধর্ম্ম

প্রবর্ত্তক—গুরু গোরক্ষনাথ

উদ্ভবকাল—সম্ভবতঃ ১ম বা ২য় খৃঃ অব্দ

বঙ্গদেশে (পূর্ব্ব-পাকিস্তানসহ) নাথধর্ম্মের প্রবর্ত্তনকাল

সম্ভবতঃ ৩য় কি ৪র্থ খৃঃ অব্দ

নিখিল বিশ্বকর্ত্তাকে নাথ, (প্রভু, গুরু) রূপে ভজনা করিত বলিয়া এই ধর্ম্মকে নাথধর্ম্ম বলে। নাথধর্ম্মের প্রথম সাধকগণ মানবরূপী মন্ত্রদাতা স্বীয় গুরুদেবকে পরম গুরু কল্পনা করিয়া তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন এবং পরে সাধনমার্গে উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে গুরু ও পরম গুরুর একত্ব উপলব্ধি করিতে গুরুদেবের স্থলে পরম গুরুকে কল্পনা করিয়া নিরপেক্ষ সাধনা করেন। "নাথ স্তেষাং গুরুঃ প্রোক্তশ্চিন্তয়েৎ পরম গুরুং।" অর্থাৎ তাহাদের গুরুকে তাঁহারা 'নাথ' বলেন, এবং সেই নাথের সাহায্যে পরমগুরুর চিন্তা করিয়া থাকেন। এই গুরু ভজনমূলক সাধনা পরবর্ত্তীকালে সকল ধর্ম্মেই গৃহীত হইয়াছে। জৈন ও বৌদ্ধগণও গুরুপূজক হইয়াছিলেন। হিন্দুসমাজের প্রত্যেক সম্প্রদায়ে এই গুরুপূজার প্রাধান্য আছে। ইহা নাথধর্ম্মের দান। নাথধর্ম্মের নাথকে নাথাচার্য্যগণ জ্যোতির্ম্ময় রূপেও কল্পনা করিতেন, এবং জ্যোতিরূপে তাঁহার পূজা করিতেন। বেদে রুদ্রকেই সূর্য্য বা অগ্নিরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে (Tattwajnan—তত্ত্বজ্ঞান By Swami Anandacharyya)। নাথসাধক, রুদ্ররূপী মহাদেবের সাধক। নাথধর্ম্মে নাদবিন্দুর উপাসনা আছে। নাদবিন্দু প্রণবেরই নামান্তর মাত্র। নাদ বা প্রণব হইতেই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি মনে করিয়াই নাথদের মধ্যে নাদবিন্দুর উপাসনা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। যোগক্রিয়ার সাহায্যে নাথসাধক উপাসনা করিয়া থাকেন। এই ধর্ম্মে এক

মাত্র পরব্রহ্ম স্বীকৃত হইয়াছে, এবং সেই পরব্রহ্মকে জগন্নাথ, নাথ, নিরঞ্জন প্রভৃতি আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

নাথ শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। অধ্যাপক ডক্টর বেণী মাধব বড়ুয়া বলেন—"* * * নাথ আখ্যা, নাথ ধর্ম্ম, নাথ সমাজ ও নাথ গুরুদিগের উৎপত্তি ও বিশেষত্ব কি তাহা অনুধাবন করিয়া দেখিতে হয়। নাথ আখ্যার উৎপত্তি ও বিশেষত্ব বুঝিতে হইলে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে এই আখ্যা আদিনাথ, মৎস্যেন্দ্রনাথ, মীননাথ, গোরক্ষনাথ ও বিন্দুনাথ এই কয়েকজন প্রসিদ্ধ নাথ-গুরুদিগের এবং পুরাকালে ঋষভদেব বা আদিনাথ, অজিতনাথ, সম্ভবনাথ প্রভৃতি ১৭ জন জৈন তীর্থঙ্করের নামের সহিত যুক্ত। বর্দ্ধমান বা মহাবীরের স্বামী জৈনদিগের চরম তীর্থঙ্কর বলিয়া সুপরিচিত। তীর্থঙ্করদিগের তালিকায় তাঁহার নামের সহিত নাথ আখ্যাযুক্ত হয় নাই। পার্শ্বনাথ বা পরেশনাথ মহাবীরের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী জৈন তীর্থঙ্কর। আধুনিক সময়ে জৈনগণ নাথ আখ্যা 'স্বামী' অর্থেই গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু পূর্ব্বে নাথ আখ্যায় ঠিক স্বামী অর্থ জ্ঞাপন করিত কি না তাহা বিচারসাপেক্ষ। আচারাঙ্গ ও সূত্রকৃতাঙ্গ প্রভৃতি জৈন আগম ভক্ত সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থসমূহের তীর্থঙ্কর পার্শ্বের নামের সহিত নাথ আখ্যাযুক্ত দেখা যায় না। তন্মধ্যে তাঁহাকে শ্রমণকুমার পার্শ্ব নামে অভিহিত করা হইয়াছে। আগমগ্রন্থসমূহের সর্ব্বত্র মহাবীর বৈশালীবাসী বর্দ্ধমান নিগগন্থ নায়পুত্ত আখ্যায় অভিহিত হইয়াছেন। বৌদ্ধ ত্রিপিটক গ্রন্থে ও অর্থকথা সমূহে তিনি "নিকণ্ঠ নাতপুত্ত" নামে আখ্যাত হইয়াছেন। পরবর্ত্তী অর্থ কথার মধ্যে একমাত্র সুত্র নিপাতের অর্থ কথায় 'নাতের' পরিবর্ত্তে 'নাথ' বানান পরিদৃষ্ট হয়। কবি ভবানীদাস বিরচিত 'ময়নামতীর গানে' ও 'নাত' এবং 'নাথ' উভয় বানান অবলীলাক্রমে ব্যবহৃত হইয়াছে। মহাবীর 'নায়পুত্ত' 'নাতপুত' আখ্যা কোথা হইতে পাইলেন? জৈন এবং বৌদ্ধ উভয় শ্রেণীর

গ্রন্থের মতে 'নায়' বা নাথ' তাঁহার কৌলিক উপাধি মাত্র। তিনি বৈশালী অঞ্চলের যে কাশ্যপ গোত্রীয় ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণ করেন তাহা 'নায়', 'নাত' বা 'নাথ' নামে পরিচিত ছিল। পরবর্ত্তী সংস্কৃত জৈন গ্রন্থসমূহে এই প্রাকৃত বা পালি আখ্যা সংস্কৃত জ্ঞাত ও জ্ঞাতৃক অর্থেই গৃহীত হইয়াছে। এই যে ধ্বনিগত পরিবর্ত্তন,—ইহা প্রাচীন জৈন গ্রন্থসমূহের মধ্যে যে একটা অর্থের ধারা এবং পরে বৌদ্ধগ্রন্থসমূহের সেই ধারার যে প্রতিচ্ছায়া পরিদৃষ্ট হয়—তাহার সঙ্গে সঙ্গে সংঘটিত হইয়াছে। জৈন গ্রন্থসমূহে নালি 'নাথ' শব্দের অনুযায়ী প্রাকৃত 'নায়' শব্দটী যেই অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, বৌদ্ধ-গ্রন্থসমূহে 'নাথ' শব্দ ঠিক সেই অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। "ভিক্ষুগণ" সনাথ হইয়া বিচরণ কর, অনাথ হইয়া নহে।". বুদ্ধঘোষের মতে বুদ্ধের এই উক্তির সনাথ শব্দের অর্থ জ্ঞাতিসহ, বহুল 'জ্ঞাতি বর্ণ সমন্বিত হইয়া (সজ্ঞাতকা বহুল জ্ঞাতি বগ্‌গানুত্বা)। এই ব্যাখ্যা হইতে বুঝা যাইতেছে, নাথ শব্দের অর্থ জ্ঞাতি। পূর্ব্বোক্ত উক্তির প্রসঙ্গে বুদ্ধ দশবিধ নাথকরণ ধর্ম্মের বা নাথ উল্লেখ অর্থ আত্মপ্রতিষ্ঠা কর। ধর্ম্ম (অত্তপতিটঠা করো ধর্ম্মো *)। বুদ্ধকথিত দশবিধ নাথ করণ ধর্ম্ম বা নাথধর্ম্ম আলোচনা করিলে তন্মধ্যে নাথ শব্দের জ্ঞাত অর্থাৎ সুশিক্ষিত, সুভদ্রা এবং শাস্ত্রবিৎ ও তত্ত্বজ্ঞ অর্থ নিহিত আছে, দেখা যায়। তাঁহার কথিত মতে নিম্নোক্ত দশবিধ ধর্ম্মই নামকরণ ধর্ম্ম :—

(১) সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিনয়বিধান মতে শীলাচার শিক্ষা

(২) বাহুশ্রুত্য বা বহুশাস্ত্র জ্ঞান

(৩) কল্যাণ মিত্রতা

---

* ধর্ম্মপদের অত্তবগগের এক শাখার মধ্যেও এই অর্থটি ব্যক্ত হইয়াছে :—
"অত্তা হি অত্তোনোনাথো কোহি না থোপয়োসিয়া। অত্তনাব সুদন্তেন নাথং লভতি দুল্ল‌ভং।। নাথো পতিটঠা (অর্থসথা)

হইবে, ন—অথ বিদ্যতে যস্য সঃ নাথঃ—অর্থাৎ যাঁহার কোন 'অথ' নাই তিনিই নাথ। সংস্কৃতে কোন কোন প্রবন্ধ বা গ্রন্থারম্ভে 'অথ' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। 'অথ' শব্দের অর্থ 'অনন্তর' বা 'পরে'। যেমন "অথ ভাসুরকোনাম সিংহ প্রতিবসতিস্ম" এখানে 'অথ' প্রবন্ধ প্রারম্ভে ব্যবহৃত হইয়াছে। 'অথ সঃ মন্দং মন্দং গত্বা দিবাবসানে সিংহসমীপমুপস্থিতঃ' এখানে অথ মানে অনন্তর। আমাদের দেশের ঋষিগণ দর্শন শাস্ত্রের প্রথমে 'অথ' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। যেমন—'অথেৌতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা' 'অথাতঃ তত্ত্বজিজ্ঞাসা' এ 'অথ' শব্দের অর্থও অনন্তর। অর্থাৎ শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দঃ, জ্যোতিষ ইত্যাদি বেদাঙ্গের পাঠ সমাপ্ত হইলে এবং বেদের মন্ত্রভাগ সমাপ্ত হইলে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা বা তত্ত্বজিজ্ঞাসা, অর্থাৎ বেদের অন্ত বা উপনিষদের শেষ প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা ইহাই। সুতরাং, যাঁহার কোন জিজ্ঞাসা নাই—যিনি যোগাভ্যাস করিয়া প্রত্যক্ষ সত্যকে উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনিই নাথ বা সর্ব্বজ্ঞঃ যোগীরাট্। যোগশাস্ত্রেও এই অর্থ পাওয়া যায়—

"তদানন্দময়ো যোগী জ্ঞানকায়ো মহোদয়ঃ।
অব্যয়ো নিষ্কলো ব্যাপী শিবস্ সর্ব্বগতোবিভুঃ ॥
বিশুদ্ধ জ্ঞানদেহোঽসৌ নিরজোগুণর্জ্জিতঃ।
সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বগোণিত্যঃ সর্ব্বথোপি মহোদয় ॥
মহোদয়ো মহাকায়ো অব্যয়ো নিষ্কলো বিভুঃ।
ব্যাপী নিরঞ্জনো দেবঃ যোগী সর্ব্বগতোবিভুঃ ॥"

সিদ্ধা বিরূপাক্ষ নাথ বিরচিত 'অমৃতসিদ্ধযোগে' মহানির্ব্বাণ বিবেক সিদ্ধ যোগীর উক্ত অবস্থা বর্ণিত আছে। শিবভাষিত যোগবীজে আছে—

"জিত্বা পৃথ্ব্যাদিকং জাড্যং খেচর সম্ভবেন্নরঃ।
সর্ব্বজ্ঞোঽসৌ ভবেৎ কামরূপঃ পবন বেগবান্।

সর্ব্বকর্ত্তাচ যোগীন্দ্রঃ স্বতন্ত্রে বিশ্বরূপবান্।
জীবন্মুক্তো মহাযোগী জায়তে নাত্র সংশয়ঃ।”

সুতরাং যিনি সর্ব্বজ্ঞ, যাঁহার ইহার পর জ্ঞাতব্য বলিয়া আর কিছু নাই, অর্থাৎ “ন—অথঃ” আছে যাঁর, তিনিই নাথ। আগে শব্দ, তারপর ব্যাকরণ; আগে ব্যাকরণ তারপর ভাষা নহে।

জ্ঞাত শব্দ হইতেও ‘নাথ’ শব্দের উৎপত্তি হইতে পারে। জৈন ধর্ম্মগুরু মহাবীরকে নিগগন্ত ‘নাথ পুত্ত’ বলা হয়। প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত জুলিয়েন (Julien) সাহেব জ্ঞাতি শব্দ হইতে ‘নাথ’ শব্দ আসিয়াছে বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। বর্ধমান জ্ঞাতি ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণ করেন, সুতরাং তিনি জ্ঞাতি পুত্র বা নাথ পুত্ত। যদি ‘জ্ঞাতি’ হইতে ‘নাথ’ হইতে পারে, তাহা হইলে ‘জ্ঞাত’ হইতে ‘নাথ’ শব্দের উৎপত্তির সম্ভাবনা আরও অধিক। ‘জ্ঞাত’ অর্থে যিনি তত্ত্ব, ব্রহ্ম বা সত্য জানিয়াছেন, তিনিই ‘জ্ঞাত’ বা ‘নাথ’।

‘নাদ’ শব্দ হইতে ‘নাথ’ উৎপন্ন হইতে পারে। নাথ সন্ন্যাসিগণ গলদেশে ‘নাদবিন্দু’ ধারণ করেন। বিন্দুধারণ ও নাদ শ্রবণ কায়িক সাধনের একটি বিশেষ অঙ্গ। বিভিন্ন যোগশাস্ত্রে ও উপনিষদে ‘নাদবিন্দু’ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা দৃষ্ট হয়। নাদ + স্থ = নাদস্থ = নাত্থ = নাথ। যিনি নাদে স্থিত—তিনি নাদস্থ। নাদস্থ শব্দের অপভ্রংশ ‘নাত্থ’ এবং ‘নাত্থ’ হইতে ‘নাথ’ আসিতেও পারে। নাথ শব্দ অনাহত হইতেও উৎপন্ন হইতে পারে। অনাহত ধ্বনি শ্রবণ যোগের একটি বিশেষ অঙ্গ। কালক্রমে অনাহতের ‘অ’ চলিয়া গিয়াছে, এবং ‘নাহত’ শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে, এবং ‘নাহত’ হইতে ক্রমে ‘নাথ’ শব্দের উদ্ভবও একান্ত সম্ভবপর। যেমন সংস্কৃত ‘উপানহ’ শব্দ হইতে কালে ‘পানহ’ এবং পরে ‘পানাই’ (জুতা) শব্দ আসিয়াছে। ‘নদ্ধ’ শব্দ হইতেও নাথ হইতে পারে। বঙ্গদেশের বজ্রযোগিগণ যুগনদ্ধের সাধনা করিতেন। সুতরাং নদ্ধ হইতে ‘নাথ’ আসিতে পারে। কিন্তু আমরা জানি ‘বদ্ধ’ হইতে

'বাই' ইত্যাদি হইতে পারে। 'বার্থ' এরূপ হয় না। নদ্ধ হইতে খুব সম্ভব নেড্ডা নেড্ডী (বাউল নেড়া নেড়ী) শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। গুরু কৃষ্ণাচার্য্যপাদের দোঁহাকোষে 'নাথ' শব্দ 'নাহু' রূপে দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

"জে কি অ নিচ্চল মনবরণ(নি অ ঘরণী) লই এথ।
সো বাজির নাহুরে মন্নি বুত্ত পরমথো॥" ৩১ (১)

'নাহ' শব্দও এক শ্লোকে আছে—

"বিন্ন বিবজ্জি অ জ্জোও বর্জ্জুই।
অচ্ছ হি সিরি গুরু নাহ কহিজ্জই।"

অধ্যক্ষ ডাঃ শহীদুল্লা সাহেব ও অধ্যাপক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'নথু' হইতে 'নাথ' আসিয়াছে বলিয়া শূন্য পুরাণের ভূমিকায় দেখাইয়াছেন। দোঁহাকোষে 'ন্নথু' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে—

"জ্জোন্নথু নিচ্চল কি অর্ড মন সো ধনক্কর পাস।
পবন হো বজ্জঝই তকৃখনে বিসয়া হোন্তি নিরাস॥
—(শাস্ত্রী প্রকাশিত দোঁহাকো

টীকাকার এখানে ন্নথু শব্দে 'পুরুষ' লইয়াছেন। শাস্ত্রী মহা 'নাথ' হইবে কি না প্রশ্ন করিয়াছেন। কিন্তু অধ্যক্ষ ও অ নিঃসন্দেহে 'ন্নথু' অর্থে 'নাথ' ধরিয়া লইয়াছেন।

'নস্থ' শব্দ হইতে 'নাথ' শব্দ হইয়াছে কি না তাহাও বিবেচ্য। ন তিষ্ঠতি ইতি নস্থ, যেমন ন গচ্ছতি ইতি নগ শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। যিনি এক স্থানে থাকেন না তিনিই 'নস্থ' বা 'নাথ'। বৈদিকযুগে চতুর্থাশ্রমে প্রবেশ করিলে তাঁহাকে যতি বলা হইত। তিনি কোথাও বহুদিন অবস্থান করিতেন না, দেশে দেশে উপদেশ দিয়া বেড়াইতেন। (ন—স্থা ধাতু + ড)। ন্যাস হইতে

(১) ইহার মোটামুটী অর্থ এই যে—যে হেথায় নিজ ঘরণী লইয়া মনোরত্ন নিশ্চল করিল, সে যে বজ্রধর নাথ। আমি পরমার্থ বলিলাম।

'নাথ' আসিয়াছে কি না তাহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে। চতুর্থাশ্রমের নাম সন্ন্যাসও ছিল।

'নাথ' শব্দ ইংরাজী Gnostic নষ্টিক হইতেও আসিতে পারে। ইংরাজি Gnostic শব্দ গ্রীক Knostikos হইতে উৎপন্ন। কালক্রমে Knostiko নষ্টিকো নাথ শব্দে পর্য্যবসিত হইয়াছে। 'মস্তক' হইতে 'মাথা' ও পরে 'মাথ' আসিয়াছে, 'হস্ত' হইতে 'হাত' ইত্যাদি সৃষ্টি হইয়াছে, তেমনই 'Knostikos' হইতে 'নাথ' হইতে পারে।, এই Gnostic বহু পুরাকাল হইতে গ্রীক, মিশর, ব্যাবিলন রাজ্যে বিদ্যমান ছিলেন। ইংরাজি অভিধানে Gnostic শব্দের অর্থ এইরূপ—"Gnostic = One having esoteric spiritual knowledge; of the Gnostics, occult mystic—তত্ত্ববিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা ও যোগবিদ্যায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে Gnostic বলা হইত। ইহাদের মতে nou (নিরঞ্জন?) হইতে এই সৃষ্টি। Nou শব্দ 'জ্ঞা' ধাতুর অপভ্রংশ মাত্র। প্রাচীন খৃষ্টানদিগকে Gnostic বলা হইত। খৃষ্টান 'Gnostic' দের মতে Jesus Christ বা প্রভু যীশু বা ঈশা প্রথম Gnostic। ভারতীয় যোগী সন্ন্যাসীদিগের সহিত গ্রীসের Gnostic দের যোগাযোগ ছিল, এবং গ্রীক 'Knostikos' সংস্কৃত ধাতু 'জ্ঞা' হইতে উৎপন্ন বলিয়া মনে হয়" (যোগিসখা, মাঘ—চৈত্র, ১৩৫৩ বাং)।

যিনি যোগাভ্যাস করিয়া প্রত্যক্ষ সত্যকে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে পারেন, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তাঁহার জানিবার বুঝিবার শিখিবার আর কিছুই থাকে না—তিনিই নাথ [প্রভু, গুরু, স্বামী, লর্ড (Lord)]।

দোঁহাকোষের টীকাকার নাথ অর্থে—"কায়—বাক—চিত্ত—প্রভু" ধরিয়াছেন। সংস্কৃত ও বাঙ্গালাতে 'নাথ' শব্দে এই অর্থই বুঝা যায়। "নাথ অর্থে সদ্‌গুরু নাথ" এবং গুরু বুঝাইতে এই শব্দটী চর্য্যাতেও ব্যবহৃত হইয়াছে যথা—ভন্তিন পুচ্ছসি নাহ" (চর্য্যা—১৫) এই গুরু-পরম্পরা প্রচারিত বিশিষ্ট মতবাদই

নাথধর্ম্মের বিশেষত্ব। চর্য্যাতেও ধর্ম্মার্থে গুরুকে অনুসরণ করিতে নির্দ্দেশ দেওয় হইয়াছে (চর্য্যাপদ ১ পৃঃ)

অধ্যাপক তমোনাশ চন্দ্র দাসগুপ্ত, এম-এ, পি-এইচ-ডি বলেন—

"নাথধর্ম্ম ভারতীয় ধর্ম্মের ইতিহাসে এক অভিনব ব্যাপার। এই নাথধর্ম নাথ উপাধিবিশিষ্ট যুগীজাতির মধ্যে উদ্ভূত হইয়া একদা সমগ্র ভারতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। যে যুগে মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মের কঙ্কালস্বরূপ তান্ত্রিক বৌদ্ধ-ধর্ম্ম দারুণ ব্যাধির ন্যায় ভারতের সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, যে যুগে শৈব হিন্দুধর্ম্ম ধীরে ধীরে মস্তকোত্তোলন করিয়া ইহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল, সেই ঘোর ধর্ম্মকলহের দিনে (১০ম—১১শ শতাব্দীতে) নাথধর্ম্ম আবির্ভূত হইয়া (৩) কলহপরায়ণ ধর্ম্মদ্বয়ের মধ্যে মিলন সংস্থাপন করিয়া শান্তিবারি-সেচনে প্রয়াসী হইয়াছিল। * * * আলোচ্য ধর্ম্মকে নাথধর্ম্ম বলে কেন তাহা কঠিন প্রশ্ন। সম্ভবতঃ এই ধর্ম্মের নেতৃবৃন্দ সকলেরই নাথ উপাধি ছিল বলিয়া নাম নাথধর্ম্ম হইয়া থাকিবে। এই নেতাগণ সিদ্ধাই বা সিদ্ধ বলিয়া প্রসিদ্ধ। * * * সিদ্ধাইগণের মধ্যে যে চারিজন সমধিক খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম মীননাথ, গোরক্ষনাথ, কানুপা বা হাড়িফা। * * * নাথধর্ম্ম তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্ম ও পৌরাণিক শৈবধর্ম্মের মধ্যে মিলনপ্রয়াসী হইয়াছিল বলিয়া উভয় ধর্ম্মের সারাংশ নিজ অঙ্গভুক্ত করিয়া ফেলিয়াছে। * * * নাথধর্ম্মের সহিত শৈবধর্ম্মের যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য দেখা যায়। নাথধর্ম্মে শিবের কথা ভক্তি সহকারে উল্লিখিত আছে" (ইতিহাস ও আলোচনা—শ্রাবণ, ১৩২৮ বাং)।

অধ্যাপক ডাঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম-এ, পি-এইচ-ডি বলেন,—

"অথর্ব্ববেদে যে মন্ত্র-তন্ত্রে বহুল শিবধর্ম্মের প্রাধান্য দেখা যায়, নাথধর্ম্ম তাহা

(৩) আমরা পরে দেখাইতেছি, ১০ম, ১১শ শতাব্দীতে নাথধর্ম্ম জনসমাজে প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিল। সম্ভবতঃ ৩য় ৪র্থ খৃঃ অব্দে নাথধর্ম্ম বঙ্গে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। আদিম নাথধর্ম্মের উদ্ভবকাল ১ম বা ২য় খৃঃ অব্দ বলিয়া অনুমিত হয়।

হইতে প্রসূত। মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মের শাখা-প্রশাখাগুলি হইতে নাথ-ধর্ম্মের জীবনীশক্তি যে অনেক বেশী ছিল, তাহার প্রমাণ এই যে, বর্ত্তমানে বৌদ্ধধর্ম্মের শাখা-প্রশাখাগুলি লুপ্তপ্রায়। দুই একটি নাম ভাড়াইয়া কোনমতে আত্মরক্ষা করিতেছে; কিন্তু নাথধর্ম্ম এখনও বর্ত্তমান; নাথ-সম্প্রদায় অব্যাহতভাবে এখনও ভারতের (পাকিস্তানসহ) সর্ব্বস্থানে বিরাজ করিতেছে, এবং বাংলা দেশে রাজকোপে ইহারা সমাজে পৃথক হইয়া পড়িয়া থাকিলেও সংখ্যায় এবং ক্ষমতায় তাঁহারা এখনও নগণ্য নহেন। চৈতন্যের প্রেমবন্যায় বৌদ্ধধর্ম্মের শাখা-প্রশাখাগুলি ভাসিয়া ডুবিয়া গিয়াছে। কিন্তু নাথ উপাধিধারী জনসমূহ এখনও সগৌরবে তাঁহাদের স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া চলিতেছেন। নাথ-ধর্ম্মের জীবনীশক্তির ইহার চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি হইতে পারে (?)" (ময়নামতীর গান—ভূমিকা)। ভট্টশালী মহাশয় আরও বলেন,— "মীনচেতন ও গোরক্ষবিজয়ের কাহিনী অনুধাবন করিলে সন্দেহমাত্র থাকে না যে, খাঁটি নাথ-পন্থ গোরক্ষনাথের সৃষ্টি। তিনিই নাথপন্থকে প্রকৃত প্রস্তাবে শিবমার্গী ও যোগপন্থী করিয়াছিলেন" (গোপীচাঁদের সন্ন্যাস—সম্পাদকীয় মন্তব্য; ৬৬ পৃঃ ৩য় স্তম্ভ)। তিব্বতীয় ভাষার 'পগসাম জোন জং' গ্রন্থের ১০৫ হইতে ১২২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, গোরক্ষনাথের সম্প্রদায় নাথ নামে পরিচিত এবং এই সম্প্রদায় যোগী সম্প্রদায়রূপে এখনও বর্ত্তমান আছে। (সিদ্ধাকানুপার গীত ও দোহা)।

অধ্যাপক ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন—"The Shahajiya sect of Bengal had unquestionably some connections with the Sivaite Natha or Yogi sect which originated in Northern India as an expression of a revived Hinduism during the beginning of the second Millenium A. C. The History of the origin of this sect is shrouded in mystery and a great deal of the religious, social and literary life of Northern India will have

a light thrown on it when we come to know the story of the origin of Nathpanth and about the personality of Gorakh Nath" (History of Bengali Literature, page 120) ।

অর্থাৎ খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর পর উত্তর ভারতে হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের প্রতীকস্বরূপ যে যোগিসম্প্রদায়ের বা শৈব নাথ-সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছিল, তাঁহাদের সহিত বঙ্গীয় সহজিয়া সম্প্রদায়ের নিশ্চিত যোগসূত্র ছিল। এই সম্প্রদায়ের জন্মকাল রহস্যাবৃত নাথপন্থের এবং গোরক্ষনাথের উৎপত্তির বিবরণ জানিতে পারিলে, ঐ সময়কার উত্তর ভারতের সামাজিক, সাহিত্যিক এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অনেক তথ্যের উপর আলোকসম্পাত হইবে (বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস—১২০ পৃঃ) ।

কর্ণেল উপেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী বলেন—"The Yogis have successfully contested with the Brahmins. Now the class of people occupying a social position lower than that of the Brahmins is known to have contested the superiority of the Brahmins. Yogis also would never have dared to enter into any contest with the Brahmins had they not been convinced of the fact that their origin was in no way inferior to that of the Brahmins." (Dying Race)

অর্থাৎ যোগিজাতি কৃতকার্য্যতার সহিত ব্রাহ্মণদের সহিত বিবাদ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ অপেক্ষা সামাজিক মর্য্যাদায় হীনতর আর কোনও জাতি, ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য অস্বীকার করিয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই। ব্রাহ্মণদের উৎপত্তি অপেক্ষা যোগিজাতির উৎপত্তি কোনও অংশে হীন নহে, এ বিষয়ে তাঁহাদের স্থির বিশ্বাস না থাকিলে তাঁহারা কখনই ব্রাহ্মণদের সহিত বিরোধ করিতে সাহসী হইতেন না। (ডাইং রেইচ—ধ্বংসোন্মুখ জাতি)

অধ্যাপক ডাঃ সুকুমার সেন বলেন—"ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র গৃহস্থ যোগীরা প্রধানতঃ তাঁতের কাজকেই জাতি-ব্যবসায় করে নিয়েছে। এঁদের সামাজিক

আচার-ব্যবহারে কিছু কিছু স্বাতন্ত্র্য আছে। যেমন ব্রাহ্মণের প্রাধান্য অস্বীকার এবং শব-সমাধিরীতি। নাথপন্থীদের ব্রাহ্মণ্যবিরোধ আজিকার নয়, গোড়া থেকেই আছে" (কল্যাণশ্রী—শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৫৫ বাং, নাথপন্থের দিশা)।

অধ্যাপক ডাঃ বেণীমাধব বড়ুয়া বলেন—"* * * সন্ন্যাস গ্রহণ এবং যোগসাধনের দ্বারা মোক্ষলাভ করাই এই সমাজের চরম লক্ষ্য ছিল। এই সমাজের ধর্ম্মোপদেষ্টা বা কুলগুরুগণ স্মৃতি শাস্ত্রকার ও গণক ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় গার্হস্থ্য ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন না। এই সমাজের ধারণায় ইহার ধর্ম্মোপদেষ্টা কুলগুরুগণ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ ছিলেন, এবং ইহার আপামর সাধারণ সকলেরই এই উচ্চপদ লাভের অধিকার ছিল। বল্লালচরিত হইতে যে সকল আভাষ পাওয়া যায়, তাহাতে অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই যে, খৃষ্টীয় একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে নাথপন্থী যোগিসন্ন্যাসিগণ রুদ্রজ ব্রাহ্মণরূপে গৌড়, বঙ্গ ও ত্রিকলিঙ্গের সর্ব্বত্র সমাদৃত হইতেন। তাঁহাদিগের দ্বারা পূজাকার্য্য সম্পাদন করাইতে পারিলে সকলে চরিতার্থ বোধ করিতেন। বৌদ্ধ, রামাৎ-ধর্ম্ম প্রভৃতি সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের লোকেরা মৎস্যেন্দ্রনাথ প্রমুখ নাথ নামধেয় সিদ্ধ যোগিপ্রবরগণের আদর্শ অবনত মস্তকে স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। * * * আজ নাথসমাজ নাথগুরুগণকে ভুলিয়া বৈষ্ণব গোস্বামীদের শরণাপন্ন হইয়াছে, গোরক্ষসংহিতা ছাড়িয়া শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। যে সকল নাথ যোগিপ্রবরের দীক্ষায় ইহার প্রাণস্পন্দন ও হৃদয়ের অনুভূতি, এবং যাঁহাদের জীবন, চরিত্র, শিক্ষা ও সাধন-মাহাত্ম্য হিন্দু-মুসলমান কবিগণ বর্ণনা করিয়া ধন্য হইয়াছেন, তাঁহাদের কথা নাথ-যোগিগণ স্মরণ করে না। * * * ইহা নিশ্চিত যে, শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব প্রবর্ত্তিত পরম প্রেমরূপ ভাগবতধর্ম্ম এবং সর্ব্বপাপ-তাপহর, ভয়ভৈরব বারণকর সুমধুর হরিনাম গ্রহণ এবং বৈষ্ণব ভাবাপন্ন হওয়ার পূর্ব্বে এই সমাজের লোক-সকল মৎস্যেন্দ্রনাথ, মীননাথ, গোরক্ষনাথ ও বিন্দুনাথ প্রভৃতি নাথপদবীবিশিষ্ট

ভারতবিশ্রুত সিদ্ধযোগিরাজগণের উপাসক ছিলেন। তাঁহাদের ধর্ম্মমতে দীক্ষিত হইয়া এই সমাজের নরনারী যোগী ও যোগিনীবেশে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস-ব্রত অবলম্বন করিতেন।

* * * * *

যোগিজাতি প্রাক্ বৌদ্ধ সময় হইতে তাহার নিজের একটী স্বাধীন সত্তা সামাজিক শত পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়াও অদ্য পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। উহা কম গৌরবের বিষয় নহে। হিন্দুসমাজ কত শ্রেণী পরিবর্ত্তনের আবর্ত্তে পড়িয়া নিজ নিজ সত্তার অস্তিত্ব লোপ করিয়া দিয়াছে; কিন্তু এই শ্রেণী তাহার সবগুলি বিশেষত্ব বজায় রাখিয়াছে। ব্রাহ্মণিক উন্নতির উপর এই জাতির উন্নতি নির্ভর করে নাই। এই জাতি নিজেই স্বতন্ত্রভাবে তাহার উন্নতি সাধন করিয়াছে। অপর কোন জাতির গলগ্রাহী কিংবা মুখাপেক্ষী হইয়া তাহাকে সমাজে জীবিত থাকিতে হয় নাই" (বঙ্গীয় যোগিসমাজের মর্ম্মস্থল, প্রাণস্পন্দন ও গতিবিধি)।

"বাঙ্গালা দেশে এককালে নাথধর্ম্মের খুব প্রভাব ছিল। আজও অনেক যোগী নাথধর্ম্মাবলম্বী। এই নাথধর্ম্মের উৎপত্তি বাঙ্গালার স্বাধীনতার যুগেই হইয়াছিল। গোরক্ষনাথ বাঙ্গালায় নাথধর্ম্মের প্রচার করেন। * * * নাথধর্ম্মের গোরক্ষনাথকে লইয়া আমাদের ময়নামতীর গান রচিত।" (পৃথিবীর ইতিহাস—সোনার বাঙ্গালা খণ্ড, ১৭৯ পৃঃ)। "নাথেরা বাঙ্গালা দেশে নানা জাতি হইতে বহু শিষ্য গ্রহণ করিয়া শিক্ষাদীক্ষা দ্বারা তাহাদিগকে উন্নত করার চেষ্টা করিতেন" (যশোহর খুলনার ইতিহাস)। পণ্ডিত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—"রাঢ়েই তিনি (গোরক্ষনাথ) শৈবধর্ম্ম প্রচার করেন। * * * নাথ-সম্প্রদায়ের প্রভাবে বাঙ্গালায় বহু শিব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। * * * গোরক্ষনাথ হিন্দু ও বৌদ্ধতন্ত্রের সমন্বয় সাধন করেন" (প্রবাসী—অগ্রহায়ণ, ১৩২৯ বাং)।

Mr. J. N. Farquhar সাহেব বলেন—"Goraksha was a noted Yogi. He founded his sect somewhere about 1200 A. D. (Amritanubhaba of Jnaneshwara) অর্থাৎ গোরক্ষনাথ একজন প্রসিদ্ধ যোগী ছিলেন। ১২০০ খৃঃ অব্দে তিনি তাঁহার সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি আরও বলেন—"Both Tantric Hinduism and Tantric Buddhism glorify the whole company of Sainted Naths". (An outline of the Religious literature of India. Page—254) অর্থাৎ তান্ত্রিক হিন্দুধর্ম্ম ও তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্ম উভয়েই নাথসিদ্ধাগণের সকলকেই মহিমোজ্জল করিয়া থাকে। মিঃ বি. এইচ্ হড্সন সাহেব বলেন—"Mytsyendra Nath is the introducer of Nathism into Buddhism" অর্থাৎ মৎস্যেন্দ্রনাথ বৌদ্ধধর্ম্মে নাথধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করেন। তিনি আরও বলেন—"গোরক্ষনাথের নাথধর্ম্ম ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধধর্ম্মের সংযোজক সেতুস্বরূপ।" কি হিন্দু, কি বৌদ্ধ, কি ব্রাহ্মণ, কি শ্রমণ—সকলেই অবনত মস্তকে গোরক্ষনাথের শিষ্যত্ব স্বীকার করিতেন (জার্ণেল অব দি এসিয়াটিক সোসাইটি অব্ বেঙ্গল—১৮শ খণ্ড)। গোরক্ষনাথকে বৌদ্ধেরা নিজেদের সিদ্ধপুরুষ বলিয়া প্রচার করেন বটে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি শৈবধর্ম্মের আচার্য্য ছিলেন (জার্ণেল অব দি এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল—১৮৭৮, ১৩৯ পৃঃ)।

স্যার্ জি. এ. গ্রীয়ারসন. কে-সি-আই-ই 'গোরক্ষনাথ' শীর্ষক প্রবন্ধে বলনে,—"প্রচলিত মতানুসারে গোরক্ষনাথ ভারতবর্ষীয় কানফাটা or split-eared যোগি-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। * * * তিনি শৈবধর্ম্মের একজন শ্রেষ্ঠ শিক্ষাগুরু ছিলেন। * * * নেপালকে মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবমুক্ত করিয়া শৈবধর্ম্ম তিনিই সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।"

বাঙ্গালার এসিয়াটিক্ সোসাইটির ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক জি. এস্. লিওনার্ড বলেন—"গোরক্ষনাথ কানফাটা যোগীদের ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা ও

প্রচারকর্ত্তা ছিলেন। এই ধর্ম্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল—একেশ্বরবাদ। ইহাকে ব্রহ্মবাদও বলা হইত। এই ধর্ম্মমতবাদ পরবর্ত্তী কালে শ্রেষ্ঠ বৈদান্তিক সর্ব্বজনমান্ত শঙ্করাচার্য্য ও আনন্দগিরি প্রভৃতি কর্ত্তৃক প্রচারিত হইয়াছিল। * * * গোরক্ষনাথরচিত "গোরক্ষসহস্র নাম" কানফাটা 'সম্প্রদায়ের ধারক।"

ইটালির বিখ্যাত গবেষক ডাঃ এল. পি. টেসিটারী বলেন,—"গোরক্ষনাথ কানফাটা যোগি-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। কানফাটা যোগীরা শৈব-সম্প্রদায়ের এক উপসম্প্রদায়। গোরক্ষনাথের নাম হইতে ইহারা 'দর্শনী' ও গোরক্ষপন্থী নামেও পরিচিত। * * * ইহা খুবই সম্ভবপর যে, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবের যুগে যোগীরা ইহার প্রভাব এড়াইতে পারেন নাই। গোরক্ষনাথই কানফাটা সম্প্রদায়কে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবমুক্ত করেন এবং উপনিষদের দর্শনের সঙ্গে তাঁহাদের ধর্ম্মমতের সামঞ্জস্য সাধন করেন। শঙ্কর হইতে গোরক্ষনাথ খুব পরবর্ত্তী কালের নহেন। গোরক্ষনাথ যে ব্রহ্মণ্যধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থানের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কানফাটারা শিবকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতা বলিয়া মান্য করেন। "গোরক্ষবোধে" ইহাদের সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। ইহাতে যে মত প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা করা হইয়াছে, তাহা শৈব ও যোগদর্শনের সংমিশ্রণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করার যথেষ্ট হেতু আছে। * * * গোরক্ষনাথের ধর্ম্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য— ইহার সার্ব্বজনীনতা; কারণ এই ধর্ম্মের দ্বার সকল জাতির লোকের নিকট উন্মুক্ত।"

("গবেষণা পরিষদ"—যোগিসখা ১৩৫৯, আষাঢ় হইতে সংগৃহীত।)

মিঃ হেষ্টিংস্ সাহেব বলেন—'গোরক্ষনাথ নেপালী বৌদ্ধদিগকে হিন্দুধর্ম্মে আনয়ন করেন' (Goraknath and Kanpathes in Encyclopaedea of Religions and Ethics by Mr. Hastings)। Mr. Geneseppe Tucchi সাহেব বলেন—Nath Siddhas tried to harmonise Buddhism and Hinduism অর্থাৎ নাথ সিদ্ধাগণ হিন্দুধর্ম্মের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের

সমন্বয় সাধন করিতে চেষ্টা করেন (জার্ণেল অব দি এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল—মার্চ্চ, ১৯৩১)। Mr. Sir Charles Eliot সাহেব বলেন—১৪শ শতকে নাথদের প্রাদুর্ভাব হয়। হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয়েই তাঁহাদিগকে পূজা করিত (Hinduism and Buddhism (1921) Vol. 2. page 117)। মার্কো পোলো সাহেব যুগী শব্দে যোগীদের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে যোগীরা ব্রাহ্মণ ধর্ম্ম-সম্প্রদায় (Marcopolo's Travels—Vol. 2, page 130)। 'বিশ্বকোষ' ধৃত 'যোগিন' শব্দেও এসব বিবরণ পাওয়া যায়। মিঃ টেলবয়েস্ হুইলার সাহেব বলেন—নাথেরা ব্রাহ্মণ। সকলেই তাঁহাদিগকে দেবতার ন্যায় পূজা করিত। রাজা মহারাজদের উপরও নাথদের বিশেষ প্রভাব ছিল (ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ ও নেপালের ইতিহাস)।

দেশবিদেশের পণ্ডিতমণ্ডলীর উপরোক্ত গবেষণামূলক আলোচনা হইতে ইহাই প্রমাণিত হইল যে—নাথেরা বৌদ্ধধর্ম্মে হিন্দুধর্ম্ম সংমিশ্রণ করিয়া হিন্দু-ধর্ম্মের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের সমন্বয় সাধন করিয়াছিলেন।

এক্ষণে নাথধর্ম্মের উদ্ভবকাল ও উহার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। বুদ্ধদেবের জন্মকাল হইতে সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্বকালকে বৌদ্ধযুগ বলে। বুদ্ধদেবের আনুমানিক সময়—৫৬৩ খৃঃ পূর্ব্ব হইতে ৪৮৩ খৃঃ পূর্ব্ব। আর সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্বকাল—৬০৫ হইতে ৬৪৭ খৃষ্টীয় শতাব্দী। তাহা হইলে বৌদ্ধযুগ দাঁড়াইল—৫৬৩ খৃঃ পূর্ব্ব হইতে ৬৪৭ খৃঃ অব্দ। হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্বকালে চীন দেশের বিখ্যাত পরিব্রাজক হুয়েন্‌সাঙ ভারতভ্রমণে আসিয়াছিলেন। তিনি ৬৩০ খৃঃ অব্দ হইতে ৬৪৪ খৃঃ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে ছিলেন। ভারতের অনেক বিবরণ তাঁহার প্রণীত "সিয়ুকী" গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। এই সকল বিবরণের মধ্যে নাথধর্ম্মের কথাও আছে (১)। যদি ৬৩০—৬৪৪ খৃঃ

(১) হুয়েনসাঙের লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায় যে সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধন প্রথমে শৈব ছিলেন এবং পরে বৌদ্ধধর্ম্মে অনুরাগী হন (সিয়ুকী গ্রন্থ)।

অব্দের পর নাথধর্ম্মের উদ্ভব হইত, তাহা হইলে নাথধর্ম্মের কথা 'সিয়ুকী' গ্রন্থে থাকিত না। আমরা ৫ম অধ্যায়ে দেখাইব যে, বাঙ্গালা রূপের উদ্ভবকাল ৫ম খৃঃ অব্দ এবং ইহার আদিম লেখক নাথধর্ম্মনায়ক মীননাথ বা মৎস্যেন্দ্রনাথ। এ সব বিচার করিলে এইরূপ অনুমানই যুক্তিসঙ্গত হইবে যে, ৩য় কি ৪র্থ খৃঃ অব্দে নাথধর্ম্ম বাঙ্গালায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল এবং ইহা জনসাধারণের উপর পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করিবার পর ১০ম। ১১শ খৃঃ অব্দে বিকৃত বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া জয়লাভ করিয়াছিল। কোন কোন পণ্ডিত বলিয়াছেন ১০ম। ১১শ খৃঃ অব্দে, আবার কেহ কেহ বলিয়াছেন ১২শ খৃঃ অব্দে নাথধর্ম্ম উদ্ভূত হইয়া বিকৃত বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। কিন্তু এরূপ উক্তি বিচারসহ বলিয়া মনে হয় না; কারণ একটি ধর্ম্ম উদ্ভূত হইয়া তখন তখনই আর একটি প্রাচীন সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইতে সাহসী হইবে এরূপ বিশ্বাস করা যায় না। অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ বলেন —"নাথপন্থ নামে একটি বড় ধর্ম্ম-সম্প্রদায় খৃষ্টীয় নবম শতকের শেষে প্রথমে বঙ্গদেশে প্রভুত্ব বিস্তার করে। তারপর ক্রমশঃ পূর্ব্ব-ভারতে পশ্চিম, মধ্য ও দক্ষিণ-ভারতে নাথ-সম্প্রদায় ধর্ম্ম প্রচার করিয়া শিষ্যশাখার পুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন। * * * নাথদের মধ্যে গোরক্ষনাথের প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক" (প্রবাসী—নাথপন্থ, ফাল্গুন, ১৩২৮ বাং)। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী দেখাইয়াছেন যে, ৮ম খৃঃ অব্দের শেষভাগে নাথধর্ম্ম বঙ্গে প্রবর্ত্তিত হয় (বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন—৮ম অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণী—২১।২২ পৃঃ)। তিনি আরও বলেন—একজন রুশ পণ্ডিত বলিয়াছেন; খৃষ্টীয় ৮০০ শত বছরের কাছাকাছি নাথেরা প্রবল হইয়া উঠে (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ত্রিপুরাশাখার ৫ম বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণ)। রুশ পণ্ডিতের এবং বিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রমুখ পণ্ডিতদের উক্তিই যুক্তিসঙ্গত; কারণ ১ম বা ২য় খৃঃ অব্দে যদি নাথধর্ম্ম উদ্ভূত হইয়া থাকে, এবং যদি ৩য় কি ৪র্থ খৃঃ অব্দে

ইহা বাঙ্গালায় (পাকিস্তান সহ) প্রবর্ত্তিত হয়, তবে ৭ম। ৮ম খৃঃ অব্দে ইহা জনসাধারণের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিবে, তাহা একান্তই সম্ভবপর। খৃষ্টীয় ১০ম। ১১শ শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যে লিঙ্গ বা রুদ্রোপাসক শৈব সম্প্রদায়ের পুনঃ প্রাদুর্ভাব হয়। তাঁহারা বৌদ্ধদিগকে উৎসন্ন করিয়া ভারতে হিন্দুপ্রাধান্য স্থাপনকল্পে শৈবধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করেন" (বিশ্বকোষ)। অধ্যাপক ডাঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী বলেন—"গোরক্ষ প্রচারিত শৈবধর্ম্মই নাথপন্থ নামে বিখ্যাত হইয়াছে" (গোপীচাঁদের সন্ন্যাস—সম্পাদকীয় মন্তব্য, ৬৭পৃঃ)। ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—"পূর্ব্ব দেশের অর্থাৎ বাঙ্গালার নাথধর্ম্ম শৈবধর্ম্মের প্রাবল্যের যুগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহা নাথগুরু গোরক্ষনাথের নব প্রতিষ্ঠান" (সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৩৩১ বাং, ২য় সংখ্যা)।

১ম বা ২য় খৃষ্টীয় শতাব্দীতে আদিম নাথধর্ম্মের উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। এই নাথযোগাচার-মত কপিল ও পতঞ্জলি ঋষির যোগেরই অনুকরণ মাত্র। ইহা কালে চীন দেশেও প্রচারিত হয় (Eitel's Hand book on Chinese Buddhism. Page 209)। এই সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী তিব্বতেও অনেক আছে (Journey to Lhasa and Central Tibet by S. C. Dass, C. I. E, page 241)। চীনদেশে এই নাথযোগাচার-মত যাঁহারা প্রচার করেন, তাঁহাদের মধ্যে নাথাচার্য্য অমোঘসিদ্ধ অন্যতম (Eitel. Page 132)। এ সম্বন্ধীয় ইঙ্গিত এড্‌কিন সাহেবও দিয়াছেন (Chinese Buddhism. Page 129)। গ্রীক পর্য্যটকেরা ভারতের ধর্ম্ম-সম্প্রদায়কে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিতেন। ইহাদেরই একজন ইবন বাটুটা চাণ্ডেল রাজপুতদের রাজধানী কাজুরা পরিদর্শনকালে (১৩৩৫ খৃঃ অব্দ) সে স্থান দীর্ঘ জটাধারী যোগিগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত ছিল বলিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন, সে সময় সে স্থান অধ্যাত্মবিদ্যার প্রধান নির্ভরযোগ্য স্থান ছিল (Cunningham, Vol. 2. Page 438)। Mr. Farquhar সাহেব মাদ্রাজের নাথদের সম্বন্ধে বলেন—

গোরক্ষনাথ-সম্প্রদায় শৈবধর্ম্মাবলম্বী, আবার তাঞ্জোরের আধুনিক ভাস্কর রায় সম্প্রদায় শাক্ত ধর্ম্মাবলম্বী। ১৮০০ খৃঃ অব্দে ভাস্কর রায় তাঞ্জোরের সভাপণ্ডিত ছিলেন (An outline of the Religious Literature of India)।

উল্লিখিত প্রত্নতাত্ত্বিক আলোচনাসমূহ হইতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে—অতি প্রাচীনকালে নাথধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত ও প্রচারিত হইয়াছিল এবং ইহার প্রভাব-প্রতিপত্তি ভারতের বাহিরেও বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল। নাথযোগীরা শৈব ছিলেন, বৌদ্ধ ছিলেন না। তাঁহারাই হিন্দুধর্ম্মের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের সমন্বয়সাধন করিয়া মরণোন্মুখ হিন্দুধর্ম্মকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

নাথধর্ম্মে সৃষ্টিতত্ত্ব ও বেদতত্ত্ব

ভারতের (পাকিস্তানসহ) আর্য্যবাণীকেই বেদ বলা হয়। বেদরচনার কালকে বৈদিক যুগ বলে। যীশুখ্রীষ্টের জন্মের আনুমানিক ২৫০০ কিম্বা ২০০০ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী কালকে বৈদিক যুগ বলিয়া ধরা হয়। আমাদের দেশে প্রসিদ্ধি আছে যে, আর্য্যেরা মধ্য-এশিয়া হইতে হিমালয় পার হইয়া ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এই মত সত্য নহে। আর্য্যগণ দেশ-দেশান্তরে বিস্তৃত হইয়া পড়িলেও ভারতের আর্য্যবাণী বেদ অপেক্ষা প্রাচীন কিছুই নহে। আর্য্যজাতির প্রাচীন গ্রন্থ ভারতেই নিবদ্ধ ছিল। অন্য কোথাও বেদের উৎপত্তি-প্রমাণ করিতে কেহই চেষ্টা করেন নাই। সুতরাং সভ্য আর্য্যজাতি যে ভারতেই অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় এবং ভারতবর্ষই যে আর্য্যজাতির আদি বাসস্থান, সে সম্বন্ধে সন্দেহ করা উচিত নহে। পাশ্চাত্য জগতের শ্রেষ্ঠ মনীষী ম্যাকস্‌মুলার, পাশ্চাত্য ভাষায় সর্ব্বপ্রথম পৃথিবীর ইতিহাসপ্রণেতা স্যার ওয়ালটার র‍্যালে প্রমুখ পণ্ডিতমণ্ডলী এই মতের সমর্থক। বেদ অপৌরুষেয় ও ঈশ্বরের বাণী বলিয়া হিন্দুরা বিশ্বাস করে।

এখন দেখা যাউক, নাথধর্ম্মে সৃষ্টিতত্ত্ব, নিরঞ্জনতত্ত্ব ও বৌদ্ধধর্ম্মতত্ত্ব বেদের সহিত সাদৃশ্যযুক্ত কি না।

১৩৩১ বঙ্গাব্দের ১৫ই ভাদ্র তারিখে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মাসিক অধিবেশনে "নাথধর্ম্মে সৃষ্টিতত্ত্ব" নামক একটি প্রবন্ধ পঠিত ও আলোচিত হয় প্রত্নতাত্ত্বিক ইঞ্জিনিয়ার শ্রীরাজমোহন নাথ, বি. ই. মহাশয় নাথধর্ম্মের তিনখানি প্রাচীন হস্তলিখিত বই অবলম্বনে এই প্রবন্ধটি লিখেন। কৌতূহলী পাঠকের অবগতির জন্য "নাথধর্ম্মে সৃষ্টিতত্ত্ব" প্রবন্ধ, সাহিত্য পরিষদ-পত্রিকা হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল *।

নাথধর্ম্মের বহুতথ্যপূর্ণ 'অনাদিপুরাণ' বা 'অনাদিচরিত্র', 'হাড়মালা গ্রন্থ', 'যোগিতন্ত্রকলা' প্রভৃতি কয়েকখানি 'কলমীপুঁথি' আমাদের হস্তগত হইয়াছে।

'যোগিতন্ত্রকলা'র ভাষা সংস্কৃত, তবে এ সংস্কৃতের ব্যাকরণ রচনা করিতে পাণিনিও একটু প্রমাদে পড়িবেন। বহিগুলি কখন এবং কাহার দ্বারা রচিত, বলা যায় না। তবে প্রত্যেক বহির শেষে লেখা আছে, ঐগুলি অন্য বহির নকল এবং পুঁথিলেখক 'যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং' বলিয়া রচনাতে কোনও ভুলত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন। 'যোগিতন্ত্রকলা' নিতান্ত আধুনিক বলিয়া মনে হয়। উহাতে নাথযোগিগণের—আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিত আছে।

সৃষ্টির পূর্ব্বে কি ছিল, এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রুতি ও বাইবেলে যাহা লিখিত আছে, নাথধর্ম্ম ইহার বেশী বিশেষ কিছু বলে নাই। প্রথমে শুধু 'নৈরাকার রাত্রি' ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। তখন,—

নাই আদ্য অনাদ্য না ছিল ধর্ম্মেশ্বর।
না ছিল বর্ম্মা বিষ্ণু শিব গঙ্গেশ্বর ॥

---

* উক্ত প্রবন্ধটি সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার ১৩৩১ সালের ২য় সংখ্যাতে (৮৩ পৃঃ) প্রকাশিত হইয়াছিল এবং উহা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ৩১শ বার্ষিক ১ম মাসিক অধিবেশনে পঠিত হইয়াছিল।

না ছিল চন্দ্র সূর্য্য স্বর্গে ইন্দ্র শর।
না ছিল আকাশ পাতাল ধরণী পবন ।।
না ছিল অগ্নি পাণি না ছিল ছুর্ত্তাসন।
না ছিল দরিয়া সাগর কুলাকুল ।।

কিন্তু সেই 'নৈরাকারে'র মধ্যে ছিলেন একজন ; তাঁর আদি-অন্ত 'রূপরেখা' নাই। তিনি 'উদয় না হইয়াছে না জাইর অন্ত'। তিনি সমস্ত স্থান ব্যাপিয়া আছেন। তিনি পরম গুণবান্, তিনি সকলের কর্ত্তা, সকলের দাতা এবং 'সমাই'কের (সকলের) পালক। তিনি 'সর্ব্বসৃষ্টিকর্ত্তা' ও সর্ব্বসংহারক।

কিন্তু তিনি কে? তার নাম কি?
"সেই আলোকনাথ আছয়ে ঈশ্বর।"

শ্রুতিতে ঈশ্বর ইচ্ছা করিলেন—'সৃষ্টি হউক'; আর সৃষ্টি হইয়া গেল। বাইবেলে পরমপিতা বলিলেন—'আলো হউক'; আর আলো হইয়া গেল। অনাদিপুরাণেও—

"হেনকালে আলোকনাথ কল্লিলেক মন।
সত্যযুগ সৃজিতে মনে হইল যেই খন।"

শ্রুতিতে 'নৈরাকার রাত্রির' গভীর অন্ধকার দূরীকরণার্থ প্রথমে আলো, আর বাইবেলে প্রথম জল এবং পরে আলো সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু নাথধর্ম্মে প্রথমে সত্যযুগ সৃজন করিয়া আলোকনাথের সৃষ্টি করার পক্ষে কি সুবিধা হইল—অনাদিপুরাণ সে বিষয়ে কিছু বলেন নাই। তারপর আলোকনাথ—"ইচ্ছাহলে 'অনাস্ত' সৃজিলা আচম্বিতে।" তাঁহার ইচ্ছা 'অনাদ্যের' উপর সৃষ্টি নির্ম্মাণের ভার অর্পণ করিবেন। অনাদ্যকে সৃজন করিয়া আলোকনাথ "নৈরাকার রাত্রি হলে দিবস নিকলিলা" ও "সাত দিবসের নাম নির্ণয় করিলা"। প্রথম বারের নাম সোমবার—সেই দিন অনাদির জন্ম হইয়াছিল। অনাদ্য

বা অনাদিধর্ম্ম নাম সৃষ্টি হইয়াই—'বলে মুই মুই'। ইহাতে আলোকনাথ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন,—

"মুই মুই করি কর্ব্ব বড় দাপ।
অখনে সৃজিছি তোরে আমি তর বাপ ॥"

এই অভিযোগের বিরুদ্ধে অনাদিরও অনেক বলিবার ছিল।

"অনাদি বলয়ে প্রভু সৃজিলা আমারে।
কিরূপে আছয়ে কথা না দেখি তুমারে ॥
হেটে চাইলু স্থল নাই উপরে নাই কে অ।
ধরিবারে লক্ষ্য নাই পুজিবারে দেয়।"

'হাড়মালা' গ্রন্থেও ঠিক এইরূপ কথা আছে। তবে সেখানে 'আলোকনাথ' নয়, তিনি নিরঞ্জন গোঁসাই। তিনি প্রথমে সত্যযুগ সৃজন করিবার প্রয়োজন দেখেন নাই।

তিনি প্রথমেই—

"মনেতে ভাবিয়া দেব চাহে চারিভিতে।
হেনকালে অনাদি জন্মিলা আচম্বিতে ॥" (৩)

সে যাহা হউক, অনাদির উত্তরে আলোকনাথ বা নিরঞ্জন গোঁসাই সন্তুষ্ট হন নাই। তিনি কোথায় থাকেন, বলিয়া দিলেন—"শূন্যরূপে থাকি আমি শূন্যে অধিষ্ঠান।" (হাড়মালা)। কিন্তু কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া অহঙ্কার

(৩) হিন্দুস্থানের নাথযোগিগণের নিকট নিম্নলিখিত সৃষ্টির ইতিহাস শুনিতে পাওয়া যায়— "জলাময় রহে যব মহী এ সংসারী স্থাবর জঙ্গমসহী একাকারা আদি মহাপুরুষকো জন্ম মহাজন্ম ভবগোস্বামী আপে নিরঞ্জন। মহাকায় শরীর জলমে ভাসে, ফিরে গোস্বামী তিন অযুত বৎসর, এসা সময়মে প্রভুকো মুখমে উঠে হাইতি তিনমে জনম লিয়ে উলপক্ষী মোহ ভাই। ধ্যান ভাঙ্গনেছে নিরঞ্জন আঁখ মেলকো চাঁহিয়ে। সম্মুখনে উলুপক্ষী দেখনেকো পাঁইয়ে।"

করার সমর্থন তিনি করিতে পারিলেন না। তিনি যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া গিয়াছেন। অহঙ্কারের ক্ষমা নাই; তিনি আমাদিগকে শাপ দিয়া ফেলিলেন :—

"সিদ্ধি না হইল পিণ্ড পড়িব তোমার।
সৃষ্টি সৃজিবা আ তুমি বড় দুক্ষ পাই আ॥
তাকে সংহারিব আমি শিবরূপ সৃজি আ।
শিবরূপে য়েকজন করিমু সৃজন।
আদিরূপ শক্তি দিআ করিমু সংহারণ॥"

হাড়মালা গ্রন্থে নিরঞ্জন গোঁসাই 'শিবরূপ সৃজিআ' সংহার করেন নাই; সংহার করিবার জন্য তিনি কাল সৃজন করিয়াছেন। আলোকনাথ শাপ দিয়া অনাদিগকে "আপেজগ আপে জোগি আপে আপে ধ্যাই" প্রভৃতি তত্ত্বকথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলে, অনাদি তপ আরম্ভ করিলেন এবং কি দিয়া তিনি সৃষ্ট হইয়াছেন জানিবার জন্য আলোকনাথকে অনুনয় করিতে লাগিলেন। আলোকনাথ পুনর্ব্বার আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। অনাদিনাথ—

"য়েতেক শুনিয়া বলইন নাথের চরণে।
শূন্যেতে রহিল বলিয়ে তোমারো স্থানে॥
শূন্যে সৃজিলাম প্রভু তোমার গোচর।"

এই কথা শুনিয়া আলোকনাথ মুখ হইতে অমৃত ছাড়িলেন, আর সেই অমৃত হইতে স্থল সৃষ্ট হইল। অনাদিনাথ সেই স্থলের উপর আসন করিয়া বসিলেন। তারপর আলোকনাথ নিজের দেহের শক্তি হইতে 'কাকেতুকা' দেবীকে সৃজন করিলেন। কাকেতুকা দেবী অনাদির 'পদান্তর' সহ্য করিতে না পারিয়া মনে মনে কল্পনা করিয়া অন্তরীক্ষ হইতে ডাকিয়া অনাদিকে বলিলেন :—

"আদি দেবি স্বজিছি তোমার লাগি শক্তি।
গঙ্গা দেবি স্বজিছি আদির অঙ্গে গতি ॥
আদিয়ে অনাগ্নিয়ে স্বষ্টি নির্ম্মিছি।
দুইয়ে মিলি স্বষ্টি কর আপনার ইছি ॥"

স্বষ্টি করার ভার অনাদির উপর অর্পণ করিয়া আলোকনাথ চলিয়া গেলেন। আমরা আরও দেখিতে পাইব, স্বষ্টিকার্য্যে অনাদি যখন একটু গণ্ডগোলে পড়িয়াছেন, তখনই আলোকনাথ আসিয়া তাহাকে সাহায্য করিয়াছেন। এইরূপ স্বষ্টিকার্য্য আপাততঃ নষ্টিক (Gnostic) দর্শনের মতানুযায়ী বোধ হইতেছে (৪)।

আলোকনাথের কৃপায় কাকেতুকা দেবী ওরফে আদি দেবী জীবিতা হইলেন এবং আদি অনাদি মিলিয়া স্বষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথম আকাশ স্বষ্ট হইল, আকাশে ইন্দ্র রাজা হইলেন। তারপর চন্দ্র সূর্য্য স্বষ্ট হইল, সূর্য্যে লালবর্ণ দেওয়া হইল। তারপর বাসুকি ও পাতাল স্বজন করা হইল; বাসুকিকে পাতালে স্থান দেওয়া হইল এবং তাহার ফটের উপর তিনকুল (ত্রিকোণ) পৃথিবী স্থাপিত করা হইল। বিভিন্ন উপাদানে শ্বেতবর্ণ ও রক্তবর্ণ দুই প্রকার তারা স্বজন করা হইল।

"তবে ধর্ম্মে মুষ্টি কশাই আচাই-লা।
মুষ্টিতে ব্রহ্মা বিষ্ণু দুই মূর্ত্তি দেখিলা ॥
তবে অনাগ্নে হস্তের মুষ্টি ফিরাইলা।
ঊর্দ্ধমুখ মহাদেব তথায় দেখিলা ॥
হস্ত হনে তিনপুত্র আইলা তিন স্থানে ॥"

হাড়মালার কিন্তু নিরঞ্জন গোঁসাই অনাদিকে শাপ দিয়া অন্তর্হিত হইলেন, "শিবশক্তি বিগুমান" হইলেন ও হরিব্রহ্মা তার পর স্বষ্ট হইলেন।

---

(৪) Some lesser God had made the work, but had not force to shape it as he would, till the High God behold it from beyond and enter it and make it beautiful.

শ্রীযুক্ত তমোনাশ বাবু নাথধর্ম্মের শিবকে বৈদিক যুগের রুদ্র বা পৌরাণিক যুগের মহাযোগী শিব হইতে পৃথক ও কম ক্ষমতাশালী দেখিয়াছেন। আমরা কিন্তু নাথধর্ম্মের শিবকে বৈদিক বা পৌরাণিক যুগের শিব অপেক্ষা পৃথক দেখিলেও কম ক্ষমতাশালী দেখিতেছি না। আলোকনাথ অনাদিকে বলিতেছেন :—

"আমার অং (অঙ্গ) শিব অং জানিব আপনে।

* * . * *

শিব অং সিদ্ধি অয় যেই অং তুমি।
তুমার নাম রাখিলাম অনাদ্ধি ধর্ম্মনাথ।
শিবর নাম রাখিলাম ঈশ্বর আদিনাথ।"

আমরা আরও দেখিতে পাইব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের মধ্যে শিবই খুব চালাক, চতুর, বুদ্ধিমান ও ক্ষমতাশালী। তিনিই পিতার প্রিয় পুত্র ও পিতার আশীর্ব্বাদে তিনি ব্রহ্মা বিষ্ণুর গুরু হইয়াছিলেন।

অনাদিনাথ তিন পুত্রকে তিন স্থানে রাখিয়াছেন, আর তাহাদের খোঁজ নেন নাই। তাহারা তিন জন "চক্ষে না দেখে, কর্ণে না শুনে," এমত অবস্থায় "অস্থল ভিতর'' পড়িয়া রহিয়াছে। অনাদিনাথ আদি দেবীর সহিত পুত্রগণকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত তাহাদের প্রত্যেকের কাছে গমন করিলেন। প্রথমে ব্রহ্মচারীর বেশে ব্রহ্মার কাছে গিয়া বলিলেন, তিনি পাঁচদিনের উপবাসী, এবং "অপুড়া পৃথিবী দেয় ভুজনের ঠাই।" ব্রহ্মা ভীষণ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, তিনি চক্ষেও দেখেন না, কর্ণেও শুনেন না, তিনি "অপুড়া পৃথিবী" কোথায় পাইবেন। তাহার যদি চক্ষু কর্ণ থাকিত, তবে তিনি ব্রহ্মাগ্নি দিয়া ব্রহ্মচারীকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিতেন। বৈষ্ণববেশে বিষ্ণুর কাছে গিয়া আদিনাথ একই প্রার্থনা করেন এবং প্রায় একইরূপ উত্তর পান। অতঃপর 'মহাজুগেশ্বর' বেশে শিবের নিকট গিয়া প্রার্থনা করিতেই,—

"যেত শুনি শিবযুক্তি করে মনে।
পিতা পরে কেয় নাই লয়ে পর মনে ॥"

এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি পিতাকে যথাবিহিত সম্মান পুরঃসর নিবেদন করিলেন,—

"তিন জটা আছে আমার শিরের উপর।
রন্ধন ভুজন তথা করহ শর্ত্তর।"

পুত্রের ব্যবহারে অনাদিনাথ সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাহাকে দৃষ্টিশক্তি লাভ করিবার গুপ্তমন্ত্র ও কৌশল শিখাইয়া দিয়া গেলেন। শিব দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি লাভ করিয়া বিষ্ণু ও ব্রহ্মাকে ঐ সকল কৌশল শিখাইয়া দিলেন। তাঁহারা শিবকে গুরু ভজিয়া অনাদিধর্ম্মনাথের কৃপায় দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি লাভ করিলেন এবং অনাদিধর্ম্মনাথকে 'আদেশ' (৫) জানাইলেন।

তারপর অনাদি ধর্ম্ম আদিদেবীর 'তনু' হইতে লক্ষ্মী, সাবিত্রী ও গৌরী-দেবীকে সৃজন করিলেন এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবকে লইয়া 'কুটেশ্বরে' গমন করিলেন। সেখানে আদিনাথের আদেশে শিব, আদিদেবীর মড়া তনুর কেশে কাঠ, মাথার খুলিতে ভাণ্ড ও দেহরস জলরূপে ব্যবহার করিয়া নিজের শরীর হইতে "অগ্নিপাণি নিকালিয়া" "চন্দ্রের গোলিতে" অন্ন পাক করেন এবং দেবগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করান। দেবগণের মধ্যে যিনি প্রধান তাঁহাকে 'শ্রীপত্রে' অন্ন দেওয়া হইল। শ্রীপত্রের অধিকারী নিজে অনাদিধর্ম্মনাথ। ভোজনান্তে শিব বলিলেন, এখন অন্ন ভোজনান্তে দেবগণ সন্তুষ্ট হইয়াছেন,

(৫) 'আদেশ' শব্দ দণ্ডবৎ অর্থে পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইত। বিশ পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বেও নাথযোগিগণের কোনও উৎসবাদিতে বহু লোক জড় হইলে, যিনি সভায় লোক মিলিত হওয়ার পরে আসিতেন, তিনি সভাস্থ লোকজনকে মাটিতে পড়িয়া দণ্ডবৎ কিম্বা নমস্কারাদি না করিয়া "সমাইর (সবার) পদে আদেশ" বলিয়া সভায় আসন গ্রহণ করিতেন।

কিন্তু "পুনি কিরূপে হৈব অন্নের শ্রীজন।" তখন "অনাহেতু ভীমনাথ মারিলেক ছিটা" আর অন্ন সৃষ্ট হইয়া পৃথিবীতে পড়িয়া গাছ হইয়া উঠিল এবং তাহাতে ধান ধরিল। কিন্তু সে ধানে চাউল নাই; তখন—

"ধর্ম্মের আজ্ঞায় দেবি দুগ্ধ ছিটি দিলা।
চুচার মধ্যে দুগ্ধ ক্ষির বসিলা॥"

এখন অনাদিধর্ম্মনাথ, ব্রহ্মা-বিষ্ণুকে একে একে গঙ্গা গৌরী বিবাহ করিতে আদেশ করিলেন এবং তাহাদিগকে সৃষ্টির ঈশ্বর করিবেন ও ব্রহ্মজ্ঞান দিয়া অমর করিবেন বলিলেন। কিন্তু তাঁহারা সে আদেশ মানিলেন না। কারণ গঙ্গা গৌরী তাঁহাদের "শাতমায়"। অতঃপর শিবকে গঙ্গা গৌরী বিবাহ করিতে আদেশ হইল। শিব 'ধর্ম্মের আজ্ঞা লজ্ঘিতে না পারিয়া' শাধি ব্রহ্মজ্ঞান গৌরীকে 'কোলে' ও গঙ্গাকে 'শিরে' লইলেন। সন্তুষ্ট হইয়া অনাদি বর দিলেন, "অন্ত-কালে ব্রহ্মা বিষ্ণু, ভজিবা-তুমাতে।" অতঃপর শিবের বীর্য্য হইতে 'কুলনাথের' জন্ম ও গৌরীর বীর্য্য হইতে "বিন্দুবতীর" জন্ম হইল। ধ্যানে আজ্ঞা পাইয়া শিব, কুলনাথের সহিত বিন্দুবতীর বিবাহ দিলেন এবং কুলনাথকে যোগধর্ম্ম শিক্ষা দিয়া "শিবগোত্র, নাথ পৌদ্ধত" দিলেন (৬)।

তারপর, অনাদিধর্ম্ম, বিষ্ণুকে লক্ষ্মী ও ব্রহ্মাকে সাবিত্রী সমর্পণ করিয়া অলক্ষিতে দক্ষিণ সাগরে চলিয়া গেলেন এবং সেখানে আসনে বসিয়া মনে মনে কল্পনা করিয়া এক অক্ষয়বটবৃক্ষ, এক গৃধিনী, জনেনজয় রাজা, যমরাজা ও চিত্রগুপ্ত সৃজন করিলেন, এবং বিভিন্ন অঙ্গের ঘর্ম্ম হইতে পবন, চন্দন বৃক্ষ প্রভৃতি সৃজন করিলেন। অক্ষয় বটবৃক্ষ হইতে তিন যুগের নিদর্শন স্বরূপ তিন তাল জন্মিল। সত্যযুগের তালের উপর গৃধিনী বসিল। যমরাজাকে বটবৃক্ষের নীচে

(৬) যোগতন্ত্রকলা মতে শিব বা অনাদি মোহিনীকে বিবাহ করেন এবং আন্তনাথের সঙ্গে বিন্দুবতীর বিবাহ হয়। এই বিবাহে ব্রহ্মা মন্ত্রপাঠক ও শিব যাজক।

বসাইয়া জম্বুদ্বীপের রাজা করিয়া দিলেন। পাপপুণ্য বুঝিবার ভার চিত্রগুপ্তকে অর্পণ করিলেন এবং গৃধিনীকে চারি যুগের সাক্ষিস্বরূপ সে স্থানে স্থাপন করিলেন। তারপর তাঁহার জটার মূল হইতে যে 'হরমূল' বৃক্ষ উৎপন্ন হইল, তাহার ফল ভক্ষণ করিয়া ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবকে সৃষ্টি-স্থিতি সংহারের ভার দিয়া, অনাদিধর্ম্মনাথ অনন্তশয্যায় শয়ন করিলেন।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব পিতার অন্বেষণ করিতে করিতে দক্ষিণ সমুদ্রের নিকট গিয়া, গৃধিনীর নিকট হইতে সমস্ত কথা জানিতে পারিলেন এবং তিন ভাই সাগরের কূলে বসিয়া ধ্যান আরম্ভ করিলেন। তখন অনাদি মৃত গরুর রূপ ধরিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণুর নিকট ভাসিতে ভাসিতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন ব্রহ্মা বিষ্ণু উভয়েই ঘৃণাভরে ধ্যান হইতে উঠিয়া পলায়ন করিলেন। মৃত গরু যখন শিবের নিকট উপস্থিত হইল, তখন শিব চিন্তা করিলেন, এরূপ প্রাণী এখনও পর্য্যন্ত সৃষ্ট হয় নাই, ইহা নিশ্চয়ই পরমপিতার লীলা—এই ভাবিয়া জলে সাঁতার দিয়া তিনি সেই গো-মূর্ত্তিকে ধরিলেন। ব্রহ্মা বিষ্ণু ইহা দেখিয়া শিবকে নিন্দা করিয়া চলিয়া গেলেন। অনাদিধর্ম্ম, তখন তিন ভাই কিরূপে তাঁহার সৎকার করিবেন, তাহা বলিয়া দিলেন—ব্রহ্মা বিষ্ণুর আচার "ভাশা পুড়া গাড়া" এবং শিব গর্ত্ত খুড়িয়া, আসনে বসাইয়া সমাধি করিবেন। শিব পিতাকে সমাধিস্থ করিয়া ব্রহ্মা বিষ্ণুকে সেখানে লইয়া আসিলেন, তাঁহারা এখন পিতার দেহ দেখিতে পাইলেন, এবং শিবের নিকট হইতে শুনিয়া, পিতৃ আদেশ মতে তাহার সৎকার করিলেন।

অনাদিকে যখন দাহ করা হইল, তখন তাঁহার নাভি ভস্মীভূত হয় নাই। উহা জলে ভাসাইয়া দেওয়া হয় এবং রাঘব ইহা ভক্ষণ করে। তারপর—

"রাঘবের পেট ফাটি মীন নিকালিলা।
নাভি হলে মীননাথ জন্ম হইলা ॥' (৭)

(৭) মীননাথের জন্ম সম্বন্ধে অন্যত্র অন্যরূপ উল্লেখ আছে। গণ্ডযোগে

এবং পার্ব্বতী যখন নিদ্রালসা হইয়া অন্যমনস্কা ছিলেন, তখন ঐ বালক রাঘবের পেট হইতে "হু হু" বলিয়া শিবের কথার উত্তর দিতেছিল। তখন মহাদেব তাহাকে ধরিয়া ফেলেন এবং রাঘবের পেট হইতে চিরিয়া বাহির করেন। অনাদির পেট ফাটিয়া চৌরঙ্গীসিদ্ধার জন্ম হইল। অগ্নির জ্বালের তেজ হইতে জালকুড়ি সিদ্ধা, কর্ণ হইতে কর্ণফাটি বা কানিফা, চর্ম্ম হইতে চর্ম্মনাথ, ধূম্র হইতে ধুম্রনাথ, পাঃ হইতে পাগলনাথ, নাভিস্থল হইতে নারদ প্রভৃতি অর্দ্ধ সিদ্ধা ও নবনাথের জন্ম হইল এবং—

"শ্রীগুলি ফুটি নিকলিছ ইল শ্রীনাথ।
অনন্ত কুটী সিদ্ধার গুরু শ্রীগোরকনাথ॥"

অনাদির চক্ষু ফুটিয়া পৃথিবীতে পড়িল এবং তাহা হইতে রুদ্রাক্ষবৃক্ষের জন্ম হইল। যোগিতন্ত্রকলামতে অনাদির মস্তক হইতে গোরক্ষনাথের জন্ম হয় (৮) এবং তাঁহার মুখ হইতে দাহননাথ, হৃদয় হইতে মেঘনাথ, নাভি হইতে পিনকনাথ, জঙ্ঘা হইতে উদ্ধারনাথ, জানু হইতে পাগলানাথ, বাহু হইতে ভৃকটিনাথ, গুহ্য হইতে সত্যনাথ এবং চরণ হইতে বিন্দুনাথের উৎপত্তি হয়। তাঁহার হাত

এক ব্রাহ্মণের এক পুত্র জন্মে। পুত্র মা-খেকো হবে—এই আশঙ্কায় ব্রাহ্মণ তাহাকে জলে নিক্ষেপ করেন এবং রাঘব তাহাকে ভক্ষণ করে। যখন মহাদেব পার্ব্বতীর—

"তুহ্মি কেনে তর গোসাঞি আহ্মি কেনে মরি।
হেন তত্ত্ব কহ দেব জোগে জোগে তরি॥" —গোরক্ষবিজয়

এরূপ প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য ক্ষীরোদসাগরে মনোহর টঙ্গীতে বসিয়া পার্ব্বতীকে যোগশাস্ত্রের গূঢ়তত্ত্ব বলিতেছিলেন, তখন—

"মাৎস্য রূপ ধরি তথা মীন মোচন্দর॥
টঙ্গির লাসাতে রহে বোগাল সুন্দর॥" — গোরক্ষবিজয়

(৮) একখানি কলমী পদ্মপুরাণে আছে—"মাথা ফাটি বাহিরিলা শ্রীগোলকনাথ"—'গোলক' স্থানে খুব সম্ভব গোরক্ষ হওয়া উচিত ছিল।

হইতে হাঁড়িপা ও চর্ম্ম হইতে চৌরঙ্গী সিদ্ধার জন্ম হয়। গোরক্ষনাথের জন্ম অনাদির অঙ্গ হইতে হইলেও তিনি অন্যান্য সিদ্ধার মত নহেন। তিনি অলোকনাথের স্বরূপ। অলোকনাথ অনাদিকে বলিতেছেন,—

"যেই কালে তোমার অং (অঙ্গ) আমি ছুড়ি জাইবা।
তুমার শৃগুলি ফুটি আমি নিকলিবা॥
আমার নাম গুরু গোরক ধরিয়া।
গুরু গোরক নামে শংষার তরাইবা॥"

পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া শ্রাদ্ধাদি করিবার জন্য ব্রহ্মা বিষ্ণু কুটেশ্বরে চলিয়া গেলেন এবং শিব শ্মশানে বসিয়া তপ আরম্ভ করিলেন। তপে সন্তুষ্ট হইয়া তখন অলোকনাথের স্বরূপ গোরক্ষনাথ সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন এবং শিবকে ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অর্থর্ব্ববেদ, "নিলবেদ" ও শোসম্বেদের (৯) তত্ত্ব বলিয়া দিয়া তাঁহাকে শ্মশানের মাটি খুড়িতে আদেশ করিলেন। মাটি খুড়িয়া শিব যে সমস্ত বস্তু পাইলেন, তদ্দ্বারা গোরক্ষনাথ শিবকে নানারূপ অঙ্গভূষণ প্রস্তুত করিয়া দিলেন। অনাদ্যের রুধিরে গৈরিক বসন, নাভির দ্বারা কর্ণের কুণ্ডল, নাসিকা দ্বারা নাদ, মেরুদণ্ড দ্বারা হস্তের "দ্বাদশ" প্রস্তুত করিয়া দিলেন। তারপর শ্মশানের ভস্মে সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত

(৯) আমরা এতকাল চারি বেদের কথা জানিতাম, কিন্তু যোগিতন্ত্রকলা ও অনাদিপুরাণে 'নিলবেদ' ও 'শোসম্বেদ' নামে আরও দুইখানি বেদের উল্লেখ পাই। বহু অনুসন্ধান করিয়াও এ বিষয়ে অন্য কোনও বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। 'যোগিতন্ত্রকলা' ও 'বেদমালা' নামক ক্ষুদ্র পুঁথিতে নিম্নলিখিত-রূপ বিবরণ পাইলাম :—

"সামবেদ যজুর্ব্বেদ অথর্ব্ববেদ ঋগ্বেদ আর।
নিল অনিল বেদ ষষ্ঠম্ বেদ সার॥" —যোগিতন্ত্রকলা
"পঞ্চমুখী ব্রহ্মা এক মুখ কাটিয়াছে রুদ্র।
সেই মুখ হইতে সুসম্বনা বেদ উৎপন্ন॥" —বেদমালা

করিয়া শিবের গলায় বাসুকিকে পৈতারূপে স্থাপন করিলেন এবং তাঁহার মস্তকে নিজ মস্তকের লালটুপী (১০) পরাইয়া দিলেন এবং রুদ্রাক্ষের মালা কণ্ঠে তুলিয়া দিলেন। গোরক্ষনাথ শ্মশানের ভস্ম হইতে "ভর্ম্ম্যা" (বৃষ ?) সৃজন করিলেন এবং শিব সেই বৃষে চড়িয়া কুটেশ্বরে গমন করিলেন।

প্রথমে ত্রিরাত্র শ্রাদ্ধ হইল। এই শ্রাদ্ধে গোরক্ষনাথ অলক্ষিতে থাকিয়া পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। তারপর একাদশ দিবসে পুনর্ব্বার শ্রাদ্ধ হয়। এই শ্রাদ্ধেও গোরক্ষনাথ স্মরণমাত্রে "শ্রীকবিলাশ" হইতে আসিয়া পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন এবং ইন্দ্র, যম প্রভৃতি দেবগণ চৌরঙ্গী প্রভৃতি অর্দ্ধসিদ্ধা, রাগরাগিণী, বাসুকি, গৃধিনী পক্ষী প্রভৃতিকে আনিয়া শ্রাদ্ধে উপস্থিত করিয়াছিলেন। গোরক্ষনাথকে শিব ভিন্ন অন্য কেহ দেখিতে পাইতেন না। শ্রাদ্ধ হইতেছে, কিন্তু পুরোহিত নাই দেখিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু শিবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন :—

"বাপের জজ্ঞ করিতে ব্রাহ্মণ কেবা য়েতে।"

শিব তদুত্তরে বলিয়াছিলেন,—

"শ্রীগুরু গোরকনাথ পুরুইত য়েথাতে ॥
হস্তপদ নাই তার বিন্দু হংশ কলা।
আছয়ে জগত ভরি শমাইর দরশনে খেলা ॥

(১০) নাদ পৈতা আজকালও নাথযোগিগণ ধারণ করেন এবং স্থানে স্থানে অধুনাও অনেকে লালটুপী ও কুণ্ডল ব্যবহার করিয়া থাকেন। ফরাসী পর্য্যটক Delavalle-এর ভ্রমণকাহিনীতেও যোগীদিগের এই লালটুপী ও কুণ্ডলের উল্লেখ পাওয়া যায়।

(10) "He (Yogiraj) had a golden bead hanging from his ear as big as a musket-bullet, and had a little red cap like those worn by Italian-galley Slaves." (J. Talboys Wheeler's A short History of India, Burma & Nepal, pp 116—117).

বাপের জজ্ঞেতে নাথ পুরইত হইলা।
তাহানে কেয় দেখিতে না পাইলা॥
কিঞ্চিৎ ধ্যান শুন আমার সাক্ষাতে।
য়েতেক মর্ম্মভেদ কইলাম তুমাতে।"

সে যাহা হউক শ্রাদ্ধ হইয়া গেল; পিণ্ডের অন্ন শিব নিজ হস্তে রন্ধন করিয়াছিলেন। নিমন্ত্রিতগণকে ভোজন করাইবার জন্য "ভাণ্ডেবার" সামগ্রী আনান হইল এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর—সাবিত্রী, লক্ষ্মী, গঙ্গা ও ভগবতীকে আদেশ করিলেন—

"তুমি চাইরে মিলি রন্ধন কর উকা ইহাতে।"

অন্নব্যঞ্জন রন্ধন করা হইল, পুরোহিতকে এই অন্নব্যঞ্জনের অর্ঘ্য দেওয়া হইল। অতঃপর নিমন্ত্রিতগণকে তৃপ্তির সহিত ভোজন করানি হইল এবং তারপর সকলে স্ব স্ব স্থানে স্ব স্ব কর্ম্মে প্রস্থান করিলেন।

অনাদিপুরাণ প্রভৃতিতে বর্ণিত নাথধর্ম্মের সৃষ্টিতত্ত্ব ও সৃষ্টির ইতিহাস এই। এখন সৃষ্টি ত হইল। সৃষ্টির একদিন ধ্বংস হইবে; কিছুই থাকিবে না। তখন—

"পৃথিবী মিশাইব আবে, আব মিশাইল রবিতে।
রবি মিশাইল বারে বার মিশাই আকাশেতে॥
কলসী গজিলে জেন মীশাইব আকাশে।
আকাশ ভাঙ্গিলে জাইব মহা আকাশে॥
রবি ভাঙ্গিলে জাইব তিন অভিপ্রায়ে।
শরূপ মিশাইব তেন নাথ গুরুর পায়ে॥"

প্রবন্ধ পাঠ শেষ হইলে সাধারণ আলোচনা আরম্ভ হয়। ডাক্তার শ্রীবেণীমাধব বড়ুয়া, এম-এ, ডি-লিট্ মহাশয় বলিলেন:—"প্রবন্ধলেখক শ্রীরাজমোহন নাথ 'অনাদিপুরাণ', 'হাড়মালাগ্রন্থ' ও 'যোগিতন্ত্রকলা' নামক তিনখানি গ্রন্থের হস্তলিখিত পুঁথি অবলম্বন করিয়া "নাথধর্ম্মের সৃষ্টিতত্ত্ব" নিরাকরণ করিতে

গিয়াছেন। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে একখানি সংস্কৃত ও অপর দুইখানি বাঙ্গালায় লিখিত হইয়াছে। ইহাদের রচনাকাল জানা যায় না। প্রত্যেক পুঁথির 'নিমগণ' বা সমাপ্তি অংশে "যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং" উক্তি আছে দেখিয়া মনে করিতে হয়, ইহা আজকালকার নিতান্ত আধুনিক সময়ের রচনা নহে। ইহাও নিশ্চিত যে, ইহা অতি পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের রচনাও নহে। আমার বিশ্বাস, এই গ্রন্থগুলির মধ্যে সৃষ্টিতত্ত্ব বা Cosmology বলিতে আমাদের যাহা বুঝা উচিত, ঠিক তাহা নাই; তন্মধ্যে কতকগুলি প্রাচীন সৃষ্টিতত্ত্ব, পৌরাণিক কাহিনী, উপকথা বা রূপকচ্ছলে সরল পৌরাণিক আধ্যাত্মিক কাহিনীর মূল অনুসন্ধান করিলে সর্ব্বাগ্রে ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের নাসদীয় সূক্তই আমাদের মনে পড়ে। বিশ্ব-সৃষ্টির পূর্ব্বে আকাশ, বাতাস, মর্ত্ত্য, পাতাল, স্থাবরজঙ্গমাদি বলিতে সাধারণতঃ আমরা যাহা বুঝি, তাহা আদৌ ছিল না। চতুর্দ্দিক অন্ধকারে আবৃত ছিল। অগাধ জলরাশি বা নিরাকার বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে একমাত্র অলেখ প্রভু নিরঞ্জনই ছিলেন। তিনি জ্যোতির্ম্ময় ও আলোকস্বরূপ। তাঁহার দয়াতেই বিশ্ব-ভুবনের সৃষ্টি হয়, জল ও স্থলের আবির্ভাব হয়, স্থাবরজঙ্গম উৎপন্ন হয়। মনুষ্য ও মনুষ্য সভ্যতার উৎপত্তি ও অভ্যুদয় হয়। আপাতঃ দৃষ্টিতে নাসদীয় সূক্ত নাথসৃষ্টি কাহিনীর প্রধান অবলম্বন হইলেও বস্তুতঃ ইহার মধ্যে অমঘর্ষণ, অনিল, ব্রহ্মণস্পতি, হিরণ্যগর্ভ ও বিশ্বকর্ম্মাদি সূক্তের উপদেশও বিদ্যমান আছে। শুধু তাহাই নহে,—ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং উপনিষদাদি গ্রন্থের সৃষ্টি-কথার প্রভাবও তন্মধ্যে যথেষ্ট আছে। আলোচ্য প্রবন্ধের উপসংহারে মোক্ষ-প্রাপ্ত ব্যক্তির পরিণাম বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখক যে পদগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তন্মধ্যে স্পষ্ট উক্ত আছে—পৃথিবী জলে, জল রবি বা অগ্নিতে, অগ্নি বায়ুতে, বায়ু আকাশে এবং আকাশ মহাকাশে লীন হয়। একমাত্র আলেখ নিরঞ্জনই অবশিষ্ট থাকেন। সিদ্ধ নাথগুরুগণ মানব হইলেও তাঁহারা এবং প্রভু নিরঞ্জন স্বরূপতঃ একই।

প্রোক্ত নাথসিদ্ধ পুরুষদিগের মধ্যে গোরক্ষনাথই সকলের শীর্ষস্থানীয় শিরোমণি। প্রবন্ধের অবলম্বিত পুঁথির মধ্যে তাঁহাকে 'অনন্তকুটি সিদ্ধার গুরু'রূপে প্রশংসা করা হইয়াছে। এই প্রশংসা নিরর্থক নহে। গোরক্ষনাথের আবির্ভাবকালে পূর্ব্বে ও পরে আর্য্যাবর্ত্তে বিশেষতঃ পূর্ব্বাঞ্চলে বহু নাথগুরু ও নাথপন্থী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বামাচারী ছিলেন, কেহ কেহ বামাচার হইতে বিরত ছিলেন। তাঁহারা সকলেই হঠযোগী ছিলেন। শিবপদ সকলেরই প্রার্থিত বস্তু ছিল। দৈহিক ক্রিয়া ও ইন্দ্রিয়গণকে প্রাণায়ামাদি দ্বারা নিরুদ্ধ করিয়া অলেখ নিরঞ্জন আত্মার স্বরূপ দর্শন করাই তাঁহাদের সাধনার চরম লক্ষ্য ছিল। ন্যাসের স্থান অনুসারে নাথসিদ্ধাগণ হাড়িপা, কানফা প্রভৃতি নামে বিশিষ্টতা লাভ করেন। গোরক্ষনাথের দৃষ্টি ব্রহ্মরন্ধ্রেই স্থাপিত ছিল। তিনি কামিনীকাঞ্চনমুক্ত ও অলৌকিক শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন। তিনি নাথধর্ম্মের প্রভূত সংস্কার সাধনও করিয়াছিলেন। কদলীরাজ্যে কামিনীকাঞ্চন মোহে মীননাথের পতন হইয়াছিল সত্য, কিন্তু মীননাথ নিজে মৈথুনবিরোধী ছিলেন। কাজেই তাঁহার পক্ষে গোরক্ষনাথের গুরু হওয়ার অধিকার ছিল। আমার বিশ্বাস গোরক্ষনাথের নামের ছায়ায় সকল নাথধর্ম্ম ও নাথসম্প্রদায়ের সমাবেশ হইয়া থাকিবে। পরে একইভাবে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের নামের ছায়ায় বিভিন্ন পন্থী বৈষ্ণবসম্প্রদায় সম্মিলিত হইয়াছিলেন। তথাপি চক্ষু থাকিলে আমরা দেখিতে পাইব যে, এই সম্মিলন, সমাবেশ বা সমন্বয়ের অন্তরালে পূর্ব্ব বিভিন্নতা এবং বৈশিষ্ট্যগুলিও বিদ্যমান আছে। **নাথসৃষ্টিকাহিনীর ভিত্তি বৌদ্ধসাহিত্যদর্শন নহে। বৈদিক-সাহিত্য বা বেদান্তই ইহার মূলে নিহিত আছে।** বুদ্ধের আবির্ভাবের দুই তিন শতাব্দী পূর্ব্ব হইতে আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বাঞ্চল শৈবজাতীয় বহু শ্রমণ, ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ের লীলাক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। প্রাচীন বেদান্ত ও বৌদ্ধমতের ভিত্তির উপর পরে বহু সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম ও সাধনপন্থার সমাবেশ

ও সংঘর্ষণ হইয়াছিল। তন্মধ্যে অধিকাংশই একভাবে না একভাবে বৈদিক পরাবিদ্যার সহিত সংশ্লিষ্ট। তাঁহারা যাজক ব্রাহ্মণদিগের পৌরোহিত্য স্বীকার করিতেন না। ইহার আভাস আমরা বক্ষ্যমান পুঁথিগুলিতে দেখিতে পাই। পিতৃযজ্ঞে বা পিতার শ্রাদ্ধকার্য্যে পুত্র ব্যতীত অন্য পুরোহিতের প্রয়োজন কি আছে? পুত্র ভিন্ন পিতার প্রতি অধিক শ্রদ্ধাবান্ আর কে হইতে পারে? গোরক্ষনাথের ধর্ম্মাদর্শ মতে নাথসৃষ্টিকাহিনীতে পুরুষের সহিত প্রকৃতির সংযোগ থাকিতে পারে না। বাস্তবিক পক্ষে ইহার মধ্যে প্রকৃতিকে অলেখ নিরঞ্জনের পশ্চাতে রাখা হইয়াছে। কিন্তু যখন কালক্রমে গৃহস্থগণ নাথধর্ম্ম-ভুক্ত হইয়া পড়েন, এবং পূর্ণভাবে নাথসমাজ বা Church গঠিত হয়, তখন তাঁহাদের জীবনাদর্শের অনুযায়ী প্রকৃতি-পুরুষ সংযোগাত্মক সাংখ্যভাবের অবতারণা করিতে হইয়াছে। সম্ভবতঃ এই সমাজগঠন নাথধর্ম্মের আবির্ভাবের বহু বৎসর পরেই সম্ভব হইয়াছিল। (সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা)

তৎপর সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ ও অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়দ্বয় এ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। পরিশেষে সভাপতি ৺হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বেদান্তরত্ন মহাশয় বলেন—"প্রথমে মনে হইয়াছিল যে, অদ্যকার এই প্রবন্ধে একটি নীরস বিষয়ের আলোচনা হইবে। কিন্তু পরে দেখা গেল যে আমরা আশাতীত আনন্দ উপভোগ করিয়াছি। * * * অদ্যকার আলোচিত সৃষ্টিতত্ত্ব যে বেদের সহিত সাদৃশ্যযুক্ত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। নাসদীয় সূক্ত ছাড়া বেদের অন্যত্রও সৃষ্টির কথা আছে এবং তাহার সহিতও ইহার সাদৃশ্য আছে। বেদে 'অশব্দমসপর্শরূপমব্যয়ম্' বলিয়া যে ব্রহ্মের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহার সহিত নাথধর্ম্মের নিরঞ্জনের ত কোনই পার্থক্য দেখা যায় না। পরন্তু, বেদে নিরঞ্জন সংজ্ঞাটিও অপরিচিত নহে। তারপর গোরক্ষনাথকে নাথগুরু বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাও

হিন্দুধর্ম্মের সহিত মিলে। পাতঞ্জলে ঈশ্বরকে—'সঃ পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। (সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা—২য় সংখ্যা, ১৩৩১ বাং)।

নাথধর্ম্মে নিরঞ্জন তত্ত্ব ও বেদতত্ত্ব। নিরঞ্জন বৈদিক দেবতা এবং বেদই বিশুদ্ধ বৌদ্ধধর্ম্মের মূল ঃ—

(নহি) অঞ্জন (দাগ কালিমা) যাহাতে অর্থাৎ যিনি বিশুদ্ধ ব্রহ্ম তিনিই নিরঞ্জন। পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ; নক্ষত্রাদি পরিদৃশ্যমান বিশ্ব এবং তাহার অতীত যাহা কিছু আছে বা থাকিতে পারে, সেই সমস্তের যিনি মূল, অথবা যাঁহাতে তৎসমস্ত অবস্থিত, তাঁহার স্বরূপ অনুভব করিয়া ঋষিগণ তাঁহাকে ব্রহ্ম নামে অভিহিত করিয়াছেন। ব্রহ্ম সকল বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা সমধিকরূপে বড়, এবং তাঁহার শক্তির কার্য্যও সর্ব্বাপেক্ষা সমধিকরূপে অধিক। ব্রহ্ম নিত্য অনাদি। শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, ব্রহ্ম এক হইয়াও অনাদিকাল হইতে অনন্তস্বরূপে আত্মপ্রকট করিয়া বিরাজিত। বৃংহ্ ধাতু হইতে ব্রহ্ম শব্দ নিষ্পন্ন—"বৃংহতি বৃংহয়তি চ ব্রহ্ম।" যোগিগণ এই ব্রহ্মকেই নিরঞ্জন বলেন। এই নিরঞ্জনই নাথদের উপাস্য। নাথসিদ্ধারচিত প্রায় সকল যোগশাস্ত্রে নিরঞ্জন তত্ত্ব দৃষ্ট হয়। যোগী দত্তাত্রেয়ের অবধূত গীতায়, অষ্টাবক্র গীতার ১ম অধ্যায়ের ৫ম শ্লোকে এবং বেদান্তান্তর্গত উপনিষদগুলিতে নিরঞ্জনতত্ত্ব আছে। বিবিধ উপনিষদের বিভিন্ন চিন্তাধারার সমন্বয়বিধান শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে হইয়াছিল। নিরঞ্জন শব্দ ইহার ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে প্রথম দেখিতে পাওয়া যায়। মুক্তিকোপনিষৎ অনুসারে সর্ব্বশুদ্ধ ১০৮ খানি উপনিষৎ আছে। এগুলির দশখানি ঋগ্বেদের, ১৯ খানি শুক্ল যজুর্ব্বেদের, ৩২ খানি কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের, ১৬ খানি সামবেদের ও ৩১ খানি অথর্ব্ববেদের। এগুলির ধ্যানবিন্দু, ব্রহ্মবিন্দু, হংসোপনিষৎ, ব্রহ্মবিদ্যোপনিষৎ, ত্রিশিখিব্রাহ্মণোপনিষৎ, নির্ব্বাণোপনিষৎ, শাণ্ডিল্যোপনিষৎ, যোগশিখোপনিষৎ, ত্রিপুরতাপন্যুনিষৎ, ভস্মজাবালোপনিষৎ প্রভৃতিতে নিরঞ্জনতত্ত্ব দৃষ্ট হয়। তাহা হইলে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, নিরঞ্জনতত্ত্ব ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ব সব বেদেই

আছে। তাহা হইতে সিদ্ধান্ত অনিবার্য্য যে নিরঞ্জন বৈদিক দেবতা। নিরঞ্জন সম্বন্ধে অপ্রচুর জ্ঞান লইয়া কয়েক জন পণ্ডিত এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্মের নানা বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অবধূত দত্তাত্রেয় তাঁহার গীতার প্রারম্ভে স্পষ্টই উল্লেখ করিয়াছেন যে, হিন্দু ও বৌদ্ধ প্রতিভার মহামিলনে যে মহান্ দার্শনিক তত্ত্বের প্রকট ভারত দর্শনে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই নিরঞ্জন তত্ত্ব বা বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদ। নিরঞ্জন হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয়েরই উপাস্য এবং বেদ এই উভয় ধর্ম্মের মূল।

বুদ্ধদেব হিন্দু রাজপুত্র ছিলেন। তিনি যৌবন প্রাপ্তিকাল পর্য্যন্ত হিন্দুরাজ পরিবারে অবস্থান করিয়া পরে পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করতঃ সংসার ছাড়িয়া যান। অতএব হিন্দুরাজ পরিবারে হিন্দুসংসারের মধ্যে তিনি বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। হিন্দুশাস্ত্রের আলোচনার ও শিক্ষার তাঁহার যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা ছিল। এই সব কারণে বেশ বুঝা যায়, হিন্দুপ্রভাব তাহার উপর বিশেষ ক্রিয়া করিয়াছিল। জন্ম, জরা, মৃত্যু প্রভৃতির কারণ এবং ইহা পরিহার করিবার উপায় নির্দ্দেশই বুদ্ধদেবের উদ্দেশ্য ছিল। জাগতিক দুঃখের হেতু ও তাহা দূর করার উপায় সম্বন্ধে (বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে) উপনিষদে আলোচনা দৃষ্ট হয়। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, হিন্দু-শাস্ত্রের প্রভাব বুদ্ধদেবের চিন্তাধারাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের সন্ন্যাসাশ্রম ব্যবস্থা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের ব্রহ্মচর্য্য ও বাণপ্রস্থ ব্যবস্থার রূপান্তর মাত্র। বৌদ্ধভিক্ষুদের বিনয়ব্যবস্থা ব্রহ্মচারীর বিধি-ব্যবস্থার অনুরূপ মাত্র। বুদ্ধদেব আত্মা ও পরমাত্মা স্বীকার করেন নাই বটে; কিন্তু দুঃখের কারণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া 'অবিদ্যার' আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন এবং দুঃখ, দুঃখের উৎপত্তি, দুঃখনিরোধ এবং দুঃখ-নিরোধের উপায়—এই চারিটি তত্ত্বের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সাংখ্য ও যোগ-দর্শনে এই সকল তত্ত্বের বিস্তৃত আলোচনা দৃষ্ট হয়। মোক্ষ বা নির্বাণলাভই দুঃখ দূর করার প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া বুদ্ধদেব যাহা প্রচার করেন, তাহা সাংখ্য

বেদান্তের প্রতিধ্বনি মাত্র। বুদ্ধদেব বলিয়াছেন—"সর্ব্বম্ অনিত্যম্ সর্ব্বম্ অনাত্মম্ নির্ব্বাণং শান্তম্"। ইহা বৌদ্ধধর্ম্মের মূলতত্ত্ব এবং ইহা হইতে শূন্য-বাদের সৃষ্টি হইয়াছে। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের নাসদীয় সূক্তে এই শূন্যতত্ত্বের সন্ধান আছে। নাগার্জ্জুন বলিয়াছেন—সকল ধর্ম্মই শূন্যতাস্বভাববিশিষ্ট (মাধ্যমিক শাস্ত্র—২৪।১৯)। বৌদ্ধধর্ম্মে যোগাচার মত প্রবল। ইহা কপিল ও পতঞ্জলি ঋষির যোগের অনুকরণ মাত্র (Eitel's Hand book on Chinese Buddhism, page 209)। গৌড়পাদ বৌদ্ধশূন্যবাদ ও বিজ্ঞানবাদ সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়া সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, ইহাদের সহিত ঔপনিষৎ সত্যের সামঞ্জস্য রহিয়াছে (History of Indian Philosophy, Vol. I, page 429)। বুদ্ধদেবকে হিন্দুশাস্ত্র বিষ্ণুর অবতার বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে (১)। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য, জয়দেব প্রমুখ ধর্ম্মাচার্য্যগণ বুদ্ধদেবকে অবতার বলিয়াছেন। 'ললিতবিস্তর' বৌদ্ধগ্রন্থে বুদ্ধদেবকে স্বয়ং নারায়ণ বলা হইয়াছে। পদ্মপুরাণ ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে বুদ্ধদেবকে উপবীতধারী (নিবীত বুদ্ধ) বুদ্ধ বলা হইয়াছে। উপালিসূত্তে তাঁহাকে ঋষিসত্তম, ত্রিবিদ্যাযুক্ত ও ব্রহ্মপ্রাপ্ত বলিয়া স্তব করা হইয়াছে। যিনি ব্রহ্মস্বরূপে বিরাজ করেন, যিনি ব্রহ্মত্ব লাভ করিয়াছেন, তাঁহাকে ব্রহ্মভূত বলা হয়। 'ইতিবুদ্ধকং' নামক পালিগ্রন্থে তাঁহাকে ব্রহ্মভূত বলা হইয়াছে। রাইস্ ডেভিস্ সাহেব বলিয়াছেন—"Buddha was a Hindu and the best of the Hindus." (Manual of Indian Buddhism by H. Kern—Part I, page 71)। ডাঃ রামপ্রসাদ সেন বলিয়াছেন—বুদ্ধদেব তাঁহার ধর্ম্মে পাতঞ্জল সূত্রের প্রণালীই অনুসরণ করিয়াছেন (Oldenburg's Buddha, page 62)। ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রের পদ্মপুরাণ ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের শালগ্রাম শিলায় বুদ্ধদেবের পূজার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বহু হিন্দুশাস্ত্রে বুদ্ধদেবের স্তব আছে। একদিন এক ব্রাহ্মণের বিবিধ প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধদেব

(১) বায়ুপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত।

বলিয়াছিলেন, আমি দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ বা মানুষ নহি—আমি বুদ্ধ। ইহার সঙ্গে হিন্দুধর্ম্মের সর্ব্বোচ্চ আধ্যাত্মিক অনুভূতি—'অহম্ ব্রহ্ম'—এর কোনও প্রভেদ নাই। বিশুদ্ধ বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের অঙ্গবিশেষ (Oldenburg's Buddha, page 62)।

"Mysteriously connected with the worship of Siva is Buddhism. The same close connection between Buddhism and Siva worship appears in Southern India." (Annals of Rural Bengal by W. W. Hunter)। অর্থাৎ বৌদ্ধধর্ম্ম শিবপূজার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে ও আশ্চর্য্যরূপে সম্বন্ধযুক্ত। শিবোপাসনা ও বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে উক্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দক্ষিণ ভারতেও পরিলক্ষিত হয়।

"Dr Hoerule points out that neither Buddhism nor Jainism are religions in the strict sense of the word, but are rather monastic organisations of a type very common about the period when they were founded.........They did not represent a revolt against the tyranny of caste but only against the caste exclusiveness of Brahman-ascetics; caste as such was fully acknowledged by them. Lastly the Buddhist or Jain priest only acted as the spiritual guide of his followers; for their religious and ceremonial observances, Brahman priests had always to be called in." (Census Report of India for 1901. Vol. VI, Part 1, Page 158—foot note)। অর্থাৎ ডক্টর হোয়েরুল বলেন—ধর্ম্মের সংজ্ঞানুসারে বৌদ্ধধর্ম্ম ও জৈনধর্ম্মের কোনটিই প্রকৃত ধর্ম্ম নহে; ইহারা বরং তৎকালোপযোগী মঠাধিষ্ঠিত সন্ন্যাস সম্প্রদায় বিশেষের সাধারণ সঙ্ঘ মাত্র। এই দুই ধর্ম্ম জাতিবিভাগের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয় নাই; তাহারা ব্রাহ্মণসন্ন্যাসীদের জাতিপ্রথা-তিরোধান-প্রচেষ্টারই বিরোধিতা করিত; সুতরাং জাতি-প্রথা ইহারা মানিয়াই লইয়াছিল। তারপর বৌদ্ধ বা জৈন যাজকেরা তাঁহাদের শিষ্যগণের ধর্ম্মগুরুর কাজই করিতেন; কিন্তু

তাহাদের ক্রিয়াকাণ্ডাদি যাবতীয় আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে ব্রাহ্মণ যাজকেরাই আহূত হইতেন।

প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বলিয়াছেন—"বৌদ্ধশাস্ত্র সমস্ত যোগমূলক। অথর্ব্ববেদে যোগের উপদেশ অধিক" (শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ, ১ম সং, ২২০-২২১ পৃঃ)। তাহা হইলে দেখা গেল যে, বৌদ্ধধর্ম্ম ও জৈনধর্ম্ম যোগধর্ম্মাচারী সম্প্রদায়ের এক একটি শাখা মাত্র।

বুদ্ধদেবের জীবনী ও ধর্ম্মমত আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, তিনি বৈদিক যুগের আর্য্য ঋষিগণেরই প্রতীক। "হিন্দুধর্ম্মের সকল উচ্চ চিন্তাধারার চরম স্তরের খবর নিলে বৌদ্ধধর্ম্মের পরম তত্ত্বের সহিত ইহার কোন পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। এতদ্ভিন্ন বৌদ্ধসমাজে ধর্ম্মনিষ্ঠ শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ ও শ্রমণের তুল্য সম্মান। এইসব অবিসংবাদিত সত্য ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়াই আর্য্য ঋষিগণ, হিন্দুবেদান্তকেশরী শঙ্কর প্রভৃতি শ্রীশ্রীবুদ্ধদেবকে ঈশ্বরের নবম অবতাররূপে বন্দনা করিয়াছেন।" (উদ্বোধন, বৈশাখ ১৩৫৮ বাং)। কালবশে রূপান্তরিত হইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম বিকৃত আকার ধারণ করিয়াছিল। বিকৃত হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্মকে উদার সার্ব্বজনীন আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য মহর্ষি অষ্টাবক্র, ভগবান্ গোরক্ষনাথ, ভগবান্ মৎস্যেন্দ্রনাথ, ঋষি দত্তাত্রেয়, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য, পতিতপাবন গৌরাঙ্গদেব প্রমুখ হিন্দুধর্ম্মাচার্য্যগণ বিশেষভাবে চেষ্টা করিয়া সফলকাম হইয়াছিলেন। ফলে বিকৃত বৌদ্ধধর্ম্ম পুনরায় হিন্দুধর্ম্মের অঙ্গীভূত হইয়াছে।

উল্লিখিত আলোচনাসমূহ হইতে ধর্ম্মসংস্থাপনে, ধর্ম্মসংস্কারে ও ধর্ম্মসমন্বয়ে নাথগুরুগণের অসাধারণ প্রভাব ও ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়।

তৃতীয় অধ্যায়

নাথযোগিগণের প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত মঠমন্দির ও তীর্থস্থানসমূহ

"ধৈর্য্য ধর, ধৈর্য্য ধর, বাঁধ বাঁধ বুক।
শত দিকে শত দুঃখ আসুক আসুক॥" —(গোবিন্দদাস)

পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে আমরা দেখাইয়াছি যে, নাথযোগিগণ এক সময় বিশাল হিন্দুসমাজকে দীক্ষিত, নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিয়াছিলেন। ইহাদের বংশধরগণ অতীত ভারতের (অবিভক্ত) ধর্ম্মজগতে একচ্ছত্র প্রাধান্য লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। সমগ্র এশিয়া মহাদেশে তাঁহাদের বিজয় কেতন উড্ডীন হইয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভারতীয় সভ্যতায় ও সাহিত্যে নাথাচার্য্যগণের দান অতুলনীয়। ব্রাহ্মণোচিত যাবতীয় গুণের অধিকারী হইয়া যে নাথযোগিগণ সমগ্র ভারতে ও ভারতের বাহিরে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, দেবতার ন্যায় পূজিত হইয়াছিলেন, বহু মঠমন্দির এবং তীর্থস্থানের প্রতিষ্ঠা করিয়া শৈবধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, সেই নাথযোগিগণের প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত প্রধান প্রধান মঠমন্দির ও তীর্থস্থানসমূহের তালিকা ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

গুরুগীতাধৃত 'কঙ্কালমালিনীতন্ত্রে' দেখা যায়—

কনিষ্ঠাভ্যাং লং পৃথ্ব্যাত্মকং গন্ধং
অমুকানন্দ নাথায় ঐঁ শ্রীগুরবে সমর্পয়ামি নমঃ।
অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং হং আকাশাত্মকং পুষ্পং
অমুকানন্দ নাথায় ঐঁ শ্রীগুরবে সমর্পয়ামি নমঃ।
তর্জ্জনীভ্যাং যং বায়ব্যাত্মকং ধূপং
অমুকানন্দ নাথায় ঐঁ শ্রীগুরবে সমর্পয়ামি নমঃ।

মধ্যমাভ্যাং রং বহ্ন্যাত্মকং দীপং
অমুকানন্দ নাথায় ঐঁ শ্রীগুরবে সমর্পয়ামি নমঃ।
অনামিকাভ্যাং বং অমৃতাত্মকং নৈবেদ্যং
অমুকানন্দ নাথায় ঐঁ শ্রীগুরবে সমর্পয়ামি নমঃ।

মাদ্রাজের নাথদের যে গুরুপরম্পরা স্তোত্র প্রচলিত আছে, তাহার 'ললিতা-সহস্র স্তোত্রের' শেষের অংশে আছে—

"বাগভবানন্দনাথ শ্রীপাদুকাং নীলকণ্ঠানন্দনাথ
শ্রীসাংভ্রমানন্দনাথ শ্রীচিদাম্বানন্দনাথ শ্রীপ্রসন্নানন্দ
নাথ শ্রীআদিনাথানন্দনাথ শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ।"

তথাকার 'নিত্যোৎসব' গ্রন্থের প্রারম্ভে আছে—

"নত্বা ভাস্বরানন্দ নাথ পাদাম্বুজদ্বয়ং তনোম্যুমানন্দ নাথো
নিত্যোৎসব মনল্পধীঃ। নত্বা নাথপরম্পরাং শিবমুখ্যাং
বিঘ্নেশ্বরং শ্রীমহারাজ্ঞীং তৎসচিবাংস্তদীয় পৃতনানাথাংস্তেদন্তঃ পরাম্।"

মাদ্রাজের নাথদের সম্বন্ধে অনেক বিবরণ Farquhar সাহেবের 'An outline of the religious literature of India' গ্রন্থে পাওয়া যায়।

শ্রীনন্দলাল বসু প্রকাশিত 'উপাসনা পদ্ধতি'র ১২২ পৃষ্ঠায় গুরুকুলের তর্পণ প্রসঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায়—

"যেরূপ পিতৃকুল, মাতৃকুল সেইরূপ গুরুকুল আছে। প্রত্যেক দেবতার ত্রিবিধ গুরুপংক্তি যথা— দিব্যৌঘ, দেবতাস্থানীয়; সিদ্ধৌঘ, সিদ্ধ পুরুষ; মানবৌঘ, মনুষ্যরূপে অবস্থিত। দেবতা বিশেষে তাঁহাদের নাম ভিন্ন ভিন্ন। দিব্যৌঘের নাম—মহাদেবানন্দ নাথ, মহাদেব্যম্বা, ত্রিপুরানন্দ নাথ, ভৈরবানন্দ নাথ। সিদ্ধৌঘের নাম— ব্রহ্মানন্দ নাথ, পূর্ণদেবানন্দ নাথ, চলচ্চিত্তানন্দ নাথ, চলাচলানন্দ নাথ, কুমারানন্দ নাথ, ক্রোধানন্দ নাথ, বরদানন্দ নাথ, স্মরদীপানন্দ নাথ, মায়াদেব্যম্বা, মায়াবতী দেব্যম্বা। মানবৌঘের নাম— বিমলানন্দ নাথ, কুশলানন্দ

নাথ, ভীমসেনানন্দ নাথ, সুধাকরানন্দ নাথ, মীনানন্দ নাথ, গোরক্ষানন্দন াথ, ভোজদেবানন্দ নাথ, প্রজাপত্যানন্দ নাথ, মূলদেবানন্দ নাথ, রাস্তদেবানন্দ নাথ, বিঘ্নেশ্বরানন্দ নাথ, হুতাশনানন্দ নাথ, সময়ানন্দ নাথ, নকুলানন্দ নাথ, সন্তোষানন্দ নাথ। ইঁহাদের তর্পণ গুরুপাত্র হইতে, ঐঁ গুরু শ্রীঅমুকানন্দ নাথ বা অমুকী দেব্যম্বা শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ।"

৺জগন্মোহন তর্কালঙ্কার সঙ্কলিত ও শ্রীঅমৃতলাল কাব্যতীর্থ প্রকাশিত 'সনাতন ধর্ম্মানুষ্ঠান' তৃতীয় খণ্ডে (৩য় সংস্করণ, তন্ত্রোক্ত নিত্য পূজাপদ্ধতি) আছে—

"অনন্তর পূজাযন্ত্রের বায়ুকোণ হইতে ঈশান কোণ পর্য্যন্ত গুরুপংক্তির পূজা করিবে, যথা—(পাদুকা বা ঐঁ বীজ) মহাদেবী দেব্যম্বা শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (এইরূপ) মহাদেবানন্দ নাথ শ্রীপা; মহাকালানন্দ নাথ শ্রীপা; ত্রিপুরানন্দ নাথ শ্রীপা; ভৈরবানন্দ নাথ শ্রীপা। ইঁহারা দিব্যৌঘ গুরু। সিদ্ধৌঘ গুরু, যথা—ব্রহ্মানন্দ নাথ। পূর্ণদেবানন্দ নাথ। চলচ্চিত্তানন্দ নাথ। চলাচলানন্দ নাথ। কুমারানন্দ নাথ। ক্রোধানন্দ নাথ। বরদানন্দ নাথ। স্মরদীপানন্দ নাথ। মায়াদেব্যম্বা। মায়াবতী দেব্যম্বা। মানবৌঘ গুরুপংক্তি, যথা—বিমলানন্দ নাথ। কুশলানন্দ নাথ। ভীমসেনানন্দ নাথ। সুধাকরানন্দ নাথ। মীনানন্দ নাথ। গোরক্ষানন্দ নাথ। ভোজদেবানন্দ নাথ। প্রজাপত্যানন্দ নাথ। মূলদেবানন্দ নাথ। রন্তিদেবানন্দ নাথ। বিঘ্নেশ্বরানন্দ নাথ। হুতাশনানন্দ নাথ। সময়ানন্দ নাথ। (নকুলানন্দ নাথ) সন্তোষানন্দ নাথ। (পরে আপনার) গুরু, পরমগুরু, পরাপরগুরু, পরমেষ্ঠি গুরু। সর্ব্বত্র প্রথমে পাদুকা বা ঐঁ বীজ এবং অন্তে 'শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ' বলিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা অভাবে অক্ষত জলদ্বারা পূজা করিবে। পরে ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে, ভৈরবঋষি শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।" (১১৯—১২০ পৃঃ)

"অনন্তর পীঠের উত্তরে বায়ুকোণ হইতে ঈশান কোণ পর্য্যন্ত ক্রমশঃ গুরুপংক্তির পূজা করিবে। সর্ব্বত্র গুরুপূজার অগ্রে পাদুকামন্ত্র বা ঐঁ বীজ

যোগ করিতে হইবে। যথা (পাদুকা বা ঐঁ বীজ) উর্দ্ধকেশানন্দ নাথ বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ হূঁ ফট্ স্বাহা, উর্দ্ধকেশানন্দ নাথ শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (পাদুকা বা ঐঁ বীজ) ব্যোমকেশানন্দ নাথ শ্রীপাদুকাং বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ হূঁ ফট্ স্বাহা ব্যোমকেশানন্দ নাথ শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এইরূপ সর্ব্বত্র পূজামন্ত্র একই প্রকার, কেবল নাম মাত্র বিভিন্ন হইবে। এইরূপ নীলকণ্ঠানন্দ নাথ, বৃষধ্বজানন্দ নাথ। (ইঁহারা দিব্যোঘ গুরু)। বশিষ্ঠানন্দ নাথ, কুর্ম্মনাথানন্দ নাথ, মীননাথানন্দ নাথ, মহেশ্বরানন্দ নাথ, হরিনাথানন্দ নাথ। (ইঁহারা সিদ্ধৌঘ গুরু)। তারাবতী দেব্যম্বা, ভানুমতী দেব্যম্বা, জয়া দেব্যম্বা, বিদ্যা দেব্যম্বা, মহোদরী দেব্যম্বা, ফেরবী দেব্যম্বা, সুখানন্দ নাথ, পরানন্দ নাথ, পারিজাতানন্দ নাথ, কুলেশ্বরানন্দ নাথ, বিরূপাক্ষানন্দ নাথ। (ইঁহারা মানবৌঘ গুরু)।" (১৫০—১৫১ পৃঃ)।

"পীঠের উত্তরে বায়ুকোণ হইতে ঈশানকোণ পর্য্যন্ত গুরুপংক্তির পূজা করিবে। সর্ব্বত্র গুরুপূজায় প্রথমে পাদুকামন্ত্র বা ঐঁ বীজ যোগ করিয়া দিতে হইবে এবং শেষে 'শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ' যোগ হইবে। যথা—(পাদুকা বা ঐঁ বীজ) পরমাত্মানন্দ নাথ শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এইরূপ পরমানন্দ নাথ, পরমেষ্ঠ্যানন্দ নাথ, শুভোদয়ানন্দ নাথ, কৃষ্ণানন্দ নাথ, কলানন্দ নাথ। (ইঁহারা দিব্যোঘ গুরু)। নারদানন্দ নাথ, কাশ্যপানন্দ নাথ, শম্ভ্বানন্দ নাথ, ভার্গবানন্দ নাথ, কৌলিকানন্দ নাথ। (ইঁহারা সিদ্ধৌঘ গুরু)। রুদ্রাচার্য্যানন্দ নাথ, ক্ষমাচার্য্যানন্দ নাথ, পবনাশনানন্দ নাথ, কুমারীশানন্দ নাথ, শক্তিধরানন্দ নাথ, জ্ঞানানন্দ নাথ, প্রভাকরানন্দ নাথ, হরিশর্ম্মানন্দ নাথ, দত্তাত্রেয়ানন্দ নাথ, প্রিয়ংবদানন্দ নাথ, চর্য্যানন্দ নাথ। (ইঁহারা মানবৌঘ গুরু)। সশক্তিক গুরু —অমুকানন্দ নাথ, অমুকী দেব্যম্বা, সশক্তিক পরম গুরু অমুকানন্দ নাথ, অমুকী দেব্যম্বা, সশক্তিক পরম গুরু অমুকানন্দ নাথ, অমুকী দেব্যম্বা। সর্ব্বত্র প্রথমে পাদুকামন্ত্র বা ঐঁ বীজ এবং অন্তে শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ" (১৬৭, ১৬৮ পৃঃ)।

বৈষ্ণব গোস্বামীগণ প্রচারিত ও প্রকাশিত 'শ্রীশ্রীগুরু গীতা' গ্রন্থের মানস গুরু সম্পর্কে "অথ মুদ্রাভেদে মানসপূজার ক্রম" বিভাগে আছে—

"কনিষ্ঠাভ্যাং লং পৃথিব্যাত্মকং গন্ধং অমুকানন্দনাথায় ঐঁ শ্রীগুরবে সমর্পয়ামি নমঃ। অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং হুং আকাশাত্মকং পুষ্পং অমুকানন্দ নাথায় ঐঁ শ্রীগুরবে সমর্পয়ামি নমঃ। তর্জ্জনীভ্যাং যং বায়্বাত্মকং ধূপং অমুকানন্দ নাথায় ঐঁ শ্রীগুরবে সমর্পয়ামি নমঃ। অনামিকাভ্যাং রং অমৃতাত্মকং নৈবেদ্যং অমুকানন্দ নাথায় ঐঁ শ্রীগুরবে সমর্পয়ামি নমঃ।"

উল্লিখিত স্থলে নাথাচার্য্যদিগকে দেবতারূপে, সিদ্ধরূপে এবং মানবমধ্যে গুরুরূপে হিন্দুর পূজার্হ দেখিতেছি। আর ইহাও বুঝা যাইতেছে যে, নাথেরা শৈব, শাক্ত, গাণপত্য, বৈষ্ণব প্রভৃতি তৎকালে প্রচলিত সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের গুরু ছিলেন। আজকাল যত প্রকার গুরু প্রণালীকা প্রচলিত আছে, নাথেরা তাহার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। এক কথায় নাথেরা—জগদ্‌গুরু ছিলেন। সেই জন্য হিন্দুর অনেক দেবতার উপাধি 'নাথ'। যথা—বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ গোপীনাথ; দ্বারকার শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকানাথ; দক্ষিণকাঞ্চির শ্রীকৃষ্ণ রঙ্গনাথ; রামেশ্বরের শিব—রামনাথ; কাশীধামের শিব—বিশ্বনাথ; কাশ্মীরের শিব—অমরনাথ; চট্টগ্রামের শিব—চন্দ্রনাথ; বঙ্গোপসাগরের মহেশখালির দ্বীপের শিব—আদিনাথ; হুগলির শিব—তারকনাথ; জৈন্তাপর্ব্বতের শিব—রূপনাথ; কাছাড়ের ভুবন পাহাড়ের শিব—ভুবননাথ; মথুরার শিব—ভূতনাথ; শ্রীক্ষেত্রের (নীলাচলের) বিষ্ণু—জগন্নাথ; নেপালের শিব—পশুপতিনাথ; বৃন্দাবনের গিরিরাজ গোবর্দ্ধন—গোবর্দ্ধননাথজী; দক্ষিণ দেশের—শ্রীশ্রীবেঙ্কটনাথজী এবং ভারতের উত্তর প্রান্তস্থিত—অমরনাথ, বদরিনাথ, কেদারনাথ, পিছোড়নাথ, খোজোরনাথ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ হিন্দুতীর্থস্থানগুলির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে॥ ৪১

অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্।। ৪২
(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ)

শ্রীধর স্বামী উক্ত শ্লোকের টীকায় মোক্ষহেতু এ কুলে জন্ম দুর্লভ বলিয়াছেন—"এতদ্ধিলোকে দুর্লভতরং মোক্ষহেতুত্বাৎ"। মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ সম্পাদিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উক্ত শ্লোকের বঙ্গানুবাদে—"অথবা ধীমান্ যোগীদের কুলে (সেই যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি) জন্মলাভ করিয়া থাকেন। মনুষ্যলোকে এইপ্রকার যোগিগণের কুলে জন্ম (যোগভ্রষ্টগণের পক্ষে) দুর্লভতর"।। (৪২)। উক্ত গ্রন্থে আনন্দগিরি টীকায় নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ আছে—"অথবা ধনীদিগের কুল ব্যতিরেকে দরিদ্র অথচ বুদ্ধিমান্ যোগীদিগের কুলে (যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি) জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। এই দরিদ্র যোগীদিগের কুলে ইহা (যোগভ্রষ্ট ব্যক্তিগণের পক্ষে) ধনবান্দের কুলে জন্ম অপেক্ষা দুর্লভতর; যথোক্ত বিশেষণযুক্ত দরিদ্র-যোগিগণের কুলে জন্মই অধিকতর স্পৃহণীয়—ইহাই তাৎপর্য্য"।। (৪২)। শ্রীঅরবিন্দের ব্যাখ্যা অবলম্বনে শ্রীঅনিলবরণ রায় সম্পাদিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উক্ত শ্লোকের বঙ্গানুবাদে বলা হইয়াছে—"যোগভ্রষ্ট ব্যক্তির পক্ষে আরও উত্তম গতি হইতেছে, বুদ্ধিমান যোগীর গৃহে জন্মগ্রহণ; কারণ সেখানে তিনি পুনরায় যোগ অভ্যাসের অনুকূল শিক্ষা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রাপ্ত হন।" যোগী যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, নানা জন্ম ভ্রমণের পর মানব সর্ব্ববিধ পাপ ক্ষয় করিয়া শুদ্ধদেহ হইলে বিদ্যা ও ধনধান্যসমন্বিত হইয়া যোগীদের মহৎ কুলে জন্মগ্রহণ করেন—

"ততো নিষ্কাল্মষী ভূতাঃ কুলে মহতি যোগিনঃ।
জায়ন্তে বিদ্যয়োপেতা ধনধান্য সমন্বিতাঃ।।" ২১৮
(যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা—৩য় অধ্যায়)

পণ্ডিত গুরুনাথ বিদ্যানিধি সম্পাদিত গীতাতে 'কুল' শব্দে 'বংশ' বুঝায়, বলা হইয়াছে। পণ্ডিত রামকুমার স্মৃতিরত্ন 'কুল' পদে 'বংশ' না বুঝাইলে ইহার কোন সার্থকতা থাকে না বলিয়াছেন—"ইতি গীতালিখিত শ্লোকেন চ এষাং প্রাচীনত্বং খ্যাপয়তি, অন্যথা অত্র শ্লোকে কুলপদস্য বৈয়র্থ্যং স্যাৎ যতো যোগিনাং বংশাদিকং প্রয়োজনবহির্ভূতমিতি।"

শান্তিশতককার বলেন—"যোগভ্রষ্ট কুযোগাশ্চ তথা যোগিকুলোদ্ভবাঃ।" অর্থাৎ যোগভ্রষ্ট ও কুযোগিগণ যোগিকুলে জন্মগ্রহণ করেন।

শাস্ত্রশতকে আছে—"যোগভ্রষ্ট কুযোগাশ্চ বিপ্রা যোগিকুলোদ্ভবাঃ।" অর্থাৎ যোগভ্রষ্ট ও কুযোগিগণ যোগিব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন।

এই 'কুল' শব্দ যে বংশবাচক সে সম্বন্ধে সন্দেহ করা উচিত হইবে না।

আগম সংহিতায় আছে—"কশ্যপদুহিতা কৃষ্ণা বিন্দুনাথে সমর্পিতা।" অর্থাৎ কশ্যপ ঋষির কন্যা কৃষ্ণাকে বিন্দুনাথ বিবাহ করেন। কশ্যপ ঋষি একজন প্রজাপতি ছিলেন। দক্ষের ৬০টী কন্যার ১৩টীকে তিনি বিবাহ করেন। সেই ঋষিকুলশ্রেষ্ঠ কশ্যপ নাথযোগী বিন্দুনাথকে স্বীয় কন্যা সম্প্রাদান করেন। আগম সংহিতায় আরও দেখা যায়, বিন্দুনাথের ষোল জন পুত্রের মধ্যে দশজন গৃহত্যাগ করিয়া স্ব স্ব নামানুসারে গিরি, পুরী, ভারতী প্রভৃতি নামে এক একটী ধর্ম্ম সম্প্রদায় গঠন করেন *। যথা—"গিরিপুরীভারত্যাদি শৈলনাগা সরস্বতী রামানন্দী শ্যামানন্দী সুকুমারাচ্যুতস্তথা। এতে দশ গৃহং ত্যক্ত্বা ভ্রমন্তি দিগ্ দিগন্তরং।" তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, মহাপুরুষ চৈতন্যদেবের দুই জন দীক্ষাগুরু বিন্দুনাথের দুই সন্তানের প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত—

"তবেত করিলা প্রভু গয়াতে গমন।
ঈশ্বর পুরীর সঙ্গে তথহি মিলন॥

* গিরি, পুরী, ভারতী প্রভৃতি নামে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যদেবের দশনামী সম্প্রদায়ের কথাও শুনিতে পাওয়া যায়।

দীক্ষা অনন্তরে কৈল প্রেম পরকাশ
দেশে আগমন পুনঃ প্রেমের বিলাস ॥"
(শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

"কেশবভারতী আইলা নদীয়া নগরে ॥
প্রভু তারে নমস্কারি কৈলা নিমন্ত্রণ।
*   *   *   *   *   *
তুমিত ঈশ্বর বট-সাক্ষাৎ নারায়ণ।
কৃপা করি কর মোর সংসার মোচন ॥
*   *   *   *   *
এত বলি ভারতী গোসাঞি কাটোয়াতে গেলা।
মহাপ্রভু তাহা যাই সন্ন্যাস করিলা ॥"
(শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

অধঃপতিত অবস্থায় যোগিজাতির মোটামুটি আটশত বৎসর কাটিয়াছে। এই জাতির অধঃপতিত অবস্থার প্রায় মধ্যকালে শ্রীচৈতন্যপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণ ও প্রেম বিতরণ। সে সময় নাথ-সম্প্রদায়ের ঈশ্বর পুরী ও কেশব ভারতীর নিকট চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসের দীক্ষাগ্রহণ অভিজাত সম্প্রদায় সহ্য করিবেন কেন ?

"গোপীনাথ কহে ইহার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
গুরু ইহার কেশব ভারতী মহামান্য ॥
সার্ব্বভৌম কহে এই নাম সর্ব্বোত্তম।
ভারতী সম্প্রদায় ইঁহো হয়েন মধ্যম ॥
গোপীনাথ কহে ইহার নাহি বাহ্যাপেক্ষা।
অতএব বড় সম্প্রদায় করিল উপেক্ষা ॥"
(শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

দেশবিদেশে নাথতীর্থ, শিলালিপি ও শিলামূর্ত্তি

নাথযোগিগণ শৈব ছিলেন। শৈবধর্ম্মের প্রাবল্যের কাল হইতে ভারতে ও ভারতের বাহিরে (সমগ্র এশিয়া ব্যাপিয়া) শৈবনাথতীর্থ, শিলালিপি ও শিলামূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে। এখনও ইহাদের অনেকগুলি বিদ্যমান থাকিয়া শৈবনাথদিগের অতুল কীর্ত্তির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এমন একদিন ছিল যখন ইহাদের প্রায় সবগুলিই নাথদিগের আয়ত্তাধীন ছিল। এগুলি সর্ব্ববর্ণের হিন্দুর অতি পবিত্র তীর্থরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। কিন্তু কালক্রমে বহু তীর্থের তীর্থগুরুর পদ হইতে নাথেরা বিচ্যুত হইয়াছেন। তবুও ভারতে ও ভারতের বাহিরের যে সব তীর্থভূমিতে এখনও নাথদের পূজা হইতেছে, তাহার সংখ্যাও নগণ্য নহে। নিম্নে তাহার কতকগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

নেপালে মৎস্যেন্দ্রের শৈব বিগ্রহ—ডক্টর শ্রীমতী কল্যাণী মল্লিক তাঁহার 'নাথপন্থ' গ্রন্থে বলেন—"মৎস্যেন্দ্র শৈব যোগীর বেশেই নেপালে শৈবধর্ম্ম প্রচার করিতে যান এবং তাঁহার রচিত 'কৌলজ্ঞান নির্ণয়' নামক পুঁথিতে বৌদ্ধধর্ম্মের উল্লেখ মাত্র নাই। পরবর্ত্তী কালের পুঁথিমধ্যেও বৌদ্ধ-ধর্ম্মের কোন কথা পাওয়া যায় না; শিব ও শক্তির কথাই পাওয়া যায়। * * * * মৎস্যেন্দ্র শৈবযোগী হইয়াও নেপালী বুদ্ধদের মধ্যে চতুর্থ বোধিসত্ত্ব অব-লোকিতেশ্বর অবতাররূপে উপাস্য হইলেন কিরূপে, তাহাই বিস্ময়ের বিষয়। * * * * নেপালে মৎস্যেন্দ্রের শৈববিগ্রহও আছে। ৭পৃঃ। * * * * শৈবপন্থী মৎস্যেন্দ্রের নেপালের প্রধান দেবতারূপে অর্চ্চিত হওয়া বাস্তবিক বিস্ময়জনক। নেপালে শৈবযোগীর বেশে মৎস্যেন্দ্র শৈবধর্ম্মই প্রচার করেন, তাঁহার মন্ত্র ও তীর্থাদিও শৈব, শৈবযোগীরাই যে প্রথমে সহজবোধ্য সংস্কৃত ও বাঙ্গলা ভাষায় পদ রচনা করেন—তাহা নিঃসন্দেহ। অতএব মৎস্যেন্দ্র কোন-ক্রমে বৌদ্ধ হইতে পারেন না। ২১পৃঃ। * * * * * মৎস্যেন্দ্রের রথযাত্রা

আমাদের দেশের জগন্নাথের রথযাত্রার মত মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্যচ্যুত নেপালরাজ শ্রীবসন্ত দেবজী মৎস্যেন্দ্রের আশীর্ব্বাদে স্বীয় রাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইলে, প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে ভোগমতী নদীতীরে তাঁহার উৎসবের ব্যবস্থা করেন।" ২০ পৃঃ।

নেপালে মৎস্যেন্দ্র নাথের মন্দির ও স্মৃতিফলক—ইহার অন্য নাম বাঙ্গমতী অবলোকিতেশ্বরের মন্দির। ৭৯২ নেপালাব্দে (১৬৭২ খৃঃ অব্দে) নেপালরাজ শ্রীনিবাস কর্ত্তৃক উক্ত মন্দিরের তোরণ সহিত স্বর্ণদ্বার স্থাপিত হয়। ইহার শিলালিপিতে আছে,—

"শ্রীলোকেশ্বরায় নমঃ—
মৎস্যেন্দ্রং যোগিনাম্ মুখ্যাঃ শাক্তাশক্তি বদন্তি যৎ।
বৌদ্ধাঃ লোকেশ্বরং তস্মৈ নমঃ ব্রহ্মস্বরূপিনে॥
নেপালাব্দে লোচনাচ্ছিদ্র সপ্তে
শ্রীপঞ্চম্যাং শ্রীনিবাসেন রাজ্ঞা
স্বর্ণদ্বারং স্থাপিতং তোরণেন
সার্দ্ধং শ্রীলোকনাথস্য গেহে।"

(Inscription from Nepal in Indian Antiquary vol. IX)

অর্থাৎ যোগিগণের শ্রেষ্ঠগণ যাঁহাকে মৎস্যেন্দ্র বলেন, শাক্তগণ যাঁহাকে শক্তি বলেন, সেই ব্রহ্মস্বরূপ লোকেশ্বরকে প্রণাম করি। ৭৯২ নেপালাব্দে শ্রীপঞ্চমী তিথিতে শ্রীনিবাস রাজা কর্ত্তৃক লোকনাথের মন্দিরের তোরণ সহিত স্বর্ণদার স্থাপিত হইল।

নেপালরাজ নরেন্দ্রদেবের সময় নেপালে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল ছিল। সে সময় দ্বাদশবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষে নেপাল ধ্বংসমুখে ধাবিত হইয়াছিল। নেপালের বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ বা অন্য কোনও ধর্ম্মের সাধকগণ সেই দুর্নিবার দুর্য্যোগ নিবারণ করিতে পারেন নাই। সে সময় মৎস্যেন্দ্রনাথকে তৎকালীন প্রসিদ্ধ নাথধর্ম্মের

অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন সিদ্ধপুরুষ জানিয়া নেপালাধিপতি তাঁহাকে স্বরাজ্যে বিশেষভাবে আহ্বান করেন এবং তাঁহার সাধনশক্তিবলে নেপালের সেই দীর্ঘকালব্যাপী অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ নিবারিত হয়। তদবধি নেপালের বৌদ্ধগণ মৎস্যেন্দ্রনাথের শিষ্য হইয়া ক্রমে ক্রমে হিন্দুভাবাপন্ন হইতে আরম্ভ করেন। এই কারণেই উদ্ধৃত শ্লোকে দেখা যাইতেছে, নেপালরাজ বাঙ্গালী মৎস্যেন্দ্রনাথকে (৪র্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া প্রণাম করিয়াছেন।

হডসন সাহেব বলেন—"Sree Narendra Dev became Raja of Bhagapattana (ভাটাগাঁওন). He was a disciple of Bandhu Dutta Acharjya and brought Arya-Abalokiteswar from Putalak Parbata (in Assam) to the city of Lalitpattana in Nepaul. The reason of inviting this nobility to Nepaul was a draught of twelve years of great severity. * * * * is the above Abalokiteswar the same as Matsyendra Nath whose arrival in Nepaul is referred to in the fifth century of Christ by the well-known memorial verses? The identification with Padmapani rests on the Sastras of Nepaul and China." (R. A. S. J. Series VII, part I, page 137).

অর্থাৎ নরেন্দ্র দেব বাঘপত্তনের রাজা হন। তিনি বন্ধুদত্ত আচার্য্যের শিষ্য ছিলেন। দ্বাদশ বর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য আর্য্যাবলোকিতেশ্বরকে তিনি আসামের পুতলক পর্ব্বত হইতে নিমন্ত্রণ করিয়া ললিতপত্তনে আনিয়াছিলেন। পাদটীকায় তিনি বলিয়াছেন—এই আর্য্যাবলোকিতেশ্বরই কি মৎস্যেন্দ্রনাথ, খৃঃ অব্দ পঞ্চম শতাব্দীতে যাঁহার নেপাল আগমনবার্ত্তা বিখ্যাত স্মৃতিফলকের শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছিল? পদ্মপাণি ও মৎস্যেন্দ্রনাথ যে একই ব্যক্তি তাহা নেপাল ও চীনের শাস্ত্রানুসারে প্রতিপন্ন হয়।

ধর্ম্মজগতে মৎস্যেন্দ্রনাথের স্থান অতি উচ্চে। বুদ্ধদেব যেমন হিন্দুর নিকট ভগবানের অবতার বলিয়া পূজিত, বাঙ্গালী মৎস্যেন্দ্রনাথও তেমনি বৌদ্ধদের

নিকট বুদ্ধদেবের অবতার বলিয়া পূজিত। ইহা হিন্দুর, বিশেষ করিয়া বাঙ্গলীদের পরম গৌরবের কথা। রাজা নরেন্দ্রদেব কর্ত্তৃক যিনি নেপালে আহূত হইয়াছিলেন, তিনিই যে মৎস্যেন্দ্রনাথ বা অবলোকিতেশ্বর তাহা বিখ্যাত চীন-পর্য্যটক হুয়েনসাঙও স্বীকার করিয়াছেন—"The temple of Abolokiteswar called Mytsyendra Nath by the common people is situated in the centre of the village. The image which it contains is made of mud and covered with silver plates. It remains half of the year only in this temple and during the other six months it is kept at Lalitpattam (Indian Antiquary vol. IX, page 169)। অর্থাৎ অবলোকিতেশ্বরের মন্দিরকে জনসাধারণ মৎস্যেন্দ্রনাথের মন্দির বলিয়া থাকে। মন্দিরটি গ্রামের মধ্যস্থলে অবস্থিত। মন্দিরস্থিত বিগ্রহ মৃন্ময়, কিন্তু রৌপ্যমণ্ডিত। বৎসরের অর্দ্ধেক অর্থাৎ ছয় মাসকাল বিগ্রহ এই মন্দিরে অবস্থান করেন এবং আর ছয় মাস ললিতপত্তনে রক্ষিত হন।

হড্‌সন সাহেবের Language Literature and Religion of Nepal and Tibet গ্রন্থে এ সম্বন্ধীয় বিবরণ আছে। রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটীর পুস্তকাগারে হড্‌সন সাহেবের সংগৃহীত নেপাল ও তিব্বতের অনেক পুস্তক আছে। তাঁহার সংগৃহীত কয়েকখানি পুস্তক কেম্ব্রিজ ও প্যারিসে প্রেরিত হয়। প্যারিস হইতে এই সব পুস্তকের সারভাগ ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত হয়। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ইহাদের অতি সংক্ষিপ্ত সার সঙ্কলন করিয়াছিলেন। এই সকল পুস্তকের অনুসন্ধান আবশ্যক। পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি আসামের পুতলক পর্ব্বত হইতে মৎস্যেন্দ্রনাথকে নেপালে লওয়া হইয়াছিল। পুতলক পর্ব্বত চারিটি বলিয়া কয়েকজন পণ্ডিত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে একটি তিব্বতের রাজধানী লাসা নগরীতে, একটি চীনের পূর্ব্বপ্রান্তে,

আর একটি ভারতের দক্ষিণে কন্যা কুমারিকার নিকট এবং চতুর্থটি সিন্ধু নদীর মোহনায় বলিয়া তাঁহাদের বিশ্বাস। এই চারি স্থানেই মৎস্যেন্দ্রনাথের বিহার-ভূমি ছিল।

"কথিত আছে মৎস্যেন্দ্রনাথ তিনটি প্রধান নদীর মোহনায় স্বীয় আশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন। প্রথমটি চীন দেশের প্রধান নদীর মোহনায় চুস্থান দ্বীপ-পুঞ্জের পুটো দ্বীপে। এখানকার লোকেশ্বর বা কোয়ানইন মন্দির জগদ্বিখ্যাত। দ্বিতীয়টি গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের মোহনায়—খুব সম্ভব মহেশখালি দ্বীপে কিংবা সাগর দ্বীপে। * * * * আর একটি সিন্ধু নদীর মোহনায় কচ্ছ প্রদেশে। এখানেও ধীনোধর প্রভৃতি স্থানে নাথপন্থী সন্ন্যাসীদের প্রভুত্ব আজিও বিদ্যমান আছে। উক্ত আছে, সারা বৌদ্ধজগতের পূজ্য নাগার্জ্জুনও এই অবলোকিতে-শ্বরের (মৎস্যেন্দ্রনাথের) কৃপায় চণ্ডিকাসিদ্ধ হন এবং মহারাজ শিলাদিত্য হর্ষবর্দ্ধন ইহার কৃপায় ভারত সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হন।"* ভারতসভ্যতায় নাথধর্ম্মের দান—পুরাতত্ত্ব বিশারদ শ্রীভোলানাথ নাথ, এম-এ)।

৺অক্ষয়কুমার দত্ত বলেন—"নেপাল অতি বিস্তীর্ণ স্বাধীন রাজ্য। এই রাজ্যে বহুসংখ্যক প্রাচীন নাথযোগীর নিবাস আছে। তাঁহারা প্রায় সকলেই যোগমার্গে রত এবং ঐ প্রদেশস্থ সমস্ত হিন্দুজাতির অর্থাৎ চতুর্ব্বর্ণের গুরুপদে বরণীয়। * * * * নেপালাধিপতি বহুকাল হইতে নাথগুরুর শিষ্য। এখানে যোগী গোরক্ষনাথজী ও মৎস্যেন্দ্র (মীননাথ) নাথজীর প্রসিদ্ধ দুইটি মঠ অদ্যাপি বর্ত্তমান থাকিয়া নাথবংশীয় যোগীদিগের পবিত্র জাতিত্বের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ঐ মঠদ্বয় বাঘমতী নদীর পূর্ব্বধারে পর্ব্বতোপরি স্থাপিত এবং পর্ব্বত-অধিত্যকা হইতে নদীকূল পর্য্যন্ত প্রস্তরনির্ম্মিত ঘাট আছে। এই ঘাট বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। বিখ্যাত পবিত্র তীর্থস্থান—'পশুপতি নাথ' এই স্থানে অবস্থিত। * * * * এই দেবমন্দির প্রস্তরনির্ম্মিত ঘাট এবং বহুসংখ্যক

* হুয়েনসাঙ সিয়ুকী

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির দ্বারা পরিশোভিত। এই সকল মন্দির ও দেবালয়ের সেবাদির জন্য বহুসংখ্যক নাথযোগী সর্ব্বদা নিযুক্ত রহিয়াছেন। ঐ সকল মন্দিরের পূজাদির ব্যয় নেপালেশ্বর স্বয়ং বহন করিয়া থাকেন। এ জন্য তাঁহাকে মাসিক পাঁচ সহস্রেরও অধিক টাকা ব্যয় করিতে হয়।" (ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় —২য় ভাগ)

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু বলেন—"নেপালের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা মৎস্যেন্দ্রনাথ। পাটনের অন্তর্গত ভোগমতী গ্রামে এই মন্দির ও লিঙ্গ স্থাপিত। বৎসরের প্রথম দিন (বৈশাখের প্রথম দিন) প্রথম (মৎস্যেন্দ্রনাথের) উৎসব আরম্ভ হয়। ঐ দিন বিগ্রহের স্নানান্তে রাজার তরবারি তাঁহার পাদদেশে রাখিয়া পূজা করা হয়। পূজান্তে একখানি সুসজ্জিত রথে মৎস্যেন্দ্রনাথের মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া পাটনে লইয়া যাওয়া হয় এবং তথায় প্রায় এক মাস অবস্থানের পর পুণ্যদিনে ও শুভলগ্নে তাঁহাকে পুনরায় ভোগমতী গ্রামে আনয়ন করা হয়। * * * পাটন হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় পথিমধ্যে যে যে স্থানে সেবকদের আহারের জন্য বিগ্রহের অনুষ্ঠান হয়, তথাকার অধিবাসিগণ খাদ্যদ্রব্যাদি সরবরাহ করিয়া থাকে। নেবারগণের মধ্যেও নেপালের অধিষ্ঠাতা অবলোকিতেশ্বর মৎস্যেন্দ্রনাথদেবের বড় ও ছোট দুইটী পর্ব্বদিন ধার্য্য আছে। নেপালে ছোট মৎস্যেন্দ্রনাথ যাত্রা নামে আর একটি উৎসব প্রচলিত আছে। চৈত্র মাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে এই পার্ব্বণোৎসব হইয়া থাকে। ইহার স্থিতি চারি দিন। * * * প্রথম দিন রাসীপোখরা হইতে আসনতাল, পরদিন আসনতাল হইতে দরবার, তৃতীয় দিনে দরবার হইতে নাথনতাল এবং চতুর্থ দিনে ঐ সকল স্থান হইতে ঘুরিয়া পুনরায় রাসীপোখরায় রথ ফিরিয়া আইসে।" (বিশ্বকোষ)

অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ বলেন— নেপালের অধিষ্ঠাতৃদেব মচ্ছীন্দ্র-নাথের একটী উৎসব নেপালে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বোগমতী গ্রামে মচ্ছন্দ্র-নাথের একটী মন্দির আছে। সেই মন্দিরে তাহার বিগ্রহও আছে। বৈশাখের

প্রথম দিন উৎসবের অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। ঐ দিন মচ্ছীন্দ্রনাথকে পবিত্র জলে স্নান করান হয় এবং রাজার তরবারিও তাঁহাকে দেওয়া হয়। তারপর বিগ্রহটীকে প্রকাণ্ড রথে আরোহণ করাইয়া পাটনে লইয়া যাওয়া হয়। রথমধ্যে একটি সুন্দর আসন পত্র-পুষ্পে সজ্জিত করা হয়। এইরূপে অলঙ্কৃত করিয়া রথটীকে টানিয়া লইয়া যাওয়া হয়। * * * সাধারণতঃ সাত দিন রথযাত্রা হইয়া থাকে। নেপালে এই শুভদিনের একটী বিশেষ নাম আছে। ইহাকে তাঁহারা 'গুদরি ঝাড়' বলিয়া থাকে। গুদরি শব্দের অর্থ কম্বল। ঐ দিন সকলের সম্মুখে মচ্ছীন্দ্রনাথের কম্বল ঝাড়া হয়। কম্বল ঝাড়িয়া তাহারা দেখাইতে চায় যে, মচ্ছীন্দ্র কিছুই সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেছেন না। ইহার অর্থ এই যে, মচ্ছীন্দ্র সর্ব্বশূন্য হইয়াও সন্তুষ্ট। নেপালে মৎস্যেন্দ্রনাথের ও গোরক্ষনাথের দুইটী মন্দির আছে। মন্দির দুইটী বাগমতী নদীর পূর্ব্বতীরে পর্ব্বতের উপর। * * * * * মৎস্যেন্দ্রের শিষ্য হইয়াও গোরক্ষনাথ গুরুকে পুণ্যে অতিক্রম করিয়াছিলেন। ভারতের সর্ব্বত্র গোরক্ষনাথ পূজিত। অনেক তীর্থস্থানে গোরক্ষনাথ পূজিত। অনেক তীর্থস্থানে গোরক্ষনাথের মন্দির আছে।"

(প্রবাসী—ফাল্গুন, ১৩২৮ বাং)

তিব্বতে মৎস্যেন্দ্রনাথ বা অবলোকিতেশ্বরের জীবন্ত মূর্ত্তি— চীন পর্য্যটক হুয়েন্‌সাঙ বলেন, মৎস্যেন্দ্রনাথ নেপাল ও তিব্বতের জাতীয় দেবতা। লাসা নগরীর কথিত কাঞ্চন নির্ম্মিত মৎস্যেন্দ্রনাথের জীবন্ত মূর্ত্তি আজিও দর্শকের যুগপৎ ভক্তি ও বিস্ময় উৎপাদন করে। যদি কেহ মৎস্যেন্দ্রনাথ বা অবলোকিতেশ্বরকে দেখিবার মানসে যথারীতি উপবাস করিয়া একমনে তাঁহাকে আহ্বান করেন, তাহা হইলে মৎস্যেন্দ্রনাথ-প্রতিমা হইতে জ্যোতির্ম্ময় রূপে দর্শকের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। হুয়েন্‌সাঙ আরও বলেন,"ধর্ম্মজগতে মৎস্যেন্দ্রনাথের স্থান অতি উচ্চে। তিনি যখন ভারতভ্রমণে আসিয়াছিলেন সে সময় তিনি সারা ভারতভূমি ব্যাপিয়া মৎস্যেন্দ্রনাথের মূর্ত্তি পূজিত হইতে দেখিয়া-

ছিলেন। সেগুলির মধ্যে কাশ্মীরের উদয়নের ও মাদ্রাজের ত্রিলোকের মন্দির প্রসিদ্ধ ছিল।

চীন ও জাপানে মৎস্যেন্দ্রনাথ— মৎস্যেন্দ্রনাথ বা অবলোকিতেশ্বর চীন ও জাপানে কানসাইন নামে পূজিত হইতেছেন। "It is well-known that Abalakiteswar is venerated in China and Japan as the God or Being who hears the cries of men (Kwan-shai-yin). I need not remark that the worship of any divinity on abstract grounds is foreign to the principles of Buddhism; nevertheless we find the worship of Amitabha and Kwan-shai-yin almost universally prevalent in the countries above named." (J. A. R. S. 1883. vol. XV. page 333)

অর্থাৎ ইহা সুবিদিত যে, অবলোকিতেশ্বর চীন ও জাপানে ব্রহ্ম বা পরম-পুরুষ রূপে পূজিত হন; তিনি মানবের ক্রন্দন-ধ্বনি শুনিতে পান। বৌদ্ধধর্মে দেব-দেবীর ভাবাত্মক পূজা প্রচলিত নাই— তাহা বলাই অনাবশ্যক। তাহা সত্ত্বেও আমরা দেখিতে পাই যে, অমিতাভ ও কান সাইনের পূজা উপরোক্ত দেশগুলিতে প্রায় সার্ব্বজনীন ভাবেই সমাদৃত।

ইলোরার আদিনাথ ও মৎস্যেন্দ্রনাথ সভা:— আদিনাথ ও মৎস্যেন্দ্রনাথের নাথধর্ম্ম বিন্ধ্যপর্ব্বত অতিক্রম করিয়া দাক্ষিণাত্যেও প্রবেশ করিয়াছিল। এই জন্যই ইলোরার দুই গোমফা তাঁহাদের নামে খ্যাতণ যথা— (১) "আদিনাথ সভা" ও (২) "মৎস্যেন্দ্রনাথ সভা"। (যোগিসখা—বৈশাখ হইতে আষাঢ়, ১৩৫৩ বাং, ১১ পৃঃ)

ডক্টর শ্রীমতী কল্যাণী মল্লিক বলেন—"কাশ্মীর, নেপাল, সিকিম, নেপালের অনতিদূরে তুলসীপুর, নৈনিতাল, আলমোরা, হরিদ্বার প্রভৃতি স্থানে গোরক্ষনাথ ও মৎস্যেন্দ্রনাথের সহিত যুক্ত নানাস্থান, মঠমন্দির প্রভৃতি আছে।" (নাথপন্থ—১৭পৃঃ)

পুটোদ্বীপে মৎস্যেন্দ্রনাথ ঃ—চীন সাম্রাজ্যের চুসান দ্বীপপুঞ্জের পুটো দ্বীপে মৎস্যেন্দ্রনাথের মন্দির প্রসিদ্ধ। এখানকার অপরাপর দেবমূর্ত্তিও ভারতীয় হিন্দুর। (Edkin Page 263)। মৎস্যেন্দ্রনাথের মূর্ত্তি বালি, জাভাদ্বীপ, ভোটান প্রভৃতি স্থানেও দৃষ্ট হয়। রেঙ্গুনের ষ্ট্যাণ্ড রোডে চীনাগণ কর্ত্তৃক স্থাপিত অবলোকিতেশ্বরের বা মৎস্যেন্দ্রনাথের মন্দির সুবিখ্যাত। প্রতি বৎসর নভেম্বরের প্রথমে এখানে তাঁহার জন্মোৎসব হয়।

"নেপালে তারা দেবীর মন্দির আছে। এরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, মৎস্যেন্দ্রনাথ বা অবলোকিতেশ্বরের একটী অশ্রুবিন্দু হইতে যে হ্রদের উৎপত্তি হইয়াছিল, সে হ্রদে একটী প্রস্ফুটিত পদ্ম জন্মে। সেই পদ্মের ভিতর তারা দেবীকে পাওয়া যায়। তারা দেবী শক্তিদেবীদের ও দশমহাবিদ্যারও অন্যতমা। এই শক্তিবাদের প্রতিষ্ঠা ও প্রসারে বাঙ্গালা দেশই অগ্রণী ছিল।" (ভারতে শক্তিপূজার বৈচিত্র্য—দেশ, শারদীয়া সংখ্যা ১৩৪১ বাং, ৭৯-৮২ পৃঃ)

"মৎস্যেন্দ্রনাথ নাথসম্প্রদায়ের একজন প্রসিদ্ধ সাধু, এবং আদিনাথের শিষ্য ছিলেন। গোরক্ষনাথ মৎস্যেন্দ্রনাথের শিষ্য। নাথপন্থীদের মতে মৎস্যেন্দ্রনাথ ও গোরক্ষনাথ উভয়েই বিষ্ণুর অবতার ছিলেন।" (মানসী ও মর্ম্মবাণী —পৌষ, ১৩২৯ বাং)

এইভাবে ভগবান্ মৎস্যেন্দ্রনাথ বহুরূপে ও বহু নামে উপাসিত। মৎস্যেন্দ্রনাথ ও নাথধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিবরণ রেভারেণ্ড বিল সাহেব অনুবাদিত হুয়েন্‌সাঙ-এর সিয়ুকী গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে ও দ্বিতীয় খণ্ডে প্রদত্ত হইয়াছে।

গোরক্ষ পাহাড়ে গোরক্ষমন্দির ঃ—মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন—"নেপাল ও তিব্বতের বহু দেবমন্দিরে ও তীর্থস্থানে এখনও বহু নাথের পূজা অর্চনা হইয়া থাকে। এখনও গোরক্ষনাথ সমস্ত গোর্খা জাতির শ্রেষ্ঠ দেবতা বলিয়া পূজিত হন। গোরক্ষ পাহাড়ের গোরক্ষমন্দির এখনও সহস্র সহস্র তীর্থযাত্রীর পুণ্য পীঠস্থান বলিয়া পরিচিত। * * * * ভারতবর্ষের

সমতল ভূমিতেও গোরক্ষনাথের বিস্তর মন্দির আছে।" (মডার্ণ বুদ্ধিজম্—ভূমিকা)। অধ্যাপক অক্ষয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—"নেপাল অঞ্চলে গোর্খা নামে একটী জাতি আছে, তাহারা তাহাদের সাহস ও বীর্য্যের জন্য সুপরিচিত। তাহারা বলিয়া থাকে যে, গোরক্ষনাথজী নেপালে থাকিয়া দ্বাদশ বৎসর কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার তপস্যার স্থান তাঁহারই নামে গোর্খা বলিয়া পরিচিত এবং সেই স্থান ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের অধিবাসিগণ তাঁহার ভক্ত ও শিষ্য বলিয়া তাঁহার নামানুসারে গোর্খা বলিয়া আপনাদের পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। তাহা হইতেই গোর্খা জাতির উৎপত্তি। * * ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই তাঁহার নামানুসারে অনেক স্থানের ও অনেক মন্দিরের নামকরণ করা হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ে লিখিত আছে, পশ্চিমোত্তর প্রদেশে তাঁহার নামে নানা স্থানের নাম শুনিতে পাওয়া যায়।" ("যোগিগুরু গোরক্ষনাথ"—পল্লীশ্রী, ২য় সংখ্যা, ১৩৩১ বাং)

গোরক্ষনাথের মূর্ত্তি—নেপালের পূর্ব্বতন রেসিডেণ্ট হডসন সাহেব রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটীর জার্নেলের ১৮শ খণ্ডে গোরক্ষনাথের তিনটী চিত্র প্রকাশ করিয়াছেন। একটী চিত্র নেপালের রাজধানী কাঠমুণ্ডুর ইন্দ্রচোক স্থানের মন্দিরের বিগ্রহ দৃষ্টে গৃহীত; অপর দুইখানি চিত্র তিব্বতের 'Illuminated' (আলোকদীপ্ত) পুঁথি হইতে সংগৃহীত। সিকিম দেশের এক বিহারে তিনটী মূর্ত্তি আছে। ইহার মধ্যস্থ মূর্ত্তি শুভ্রবর্ণ অমিতাভ ধ্যানীবুদ্ধ, দক্ষিণে গৌতমবুদ্ধ এবং বামে গোরক্ষনাথ।

ডক্টর তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত, এম্. এ., পি. এচ্. ডি. বলেন—" * * * হডসন সাহেব (B. H. Hadgan) J. R. A. S-এর অষ্টাদশ খণ্ডে মৎস্যেন্দ্রনাথের একটি এবং গোরক্ষনাথের তিনটি চিত্র দিয়া মন্তব্য করিয়াছেন যে, মৎস্যেন্দ্রনাথের আকৃতি চতুর্থ ধ্যানীবোধিসত্ত্বের অনুরূপ। পক্ষরথী গ্রন্থের আলোচনায় ইহার অনেকটা শৈবভাব লক্ষিত হয়। 'উড়িষ্যার জগন্নাথদেবের

ন্যায় নেপালে মহাসমারোহের সহিত ইহার রথযাত্রা সম্পন্ন হইয়া থাকে। * * * মৎস্যেন্দ্রনাথ, গোরক্ষনাথ প্রভৃতি নাথপন্থী সিদ্ধাগণ এক একটী ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক।" (নাথধর্ম্ম—প্রবর্ত্তক, অগ্রহায়ণ ১৩৪৪ বাং)

কালীঘাটের কালীমন্দির—সাহিত্যাচার্য্য রায় দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর বলেন—"গোরক্ষবিজয় হইতে আভাষ পাওয়া যায় যে, এই যোগীই (গোরক্ষনাথ) কালীঘাটের কালী প্রতিষ্ঠিত করেন। বিশ্বকোষ অভিধানে বহুপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল যে, লৌকিক প্রবাদ এই যে, গোরক্ষনাথই কালীঘাটের কালীর প্রতিষ্ঠাতা। যখন এ কথা লিখিত হইয়াছিল, তখন গোরক্ষবিজয়ের অস্তিত্ব কেহ জানিত না। সুতরাং এই উক্তি প্রাচীন প্রবাদকে দৃঢ়ীভূত করিতেছে। সমস্ত ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া গোরক্ষনাথের শিষ্য সম্প্রদায় বিদ্যমান।"

(বঙ্গভাষা ও সাহিত্য)

গোরক্ষকূপা—ইহা পাঞ্জাবের শিয়ালকোটের নিকট অবস্থিত। শালিবাহন রাজার পুরাণ ভাগবত নামক পুত্রের রূপে দ্বিতীয়া রাজমহিষী মুগ্ধা হইয়া নিজের কু-অভিসন্ধি পূর্ণ করিতে চাহিলে রাজপুত্র তাহাতে অসম্মত হন। ইহাতে ক্ষুব্ধা হইয়া রাজরাণী পুরাণ ভাগবতের বিরুদ্ধে সতীত্বনাশের অভিযোগ করিলে রাজার আদেশে ঘাতকেরা পুরাণ ভাগবতের হাত-পা ছিন্ন করিয়া তাহাকে একটী কূপে নিক্ষেপ করে। গোরক্ষনাথের কৃপায় পুরাণ ভাগবত বাঁচিয়া উঠে এবং গোরক্ষনাথের নিকট দীক্ষিত হয়। ঐ কূপ আজও বিদ্যমান্ আছে। বন্ধ্যা নারীরা পুত্রকামনায় আজও এখানে 'হত্যা' দেয়। এখানে একটী শিবলিঙ্গ বিদ্যমান আছে। (Romantic Tales from the Punjab by Charles Swynnerton)

গোরক্ষপুর—ইহা যুক্তপ্রদেশের একটী বড় সহর ও গোরক্ষপুর বিভাগের কেন্দ্রস্থান। গোরক্ষনাথের নামানুসারে ইহার নামকরণ করা হইয়াছে—তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। লৌকিক প্রবাদ এই যে, স্থানীয় পাহাড়ে গোরক্ষনাথ

তপস্যা করিয়া সর্ব্বসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। গোরক্ষনাথের অন্তর্ধানের পর তদীয় শিষ্যমণ্ডলী তাঁহার ছত্র, দণ্ড, ও পাদুকা সংগ্রহ করিয়া আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। স্থানটী শৈব হিন্দুদের পরম পবিত্র তীর্থ। নেপাল, তিব্বত, ভোট প্রভৃতি দেশ হইতে ভক্তেরা এখানে আসিয়া গোরক্ষনাথের পূজা দিয়া থাকেন। স্থানটী গোরক্ষপুর সহর হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে অবস্থিত। খ্যাতনামা দিগ্বিজয় নাথজী এখানকার বর্ত্তমান প্রধান মোহান্ত। ডক্টর শ্রীমতী কল্যাণী মল্লিক বলেন—"গোরক্ষ প্রজ্জ্বলিত একটী প্রদীপ অদ্যাপি মন্দির মধ্যে জ্বলিতেছে। এই স্থানের মঠ স্বয়ং গোরক্ষ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।" (নাথপন্থ—১৭ পৃঃ)

গোরক্ষকুঞ্জ—"দিনাজপুর জিলার অন্তর্গত রাণীশঙ্কল থানার মধ্যে গোরক্ষকুঞ্জ নামক স্থানে এক অতি প্রাচীন শিব ও কালীমন্দির দৃষ্ট হয়। এখানে পাথর দিয়া ঘেরা একটী প্রস্রবণ বা কূপ আছে। যত জল লওয়া হউক না কেন, কিছুতেই তাহার জল খালি হয় না। শিবরাত্রির দিন এখানে মহা-ধূমধাম হইয়া থাকে। ইহার নিকটে রামরায়, শ্যামরায়ের প্রাচীন কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ আছে।" (বিশ্বকোষ—দিনাজপুর শব্দ, ৪৫৪ পৃঃ)।

গোরক্ষমড়ি—গুজরাটের কাথিয়াবাড়ে গোরক্ষমড়ি নামক একটী মন্দিরে আজও গোরক্ষনাথের পূজা হয়। মোহান্ত মনসুখ নাথজী এখানকার মন্দিরের বর্ত্তমান প্রধান পুরোহিত।

গোরক্ষবাসলি—কলিকাতার নিকটবর্ত্তী দমদম রেল ষ্টেশনের সন্নিকট এই মঠটী অবস্থিত। এখানে দত্তাত্রেয়, গোরক্ষনাথ ও মীননাথের প্রস্তরমূর্ত্তি আছে। এতদ্ব্যতীত শিব, কালী, হনুমান প্রভৃতি দেববিগ্রহও আছে। এখানে সর্ব্ব জাতির লোক পূজা দিয়া থাকে। এই স্থানে নাথদের আর একটী মন্দির ছিল। শুনা যায় সম্রাট আওরঙ্গজেব তাহা ভাঙ্গিয়া মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করেন।

গোরক্ষমঠ—কলিকাতা গড়ের মাঠের শেষ সীমা ও খিদিরপুরের পুলের

নিকট মাত্র দুই শত হস্ত দূরে পারসনে রোড ও খালাসীতলা রোডের উত্তর-পশ্চিমে আন্দাজ চারি কাঠা জমির উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত। প্রয়াগ নাথজী ইহ প্রতিষ্ঠা করেন।

গোরক্ষনাথজী আখড়া—"এই আখড়াটী হরিদ্বার সহরের প্রকাণ্ড ঘের বাড়ীতে স্থাপিত হইয়াছিল। এখানে নাথ সম্প্রদায়ভুক্ত প্রায় হাজার সন্ন্যাসীর আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। গুরুর আসনে যথারীতি ভোগ আরতি হইত। ইহাদের মধ্যে অনেকেই বিভূতিমণ্ডিত এবং কৌপীন মাত্র পরিহিত ছিলেন।" (হরিদ্বারে কুম্ভমেলা ও সাধুসম্মিলনী, ১৩২৯ বাং)। উক্ত সম্মিলনীতে যে সব প্রসিদ্ধ সাধু, সন্ন্যাসী ও মঠ আখড়ার মোহান্তগণ আপন আপন সম্প্রদায়সহ বিরাজ করিতেছিলেন, তাঁহাদের প্রধান প্রধান ২৩ জনের নামের তালিকা উক্ত গ্রন্থের ৫৫-৬২ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইয়াছে। হৃষীকেশের মোহান্ত মণ্ডলেশ্বর স্বামী মঙ্গলনাথজীর নাম উক্ত তালিকায় ২য় স্থানে আছে। এই উপলক্ষে ২৬।২৭শে চৈত্র তারিখে সমগ্র ভারতীয় হিন্দুসভার অধিবেশন হয়। প্রথম দিনের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন কাশীমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী এবং দ্বিতীয় দিনের সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন স্বামী মঙ্গলনাথজী। স্বামী যোগানন্দের 'হরিদ্বারে কুম্ভমেলায়' (১৩২৯ বাং) এ সম্বন্ধীয় বিস্তৃত বিবরণ আছে।

গোরক্ষটীলা—কাশীক্ষেত্রে অবস্থিত। এখানে অনেক সাধু সন্ন্যাসীর বাস।

গোরক্ষকূপা—ইহা কচ্ছদেশের ধমকার নিকট অবস্থিত। এখানে গোরক্ষ-নাথ চিরজীবী বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস।

গোরক্ষপাদুকা—বর্দ্ধমানের আমলগঞ্জে গোরক্ষনাথের পাদুকা প্রতিষ্ঠিত আছে। এখানে এই পাদুকার পূজা হয়।

গোরক্ষনাথের মন্দির—আসামের কামরূপ জিলার রঙ্গিয়া রেল ষ্টেশন হইতে প্রায় চারি মাইল দূরে বরিগোগ মৌজার বালিকুচি গ্রামে এই মন্দিরটী

ভগ্নদশায় বর্ত্তমান আছে। পাথরের আসনসহ এখানে গোরক্ষনাথের মূর্ত্তি আছে। লৌকিক প্রবাদ এই যে, বল্লাল সেনের অত্যাচারে উৎপীড়িত নাথেরা গোরক্ষনাথের উক্ত বিগ্রহ সহ পলায়ন করিয়া গোয়ালপাড়ার যোগী-গুফায় আশ্রয় নিয়াছিলেন। তথা হইতে এই মূর্ত্তি বালিকুচিতে আনিয়া স্থাপন করা হয়। সেই সময় স্থানটীর নাম বৃন্দাবন রাখা হইয়াছিল। বর্ত্তমানে ইহা বিন্নাবারী নামে খ্যাত। বিন্নাবারী বৃন্দাবনের নামান্তর বলিয়াই মনে হয়। এই মন্দিরের সেবাকার্য্য চালাইবার জন্য রাজা শ্রীশ্রীচন্দ্রকান্ত সিংহ ৭২ বিঘা জমি দেবোত্তরস্বরূপ দান করেন। বর্ত্তমানে ৩৯৶১৮ লোচা জমি সহ ইহা যোগিজাতির দখলে আছে। দেবোত্তরনামার কিয়দংশ এই—"নং ৬৭ বহি জমাবন্দি ৬৬ নং ইংরাজি। বালিকুছি মৌজায় গোরক্ষনাথ দেবালয়ে দেবোত্তর ১২। এক দোন পেরাতে জেপের আছে। ইতি—নং ২ ফেব্রুয়ারী এস্তাকাচারি শ্রীদশরথ যুগী বহলক ৺ভাগবত কাছারি লাখেরাজী মুলুকে আসাম জেলা কামরূপ, সন ১৮৩৫ ইং তারিখ ১১ ডিসেম্বর শক ১৭৫৭ তাং ২৭ আশ্বিন।"

গোরক্ষক্ষেত্র—দ্বারকার নিকট অবস্থিত। কনফটযোগী সম্প্রদায়ের নাথেরা এখানকার সেবাপূজা করেন। বিশ্বকোষ তৃতীয় খণ্ডে এ সম্বন্ধীয় বিবরণ আছে। "আবুল ফজল পেশোয়ারে গোরক্ষক্ষেত্রের উল্লেখ করিয়াছেন।"

(প্রবাসী—ফাল্গুন, ১৩২৮ বাং)

গোরক্ষনাথ ও অওঘর গদ্দী—"ব্রহ্মগিরি নামক একদণ্ড নামী সন্ন্যাসী গুরু গোরক্ষনাথের কৃপায় শক্তি লাভ করিয়া অওঘর নামে একটি সম্প্রদায় সৃষ্টি করেন। গুজরাট অঞ্চলে ইহাদের গদী আছে।" (বিশ্বকোষ—সন্ন্যাসী শব্দ)

গোরক্ষপর্ব্বত—গোয়ালপাড়া জিলায় রংজুলির নিকট গোরক্ষ পর্ব্বত নামক একটি পর্ব্বত আছে। (কদলীরাজ্য—৩৮ পৃঃ)। "আমেদাবাদের উত্তরে গোরক্ষনাথের নামে পর্ব্বতশ্রেণী আছে।" (নাথপন্থ—১৮ পৃঃ)

গোরক্ষক্ষেত্র—পেশোয়ারে অবস্থিত। আবুল ফজল ইহার উল্লেখ

করিয়াছেন। দ্বারকায় আর একটি গোরক্ষক্ষেত্র আছে। এ সব স্থানে গোরক্ষনাথের পূজা হয়।

গোরক্ষটিলা—ডক্টর শ্রীমতী কল্যাণী মল্লিক বলেন—"ভারতের উত্তরে পাঞ্জাবে টিলা নামক স্থানে গোরক্ষনাথীদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মঠ আছে। ইহা ঝিলামের ২৫ মাইল দূরে অবস্থিত এবং গোরক্ষটীলা নামে প্রসিদ্ধ। ইহার উচ্চতা ৩২৪২ ফুট এবং ইহার পর্ব্বতগাত্র অমসৃণ ও দুরারোহ। এই স্থান হইতে দৃষ্ট হিমালয়ের দৃশ্য অতীব মহান। গোরক্ষনাথ এই টীলায় দেহরক্ষা করেন, এরূপ প্রবাদ আছে। বাল্মীকিকন্যার বিবাহ বর্ণনায় এই টীলার উল্লেখ পাওয়া যায়। অতএব এই টীলা গোরক্ষপূর্ব্ব যুগেরও বহু প্রাচীন তীর্থ বিশেষ। সম্রাট আকবরও ইহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ কয়েকটী গ্রাম অর্পণ করেন।"

(নাথপন্থ—১৭ পৃঃ)

গোরক্ষগড়— ডক্টর শ্রীমতী কল্যাণী মল্লিক বলেন— "বোম্বাই প্রদেশের সাতপুরা প্রভৃতি স্থানে গোরক্ষগড় ও মচ্ছিন্দরগড় নামে দুইটি দুর্গ আছে। গোরক্ষাদির নামে মন্দির, উষ্ণ প্রস্রবণাদিরও অভাব নাই।" (নাথপন্থ ১৬, ১৭ পৃঃ)। ১৬৭৬ খৃঃ অব্দে মহারাষ্ট্রকেশরী ইহা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এখানে মৎস্যেন্দ্রনাথের প্রাচীন মন্দিরও দৃষ্ট হয়।

মহানাদ নাথ মঠ— প্রত্নতত্ত্ববিদ্ মঠ-সম্পাদক শ্রীপ্রভাসচন্দ্র পাল মহাশয় বলেন— "বর্ত্তমান হুগলী জিলার পাণ্ডুয়া পরগণার অন্তর্গত মহানাদ নামক স্থান সুপ্রাচীন বঙ্গের অন্যতম পুণ্যতীর্থ। এখানকার প্রাচীন মঠটী জিয়াৎকুণ্ড, মুক্তকুণ্ড, সিদ্ধকুণ্ড, যজ্ঞকুণ্ড, অগ্নিকুণ্ড, গোদকুণ্ড, ক্ষীরকুণ্ড, কুকুরকুণ্ড, যোগিনীকুণ্ড, দুর্গাকুণ্ড, গৌরীকুণ্ড এবং রাধাকুণ্ড নামক বহু কাহিনী বিজড়িত দ্বাদশটী কুণ্ড দ্বারা সীমাবদ্ধ। এতদ্ভিন্ন মঠ হইতে আরম্ভ করিয়া সপ্তগ্রাম্ পর্য্যন্ত বশিষ্ঠ গঙ্গা নামক এক পুণ্যস্রোতা বিদ্যমান রহিয়াছে। যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীগোরক্ষনাথ স্বীয় ধর্ম্মমত প্রচারার্থ মহানাদে শুভাগমন করেন। তাঁহারই সময় হইতে মহানাদ

অন্যতম নাথতীর্থ এবং মঠটী নাথমঠ নামে বিদিত হইয়াছে। মঠে প্রাচীনকালের নাথ যোগীদের জীবন্ত সমাধি বিগুমান রহিয়াছে। রাজপুতনায় বক্ষে এই প্রকার জীবন্ত সমাধি দৃষ্ট হয়। মঠের মধ্যস্থলে লিঙ্গরাজ শ্রীশ্রীজটেশ্বর নাথ মহাদেবের সুরম্য মন্দির বিরাজিত। মন্দিরটী নির্ম্মাণকৌশলে প্রসিদ্ধ বৈদ্যনাথ মন্দিরের সমতুল্য। মহাদেবের পার্শ্বে কৃষ্ণ প্রস্তরের নন্দীকেশ্বর মূর্ত্তি স্থাপিত রহিয়াছে। মঠে এক প্রকার গুপ্তবংশীয় প্রথম কুমার গুপ্তের সময়কালীন স্তম্ভাকৃতি শিবলিঙ্গ দৃষ্ট হয়। এতদ্ভিন্ন গুপ্তযুগের ভৈরব, গণকীর্ত্তি, মকরাকৃতি মন্দিরের পয়ঃপ্রণালী, বিশাল গৌরীপট্ট এবং পাল রাজত্বের হরপার্ব্বতী মূর্ত্তি, বিষ্ণু, তারা, লক্ষ্মী, ব্রহ্মা, জাম্ভেলা এবং নানা দেবদেবীর অভগ্ন ও ভগ্নমূর্ত্তি এবং পরবর্ত্তীকালীন অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি ও দুইটী বুদ্ধমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। হরপার্ব্বতী মূর্ত্তি ও জাম্ভেলা মূর্ত্তি কলিকাতা সংগ্রহাগারে (Indian Museum, Calcutta) এবং একটী একপাদ ভৈরবমূর্ত্তি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত হইয়াছে।

মঠের প্রাচীন কাগজ-পত্রাদি হইতে প্রমাণিত হইয়াছে যে গুপ্তযুগের (১) রাঢ়াধিপতি চন্দ্রকেতু বা চন্দ্রবর্ম্মা মঠের ভূমি দান করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীর বাদশাহ মঠের ভূমি দান করিয়া হিন্দুগণের নিকট চিরস্মরণীয় হইয়াছেন (২)। জাহাঙ্গীর বাদশাহের রাজত্বকালে পাটনা নিবাসী জগন্মোহন পণ্ডিত মহানাদ পরিদর্শন করেন। তাঁহার রচিত "দেশাবলী বিবৃতি" নামক গ্রন্থে "অথ মানাত দেশ বিবরণম্" বলিয়া উল্লেখ আছে (৩)। * * * * এই পুঁথি ব্যতীত ৺সহদেব চক্রবর্ত্তীর রচিত "ধর্ম্মমঙ্গল" পাঠে অবগত হওয়া যায় যে

(১) খৃষ্টের জন্মের পূর্ব্ব হইতে খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দী পর্য্যন্ত গুপ্ত নামধারী অনেক রাজা রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন (ভারতবর্ষের ইতিহাস— ৭৬ পৃঃ)।

(২) জাহাঙ্গীরের রাজত্বকাল— ১৬০৫-১৬২৭ খৃঃ অব্দ।

(৩) পুঁথিখানি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে সংরক্ষিত।

মহানাদে মীননাথ নামক একজন যোগী রাজা ছিলেন (১)। সেই প্রাচীনকাল হইতে অদ্যাবধি যোগেশ্বর যোগীরাজ উপাধিধারী নাথ সম্প্রদায়ের মোহান্ত মহারাজ কর্ত্তৃক মঠটী পরিচালিত হইতেছে।

প্রাচীন রীত্যনুসারে মহানাদের শিবরাত্রি উৎসব সবিশেষ আশ্চর্য্যময়। শিব চতুর্দ্দশীর দিবস প্রাতঃকাল হইতে অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীমোহান্ত মহারাজ অন্দরে ধ্যানমগ্ন থাকিবেন। অপরাহ্ণে স্থানীয় জমিদার পরিজন সমভিব্যাহারে শ্রীশ্রীমোহান্ত মহারাজকে উত্থান করতঃ ৺ভৈরবনাথের সম্মুখে আনয়ন করেন। তখন ৺ভৈরবনাথের যথাবিধি পূজা ও বলিদান হয়। প্রথমতঃ বলির ছাগটীকে বলিদানের পরই ৺ভৈরবনাথের বেদীর চতুর্দ্দিকে সপ্তবার প্রদক্ষিণ করান হয়। অতঃপর শ্রীশ্রীমোহান্ত মহারাজকে উক্ত বেদীর চতুর্দ্দিকে সপ্তবার প্রদক্ষিণ করান হয়। তৎপর ৺জটেশ্বরনাথ মহাদেবের মন্দিরের চতুর্দ্দিকে মোহান্তরাজকে পূর্ব্ববৎ সপ্তবার প্রদক্ষিণ করাইয়া মন্দিরস্থ গদীতে উপবিষ্ট করতঃ ভালে টীকা দান করা হয়। সন্ধ্যার পূর্ব্বে এই প্রকার গদীদান প্রথা বিধেয়। গদীদানের সমবেত যাত্রিগণ পবিত্র দীপালোকে মন্দিরটীকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলেন। অতঃপর যাত্রিগণ ৺জটেশ্বরনাথ মহাদেবকে ডাবের জল, দুগ্ধ ও গঙ্গাজল দ্বারা স্নান করাইয়া আকন্দের মালা পরাইয়া বিল্বপত্র ও আকন্দের ফুল দ্বারা ভক্তি-ভরে পূজা করিতে আরম্ভ করেন। সারারাত্রব্যাপী এই প্রকার পূজা চলিতে থাকে। পরদিন প্রাতঃকালে মোহান্ত মহারাজকে গদী হইতে উত্থান করান এবং তাঁহার ভোজনাদির ব্যবস্থা করা হয়। এই প্রকার শিবরাত্রি বাংলা তথা ভারতের অন্যত্র দেখা যায় না। শিবচতুর্দ্দশী দিবস হইতে প্রায় একমাস কাল-ব্যাপী মেলা চলিতে থাকে। এই মেলাকে 'জাতমেলা' বলা হয়। দিবারাত্র নহবতের বাজনায় মঠটী মুখরিত হয়। বায়োস্কোপ, সার্কাস ও নানাবিধ ক্রীড়াকৌতুক আবালবৃদ্ধ-বনিতার আনন্দ বর্দ্ধন করে। বহু বিপণির দ্বারা

(১) রাজা মীননাথ সম্বন্ধীয় অন্যান্য বিবরণ ৭ম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

সুশোভিত হইয়া মঠটী নগরের আকার ধারণ করে। মঠের অন্তর্গত প্রাচীন রাজবাটীর ভগ্নাবশেষ গুপ্তযুগের নিদর্শন বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে (১)। ভারতীয় সরকারি বিভাগ কর্ত্তৃক কিয়দংশ ভূমি খননের কালে গৃহাদির নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং ঐ স্থান "সংরক্ষিত অঞ্চল" বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে।"

(যোগিসখা— জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৮ বাং, ২৬-২৭ পৃঃ)

সৎনাথী মঠ— কল্যাণী মল্লিক বলেন, " * * উড়িষ্যা প্রদেশের পুরীতে কানফাটাদের সৎনাথীনামক সম্প্রদায়ের মঠ ও মন্দিরআছে।" (নাথপন্থ, ১৮ পৃঃ)

শ্রীগোবর্দ্ধননাথজী— শ্রীবৃন্দাবনের রাধাকুণ্ডের সন্নিকটে গিরিরাজ শ্রীগোবর্দ্ধন বিরাজমান। ব্রজবাসিগণ প্রতি বৎসর ইন্দ্রপূজা করিতেন। শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে তাঁহারা ইন্দ্রপূজার পরিবর্ত্তে শ্রীগোবর্দ্ধনের পূজা করেন। ইন্দ্র তাহাতে রুষ্ট হইয়া ব্রজমণ্ডলের উপরে কয়েক দিন যাবৎ মুষলধারে বারিবর্ষণ করেন। সেই সময়ে "শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধনকে উত্তোলন করিয়া স্বীয় বাম হস্তে উর্দ্ধে ধারণ করিয়া এবং ব্রজবাসিগণকে তাহার নিম্নদেশে অবস্থান করাইয়া ইন্দ্র কর্ত্তৃক অশ্রান্ত বারিধারা বর্ষণ জনিত বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। গোবর্দ্ধনের পূজার সময়ে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং গিরি গোবর্দ্ধনে আবিষ্ট হইয়া পূজার ভোজ্যাদি উপভোগ করিয়াছিলেন। এ জন্য ভক্তগণের নিকট গিরিরূপে গোবর্দ্ধন শ্রীহরির দেহ বলিয়া পরিগণিত। এই জন্যই শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিয়া গিরি-গোবর্দ্ধনে আরোহণ করেন নাই। অথচ শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী এই গিরি গোবর্দ্ধনের উপরেই বিরাজ করিতেন এবং শ্রীগোবর্দ্ধননাথজী বা সংক্ষেপে শ্রীনাথজী নামে অভিহিত হইতেন।" (মাসিক বসুমতী— চৈত্র, ১৩৪৭ বাং)

শক্তি ও শ্রীবিদ্যায় দীক্ষিত হইয়া আচার্য্যগণ নাথ উপাধি গ্রহণ করেন। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু বলেন—"ভুটান পরিব্রাজক বুদ্ধগুপ্ত যোগী

(১) গুপ্তরাজগণ ৪র্থ খৃঃ অব্দে ভারতে খুব প্রতাপশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। ৫৮০ খৃঃ অব্দে গুপ্ত সাম্রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হইতে আরম্ভ হয়।

দিনকর ও গুরু গম্ভীরমতির কৃপায় মহাশক্তি লাভ করিয়া বুদ্ধগুপ্তনাথ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। তিব্বতের শক্তিসিদ্ধ বৌদ্ধগণ এখনও নাথ উপাধি গ্রহণ করেন " (বিবিধ বৌদ্ধ সম্প্রদায়)। এই শক্তিবাদের প্রতিষ্ঠা ও প্রসারে বাঙ্গালা দেশই অগ্রণী হইয়াছিল। শক্তি ও শ্রীবিদ্যায় দীক্ষিত হইয়া তান্ত্রিকগণ নাথ উপাধি গ্রহণ করেন (ভারতসভ্যতায় নাথধর্ম্মের দান)। পঞ্চদশ খৃঃ অব্দেও বাঙ্গালার সিদ্ধ শাক্তগণ নাথ উপাধি ধারণ করিতেন। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ শ্রেণীভুক্ত সর্ব্বানন্দ, শক্তি ও শ্রীবিদ্যায় দীক্ষিত হইয়া সর্ব্বানন্দ নাথ নামে খ্যাত হইয়াছিলেন (১)। এই প্রসঙ্গে বাবা গম্ভীরনাথের নামও উল্লেখ করা যাইতে পারে। পূর্ব্বাশ্রমে ইনি ব্রাহ্মণ ছিলেন। পরস্পর বিবদমান বিবিধ মতবাদের সমন্বয় সাধন হইয়াছিল তন্ত্রের ভিতর দিয়া। তাই তন্ত্রগুরু প্রায়ই সব নাথাচার্য্যগণ—

"অথ তারা গুরূন বক্ষ্যে দৃষ্টাদৃষ্ট ফলপ্রদান্।
ঊর্দ্ধকেশো ব্যোমকেশো নীলকণ্ঠো বৃষধ্বজঃ ॥
দিব্যোঘাঃ সিদ্ধিদাঃ বসে সিদ্ধৌঘান শৃণুযত্নতঃ।
বশিষ্টঃ কূর্ম্মনাথশ্চ হীননাথো মহেশ্বরঃ ॥
হরিনাথো মানবৌঘান শৃণু বক্ষ্যামি তদ্ গুরূন্।
তারাবতী ভানুমতী জয়াবিদ্যা মহোদরী ॥
সুখানন্দ পরানন্দ পারিজাতাঃ কুলেশ্বরঃ।
বিরূপাক্ষঃ ফেরচৌচ কথিতং তারিণীকুলং ॥
আনন্দনাথ শব্দান্তাঃ গুরবঃ সর্ব্বাসিদ্ধিদাঃ।
স্ত্রিয়োঽপি গুরুরূপাশ্চ অম্বান্তাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥" (তন্ত্রসার)

বৈদিক যুগ হইতে হিন্দুধর্ম্মাচার্য্যেরা বিভিন্ন মতের সমন্বয়সাধন করিয়া আসিতেছেন। ঠিক সেই ভাবে বৌদ্ধ মতবাদ, জৈন ধর্ম্মের কর্ম্মবাদ, চার্ব্বাকের

(১) উত্তরক "শক্তি ও শাক্ত" গ্রন্থে সর্ব্বানন্দ নাথের উল্লেখ করিয়াছেন। ইনি ১৪২৬ খৃঃ অব্দের পৌষ সংক্রান্তির অমাবস্যায় সিদ্ধিলাভ করেন।

নাস্তিকবাদ, পুরাণের ভক্তিবাদ প্রভৃতি নানা মত তন্ত্রে একীভূত করার চেষ্টা করা হইয়াছে। এই সমন্বয় সাধনের ইঙ্গিত শ্রীঅরবিন্দের 'Essays on the Geeta'-তে আছে।

মহামন্দির— মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন—"১৫৮৮ সালে মানসিংহ যোধপুরের রাজা ছিলেন। তাঁহার গুরু দেবনাথকে তিনি একটা নগর দান করিয়াছিলেন। উহার নাম মহামন্দির। উহার প্রাচীরটা প্রায় দুই মাইল হইবে। এখানকার নাথজী খুব বড় লোক।"

(সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা—১৩২৮ বাং, ২৪থ পৃষ্ঠা)

যোধপুররাজ মানসিংহের প্রধান গুরু দেবনাথ ছিলেন, তিনি যোধপুরে অনেক মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। "Few temples are to be found older than those built in the reign of Mansingha and at the instance of Debnath, the high priest of that prince". (Report of a tour in the Punjab and Rajputna by Mr. Garrick, Page 85)

অর্থাৎ যোধপুররাজ মানসিংহ তদীয় গুরু দেবনাথের নির্দ্দেশ অনুসারে যে সকল মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, সেগুলি অপেক্ষা প্রাচীন মন্দির প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না।

জলন্ধর কোটকাংরা দুর্গ— পাঞ্জাবের এই দুর্গ ভারতবিখ্যাত। দ্বাদশবার ভারত লুণ্ঠনকারী গজনীর মামুদ এখান হইতে (১০০৯ খৃঃ অব্দে) ৪০০ মণ স্বর্ণ লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। এখানে জ্বালামুখী তীর্থ অবস্থিত। নাথযোগী জালন্ধর নাথের নামানুসারে জলন্ধর ও জ্বালামুখী তীর্থের নামকরণ করা হইয়াছে বলিয়া জনশ্রুতি আছে।

বৈদ্যনাথে নাথকুণ্ড— বৈদ্যনাথ ধাম হিন্দুর পবিত্র তীর্থ। এখানে নাথবংশসম্ভূত তীর্থগুরু ৺রঘুনাথজী পাণ্ডা মহাশয়ের বংশধরেরা আজও তীর্থগুরুত্ব করিতেছেন। এখানকার নাথকুঞ্জ নামক হর্ম্ম্যটী বিখ্যাত।

মাঙ্গালোর আশ্রম—টেলরয়েজ হুইলার সাহেব বলেন—১৬২৩-১৬২৫ খৃঃ অব্দে পিয়াট্রো ডেলাভেলি নামক একজন রোমান ক্যাথলিক ভারতবর্ষ ভ্রমণে আসেন। উক্ত রোমান ক্যাথলিক বলেন, মাঙ্গালোরের নিকটের আশ্রমের একজন সাধুকে সকলেই যোগিমহারাজ বলিতেন। ইনি এক ক্ষুদ্র ভূখণ্ডের অধিকারী ছিলেন। ইহাতে আশ্রম, দেবমন্দির ও যোগীদের বাসগৃহ ছিল। এই ক্ষুদ্র রাজ্যটী মাঙ্গালোররাজ যোগীদিগকে দান করিয়াছিলেন। কিন্তু যোগীরা উক্ত রাজ্যের কোন বাধ্যবাধকতায় ছিল না। ইহার বার্ষিক আয় ৪৫০০০৲ টাকা।

(ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ ও নেপালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ১১৬।১১৭ পৃঃ)

একলিঙ্গ শিবমন্দির—মেবারের রাজধানী উদয়পুরের ছয় মাইল উত্তর দিকে এক গিরিসঙ্কটে এই মন্দির অবস্থিত। অতি প্রাচীনকাল হইতে গিহেলাট বংশীয় রাজগণ এই লিঙ্গ পূজা করিয়া আসিতেছেন। এখানকার গোস্বামিগণ নাথজাতীয়। উদয়পুরের রাণাগণ ইহাদের শিষ্য। উদয়পুরের মহারাজা ও মেবারের রাজপুতগণ এই নাথগুরুগণের পদরজঃ মস্তকে ধারণ করেন। (টড সাহেবের রাজস্থানের ১ম খণ্ড, ১৯শ অধ্যায়, ৫৪৪-৫৪৯ পৃষ্ঠায় এবং ২য় খণ্ডের ৩য় অধ্যায়ের ২১।২২ পৃষ্ঠায় এ সম্বন্ধীয় বিবরণ আছে।)

বেরেলী নাথমঠ—ইহা অযোধ্যা প্রদেশে অবস্থিত। এখানকার নাথ-মোহান্ত স্থানীয় বহুসংখ্যক হিন্দুর গুরু।

শ্রীমস্তনাথের সমাধিমন্দির—"পাঞ্জাব প্রদেশের রোহতক জিলায় (দিল্লী হইতে ৪০ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে) বেহার নামক একটী স্থান আছে। এখানে একটী প্রকাণ্ড মঠ আছে। মঠটী শ্রীমস্তনাথের সমাধিমন্দির। মঠাধিপতির নাম সন্তোষ নাথজী। ইনি উত্তর-পশ্চিম প্রদেশস্থ অনেক রাজপরিবারের কুলগুরু। ইহার সম্পত্তি যথেষ্ট। এখানে প্রায় পাঁচ হাজার নাথ আছে। * * * * এখানে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথি পর্য্যন্ত একটী মেলা হয়। এক শত বৎসর ধরিয়া এই অনুষ্ঠান হইয়া আসিতেছে।

এই মেলায় প্রায় দুই লক্ষ লোক সমবেত হইয়া থাকে। সম্ভ্রান্ত অসম্ভ্রান্ত হিন্দু স্ত্রী পুরুষ শ্রীমন্ত নাথের সমাধির উপর পূজা মানসিক দিয়া থাকে।" (অধ্যাপক অমূল্য বিদ্যাভূষণের 'নাথপন্থ'—প্রবাসী, ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩২৮ বাং)

ভেকবরাহপন্থ — ডক্টর শ্রীমতী কল্যাণী মল্লিক বলেন— "নাথ যোগীদের মধ্যে জাতিভেদ না থাকিলেও শ্রেণীভেদ ও মতভেদ নাই ইহা বলা চলে না। ইহাদের প্রধানতঃ দ্বাদশ শাখা আছে। তাহা দ্বাদশপন্থ নামে পরিচিত। এই দ্বাদশপন্থীরাই কানফাটা সম্প্রদায়' নামে খ্যাত। হরিদ্বারে ভেকবরাহ-পন্থ নামে ইহাদের কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি আছে। দ্বাদশ বৎসরান্তে কুম্ভ-মেলায় বিভিন্ন শ্রেণী হইতে ইহার দ্বাদশ সভ্য নির্ব্বাচিত হন। তাঁহারা মঠ পরিদর্শন, মোহান্ত নির্ব্বাচন আদি কার্য্য করেন। ভারত সরকার এই দ্বাদশ যোগীর অনুমোদন ব্যতীত মোহান্ত 'নির্ব্বাচন আদি যোগী সম্বন্ধীয় বিবাদে হস্তক্ষেপ করেন না।" (নাথপন্থ—৮ পৃঃ)।

হিংলাজ কোটেশ্বরনাথ মঠ — "ভারতের পশ্চিম প্রান্তে করাচির অনতিদূরে হিংলাজ কোটেশ্বর প্রভৃতি স্থানে নাথদিগের প্রসিদ্ধ মঠাদি আছে। এই সকল তীর্থভ্রমণ শেষ হইলে তাহার স্মারক চিহ্নরূপে সেখানে দক্ষিণ বাহুতে 'যোনিলিঙ্গ' অঙ্কিত করার প্রথা আছে।" (নাথপন্থ-১৬ পৃঃ)

ভর্ত্তৃহরি দুর্গ — "যুক্ত প্রদেশের চুণারে ভর্ত্তৃহরির দুর্গ আছে। রাজা ভর্ত্তৃহরি সিংহাসন ত্যাগ করিয়া গোরক্ষনাথের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।"

(নাথপন্থ—১৭ পৃঃ)

কানেড়ী গুহা—অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ বলেন—"কঙ্কন প্রদেশে আজ কাল যোগীর সংখ্যা খুব কম। * * * * * পর্টুগীজগণ যখন সালসেট অধিকার করে তখন তাহারা কানেড়ী (Kanheri) গুহাতে বহু সংখ্যক যোগী দেখিয়াছিল। ইহাদের সম্বন্ধে পর্ত্তুগীজগণ আশ্চর্য্যজনক বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা নাকি তিন হাজার গুহা দেখিয়াছিলেন। এই সমস্ত গুহায়

যোগাচারী নাথেরা থাকিত। একজন যোগীর বয়স তাঁহারা দেড়শত বৎসর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।" (নাথপন্থ—প্রবাসী, চৈত্র ১৩২৮ বাং)

কালীকম্বলীবাবার পঞ্চাতি ছত্র— এই ছত্রটি কুম্ভমেলা উপলক্ষে অস্থায়িভাবে ভীমকুণ্ডের (হরিদ্বার) কিছু উত্তরে গঙ্গাতীরে সুদৃশ্য স্থানে খোলা হইয়াছিল। এই ছত্রের বর্ত্তমান মোহান্ত বাবা কালীকম্বলীওয়ালে রামনাথজী। ইনি সাধারণতঃ ঋষিকেশে বাস করিয়া থাকেন। ইনি সুপ্রসিদ্ধ কালী কম্বলী বাবার সঙ্গী ছিলেন। ইহার তত্ত্বাবধানে কেদারনাথ ও বদরীনারায়ণের পথে এবং অন্যান্য স্থানে ৫০।৬০টী ছত্র ও ধর্ম্মশালা পরিচালিত হইতেছে। এই ছত্র হইতে প্রতিদিন প্রাতে ১০টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত উপস্থিত সাধু-সন্ন্যাসিগণকে মাধুকরী দেওয়া হইত; কোন দিন বা সরদহি (ভাঙমিশ্রিত সরবৎ) বিতরণ করা হইত। এই ছত্রে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত এই ছত্রের একটী শাখাছত্র স্থাপিত হইয়াছিল। তাহাতে গৃহস্থ ব্রাহ্মণদিগকে আহার্য্য দেওয়া হইত।" (হরিদ্বারে কুম্ভমেলা— ১৩২৯ বাং)

সিদ্ধেশ্বর শিবলিঙ্গ— গয়ার ১৬ মাইল উত্তরে নাগার্জ্জুনী গুহার নিকট সিদ্ধেশ্বর নামে এক শিবলিঙ্গ আছে। নাথযোগি কর্ম্মমার্গ ও ভয়ঙ্কর নাথের নাম ঐ মন্দিরগাত্রে খোদিত আছে। **(Archaelogical Survey by Mr. Cunningham, Vol. I, page 50-52 and 167).**

যোগীদের শিবমন্দির— হুগলী জিলার উত্তর-পশ্চিমাংশ, যেখানে বাকুড়া ও মেদিনীপুর জিলাদ্বয়ের সহিত মিলিত হইয়াছে, ইহার অনতিদূরে ভগবান্ রামকৃষ্ণ দেবের জন্মভূমি কামারপুকুর গ্রামে উক্ত মন্দির অবস্থিত। স্বামী সারদানন্দ প্রণীত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গে' দেখা যায়, রামকৃষ্ণদেবের মাতা শ্রীশ্রীচন্দ্রা দেবী বলিতেছেন— "আর একদিন যুগীদের শিবমন্দিরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ধনীর সহিত কথা কহিতেছি, এমন সময় দেখিতে পাইলাম ৺মহাদেবের শ্রী অঙ্গ হইতে দিব্য জ্যোতিঃ নির্গত হইয়া মন্দির পূর্ণ করিয়াছে এবং বায়ুর ন্যায়

তরঙ্গাকারে উহা আমার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। আশ্চর্য্য হইয়া ধনীর সহিত এই কথা বলিতে যাইতেছি এমন সময়ে সহসা উহা নিকটে আসিয়া আমাকে যেন ছাইয়া ফেলিল এবং আমার ভিতরে প্রবল বেগে প্রবেশ করিতে লাগিল। ভয়ে, বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া এককালে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলাম। * * * আমার কিন্তু তদবধি মনে হইতেছে ঐ জ্যোতিঃ যেন আমার উদরে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন এবং আমার যেন গর্ভসঞ্চারের উপক্রম হইয়াছে।" * * * ক্রমে তিন চারি মাস অতীত হইল, তখন সকলে নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিল, পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে ক্ষুদীরাম গৃহিণী শ্রীমতী চন্দ্রা দেবী সত্য সত্যই অন্তর্বত্নী হইয়াছেন।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ— ৬৮, ৭৪ পৃঃ)। তারপর ১২৪২ বাং, ৬ই ফাল্গুন, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের জন্ম হয়। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, যোগীদের মহাদেবের কৃপাতেই রামকৃষ্ণ দেবের আবির্ভাব।

বাগনাথের সমাধিস্থান —অধ্যাপক ৺ সতীশচন্দ্র মিত্র বলেন— "কপিলমুনি গ্রামেই বহু সংখ্যক যোগীর বাস আছে। তাঁহাদের মধ্যে বাগনাথ মোহান্ত নামক এক সাধুর নাম বিশেষ প্রসিদ্ধ। তাঁহার জীবন্ত কবর হইয়াছিল। বাগনাথের সে সমাধিস্থান সকল শ্রেণীর লোক দ্বারা সম্মানিত হয়। সুন্দরবন অঞ্চলের একটী বিপ্লবের পর পাঠান আমলের মধ্যস্থলে যখন এ প্রদেশে পুনরায় বসতি পত্তন হইয়া থাকে, তখনই বাগনাথ ও তাঁহার গুরু শিশুনাথ অধিবাসিগণের অগ্রদূতরূপে এই স্থানে উপনীত হন এবং তাঁহারাই প্রথম জঙ্গলাবৃত কালীবাড়ী আবিষ্কার করেন। এ জন্য সাধারণ লোকে বলে, কালীবাড়ী তাঁহারাই স্থাপিত করিয়াছিলেন। বাগনাথ বাক্‌সিদ্ধ সাধুপুরুষ ছিলেন।" (যশোহর-খুলনার ইতিহাস—১ম খণ্ড, ১৩২১ সাল)

শম্ভুনাথের সমাধিস্থান — "শ্রীভৈরোজী মন্দিরের প্রসিদ্ধ যোগী মোহান্ত শম্ভুনাথ গত ১৫ই মে রাত্রিকালে সমাধি লাভ করেন। অর্থাৎ তিনি তাঁহার মৃত্যু সন্নিকট হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করায় তাঁহার নির্দ্দেশে তাঁহাকে জীবিতা-

বস্থায় সমাধি দেওয়া হয়। তাঁহার বয়স ১২৫ বৎসর হইয়াছিল এবং গত ৫০ বৎসর তিনি মন্দিরে সাধুজীবন যাপন করেন। লোক দলে দলে তাঁহার সমাধিস্থানে পূজা অর্চ্চনা করিবার জন্য সমবেত হইতেছে।" (আনন্দবাজার পত্রিকা—শনিবার, ১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১ বাং, ২৬।৫।৩৪ ইং)

মত্তময়ুর মঠ — গোয়ালিয়র রাজ্যে মত্তময়ুর নামক স্থানের উক্ত মঠ বিশেষ প্রসিদ্ধ। শৈবাচার্য্য পুরন্দর উক্ত মঠের মঠাধিপতি ছিলেন বলিয়া মত্তময়ূরনাথ নামে খ্যাত হন। এখানে ১০ম খৃঃ অব্দে অবন্তি বর্মা নামক এক রাজা রাজত্ব করিতেন। আবিষ্কৃত শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, শৈবাচার্য্য পুরন্দরের (মত্তময়ুর নাথের) নিকট অবন্তি বর্মা শৈবধর্ম্মে দীক্ষিত হন।

বিশ্বকোষ—ত্রয়োদশ ভাগে (১৩১৭ সাল) এ সম্বন্ধীয় বিবরণ পাওয়া যায়।

ময়নামতীর পাহাড়—গুরু গোরক্ষনাথের শিষ্যা রাণী ময়নামতীর নামানুসারে ইহার নাম হইয়াছে ময়নামতীর পাহাড়। ডাঃ আব্দুল গফুর বলেন—"কুমিল্লার ময়নামতীর পাহাড়, পুকুর, মাঠ ও চড়কডাঙ্গা দেখিয়াছি।" (সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা—১৩২৮ বাং অষ্টাবিংশ ভাগ)

যোগীমারা গুহা—"রামগড় পাহাড়ে যোগীমারা গুহা আছে। সেই গুহায় অনেক খোদিত চিত্র আছে।" (প্রবাসী—কার্ত্তিক, ১৩২১ সাল)

অনন্ত জ্যোতি আশ্রম— ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ, বলেন—"রাজপুতনার আলোয়ার রাজ্যের সেরিস্কা ভর্ত্তৃহরি ও ইন্দোর রাজ্যের দুদাখেড়ি নামক স্থানে নাথপন্থীদের আশ্রমে অনন্তজ্যোতি বা প্রদীপ দিবারাত্রি জ্বালাইয়া রাখা হয়।" (সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৩৩১ বাং)

দুধনাথ শিবের মন্দির—গোরক্ষপুর জিলার গাজপুরে ইহা অবস্থিত। প্রবাদ আছে, এখানে একটি গাভী মৃত্তিকার উপর দুগ্ধ নিঃসরণ করে। তৎপর মাটী খুঁড়িয়া এখান হইতে শিবকে উত্তোলন করা হয়। সেইজন্য ইহার নাম দুধনাথ শিব হইয়াছে। নাথমোহান্ত এখানকার মঠাধিপতি। এখানে ভর্ত্তৃহরি

সম্প্রদায়ের আর একটি মঠ আছে। এগুলি স্থানীয় হিন্দুদের প্রধান পূজাস্থান। "Mont Martin's History, Topography, Antiquities of Eastern India, Book II, 1838"— ইহাতে এ সম্বন্ধীয় বিবরণ আছে।

মার্টিন সাহেবের উক্ত বহি অবলম্বনে শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত লিখিয়াছেন— "গোয়ালপাড়া জিলার রাঙ্গামাটীতে দুধুনাথের একটি মন্দির আছে। গৌরীপুরের রাজা ইহার ব্যয় নির্ব্বাহ করেন। যোগনাথ নামে আর একটি শিবমন্দির আছে। এ সব স্থানে শিলাগাত্রে যোগীগোফার মত গোফা আছে। পাথর কাটিয়া এগুলি প্রস্তুত করা হইয়াছে। জনশ্রুতি এখানে উনকোটী সংখ্যক শিবলিঙ্গ বিদ্যমান।"

(প্রবাসী— ১৩৩৬ বাং, শ্রাবণ, শ্রীসূর্য্যের পাহাড় ও গোয়ালপাড়া)

যোগিঘোপা—"এই স্থানটী গোয়ালপাড়া জেলার ব্রহ্মপুত্রনদের ও মানস নদীর সঙ্গমস্থলের নিকট। কথিত আছে, বল্লালসেনের ভয়ে যোগিগণ পলায়ন করিয়া এই জঙ্গল ও পাহাড়ময় স্থানে আসিয়া প্রথমে অবস্থিতি করেন। পরে তাঁহাদের বংশাবলী হইতেই আসামের যোগিজাতির উৎপত্তি হইয়াছে।"

(যোগিসখা—শ্রাবণ, ১৩২১ বাং, ১০৯ পৃঃ)

যোগিগুফা—"গোবিন্দগঞ্জের ১৬ ক্রোশ পশ্চিমে পাহাড়পুর নামক গ্রামে বৌদ্ধস্তূপ দৃষ্ট হয়। ইহার প্রায় আড়াই ক্রোশ পশ্চিমে যোগিগুফা নামক বিখ্যাত স্থান আছে। এখানে প্রস্তরময়ী মায়াদেবীর মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। যোগিগুফার চারিদিকে বিস্তর ধ্বংসাবশেষ আছে।

(বিশ্বকোষ— দিনাজপুর শব্দ, ৫৫৫ পৃঃ)

অচল শিবমন্দির—"দাশোড়ার নিকটবর্ত্তী শিববাড়ী গ্রামে একটি অতি প্রাচীন শিব ও শিবমন্দির আছে। এই অচল শিবলিঙ্গ দাশোড়ার বৈদ্যবংশোদ্ভব দত্ত মহাশয়দিগের প্রতিষ্ঠিত। যুগীজাতীয়গণ এই শিবের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। কথিত আছে এই যুগীদের জৈনক পূর্ব্বপুরুষ স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া

ইহার সন্ধান পাইয়াছিল। * * * শিবরাত্রির সময় এখানে একটি মেলার অধিবেশন হয়।" (ঢাকার ইতিহাস—যতীন্দ্র রায়, ৩৯৫ পৃঃ)

বুড়া শিবের মন্দির— ঢাকা সহরের রমনার নিকট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল ছাত্রাবাসের সম্মুখে অবস্থিত। নাথেরা বহুকাল এখানকার মোহান্ত ছিল। ১৫।২০ বৎসর হইল এখানকার শেষ নাথ মোহান্ত ত্রিপুরলিঙ্গ স্বামী মোহান্ত পদ হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন।

শিবালয়—ঢাকা জিলার মাণিকগঞ্জ মহকুমায় ইহা অবস্থিত। এখানে একটি প্রকাণ্ড শিব মন্দির আছে। প্রতি বৎসর শিবচতুর্দ্দশীর দিনে এখানে বৃহৎ উৎসব ও মেলা হয়। যোগিজাতীয় পুরোহিত এখানকার মোহান্ত। শিবালয় গ্রামে ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে অনেক যোগিজাতীয় লোকের বাস আছে।

লক্ষ্মীখোলা শিবালয়—ময়মনসিংহ জিলার মুক্তাগাছার জমিদার বাড়ীর নিকটে জঙ্গলের মধ্যে ইহা প্রতিষ্ঠিত। স্থানটী লক্ষ্মীখোলা যোগী পাড়া (যুগী পাড়া) বলিয়া আজও প্রখ্যাত আছে। প্রবাদ যে, এখানে শৈবমতাবলম্বী যোগবলসম্পন্ন বহুসংখ্যক যোগীর বাস ছিল। ইঁহারাই এখানকার শিব মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ও মোহান্ত ছিলেন।

যোগিজান—নগাঁও জিলার (আসাম) হোজাই রেল ষ্টেশনের নিকট যোগিজান নামক স্থানে বৃহদাকার প্রস্তর মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে দুইটী বৃহৎ আকারের কৃষ্ণবর্ণ পাথর নির্ম্মিত শিবলিঙ্গ আজও যোনিপীঠসহ দাঁড়াইয়া আছে। যোগিজানের নিকটে ন-ভাঙ্গা নামক স্থানে একটি চামুণ্ডার মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ১১শ/১২শ খৃঃ অব্দের নির্ম্মিত। (Journal of the Assam Research Society, Vol. V. No I. 2 July 1937, Page 28 (Jugijan) and J. A. R. S. Vol. VIII, No. 2, April 1941, Page 35-37)। হোজাই প্রভৃতি অঞ্চলে আজও বহু সংখ্যক যোগিজাতির নিবাস আছে।

চৌরাশী সিদ্ধার পাঁচ লক্ষ নগর—আসামের নওগাঁ জিলায় লঙ্কা, ডবকা, যমুনামুখ, বকুলিয়া প্রভৃতি কপিলী ও যমুনা উপত্যকার মধ্যে পারিপার্শ্বিক স্থান। এসব স্থানে প্রাচীন কালের অসংখ্য ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রতি ক্রোশের মধ্যে কম পক্ষেও একটি মন্দির ও চারিটি বড় পুষ্করিণীর ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। এককালে ইহা সুসভ্য জনপদ ছিল। অনেকে অনুমান করেন, চৌরাশী সিদ্ধার ইতিহাসোল্লিখিত পাঁচ লক্ষ নগরপূর্ণ দেশ এতদঞ্চলেই অবস্থিত ছিল।

(কদলীরাজ্য)

দাঙ্গথোখরী যোগাশ্রম— "নেপাল রাজ্যে দাঙ্গথোখরী নামক একটী প্রদেশ আছে। তথায় চৌঘরা নামক যোগীদের আশ্রম আছে। এই আশ্রমের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি নেপাল রাজার দান। দাঙ্গথোখরীতে বহু গৃহস্থ যোগী বাস করেন।" (ভারতবর্ষ— জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১ বাং)

নাথদ্বার— উদয়পুর রাজের প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র। নাথপন্থের নামে ইহার নামকরণ করা হইয়াছে।

চেৎনাথজীর গদী— পাঞ্জাবের রোহটক জিলার বহরধামে অবস্থিত। ইহার ব্রাহ্মণ, রাজপুত ইত্যাদি বহু সহস্র শিষ্য আছেন।

নাথসুরঙ্গা— "হরিদ্বারে একটি সুড়ঙ্গ নাথদের কীর্ত্তির নিদর্শন।"

(প্রবাসী—নাথপন্থ, ১৩২৮ বাং ফাল্গুন-চৈত্র)

নিরঞ্জনের মন্দির— কলিকাতার উত্তর-পূর্ব্বে দমদমা গোরাবাজার হইতে দুই মাইল পূর্ব্বে হাতিয়াড়া গ্রামে ইহা স্থাপিত। নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষ প্রদত্ত দেবোত্তর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ নাথজী উক্ত মন্দিরের বর্ত্তমান মোহান্ত। প্রতি বৎসর দোল পূর্ণিমায় এখানে বার্ষিক উৎসব হয়।

সরভনাথ শিবের মন্দির— হরিদ্বারে ইহা প্রতিষ্ঠিত। এই মন্দির মায়া দেবীর মন্দিরের নিকট অবস্থিত। সরভনাথ বা সর্ব্বনাথ এক জাগ্রত শিবলিঙ্গ

বলিয়া খ্যাত। এই মন্দিরের পার্শ্বে নাথজীকী 'গদ্দী' অর্থাৎ আসন আছে।

পাষাণ নাথজীর সমাধিমন্দির— নদীয়া জিলায় (বর্ত্তমান কুষ্টিয়া জিলার) খয়েরপুর গ্রামের নিকট নাথেরগড় নামক স্থানে ইহা প্রতিষ্ঠিত। এখানে তাঁহার পূজা হয়। আজও সেখানে জনসাধারণ মানত করিয়া সিদ্ধকাম হইয়া থাকে।

কাজলনাথের আশ্রম— শ্রীহট্ট জিলার সদর মহাকুমার রাণাপিঙ্গ নামক স্থানে কাজলনাথের সমাধি বর্ত্তমান আছে। এই স্থানকে মুসলমানেরা কাজল-নাথের মোকাম ও হিন্দুরা কাজলনাথের আশ্রম বলিয়া থাকে। হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে সকলে আজও কাজলনাথের নামে মানত করিয়া সফলকাম হয়।

ঢাকেশ্বরী মন্দির— ঢাকার এই ঢাকেশ্বরী মন্দির পূর্ব্বে যোগিজাতীয় পূজকের হাতে ছিল। ব্রাহ্মণেরা নাথদিগকে বে-দখল করিয়াছেন বলিয়া প্রবাদ প্রচলিত আছে।

কথুনাথের দেবালয়— রূপগঞ্জ থানার অন্তর্গত লাক্ষাতীরবর্ত্তী ভাঙ্গা-বাজারের সন্নিকট তালতলা গ্রামে সাধক শ্রেষ্ঠ কথুনাথের সমাধি-মন্দির ও তৎ প্রতিষ্ঠিত সাধন মন্দির আছে। ইহা ভীষণ জঙ্গলাকীর্ণ উচ্চ ভূমি ছিল। কথু-নাথ এই স্থানে আসিয়া সিঙ্গাধ্বনি করাতে যাবতীয় হিংস্র জন্তু এই স্থান ত্যাগ করে— এইরূপ কথিত আছে। ফলে জনসমাগম হইয়া ইহা দেবস্থানে পরিণত হয়। এখানে কথুনাথের পাদুকা পূজিত হইয়া থাকে।

মৈনসের শিবলিঙ্গ ও কালীবাড়ী— রাজসাহী জিলার নওগাঁ মহকুমার মৈনস গ্রামে ইহা অবস্থিত। স্থানটী সান্তাহার রেলজংশন হইতে ১৭ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। এখানকার মোহান্ত শ্রীরামশঙ্কর নাথ সন্ন্যাসী। ইঁহারা পুরুষানুক্রমে একানকার পুরোহিত।

উল্টাডিঙ্গীর শিবালয়— কলিকাতার উল্টাডিঙ্গীতে ইহা অবস্থিত। শ্রীচন্দ্রকুমার নাথ এখানকার পুরোহিত।

মহাস্থান গড়—ইহা বগুড়া জিলায় অবস্থিত। বল্লালচরিতে মহাস্থানের উল্লেখ আছে। এখানকার মোহান্তগণ যোগিজাতীয়। সম্ভবতঃ এখানে বল্লালচরিতে লিখিত পূজাদ্রব্যের ভাগ লইয়া নাথ ও ব্রাহ্মণ পুরোহিতের মধ্যে বিবাদ হইয়াছিল।

চূণাগলির কালীমন্দির— ইহা কলিকাতার চূণাগলিতে অবস্থিত। নাথেরা এখানকার মোহান্ত।

পঞ্চানন ঠাকুরের দেবালয়— ইহা হাওড়া জিলার লিলুয়া রেল ষ্টেশনের নিকট অবস্থিত। ইহার দেবোত্তর, সম্পত্তি ও জমিদারী আছে। নাথেরা এখানকার পুরোহিত।

যোগীর ভবন—বগুড়া জিলার সদর ষ্টেশন হইতে ইহা সাত মাইল উত্তর-পশ্চিমে এবং মহাস্থানগড় হইতে চারি মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। এখানকার মঠবাড়ী প্রায় ৮০ মাইল জমির উপর স্থাপিত এবং চারিদিক প্রাচীরবেষ্টিত। গোরক্ষনাথের মন্দিরসহ এখানে চারিটি মন্দির আছে। এখানকার প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড কখনও নির্ব্বাপিত করা হয় না।

এখানকার কালভৈরবের মন্দিরের ইষ্টকলিপিতে আছে— শ্রীরামসিদ্ধ সন ১১৭৩ সাল আমাল শ্রীজয়নাথ নরনারায়ণ…………।

সর্ব্বমঙ্গলার মন্দিরের ইষ্টক-লিপির পাঠ এইরূপ—"……..১০৮৯ মেহের নাথ সাদক শ্রীঅভিরাম মেহেত্তর।"

মঠের জন্য ৪৬০ বিঘা জমি দেবোত্তর আছে। তন্মধ্যে ৮০ বিঘাতে মঠবাড়ী বিদ্যমান। ৩০ বিঘা জমি মঠাধ্যক্ষের খাস দখলে এবং অবশিষ্ট ৩৫০ বিঘা জমি ১৫০্ জমায় ইজারা বন্দোবস্ত আছে।

শ্রীমদ্ বলকাই নাথ এখানকার অধ্যক্ষ ও সেবাইত। ইনি গোরক্ষপন্থী নাথ। দিল্লী হইতে ৫০ ক্রোশ পশ্চিমে কুরুক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী কর্ণাল জিলার আলেওয়া মঠ হইতে তিনি এখানে আসিয়াছেন। যোগীর ভবন আলেয়া

মঠের শাখা। যোগীর ভবনের কয়েকজন পূর্ব্ববর্ত্তী মঠাধিকারীর নাম—(১) শম্ভুনাথ, (২) গোপাল নাথ, (৩) রমানাথ। শম্ভুনাথের পূর্ব্বে যোগীর ভবনের সংলগ্ন পীড়াপাঠ গ্রামের কাশীনাথ নাথই ইহার মোহান্ত ছিলেন।

ভারতের কয়েকটী প্রাচীন তীর্থভূমিতে আজও নাথদের বিশেষ আধিপত্য আছে। সেগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত তীর্থস্থানগুলি উল্লেখযোগ্য :— কর্ণেলগঞ্জ এলাহাবাদের প্রয়াগতীর্থে, ভরদ্বাজেশ্বরের মন্দির, সপ্তর্ষি মন্দির, কালীমাতার মন্দির, এলাহাবাদ ফোর্টের অক্ষয়বট মন্দির, বৃন্দাবন যমুনাতীরস্থ গোপেশ্বরের শিবমন্দির, কাশীধামের আলাইপুরের লাট ভৈরবের মন্দির, মঠীয়াঘাটস্থ শৈলপুত্রী দেবী ও শৈলেশ্বর ভৈরবমন্দির, নাটেইমাণস্থ ধূপচণ্ডী (ধূমচণ্ডী বা ধূমাবতী) মন্দির, মপুরহাট্টাস্থ চিত্রগুপ্তের মহাদেব মন্দির, চৌকস্থিত চিত্রঘণ্টা দেবী (দুর্গার নামান্তর), ব্রহ্মণালস্থ ব্রহ্মণালেশ্বর মহাদেব মন্দির, চেৎগঞ্জস্থ লপুরাবীর ভৈরবমন্দির, চৌকস্থিত কালভৈরব মন্দির, মণিকর্ণিকাঘাটস্থ তারকেশ্বরের মন্দির, ভৈরবনাথের নিকট শীতলা দেবীর মন্দির, মৈদাগ্নি মহাল্লায় মন্দাকিনী দেবীর মন্দির, পঞ্চক্রোশীয় পথে রামেশ্বর নাথ মহাদেব মন্দির এবং জল্লাদেবীর (জ্বালামুখী) মন্দির। (যোগিসখা—১৩৩৭ বাং, কার্ত্তিক, আসামবঙ্গ যোগি-সম্মিলনীর ২১শ বার্ষিক অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ৺অরবিন্দবন্ধু নাথ মহাশয়ের ভাষণে ধৃত)

এই সব অতীত গৌরব-কাহিনী স্মরণ করিলে আমাদের বক্ষ: গৌরবে স্ফীত হইয়া উঠে বটে, কিন্তু নিজেদের দীনতা স্মরণে লজ্জায় অধোবদন হইতে হয়। তাই কবির ভাষায় বলিতে ইচ্ছা হয় :—

"ক্ষান্ত কর অতীতের গৌরবের কথা
সে কাহিনী মিথ্যা আজি, মিথ্যা তারে
করেছি আমরা আমাদের দৈন্য দিয়া।"

উল্লিখিত মঠ-মন্দির ও তীর্থস্থানসমূহের তালিকা হইতে দেখা গেল যে

নাথযোগিগণ ভারতের সর্ব্বত্র ও উহার বাহিরেও রাজা, মহারাজা, এবং ব্রাহ্মণাদি সর্ব্বজাতির গুরুরূপে পূজিত হইতেন এবং অনেক স্থলে দেবপূজার ন্যায় তাঁহাদের পূজার মন্ত্র পর্য্যন্ত রচিত হইয়াছিল। নাথযোগিগণ যে জাতি-বর্ণনির্ব্বিশেষে এইরূপ সর্ব্বজনমান্য, পূজনীয় ও বরেণ্য হইতে পারিয়াছিলেন তাহার একমাত্র কারণ তাঁহাদের উদার ধর্ম্মমত এবং সর্ব্বজীবে সমত্ব বুদ্ধি। হিন্দুধর্ম্মের সর্ব্বোত্তম ও সর্ব্বোচ্চ আদর্শ—সাম্য, মৈত্রী, প্রেম। নাথগুরুগণ এই উচ্চতম আদর্শের প্রবর্ত্তক ও প্রচারক—ধারক ও বাহক ছিলেন। সাম্য, মৈত্রী ও প্রেমের অপূর্ব্ব মোহন মন্ত্রে তাঁহারা সকলের হৃদয় জয় করিয়াছিলেন এবং নানা ভেদবিভেদ জর্জ্জরিত ভারতভূমিতে পরম উদার নাথধর্ম্ম বা শৈবধর্ম্ম সংস্থাপন পূর্ব্বক ধর্ম্মরাজ্যে একচ্ছত্র আধিপত্য অর্জ্জনে সমর্থ হইয়াছিলেন। সুতরাং নাথজাতির অতীত ইতিহাস যে গৌরবময় তাহাতে সন্দেহ নাই। এই মহিমময় ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী হইয়াও নাথযোগিগণ যে হিন্দু সমাজের নিম্নস্তরে আসীন হইয়া ঘৃণিত ও লাঞ্ছিত হইতেছে তাহার মূল কারণ— তাহাদের আদর্শভ্রষ্টতা ও আভিজাত্যবোধহীনতা। কিন্তু সুখের বিষয় নানা অত্যাচার ও নিষ্পেষণ সত্ত্বেও যোগিগণ তাহাদের বৈশিষ্ট্য আজও হারাইয়া ফেলে নাই। অন্যান্য জাতির ন্যায় তাহারা ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব ও আধিপত্য স্বীকার করিয়া মস্তক অবনত করে নাই। ব্রাহ্মণশাসিত ও চালিত হিন্দুসমাজে যোগিগণের এই তেজস্বিতা ও নির্ভীকতা অসহনীয়। এই জন্য তাহাদিগকে অনেক সময় সামাজিক উৎপীড়ন, লাঞ্ছনা ও নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছে। এইরূপ অত্যাচার ও অবিচারের ফলে নিরীহ, শান্তস্বভাব, ধর্ম্মভীরু যোগিগণ সমাজের নিম্নস্তরে সজোরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। তাহাদের বর্ত্তমান দৈন্য, দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, নিরক্ষরতা লক্ষ্য করিয়া একদেশদর্শী অনেক লেখক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, গবেষক ও প্রত্নতাত্ত্বিক যোগিজাতিকে সমাজে হেয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য অপচেষ্টা কম করেন নাই। কিন্তু যোগিজাতির ভাগ্যবলে তাহাদের অদৃষ্টচক্র

এখন বিপরীত দিকে ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই জাতির গৌরবোজ্জল অতীত কাহিনী উদ্ধার করিবার জন্য প্রত্নতাত্ত্বিক মহলে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। দেশের খ্যাতনামা ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকগণ এখন একবাক্যে স্বীকার করিতেছেন— যোগিজাতির অতীত ইতিহাস মহিমামণ্ডিত। গোরক্ষনাথ, মৎস্যেন্দ্রনাথ প্রমুখ যে ধর্ম্মরথীগণ সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয় সাধন করিয়া পরম উদার নাথধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের প্লাবনে ধ্বংসোন্মুখ হিন্দুধর্ম্মকে রক্ষা করিয়াছিলেন বর্ত্তমান নাথযোগিগণ তাঁহাদেরই বংশধর। সুতরাং যোগীরা দীন হইলেও, তাহারা হীন নহে; তাহারা শ্রেষ্ঠ— তাহারা বরণীয়— তাহারা মাননীয়।

অতএব কালচক্রের কুটিল গতিতে সমাজে লাঞ্ছিত, ঘৃণিত ও অত্যাচারিত যোগিগণের নিরাশ হইবার প্রয়োজন নাই। তাহাদের ভাগ্যাকাশে অভ্যুদয়ের নূতন সূর্য্য শীঘ্র সমুদিত হইবে— যাহার সমুজ্জ্বল আলোকরশ্মিতে তাহাদের অজ্ঞতা, দীনতা ও দরিদ্রতার অন্ধকার শীঘ্রই অপসারিত হইবে। অদূর ভবিষ্যতের এই আশায় আশান্বিত হইয়া আমরা, তাহাদিগকে ধৈর্য্য অবলম্বন করিবার জন্য পরামর্শ দিতেছি।

চতুর্থ অধ্যায়

নাথাচার্য্যবৃন্দ

যোগীগুরু মহর্ষি কপিল

সময়— রামায়ণের যুগ (১)

"চলমান রূপহীন যে বিরাট সেই
মহাক্ষণে আছে তবু ক্ষণে ক্ষণে নেই।"

পূর্ণ ব্রহ্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মহর্ষি কপিলকে সিদ্ধাদের প্রধান বলিয়াছেন। যথা— "সিদ্ধানাং কপিলোমুনি" (গীতা— ১০।২৬)। নাথপন্থের নয় নাথ চৌরাশী সিদ্ধা প্রসিদ্ধ। সে সব বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া আমরা পরে দেখাইব যে সিদ্ধ বা সিদ্ধা উপাধি নাথদের নিজস্ব। কপিল ভারতের আদি দার্শনিক, তর্কে ঈশ্বর প্রতিষ্ঠা হয় না ইহাই তাহার মত। বেদ যদি বিবেকবিরুদ্ধ হয় তবে বেদকেও অগ্রাহ্য কর এই স্বাধীনতার বাণী তিনিই প্রথম ঘোষণা করিয়া ব্রাহ্মণ সমাজের রোষ কটাক্ষে পতিত হইয়াছিলেন।

মহর্ষি কপিল প্রণীত সাংখ্যদর্শন মতে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ দুঃখ নিবৃত্তিই মোক্ষলাভের উপায়। কিরূপে এই ত্রিবিধ দুঃখ নিবৃত্তি হয় তাহাও ইহাতে কথিত হইয়াছে। ইহাতে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব

---

(১) ঢাকা মিউজিয়ামের অধ্যক্ষ ডাঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী বলেন— "নাথসিদ্ধাগণের সময় নির্ণয় করা বাঙ্গলাদেশের সাহিত্যের এবং ইতিহাসের জন্য অত্যন্ত আবশ্যক। কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণের অভাবে কাজটা অদ্যাবধি সুসম্পন্ন হইয়াছে বলা যায় না। বিখ্যাত সিদ্ধাগণের এক জনেরও সময় অবিসংবাদিতরূপে নির্ণীত হইলে অন্য সকলের সময়ের একটা নির্ভরযোগ্য অনুমান পাওয়া যাইত" (গোপীচাঁদের সন্ন্যাস, সম্পাদকীয় মন্তব্য— ৬০ পৃঃ)।

আমরা এ-অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে চেষ্টা করিব।

স্বীকৃত হইয়াছে। ইহার মতে প্রকৃতি দ্বারা জাগতিক ব্যাপার নিষ্পন্ন হইতেছে এবং অষ্টাঙ্গ যোগ দ্বারা নিঃশ্রেয়স বা মোক্ষ লাভ করা যায়। সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই। ইহা ষড়দর্শনের একতম।

কোন কোন পুরাণ কপিলকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়াছেন। ইনি বিভিন্ন স্থানে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া যোগ সাধন ও যোগধর্ম্ম প্রচার করিতেন। সে জন্য এসব আশ্রম কপিলাশ্রম নামে খ্যাত। যোগিজাতির মধ্যে প্রবাদ আছে যে সিদ্ধা কপিল যোগিবংশ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ইহার একটী আশ্রম গঙ্গা-সাগরসঙ্গমে অবস্থিত। যে দ্বীপের উপর আশ্রমটী অবস্থিত তাহাকে সাগরদ্বীপ কহে। আজিও এখানে নাথমোহান্ত পূজাকার্য্য সম্পাদন করেন। শ্রীপ্রতাপচন্দ্র ঘোষ এখানকার "কপিলাশ্রম ও বারুণী স্নান" প্রবন্ধে বলেন—

"Among the pilgrims I could not find a single Kayastha, Vaidya or Brahman. All the lower classes of Hindus almost without an exception were present. The reason is, the three higher classes named above do not believe in the sanctity of Kapataksha at the time of Baruni. This would seem to prove that Copil was born of low Parentage Indeed. He is suspected by some to be an ancestor of the present Mohantas who are Jugis (cloth weavers) by caste. Hence his influence over the higher castes is very small."

(J. R. A. S. of Bengal, Vol. 39)

অর্থাৎ তীর্থযাত্রীদের মধ্যে কায়স্থ, বৈদ্য, ব্রাহ্মণ জাতির একজনকেও দেখা যায় নাই। কিন্তু নিম্ন জাতির কোন লোকই বাদ পড়ে নাই। ইহার কারণ উল্লিখিত তিনটী উচ্চ জাতি বারুণীর সময় কপোতাক্ষের পবিত্রতায় বিশ্বাস করে না। এসব হইতে বুঝা যায় কপিল নীচ বংশোদ্ভব। প্রকৃত পক্ষে লোকে তাঁহাকে এখানকার যুগী (তন্তুবায়) মোহান্তদের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া অনুমান করে। এই কারণেই উচ্চ হিন্দুদের উপর তাঁহার তেমন প্রভাব নাই।

কপিল যে বঙ্গদেশ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, কপিল-গীতায় তার আভাষ আছে—

"এবং সা কপিলোক্তেন মার্গেণাচরিতঃ পরম্।
আত্মানং ব্রহ্মনির্ব্বাণং ভগবন্তমবাপহ।
তদ্বীবাসীৎ পুণ্যতমং ক্ষেত্রং ত্রৈলোক্য বিশ্রুতম্।
নাম্না সিদ্ধিপদং যত্রসা সংসিদ্ধিরুপেয়ুষী ॥
তস্যাস্তদয়োগ বিধুর্তমার্ত্ত্যং মর্ত্য মুভৎসরিৎ।
স্রোতসাং প্ররবাসৌম্য সিদ্ধিদা সিদ্ধসেবিতা।
কপিলোঽপি মহাযোগী ভগবান পিতুরাশ্রমাৎ
মাতরং সমনুজ্ঞাপ্য প্রাগুদীচীং দিশং যযৌ।
সিদ্ধচারণ গন্ধ বৈর্মুনিভিশ্চাপ সরোগণৈঃ ॥
স্তূয়মানঃ সমুদ্রেণ দর্ত্তাহণ নিকেতনঃ।
আস্তেযোগং সমস্থায় সাংখ্যচার্য্যৈরভিষ্টুতঃ।
ত্রয়াণামপি লোকানামুপশান্ত্যৈ সমাহিতঃ।"

(কপিল-গীতা— ৯ম অধ্যায়, ৩০-৩৫ শ্লোক)

সদ্ধর্ম বলিতে অনেকেই ভ্রমাত্মকভাবে বৌদ্ধধর্ম্মকেই বুঝিয়া থাকেন। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবদন্তর্গত কপিল-গীতাতে দেখা যায় দেবহুতি কপীলকে সদ্ধর্ম্মবিৎদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন—

"দেবহুতিরুবাচ—তংত্বাগতাহং শরণং শরণ্যং স্বভৃত্য সংসারতরোঃ কুঠারম্। জিজ্ঞাসয়াহং প্রকৃতেঃ পুরুষস্য নমামি সদ্ধর্ম্মবিদং বরিষ্ঠম।"

(কপিল-গীতা, ১ম অধ্যায়, একাদশ শ্লোক)

বিশ্বভারতীর অধ্যাপক শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন—"কপিলমুনি (১) ষড়দর্শনের অন্তর্গত সাংখ্য-সূত্রের রচয়িতা। কপিল ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই। অন্ততঃ অস্তিত্বের প্রমাণাভাব এ কথা স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন।

তাঁহার মতে জগৎ প্রকৃতি (জড়) হইতে উদ্ভূত। সাংখ্য মতের তিনখানি মাত্র গ্রন্থ আছে, 'তত্ত্ব সমাসসূত্র', 'সাংখ্য প্রবচন সূত্র' ও 'ঈশ্বর কৃষ্ণের কারিকা'। অনেকে 'তত্ত্ব সমাস সূত্রকে' কপিল মুনির মুল দর্শন মনে করেন। তবে ইহাকে সূত্র না বলিয়া সূচী বলা উচিত। এই তত্ত্ব সমাসের কপিল শিষ্য আসুরির নামে প্রচলিত এক ভাষ্য এবং ১৭৯৩ শকাব্দে লিখিত শ্রীনরেন্দ্রকৃত এক টীকা প্রচলিত আছে (দ্রঃ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, 'সাংখ্য পরিচয়')। ইন্দ্র সগর রাজার যজ্ঞাশ্ব হরণ করিয়া পাতালে ধ্যানরত কপিল মুনির আশ্রম সমীপে রাখিয়া আসেন"। সগর তনয়গণ ইহা আবিষ্কার করে ও মুনিকে চোর বলিয়া সন্দেহ করে। মুনির কোপানলে সগরের ৬০ হাজার সন্তান ধ্বংস হয়। পরে অংশুমান (দ্রঃ) পাতালে গিয়া মুনিকে সন্তুষ্ট করেন ও জানিতে পারেন জাহ্নবীর জলে সগর বংশের উদ্ধার হইবে। ইহাঁর পর ভাগিরথী মর্ত্যে আনীত হয়।"

(জ্ঞানভারতী, ১ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ— ২১২ পৃঃ)

কপিলের নামানুসারে যোগিজাতির মধ্যে কপিলানী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছিল। নাথপন্থী মোহান্তগণের যে দ্বাদশটী শাখা আছে তাহার এক নম্বর শাখার নাম "কপিলানী পন্থী।"

তিননাথ ও নয়নাথ বা নবনাথ এবং চৌরাশীসিদ্ধা

সময়—৫ম খৃঃ অঃ হইতে ১২শ খৃঃ অব্দ

নাথপন্থার তিন জন সর্ব্বগুণান্বিত নেতাকে তিননাথ, নয়জন সর্ব্বগুণান্বিত নেতাকে নয়নাথ বা নবনাথ, চৌরাশী জন সিদ্ধ মহাপুরুষকে চৌরাশী সিদ্ধা বলা হয়। নিম্নে ইহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল।

তিননাথ

গুরু আদিনাথ, গুরু মৎস্যেন্দ্রনাথ বা মীননাথ ও গুরু গোরক্ষনাথ

উপরোক্ত তিন জন নাথগুরুকে তিননাথ বলা হয়। সাধারণের বিশ্বাস

ইহাদের কৃপায় অমঙ্গল দূর হয়। জনসমাজে ইহাদের পূজা প্রচলিত আছে। এই পূজাকে তিন নাথের সেবা বা তিন নাথের মেলা বলা হয়। কাছাড় এবং বর্ত্তমান পাকিস্তানের ময়মনসিংহ, ঢাকা, ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম প্রভৃতি জিলায় উক্ত সেবা বা মেলার আধিক্য দৃষ্ট হইত। অবশ্য এ সব আজ কাল লুপ্তপ্রায়। সন্ধ্যাবেলা মিঠা তৈলের আলো জ্বালাইয়া পান, সুপারি ও গাঁজা খাইয়া ভক্তবৃন্দ তিন নাথের ভজন গান করেন। গান নিম্নরূপ—

"সাধুরে ভাই—
দিন গেলে তিন নাথের নাম লইও।
সারাদিন কৈররে ভাই সংসারের কাম,
সন্ধ্যা হইতে লইও তিন নাথের নাম।
আমার ঠাকুর তিন নাথ যেবা করে হেলা,
গলায় হবে গলগণ্ড চোখে বার হয় ঢেলা। (১)
সাধুরে ভাই ইত্যাদি ধূয়া—
আমার ঠাকুর তিন নাথ যার বাড়ী যায়
সর্দিজ্বর মাথাব্যথা তরাসে পলায়।
সাধুরে ভাই ধূয়া পূর্ব্ববৎ—
আমার ঠাকুর তিন নাথ যার বাড়ী যায়,
এক পয়সার গাঁজা দিয়া তিন কল্কি সাজায়।
ধূয়া পূর্ব্ববৎ—"

এই গানটি ত্রিপুরা জিলায় আজও গীত হইয়া থাকে :—

"তিন পয়সায় হয় যার মেলা,
কলিতে তিন নাথের মেলা।

---

(১) 'ত্রিনাথ ত্রিনাথ ব'লে যে করিবে হেলা।
তার গলায় হবে গলগণ্ড চোখে বেরুবে ঢেলা ॥'
—পাঠান্তর।

এক পয়সার সিদ্ধি আনি তিন কল্‌কি সাজায়,
গাঁজায় দিয়ে দম বলছে বম ববম ববম বম ভোলা,
সাধুরে ভাই কলিতে তিন নাথের মেলা।
এক পয়সার পান আনি তিন খিলি সাজায়,
সাধুরে ভাই কলিতে তিন নাথের মেলা।
এক পয়সার তৈল আনি, তিন বাতি সাজায়,
বাতি জ্বালিয়া দিলে নিভে নারে এ কিরে আজব লীলা,
সাধুরে ভাই কলিতে তিন নাথের মেলা।"

নয় নাথ বা নব নাথ

সময়—৫ম খৃঃ অব্দ হইতে ১২শ খৃঃ অব্দ

তিন নাথ, নঁয় অথবা নব নাথ এবং চৌরাশী সিদ্ধা জনসাধারণের বিশেষ করিয়া হিন্দুদের দেবতা রূপে পূজিত। হিমালয় আর্যাদের অতি পবিত্র স্থান। যোগী-সন্ন্যাসীরা বৈদিক কাল হইতে হিমালয়ের নির্জ্জন গিরিগুহায় তপস্যা করিয়া আসিতেছেন। শিব আর্য্যদের আদি দেবতা, তিনি কৈলাসে বাস করেন। মানস সরোবর ব্রহ্মার মানস-সৃষ্টি বলিয়া পুরাণে লিখিত আছে। কৈলাস ও মানস সরোবর ভারতের উত্তরে অবস্থিত। এই জন্যই উত্তর দিকটা হিন্দুদের নিকট অতি পবিত্র। এখনও শত শত সাধু সন্ন্যাসী হিমালয়ের তুষার ভেদ করিয়া কৈলাস ও মানস সরোবর গমন করিয়া থাকেন। প্রাচীন যুগেও সাধু সন্ন্যাসীগণ ভারতের সমতল ভূমি হইতে কৈলাস ও মানস সরোবরে গমনাগমন করিতেন। অমর নাথ, কেদার নাথ, বদরি নাথ, পশুপতি নাথ, পিছোড় নাথ, খোজোর নাথ প্রভৃতি নাথ নাম সমন্বিত ভারতের উত্তর প্রান্তস্থিত শৈবতীর্থগুলি

তাঁহাদের কৈলাস ও মানস সরোবর গমনাগমনের মাইল-স্তম্ভস্বরূপ বিদ্যমান আছে। হিমালয়ে নয় নাথ চৌরাশী সিদ্ধা যমদণ্ডকে খণ্ডন করিয়া আজিও বিচরণ করিতেছেন। মানস সরোবরের নিকট নয় নাথ বা নব নাথের ডেব্বি আছে। ইহা আজও হাজার হাজার তীর্থযাত্রীর পুণ্য পীঠভূমি। স্থানটি অতি দুর্গম। পরম স্বাতন্ত্রী প্রকাশানন্দ ব্রহ্মচারী এ সব দুর্গম স্থান ভ্রমণ করিয়া তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত ১৭৯২ খৃঃ অব্দের ১৪ই আগষ্ট জোনাথান ডানকান (Jonathan Duncan) সাহেবকে বলিয়াছিলেন। সাহেব তাহা এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় (J. A. R. S. Vol. V.) প্রকাশ করিয়াছিলেন। নিম্নে ইহার কতক অংশ উদ্ধৃত করা হইল—

"I went into the country of great and little Lamas where the Tishu Lama lives. The lake Mansarbar is 17 days' journey from there on. In a jungly country which prevents access to it, there are places known under the denomination of Monmahesh Mahadeo and of Trilok Nathjee and the debbesor cooking places of Nao Nath and of eighty four Siddhas— all situated on the said Mansorabar. Into the debbes if one throws in either two loaves or as many as are wanted, one in the name of the Siddha and another in one's own name, that in the name of the Siddha remains at the bottom and that in one's own name rises up baked. These places I visited.

(J. A. R. S., Vol. V, 1792)

অর্থাৎ আমি ছোট ও বড় লামার দেশ যেখানে তিশু লামা বাস করেন সে দেশে গিয়াছিলাম। মানস সরোবর সেখান হইতে আরও ১৭ দিনের রাস্তা। এখানে ভীষণ পর্ব্বতময় অতি দুর্গম প্রদেশে মনোমহেশ, মহাদেব, ত্রিলোক নাথজী, নয় নাথ ও চৌরাশী সিদ্ধার ডেব্বি বা রন্ধনের স্থান আছে। সেই ডিব্বির ভিতর যদি কেহ সিদ্ধার নামে একখানা ও নিজের নামে একখানা বা যত ইচ্ছা টী ফেলিয়া দেয়, তবে সিদ্ধার নামের রুটীখানি চুলার তলায় থাকে, এবং

নিজের নামের কটী ভাজা হইয়া উপরে আসিয়া থাকে। এ সব স্থান আমি নিজে পরিদর্শন করিয়াছি।

(জার্নেল অব দি এসিয়াটীক রিসার্চ সোসাইটীর ৫ম খণ্ড, ১৭৯২ খৃঃ)

হিমালয় অঞ্চলের তুষারময় গুহায় নাথদের কীর্ত্তি সন্ধানীদের অপেক্ষা করিতেছে।

ষোড়শ নিত্যতন্ত্রে আছে—

"তন্ত্রং মদুক্তং ভুবনে নব নাথৈব কল্পয়েৎ।
ত্বয়াতৈ ভুবনে তন্ত্রং কল্পে কল্পে বিজৃম্ভতে।।" (১)

Mr J. C. Oman-কৃত "Mystics, Ascetics and Saints of India" নামক গ্রন্থের ১৮৫ পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত মহাত্মাদের নয়নাথ বা নবনাথ বলা হইয়াছে—"গোরক্ষনাথ, মৎস্যেন্দ্র নাথ, চর্পট নাথ, মঙ্গল নাথ, ঘুগা নাথ, গোপী নাথ, (২), প্রেম নাথ, সুরথ নাথ ও চম্বা নাথ।"

অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ নাথপন্থ প্রবন্ধে বলেন—"ইঁহাদের (নাথদের) বিশ্বাস, গোরখ অনাদি অনন্ত পুরুষ। ইঁহারই ইচ্ছায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহাদেবের জন্ম। ইনি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নবনাথ রূপে অবতীর্ণ হন। গোরখপন্থীরা নবনাথের উল্লেখ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে নবনাথের নাম—এক নাথ, আদি নাথ, মৎস্যেন্দ্র নাথ, উদয় নাথ, দণ্ড নাথ, সত্য নাথ, সন্তোষ নাথ, কূর্ম্ম নাথ, জলন্ধর নাথ।" (প্রবাসী, চৈত্র—১৩২৮ বাং)

মারাঠী ভাষার 'নব নাথ ভক্তি সার' গ্রন্থ সুপ্রাচীন নাথমত পরম্পরা হইতে সংগৃহীত হইয়া ১০৩ বৎসর পূর্ব্বে ১৭৪১ শক জ্যৈষ্ঠ শুক্লা প্রতিপদে ইহার লেখা শেষ হয়। ইহাতে নব নাথের নিম্নে উদ্ধৃত শ্লোক আছে—

"নব নাথাচাঁ শ্লোক"

---

(১) Buddhist Esoterism By B. T. Bhattacharjee
(২) খুব সম্ভব রাজা গোপীচাঁদ

"গোরক্ষ জালন্দর, চর্পটাশ্চ অডবঙ্গ কাম্বীপ মাচ্ছিন্দরাদ্যাঃ ॥ চৌরঙ্গী রেবাণক ভক্তি সংজ্ঞাভূম্যাংবভুবুর্ণব নাথ সিদ্ধাঃ ॥"

Light on the path of Self Realisation By N. V. Gunaji গ্রন্থের ক্রোড়পত্রে নিম্নলিখিত মহাত্মাগণকে নয়নাথ বা নবনাথ বলা হইয়াছে:—

"মৎস্যেন্দ্র নাথ, গোরক্ষ নাথ, জালন্দর নাথ, কাহ্নুপা নাথ, ভর্ত্তিহরি নাথ, বেরণ নাথ, নাগ নাথ (১), চর্পট নাথ, গাহিনী নাথ।"

সুধাকর চন্দ্রিকা নামক হিন্দী ভাষায় গ্রন্থে আছে—

"নবই নাথ চলি অবহী অউ চউরাসী সিদ্ধা।
অহুটি বজরজর ধরতী, গগন গরুর অউ সিদ্ধ॥"

দাদুপন্থী সাধক কবি সুন্দর দাস (সপ্তদশ শতাব্দী) কয়েকজন আদি যোগীগুরুর নাম করিয়াছেন—

"আদিনাথ মচ্ছিন্দ্র অরু গোরখ চর্পট মীন
কাণেরী চৌরঙ্গী পুনি হঠযোগত ইতি কীন্থ।"

(নাথপন্থের দিশা)

ধর্ম্মপুরাণের সৃষ্টিকাহিনী অবলম্বন পূর্ব্বক অধ্যাপক ডাঃ সুকুমার সেন বলেন—"নিরঞ্জনের নাভি থেকে বেরুলেন মীন নাথ (মৎস্যেন্দ্র নাথ), ললাট থেকে নির্গত হলেন গোরক্ষনাথ, হাড় থেকে উদ্ভূত হলেন হাড়িপা (জালন্ধরি), কর্ণরন্ধ্র থেকে বেরিয়ে এলেন কাহ্নুপা এবং চরণ থেকে উঠলেন চৌরঙ্গী নাথ। এই পাঁচ জন নাথপন্থের হচ্ছেন আদি সিদ্ধা।"

(নাথপন্থের দিশা—কল্যাণশ্রী— শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৫৫ বাং)।

শিখগুরু নানক বিরচিত 'প্রাণ সংগলী' নামক পাঞ্জাবী ভাষায় লিখিত একখানা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ ১৯১২ সালে এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত হয়। ইহাতে

(১) খুব সম্ভব নাগার্জ্জুন।

প্রসঙ্গক্রমে নাথপন্থার কথা আছে। নানক যোগতন্ত্র আলোচনা প্রসঙ্গে নয় জন নাথের বন্দনায় বলিয়াছেন—

"অষ্টজতী নউ নাথ কহায়ং।
তিনকে ইসম সভৈ সমঝায়ং॥
আদি নাথ উথন্থ প্রগট্টায়ো।
চউরং নাথ (১) বিশন্থঠহয়ায়ো॥
সত্তু নাথ বিশ্বেবিসথারং।
সংতোষ নাথ (২) ব্রহ্মাউপকারং॥
ওঁ অনাহদ শব্দ প্রগাসং।
জহং নানক সতি ঘটি ব্রহ্মনিবাসং॥
জব ভিন্ন ভিন্ন করি সুনহু বিচারা।
ভৈরবনাথ জলৈ থল সারা॥
অসংভুনাথ অবচল্ল অনুপং।
জগন্নাথ হৈ বোধ অনুপং॥
কজরীবন (৩) মাছংদ্রনাথা (৪)।
গোরখনাথ ঘটি ঘটিহৈ সাথা॥
সব নাথংহসির অবগত নাথং।
তাং সিসরৈ স গলে দুখ লাথং॥
ইওঁ নুওঁ নাথ (৫) হংকা ভেদবতায়া।
তব নানক দুর্মতি মার সমায়া॥"

(প্রাণ সংগলী—৩১শ অধ্যায়, ৪৮, ৪৯

---

(১) চৌরঙ্গী নাথ। (২) সন্তোষ নাথ। (৩) কদলী বন। (৪) মৎস্যেন্দ্র নাথ
(৫) নয় নাথ।

নাথ চৌরাশী সিদ্ধা

সময়— ৫ম খৃঃ অঃ হইতে ১২শ খৃঃ অব্দ

হঠপ্রদীপিকায় চৌরাশী সিদ্ধার কথা আছে। কিন্তু ইহাতে চৌরাশী জনের নাম পাওয়া যায় না।

"শ্রীআদিনাথ মৎস্যেন্দ্র সারদানন্দ ভৈরবাঃ।
চৌরঙ্গীমীন (১) গোরক্ষ বিরূপাক্ষ বিলেশয়াঃ।
মন্থান ভৈরবো যোগী সিদ্ধাবোধশ্চ কান্থড়ী।
কোরণ্ডকঃ সুরানন্দঃ সিদ্ধপাদশ্চ চর্পটী।
কণেরিঃ পূজ্যপাদশ্চ নিত্যনাথো নিরঞ্জনঃ।
কাপালী বিন্দুনাথশ্চ কাক চণ্ডীশ্বরো ময়ঃ।
অক্ষয়ঃ প্রভুদেবশ্চ ঘোড়া চুলীচ টিণ্টিনী।
ভল্লাটি নাগবোধশ্চ খণ্ডঃ কাপালিকস্তথা।
ইত্যাদয়ো মহাসিদ্ধা হঠযোগ প্রভাবতঃ।
খণ্ডয়িত্বা কালদণ্ডং ব্রহ্মাণ্ডে বিচরন্তিতে।"

(হঠপ্রদীপিকা— ১ম উপদেশ)

উক্ত মহাসিদ্ধাগণ যমদণ্ডকে খণ্ডন করিয়া ব্রহ্মাণ্ডে বিচরণ করিয়া থাকেন।

আব্দুল সুকুর মোহাম্মদ বিরচিত ও অধ্যাপক ডাঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পাদিত 'গোপীচাঁদের সন্ন্যাসে' দেখা যায় গৌরী এক যজ্ঞ করিয়াছিলেন। নিমন্ত্রিত হইয়া নয়নাথ চৌরাশী সিদ্ধা সে যজ্ঞে সমবেত হইয়াছিলেন। এখানেও চৌরাশী জনের নাম পাওয়া যায় না।

(১) মৎস্যেন্দ্রনাথের নামান্তর মীননাথ বলিয়াই আমরা জানি। কিন্তু এখানে প্রথম লাইনে মৎস্যেন্দ্রনাথ ও দ্বিতীয় লাইনে 'মীন' (নাথের) নাম করায় ইঁহারা বিভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া ধরিতে হয়। খুব সম্ভব মৎস্যেন্দ্র (মীন) নাথ একজন সিদ্ধা এবং শুধু মীননাথ নামক অন্য আর একজন সিদ্ধা ছিলেন।

"আইল সকল সির্দ্ধা জৈগ্যের (১) কারণ ॥
প্রথমে আইল শির্দ্ধা গোরেখ্য হরিহর (২)।
হাড়িফা আইল জার নাম জলর্দ্ধরী ॥
মিন্নাথ (৩) আইল আর আইল ভাদাই।
মেহের নাথ আইল আর শির্দ্ধা কাহ্নাঞি ॥ (৪)
হেরেঙ্গা (৫) চেরেঙ্গা (৬) আইল ২ বোনমালি।
মিন্নাথ (৭) আইল জার নাম মচ্ছন্দলি
লও [নও] লাক (৮) চৌরাশী শির্দ্ধা আইল সর্ব্বজন।
আসিয়া বন্দিল ভোলানাথের চরণ ॥"

(গোপীচাঁদের সন্ন্যাস— ১১ পৃঃ)

গুরু গোরক্ষনাথ প্রণীত 'হঠপ্রদীপিকা'তে আছে—

"আদিনাথো বিরূপাক্ষ মস্যেন্দ্রো ধানর স্তথা
নাগার্জ্জিনো মেঘানাদো চৌরঙ্গী যোগশাস্ত্রবিৎ ॥"

---

(১) যজ্ঞের। (২) গোরক্ষ হরিহর। (৩) মীননাথ (৪) সিদ্ধা কানুপা বা কৃষ্ণাচার্য্য। (৫) এই নাম নূতন শুনা গেল। (৬) চৌরঙ্গী নাথ। (৭) মীন (মৎস্যেন্দ্র) নাথ। তাহা হইলে এখানকার ৩নং সিদ্ধা মিন্নাথ (মীননাথ) এবং ৭নং সিদ্ধা মিন্নাথ (মচ্ছন্দলি) ইঁহারা বিভিন্ন ব্যক্তি। ৭নং সিদ্ধা যে মৎস্যেন্দ্র (মীন) নাথ সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকা উচিত নহে। হঠপ্রদীপিকার ও গোপীচাঁদের সন্ন্যাসের উক্ত বিবরণ বিচার করিলে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে মৎস্যেন্দ্র (মীননাথ) একজন সিদ্ধা এবং মীননাথ আর একজন সিদ্ধা।

(৮) সর্ব্বত্র নয়নাথ চৌরাশী সিদ্ধা প্রসিদ্ধ। কোথাও নয় লাক (লক্ষ) চৌরাশী সিদ্ধার বিবরণ পাওয়া যায় নাই। লিপিকরপ্রমাদে এখানে 'নয়' 'লও' [নও] এ এবং 'নাথ' 'লাকে'-এ পরিণত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। গুজরাটী বিবরণেও নয়নাথ চৌরাশী সিদ্ধা পাওয়া যায়।

(Indian Antiquary, Vol. VII. Page 49, ১ম স্তম্ভ)

এখানকার 'নাগাজিনো', 'নাগার্জ্জুন' এবং 'চৌরহী' 'চৌরঙ্গী' নাথ? তাহা হইলে 'ধানর' ও 'মেঘনাদের' নাম নূতন শুনা গেল।

ময়নামতীর একটি গানে আছে—

"তবে সিদ্ধা চলি গেলা যার যেই ঘরে।
প্রথমে হাড়িফা গেল ময়নামতীর ঘরে॥
ত্বরিত গমনে গেল মৈনামতীর পুরি।
তথা গিয়া রহিলেক হাড়ি রূপ ধরি॥
কানফা চলিয়া গেল অবরির ঘরে।
গাবুর চলিয়া গেল আপনা বাসরে॥
গোক্ষনাথ চলি গেল বঙ্গ নিকেতন।
কদলীতে চলি গেল মীন মহাজন॥

(ময়নামতীর গান)

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁহার বৌদ্ধ গান ও দোঁহার ভূমিকায় (৩৫— ৩৬ পৃঃ) কবিশেখরাচার্য্যের 'বর্ণন রত্নাকর, (১৩০০— ১৩২১ খৃঃ অঃ) নামক গ্রন্থ হইতে নাথচৌরাশী সিদ্ধার এক তালিকা উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেই তালিকাটি এই—

"১। মীননাথ ২। গোরক্ষনাথ ৩। চৌরঙ্গীনাথ ৪। চামরীনাথ ৫। তন্তিপা ৬। হালিপা ৭। কেদারিপা ৮। ধোঙ্গপা ৯। দারিপা ১০। বিরূপা ১১। কপালী ১২। কমারী ১৩। কাহ্ন ১৪। কনখল ১৫। মেখল ১৬। উন্মন ১৭। কাণ্ডলি ১৮। বোধী ১৯। জালন্ধর ২০। টোঙ্গী ২১। মবহ ২২। নাগার্জ্জুন ২৩। দৌলী ২৪। ভিষাল ২৫। অচিতি ২৬। চম্পক ২৭। ঢেণ্টস ২৮। ভুম্বরী ২৯। বাকলি ৩০। তুজী ৩১। চর্পটি ৩২। ভাদে ৩৩। চান্দন ৩৪। কামরী ৩৫। করবৎ ৩৬। ধর্ম্মপাপতঙ্গ ৩৭। ভদ্র ৩৮। পাতলি ভদ্র ৩৯। পলিহিহ ৪০। ভাহ্নু ৪১।

জীন ৪২। নির্দ্দয় ৪৩। শবর ৪৪। শান্তি ৪৫। ভর্ত্তৃহরি ৪৬। ভীষণ ৪৭। ভটী ৪৮। গগনপা ৪৯। গমার ৫০। মেহুরা ৫১। কুমারী ৫২। জীবন ৫৩। অঘোসাধব ৫৪। গিরিবর ৫৫। সিয়ারী ৫৬। নাগবালি ৫৭। বিভবৎ ৫৮। সারঙ্গ ৫৯। বিবিকিধজ ৬০। মগরধজ ৬১। অচিত ৬২। বিচিত ৬৩। নেচক ৬৪। চাটল ৬৫। নাচন ৬৬। ভীলো ৬৭। পাহিল ৬৮। পাসল ৬৯। কমলকঙ্গারি ৭০। চিপিল ৭১। গোবিন্দ ৭২। ভীম ৭৩। ভৈরব ৭৪। ভদ্র ৭৫। ভমরী ৭৬। ভুরুকুটি" (বর্ণন রত্নাকর—বৌদ্ধগান ও দোঁহা)। এখানেও ৮৪ জনের নাম পাওয়া গেল না। মূল তালিকা হইতে হয়ত অবশিষ্ট ৮ জনের নাম উদ্ধৃত করা সম্ভবপর হয় নাই।

Light on the path of Self Realisation নামক ইংরাজি গ্রন্থমালার ২৮ নং গ্রন্থের ক্রোড়পত্রে চৌরাশী সিদ্ধার যে তালিকা আছে, তাহা এই ;—

"১। কবিশানন্দ সিদ্ধ ২। বাগানন্দ সিদ্ধ ৩। শগতানন্দ সিদ্ধ ৪। বাণ্ডানন্দ সিদ্ধ ৫। গোরানন্দ সিদ্ধ ৬। অসিতাগানন্দ সিদ্ধ ৭। বটুকানন্দ সিদ্ধ ৮। রবিনন্দ সিদ্ধ ৯। অজমাতনন্দ সিদ্ধ ১০। গুপ্তানন্দ সিদ্ধ ১১। চন্তানন্দ সিংহ ১২। ক্রোধানন্দ সিদ্ধ ১৩। মহেন্দ্রানন্দ সিদ্ধ ১৪। ভীষণানন্দ সিদ্ধ ১৫। দিব্যানন্দ সিদ্ধ ১৬। বোধিনন্দ সিদ্ধ ১৭। কলানন্দ সিদ্ধ ১৮। বিলাসানন্দ সিদ্ধ ১৯। সিদ্ধানন্দ সিদ্ধ ২০। মাতৃকানন্দ সিদ্ধ ২১। সরস্বত্যানন্দ সিদ্ধ ২২। শুভাগানন্দ সিদ্ধ ২৩। পরমছত্তানন্দ সিদ্ধ ২৪। সমরসানন্দ সিদ্ধ ২৫। মহানন্দ সিদ্ধ ২৬। ভোমানন্দ সিদ্ধ ২৭। ব্রহ্মানন্দ সিদ্ধ ২৮। শকানন্দ সিদ্ধ ২৯। চিদানন্দ সিদ্ধ ৩০। পূর্ব্বানন্দ সিদ্ধ ৩১। শুকানন্দ সিদ্ধ ৩২। বনানন্দ সিদ্ধ ৩৩। চৈতন্য সিদ্ধ ৩৪। রাজচৈতন্য সিদ্ধ ৩৫। কলাচৈতন্য সিদ্ধ ৩৬। নামচৈতন্য সিদ্ধ ৩৭। দিব্যচৈতন্য সিদ্ধ ৩৮। প্রজ্ঞাচৈতন্য সিদ্ধ ৩৯। শ্যামচৈতন্য সিদ্ধ ৪০। বিজ্ঞানচৈতন্য সিদ্ধ ৪১। পঞ্চচৈতন্য সিদ্ধ ৪২। আত্মচৈতন্য সিদ্ধ ৪৩। বৈরাগ্যচৈতন্য সিদ্ধ ৪৪। প্রসপদচৈতন্য সিদ্ধ ৪৫। নির্ব্বাণচৈতন্য সিদ্ধ

৪৬। মেধাচৈতন্য সিদ্ধ ৪৭। বিদ্যচৈতন্য সিদ্ধ ৪৮। সিদ্ধচৈতন্য সিদ্ধ ৪৯। শ্রীচৈতন্য সিদ্ধ ৫০। প্রজ্ঞা সিদ্ধ ৫১। শ্রীনাথ সরস্বতী সিদ্ধ ৫২। আনন্দ সিদ্ধ ৫৩। মেধা সিদ্ধ ৫৪। চিদানন্দ সিদ্ধ ৫৫। প্রজ্ঞাসরস্বতী সিদ্ধ ৫৬। কলা সিদ্ধ ৫৭। সমেটা সিদ্ধ ৫৮। দেব সিদ্ধ ৫৯। বিরাট সিদ্ধ ৬০। সার সিদ্ধ ৬১। ভূতভৈরব সিদ্ধ ৬২। বিরাটভৈরব সিদ্ধ ৬৩। স্বরাজ্যভৈরব সিদ্ধ ৬৪। সম্রাট-ভৈরব সিদ্ধ ৬৫। আনন্দভৈরব সিদ্ধ ৬৬। রুরুভৈরব সিদ্ধ ৬৭। উন্নতভৈরব সিদ্ধ ৬৮। উদ্ভটভৈরব সিদ্ধ ৬৯। মিরাশতভৈরব সিদ্ধ ৭০। বিশ্বরূপভৈরব সিদ্ধ ৭১। রঙ্গবার সিদ্ধ ৭২। দেববার সিদ্ধ ৭৩। ব্রহ্মবার সিদ্ধ ৭৪। রাজবার সিদ্ধ ৭৫। সিদ্ধবার সিদ্ধ ৭৬। মাপ্র সিদ্ধ ৭৭। কপিলী সিদ্ধ ৭৮। কাম সিদ্ধ ৭৯। মূর্ত্তি-শট সিদ্ধ ৮০। মূর্ত্তিচালনা সিদ্ধ ৮১। চক্রবর্ত্তী সিদ্ধ ৮২। জোগবার্ত্তা সিদ্ধ ৮৩। অনুগ্রহ সিদ্ধ ৮৪। নিগ্রহ সিদ্ধ।"

উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে যে উপরোক্ত ৮৪ জন সিদ্ধ পুরুষ এবং নাথ সম্প্রদায়ের আরও অনেক মহাপুরুষ জ্ঞানেশ্বর মহারাজের পূর্ব্বে অধ্যাত্ম বিদ্যা প্রচারে রত ছিলেন। জ্ঞানেশ্বর মহারাষ্ট্রের মহাপুরুষ। তাঁহার সময় ১২শ খৃঃ অব্দ। তাহা হইলে উক্ত চৌরাশী সিদ্ধার তালিকাখানি ১০ম বা ১১শ খৃঃ অব্দের বলিয়া অনুমিত হয়।

"নব নাথ ভক্তিসার" মারাঠী ভাষার গ্রন্থে নয় নাথ চৌরাশী সিদ্ধার বিবরণ পাওয়া যায়। হিন্দী ভাষার 'সুধাকর চন্দ্রিকায়'ও ইহাদের উল্লেখ আছে। নিম্নে সে তালিকাটী উদ্ধৃত করা হইল—

"১। সিদ্ধ নাথ ২। বদ্ধপদ্ম নাথ ৩। দৃঢ় নাথ ৪। বীর নাথ ৫। পবনমুক্ত নাথ ৬। ধীর নাথ ৭। শ্বাস নাথ ৮। পশ্চিম তান নাথ ৯। বাতায়ন নাথ ১০। ময়ুর নাথ ১১। মৎস্যেন্দ্র নাথ* ১২। কুক্কুট নাথ

* ইনি গোরক্ষনাথের গুরু মৎস্যেন্দ্রনাথ নহেন বলিয়াই অনুমিত হয়। কারণ এই তালিকায় সে সময়কার আর কোনও সিদ্ধার নাম নাই।

১৩। ভদ্র নাথ ১৪। অৰ্দ্ধপদ নাথ ১৫। পূর্ণপদ নাথ ১৬। দক্ষিণ নাথ ১৭। শব নাথ ১৮। অৰ্দ্ধ নাথ ১৯। ধনুষ নাথ ২০। পাদশিরা নাথ ২১। দ্বিপাদশিরা নাথ ২২। স্থির নাথ ২৩। বৃক্ষ নাথ ২৪। অৰ্দ্ধবৃক্ষ নাথ ২৫। চক্র নাথ ২৬। তাল নাথ ২৭। উৰ্দ্ধধনুষ নাথ ২৮। বামসিদ্ধ নাথ ২৯। স্বস্তিক নাথ ৩০। স্থিতবিবেক নাথ ৩১। উত্থিতবিবেক নাথ ৩২। দক্ষিণতর্ক নাথ ৩৩। পূর্ব্বতর্ক নাথ ৩৪। নিঃশ্বাস নাথ ৩৫। অৰ্দ্ধকূৰ্ম্ম নাথ ৩৬। গড়ুর নাথ ৩৭। ব্যাঘ্র নাথ ৩৮। বামত্রিকোণ নাথ ৩৯। প্রার্থনা নাথ ৪০। দক্ষিণসিদ্ধ নাথ ৪১। পূর্ণ-ত্রিকোণ নাথ ৪২। বামভুজ নাথ ৪৩। ভয়ঙ্কর নাথ ৪৪। অঙ্গুষ্ঠ নাথ ৪৫। উৎকট নাথ ৪৬। বামাঙ্গুষ্ঠ নাথ ৪৭। জ্যেষ্ঠিক নাথ ৪৮। বামার্দ্ধপাদ নাথ ৪৯। বামভুজপাদ নাথ ৫০। ভুজপাদ নাথ ৫১। বাম বক্র নাথ ৫২। বামজানু নাথ ৫৩। বামশাখা নাথ ৫৪। ত্রি-স্তম্ভ নাথ ৫৫। বামপাদাপান নাথ ৫৬। বামহস্ত-চতুষ্কোণ নাথ ৫৭। গোমুখ নাথ ৫৮। গর্ভ নাথ ৫৯। একপদ বৃক্ষ নাথ ৬০। মুক্ত হস্ত বৃক্ষ নাথ ৬১। হস্তবৃক্ষ নাথ ৬২। দ্বিপাদপার্শ্ব নাথ ৬৩। কন্দপীড়ন নাথ ৬৪। প্রৌঢ় নাথ ৬৫। উপধান নাথ ৬৬। উৰ্দ্ধসংযুক্তপাদ নাথ ৬৭। অৰ্দ্ধশব নাথ ৬৮। উত্তানকূৰ্ম্ম নাথ ৬৯। সর্ব্বাঙ্গ নাথ ৭০। অপান নাথ ৭১। যোগি নাথ ৭২। মণ্ডুক নাথ ৭৩। পৰ্ব্বত নাথ ৭৪। শলভ নাথ ৭৫। কোকিল নাথ ৭৬। লোল নাথ ৭৭। উষ্ট্র নাথ ৭৮। হংস নাথ ৭৯। প্রাণ নাথ ৮০। কার্ম্মুক নাথ ৮১। আনন্দমন্দির নাথ ৮২। খঞ্জন নাথ ৮৩। গ্রন্থিভেদন নাথ ৮৪। ভুজঙ্গ নাথ।"

(নবনাথ ভক্তিসার—সুধাকর চন্দ্রিকা)

তিব্বতে স্বীকৃত চৌরাশী সিদ্ধার ইংরাজী ভাষায় লিখিত তালিকাখানি বঙ্গানুবাদ সহ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল—

"(1) Luhipa (Matsyendra or Matsyantrad), (2) Lilapa (3)

Virupa (4) Dambi (Haruka) (5) Sabara (Sabari) (6) Saraha (Rahulabhadra) (7) Kankali (8) Mina (Vajra-pada) (9) Goraksa (10) Caurangi (11) Vina (12) Santi (Ratnakara Santi) (13) Tanti (14) Carmari (Carmara) (15) Khadga (16) Nagarjun (17) Karsnacari (Kanhapada, Kanapa, Karana) (18) Kanera (Kanari, or Agradeva) (19) Sihagana (Thagana) (20) Nadapa (Jasabhadra) (21) Salipa (Srgalapada) (22) Tilopa (Tailikapada) (23) Chatra (24) Bhadra (Bhada) (25) Doikhandi (Dokhandi) (26) Ajogi (Yogipada) (27) Kadapada (Kala) (28) Dhobi (Dhombhi) (29) Kankana (30) Kambala (Kamari) (31) Tinki (Damgi) (32) Bhade (Bhande, Bhandari) (33) Tandhi (Tandhe) (34) Kukkuri (35) Cubji (Kusali) (36) Dharma (37) Mahi (38) Acintya (Acinta, Acinti) (39) Babhahi (Bhalaha) (40) Nalina (41) Bhusuku (Santideva) (42) Indrabhuti (43) Meghapada (Meko) (44) Kuthari (Kuthali) (45) Karmara (46) Jalandhari (47) Rahula (48) Gharbari (Gharma) (49) Dhakari (Takri) (50) Medini (51) Pankoja (52) Ghanta (Vajraghanta) (53) Yogi (54) Celuka (Caluka) (55) Vaguri (Gundari) (56) Luncaka (Lucika) (57) Niranjana (58) Jayananda (59) Carsati (Pacari, Pacala) (60) Campaka (61) Visana (Vikhana) (62) Bhali (Teli, Taili) (63) Kumari (Kumbhakara) (64) Carpali (Javari) (65) Manibhadra (66) Mekhata (67) Mankhala (Kanakha) (68) Kata-Kala (69) Kanthadi (Pantali) (70) Dhahuli (Dandi) (71) Udhali (Uddiya) (72) Kapala (73) Kila (74) Puskara (Sagara) (75) Sarvabhaksa (Sabhiksa) (76) Nagabandhi (77) Darika (78) Puthali (Putuli) (79) Panaha (Upanahi) (80) Kokila (Kokili) (81) Ananga (82) Laksminkara (83) Samudra (Samuda) (84) Bhalipa (Byadi or Byali)"

(Kalyana Yaganka Number, Gita Press, Gorakhpore U. P.)

অর্থাৎ (১) লাহিপ (মৎস্যেন্দ্র অথবা মৎস্যান্ত্রাদ) (২) লিলা-পা (৩) বিরাপা (৪) দম্বী (হেরুক) (৫) সাবর (সবরা) (৬) সরহ (রাহুল ভদ্র) (৭) কঙ্কালী (৮) মিনা (বজ্রপাদ) (৯) গোরক্ষ (১০) চৌরঙ্গী (১১) বিনা (১২) শান্তি (রত্নাকর শান্তি) (১৩) তন্তী (১৪) চর্ম্মরী (চর্ম্মার) (১৫) খদ্গ (১৬) নাগার্জ্জুন (১৭) কৃষ্ণচারী (কাহন-পাদ, কনপ, করণ) (১৮) কানের (কানরী অথবা আর্য্যদেব) (১৯) স্থগর (থগন) (২০) নাড়পা (যশোভদ্র) (২১) সালিপা (স্রগালপাদ) (২২) তিলোপা (তৈলিকপাদ) (২৩) ছত্র (২৪) ভদ্র (ভাদ) (২৫) দ্বিখণ্ডী (দোখণ্ডী) (২৬) অযোগী (যোগীপাদ) (২৭) কডপাদ (কাল) (২৮) ধোবী (ধোম্ভী) (২৯) কঙ্কন (৩০) কম্বল (কমরী) (৩১) টেঙ্কী (ডঙ্গী) (৩২) ভদে (ভনঢে, ভাণ্ডারী) (৩৩) তন্ধী (তন্ধে) (৩৪) কক্কুরী (৩৫) চুজ্জী (কুসালী) (৩৬) ধর্ম্ম (৩৭) মহী (৩৮) অচিন্ত্য (অচিন্ত, অচিন্তি) (৩৯) বভহী (ভলহ) (৪০) নলিন (৪১) ভুসুকু (শান্তিদেব) (৪২) ইন্দ্রভাতি (৪৩) মেঘপাদ (মেকো) (৪৪) কুঠারী (কুঠালী) (৪৫) কর্ম্মার (৪৬) জালন্ধরী (৪৭) রাহুল (৪৮) ঘর্ব্বরী (ঘর্ম্মপাদ) (৪৯) ধকরী (টক্রী) (৫০) মেদিনী (৫১) পঙ্কজ (৫২) ঘণ্টা (বজ্রঘণ্ট) (৫৩) যোগী (৫৪) চেলুক (চলুক) (৫৫) ভাগুরী (গুণ্ডরী) (৫৬) লাঞ্চক (লুচিক) (৫৭) নিগুর্ণ (৫৮) জয়ানন্দ (৫৯) চর্যটী (পকরী, পাকল) (৬০) চম্পক (৬১) ভীষণ (ভীখন) (৬২) ভলী (তেলী, তৈলী) (৬৩) কুমরী (কুম্ভকার) (৬৪) চর্পটী (যবরী) (৬৫) মনিভদ্রা (৬৬) মেখলা (৬৭) মংখলা (কঙ্কখ) (৬৮) কল-কল (৬৯) কন্দুড়ী (পণ্টলী) (৭০) ধহুলী (দণ্ডী) (৭১) উধলী (উড্ডীয়) (৭২) কপাল (৭৩) কিল (৭৪) পুষ্কর (সাগর) (৭৫) সর্ব্বভক্ষ (সাভিক্ষ) (৭৬) নাগবোধি (৭৭) দারিক (৭৮) পুট্টলি (পুটুলি) (৭৯) পনহ (উপনাহী) (৮০) কোকিলা (কোকিলী) (৮১) অনঙ্গ (৮২) লক্ষ্মীঙ্করা (৮৩) সামুদ্র (সমুদ) (৮৪) ভলিপা (ব্যার্ড— অথবা ব্যালি)”— কল্যাণ যোগাঙ্ক নাম্বার— গীতাপ্রেস, গোরক্ষপুর, ইউ. পি.)

বর্ণন রত্নাকর ও কল্যাণ যোগাঙ্ক নাম্বার হইতে উদ্ধৃত চৌরাশী সিদ্ধার তালিকায় দেখা যায় যে এগুলিতে নাথপন্থী ও সহজপন্থী ধর্ম্মনায়কগণ নির্ব্বিচারে স্থান লাভ করিয়াছেন। তাহার কারণ ৫ম অধ্যায়ে দেখুন।

বুদ্ধাযেন বিমুচ্যন্তে নাথমার্গমতঃপরং।
তমহং কথায়িষ্যামি তব প্রীত্যাসুরেশ্বরি ॥
নানামার্গৈস্তু দুষ্প্রাপ্যং কৈবল্যং পরমং পদম্।
সিদ্ধিমার্গেণ লভ্যেত নান্যথা শিবভাষিতম ॥”

(গোরক্ষনাথের যোগবীজ) (১)

শিব গৌরীকে বলিতেছেন বদ্ধ জীব যে মার্গ অবলম্বন করিয়া মুক্ত হয় তোমার প্রীতির জন্য সেই নাথমার্গের কথা বলিব। কৈবল্যরূপ পরমপদ নানা মার্গে দুর্লভ, সিদ্ধিমার্গ দ্বারাই ঐ পদ লাভ করা যায়। •

তাহা হইলে বুঝিতে হইবে নাথমার্গের আর এক নাম সিদ্ধিমার্গ। এই সিদ্ধিমার্গে যাঁহারা সফল হইতেন তাঁহারাই সিদ্ধ বা সিদ্ধ বলিয়া খ্যাত হইতেন। নাথপন্থী ও সহজপন্থীদের মধ্যে যাঁহারা উক্ত নাথমার্গ বা সিদ্ধিমার্গে সফল হইতেন তাঁহারাই চৌরাশী সিদ্ধার তালিকায় স্থান লাভ করিতেন তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে যে—Light on the path of Self Realisation নামক গ্রন্থের চৌরাশী সিদ্ধার তালিকার সকলেরই উপাধি সিদ্ধ।

অধ্যাপক শ্রীতমোনাশচন্দ্র দাসগুপ্ত, এম-এ, পি-এইচ-ডি, বলেন— “সম্ভবতঃ এই ধর্ম্মের নেতৃবৃন্দ সকলেরই নাথ উপাধি ছিল বলিয়া নাম নাথধর্ম্ম হইয়া থাকিবে। এই নেতাগণ সিদ্ধাই বা সিদ্ধ বলিয়া প্রসিদ্ধ। * * সিদ্ধাইগণের মধ্যে যে চারিজন সমধিক খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন তাঁহাদের নাম—মীন নাথ,

(১) শ্রীভোলানাথ নাথ, এম-এ, পুরাতত্ত্ব-বিশারদ মহাশয়ের “ভারত সভ্যতায় নাথধর্ম্মের দান” প্রবন্ধ হইতে গৃহীত।

গোরক্ষনাথ, কালুপা ও হাড়িপা। এই চারিজনের মধ্যে গোরক্ষনাথের ভক্তের সংখ্যাই অধিক। গোরক্ষনাথ মীননাথের এবং কালুপা হাড়িপার শিষ্য ছিলেন।"

(ইতিহাস ও আলোচনা—শ্রাবণ, ১৩২৮ বাং)

শ্রীসুরেশচন্দ্র নন্দী বলেন—"শৈবযোগীরা সিদ্ধ আর বৌদ্ধযোগীরা সিদ্ধাচার্য্য নামে পরিচিত ছিলেন" (বসুমতী—পৌষ, ১৩৩৯ বাং)। সিদ্ধ বা সিদ্ধা উপাধি কখন হইতে চলিয়া আসিতেছে ঠিকভাবে বলা কঠিন। মহাভারতের যুগে যে এ উপাধি প্রচলিত ছিল তাহার প্রমাণ এই অধ্যায়ের প্রারম্ভেই দেওয়া হইয়াছে। বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে বিভিন্ন সময়ের নয় নাথ চৌরাশী সিদ্ধাদের যে সব তালিকা উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে খ্যাতনামা কয়েক জনের সময় বিচার করিয়া আমরা পরে দেখাইব যে ইঁহারা ৫ম খৃঃ অব্দ হইতে ১২শ বা ১৩শ খৃঃ অব্দের মধ্যকার নাথসিদ্ধ।

যোগিগুরু আদি নাথ

সময়—৫২২ খৃঃ অব্দ

নাথগুরু আদি নাথের শিষ্যের নাম মৎস্যেন্দ্র (মীন) নাথ। জৈনদের আদি তীর্থাঙ্কুরের নাম আদি নাথ। বৌদ্ধদের আদি গুরু আদি বুদ্ধ বা আদি নাথ। এ কারণে ঐ তিন সম্প্রদায় মূলতঃ এক বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। এখন বিচার করিতে হইবে ইঁহারা একই ব্যক্তি কি না? বৌদ্ধ ও জৈনেরা আদি নাথকে তাঁহাদের আদি গুরু বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু নাথেরা নিরঞ্জন নিরাকারকে তাঁহাদের আদি গুরু বলিয়া থাকেন। এই নিরঞ্জন নিরাকার নাথাচার্য্য আদি নাথ হইতে ৬ষ্ঠ পুরুষ উর্দ্ধে। (নাথপন্থ—অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, প্রবাসী, ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩২৮ বাং)

জৈন-শাস্ত্রানুসারে আদি নাথের সময় নির্ণয় গণিত শাস্ত্রের অঙ্ক দ্বারা দুঃসাধ্য ব্যাপার। বৌদ্ধ-শাস্ত্রানুসারে আদি বুদ্ধ বা আদি নাথের আবির্ভাব

সৃষ্টির আদিতে হইয়াছিল। আর নাথদের আদিনাথের সময় নিঃসন্দেহে ৫২২ খৃঃ অব্দ [যোগীগুরু মৎস্যেন্দ্র (মীন) নাথ দ্রষ্টব্য]। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে ইহারা বিভিন্ন আদি নাথ এবং ঐ তিন সম্প্রদায় মূলতঃ এক নহে। যোগিজাতির যোগের শ্রেষ্ঠত্ব বৌদ্ধ ও জৈনেরাও এক বাক্যে স্বীকার করেন। এখানেই ঐ তিন সম্প্রদায়ের বেশ মিল আছে। তবে তাঁহাদের মধ্যে পার্থক্য এই যে জৈন ও বৌদ্ধেরা নিরীশ্বর এবং নাথেরা সেশ্বর। নাথেরা যোগের মধ্য দিয়া বৌদ্ধ ও জৈনদেরে সেশ্বর করার জন্য বহু যুগব্যাপী বিস্তর শ্রম স্বীকার করিয়াছেন। একটী ধর্ম্মের বিলোপসাধন করিতে হইলে বা ধর্ম্ম-সামঞ্জস্য সংস্থাপন করিতে হইলে বিরুদ্ধ ধর্ম্মের তুল্য অংশগুলি গ্রহণ করিতে হয়, এবং তাহার অনেক ভাব ও আদর্শ অবলম্বন করিতে হয়। নাথেরা তাহাই করিয়াছিলেন। তাহার ফলেই নাথ, বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্মের কোথাও কোথাও মিল দেখা যায়। বৌদ্ধধর্ম্ম নাস্তিকতাদুষ্ট হওয়ায় শৈব-নাথেরা যোগের মধ্য দিয়া কৌশলে সপ্তধ্যানী বুদ্ধের উপাসনা প্রবর্ত্তিত করিয়া বৌদ্ধদেরে সেশ্বর করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সেই সেশ্বর বৌদ্ধধর্ম্ম তিব্বত, চীন, নেপাল, মঙ্গোলিয়া প্রভৃতি দেশে প্রচারিত হইয়াছিল। জৈনদের সকল তীর্থঙ্করের উপাধিই নাথ, বৌদ্ধদিগের তাহা নহে। নাথদের নয় নাথ চৌরাশী সিদ্ধার সঙ্গে জৈন ও বৌদ্ধ ২৪ জন তীর্থঙ্কর বা বুদ্ধের সঙ্গে কিছু মাত্র মিল দেখা যায় না। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে বংশ-পরম্পরা হিসাবেও নাথদের সঙ্গে বৌদ্ধ ও জৈনদের মিল নাই।

গুরু মৎস্যেন্দ্র নাথ কৃত 'যোগবিষয়' গ্রন্থে আছে—

"আকুলেনাদি নাথেন কেজাপূবীন বাসিনা।
কৃপয়েব পরং তত্ত্বং মীন নাথোপি বোধতঃ॥"

(ভারতসভ্যতায় নাথধর্ম্মের দান)

এখানে দেখা যাইতেছে যে গুরু আদিনাথ কেজাপূবীন নামক স্থানের অধি-

বাসী। এই কেজাপূবীন কোথায়? চট্টগ্রামের কক্স বাজারের সন্নিহিত সমুদ্রে অবস্থিত মহেশখালি দ্বীপে বহুকালাবধি 'আদিনাথ' প্রতিষ্ঠিত আছেন। এখানে যথারীতি তাঁহার পূজা অর্চ্চনা হয়। ইহা হিন্দুদের অতি পবিত্র তীর্থ। প্রাচীন আমলে ইহা নাথদের দখলে ছিল। ইহা কেজাপূবীন বলিয়া অনুমিত। মহানাদ, চন্দ্রনাথ, কপিল (মুনি) আশ্রম প্রভৃতি নাথধর্ম্মের প্রসিদ্ধ স্থানসমূহ সবই প্রায় বঙ্গের দক্ষিণাংশে অবস্থিত। বঙ্গীয় যোগিজাতি আপনাদিগকে 'আই-পন্থী' 'আদি পন্থী' অর্থাৎ আদিনাথ পন্থী বলিয়া নিজদের পরিচয় দিয়া থাকেন। বঙ্গদেশে আদিনাথ সম্বন্ধীয় অনেক গাথা প্রচলিত ছিল। এখনও কিছু আছে। যথা—

"আদি নাথরে আদি নাথ। আদিনাথে দিলা বর ॥

এই ঘর সুবন্নি (১) ঘর। সুবন্নি ঘরে তুলছে মাটি ॥ এই ঘর হইছে কুমারহাটি। কুমারহাটির কুমার ভাই ॥ তোমার লাগাল কেমনে পাই। গাঙ্গেরই (২) পারে পারে ॥ ডলু ডলু কাঞ্চন। কাঞ্চনে গুয়া খায় ॥ কাঞ্চনে পান খায়। উঠ লাগল চুন ॥ ফাল দিয়া উঠে বরইর ঝুনট। বরই নারে কেরাইয়া। হাত লইমু পোরাইয়া ॥ ও ভাই সদাগর। সোনার টুপী মাথে ধর ॥ সোনার টুপী লোহার খিল। এন (৩) ঘর আছে ধান বিশ (৪)। ধান বিশ না দিতে পারে ॥ চাউল কড়ি দিয়া বিদায় করে ॥"

ইহার মোটামুটী অর্থ আদিনাথের বরে গৃহস্থ শ্রীসম্পন্ন হয়। গৃহস্থ ধান বিশ দিতে যদি অনিচ্ছুক হন তবে আদিনাথের শিষ্য ও ভক্তমণ্ডলীকে কিছু কিছু চাউল ও পয়সা দিয়া বিদায় করুন। হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে কাছাড় ও বর্ত্তমান পূর্ব্ব পাকিস্তানে ঐ জাতীয় গাথা গীত হইত। জনসাধারণ দলে দলে

(১) স্বর্ণরচিত (২) নদীরই (৩) ইহার। (৪) কাছাড়ে দুই সের আধ পোয়া ধান বা চাউল প্রভৃতি ধরে এমন পাত্রকে কাঠি বলে। এই জাতীয় কুড়ি কাঠিতে এক মণ হয় এবং কুড়ি মণে এক বিশ হয়।

ঐ জাতীয় গাথা গাহিয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ভিক্ষা করিত এবং ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যাদি দ্বারা আদিনাথের ভোগ দিয়া প্রসাদ ভক্ষণ করিত। আমরা 'যোগিগুরু মৎস্যেন্দ্র (মীন) নাথ' প্রসঙ্গে দেখাইব যে আদিনাথের শিষ্য মৎস্যেন্দ্র (মীন) নাথ বাঙ্গালী এবং নিঃসন্দেহে মৎস্যেন্দ্র (মীন) নাথের সময়—৫২২ খৃঃ অব্দ। তাহা হইলে নিঃসন্দেহে বলা যায় আদিনাথের সময়ও— ৫২২ খৃঃ অব্দ।

এ সব কারণে আদি নাথকে বাঙ্গালী বলিয়াই মনে হয়।

'হঠযোগ প্রদীপিকায়' যোগমাহাত্ম্য বর্ণন প্রসঙ্গে আদিনাথের পরই মৎস্যেন্দ্রনাথের উল্লেখ রহিয়াছে (চারুবাবুর শূন্য পুরাণের ভূমিকা ৩—৫ পৃঃ ঋষি দত্তাত্রেয়কৃত দত্তাত্রেয়বোধ নামক সংস্কৃত ভাষার যোগশাস্ত্রে আদিনাথের কথা আছে— "আদিনাথেন সঙ্কেতাসসার্দ্ধকোটী প্রকীর্ত্তিতাঃ।" অর্থাৎ দত্তাত্রেয় বহু প্রকার যোগের বিষয় বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন আদিনাথ যোগ সম্বন্ধীয় সার্দ্ধ কোটী সঙ্কেতের উল্লেখ করিয়াছেন। দত্তাত্রেয় আরও বলিতেছেন—

"অহিংসা নিয়মেষ্টেকা মুখ্যা ভবতি সাঙ্কৃতে।
চতুরশীতি সংখ্যয়েষু আসনেষুত্তমং শৃণু ॥
আদিনাথেন সংপ্রোক্তং পদ্মাসনমিহোচ্যতে।"

(দত্তাত্রেয়বোধ)

অর্থাৎ নিয়মের মধ্যে অহিংসাই মুখ্য। আসনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পদ্মাসন আদিনাথই সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন।

দত্তাত্রেয় আদিনাথকে শিব বলিয়াছেন—

"সাঙ্কৃতিরুবাচ—ভগবন্নাদি নাথোহি কোঽয়ং পুরুষ উচ্যতে
দত্তাত্রেয় উবাচ—দেবদেবস্য নামামি আদিনাথোহি কেনচিৎ।"

(দত্তাত্রেয়বোধ)

মহেশখালি দ্বীপের আদিনাথ আজও শিব বলিয়া পূজিত হইতেছেন।

দত্তাত্রেয়কে কেহ কেহ ১০ম শতাব্দীর লোক বলিয়া মনে করেন—(হিন্দু-

gious thought and Life in India By Monior Williams, Page 267)। তাহা হইলে দেখা যায় ঋষি দত্তাত্রেয়ের বহু পূর্ব্বে গুরু আদিনাথ অবিভূর্ত হইয়াছিলেন।*

যোগিগুরু মৎস্যেন্দ্র (মীন) নাথ

সময়— ৫২২ খৃঃ অব্দ হইতে দশম খৃঃ অব্দ

নাম ও জন্মভূমি বিচার

অধ্যক্ষ ডাঃ শহীদুল্লাহ্ বলেন—"মীননাথ বাঙালী। তাঁর নামান্তর মীন-পদ, মৎস্যেন্দ্রনাথ, মচ্ছিন্দ্রনাথ, মৎস্যেন্দ্রপাদ, মচ্ছেন্দ্রপাদ'' (শনিবারের চিঠি—আশ্বিন, ১৩৫১ বাং, ৩১৯ পৃঃ)। পূর্ব্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মিলনীর সভাপতির ভাষণে অধ্যক্ষ সাহেব আরও বলেন—

"পূর্ব্ব বঙ্গের বিশেষ গৌরব এই যে এই প্রদেশের প্রাচীন নাম বাঙাল থেকে দেশের নাম হয়েছে বাঙালা বা বাংলা। পূর্ব্ব বঙ্গের শ্রেষ্ঠ গৌরব এই যে, এই দেশ থেকেই বাঙ্গালা সাহিত্য ও নাথপন্থের উৎপত্তি হয়েছে। মৎস্যেন্দ্রনাথ যেমন বাঙ্গালার আদিম লেখক, তেমনি তিনি নাথপন্থের প্রবর্ত্তক। তাঁর নিবাস ছিল ক্ষীরোদসাগরের তীরে চন্দ্রদ্বীপে, বর্ত্তমানে সম্ভবতঃ যাকে সন্দ্বীপ বলে।" (আনন্দবাজার পত্রিকা—২৩শে পৌষ, '৫৫ বাং, ২৭শ বর্ষ, ২৮৬ সংখ্যা, ৬ পৃঃ)

চন্দ্রদ্বীপ বাখরগঞ্জ জিলার প্রাচীন নাম। চন্দ্রবংশীয় রাজারা চন্দ্রদ্বীপের অধিপতি ছিলেন। ইঁহাদের নামান্তে চন্দ্রপাদান্ত ছিল বলিয়া তদনুসারে স্থানের নামকরণ হইয়াছিল চন্দ্রদ্বীপ (Indian Historical Quarterly, Vol XVI.

---

* এ সব বিবরণ মৎলিখিত যোগেশ্বর আদিনাথ শীর্ষক প্রবন্ধে 'উদ্বোধনে' (চৈত্র—১৩৫৩ বাং) প্রকাশিত হইয়াছিল।

No. 3. pp 635—636, Sept., 1940)। 'কৌলজ্ঞান নির্ণয়ে'ও মৎস্যেন্দ্র নাথকে "চন্দ্রদ্বীপ বিনির্গত" বলিয়া লিখা হইয়াছে। ইহা মৎস্যেন্দ্র পাদাবতারিত এবং চন্দ্রদ্বীপে প্রকাশিত (কৌলজ্ঞান নির্ণয়—২২শ পটল, ১০—১২)। মহা-মহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অনুমান উহা খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর মধ্যভাগের লিখা, আর অধ্যাপক ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচীর মতে ইহা ১০৫০ খৃঃ অব্দের লিখা। এ সম্বন্ধে অধ্যক্ষ ডাঃ শহীদুল্লাহ্ বলেন—"মীননাথের নাম কৌলজ্ঞান নির্ণয় নামে যে পুঁথিখানিতে পাওয়া যায় তাহা মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর মধ্যভাগের লেখা। ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচীর মতে অনুমান ১০৫০ খ্রীষ্টাব্দের। মীননাথ ইহার বহুদিন আগেকার স্বীকার করিতেই হইবে। কেন না তিনি এই পুঁথিখানিতে রক্তমাংসের মানুষ থেকে একেবারে দেবতার কাছাকাছি বা দেবতা হয়ে গেছেন" (শনিবারের চিঠি—আশ্বিন, ১৩৫১ বাং)। নিত্যাহ্নিক তিলকে (লিপিকাল— ১৩৯৫ খৃঃ অব্দ) লিখা আছে মৎস্যেন্দ্রের "বরণা বঙ্গিদেশে" জন্ম। কোর্ডিয়ার সাহেব তাহার প্রকাশিত তন্ত্রের তালিকায় মৎস্যেন্দ্রনাথকে বাঙালী বলিয়াছেন ((ক) পরিশিষ্ট—৪৸৵০ পৃঃ) উইলসন সাহেবের মতে মৎস্যেন্দ্রনাথ বঙ্গের উত্তর বা পূর্ব্ব অংশের লোক। তিনি মৎস্যদেশের সিদ্ধপুরুষ বলিয়া মৎস্যেন্দ্র নামে খ্যাত। বগুড়া জিলার উত্তরাংশ হইতে দিনাজপুর জিলার অধিকাংশ স্থান মৎস্যদেশ নামে পরিচিত ছিল (বগুড়ার ইতিহাস-ভূমিকা, ৫৬ পৃঃ)। আমরা ৭ম অধ্যায়ে দেখাইব যে মৎস্যেন্দ্রনাথ রাজদণ্ডও পরিচালনা করিয়াছিলেন। তাহা হইলে মৎস্যদেশাধি-পতি বলিয়া তিনি মৎস্যেন্দ্র নামে খ্যাত হইয়াছেন বলিয়া অনুমান করিলে তাহাও যুক্তিহীন হইবে না। ডক্টর কল্যাণী মল্লিক বলেন—"বাঙ্গালাদেশের সহিত নাথযোগীদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায় নাথপন্থের অনেক পুঁথি বাংলাভাষাতে রচিত হয়। সুদূর নেপালেও শ্রীমৎস্যেন্দ্রনাথ রচিত বাঙ্গালা পদ পাওয়া গিয়াছে। শ্রীমৎস্যেন্দ্রনাথ বাঙ্গালী ছিলেন। ইহা বাঙ্গালার গৌরবের কথা।" (নাথপন্থ)

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'বাঙ্গালার প্রাচীন গৌরব প্রবন্ধে বলেন —"নাথেরা যে বাঙ্গালা দেশের বা পূর্ব্ব ভারতের লোক তাহার স্পষ্ট প্রমাণ মীননাথের একটি পদে পাইয়াছি সেটি খাঁটি বাঙ্গালা। গোরক্ষনাথের লীলা-ক্ষেত্র বাঙ্গালাতেই অধিক। * * * মৎস্যেন্দ্রনাথের গ্রন্থে বৌদ্ধধর্ম্মের নামগন্ধ না থাকিলেও তিনিই এখন নেপালী বৌদ্ধদের প্রধান দেবতা। * * * তাঁহার রথযাত্রায় নেপালে যেরূপ ধূমধাম হইয়া থাকে, এমন আর কোনও দেবতার কোনও যাত্রায় হয় না। * * * নেপালীরা মৎস্যেন্দ্রনাথকে অবলোকিতেশ্বরের অবতার বলিয়া পূজা করে। * * * তিনি নাথপন্থীদের একজন গুরু ছিলেন, অথচ নেপালী বৌদ্ধদের উপাস্য দেবতা হইয়াছেন" (প্রবাসী—বৈশাখ, ১৩২২ বাং, ১৬৬ পৃঃ)। সাহিত্যাচার্য্য দীনেশচন্দ্র সেন বলেন—"মীননাথের বাড়ী সম্ভবতঃ বাখরগঞ্জে ছিল" (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য)। অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যা-ভূষণ বলেন—"* * * মৎস্যেন্দ্রনাথ একেবারে বাঙ্গালার লোক। * * * মৎস্যেন্দ্রনাথ বরিশালের চেদোঁর লোক" (প্রবাসী—ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩২৮ বাং)। অধ্যাপক ডাঃ সুকুমার সেন বলেন—"নাথপন্থের প্রসার হয়েছিল যে বাঙ্গালা দেশ থেকেই তার বলবৎ প্রমাণ আছে। * * * বাঙ্গালার বাহিরে মীননাথ মৎস্যেন্দ্রনাথ নামেই পরিচিত। নাম দুইটি সমার্থক। মৎস্যেন্দ্র পরিণত হয়েছে মছীন্দরে। বাঙ্গালায় এই বিকৃত নূতন নামের পরিণতি হয়েছে "মছন্দলি" "মোচরা" এই দুই পীরের নামে। নেপাল এবং অন্যত্র মীননাথ মাছম্ন নামেও প্রসিদ্ধিলাভ করেছেন।" (নাথপন্থের দিশা—কল্যাণশ্রী, শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৫৫ বাং)

"মৎস্যেন্দ্রনাথ আর্য্যাবলোকিতেশ্বর পদ্মপাণিবোধিসত্ত্ব। একদা শিব সমুদ্র-বেলায় পার্ব্বতীকে যোগোপদেশ দিতেছিলেন। আর্য্যাবলোকিতেশ্বর মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া সেই উপদেশ শ্রবণ করিতেছিলেন, এবং তখন হইতেই তিনি মৎস্যেন্দ্রনাথ নামে পরিজ্ঞাত হন। পরে উচ্চারণভেদে মাচ্ছিন্দ্রনাথ, মছন্দর নাথ, মীননাথ, ইত্যাদি নামকরণ হইয়াছে।" (মানসী ও মর্ম্মবাণী—পৌষ, ১৩২৯ বাং)

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-প্রকাশিত গোরক্ষবিজয়ে আছে—

"তুদ্ধি কেনেত্তর গোসাঞি আজি কেনে মরি।
হেন তত্ত্ব কহ দেব জোগে জোগে তরি॥
দেবীর বচন শুনি কহে মহেশ্বর।
সত্বরে চলহে গৌরী ক্ষীরোদ সাগর॥
সেই সাগরেতে আছে টঙ্গি মনোহর।
এ বলিয়া দুই জনে চলিলা সত্বর॥
মৎস্যরূপ ধরি তথা মীন মোচন্দর।
টঙ্গির লামাতে রহে যোগালি সুন্দর॥"

(গোরক্ষবিজয়)

একদিন গৌরীর বাসনা হইল শিবমুখে মহাজ্ঞান শুনিবেন। প্রথমে শিব মহাজ্ঞান শুনাইতে সম্মত হন নাই। পরে ভার্য্যার নিবন্ধে তাঁহাকে মহাজ্ঞান শুনাইতেই হইল। ক্ষীরোদ সাগরের টঙ্গীতে তৃতীয় ব্যক্তির অবস্থান অসম্ভব। তাই সেখানে যাওয়াই স্থির হইল। হরগৌরী সেখানে গেলেন। মহাজ্ঞান প্রকাশিত হইয়া পড়িলে জনসাধারণ অজর অমর হইয়া সৃষ্টি পত্তন ব্যর্থ করিয়া দিবে। বিশেষতঃ গৌরী স্ত্রীলোক। তিনি কথা প্রকাশ করিয়া দিতে পারেন। আদিদেব এ সব ভাবিয়া মন্ত্রীর পরামর্শে গৌরীর উপর নিদ্রার আবেশ দিবেন স্থির হইল। ফলে মহাজ্ঞান বলা আরম্ভ হইতে না হইতেই গৌরী ঘুমাইয়া পড়িলেন। এদিকে মহাদেব মহাজ্ঞান বলিতে লাগিলেন—

"উড়্যা যায় পরমহংস নাহি যায় দূর
উড়িয়া ঘুরিয়া যান নিরঞ্জন-পুর।
এড়িলে সে রহে গৌরী উজানে সে বহে
মনপবন তারা পরিচয় নহে।

(নাথপন্থের দিশা— কল্যাণশ্রী, শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৫৫ বাং)

অপরদিকে মীননাথ মহাজ্ঞান শুনিবার জন্য মাছের রূপ ধরিয়া (অন্য মতে মাছের পেটে ঢুকিয়া) টঙ্গীর নীচে জলে ডুবিয়া রহিয়াছিলেন এবং গৌরীর পক্ষে 'হুঁ হুঁ' বলিয়া সায় দিতেছিলেন। কারণ শিব যদি বুঝিতে পারেন গৌরী ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, তবে মহাজ্ঞান বলা বন্ধ করিয়া দিবেন। মহাজ্ঞান বলা শেষ হইতেই দেবীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন কিছুই বলিলেন না তো—

"চৈতন্য পাইয়া দেবী বলিলা বচন
কিছু না শুনিনু আমি নিদ্রার কারণ।"

(গোরক্ষবিজয়)

তখন মহাদেব-

"দেবীর বচন শুনি চিন্তিলেক মনে
কহিতে বচন মুই হুঙ্কারিল কোণে।
বিমর্ষিয়া দেখে হর ভাবি মহাজ্ঞান,
টঙ্গীর লামাতে দেখে মীন পরিমাণ।
চিন্তিয়া জানিল এই শুনিল বচন,
শাপ দিলা এককালে হৌক বিস্মরণ।"

(গোরক্ষবিজয়)

মহাদেবের এই শাপ সফল হইয়াছিল। ফলে মীননাথ কদলী নারীপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া মহাজ্ঞান হারাইয়াছিলেন (৭ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

তাহা হইলে নিঃসন্দেহে বলা যায় এ-কারণেই তাঁহার নাম মীননাথ বা মৎস্যেন্দ্রনাথ হইয়াছে (১)। মচ্ছন্দ্রনাথ, মছন্দরনাথ ও মকীন্দ্রনাথ এই তিনটিও তাঁহার নামান্তর বলিয়া শুনা যায়।

---

(১) গণ্ডযোগে জাত ব্রাহ্মণকুমারকে পিতামাতার মঙ্গলের জন্য সমুদ্রে বিসর্জ্জন করা হয়; রাঘব মৎস্য সেই শিশুকে উদরসাৎ করে। পরে ক্ষীরোদ

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ত্রিপুরা শাখার ৪ম বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতির ভাষণে একটি ছড়ার উল্লেখ করিয়া মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন, ইহা যদি সত্য হয় তবে মীননাথও ময়নামতীর লোক। মীননাথ যে চন্দ্রদ্বীপের লোক সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকা উচিত নহে। তবে তাঁহার প্রধান কর্ম্মকেন্দ্র ময়নামতীতে ছিল। ইহা নাথসিদ্ধাদের প্রিয় ছিল। এখানে সিদ্ধা জালন্দর নাথ বা হাড়িপা নাথ রাজা গোপীচাঁদকে দীক্ষা দান করিয়াছিলেন।

ভারতের বাহিরে মৎস্যেন্দ্রনাথ—লোকেশ্বর, লোকনাথ, মৎস্যেন্দ্রনাথ, (Inscription from Nepal in Indian Antiquary, Vol. IX), এবং কান-সাইন (J. R. A. S. Vol. XV, page 333 of 1883) নামে পরিচিত এবং বিশেষভাবে পূজিত হইতেছেন। হডসন সাহেব বলেন নেপালীরা মৎস্যেন্দ্র-নাথ ও আর্য্যাবলোকিতেশ্বর পদ্মপাণি বোধিসত্ত্বকে অভিন্ন বলিয়া বিশ্বাস করে। [Hadgson's Essays (Trubner's reprint) Vol. II, page 40]

সাগরের টঙ্গীতে রাঘবের উদর হইতে উদ্ধার করিয়া হরপার্ব্বতী সেই শিশুকে যোগধর্ম্ম শিক্ষা দেন। পরিণত বয়সে সেই বালকই মৎস্যেন্দ্রনাথ নামে ভুবন বিজয়ী সিদ্ধা বলিয়া পরিচিত হন।

"অহং মৎস্যোদরে ক্ষিপ্তঃ সমুদ্রে ক্ষীর সম্ভবে।
মাত্রাতু পিতৃবাক্যেন নায়ং মম কুলান্বিতঃ ॥
কুলক্ষয়ভয়াত্তেন জাতং স্বকুল নাশনম্।
গণ্ডান্তযোগ জানিতো বালো ন গৃহকর্ম্মকৃৎ ॥
ইতি মাত্রা দুঃখীতয়া নিরস্তঃ শৃম্নুবংশজঃ।
ঋষেনাপি গৃহীতোঽস্মি কালো মেঽত্র মহানভূৎ ॥"

[স্কন্দ পুরাণ—নাগরকাণ্ড, ২৬৩ অধ্যায় (৪৩—৬২) মৎস্যেন্দ্রনাথোৎপত্তি কথন]
(শ্রীরাজমোহন নাথ, বি. ই. মহাশয়ের 'কদলীরাজ্যে' ধৃত)

"ভারতীয় মতে মৎস্যেন্দ্র মৎস্যোদর হইতে উদ্ধারপ্রাপ্ত। * * * * * মৎস্যাবতার বন্দনা নামে মূলে প্রাচীন বাঙ্গালায় রচিত একটি স্তোত্র মহারাষ্ট্রে পাওয়া গিয়াছে।" (নাথপন্থ— ১১পৃঃ)

অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ বলেন—"মৎস্যেন্দ্রনাথ আদিনাথের শিষ্য ছিলেন। * * * কচ্ছ প্রদেশের অন্তর্গত ধিনোধরের নাথপন্থীদের নিকট মচ্ছেন্দ্রনাথের গুরু পরম্পরা পাওয়া যায়। তদনুসারে—

প্রথম গুরু......................নিরঞ্জন নিরাকার
দ্বিতীয় ,, ...অধিকসোম নাথ
তৃতীয় ,, ...চেৎসোম নাথ
চতুর্থ ,, ...ওঁকার নাথ
পঞ্চম ,, ...অচেৎ নাথ
ষষ্ঠ ,, ...আদি নাথ
সপ্তম ,, ...মচ্ছেন্দ্র নাথ

এই মচ্ছেন্দ্র সমস্ত পৃথিবী ঘুরিয়া বহু তীর্থে বাস করিয়া অনেক শিষ্য করেন" (প্রবাসী— ফাল্গুন-চৈত্র, নাথপন্থ, ১৩২৮ বাং)। মহারাষ্ট্রদেশে বোম্বাই রাজ্যে অধুনা নাথধর্ম্মের তিনটি শাখার বিবরণ পাওয়া যায়। যথা—(১) মৎস্যেন্দ্রনাথ শাখা, (২) জালন্দর নাথ শাখা এবং (৩) বারকরী নাথ সম্প্রদায় বা বারকরী সম্প্রদায়ী শাখা।

(Light on the path of Self Realization)

আসাম পূর্ত্তবিভাগের ইঞ্জিনিয়ার প্রত্নতাত্ত্বিক শ্রীরাজমোহন নাথ, বি-ই বলেন—"সন্ধ্যা ভাষায় মৎস্যেন্দ্র শব্দের অর্থ ঈড়া পিঙ্গলা (গঙ্গা-যমুনা) নাড়ীর মধ্যে শ্বাস প্রশ্বাসরূপে সতত সঞ্চারমান প্রাণবায়ু; এবং যিনি যোগবলে এই প্রাণবায়ুকে সংরুদ্ধ করিতে পারিয়াছেন তিনিই মৎস্যবধকারী বা মৎস্যজয়ী বীর বা মৎস্যেন্দ্রনাথ। যথা;—

"গঙ্গা যমুনায়োর্মধ্যে মৎস্যদ্বৌচরতঃ সদা।
তৌ মৎস্যৌভক্ষয়েৎ যস্তু স ভবেন্মৎস্য সাধকঃ॥"

(প্রবাসী—আষাঢ়, ১৩৫৭ বাং, মৎস্যেন্দ্রনাথের জন্মরহস্য

মৎস্যেন্দ্র (মীন) নাথের সময়বিচার

এখন মৎস্যেন্দ্রনাথের সময় বিচার করা যাউক। শ্রীগুণানন্দ ও শিবশঙ্কর সিংহ প্রণীত এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত 'নেপালের ইতিহাসে' আছে মৎস্যেন্দ্রনাথ কলিযুগ ৩৬২৩ বৎসর গত হইলে অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ৫২২ অব্দে নেপাল গিয়াছিলেন। নেপালের 'করণ্ড ব্যূহ' ধর্মগ্রন্থে মৎস্যেন্দ্রনাথের জীবনী আলোচিত ও ঐ মত সমর্থিত হইয়াছে। রাইট সাহেব তাঁহার নেপালের ইতিহাসের ১৪০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন নেপালে প্রবাদ যে, গোরক্ষনাথ জলের সমস্ত উৎপত্তিস্থান বন্ধ করিয়া দিয়া নেপালে বার বৎসর অনাবৃষ্টির সৃষ্টি করিয়াছিলেন। হিন্দু ও বৌদ্ধ প্রমাণ একই রকমের (Sylvain Levi, Le Nepal, i, pp 341, 348)। হডসন সাহেব বলেন, নেপালের দ্বাদশবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য নেপালরাজ কর্তৃক বিশেষভাবে আহূত হইয়া মৎস্যেন্দ্রনাথ বা আর্য্যাবলোকিতেশ্বর আন্দাজ ৫ম খৃঃ অব্দে নেপালে গিয়াছিলেন (R. A. S. J. Series VII, part 1, Page 137)। চীন পর্য্যটক হুয়েন সাঙ তাঁহার প্রসিদ্ধ সিয়ুকী গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে কপিলের শিষ্য অর্থাৎ সাংখ্য মতাবলম্বী ভববিবেক মৎস্যেন্দ্রনাথ বা অবলোকিতেশ্বরের সহিত দেখা করেন। ভববিবেক ৫৫০ খৃঃ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। বিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত Sylvain Levi তাঁহার Le Nepal গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে নেপালরাজ নরেন্দ্র দেব কর্ত্তৃক বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হইয়া মৎস্যেন্দ্রনাথ ৬৫৭ খৃঃ অব্দে নেপাল গিয়াছিলেন। এই মত অন্য দিক দিয়াও সমর্থিত হয়। মৎস্যেন্দ্রনাথের শিষ্য গোরক্ষনাথ এবং গোরক্ষনাথের শিষ্য পদ্মবজ্র সরোরুহ বা পদ্মসম্ভব। উড্ডানের রাজা ইন্দ্রভূতি এই পদ্মসম্ভবের পালকপিতা ও শিষ্য ছিলেন। জার্ম্মান পণ্ডিত শ্লাগিণ্টভাইট (Schlagintweit) স্থির করিয়াছেন যে এই পদ্মসম্ভব ৭২১।৭২২ খৃঃ অব্দে জন্মিয়াছিলেন (মীননাথ ও কাহ্নপা— শনিবারের চিঠি, আশ্বিন— ১৩৫১ বাং, ৩৮৫ পৃঃ)। "Padmasambhaba, a Buddhist of

Kabul who, invited by King Khrisreng debtsan introduced in Tibet (740—778) a system of magic and mysticism saturated with Sivaism which found its way also to China." (Eitel's hand book of Chinese Buddhism, Page 111) অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ৭৪০ হইতে ৭৭৮ অব্দে কাবুলের অধিবাসী বৌদ্ধ পদ্মসম্ভব তিব্বতের রাজা কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া তিব্বতে শৈবধর্ম্ম সংমিশ্রিত যোগধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। নেপাল ও পাঞ্জাবে আজও পদ্মসম্ভবের তীর্থস্থান দৃষ্ট হয় (J. R. A. S. Vol. IXX, Page 39 Antiquities of Indian Tibet By Franche, Appendix C) অভিনব গুপ্ত তাঁহার তন্ত্রালোকে "মচ্ছন্দ্রবিভু" বলিয়া মৎস্যেন্দ্রনাথের উল্লেখ করিয়াছেন। অভিনব গুপ্তের সময় অনুমান ১০০০ খৃঃ অব্দ। 'কৌলজ্ঞান', "তন্ত্রালোক' ও জ্ঞানেশ্বরীর সমন্বয় সাধন করিয়া ডক্টর কল্যাণী মল্লিক মহাশয়া মৎস্যেন্দ্রনাথের সময় ১০ম শতাব্দী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাহা হইলে মৎস্যেন্দ্রনাথের সময় দাঁড়ায় ৫২২ খৃঃ অব্দ হইতে ১০ম খৃঃ অব্দ। (১)

মৎস্যেন্দ্র (মীন) নাথের ধর্ম্মমত

ধর্ম্মনায়ক সিদ্ধা মৎস্যেন্দ্রনাথ ও সিদ্ধাচার্য্য লুইপাদ বা মস্যান্ত্রাদ বিভিন্ন ব্যক্তি

কেহ কেহ নাথপন্থার সিদ্ধা মৎস্যেন্দ্র বা মীন নাথ এবং সহজপন্থী সিদ্ধাচার্য্য লুইপাদ বা মস্যান্ত্রাদকে একই ব্যক্তি বলিয়া অনুমান করেন। এই অনুমানের পক্ষে যে কোন যুক্তি প্রমাণ নাই তাহাই আমরা নিঃসন্দেহে প্রদর্শন করিব।

অধ্যাপক ডাঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী তাঁহার গোপীচাঁদের সন্ন্যাসের সম্পাদকীয় মন্তব্যে (৬৩ পৃষ্ঠায়) এবং অধ্যাপক ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী

(১) এ সব বিবরণ আমার লিখিত যোগেশ্বর শ্রীশ্রীমীননাথ শীর্ষক প্রবন্ধে 'উদ্বোধনে' (আষাঢ়, ১৩৫৩ বাং, ৩১০— ১১৩ পৃঃ) প্রকাশিত হইয়াছিল।

তাঁহার 'কৌলজ্ঞান নির্ণয়ে' ইহার স্বপক্ষ ও বিপক্ষে অনেক যুক্তি প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু ইহারা কেহই ধর্ম্মনায়ক মৎস্যেন্দ্র নাথ ও লুইপাদ বা মস্যান্ত্রাদ এই দুই জনের ধর্ম্মমত ও সময় সম্বন্ধে তেমন কোন বিচারই করেন নাই। প্রত্নতাত্ত্বিক শ্রীরাজমোহন নাথ, বি-ই মহাশয় তাঁহার 'কদলী রাজ্যে' (১৪-১৮ পৃঃ) ইহাদের ধর্ম্মমত সম্বন্ধে বিচার করিয়া দেখাইয়াছেন যে মৎস্যেন্দ্র নাথ ও লুইপাদের ধর্ম্মমতের মধ্যে কিছু মাত্র মিল নাই। সুতরাং ইহারা বিভিন্ন ব্যক্তি নিশ্চিত। নিম্নে রাজমোহনবাবুর প্রবন্ধের কতক অংশ উদ্ধৃত করা হইল—

"মৎস্যেন্দ্রনাথ ছিলেন হঠযোগের প্রবর্ত্তক। হঠযোগে তাঁহার প্রবর্ত্তিত কয়েকটি কষ্টসাধ্য আসনও আছে। গোরক্ষনাথও কায়াসাধনের প্রধান নেতা। যোগের কঠোর নিয়মের দ্বারা দেহকে সংযত ও চিত্তবৃত্তিকে নিরোধ করিয়া সাধন করাই ছিল মৎস্যেন্দ্রনাথের পন্থা। গোরক্ষসংহিতায় গোরক্ষনাথের উপদেশ "আসনং প্রাণ সংরোধঃ প্রত্যাহারশ্চ ধারণা" এবং "যোগশাস্ত্রঞ্চ পরমং যোগিনং সিদ্ধিদায়কম্" (গোরক্ষসংহিতা—৫, ২০৩)। কিন্তু লুইপাদ এই কষ্টসাধ্য সাধন পদ্ধতির সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন ;—

"সঅল সমাহিঅ কাহি করিঅই
সুখ দুখেতে নিচিত মরি আই।"

(বৌদ্ধ গান ও দোহা)

তিনি মহাসুখ লক্ষ্য করিয়া গুরুর নিকট হইতে সহজানন্দ মহাসুখ লাভ করিবার উপায় জানিয়া লইবার জন্য বলেন—

"দিট করিঅ মহাসুহ পরিমাণ।
লুই ভনই গুরু পুচ্ছিঅ জানে॥"

(বৌদ্ধ গান ও দোহা)

হঠযোগীর নিকট মূলবন্ধ, জালন্ধরবন্ধ ও উড্ডিয়ানবন্ধ সাধনার কয়েকটি শ্রেষ্ঠ পন্থা—

"মহাবন্ধং সমাসাদ্য উড্ডীনকুম্ভকং চরেৎ।
মহাবেধ সমাখ্যাতো যোগিনাং সিদ্ধিদায়কঃ ॥"

(গোরক্ষসংহিতা—৭০)

কিন্তু লুইপাদ বলেন—

"এড়ি এউ ছান্দক বান্ধ করণ ক পাটের আশ।
সুনু পাখ ভীতি লাহুরে পাশ ॥"

(বৌদ্ধ গান ও দোহা)

অর্থাৎ মূলবন্ধ, জালন্দরবন্ধ, আদি হঠযোগের বিরাট সাধন ত্যাগ করিয়া শুধু নৈরাত্ম ধর্ম্মপাশ আশ্রয় কর।

লুইপাদের এই ভাবই পরবর্ত্তীকালে কৌলতান্ত্রিকদের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছে।

"এক ভক্তোপবাসাদ্যৈর্নিয়মৈঃ কায়শোষণৈঃ।
মূঢ়া পরোক্ষমিচ্ছন্তি তব মায়াবিমোহিতাঃ ॥
দেহদণ্ড ন মাত্রেণ কা সিদ্ধিরবিবেকিনাম।
বল্মীক তাড়নাদ্দেবি মৃতঃ কেহত্র মহোরগঃ ॥"

(কুলার্ণব)

লুইপাদের সাধনার পদ্ধতি "ধমন চমন বেণি পাণ্ডি বইন" অর্থাৎ ভ্রুযুগলের মধ্যে আজ্ঞাচক্রে ইড়া ও পিঙ্গলার সঙ্গমস্থলে স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ বীজবেষ্টিত (অ হইতে ল বীজ "অলি," ইড়া বা চন্দ্রনাড়ী বেষ্টিত; এবং ক হইতে ল বীজ "কালি," পিঙ্গলা বা সূর্য্যনাড়ি বেষ্টিত) ত্রিকোণাকার মণ্ডলমধ্যে (১) পদ্মাসনে সমাসীন নিজ গুরুর মূর্ত্তির ধ্যান করা। এইভাবে গুরু ধ্যান পরবর্ত্তী কালে ঘের সংহিতায় (২) (ধ্যায়েত্তত্র গুরু দেবং দ্বিভুজঞ্চ ত্রিলোচনম্") এবং

(১) ইহাকে অকথাদি মণ্ডল, হলক্ষ মণ্ডল, ত্রিবেণীর ঘটনা বলা হয়।

(২) কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন সম্পাদিত ঘেরণ্ড সংহিতা—৬ষ্ঠ উপদেশ, ১৩-১৪।

'বিশ্বসার তন্ত্রে' দেখিতে পাই। আরও পরবর্ত্তীকালে কঙ্কালমালিনী তন্ত্রে ঐ স্থানে গুরুর বাম উরুতে উপবিষ্টা গুরুপত্নীকে ধ্যানেরও উল্লেখ আছে।

নাথ সম্প্রদায়ের ধ্যান এরূপ নহে। তাঁহারা আজ্ঞা চক্রে নাদ বিন্দুর ধ্যান করেন, জ্যোতির্ম্ময় বিন্দুর ধ্যান করিয়া কর্ণে নাদ শ্রবণ করাই তাঁহাদের প্রথম লক্ষ্য। গোরক্ষনাথ "মূঢ়গণেরও সম্মত নাদোপাসনা" প্রচলিত করিয়াছিলেন বলিয়া রাজা হইতে পথের ভিখারী সকলেরই পূজ্য হইয়াছিলেন। লুইপাদের লক্ষ্য মহাসুখ; মৎস্যেন্দ্রনাথের লক্ষ্য মনের সহিত নাদের বিলয়সাধন করিয়া পরব্রহ্ম পরমাত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করা। (১)

সুতরাং দেখা যাইতেছে লুইপাদ ও মৎস্যেন্দ্র নাথের ধর্ম্মমতের বা সাধন-পদ্ধতির মধ্যে সামঞ্জস্য নাই; গোরক্ষসংহিতার ধর্ম্মমতের সহিত কৌলজ্ঞান নির্ণয়ের ধর্ম্মমতের মিল নাই। (কদলী রাজ্য— ১২ হইতে ১৮ পৃঃ)

কর্ডিয়ারের তেঙ্গুর ক্যাটালগে লুই সিদ্ধাচার্য্যের বিবরণ পাওয়া যায়। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ইহার অনুবাদ করিয়াছেন—"বাঙ্গালাদেশের অথবা লুই মহাযোগীশ্বর অপর মৎস্যান্ত্রাদ মীননাথের পুত্র মৎস্যেন্দ্রনাথ হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি।" (বৌদ্ধ গান ও দোহা, পরিশিষ্ট ৪।।৶৹ পৃঃ)। এ সম্বন্ধে অধ্যাপক ডাঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী বলেন— "এই অনুদিত বাক্যটীর অর্থসঙ্গতি নাই, ছাপার ভুল আছে বলিয়া সন্দেহ করিতেছি। * * * এই বাক্যটির মোটামুটী অর্থ বোধ হয় এই যে, লুই মহাযোগীশ্বর তাঁহার অপর নাম মৎস্যান্ত্রাদ এবং তিনি মীননাথ বা মৎস্যেন্দ্রনাথ হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি। * * * * চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ের টীকার ব্যাখ্যার সমর্থনে বহু গ্রন্থ হইতে বহু পণ্ডিতের বাক্য উদ্ধৃত করা হইয়াছে। তাহার মধ্যে বহি-শাস্ত্রকারের বা পরদর্শনের উক্তি বলিয়া বাক্য উদ্ধৃত আছে। সাধারণ বুদ্ধিতে এই বুঝা যায় যে এগুলি

(১) ব্রজেন্দ্রকুমার বিদ্যারত্ন সম্পাদিত হঠপ্রদীপিকা— ৪র্থ উপদেশ, ১০০-১০২।

সহজ পন্থের শাস্ত্র নহে।। চর্য্যাচর্য্যের ৩৭ পৃষ্ঠায় "তথাচ পরদর্শনে। মীন নাথঃ"—বলিয়া মীননাথের একটি চারি ছত্রের কবিতা বা দোহা উদ্ধৃত আছে। এই উল্লেখ হইতে দুইটি সিদ্ধান্ত প্রতিপাদিত হয়। ১ম মীননাথ সহজপন্থী ছিলেন না, কাজেই তিনি লুইর সহিত অভিন্ন হইতে পারেন না। ২য় টীকার আদিতে লুইর নাম করিয়া এবং তাঁহাকে আদি সিদ্ধাচার্য্য বলিয়া পরিচিত করিয়া পরে আবার পরদার্শনিক মীননাথের নাম করায় উভয়ের বিভিন্নত্বই সূচিত হইতেছে।" (গোপীচাঁদের সন্ন্যাস—সম্পাদকীয় মন্তব্য, ৬৪, ৬৫ পৃঃ)

তিব্বতীয় গ্রন্থ 'গ্রাব ও টবে' (Grúb O Tub) লিখা আছে যে লুইপাদ কামরূপের ধীবরের পুত্র ছিলেন এবং লুইপাদের অপর নাম মৎস্যান্ত্রাদ পাদ। আর আমরা পূর্ব্বেই নিঃসন্দেহে দেখাইয়াছি যে নাথপন্থার ধর্ম্মনায়ক মৎস্যেন্দ্র (মীন) নাথের নিবাস ছিল চন্দ্রদ্বীপে (বাখরগঞ্জে)।

মৎস্যেন্দ্রনাথের সময় আমরা নিঃসন্দেহে দেখাইয়াছি ৫২২ খৃঃ অব্দ। আর লুইর সময় সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় বলেন—"লুইর সময় ঠিক করিতে হইলে একথা বলিলেই যথেষ্ট হয় যে,তাঁহার একখানি গ্রন্থে দীপাঙ্কর শ্রীজ্ঞান সাহায্য করিয়াছিলেন। দীপাঙ্কর শ্রীজ্ঞান ১০৩৮ সালে বিক্রমশীল বিহার হইতে ৫৮ বৎসর বয়সে তিব্বত যাত্রা করিয়াছিলেন।" রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর, সি-আই-ই, দীপাঙ্কর শ্রীজ্ঞানের জীবন-কাহিনী তিব্বতীয় ভাষা হইতে সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহা হইতে তাঁহার কর্ম্মজীবনের সন তারিখাদি পাওয়া যায়। তাহা হইতে জানা যায় যে ৯৮০ খৃঃ অব্দে বাঙ্গালা দেশে তাঁহার জন্ম হয় এবং ১০৫১ খৃঃ অব্দে তিব্বতে তিনি দেহ রক্ষা করেন। তখন তাঁহার বয়স ৭২ বৎসর ছিল। সে সময় তাঁহার নামকরণ হয় অতীশ (Indian Pondits in the land of snow)। তাহা হইলে লুইর সময় দাঁড়ায় দশম খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর শেষ ভাগ বা ১১শ খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগ। যোগসিদ্ধ মহাপুরুষগণ কয়েক শত বৎসর জীবিত থাকিতে পারেন। কিন্তু লুই কয়েক শত বৎসর জীবিত ছিলেন

এমন কোনও নির্ভরযোগ্য যুক্তি প্রমাণ প্রদর্শন করার কোনও চেষ্টা কেহ করেন নাই। অধ্যাপক ডাঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী লুইর সময় ৯৬০ খৃঃ অব্দ হইতে ১০৩৫ খৃঃ অব্দ হইতে পারে বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

(গোপীচাঁদের সন্ন্যাস— সম্পাদকীয় মন্তব্য, ৬১ পৃঃ)

তাহা হইলে নাথপন্থার ধর্ম্মনায়ক মৎস্যেন্দ্রনাথ এবং সহজপন্থার ধর্ম্মনায়ক লুইপাদ বা মৎস্যান্ত্রাদ-এর সময়ের, ধর্ম্মমতের ও জন্মস্থানের মধ্যে আদৌ মিল নাই। তাহা হইলে সিদ্ধান্ত অনিবার্য্য যে, ইঁহারা বিভিন্ন ব্যক্তি নিশ্চিত।

ধর্ম্মজগতে মৎস্যেন্দ্রনাথের স্থান অতি উচ্চে ছিল। বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রন্থ "সদ্ধর্ম্ম পুণ্ডরীকের" চতুর্বিংশতি অধ্যায়ে আছে—

"বুদ্ধ অবলোকিতেশ্বরের গুণগাথা বলিতেছেন। মহাসত্ব অবলোকিতেশ্বরকে ভক্তিভরে যাহারা ডাকিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে সর্ব্ব বিপদ হইতে তিনি উদ্ধার করেন এবং সর্ব্ব পুরুষার্থ তাঁহাদিগকে দান করেন। তিনি সর্ব্ব জীবের পরিত্রাণের নিমিত্ত বিভিন্ন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বিভিন্ন ভক্তকে দেখা দেন। এই নিমিত্ত তিনি কখনও বুদ্ধ কখনও ব্রহ্মা কখনও বিষ্ণু ও কখনও শিবের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন।" ('ভারতসভ্যতায় নাথধর্ম্মের দান'— শ্রীভোলানাথ নাথ, এম-এ, পুরাতত্ত্ব-বিশারদ)

"সদ্ধর্ম্ম পুণ্ডরীকের পরবর্ত্তী বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থ "কারণ্ডব্যূহে" বুদ্ধ বলিতেছেন—

"বিপশ্বিন বুদ্ধের সময় তিনি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাঁহার চক্ষু হইতে চন্দ্র, সূর্য্য, তাঁহার ললাট হইতে মহেশ্বর, তাঁহার স্কন্ধ হইতে ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবতা, হৃদয় হইতে নারায়ণ, দন্ত হইতে সরস্বতী, মুখ হইতে বায়ু, পদ হইতে পৃথিবী, উদর হইতে বরুণ জন্ম গ্রহণ করেন। পরে তিনি মহেশ্বরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন— "তুমি কলি যুগের মহেশ্বর হইবে, এবং তুমিই আদিদেব নামে কথিত হইবে।" যে ব্যক্তি যে ধর্ম্ম পালন করে তিনি তাহাকে সেই ধর্ম্মই শিক্ষা দেন। তিনি বুদ্ধ ও প্রত্যেক বুদ্ধ হইয়া বৌদ্ধদিগকে এবং শিব হইয়া

হিন্দুদিগকে শিক্ষাদান করেন। বিশ্বভু বুদ্ধের সময় তিনি যুদ্ধমান দেবাসুরের রাজ্যে গমন করেন এবং তাহাদিগকে প্রবোধ দিয়া ধর্ম্মপথে আনয়ন করেন। তাহার পর ব্রাহ্মণ বেশে তিনি সুরলোকে গমন পূর্ব্বক অলৌকিক যোগশক্তির পরিচয় দেন, এবং প্রকাশ করেন যে তিনি দেব নন মানব মাত্র। অধম ও পতিতদিগের পরিত্রাণের জন্য তিনি বোধিসত্ত্ব হইয়াছেন। তিনি সিংহলে গমন করিয়া রাক্ষসদিগকে চতুরাগম শিক্ষা দেন। সিংহল হইতে তিনি কাশী আগমন করেন। কাশী হইতে দ্বাদশ বর্ষের অনাবৃষ্টি নিবারণের জন্য তিনি মগধে আসেন এবং যোগবলে আকাশকে বৃষ্টি দান করিতে বাধ্য করেন। তিনি ৭০ প্রকার সমাধি লাভ করিয়া ছিলেন। তাঁহার উপাসনার মন্ত্র "ওঁ মণিপদ্মেহুম্"। অতঃপর অবলোকিতেশ্বর বুদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তথায় শিব উমার সহিত আগমণ করেন এবং কোন ভবিষ্যত বাণীর জন্য অবলোকিতেশ্বরকে অনুরোধ করেন। অবলোকিতেশ্বর ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে ভবিষ্যতে তিনি বুদ্ধ ভস্মেশ্বর হইবেন এবং উমা পুরুষ রূপে বুদ্ধ উমেশ্বর হইবেন। কারণ্ডব্যূহে অবলোকিতেশ্বরের এক নাম মহেশ্বর।" (ভারতসভ্যতায় নাথধর্ম্মের দান— শ্রীভোলানাথ নাথ, পুরাতত্ত্ব-বিশারদ)*

---

* সদ্ধর্ম্ম পুণ্ডরীক ও কারণ্ডব্যূহ বৌদ্ধধর্ম্ম শাস্ত্রের বিবরণ পাঠ করিলে বলিতে হয় অবলোকিতেশ্বর বা মৎসেন্দ্রনাথ বুদ্ধদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী বা সমসাময়িক ছিলেন। বুদ্ধের আনুমানিক সময়— ৫৬৩ খৃঃ পূর্ব্ব হইতে ৪৮৩ খৃঃ পূর্ব্ব। এ সম্বন্ধে অধ্যক্ষ ডাঃ শহীদুল্লাহর সঙ্গে আমার পত্রালাপ হইয়াছিল। তিনি ১৪।৬।৪৫ ইং তারিখে আমাকে লিখিয়াছিলেন— "আপনার পুস্তকের পাণ্ডুলিপি পড়িলাম। মীননাথের সময় সম্বন্ধে আমি Sylvain Levi-র যে সময় নির্দ্দেশ উল্লেখ করিয়াছি তাহাই সঙ্গত। আপনি যে কারণ্ডব্যূহ ও সদ্ধর্ম্ম পুণ্ডরীকের প্রমাণ দিয়াছেন তাহা বিচারসহ নহে। পুস্তক দুইখানি খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের পরবর্ত্তী।" আমাদের মনে হয় তিনি ঐতিহাসিক মীননাথ নহেন। ইনি অপ্রাকৃত বা অলৌকিক। ৫২২ খৃঃ অব্দের মীননাথই ঐতিহাসিক।

এখানে স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে শৈবধর্ম্মের সহিত মহাযান ধর্ম্মের সমন্বয় সাধিত হইয়াছে। উপরোক্ত পাকা বৌদ্ধ শাস্ত্রে দেখা যাইতেছে যে লোকেশ্বর বা মৎস্যেন্দ্রনাথ শিব ও নারায়ণ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া হিন্দুদিগকে শিক্ষাদান করিয়াছেন। স্বয়ং হুয়েনসাঙ মৎস্যেন্দ্রনাথকে পাশুপত বিধর্ম্মী বলিয়াছেন। নেপালের স্মারক লিপিতেও (৩য় অধ্যায় দ্রষ্টব্য) তাঁহাকে শাক্তদিগের শক্তি, বৌদ্ধদিগের লোকেশ্বর এবং যোগীদিগের মৎস্যেন্দ্র বলা হইয়াছে। মৎস্যেন্দ্র লিখিত শাস্ত্রেও ব্রহ্মোপাসনা আছে। হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায় বাঙ্গালী মৎস্যেন্দ্রনাথকে পূজা করিয়া থাকেন।

মৎস্যেন্দ্র, মচ্ছেন্দ্র বা মচ্ছঘ্ন পাদাবতারিত "কৌলজ্ঞান নির্ণয়" ডাঃ প্রবোধ চন্দ্র বাগচী ১৯৩৪ সালে নেপাল হইতে আনিয়া সম্পাদনান্তর প্রকাশ করিয়াছেন (Calcutta Sanskrit Series No. III)। উহা মৎস্যেন্দ্রনাথের রচিত নহে, তাঁহারই মতবাদ ও ধর্ম্মাচরণ বিধান অন্য কেহ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অধ্যাপক বাগচী মহাশয় 'কৌলজ্ঞান নির্ণয়ের' সহিত আরও অনুরূপ কয়েক খণ্ড গ্রন্থ সংযোজিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ঐগুলিও মৎস্যেন্দ্র পাদাবতারিত হইলেও "অকুলবীর তন্ত্রে" "মীননাথেন ভাষিতং" (৯২ পৃঃ) "সিদ্ধনাথ প্রসাদতঃ" (১০৬ পৃঃ) বলিয়া লিখিত আছে।

"কৌলজ্ঞান নির্ণয়" কাহারও জীবনীমূলক গ্রন্থ নহে। ইহাতে মৎস্যেন্দ্রনাথের আত্মজীবনীর নামগন্ধ থাকিতে পারে না। লৌকিক দৃষ্টিতে যেগুলি

ডক্টর কল্যাণী মল্লিক বলেন—"* * * নাথেরা বৌদ্ধ ছিলেন না, তাঁহারা ছিলেন শৈব। * * * মৎস্যেন্দ্র শৈব যোগীর বেশেই নেপালে শৈবধর্ম্ম প্রচার করিতে যান। তাঁহার রচিত 'কৌলজ্ঞান নির্ণয়' নামক পুঁথিতে বৌদ্ধধর্ম্মের উল্লেখ মাত্র নাই। পরবর্ত্তীকালের পুঁথিমধ্যেও বৌদ্ধধর্ম্মের কোন কথা পাওয়া যায় না, শিব ও শক্তির কথাই পাওয়া যায়। অতএব নাথদেরে বৌদ্ধ বলা সমীচীন নহে।" (নাথপন্থ— ৭ পৃঃ)

আত্মজীবনী বলিয়া প্রতিভাত হয়, সেগুলি প্রকৃতপক্ষে সাধারণতত্ত্বের বিশ্লেষণ মাত্র। লৌকিক ভাষায় মৎস্যেন্দ্রনাথের জন্ম-বিবরণ অতি সহজ। আর্য্য শাস্ত্র বড়ই জটিল। ইহার প্রতিটি তত্ত্বের ভাষা ত্রিভাবাত্মক। "প্রথম একটি সরল আভিধানিক বা সাহিত্যিক বা লৌকিক ভাষা— ইহা নিম্ন-অধিকারীর জন্য। দ্বিতীয়— ভক্তিভাবযুক্ত পরকীয় বা পৌরাণিক ভাষা অথবা উপাসনার অনুকূল দৈবীলক্ষ্যযুক্ত সূক্ষ্ম বা তাৎপর্য্যবোধক ভাষা— ইহা মধ্য-অধিকারীর জন্য। তৃতীয়ত— উন্নত অধিকারীর পক্ষে সেই শাস্ত্র বাক্যেরই গভীরতম জ্ঞানাত্মক আধ্যাত্মিক লক্ষ্যযুক্ত সূক্ষ্মতর সমাধি-ভাষা। ইহাকে ধ্যানভাষা বা সন্ধ্যাভাষাও বলে। অন্যভাবে এই ভাষাত্রয়কে আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক ভাষাও বলা যাইতে পারে। চর্য্যাপদ, কৌলজ্ঞান নির্ণয় এবং নাথ-সাহিত্যের অধিকাংশ গ্রন্থ সন্ধ্যাভাষায় লিখিত। সুতরাং সন্ধ্যা বা সমাধির সহিত বিচার না করিয়া শুধু লৌকিক বা আভিধানিক ভাষার সাহায্যে এই সব গ্রন্থোক্ত তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিলে সিদ্ধ পুরুষদের প্রতি অবিচার করা হইবে।" (মৎস্যেন্দ্রনাথের জন্মরহস্য—প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩৫৭ বাং)

সুপারিনটেন্‌ডিং ইঞ্জিনিয়ার প্রত্নতাত্ত্বিক— শ্রীরাজমোহন নাথ, বি-ই মহাশয় বলেন—

"সন্ধ্যাভাষায় মৎস্য শব্দের অর্থ ঈড়া-পিঙ্গলা (গঙ্গা-যমুনা) নাড়ীর মধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাস রূপে সতত সঞ্চারমান প্রাণবায়ু; এবং যিনি যোগবলে এই প্রাণবায়ুকে সংরুদ্ধ করিতে পারিয়াছেন তিনিই মৎস্যবধকারী বা মৎস্যজয়ী বীর বা মৎস্যেন্দ্র-নাথ।

"গঙ্গা-যমুনয়োর্মধ্যে মৎস্যৌদ্বৌচরতঃ সদা।
তৌ মৎস্যৌ ভক্ষয়েৎ যস্তু স ভবেন্মৎস্যসাধকঃ॥

প্রাণবায়ু অবার পাঁচটি—প্রাণ, আপান, ব্যান, উদান, সনান; ইহাদের সহিত মন যুক্ত হইয়া ছয়টি হয়। যোগপন্থী সাধক এই ছয়টিকে কুম্ভক আদি

প্রক্রিয়ার দ্বারা সম্পূর্ণ স্ববশে আনিতে চেষ্টা করেন। তিব্বতী ও নেওয়ারী চিত্রে মৎস্যেন্দ্রনাথের আশেপাশে এইরূপ পাঁচটি বা ছয়টি মৎস্যের চিত্র থাকাই স্বাভাবিক।

ঈড়া-পিঙ্গলাবাহী প্রাণবায়ুরূপ মৎস্যগুলিকে নিরুদ্ধ করিতে পারিলে সাধকের মূলাধারস্থ শক্তিস্বরূপিনী কুণ্ডলিনী জাগ্রতা হইয়া সুষুম্না-পথে ঊর্দ্ধে গমন করেন, এবং স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ চক্রভেদ করিয়া আজ্ঞাচক্রে প্রবেশ করেন। এই আজ্ঞাচক্রের অন্তর্গত আরও দুইটি গুপ্তচক্র আছে। পশ্চাৎ দিকে মনশ্চক্র ও সম্মুখ দিকে সোমচক্র। মনশ্চক্রের ছয়টি দলে যথাক্রমে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ও তাহাদের সমষ্টিভূত প্রতিবিম্বরূপ স্বপ্নের স্থান। এই ছয়টি বৈষয়িক ভাবপূর্ণ উপকেন্দ্র লইয়া মনের কেন্দ্রে ছয়টি দল গঠিত হইয়াছে। এই মনশ্চক্রেই জীবের সমস্ত ভাবনা-চিন্তার রেখা গ্রামোফোনের রেকর্ডের মত অঙ্কিত হইয়া থাকে। সাধনার প্রারম্ভে সাধক পঞ্চপ্রাণ ও মন এই ছয়টির সহিত প্রবল সংগ্রামে রত হন। তাহারা ষন্মুখের মত বলশালী হইয়া বা ষট্পদের মত ঝাঁক বাঁধিয়া সাধককে বিব্রত করে। কিন্তু সাধনার জালে মৎস্যগুলিকে রুদ্ধ করিয়া সাধক যখন কুণ্ডলিনীকে আজ্ঞাচক্রে উত্থিত করেন, তখন আবার মনশ্চক্রের ষট্দলস্থিত ষট্পদগণ সবলে দংশন করিতে থাকে।

আজ্ঞাচক্রে ঈড়া-পিঙ্গলা ও সুষুম্নার মিলনস্থান। এখানে একটি ত্রিকোণ ক্ষেত্র সৃষ্ট হইয়াছে। ইহাকে ত্রিবেণী, যুক্ত ত্রিবেণী, ত্রিকূট, হলক্ষ, অকথাদি ক্ষেত্রও বলা হয়। এই স্থানেই সাধক জ্যোতিঃ দর্শন করেন ও অনাহত নাদ শ্রবণ করেন।

আজ্ঞাচক্রস্থ ত্রিকোণ পীঠ সাধকদিগের সাধনার পক্ষে একটি চরম স্থান। সাধারণতভাবে বলা হয় "এ বড় বিষম ঠাঁই, গুরু শিষ্যে ভেদ নাই।" ঈড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না মূলাধার হইতে আরম্ভ করিয়া ষট্চক্রের এক এক চক্রে ত্রিতয় অর্থাৎ কেশগুচ্ছজাত বেণীর ন্যায় সংবদ্ধ হইয়া এই আজ্ঞাচক্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে।

এই আজ্ঞাচক্র মধ্যে কূটস্থ প্রদেশে সাধকেরা শ্রীগুরুর পাদপীঠ কল্পনা করিয়া তাঁহারই জ্যোতির্ময় স্বরূপ প্রত্যক্ষ করেন। সুষুম্নাপথে জীবনী বা কুণ্ডলিনী শক্তি অনাহতস্থিত জীবাত্মা সহযোগে এই আজ্ঞাচক্র পর্য্যন্ত কুণ্ডলিনীরূপে আসিতে পারেন। আজ্ঞাচক্রের কেন্দ্রবিন্দু অর্থাৎ ঈড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নার ছেদবিন্দুতেই প্রাণবায়ুর ক্রিয়া শেষ হইয়াছে। ইহার উপরে আর শ্বাস-প্রশ্বাস চলে না। ইহার পর নিরালম্বপুরী বা শূন্যাত্মক নাদানুভবের স্থান—নাথ যোগীদের সাধনার চরম লক্ষ্য নাদবিন্দুর স্থান। তাহারই উপরে সহস্রার।

আজ্ঞাচক্রে আসিয়া কুণ্ডলিনী পরম শিবের সহিত যুক্ত হইয়া অর্থাৎ জীবাত্মা পরমাত্মায় লীন হইয়া যথার্থ নাদানুভূতিরূপ শূন্যাত্মক হইয়াযান—পার্ব্বতী শিবের কোলে নিদ্রাভিভূতা থাকিয়া আত্মাহারা হইয়া যান। ইহাই সাধকের দেহপিণ্ড রূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড-মধ্যে সাযুজ্য মুক্তিলাভ বলিয়া বুঝিতে হইবে।

আজ্ঞাচক্রস্থ ত্রিকোণ ক্ষেত্রের হলক্ষ বিন্দু হইতে তিনটি জ্যোতিঃশিখা সমুত্থিত হইয়া পিরামিডাকারে উক্ত ত্রিকোণ চূড়ের শৃঙ্গদেশে অন্তিমবিন্দু ব্রহ্ম-বিন্দুতে পরিসমাপ্ত হইয়াছে। এই অন্তিম বিন্দুতেই অখণ্ড কেন্দ্ররূপ বিন্দু ও অনাহত নাদের অন্তর-স্বরূপ ওঁকার বা প্রণবের শেষ অঙ্গ। 'ওঁ'কার রূপ পর্য্যঙ্কের উপর "ঁ" নাদরূপা দেবী এবং তদুপরি "·" বিন্দুরূপ অর্থাৎ পরব্রহ্মকেন্দ্র মিলিত হইয়া কামকলা-স্বরূপ "ঁ" চন্দ্রবিন্দুসদৃশ আকারযুক্ত হইয়া শিবশক্তি বা প্রতিলোমভাবে প্রকৃতি পুরুষের নিত্যসহযোগে যোগিগণের যোগ-প্রতিপাদ্য এই পরমধন "ওঁ" প্রণবের নির্দ্দেশ হইয়াছে। ইহার অবস্থিতি নিরালম্বপুরীতে বায়ুক্রিয়ার বাহিরে। কুণ্ডলিনী শক্তিসহ জীবাত্মা এই নিরালম্বপুরীতে উপস্থিত হইতে পারিলে অর্থাৎ সাধক মৎস্যের পেট ছিন্ন করিয়া মুক্ত হইয়া আসিতে পারিলে প্রকৃত নির্ব্বাণ, মুক্তি বা নির্ব্বিকল্প সমাধি হয়। যোগশাস্ত্র বলিতেছেন :—

"শিরঃ কপাল বিবরে ধ্যায়েৎ দুগ্ধমহোদধিম্।
অত্র স্থিত্বা সহস্রারে পদ্মে চন্দ্রং বিচিন্তয়েৎ॥

শিরঃ কপাল বিবরে দ্বিরষ্ট কলয়া যুতঃ।
পীযূষভানুং হংসাখ্যং ভাবয়েত্তং নিরঞ্জনং ॥
নিরন্তর কৃতাভ্যাসাৎ ত্রিদিনে পশ্যতি ধ্রুবং।
দৃষ্টি মাত্রেন পাপৌঘং দহত্যেব স সাধকঃ॥"

ব্রহ্মকপাল-বিবরে বা ব্রহ্মরন্ধ্র-মধ্যে প্রথমতঃ দুগ্ধ মহাসমুদ্র চিন্তা করিতে হইবে। পরে সেই স্থানে থাকিয়া অর্থাৎ লয় যোগানুষ্ঠানের দ্বারা সেই স্থানেই জীবাত্মাকে স্থিরতর করিয়া সহস্রদল কমলের অধঃস্থিত চন্দ্রমণ্ডল স্মরণ করিতে হইবে। ব্রহ্মরন্ধ্র মধ্যে ষোড়শকলাযুক্ত সুধারশ্মিবিশিষ্ট বা অমৃতবর্ষী যে চন্দ্র আছে তাহা হং-সঃ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই নিরঞ্জন হংসের সদা ধ্যান করিতে হইবে। সর্ব্বদা এই ধ্যানযোগ অভ্যাস করিলে, দিবসত্রয়ের মধ্যেই সেই নিরঞ্জনের সাক্ষাৎলাভ হয়,— ইহাতে সন্দেহ নাই। ইহার দর্শনেই সাধকের সকল পাপ বিদূরিত হইয়া তিনি মুক্ত হইতে পারেন। হং-সঃ পরিবর্ত্তিত হইলে সো-হং হইয়া থাকে। অনন্তর উহাদের স্থূল স্বরূপ স ও হ-এর লোপ হইলে ওং বা ওঁ মাত্র অবশিষ্ট থাকে। 'হ' পুরুষ বা পরম শিব, 'স' প্রকৃতি বা পরমাপ্রকৃতি; ইহারা ওতপ্রোতভাবে জড়িত হইয়া শিবশক্তিস্বরূপে প্রতিভাত হইয়া জীবের প্রাণে শ্বাসপ্রশ্বাসরূপে সদাই স্থূলভাবে বিরাজ করিতেছেন। এই হংসযুগলের স্বরূপ শ্বাসপ্রশ্বাসাত্মক শ্রীগুরু পাদুকাপীঠ বা মণিপীঠ বা সোমতীর্থ নির্ম্মল চন্দ্রকিরণের ন্যায় শুভ্রোজ্জ্বল, সুধাসরোবরে প্রস্ফুটিত সুদর্শন কমলসদৃশ। ইহা হইতে অবিরত সুধাধারা প্রবাহিত হইতেছে। এই স্থানেই পরমানন্দপ্রদ ক্ষীরোদ-সাগর, চন্দ্রদ্বীপ বা মণিদ্বীপ ও টঙ্গী-ঘর বিদ্যমান আছে। এই স্থানেই সাধকের পরমারাধ্য শ্রীগুরুপাদুকাপীঠ। সিদ্ধাচার্য্য লুইপাদ এই স্থানেই—

"—আমৃহে সানে দিঠা।
ধমন-চমন-বেনি পিণ্ডি বইঠা। —চর্য্যাপদ ১

এই বিন্দুই শুভ্র স্ফটিকবর্ণ জ্ঞানসূর্য্যরূপ পরমাত্মা— নাথযোগীদের পরম আরাধ্য

বস্তু। যোগ-সমাধির ফলে সেই অতীন্দ্রিয় অনুভূতি হয়। ইনিই ব্রহ্মস্বরূপ পরম শিব বা ব্রহ্ম-বিন্দুস্বরূপ। তাঁহারই অন্তরে সকল সুধার আধার অমাকলা বা আনন্দ ভৈরবী ব্রহ্মশক্তি অবস্থিতা আছেন।

বিন্দুস্থান বা মণিপীঠ নিরালম্বপুরীতে ;—এক প্রকার আজ্ঞাচক্রের বহির্দেশে অবস্থিত। ইহার উপরে সহস্রার বা সহস্রদল কমল ব্রহ্মরন্ধ্রে কেন্দ্রস্থ হইয়া অধোমুখ ছত্রাকারে অবস্থিত আছে। বিন্দুপীঠ ঠিক সহস্রারের অন্তর্গত নহে, অথচ ইহার কুক্ষিগত হইয়া নিম্নভাগে গাত্রসংলগ্ন হইয়া আছে।—

"ব্রহ্মরন্ধ্র সরসীরুহোদরে, নিত্যলগ্নমবদাতমদ্ভুতং।"

গুরুপাদুকাপীঠও এই হিসাবে সহস্রারের অন্তর্গত এবং অন্তিম মোক্ষপ্রদ এই শ্রীপাদুকাতীর্থকে সোমতীর্থও বলা হয়। সহস্রার একটি সহস্রদলবিশিষ্ট শ্বেতগর্ভ সপ্তবর্ণযুক্ত বিচিত্র কমল। ইহাকে ক্ষীরোদসাগরও বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে ইহা মূলাধারাদি ষট্চক্রের বা গুপ্তচক্র লইয়া নবচক্রের বাহিরে অর্থাৎ দেহনগরের বাহিরে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপ হিসাবে অবস্থিত। কুণ্ডলিনী শক্তি ব্রহ্মনাড়ী আশ্রয় করিয়া ইহার মধ্যে উত্থিতা হন।—

"নগর বাহিরি রে ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।
ছোই ছোই জাহ সো বাহ্ম নাড়িআ।"—চর্য্যাপদ—১০

তখন সাধকের যে কি অবস্থা হয় তাহা বর্ণনা করা যায় না।

সুতরাং সহস্রার ক্ষীরোদ সমুদ্র এবং তাহারই কুক্ষিগর্ভে সোমতীর্থ, চন্দ্রদ্বীপ, এবং আজ্ঞাচক্রস্থিত ত্রিকোণক্ষেত্রে পিরামিডাকৃতি টঙ্গীঘর অবস্থিত। এই টঙ্গীঘরের টঙ্গে বা তুঙ্গদেশে শিবশক্তি হরপার্ব্বতী নাদবিন্দুরূপে অবস্থিত আছেন। এই টঙ্গীর নিম্নদেশে ঈড়া-পিঙ্গলার মধ্যে মৎস্যরূপী প্রাণবায়ু আজ্ঞাচক্রের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত এবং তাহার উদরে জীবাত্মা মৎস্যেন্দ্রনাথ বিরাজিত। শিবশক্তির অনুগ্রহে মৎস্যের উদর ছিন্ন করিয়া ব্রহ্মনাড়ী পথে

তাহাকে টঙ্গীঘরে উঠাইয়া আনা হয়, এবং কুলকুণ্ডলিনী তাহাকে সযত্নে মন্দার পর্ব্বতে লইয়া নির্ব্বিকল্প সমাধিতে সমাহিত করেন।

এই কাহিনী নাথসিদ্ধা মৎস্যেন্দ্রনাথের সংসারাশ্রমের জীবনী নহে, ইহা প্রত্যেক যোগাবলম্বী সাধকের যৌগিক ক্রিয়াসাধনের সত্য বিবরণ।

এখন ধীবরত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। ঈড়া-পিঙ্গলায় সঞ্চরমাণ প্রাণবায়ুই মৎস্য। ইহাদিগকে যিনি সংযত ও সংরুদ্ধ করিতে পারিয়াছেন তিনিই ধীবর। ঈড়া-পিঙ্গলা ও সুষুম্নার ক্রিয়া হইতে মুক্ত করিয়া যিনি চিত্তকে নিরালম্বপুরীতে স্থাপন করিতে পারিয়াছেন, তিনি মৎস্যঘাতী ও মৎস্যের উদর-ছিন্নকারী ধীবর— তিনিই মচ্ছন্ননাথ বা মৎস্যান্ত্রাদপাদ্।

পঞ্চপ্রাণ ত সাধারণ মৎস্য। মায়া নামক আর একটি মহা মৎস্য আছে। নিরালম্বপুরীতে ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করিলেও তাহার ক্রিয়া চলে। ব্রহ্ম মায়ার সাহায্যেই সৃষ্টি করেন। মায়াও ব্রহ্মের সমশক্তিসম্পন্ন, দেবতারাও ইহার নিকট পরাজিত। ইহা শুধু ঈড়া-পিঙ্গলাতে বাস করে না— ইহা দেহস্থ সপ্ত ধাতুরূপ সপ্ত সমুদ্র জুড়িয়া বিরাজ করে। রুদ্রযামল গ্রন্থে দেহস্থিত প্রতি চক্রে এক একটি সরোবর বা তীর্থ কল্পনা করা হইয়াছে। মায়া-মৎস্য এই সপ্তসমুদ্র জুড়িয়া বিরাজ করে। ব্রহ্মত্ব লাভ করিলেও ইহাকে দমন করা যায় না। সুতরাং ব্রহ্মত্ব ত্যাগ করিয়া সহস্রারে উঠিতে পারিলেই তাহাকে বধ করা যায়। সুতরাং এই মহামৎস্যবধকারী ধীবর বা কৈবর্ত্ত ব্রহ্মজ্ঞানী হইতেও শ্রেষ্ঠ।

দীঘনিকায় ব্রহ্মজালসুত্রে বুদ্ধদেব বলিতেছেন—"হে ভিক্ষুগণ! যেমন কোন এক কৈবর্ত্ত বা কৈবর্ত্ত-শিষ্য (কেবট্টো বা কেবট্টোন্তেবাসি) স্বল্পজল হ্রদে সূক্ষ্মজাল নিক্ষেপ করিলে তাহার মনে এই ভাবের উদয় হয়—এই স্বল্পজল হ্রদে যত বড় বড় রকমের মাছ আছে, তাহাদের সমস্তকেই আমার জালে পুরিয়াছি, জালের মধ্যে থাকিয়াই তাহারা উল্লম্ফন করিতেছে। তেমনিভাবে—হে ভিক্ষুগণ! আত্মজ্ঞ বিষয়ে অতুদর্শী ও মননশীল যে-কোনও শ্রমণ কিম্বা ব্রাহ্মণ নানাভাবে মতবাদ

প্রচার করেন, উহাদের সমস্তই আমার এই সূত্রে বাষট্টি মতবাদের মধ্যে পাইবে। এই মতবাদসমূহের অন্তর্ভুক্ত হইয়াই জালবদ্ধ মৎস্যের ন্যায় লাফালাফি করিবে।"

"আনন্দ! এই কারণে আমার এই ধর্ম্মোপদেশকে অর্থজাল, ধর্ম্মজাল, ব্রহ্মজাল, দৃষ্টিজাল বা অনুত্তর সংগ্রামবিজয় নামে গ্রহণ করিবে।"

আসামে "রাতিখোয়া" নামক একটি গুহ্য সাধক-সম্প্রদায় আছেন। তাহাদের একটি গীতে আছে—

"দুনিয়া এদিনে দুনিয়া দুদিনে
দুনিয়া ফুলনি বাতী।
কিছু ছল বল কর তই দুনিয়া
ধরিম খেওয়ালি মারি॥
খেওয়ালি জালতে গোড়া বার কুড়ি
পাশর লেখ জোখ লাই।
টিকনিত ধরিয়া চৌচনি মারিলে
সবাকে এক ঠাঁই নাই॥"

অর্থাৎ—দুই এক দিনের ফুলবাগিচার মত এই সংসার কিসের ছলনা করিতেছে? জাল ফেলিয়া তাকে তৎক্ষণাৎ বদ্ধ করিয়া ফেলিব। আমার হাতে যে উড়া জাল আছে তাহার প্রান্তদেশে বার কুড়ি লোহার গুটি বাঁধা আছে, জালে অসংখ্য পাশা বা তন্তুও আছে। জালের শীর্ষপ্রান্তে ধরিয়া টানিয়া আনিলেই সংসারের ছোট বড় সকলকেই একত্র পাইব— ঠিক যেমন ধীবর রুই, কাতলা, পুঁটি আদি সকল মাছকে একত্রে জালবদ্ধ করে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, যে সকল মহাপুরুষ নিজ নিজ ধর্ম্ম-মতবাদের দ্বারা জগতের ছোট বড় সকলকে এক ছত্রের নিম্নে সমবেত করিতে পারেন তাঁহারা সকলেই প্রকারান্তরে ধীবরের বৃত্তিই অবলম্বন করিয়াছেন। বুদ্ধদেব, চৈতন্যদেব,

নানক, কবীর, দাদূ ইহারা সকলেই ধীবরবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন— এই দিক দিয়া বিচার করিলে মৎস্যেন্দ্রনাথও একজন ধীবর ছিলেন।

এখন কৌলজ্ঞান নির্ণয়ের ষোড়শ পটলে মৎস্যেন্দ্রনাথের তথাকথিত জীবনী-মূলক পদগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক।

ভৈরব বলিতেছেন :—

যদাবতারিতং জ্ঞানং কামরূপী ত্বয়া ময়া।
তদাবতারিত তুভ্যং তত্ত্বস্তু ষন্মুখস্য চ ॥
তেন কৌলাগমে দেবি! বিজ্ঞানং প্রণবপ্রিয়ে।
অব্যক্তেন তু রূপেন চন্দ্রদ্বীপে অহং প্রিয়ে ॥
অব্যক্তং গোচরং তেন কুলজাতং মম প্রিয়ে ॥ ২১-২২

দেবী— কিমর্থং চন্দ্রদ্বীপস্তু অহশ্চৈব গত প্রভো।
কিমর্থং গ্রসিতা প্রাজ্ঞা আদি ষন্মুখস্য চ ॥

ভৈরব— অহংচৈব ত্বয়া সার্দ্ধং চন্দ্রদ্বীপং গত যদা।
তদা বটুকরূপেন কার্ত্তিকেয়ঃ সমাগতঃ ॥
অজ্ঞান ভাবমাস্থত্য তদা শাস্ত্রং হি মূষিতম্।
শাসিতোঽহং মহাদেবী ষন্মুখা মূষকাতৃকম্ ॥
গতোঽহং সাগরে ভদ্রে জ্ঞানদৃষ্ট্যাবলোকনম্।
মচ্ছমাকর্ষয়িত্বা তু স্ফোটিতং চোদরং প্রিয়ে ॥
গৃহীত্বা মৎস্যোদরস্তু আনীতস্তু গৃহী পুনঃ।
স্থাপয়িত্বা জ্ঞানপট্টং মম গূঢ়ং তু রক্ষিতম্ ॥
পুনঃ ক্রুদ্ধমনেনৈব মূষকেন সুরেশ্বরী।
গার্ত্তং কৃতা সুরুঙ্গায় পুনঃক্ষিপ্তং হি সাগরে ॥
দশকোটি প্রমাণেন মহামাংসং (মৎস্য ?) হি ভক্ষিতম্।
মম ক্রোধো সমুৎপন্নং শক্তিজালো ময়াকৃতঃ ॥

আকর্ষিতো মৎস্য সন্তানাং সাগর হ্রদাৎ।
নাগতোঽসৌ মহামৎস্য মমতুল্য বলঃ প্রিয়ে ॥
জ্ঞানতেজেন সংভূতো দুর্জ্জয়স্ত্রিদশৈরপি।
ব্রহ্মত্বং হি তদা ত্যক্তং চিত্তবী (চিত্তধী ?) ধীবরাত্মকম্॥
অহং সো ধীবরো দেবি! কৈবর্ত্তত্বং ময়া কৃতঃ।
আকৃষ্য তু তদা মৎস্যং শক্তিজাল সমীকৃতঃ॥
মৎস্যোদরন্তু তৎস্ফোট্য গৃহীতঞ্চ কুলাগমে।
বদন্তি বিদিতা লোকে পশবো জ্ঞানবর্জ্জিতাঃ॥
দেবী—ব্রাহ্মণোঽসি মহাপুণ্যে কৈবর্ত্তত্বং ময়া কৃতঃ।
মৎস্যাভিঘাতিনৈর্বিপ্রা মৎস্যঘ্নমেতি বিশ্রুতাঃ॥
কৈবর্ত্তত্বং কৃতং যস্মাৎ কৈবর্ত্তো বিপ্রনায়কঃ॥

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী এই হেঁয়ালিপূর্ণ শ্লোকগুলির লৌকিক ব্যাখ্যার যে ইংরেজী অনুবাদ করিয়াছেন (কৌলজ্ঞান নির্ণয়—ভূমিকা ৮-৯ পৃষ্ঠা) তাহার বঙ্গানুবাদ এইরূপ:

ভৈরব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন— তিনিই কামরূপে মন্মুখ কার্ত্তিকেয়ের গুপ্ত তত্ত্ব ব্যক্ত করিয়াছেন। এই জ্ঞানই কুলাগমের সারতত্ত্ব এবং চন্দ্রদ্বীপে তিনিই ইহার অধিকারী ছিলেন। তারপর তিনি বলিতেছেন— আমি যখন তোমার সহিত চন্দ্রদ্বীপে অবস্থান করিতেছিলাম, তখন শিষ্যরূপে কার্ত্তিক আমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং অজ্ঞানতাবশতঃ গুহ্যতত্ত্বের গ্রন্থখানা হরণ করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিল। আমি সাগরে গমন করিয়া সেই নিক্ষিপ্ত শাস্ত্র ভক্ষণকারী মৎস্যকে ধরিয়া তাহার উদর দীর্ণ করিলাম ও পবিত্র জ্ঞান উদ্ধার করিলাম। সেই চোর কিন্তু ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া ভূমিগর্ভে একটি সুড়ঙ্গ খনন করিল এবং পুনরায় সেই গ্রন্থ চুরি করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিল। এইবার আরও বৃহদাকার এক মৎস্য ইহা ভক্ষণ করিল। আমিও ইহাতে অধিকতর ক্রুদ্ধ হইলাম এবং

আমার শক্তি-প্রভাবে এক জাল প্রস্তুত করিয়া সেই মৎস্যকে জালবদ্ধ করিয়া তীরে তুলিতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু সেই মহামৎস্য আমারই মত বলশালী বিধায় তাহাকে তীরে তুলিতে পারিলাম না। সেই মৎস্যেরও দারুণ দৈবশক্তি ছিল এবং দেবতাগণও তাহাকে ভয় করেন। তখন সেই মৎস্যের সঙ্গে সমুচিত-ভাবে সংগ্রাম করিবার জন্য আমি আমার ব্রাহ্মণত্ব ত্যাগ করিয়া ধীবরত্ব গ্রহণ করিলাম। হে দেবি! আমিই ধীবর বৃত্তিধারী কৈবর্ত্ত; আমিই দৈবশক্তির জালের দ্বারা সেই মৎস্যকে ধরিয়া তীরে উঠাইলাম এবং কুলাগম শাস্ত্র উদ্ধার করিলাম। আমি যদিও ব্রাহ্মণ, এখন ধীবর সাজিয়াছি। কৈবর্ত্তরূপে মৎস্য বধ করার কারণে ব্রাহ্মণেশ্বর আমি মৎস্যাঘ্ন কৈবর্ত্ত হইয়াছি।

দেবী বলিলেন— তুমি মহাপুণ্যবান ব্রাহ্মণ। আমিই তোমাকে কৈবর্ত্তরূপে পরিণত করিয়াছি। মৎস্যঘাতী বিপ্রসকল মৎস্যঘ্ন নামে বিশ্রুত হইবে; এবং আমিই যখন কৈবর্ত্তত্বে পরিণত করিয়াছি, তখন কৈবর্ত্তরাই বিপ্রনায়ক বলিয়া গণিত হইবে।

ইহা হইতে বাগচী মহাশয় মোটামুটি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন— কুলাগাম শাস্ত্র প্রথমে কামরূপে প্রকটিত হইয়াছিল। মৎস্যেন্দ্রনাথ প্রথমে ব্রাহ্মণ ছিলেন, কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিবার জন্য নিজের জাতি ত্যাগ করিয়া কৈবর্ত্ত হইয়া গিয়াছিলেন।

সন্ধ্যাভাষায় শ্লোকগুলির অর্থ হইল নিম্নলিখিত রূপ :—

মূলাধার কামরূপে শিবশক্তি থাকেন। সেখান হইতে কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগরিত করিয়া আজ্ঞাচক্রস্থিত প্রণবস্থান চন্দ্রদ্বীপে উত্থিত করিতে হইলে প্রথমে আদি ষন্মুখ অর্থাৎ পঞ্চ প্রাণ-মনের তত্ত্ব জানিতে হইয়াছিল। এই তত্ত্বই কুলা-গম শাস্ত্রের আদি গূঢ়তত্ত্ব।

তারপর আজ্ঞাচক্রস্থ ত্রিকোণের উর্দ্ধদেশে প্রণবস্থান চন্দ্রদ্বীপ বা মণিদ্বীপে যাইবার সময় ষট্‌দল কমলবিশিষ্ট মনশ্চক্রে শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধস্বপ্ন এই ষন্মুখ আবার

অজ্ঞানতার জাল বিস্তারপূর্ব্বক পূর্ব্বজ্ঞান হরণ করিয়া চিত্ত তথা কুণ্ডলিনীকে অনুলোম গতিতে নীচে নামাইয়া আনিল এবং ঈড়া-পিঙ্গলার মধ্যে মৎস্যরূপী প্রাণবায়ুর স্বাভাবিক শক্তি বৃদ্ধি করিয়া দিল। তখন জ্ঞানচক্রের মধ্যে চিত্ত নিবেশিত করিয়া ঈড়া-পিঙ্গলা সুষুম্নার অধিকার হইতে উর্দ্ধে জ্ঞানপট্ট নিরালম্ব-পুরীতে স্থাপন করা হইল। কিন্তু এখান হইতেও বিভূতি, সিদ্ধি আদির প্রাবল্যে চিত্ত আবার নিম্নগামী হইয়া মায়াতে নিবদ্ধ হইল। এই মহামৎস্যরূপী মায়া দেহস্থ সপ্ত-ধাতুর সমুদ্র জুড়িয়া ব্যাপ্ত হইল। মায়া ব্রহ্মের সমশক্তিসম্পন্ন, দেবতারাও তাহার নিকট পরাজিত। সুতরাং ব্রহ্মভাবের অতীত হইয়া তাহাকে বধ করা হইল এবং মহালয়যোগে নির্ব্বিকল্প সমাধি হইল। ("মাঅ মারিআ কাহ্ন ভৈলা কবালী"—১১ চর্য্যা)। ইহাই ধীবরবৃত্তি এবং ইহাই ব্রহ্মত্বলাভের অর্থাৎ ব্রহ্মসাযুজ্য-লাভের চেয়েও শ্রেষ্ঠ বা উন্নততর অবস্থা।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, গোরক্ষবিজয়, স্কন্দ পুরাণ বা কৌলজ্ঞান নির্ণয়োক্ত কাহিনীগুলিতে নাথসিদ্ধা মৎস্যেন্দ্রনাথের সংসারাশ্রমের জাতিকুল বিচারের ইতিহাস নাই,—আছে শুধু নাথসিদ্ধার ধর্ম্মমতানুযায়ী যোগসিদ্ধিলাভের গুহ্য আচরণের ইঙ্গিত।"—(প্রবাসী—আষাঢ়, ১৩৫৭ বাং, ২৭৪—২৮০ পৃষ্ঠা)

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন—"* * * মৎস্যেন্দ্রনাথকে অনেক সময় মচ্ছঘ্ননাথ বলে অর্থাৎ তিনি জেলের ছেলে ছিলেন। এ কথা যদি সত্য হয় তাহা হইলে তাঁহার বাংলাদেশের লোক হওয়াই সম্ভব।"

(প্রবাসী— বৈশাখ, ১৩২২ বাং ১৬৬ পৃঃ)

এ সম্বন্ধে অধ্যাপক ডক্টর বেণীমাধব বড়ুয়া বলেন— "নাথগুরু মৎস্যেন্দ্রনাথ মীননাথের নামে মৎস্যবাচক শব্দ আছে। নাথযোগিগণ মৎস্যব্যবসায়ী কৈবর্ত্তের ন্যায় সমুদ্রতীরে বাস করেন। অতএব নাথযোগিগণ জাতিতে কৈবর্ত্ত। ইহা কি গবেষণা না ব্যঙ্গ? তিনি (শাস্ত্রী মহাশয়) কি জানেন

না যে হংস ও বিহঙ্গের ন্যায় মীন কিংবা মৎস্য শব্দও আত্মবাচক? হংস এবং মীন উপমা দ্বারাই না বৃহদারণ্যক উপনিষদে যথাক্রমে আত্মার দেহাতিরিক্ত ভাব ও ভবনদীর দুইতীরের মধ্যে সঞ্চরণ শক্তিকে বুঝাইয়াছে? মীনচেতন নামক গ্রন্থের নাম ও প্রতিপাদ্য বিষয়ের এইভাবে ব্যাখ্যা করিলে মীনচেতন অর্থে আত্মার চৈতন্য এবং গোরক্ষনাথ কর্ত্তৃক কামিনীপ্রেমমত্ত নিজগুরুর অথবা নিজের আত্মার চৈতন্য সম্পাদন বুঝায়। বৈষ্ণবদিগের ভক্তমাল গ্রন্থের এক আখ্যায়িকায় ও মীনচেতনে ঠিক এই অর্থই জ্ঞাপিত হইয়াছে। যদি মৎস্য ব্যবসায়ী গুরুরূপে নাথগুরুদিগের নামের সহিত মৎস্যবাচক শব্দ যোজনার বিশেষত্ব হইত তবে অপর নাথগুরু গোরক্ষনাথের নামের সহিতও তাহা যুক্ত হইত। নাথগণ ব্যবসায়ী—বিশেষতঃ বস্ত্রব্যবসায়ী এইজন্য তাঁহারা বাণিজ্যের সুবিধার জন্য সমুদ্রতীরে বাস করিতেন। যেমন অধুনা অনেক নাথযোগী ঝালকাঠি বন্দরে বাস করিতেছেন। * * * কৈবর্ত্তও সমুদ্রকূলে বাস করেন। হইতে পারে এক স্থানে বাসহেতু নাথ ও কৈবর্ত্তের মধ্যে মেলামিশা হইত কিংবা এখনও হইয়া থাকে। আমি জিজ্ঞাসা করি— ইহাতে নাথগণের কৈবর্ত্তভাব প্রমাণিত হয় কি? * * * অধ্যাপক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় যোগিসমাজের বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া অনেক স্থলে আন্তরিকতা ও অন্তর্দৃষ্টির অভাব এবং পল্লব গ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন'' (বঙ্গীয় যোগিসমাজের মর্ম্মস্থল, প্রাণ-স্পন্দন ও গতিবিধি)। দেখা যাইতেছে শাস্ত্রী মহাশয় অপূর্ব্ব পন্থায় শব্দগত অর্থ বিশ্লেষণ করিয়া জাতিনির্ণয় করিয়াছেন। যাহার নাম গজেন্দ্র তিনি বাস্তবিকই কি গজশ্রেষ্ঠ ঐরাবত? যাহার নাম পঞ্চানন তাঁহার কি বাস্তবিকই পাঁচ মুখ? শব্দার্থ ধরিয়া নামের সহিত জাতিকুলের তথ্য জড়িত থাকা আদৌ সম্ভবপর নহে।

[মৎস্যেন্দ্র (মীন) নাথ সম্বন্ধীয় অন্যান্য বিবরণ ৩য় এবং ৭ম অধ্যায়ে দেখুন]

যোগিগুরু গোরক্ষনাথ

সময়— সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি চারি যুগের চারিজন গোরক্ষনাথ

জন্ম ও নাম বিচার

অধ্যাপক অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন— "ভারতবর্ষে বিভিন্ন যুগে যে সকল অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া স্বকীয় সাধনার প্রভাবে ও মাধুর্য্যে সনাতন ভারতীয় সাধনার ধারাটিকে আভ্যন্তরীণ কলুষতা ও বিজাতীয় আক্রমণ হইতে মুক্ত করিয়া ক্রমশঃ অধিকতর নির্ম্মল, গভীর, প্রশস্ত, শক্তিসম্পন্ন ও মাধুর্য্যমণ্ডিত করিয়া দিয়াছেন যোগিগুরু গোরক্ষনাথ তাঁহাদের অন্যতম। হিমালয়ের দুর্গম পার্ব্বত্য অঞ্চলসমূহ হইতে আরম্ভ করিয়া সুদূর রামেশ্বর সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত, এবং বঙ্গদেশের পূর্ব্ব প্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া কাশ্মীরের পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র সকল শ্রেণীর মধ্যে গোরক্ষনাথের অলৌকিক প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। * * * তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র সমগ্র ভারতব্যাপী। কেবল ভারত নয়, তিব্বত, আফগানিস্থান, বেলুচিস্থান, পিনাং প্রভৃতি বহু স্থানে তাঁহার প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। বুদ্ধের পর একমাত্র শঙ্করাচার্য্য ভিন্ন সমগ্র ভারতে এরূপ প্রভাব বিস্তার আর কোন মহাপুরুষ করিয়াছেন কি না সন্দেহ। শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় তিনিও শিবের অবতার বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছেন। উভয় মহাপুরুষই বৌদ্ধধর্ম্মের পতনের সময়, এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনরুত্থানের পূর্ব্বে ভারতীয় সনাতন ধর্ম্মের সুসংস্কৃত তত্ত্ব ও ভাবসকল প্রচার করিবার জন্য, এবং হিন্দু সমাজকে উদার, সার্ব্বজনীন নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। উভয়ের প্রচারিত ধর্ম্মের উপরই বৌদ্ধপ্রভাব বিদ্যমান, উভয়েই বৌদ্ধধর্ম্মের নাস্তিকভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া আস্তিকতার বিজয়পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন। উভয়েই সনাতন হিন্দুধর্ম্মের আস্তিক ভাব ও আচারের সহিত বুদ্ধপ্রচারিত উদার নীতির সামঞ্জস্য করিয়া ভারতীয় বৌদ্ধ সমাজকে

হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতে, এবং হিন্দুসমাজকে নূতনভাবে গঠিত করিয়া তুলিতে অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন।'

(পল্লীশ্রী— ২য় সংখ্যা, ১৩৩১ বাং)

সাহিত্যাচার্য্য দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের অনুমান গুরু গোরক্ষ নাথ পাঞ্জাবের জলন্ধর নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। অন্য প্রবাদ অনুসারে তিনি গোদাবরী প্রদেশের অন্তর্গত চন্দ্রগিরি নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম সুরথ, ইনি বশিষ্টগোত্রজ ব্রাহ্মণ, এবং তাঁহার মাতার নাম সরস্বতী দেবী। গোরক্ষ নাথের মাতা গুরু মৎস্যেন্দ্র নাথের কৃপাপাত্রী ছিলেন, এবং মৎস্যেন্দ্র নাথের কৃপাতেই গোরক্ষরত্ন লাভ করিয়াছিলেন। গোরক্ষ নাথ যৌবনের প্রারম্ভেই নাথপন্থার ধর্ম্মনায়ক মৎস্যেন্দ্র নাথের নিকট যোগে দীক্ষিত হইয়া যোগীবেশ ধারণ করতঃ তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন। ইহাই সেন মহাশয়ের বক্তব্যের মোটামুটী মর্ম্ম। (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য)

অধ্যাপক অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন— "গোরক্ষ নাথের জন্ম সম্বন্ধে একটি কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। মহারাষ্ট্রীয় ভাষার 'নবনাথ ভক্তিসার' নামক গ্রন্থে ইহা লিখিত আছে বলিয়া শুনিয়াছি। মৎস্যেন্দ্র নাথজী এক দিন এক রমণীর নিকট ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। রমণী তাঁহাকে একজন মহাতেজস্বী সাধু বুঝিতে পারিয়া ভিক্ষাদানান্তে তাঁহার নিকট পুত্রবর প্রার্থনা করিলেন। মৎস্যেন্দ্র নাথজী কৃপাপরবশ হইয়া তাঁহাকে কিছু বিভূতি প্রদান করিলেন এবং বলিলেন যে এই বিভূতি সেবন করিলে যথাসময়ে তাঁহার পুত্ররত্ন লাভ হইবে। মহাপুরুষ বিদায় হইলে পর অন্যান্য রমণীগণ এ সম্বন্ধে তাঁহাকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতে থাকে। তাহাতে উত্ত্যক্তা হইয়া রমণী ঐ বিভূতি প্রসাদ ভক্ষণ না করিয়া গোরক্ষাতে (গোবরের আবর্জ্জনা প্রভৃতি ফেলিবার স্থানে) নিক্ষেপ করেন। বার বৎসর পর মৎস্যেন্দ্র নাথজী পুনরায় আগমন পূর্ব্বক ঐ রমণীর নিকট ভিক্ষা চাহিলেন। রমণী ভিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইলে তিনি জিজ্ঞাসা

করিলেন— "তোমার পুত্র কোথায়?" বিভূতি সেবন করা হয় নাই শ্রবণ করিয়া তিনি বলিলেন— "আমার সেই সিদ্ধ বিভূতি নিশ্চয়ই পুত্ররত্ন প্রসব করিয়াছে, যেখানে সেই বিভূতি রক্ষা করিয়াছিলে, সেখানে চল।" সেখানে উপস্থিত হইয়া মৎস্যেন্দ্র নাথজী আহ্বান করিলেন এবং দ্বাদশ বৎসর বয়স্ক বালক গোরক্ষা হইতে উঠিয়া আসিয়া মৎস্যেন্দ্র নাথের নিকট দণ্ডায়মান হইলেন। ঐ গোরক্ষা হইতেই তাঁহার নাম গোরক্ষ নাথ হয়। তিনি তখন মৎস্যেন্দ্র নাথের সঙ্গে প্রস্থান করিলেন। এই কিম্বদন্তী হইতেও ইহাই অনুমান হয় যে গোরক্ষ নাথের মাতা মৎস্যেন্দ্র নাথের কৃপায়ই তাঁহাকে লাভ করিয়াছিলেন, এবং তিনি যৌবনারম্ভেই মৎস্যেন্দ্র নাথের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া গৃহত্যাগ করেন। তাঁহার নামকরণ সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন যে তিনি বাল্যকাল হইতে গোসেবাতে অত্যধিক প্রীতিযুক্ত ছিলেন বলিয়া তিনি গোরক্ষনাথ নামে অভিহিত হইয়াছিলেন।" (পল্লীশ্রী— ২য় সংখ্যা, ১৩৩১ বাং)

'Gorakhnath and Mediaval Hindu Mysticism' নামক গ্রন্থে গোরক্ষ নাথের জন্ম সম্বন্ধে কতক বিবরণ পাওয়া যায়। সেগুলি নিম্নে সঙ্কলিত হইল।

(১) কনফট যোগীদের মতে গোরক্ষ নাথের জন্মস্থান ঝিলাম জিলার টীল্লা নামক প্রাচীন পীঠস্থানে (২২ ও ২৩ পৃঃ)। (২) বাবা রতন নাথের শিষ্য সম্প্রদায়ের মতে পেশোয়ারই গোরক্ষ নাথের জন্মস্থান (২২ ও ২৩ পৃঃ)। (৩) পাঞ্জাবের রাওলপিণ্ডি জিলায় গোরক্ষপুর নামে একটী গ্রাম ও পীঠস্থান আছে। কাহারও কাহারও মতে উহাই গোরক্ষ নাথের জন্মস্থান (২২পৃঃ)। (৪) আবার কাহারও কাহারও মতে পাঞ্জাবের অনেকগুলি পাহাড় গোরক্ষ নাথের জন্মস্থান বলিয়া অভিহিত হয়, যথা— কাঙ্‌রা পাহাড়, চম্বা রাজ্য, গুরুদাসপুর ও হোসিয়ারপুর প্রভৃতি (৭৩ পৃঃ)। (৫) চন্দ্রনাথ নামক একজন আধুনিক পণ্ডিত মনে করেন গোদাবরী তীরস্থ চন্দ্রগিরি নামক স্থানে গোরক্ষ নাথের জন্ম হয়, এবং

তিনি ৩৯৪ খৃঃ অব্দে তিরোহিত হন (২৩ পৃঃ)। 'যোগী সম্প্রদায়াবিষ্কৃতি' নামক পশ্চিমা ভাষার গ্রন্থেও এই মত সমর্থিত হইয়াছে। (৬) অধ্যাপক ডাঃ মোহন সিংহ বলেন, গোরক্ষ নাথের তিরোধান ও সমাধিস্থান দুইই অপরিজ্ঞাত (২৪ পৃঃ)। (৭) আবার প্রথমোক্ত গ্রন্থের ৮০ পৃষ্ঠায় দেখা যায়— "His tomb is in the Punjab" অর্থাৎ পাঞ্জাবে গোরক্ষ নাথের সমাধিস্থান আছে। ডক্টর কল্যাণী মল্লিক বলেন পাঞ্জাবের ঝিলমের ২৫ মাইল দূরস্থিত গোরক্ষটীলায় গোরক্ষ নাথ দেহরক্ষা করেন বলিয়া প্রবাদ আছে (নাথপন্থ—১৭ পৃঃ)। (৮) ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, মিঃ সি, আর ষ্টুলপনগ্যাল সাহেব, স্যার জর্জ্জ গ্রিয়ারসন সাহেব এবং এল, পি টেসিণ্টরি সাহেব প্রমুখ দেশ-বিদেশের পণ্ডিতগণের মতে পাঞ্জাবের কোথাও গোরক্ষ নাথের জন্ম হইয়াছিল। (History of the Bengali Language and Literature: The Sikhs. E. R. E. Vol. 12)। (৯) মিঃ জি, ডব্লিউ ব্রিগ্‌স্‌ সাহেব বলেন— "Gorakhnath originally came from Eastern Bengal" (Gorakhnath and Kanphata Yogies, Page 250)

অর্থাৎ গোরক্ষ নাথ মূলতঃ পূর্ব্ববঙ্গের লোক। (১০) মনিওর উইলিয়ামস সাহেব বলেন—"One Legend describes him (Gorakhnath) as born from lotus."

(Buddhism By Mr. Monior Williams, Page 193—194)

অর্থাৎ প্রবাদ আছে যে পদ্ম হইতেই গোরক্ষ নাথের জন্ম। অধ্যাপক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন— "গোরখ নাথ বা গোরক্ষ নাথ— যোগী বা নাথ সম্প্রদায়ের গুরু। অসংখ্য জনপ্রবাদ মিশাইয়া— ইহার জীবনকাহিনী জটিল হইয়া গিয়াছে। * * * জন্মস্থান জলন্ধর পাঞ্জাব। কানফাটা যোগীরা

* Encyclopaedia of Religion and Ethics. By Mr. Tessintory.

ইঁহার শিষ্য। * * * গোরখপুর প্রধান তীর্থ। সংস্কৃত ও হিন্দীতে বহু গ্রন্থ আছে।" (জ্ঞানভারতী—১ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, ৩৮০ পৃঃ)

অধ্যাপক অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—"নাথ সম্প্রদায়ের সাধুগণ গোরক্ষপুরই গোরক্ষ নাথের আদি সাধনক্ষেত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং বলেন যে বর্ত্তমানে গোরক্ষ নাথের যে আসনে নিত্য পূজার্চ্চনাদি হইয়া থাকে, সেই আসন তাঁহার তপস্যার সময় হইতেই সেখানে প্রতিষ্ঠিত আছে। গোরক্ষপুর সহর যে তাঁহারই নাম বহন করিতেছে তাহা বলাই বাহুল্য। অন্য প্রবাদ অনুসারে তাঁহার প্রথম তপস্যার স্থান বদরিকাশ্রম। মৎস্যেন্দ্র নাথ নবীন সন্ন্যাসী গোরক্ষ নাথকে লইয়া বদরিকাশ্রম গমনপূর্ব্বক সেখানে তাঁহাকে দ্বাদশ বর্ষব্যাপী কঠোর তপস্যায় নিয়োজিত করেন। সিদ্ধিলাভান্তে তিনি ধর্ম্মপ্রচারার্থে নেপাল প্রভৃতি স্থানে প্রেরিত হন" (পল্লীশ্রী—২য় সংখ্যা, ১৩৩১ বাং)। শ্রীসারদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—"এই গোরক্ষপুরে (গোরখপুরে) গোরক্ষ নাথের আসন প্রতিষ্ঠিত আছে। ত্রেতাযুগ হইতে এই আসন প্রতিষ্ঠিত। এই মন্দিরও ত্রেতাযুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে কি না জিজ্ঞাসা করাতে বাবা (গম্ভীর নাথজী) বলিলেন 'না'; কিন্তু আসন ঠিকই আছে। সম্রাট আলাউদ্দিন খিলিজির সময় একবার, এবং সম্রাট আরঙ্গজেবের সময় আর একবার এই স্থানের মন্দির ধ্বংস করা হইয়াছিল; কিন্তু এই সময়ও আসন রক্ষিত হয়। পরে বুদ্ধ নাথ বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মাণ করেন" (ভারতবর্ষ—বৈশাখ, ১৩২৫ বাং)। আলাউদ্দিন খিলিজির রাজত্বকাল—১২৯৬ হইতে ১৩১৩ খৃঃ অব্দ, এবং আরঙ্গজেবের রাজত্বকাল ১৬৫৮ হইতে ১৭০৭ খৃঃ অব্দ।

এই সব অভিমত ধীরভাবে বিচার করিলে মনে হয় পাঞ্জাব প্রদেশই গোরক্ষ নাথের জন্মভূমি। পাঞ্জাবের কোন্ স্থানে তাঁহার জন্ম হইয়াছে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। পেশোয়ারে গোরক্ষক্ষেত্র নামে একটী স্থান আছে। আবুলফজলের আইন-আকবরীতে ও কর্ণেল টড সাহেবের রাজস্থানে

গোরক্ষক্ষেত্রের উল্লেখ আছে। উইলসন সাহেবও তাঁহার গ্রন্থে এ স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন। জনসাধারণ আজিও শ্রদ্ধার সহিত এখানে পূজা দিয়া থাকেন। ইহা অথবা জালন্ধর তাঁহার জন্মভূমি ও যুক্ত প্রদেশের গোরক্ষপুর তাঁহার আদি সাধনক্ষেত্র বলিয়া অনুমিত হয় এবং পাঞ্জাবের ঝিলমের গোরক্ষ-টীলায় তিনি দেহরক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়াও অনুমিত হয়।

গোরক্ষ নাথের সময়বিচার

পাঞ্জাবে "গোরক্ষ নাথ-চরিত" নামক একখানি বহি প্রচলিত আছে। ইহাতে লেখা আছে যে, চারি যুগের চারি জন গোরক্ষনাথ আভির্ভূত হইয়াছিলেন। সত্যযুগের গোরক্ষ নাথ পাঞ্জাবে, ত্রেতাযুগের গোরক্ষ নাথ গোরক্ষপুরে, দ্বাপরের গোরক্ষ নাথ হর্মুজে ও কলির গোরক্ষ নাথ গুজরাটে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন (গোরক্ষ নাথ-চরিত)। এ সম্বন্ধে আরও প্রমাণ আছে— ।

"He (Gorakshanath) is said to have lived in the Punjab at Peshauar beyond Lahore in the Satya (Kritha) Yuga ; at Gorakshapur in the Treta Yuga ; at Hurmuj beyond Dwaraka in the Dwapara Yuga ; and at Gorakshamari (Gorakshamandi) in Kathiawar in the Kali Yuga.', (Gorakshanath and the Kan-phata Yogis—Page 228 By Mr. G. W. Briggs) M. Martin's History, Antiquities etc. Vol. 2. Page 484, G. A. Grierson's article "Gorakshanath" in E. R. E. Vol. VI)। এ গুলিতেও এ সম্বন্ধীয় বিবরণ আছে। নেপালী প্রবাদ অনুসারেও গোরক্ষ নাথ সত্যযুগে পাঞ্জাবে আবির্ভূত হইয়াছিলেন (E. R. E. Vol. 12)। অধ্যাপক অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—"গোরক্ষ নাথের সম্প্রদায়ভুক্ত সাধুগণের মধ্যে একটি প্রবাদ আছে যে তিনি ত্রেতাযুগে বর্ত্তমান ছিলেন এবং রামচন্দ্র তাঁহার নিকট যোগ সম্বন্ধীয় উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।" (পল্লীশ্রী—২য় সংখ্যা, ১৩৩১ বাং, যোগীগুরু গোরক্ষ নাথ)। অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ বলেন—"নেপালের তরাই এ একটি

প্রবাদ আছে—যুধিষ্ঠির পঞ্চ ভ্রাতার সঙ্গে যখন মহাপ্রস্থান করিতেছিলেন তখন সকলেই মরিয়া যান, কেবল ভীম জীবিত থাকেন। তাঁহাকে গোরক্ষ নাথ রক্ষা করেন ও নেপালের রাজা করেন।"

(Grierson, Page 138 ও প্রবাসী— চৈত্র, ১৩২৮ বাং, নাথপন্থ)

বুদ্ধদেব গোরক্ষপুর জিলার কপিলাবাস্তু নগরে (৫৬৩ খৃঃ পূর্ব্ব হইতে ৪৮৩ খৃঃ পূর্ব্ব) আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্ব্বেই এ সব অঞ্চলে গোরক্ষ নাথের শৈবধর্ম্মের প্রভাব ছিল। গোরক্ষ নাথের নামানুসারে গোরক্ষপুরের নামকরণ হইয়াছে, সে সম্বন্ধে মতভেদ নাই। বৌদ্ধধর্ম্ম শাস্ত্র সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীকের চতুর্বিংশতি অধ্যায়ে এবং ইহার পরবর্ত্তী ধর্ম্মশাস্ত্র কারণ্ডব্যূহেও দেখা যায় বুদ্ধদেব মীননাথের স্তব করিতেছেন। মীননাথের শিষ্য গোরক্ষ নাথ। তাহা হইলে বলিতে হয় বুদ্ধদেবের পূর্ব্বে গোরক্ষ নাথ আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

কানিংহাম সাহেব বলেন, পাঞ্জাবে গোরক্ষ নাথকি টীল্লা বা যোগী টীল্লা বা বাল নাথকী টীল্লা নামক একটি পাহাড় আছে। এই পাহাড়ের শীর্ষদেশে বাল নাথের মন্দির আছে। সকল ঐতিহাসিকই ইহাকে অতি প্রাচীন মন্দির বলিয়া স্বীকার করেন। আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ (৩২৭—৩২৫ খৃঃ পূঃ) সময়েও এই মন্দির বিদ্যমান ছিল। কখন ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা কেহ বলিতে পারেন না। (Archaeological Survey of India. Vol. 2, Page 178, By Cunningham) যাহা হউক এ সম্বন্ধীয় বিচারে খৃষ্টের জন্মের মোটামুটী তিন বৎসর পূর্ব্বে গোরক্ষ নাথ বিদ্যমান ছিলেন বলিতে হয়।

রাজা ভর্ত্তৃহরি গুরু গোরক্ষ নাথের শিষ্য ছিলেন এবং নাথ সম্প্রদায়ের একটী শাখাও ভর্ত্তৃহরি কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ভর্ত্তৃহরি রাজা বিক্রমাদিত্যের ভ্রাতা বলিয়া প্রবাদ আছে। বিক্রমাদিত্য হইতে বিক্রমসংবৎ গণিত হয়। এতদনুসারে গোরক্ষ নাথকে খৃঃ পূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীর লোক বলিয়া স্বীকার করিতে

হয় (যোগীগুরু গোরক্ষ নাথ—পল্লীশ্রী, ২য় সংখ্যা, ১৩৩১ বাং) যোগীরাজ গম্ভীর নাথ প্রসঙ্গ, ১ম সংস্করণ, ৬ পৃষ্ঠা)।

পাশ্চাত্য জগতের গুরু যীশুখ্রীষ্ট এসিয়া মাইনরের জেরুজালেমে জন্মগ্রহণ করেন। এসিয়ার পশ্চিমাংশে এবং ইউরোপের পূর্ব্বাংশে এক সময় হিন্দু (শৈব) ধর্ম্মের প্রাবল্য ছিল। প্রবাদ আছে যে যীশুখ্রীষ্ট গোরক্ষ নাথের নিকট যোগধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া যোগাভ্যাস করেন এবং নেপাল, তিব্বত, ও ভারতের পুণা, কোকনদ, কাশী, তমলুক প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করেন (১)। নিম্নের বিবরণ দ্বারাও উক্ত প্রবাদ সমর্থিত হয়।

শ্রীসুরথকুমার কাব্যবিনোদ বলেন— "খ্রীষ্টীয় সাহিত্যে যীশুখ্রীষ্টের সম্পূর্ণ জীবনী পাওয়া যায় না। যীশুখ্রীষ্টের পুনরুত্থান এবং তৎপরবর্ত্তী ঘটনাও তাহারা এক প্রকার ভৌতিক গল্পের মধ্য দিয়া শেষ করিয়াছেন। কিন্তু কয়েকখানি দুষ্প্রাপ্য হিন্দু ও বৌদ্ধশাস্ত্র গ্রন্থ দেখিলে, এবং ভারতীয় নাথযোগী সম্প্রদায় সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে যীশুখ্রীষ্ট পূর্ব্বোক্ত সপ্তদশ বর্ষকাল ভারতে কাটাইয়াছিলেন, এবং পুনরুত্থানের পরে তিনি ভারতবর্ষে আগমন করিয়া নাথযোগী সম্প্রদায়ের বিশেষ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন।

Arthur Lillie তাঁহার "India in Primitive Christianity" গ্রন্থে ইহাদের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"Jesus was an Essene, and the Essene, like the Indian Yogi, sought to obtain divine union and the gifts of the spirit by solitary reverie in retiredspots."

(Page 200 cf. ধ্যান করবে মনে, কোণে ও বনে)

এই Essene শব্দটী ঈশানী (ঈশান বা শিবের সাধক) শব্দের বৈদেশিক উচ্চারণ ভেদ মাত্র। ইহাদের সাধনপদ্ধতি এবং ভারতীয় নাথযোগী সম্প্রদায়ের

(১) ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী কৃত 'যোগীবর ও তদীয় সমাচার' (ইংরাজী) ৩ ও ৩৭ পৃঃ এবং তাহার বাঙ্গালা রচনাবলীর ১ম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

সাধনপদ্ধতি অভিন্ন ছিল। জন দি ব্যাপ্‌টিষ্ট (John the Baptist) Essene সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন এবং তাঁহার নাম যোগী সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের নামের সহিত এমন কি এই বাঙ্গালাদেশেও গীত হইতে দেখা যায়।

বিন্ধ্যাচলের দুর্গম পার্ব্বত্য অঞ্চলে "নাথযোগী" সম্প্রদায়ের এক শ্রেণীর সাধু আছেন। তাঁহাদের কাহারও কাহারও নিকটে "নাথ নামাবলী" নামক একখানি পুঁথি আছে। এই পুঁথিতে দেখা যায় যে যীশুখ্রীষ্ট চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে ভারতে আগমন করেন এবং দীর্ঘ ষোড়শ বর্ষকাল সাধনা করিয়া শিবের দর্শন পান। তৎপর তিনি স্বদেশে যাইয়া তাঁহার স্বদেশবাসীর মধ্যে ঈশ্বরের মহিমা প্রচার করেন। কিন্তু তাঁহার স্বদেশবাসীর মধ্যে অনেকেই তামস প্রকৃতির ছিল বলিয়া তাঁহারা এই জ্ঞানের আলোক সহ্য করিতে পারিল না, এবং ঈশাই নাথের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহার হস্তপদে কীলক প্রোথিত করিয়া নির্য্যাতন করিল। ঈশ্বরদ্রষ্টা ঈশাই নাথ ত্রিলোকের কল্যাণকামনায় যোগবলে সমাধি মগ্ন হইলেন। পাষণ্ডগণ তখন তাঁহাকে মৃত মনে করিয়া ভূমধ্যে প্রোথিত করিয়া ফেলিল। ঈশাই নাথকে কাষ্ঠ ফলকের উপরে যখন কীলকবদ্ধ করা হয়, তখন তাঁহার অন্তরঙ্গ মহাপুরুষ চেতন নাথ হিমালয়ের পাদদেশে ধ্যানমগ্ন ছিলেন। তিনি ধ্যানযোগে ঈশাই নাথের যন্ত্রণা হৃদয়ঙ্গম করিয়া স্বদেহকে অপঞ্চীভূত করিলেন ও তিন দিনের মধ্যে তিন মাসের পথ উত্তীর্ণ হইয়া ঈসরাইলদের দেশে উপনীত হইলেন। এখানে আসিয়া তিনি বনের মধ্যে স্বরূপে প্রকট হইলেন। এই সময়ে অত্যন্ত দুর্য্যোগ হওয়ায় এবং ইন্দ্রাদি ক্রুদ্ধ হওয়ায় ঝড়বৃষ্টি ও বজ্রপাতে জগৎ কম্পমান হইতেছিল। তিনি উহা অগ্রাহ্য করিয়া ঈশাই নাথের দেহ ভূমধ্য হইতে উত্তোলন করিলেন এবং তাঁহার সমাধি ভঙ্গ করিলেন। তৎপর উভয়ে পবিত্র আর্য্যভূমিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া হিমালয়ের পাদদেশে মঠ স্থাপন করিলেন। এখানে তিন বৎসর সাধনা করিবার পরে পরম কারুণিক শঙ্কর তাঁহাকে পুনরায় দর্শন দেন এবং তাঁহার

দ্বারা জগতে সৃষ্টিরহস্য প্রকাশ করিবার ইচ্ছা করেন। তদনুসারে ঈশাই নাথ শঙ্করীর যোনিপীঠের উপরে শঙ্করের জ্ঞান, শক্তি ও বীজরূপী ত্রিশূল স্থাপিত করিয়া যোনিলিঙ্গ শিবপূজার প্রবর্ত্তন করেন। তখন নানা দিগ্‌দেশ হইতে সাধুগণ আসিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিতে লাগিলেন। তিনি ৪৯ বৎসর বয়সে তাঁহার কর্ম্মজীবন হইতে অবসর গ্রহণের মানসে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শীর্ষমঠে যোগাসনে বসিয়া দেহত্যাগ করেন। (এই পুঁথিখানির কিয়দংশ পূজ্যপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ও দেখিয়াছিলেন, প্রবাসী— ১৩৩৩ বাং সত্তর বৎসর প্রবন্ধ, ৪৯৭ পৃঃ) "নাথ নামাবলী" অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ হইলেও উহা অপ্রাপ্য নহে। নাথযোগী সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীগণের নিকটে চেষ্টা করিলে মিলিতে পারে। যীশুখ্রীষ্টের উপরোক্ত কাহিনী ছাড়া এই গ্রন্থে আরও ১৭ জন নাথ সম্প্রদায়ের মহাপুরুষের কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে।

যীশুখৃষ্ট যে ভারতে হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন তাহা ভবিষ্য পুরাণের নিম্নলিখিত শ্লোকটী হইতেও আমরা বুঝিতে পারি :—

"ঈশমূর্ত্তি হৃদি প্রাপ্তা নিত্যশুদ্ধা শিবঙ্করী।
ঈশা মসীহ ইতিচ মম নামে প্রতিষ্ঠিতম্॥"

বঙ্গদেশীয় যোগিসম্প্রদায়ের সাধুগণ "যোগীর গান" নামক এক প্রকার গান গাহিয়া থাকে। এই যোগীর গান অধুনা লোপ পাইতে বসিলেও এখনও রাজসাহী বিভাগের কোন কোন স্থানে বর্ত্তমান আছে। গানগুলি মুসলমান ও হিন্দুগণ কর্ত্তৃক গীত হইয়া থাকে। ইহারই কোন গানের দুই পদে আমরা "যীশুখ্রীষ্ট" ও তাঁহার গুরু জন দি ব্যাপটিষ্টের ভারতে আগমনের ইঙ্গিত পাই।—

"(আবে)" কোন দ্যাশেতে ঈশাই গেল
ফিরল' কবে ?
কয়ে গেল জন ?

(আরে) কুনঠি গেল যোগীর যোগী
কয়রে তোর মন ?
(আরে) আরোব ত্থাশেৎ ঈশেই গেল,
ফিরলো মরি্য
মিশর ত্থাশেৎ জন,
(আরে) ঈশেই আমার গুরুর গুরু—
যোগীর যোগেই থাকে মন।"

এই গীতের "ঈশাই নাথ" যে যীশুখ্রীষ্ট এবং "জন" যে John the Baptist তাহা গীতটী হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়। যীশুখৃষ্ট নাথযোগী সম্প্রদায়ের কোনরূপ সংশ্রবে না থাকিলে কোনও প্রকারেই তিনি পল্লীগীতির মধ্যে গায়েনের বা যোগীর "গুরুর গুরু" হইয়া বসিতে পারিতেন না। 'নাথ নামাবলী'তেও তাঁহার যে পরিচয় পাই তাহা আমাদের স্বপক্ষে যায়। "The unknown Life of Jesus" গ্রন্থে তাঁহার অজ্ঞাতবাসের যে পরিচয় পাই তাহাও যীশুখ্রীষ্টের "নাথযোগী" সম্প্রদায়ের পরিপুষ্টি সাধনের কথা অস্বীকার করে না, বরং তাহা হইতে আমরা বলিতে পারি যে তিনি এত উচ্চাবস্থার যোগী ছিলেন যে তাঁহাকে সকল সম্প্রদায়ই নিজ নিজ দলভুক্ত করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন।"

(বিচিত্রা— পৌষ, ১৩৪২ বাং, যীশুখ্রীষ্টের ভারতে আগমন ও হিন্দুধর্ম্ম প্রচার)

রাষ্ট্রনেতা বিপিনচন্দ্র পাল বলেন—"পূজ্যপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের মুখে একদিন শুনিয়াছিলাম যে, তিনি একবার একদল যোগী সন্ন্যাসীদিগের সঙ্গে আরাবল্লী পর্ব্বতে গিয়াছিলেন। এই সম্প্রদায়ের যোগীদের নাথ উপাধি ছিল। ইহারা নাথযোগী বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিতেন। ইহাদের সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকদিগের মধ্যে ঈশাই নাথ নামে এক মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁহার জীবনী এই নাথযোগীদের ধর্ম্মপুস্তকে লেখা আছে। গোস্বামী মহাশয়কে একজন নাথযোগী তাঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে ঈশাই নাথের জীবনচরিত পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয়ানদের

বাইবেলে যীশুখৃষ্টের জীবনচরিত্র যে ভাবে পাওয়া যায় তাহাতে দ্বাদশ হইতে ত্রিংশ বর্ষ পর্য্যন্ত এই আঠার বৎসরের যীশুর জীবনের কোন খোঁজ খবর মিলে না। কেহ কেহ অনুমান করেন যে এই সময়ের মধ্যে যীশু ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন এবং তিনিই নাথযোগী সম্প্রদায়ের এই ঈশাই নাথ" প্রবাসী—১৩৩৩ বাং, ৪৯৭ পৃঃ, সত্তর বৎসর)। স্বামী অভেদানন্দজীর 'তিব্বতে ও কাশ্মীরে' এবং India and her people" নামক গ্রন্থে এ সম্বন্ধীয় যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহাতেও উক্ত মত সমর্থিত হয়। আরও দেখা যায়—"Ereneet Reman says "Jesus resembled the Guru (spiritual master of Brahmanism). In fact, he asks, might there not in this be a remote influence of the Yogies." (Holy Saints of India)

অর্থাৎ যীশু ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মনায়কদের সমতুল্য। ইহাতে বস্তুতঃ যোগীদের পরোক্ষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

ত্রিপুরার ইতিহাসে আছে—"খৃষ্টের জন্মভূমি পেলেষ্টাইনে Essene নামক এক সম্প্রদায় যীশুখৃষ্টের পূর্ব্বেই বর্ত্তমান ছিল। ইহারা নাথযোগীদের ন্যায় যোগী সম্প্রদায় ছিল। যীশু এই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। যীশুখৃষ্ট সম্ভবতঃ নাথযোগী সম্প্রদায়ে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া উপাস্য দেবতার নামে ঈশাই নাথ আখ্যা পাইয়াছিলেন।" (২২৮-২২৯ পৃঃ)

দৈনিক অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে দেখা যায়—"There is the Hindu sect, the Nath Yogies, some of whom worship Jesus with the name of Isaye Nath as one of their own saints and teachers." (8th Sept., 1924)। অর্থাৎ হিন্দুজাতির অন্তর্ভুক্ত নাথযোগি সম্প্রদায়ের কেহ কেহ যীশুখৃষ্টকে তাঁহাদের সম্প্রদায়ের ঈশাই নাথ নামে একজন মহাপুরুষ ও প্রচারক বলিয়া পূজা করেন।

খৃষ্টের দশ আজ্ঞা (Ten Commandments) মধ্যে যে দশবিধ পাপ হইতে

বিরত থাকার কথা আছে, তাহা ভাষার পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া অল্পাধিক পরিমাণে যোগীদের অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, অপরিগ্রহ, শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধান এই দশ প্রকার যম ও নিয়মের নামান্তর মাত্র। শ্রীকৃষ্ণের দ্বাদশ রাখাল ও খৃষ্টের 12 Apostles প্রায় একই ধরণের (on Mount Caucassus এবং White Sea (J. R. S. B.)। খৃষ্টধর্ম্মের ত্যাগী সাধুদেরে সেইণ্ট (Saint) বলে। সেইণ্ট শব্দ সন্ত— সৎ (অর্থাৎ সাধু) শব্দের অনুরূপ। যাঁহারা মঠে বাস করেন তাঁহাদিগকে মঙ্ক (Monk) বলে। তাঁহাদের জীবনযাপন প্রণালী অনেকটা হঠযোগীদের মত। সুতরাং গোরক্ষ নাথের নিকট যীশুর যোগধর্ম্মে দীক্ষা, যোগাভ্যাস ও নাথ উপাধি গ্রহণের মূলে সত্য আছে। তাহা হইলে ১ম খৃঃ অব্দেও গোরক্ষ নাথ বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়।

আমরা ২য় অধ্যায়ে দেখাইয়াছি যে নাথধর্ম্মের উদ্ভবকাল সম্ভবতঃ ১ম কি ২য় খৃঃ অব্দ এবং গুরু গোরক্ষ নাথ শৈবধর্ম্মকে নাথধর্ম্মে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন। তাহা হইলে ২য় খৃঃ অব্দেও গোরক্ষ নাথ বিদ্যমান ছিলেন।

রাইট সাহেব বলেন নেপালের রাজা বলদেব বা বরদেবের সময় ৫ম বা ৬ষ্ঠ খৃঃ অব্দে গোরক্ষ নাথ নেপালে ছিলেন। কেহ কেহ বলেন বলদেব ৪২২ খৃঃ অব্দে নেপালের রাজা হইয়াছিলেন (নেপালের ইতিহাস— ১৪০ হইতে ১৪৫ পৃঃ)। মীন নাথ ৫২২ খৃঃ অব্দে নেপালে গিয়াছিলেন। নেপালীদের মধ্যে প্রবাদ আছে যে মীন নাথের সন্ধানে গোরক্ষ নাথও তথায় গিয়াছিলেন (১)।

সন্ন্যাসী বাবা চরণ নাথ সাধু বলেন, প্রবাদ আছে ইসলাম ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদকে (৫৭০—৬৩২) গোরক্ষ নাথ যোগধর্ম্মের উপদেশ দিয়াছিলেন (যোগিসখা—মাঘ, ১৩৩৩ বাং)। মুসলমান ধর্ম্মের বিখ্যাত সুফিধর্ম্ম (Supism) গোরক্ষ নাথের নিকট বিশেষভাবে ঋণী। এভাবে গোটা ইসলাম ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের

(১) ডাঃ শহীদুল্লাহর 'মীন নাথ ও কাহ্নুপা',—শনিবারের চিঠি, আশ্বিন, ১৩৫১ বাং।

নিকট ঋণী (Imperial Gazetter of India-Beluchistan Vol. VIII) তাহা হইলে বলিতে হয় ৬ষ্ঠ, ৭ম খৃঃ অব্দে গোরক্ষ নাথ বর্ত্তমান ছিলেন।

রাজা ভর্ত্তৃহরি ও গোরক্ষ নাথের সম্বন্ধের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কেহ কেহ ভর্ত্তৃহরিকে ৭ম খৃঃ অব্দের লোক মনে করেন। তাহা যদি সত্য হয় তবে ৭ম খৃঃ অব্দে গোরক্ষ নাথ বর্ত্তমান ছিলেন (যোগিগুরু গোরক্ষ নাথ—পল্লীশ্রী, ২য় সংখ্যা— ১৩৩১ বাং)। এ সম্বন্ধে আরও প্রমাণ আছে যে ৭ম শতকে নরেন্দ্র দেব নেপালের রাজা ছিলেন, সে সময় গোরক্ষ নাথ নেপালে ছিলেন (Sylvain Levi Le Nepali 347)। ৬ষ্ঠ কি সপ্তম খৃঃ অব্দে শালিবাহন রাজা ছিলেন, সে সময় গোরক্ষ নাথ পাঞ্জাবে ছিলেন (Romantic Tales from the Punjab, Page 412–441 By Charles Swynnerton)। তিব্বতীয় গ্রন্থমালার প্রমাণে রুশ দেশীয় পণ্ডিত Wasilief স্থির করিয়াছেন যে গোরক্ষ নাথ খৃষ্টের জন্মের আট শত বৎসরের পরবর্ত্তী ছিলেন।

(নাথপন্থ— প্রবাসী, ফাল্গুন, ১৩২৮ বাং)

অবধূত গীতা গোরক্ষ নাথ ও দত্তাত্রেয়ের কথোপকথনচ্ছলে লিখিত। মনিয়ার উলিয়ামস সাহেব দত্তাত্রেয়ের সময় ১০ম খৃঃ অব্দ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (Religious Thought and Life in India By Moniar Williams Page 267)। যদি এই কথোপকথনের মূলে সত্য থাকে তবে ১০ম খৃঃ অব্দেও গোরক্ষ নাথ বিদ্যমান ছিলেন বলিয়া ধরিয়া নিতে হয়।

ডক্টর কল্যাণী মল্লিক বলেন— "বিভিন্ন ঐতিহাসিক, নাথযোগীদের খৃষ্টীয় সপ্তম, অষ্টম শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীকাল মধ্যে বিভিন্ন যুগের বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন; অবশ্য পণ্ডিতমণ্ডলী অকারণে এ সকল সিদ্ধান্তে পৌছান নাই। তথাপি অধিকাংশের মতামত খণ্ডন করিয়া যে সকল কারণে আমি মৎস্যেন্দ্রকে দশম শতাব্দীর ও গোরক্ষ নাথকে একাদশ শতাব্দীর যোগী বলিয়া স্থির করিয়াছি তাহার বিবরণ দিতেছি—

১। 'কৌলজ্ঞান নির্ণয়' একাদশ শতাব্দীতে রচিত, লিপিতত্ত্ব হইতে ইহা বাগচী মহাশয় স্থির করিয়াছেন। অতএব মৎস্যেন্দ্রকে দশম শতাব্দীর যোগী বলিলে অন্যায় হয় না। 'কৌলজ্ঞান নির্ণয়ে' গোরক্ষ নাথের উল্লেখ মাত্র নাই। সুতরাং গোরক্ষ নাথ পরবর্ত্তীকালের। (১)

২। মহারাষ্ট্রের সুবিখ্যাত কবি ও রহস্যবাদী জ্ঞানেশ্বরের কাল সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণ স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন। ইহার জন্ম ১২৭৫ খৃষ্টাব্দে। জ্ঞানেশ্বর নাথযোগী ছিলেন। গোরক্ষ নাথ তাঁহার পরমগুরু ছিলেন। জ্ঞানেশ্বরের পূর্ব্বপুরুষদের সহিত গোরক্ষ নাথের যোগাযোগ বৃত্তান্ত সুবিদিত। নাথযোগীরা দীর্ঘজীবী হইতেন, এবং ভারতের সর্ব্বত্রই গমনাগমন করিতেন, অতএব গোরক্ষ-নাথের পশ্চিম ভারতে যাওয়া বিচিত্র নহে। জ্ঞানেশ্বরের গুরু নিবৃত্তি নাথ তাঁহার অগ্রজ ছিলেন এবং জ্ঞানেশ্বর অপেক্ষা মাত্র দুই বৎসরের জ্যেষ্ঠ ছিলেন। কিন্তু নিবৃত্তি নাথের ও তাহার পরমগুরু গোরক্ষ নাথের কালমধ্যে গুরু-শিষ্যে দীর্ঘ ব্যবধানের সম্বন্ধ ধরিয়া গোরক্ষ নাথের আবির্ভাবকাল আনুমানিক ১০৭৫ খৃষ্টাব্দ বা একাদশ শতাব্দী বলা যাইতে পারে। সে ক্ষেত্রে মৎস্যেন্দ্রের কাল দশম শতাব্দী ও 'কৌলজ্ঞান নির্ণয়' রচনার কাল একাদশ শতাব্দীর সামঞ্জস্য থাকে।

৩। অভিনব গুপ্ত রচিত 'তন্ত্রালোক' একটি সুবিখ্যাত তন্ত্রের গ্রন্থ। ইহা একাদশ শতাব্দীর প্রথমে রচিত হয়। এই গ্রন্থে 'মচ্ছেন্দ্র বিভু'কে নমস্কার জানানো হইয়াছে। অতএব 'তন্ত্রালোক' রচনার প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে সিদ্ধযোগীরূপে মৎস্যেন্দ্র নমস্কার পাইয়াছেন ধরিয়া লইলে মৎস্যেন্দ্রের কাল দশম শতাব্দী বলা যায়। ইহাতেও গোরক্ষের উল্লেখ নাই। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে 'কৌলজ্ঞানে' বৌদ্ধধর্ম্মের কোন কথা নাই, অতএব ইহা সম্পূর্ণরূপে শৈবতান্ত্রিক যোগীরচিত।

(১) গোরক্ষ নাথের গুরু মৎস্যেন্দ্র নাথ, ইহারা সমসাময়িক।

৪। 'গোরক্ষবোধ' গ্রন্থ নাথ সম্প্রদায়ের মধ্যে সুপ্রচলিত। সিং ও গ্রীয়ার্‌সনের মতে উহা একাদশ শতাব্দীতে রচিত। প্রচলিত অথচ নির্ভরযোগ্য তিনটি গ্রন্থ 'কৌলজ্ঞান নির্ণয়', 'তন্ত্রালোক' ও 'জ্ঞানেশ্বরীর' সমন্বয়-সাধন করিয়া মৎস্যেন্দ্র নাথকে দশম শতাব্দীর ও গোরক্ষ নাথকে একাদশ শতাব্দীর যোগী বলিয়া স্থির করিয়াছি। * * * * * নেপালের মুদ্রায় শ্রীগোরক্ষের নাম অঙ্কিত থাকে।" (নাথপন্থ)

N. Farquhar সাহেব বলেন গোরক্ষ নাথ ১২শ খৃঃ অব্দে তাঁহার সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন (An out-line of the Religious literature of India Page 254)। সাহিত্যাচার্য্য দীনেশচন্দ্র সেন বলেন— "গোরক্ষ নাথ মাণিকচন্দ্রের সমসাময়িক। কারণ তদীয় মহিষী তাঁহার শিষ্যা, সুতরাং তিনি একাদশ শতাব্দীর লোক। ইনি মীন নাথের শিষ্য। * * * গোরক্ষ নাথ নাথ সম্প্রদায়ের অন্যতম নেতা" (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য)। গোরক্ষ নাথ ধর্ম্ম নাথের সতীর্থ বলিয়া কচ্ছ প্রদেশের লোকের ধারণা। এই ধর্ম্ম নাথ বা ধরম নাথের শিষ্য গরীব নাথ জাঠদিগকে বিতাড়িত করিয়া বরার রাজ্যে রায়ধনকে (১১৭৫ খৃঃ অব্দ হইতে ১২২৫ খৃঃ অব্দ মধ্যে) সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন (Indian. Antiquary, Vol. VII, Page 298-300)। মহারাষ্ট্র দেশে শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতার মারাঠী ভাষায় বিশদ ভাষ্যসমন্বিত জ্ঞানেশ্বরী নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত হয়। মহাপুরুষ জ্ঞানেশ্বর ইহার রচয়িতা। জ্ঞানেশ্বর জ্ঞানদেব নামেও খ্যাত। জ্ঞানেশ্বরী রচনা ১১৯০ খৃঃ অব্দে হইয়াছে বলিয়া অনেকে মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। ইহাক্তে আছে জ্ঞানেশ্বর গোরক্ষ নাথ হইতে শিষ্য-পরম্পরায় চতুর্থ স্থান অধিকার করেন। এ বিচারে গোরক্ষ নাথকে এই সময়কার লোক বলিতে হয়।

Pro Gulstan Roy গোরক্ষ নাথকে ২৩শ খৃঃ অব্দের লোক বলিয়া মনে করেন। (Indian Social Reformer, June 2, 1934)

লেওনার্ড সাহেব বলেন— গোরক্ষ নাথ ধর্ম্ম নাথের সতীর্থ। এই ধর্ম্ম নাথ ১৪শ খৃঃ অব্দে কচ্ছদেশে যোগধর্ম্ম প্রচার করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। পশ্চিম ভারতের মতেও গোরক্ষ নাথ ১৪শ খৃঃ অব্দের লোক। রায়ধনের রাজত্ব লাভের বিবরণে দেখা গিয়াছে যে ধর্ম্ম নাথ ও গোরক্ষ নাথ ১২শ, ১৩শ খৃঃ অব্দের লোক। কিন্তু এখানে আবার তাঁহারা ১৪শ খৃঃ অব্দের লোক হইয়া পড়িয়াছেন। ইহাই উক্ত সাহেবের বক্তব্যের মোটামুটী মর্ম্ম (Indian Antiquary, Vol. VII, Page 298-300)। কানিংহাম সাহেব শিখ ইতিহাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে গোরক্ষ নাথ সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন চতুর্দ্দশ খৃঃ অব্দে গোরক্ষ নাথ পাঞ্জাবে যোগধর্ম্ম প্রচার করেন।

উত্তর ভারতের মতে গোরক্ষ নাথ কবীরের সমসাময়িক ও প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। (Religious Sects of Hindus, Vol. I, Page 213 By H. H. Wilson) কবীরের জনৈক শিষ্যপ্রণীত 'গোরক্ষ নাথজীকী গোষ্ঠী' নামক গ্রন্থে কবীরের সহিত গোরক্ষ নাথের কথোপকথনের প্রসঙ্গ আছে। শিখগুরু নানক তাঁহার 'প্রাণসংগলী' গ্রন্থে গোরক্ষ নাথ প্রমুখ নয় নাথের বন্দনা করিয়াছেন এবং নানক-গোরক্ষ সংবাদ গ্রন্থে গোরক্ষনাথের সহিত নানকের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় তর্কবিতর্কাত্মক প্রসঙ্গ আছে। কবীর ও নানক ১৫শ খৃঃ অব্দের লোক। এই বিচারে গোরক্ষ নাথও এ সময়কার লোক। কোন কোন গ্রন্থে নানক ও কবীরের নিকট গোরক্ষ নাথকে ছোট করিয়া দেখান হইয়াছে।

(Hindusthanee Rekhta Kavir By Capt. Price)

অধ্যাপক অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন— "যোগীশ্বর গোরক্ষ নাথ ঠিক কোন সময়ে ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন তাহা নিশ্চয় করিয়া কেহ বলিতে পারে না। কিন্তু খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষে উচ্চ ও নীচ সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই তাঁহার ব্যক্তিগত প্রভাব যে অক্ষুণ্ণ ছিল, তাহা নিশ্চয় করিয়াই বলা যায়। তাঁহার সম্প্রদায়ের বিস্তার ও প্রভাব এখনও

সমগ্র ভারতে অক্ষুন্নভাবে চলিতেছে। * * * এ কথা অসঙ্গত নয় যে বাস্তবিকই গোরক্ষ নাথ অমর; এখনও তাঁহার জীবন্ত প্রভাব ভারতের ধর্ম্ম-সাধনক্ষেত্রে সর্ব্বত্র অনুভূত হইতেছে। * * * * * যোগিরাজ গোরক্ষ নাথ কখন কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, আধুনিক ঐতিহাসিকগণ তাহা আবিষ্কার করিবার জন্য নানারূপ গবেষণার গহন বনে প্রবেশ করিয়াও এ পর্য্যন্ত কোন অকাট্য প্রমাণ লইয়া বাহির হইতে পারেন নাই। গোরক্ষ নাথের সম্প্রদায়ভুক্ত সাধুগণের মধ্যে একটি প্রবাদ আছে যে তিনি অমর এবং সূক্ষ্ম শরীরে এখনও বর্ত্তমান আছেন এবং লোকহিতার্থে নানাস্থানে বিচরণ করেন। কোন কোন ভাগ্যবান পুরুষ তাঁহার দর্শনও লাভ করেন। * * * কবীরের দোঁহায় এরূপ কথাও আছে যে, ব্যাস, গোরক্ষ প্রভৃতি মহাত্মাগণ কখন, কোথায়, কি ভাবে থাকেন তাহা কেহই বলিতে পারেন না। ইহাতে মনে হয় যে কবীরও তাঁহাকে বহুকাল প্রসিদ্ধ যোগৈশ্বর্য্যসম্পন্ন মহাপুরুষ বলিয়া জানিতেন এবং তিনি অলৌকিক শক্তিবলে সাধারণের অলক্ষিতভাবে বিচরণ করেন বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। কবীর হয়ত তাঁহার অলৌকিক দর্শনলাভও করিয়া থাকিতে পারেন। হঠযোগসিদ্ধ মহাপুরুষগণ ইচ্ছা করিলে যোগশক্তিবলে কয়েক শত বৎসরও জীবিত থাকিতে পারেন, ইহা অনেকেই জানেন। বর্ত্তমান যুগে শ্রীমৎ ত্রৈলিঙ্গস্বামী ইহার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

(যোগিগুরু গোরক্ষ নাথ—পল্লীশ্রী, ২য় সংখ্যা, ১৩৩১ বাং)

গোরক্ষ নাথ চরিতানুসারে চারি যুগের চারি জন গোরক্ষ নাথের মধ্যে যিনি পাঞ্জাবে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তিনিই সত্যযুগের গোরক্ষ নাথ। নেপালের ইতিহাসে লিখিত আছে যে কলিযুগ ৩৬২৩ বৎসর গতে (৫২২ খৃঃ অব্দে) মৎস্যেন্দ্র নাথ নেপাল গিয়াছিলেন। মৎস্যেন্দ্র নাথের সন্ধানে গোরক্ষ নাথও তথায় গিয়াছিলেন। মৎস্যেন্দ্র নাথের সময় নিঃসন্দেহে ৫২২ খৃঃ অব্দ। তাহা হইলে তাঁহার শিষ্য গোরক্ষ নাথের সময়ও নিঃসন্দেহে ৫২২ খৃঃ অব্দ। এ বিচারে অর্থাৎ কলি

যুগের গোরক্ষ নাথের সময় দাঁড়ায় ৫ম খৃঃ অব্দ হইতে ১৫শ খৃঃ অব্দ। গোরক্ষ নাথের সঠিক সময় নির্ণয় করা সত্যই কঠিন বোধ হইতেছে। এখন প্রশ্ন অনিবার্য্য যে, মানুষ কি মোটামুটী এক হাজার বৎসর বাঁচিয়া থাকিতে পারে? ত্রৈলিঙ্গস্বামী এই সেদিন অবশ্য যোগশক্তিবলে মোটামুটী তিন শত বৎসর জীবিত ছিলেন। কলিযুগের যোগেশ্বর গোরক্ষ নাথও কি তাহা হইলে যোগবলে হাজার বৎসর জীবিত ছিলেন?

যোগিগুরু গোরক্ষ নাথ ধর্ম্মজগতের একটি সমুজ্জ্বল নক্ষত্র। অতীতের গাঢ় তিমির ভেদ করিয়া তাঁহার অনুবর্ত্তিত আদর্শ ও প্রচারিত ধর্ম্মের আলোকরশ্মি আজও লক্ষ লক্ষ নরনারীকে ধর্ম্মজীবনের পথের সন্ধানে বিশেষ সহায়তা করিতেছে। গোরক্ষ নাথ ভারতে ও ভারতের বাহিরে অদ্যাপি নানাভাবে পূজিত ও সম্মানিত হইতেছেন। এই মহাপুরুষের আবির্ভাব, তিরোভাব ও কর্ম্মজীবনের সঠিক সময় নিরূপণ করা দুরূহ। প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকগণের তর্কযুক্তির জাল ভেদ করিয়া তাহার সঠিক সময় নির্ণয় করা কঠিন। ইহার প্রধান কারণ এই— প্রাচীন ভারতের মহাপুরুষগণ তাঁহাদের আত্মচরিত রাখিয়া যান নাই এবং এ দেশে ধারাবাহিকভাবে ইতিহাস লিখিবার বা রক্ষা করিবার রীতি প্রচলিত ছিল না। এই জন্য ভারতের সুদূর অতীতের ইতিহাস দুষ্প্রাপ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তা'ছাড়া ধর্ম্মজগতের এতদ্দেশীয় মহাপুরুষগণ কখনও আত্মপ্রকাশ করিতে চাহিতেন না। তাঁহারা বিশ্বহিতে অনুপ্রাণিত হইয়া প্রায়ই আত্মগোপন করিয়া তাঁহাদের আদর্শ ও ধর্ম্মমত প্রচার করিয়া যাইতেন। এমত অবস্থায় তাঁহাদের সময় নির্ণয় করা শুধু কঠিন নহে, কোন কোন ক্ষেত্রে অসম্ভব বলিলেও চলে। প্রাচীন মুদ্রা, শিলালিপি, পুরাতন পুঁথি ও অন্যান্য উপাদান সংগ্রহ করিয়া— অথবা মহাপুরুষগণের লিখিত কাব্য-সাহিত্যে— বা তাঁহাদের রচিত গান ও দোঁহাবলীতে তাঁহাদের জীবনালেখ্যের যে ক্ষীণ ছায়া প্রতিফলিত থাকে— কিম্বা ঐ সকল কাব্য-সাহিত্যে সমসাময়িক যে সকল ঘটনা বা অবস্থার

ইঙ্গিত থাকে, তাহারই সূত্র ধরিয়া কল্পনা, অনুমান, যুক্তিবিচার ও বিশ্লেষণ-শক্তির সাহায্যে ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকগণকে অতীত ইতিহাসের দ্বার উদ্ঘাটন করিতে হয়। প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকগণের বিশ্লেষণশক্তি ও বিচার-বিবেচনার ধারা যখন বিভিন্ন, তখন ইতিহাস নির্ণয়ে অসামঞ্জস্য লক্ষিত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

মহাপুরুষগণের ইতিহাস আবিষ্কার ও সময় নির্দ্ধারণের পথে যে আর একটী অসুবিধা আছে তাহা এই, যে সকল মহামনস্বী ধর্ম্মজগতে জনসাধারণের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগকে স্বসম্প্রদায়ভুক্ত করিবার ও স্বস্থানবাসী বলিয়া গণ্য করিবার অভিপ্রায়ে ও আগ্রহে কোন কোন গ্রাম্য কবি, সাধক ও সঙ্গীত রচয়িতা পরবর্ত্তীকালে ঐ ধর্ম্মরথীগণের নামে বা সম্বন্ধে অনেক স্বকপোল-কল্পিত গল্প, রূপকথা, প্রবাদ, গান, ছড়া ইত্যাদি রচনা করিয়া সাধারণ্যে প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। বহুকাল ধরিয়া ঐ সকল গল্প, গান, প্রবাদ ইত্যাদি শ্রুত, গীত, পঠিত ও প্রচারিত হইবার ফলে জনসাধারণের মনে একটা ধারণা বদ্ধমূল হইয়া যায়। তখন জনসাধারণ নিজেদের গৌরব বাড়াইবার জন্য ঐ সকল মহাপুরুষকে স্বধর্ম্মী, স্বস্থানবাসী ও স্বসম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া দাবী উত্থাপন করেন। অতএব বহু যুগ পর গবেষকগণ প্রচলিত গল্প, কবিতা, গান, ছড়া, প্রবাদ, কাহিনী ইত্যাদি অবলম্বন করিয়া যখন মহাপুরুষগণের স্থান, সময় ও কাল নির্ণয়ে প্রয়াসী হন, তখন তাঁহারা অত্যন্ত বিভ্রান্ত হইয়া পড়েন। সুতরাং তাঁহারা স্ব স্ব বিচার-বিবেচনা ও বিশ্লেষণশক্তির বিভিন্নতা অনুসারে মহাপুরুষ-গণের স্থান-কাল নির্ণয়ে বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হন। সন্দেহ-সংশয়ের কুয়াসা ভেদ করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহারা 'বুঝি', 'বোধ করি', 'সম্ভবতঃ' ইত্যাদি অনিশ্চয়তাবাচক শব্দ ব্যবহার করিয়া তথ্য উদ্ঘাটনের দুরূহ কার্য্যের উপসংহার করেন। সুতরাং জনসাধারণ 'যে তিমিরে সেই তিমিরেই' থাকিয়া যায়। গুরু গোরক্ষ নাথের সঠিক স্থান কাল নির্ণয় করিবার অসামর্থ্যের মূলে এইরূপ

বিভ্রান্তি ক্রিয়া করিতেছে বলিয়া অনুমান হয়। তিনি কোন্ শতাব্দীতে এবং কোন্ স্থানে আবির্ভূত হইয়া কতদিন প্রকট ছিলেন, তাহা নিশ্চিতরূপে কেহই নির্দ্ধারণ করিতে পারেন নাই। গোরক্ষ নাথের কাল নির্ণয়ে বিষম মতভেদ দৃষ্ট হয়। বিভিন্ন গবেষকের মতানুসারে তাঁহার সময় ৫ম খৃঃ অব্দ হইতে ১৫শ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত। এইরূপ প্রাচীন গবেষণায় বড় জোর এক শতাব্দীর তারতম্য অগ্রাহ্য করা যাইতে পারে; কিন্তু এক সহস্র বৎসরের তারতম্যের কি সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে জানি না। ইতিহাস-বিজ্ঞানে কোন অলৌকিক কারণের স্থান নাই। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে আর কোনও গোরক্ষের আবির্ভাব হইয়াছিল কি না এবং নাম সাদৃশ্য হেতু তাঁহারা কালে এক অভিন্ন গোরক্ষ নামে পরিকল্পিত হইয়াছিলেন কি না, তাহা বলা কঠিন।

গোরক্ষ নাথের আবির্ভাব স্থান ও কর্ম্মক্ষেত্র সম্বন্ধেও বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে। তিনিও অন্যান্য ধর্ম্মাচার্য্যগণের ন্যায় প্রচারোদ্দেশ্যে সমগ্র ভারতের বিভিন্ন স্থানে এমন কি বহির্ভারতেও সশিষ্য পরিভ্রমণ করিতেন এবং বিশেষ বিশেষ স্থানে একাদিক্রমে বহুদিন অবস্থান করিতেন এরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। সুতরাং গবেষকগণ স্থানীয় নিদর্শন অনুসারে কেহ তাঁহাকে বঙ্গদেশের—কেহ দক্ষিণ ভারতের এবং কেহ পাঞ্জাবের লোক বলিয়া উল্লেখ করিলে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। গোরক্ষ নাথের জন্মস্থান সম্বন্ধে গবেষকগণের এই বিনির্ণয় অভ্রান্ত বলিয়াও গ্রহণ করা চলে না এবং ভ্রান্ত বলিয়াও উড়াইয়া দেওয়া যায় না।

মহাপুরুষগণের স্থান কাল নির্ণয়ই একটা বড় কথা নহে। স্থান কালের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে তাঁহাদিগকে টানিয়া না আনিয়া তাঁহাদিগকে কালজয়ী ও বিশ্বের অধিবাসী বলিয়া গণ্য করিলে ক্ষতি কি? বেদ ও উপনিষদের মন্ত্র-রচয়িতা ও সত্যদ্রষ্টা প্রাচীন ঋষিগণের স্থান, কাল ও গোত্র নির্ণয় করা সম্ভবপর নহে। এরূপ প্রশ্নও কাহারও মনে উদিত হয় না। নিরবধি কাল তাঁহাদের স্মৃতিবক্ষে ধারণ করিয়া প্রবাহিত হইতেছে এবং অধ্যাত্মজগতের যে সকল

তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া তাঁহারা প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি ত্রিতাপদগ্ধ লক্ষ লক্ষ নরনারীর আধ্যাত্মিক ক্ষুধার নিবৃত্তি করিতেছে। ঐ সকল বিশ্বহিত-ব্রত ঋষিগণের নিকট আমরা বিপুলভাবে ঋণী তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহাদের বাণী ও আদর্শ প্রচার করা এবং তদনুসারে জীবন গঠিত করাই ঋষি-ঋণ পরিশোধ করিবার একমাত্র উপায়। ইহাই হইল সব চেয়ে বড় কথা। যোগিগুরু গোরক্ষ নাথ যে উদার যোগধর্ম্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন, সেই লুপ্তপ্রায় যোগ-ধর্ম্মের বহুল প্রচার এবং তাঁহার জীবনাদর্শের অনুবর্ত্তনই তাঁহার শিষ্যনুশিষ্য ও বংশধরগণের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয়। এই বিশ্বমানবের ধর্ম্ম অনু-সরণ না করিয়া শুধু তাঁহার স্থান ও সময় নির্ণয়ে শক্তি ও উৎসাহ ক্ষয় করা নিরর্থক হইবে বলিয়াই আমাদের ধারণা।

[গীতিকাব্যে গোরক্ষ নাথ শীর্ষক বিবরণ ষষ্ঠ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য]

যোগিগুরু গহনানন্দ নাথ

সময়— তান্ত্রিক যুগ

তান্ত্রিক চিকিৎসাশাস্ত্রের মধ্যে "রসেন্দ্রসার সংগ্রহ" সর্ব্বাধিক প্রাচীন ও প্রামাণ্য গ্রন্থ। ইহা হিন্দুরসায়ন শাস্ত্রের মুকুটমণি। ব্রাহ্মণ বংশীয় গোপাল কৃষ্ণ ভট্ট ইহা সম্পাদন করেন। ইহার এক স্থানে আছে—

"গহনানন্দ নাথোক্তশ্চন্দ্রসূর্য্যাত্মকোরসঃ"

— (রসেন্দ্র, পাণ্ডুরোগ চিকিৎসা)

এখানে নাথ উপাধি এমন সুস্পষ্টভাবে উক্ত হইয়াছে যে, ইনি যে নাথ-যোগী সে সম্বন্ধে অন্য ধারণা করার কিছুমাত্র অবকাশ নাই।

"শ্রীমদ্ গহন নাথেন বিচিন্ত্য পরিনির্ম্মিতঃ"

(রসেন্দ্রসার সংগ্রহে গ্রহণীরোগ চিকিৎসায় নৃপতিবল্লভ বটী)

অর্থাৎ নৃপতিবল্লভ বটী শ্রীমদ্ গহন নাথ আবিষ্কার করিয়াছেন।

"শ্রীমদ্ গহন নাথেন নিম্মিতো বহুযত্নতঃ।"

(রসেন্দ্রসার সংগ্রহ, কুষ্ঠ চিকিৎসায় মাণিক্য রস)

অর্থাৎ শ্রীমদ্ গহন নাথ অতি যত্নে এই ঔষধ আবিষ্কার করেন।

উক্ত 'বিচিন্ত্য' এবং 'বহুযত্নতঃ' এই দুইটি কথা দ্বারা গহন নাথ যে রসায়ন শাস্ত্রের অত্যন্ত উন্নত গবেষণাকারক ছিলেন তাহাই বুঝাইতেছে। ইহা হইতে অনুমিত হয় নাথদের মস্তিষ্ক হইতেই এই চিকিৎসা উদ্ভুত হইয়াছে। রসেন্দ্রসার সংগ্রহ গ্রন্থের অন্ততঃ পঁচিশ স্থানে নাথদের আচার্য্যত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। ইহা দ্বারা তৎকালে তান্ত্রিক চিকিৎসার আচার্য্যপদে নাথেরা একাধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান করা অসম্ভব হইবে না।

"শ্রীমদ্ গহন নাথেন বিচিন্ত্য পরিনির্ম্মিতঃ
সূর্য্যবৎ তেজাসচারং রসোনৃপতিবল্লভঃ।।"

—(ইতি রত্নাবলী)

"শ্রীমদ্ গহন নাথেন বিচিন্ত্য পরিনির্ম্মিতঃ।"

("গ্রহণী রোগ, নৃপতিবল্লভ বটী")

"গহনানন্দ নাথেন ভাষিতো বিশ্বসম্পদে।"

— ("ক্রিমি চিকিৎসা, ক্রিমিকালানল রস")

"প্রাণবল্লভ নামায়ং গহনানন্দ ভাষিতঃ।"

("পাণ্ডুরোগ চিকিৎসা, প্রাণবল্লভ রস")

"শ্রীমদ্ গহন নাথোক্তঃ ক্রিমিধূলিজলপ্লবঃ।"

("ক্রিমি চিকিৎসা, ক্রিমিধূলিজলপ্লব রস")

"গহনানন্দ নাথোক্তশ্চন্দ্র সূর্য্যাত্মকোরসঃ।"

("পাণ্ডুরোগ চিকিৎসা, চন্দ্রসূর্য্যাত্মক রস")

"রসামৃত রসোনাম গহনানন্দ ভাষিতঃ।"

("রক্তপিত্ত চিকিৎসা, রসামৃত রস")

"গহনানন্দ নাথোক্ত রসোঽয়ং কাঞ্চনাভ্রবাঃ
মহামৃগাঙ্কঃ খলু এষ সিদ্ধঃ শ্রীনন্দি নাথ প্রকটীকৃতোঽয়ম্।"
("যক্ষ্মা চিকিৎসা, মহামৃগাঙ্ক রস")
শ্রীমদ্ গহন নাথেন কাসসংহার ভৈরবঃ
রসোঽয়ং নির্ম্মিতো যত্নাল্লোক রক্ষণ হেতবে।"
(কাসচিকিৎসা, কাসসংহার ভৈরব")
"গহনানন্দ নাথোক্তোরসোঽয়ং গুল্মশার্দ্দুলঃ।"
("গুল্মচিকিৎসা, গুল্মশার্দ্দুল রস")
"প্রাণবল্লভ নামায়ং গহনানন্দ ভাষিতঃ।"
("গুল্মচিকিৎসা, প্রাণবল্লভ রস")
"হরিবল্লভ নামায়ং গহনানন্দ ভাষিতঃ।"
("প্রমেহচিকিৎসা, হরিশঙ্কর রস")
"শ্রীমদ্ গহন নাথেন লোক নিস্তারকারিণা।"
(প্রমেহচিকিৎসা, মেহমুদ্গর রস)
"শ্রীমদ্ গহন নাথেন নির্ম্মিতং বিশ্বসম্পদে।"
(প্লীহাচিকিৎসা, অগ্নিকুমার লৌহ)
"প্লীহার্ণব ইতি খ্যাতো গহনানন্দ ভাষিতঃ।"
(প্লীহাচিকিৎসা প্লীহার্ণব রস)
"শ্রীমদ্ গহন নাথেন ভাষিতঃ প্লীহশার্দ্দুলঃ।"
(প্লীহাচিকিৎসা, প্লীহশার্দ্দুল রস)
"শ্রীমদ্ গহন নাথেন নির্ম্মিতো বিশ্বসম্পদে।"
(শ্লীপদ চিকিৎসা—নিত্যানন্দ রস)
"শ্রীমদ্ গহন নাথেন নির্ম্মিতো বহু যত্নতঃ।"
(কুষ্ঠচিকিৎসা-নিত্যানন্দরস)—রসেন্দ্রসার সংগ্রহ

"শ্রীমতা বৈদ্য নাথেন লোকানুগ্রহকারিণা।
স্বপ্নান্তে ব্রাহ্মণস্যেয়ং ভাবিতা লিখিতেন তু॥"
(গ্রহণীরোগে, বৈদ্যনাথ বটী)
"ইদং চন্দ্রামৃতং নাম চন্দ্র নাথেন ভাবিতম্।"
(কাসচিকিৎসা, চন্দ্রামৃত লৌহ)
"শ্রীমতা নন্দি নাথেন বাতবিধ্বংসনোরসঃ।"
(বাতব্যাধি চিকিৎসা বাতবিধ্বংসন রস)
"বিশ্বেশ্বর রসোনাম বিশ্বনাথেন ভাবিতঃ।"
(বাতরক্ত চিকিৎসা বিশ্বেশ্বর রস)
"নির্ম্মিতা নিত্যনাথেন বটীকা গুল্মবর্জ্জিনা।"
(গুল্মরোগ চিকিৎসা, গুল্মবর্জ্জিনী বটীকা)
"শিরোবজ্র রসোনাম চন্দ্রনাথেন ভাষিতঃ।"
(শিরোরোগ চিকিৎসা—শিরোবজ্র রস)
"সর্ব্বব্যাধি বিনাশায় কাশী নাথেন ভাষিতঃ।"
(রসায়নাধিকার পূর্ণচন্দ্র রস)।

(রসেন্দ্রসার সংগ্রহ)

যোগিগুরু কপালী, নাগার্জ্জুন, সুরানন্দ, খণ্ডকাপালিক, মন্থান ভৈরব, কাকচণ্ডীশ্বর, ভালুকী, চর্পটী প্রমুখ হঠপ্রদীপিকাধৃত নাথসিদ্ধাগণের নাম বাগভটকৃত "রসরত্ন সমুচ্চয়" গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। যথা—

আদিমশ্চন্দ্রসেনশ্চ লঙ্কেশশ্চ বিশারদঃ।
কপালী মত্তমাণ্ডবৌ ভাস্করঃ শূরসেনকঃ॥
রত্নকোশশ্চ শম্ভুশ্চ সাত্ত্বিকো নরবাহনঃ।
ইন্দ্রদো গোমুখশ্চৈব কম্বলির্ব্যাড়িরেবচ॥

নাগার্জ্জুনঃ সুরানন্দো নাগবোধির্য্যশোধনঃ।
খণ্ডকাপালিকো ব্রহ্মাগোবিন্দো লম্বকোহরিঃ ॥
সপ্তবিংশতি সংখ্যকা রসসিদ্ধি প্রদায়কাঃ।
রসাঙ্কুশো ভৈরবশ্চ নন্দী স্বছন্দভৈরবঃ।
মন্থান ভৈরবশ্চ কাকচণ্ডীশ্বর স্তথা।
বাসুদেব ঋষ্যশৃঙ্গঃ ক্রিয়াতন্ত্র সমুচ্চয় ॥
রসেন্দ্রতিলকো যোগী ভালুকী মৈথিলাহ্বয়ঃ।
মহাদেবো হরেন্দ্রশ্চ রত্নাঁকর হরীশ্বরৌ ॥"

* * * * *

যদু্ক্তং শম্ভুনাপূর্ব্বং রসখণ্ডে রসার্ণবে
রসস্য বন্দনার্থেচ দীপিকা রসমঙ্গলে
ব্যধিতানাং হিতার্থায় প্রোক্তং **নাগার্জ্জুনেন** যৎ
উক্ত **চর্পটী**, সিদ্ধেন স্বর্গবৈদ্য **কপালিকে**
অনেকরসশাস্ত্রেষু সংহিতাস্বাগমেষুচ
যদুক্ত বাভটেতন্ত্রে সুশ্রুতে বৈদ্যসাগরে।"

(রসরত্ন সমুচ্চয়)

কলানাথ শিষ্য ঢুণ ঢুক নাথ বিরচিত "রসেন্দ্র চিন্তামণি" নামক আর একখানি রসায়নশাস্ত্র আছে। ইহার গ্রন্থারম্ভে আছে—

'কলা নাথ শিষ্যেণ শ্রীঢুণঢুক নাথেন বিরচিতঃ
ইদানীং কলানাথ শিষ্যঃ শ্রীঢুণঢুক নাথাহ্বয়ো
রসেন্দ্র চিন্তামণি গ্রন্থসার ভমানস্তন্মূল দেবতে
শ্রীমদম্বিকা মহেশ্বরৌ সকল জগদুৎপত্তি
স্থিতি প্রলয়নিদানং বিশেষ সিদ্ধান্ত গর্ভবাচাবরীস্ততি।"

(রসেন্দ্র চিন্তামণি)

উপরোক্ত আলোচনায় দেখা যাইতেছে যে ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের তান্ত্রিক চিকিৎসায় নাথদের অনেকেই আচার্য্য পদে বৃত ছিলেন। সম্প্রতি শাস্ত্রীয় চিকিৎসার মধ্যে তান্ত্রিক চিকিৎসাই বহুধা প্রচারিত ও ঝটিতি ফলপ্রদ। রসেন্দ্র-সার সংগ্রহে বারবার সসম্মানে গহনানন্দের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে মনে হয় গহনানন্দ নাথ তৎকালে চিকিৎসা ব্যাপারে এবং চিকিৎসা প্রচারে নেতৃত্ব করিতেন। রসেন্দ্রসার সংগ্রহকার গোপালকৃষ্ণ ভট্ট সম্ভবতঃ গহনানন্দের শিষ্য প্রশিষ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কারণ গহনানন্দ নাথের নামের সহিত গৌরব-সূচক "শ্রীমদ্" প্রভৃতি শব্দবিন্যাসে এই অনুমানের গুরুত্ব বৃদ্ধিই হইতেছে। রসেন্দ্রসার সংগ্রহে নাথ ভিন্ন আর যে কয়েকজন আচার্য্যের নাম আছে তাঁহারা আদৌ মানুষই নহেন— দেবতা। যথা— ভগবান কৃষ্ণ, বিষ্ণু, নারদ প্রভৃতি। এ সব আলোচনায় নাথদের রাসায়নিকতা ও চিকিৎসাভিজ্ঞতার অভ্রান্ত প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

ধাতুর জারণ-মারণ বিদ্যায় নাথেরা আজিও সম্ভবতঃ বাঙ্গালা দেশে শ্রেষ্ঠাসন দখল করিয়া আছেন। তান্ত্রিক মতে বিবিধ ধাতুর জারণ-মারণের সহজ বিধি অনেক নাথের আজিও পৈতৃক সম্পত্তি।

আর্য্যেরাই পৃথিবীমধ্যে সর্ব্বাগ্রে (বৈদিক যুগে) চিকিৎসাশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। কি অস্ত্রোপচারে, কি ঔষধ প্রয়োগে, কি শরীরতত্ত্বে সর্ব্ব প্রকারেই যে আর্য্যদের জ্ঞানভাণ্ডার অফুরন্ত ছিল তাহা চরক, সুশ্রুত, বাগ্‌ভট, রসেন্দ্র প্রভৃতি আলোচনায় স্পষ্ট বুঝা যায়।

বৌদ্ধযুগে (৫৬৩ খৃঃ পূঃ হইতে ৬৪৭ খৃঃ অব্দ) আয়ুর্ব্বেদ বা আর্য্য চিকিৎসা-শাস্ত্রের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। বৌদ্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে এবং মুসলমানী ও পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসাশাস্ত্রের ঘাত-প্রতিঘাতে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাশাস্ত্র অবনমিত এবং অর্দ্ধলুপ্ত হইয়াছে।

যোগিগুরু নিত্য নাথ

সময়— তান্ত্রিক যুগ

ইনি 'হঠপ্রদীপিকা'ধৃত সিদ্ধ নিত্য নাথ। ইহার অপর নাম নিত্যানন্দ, নিত্যপাদ, ধ্যানী নাথ (অধ্যাপক হলধৃত)।

হঠপ্রদীপিকাধৃত সিদ্ধাগণ বিখ্যাত রাসায়নিক ছিলেন। তাহা প্রায় প্রত্যেক হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রকার গ্রন্থারম্ভে স্বীকার করিয়াছেন। "রাসেশ্বর দর্শন" নামে একখানি দর্শনশাস্ত্রের উদ্ভব হইয়াছিল। মাধবাচার্য্যের "সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে" ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায়। হিন্দু রাসায়নিকদের মধ্যে নিত্য নাথের নাম সমধিক প্রসিদ্ধ। ইনি "রসরত্নাকর" নামক প্রসিদ্ধ রসশাস্ত্রের প্রণেতা; বাগভটকৃত "রসরত্ন সমুচ্চয়" গ্রন্থেও নিত্য নাথের উল্লেখ আছে।

"রসরত্নাকর" বৈদ্যমহলে সুপরিচিত। ইহার ১ম অধ্যায়ের শেষে আছে—

"ইতি পার্ব্বতীপুত্র নিত্য নাথ সিদ্ধ বিরচিতে 'রস রত্নাকর' রসখণ্ডে রস-পীঠিকা নাম প্রথমোপদেশঃ।"

নাথেরাই শিবপুত্র, পার্ব্বতীপুত্র ও সিদ্ধ বলিয়া পরিচিত।

নিত্য নাথ "ইন্দ্রজালতত্ত্ব" গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার প্রারম্ভে আছে—

"অথাতঃ প্রবক্ষ্যামি চেন্দ্রজালমুত্তমং" ইত্যাদি

শেষাংশে আছে—

"অনেন মন্ত্রেণ সর্ব্বযোগানভিমন্ত্র্য সিদ্ধিঃ ইতি"
পার্ব্বতীপুত্র নিত্য নাথ বিরচিতে সিদ্ধিখণ্ডে তন্ত্রসারে
কৌতূহল বিদ্যানাম ইন্দ্রজাল তত্ত্বম।"

দ্রব্যগুণে নানা বিস্ময়কর বস্তুর উৎপাদনকে ইন্দ্রজাল বলে। রসায়নশাস্ত্রের ইহা আর একটী অঙ্গ। তাহা হইলে এ বিদ্যাতেও নাথসিদ্ধাগণ সিদ্ধহস্ত ছিলেন বলিয়া বুঝা যাইতেছে।

যোগিগুরু নাগার্জ্জুন

সময়— ৬ষ্ঠ খৃঃ অব্দ

হঠপ্রদীপিকায় নাগ নাথের নাম আছে। এই নাগনাথ অর্জ্জুন বৃক্ষের নিম্নে থাকিতেন বলিয়া লোকে ইঁহাকে নাগার্জ্জুন বলিত, এইরূপ জনশ্রুতি আছে (১)। ইনি বিখ্যাত রাসায়নিক ছিলেন। তাই রসায়ন শাস্ত্রে ইঁহার নাম বিশেষ বিখ্যাত। বাগভটকৃত 'রসরত্নসমুচ্চয়" গ্রন্থে, 'বর্ণন রত্নাকরের' নাথচৌরাশী সিদ্ধার তালিকায়, এবং নয় নাথের একটি তালিকায়ও ইঁহার নাম দৃষ্ট হয়। চৌরাশী সিদ্ধার এক সিদ্ধা এবং নয় নাথের অন্যতম মৎস্যেন্দ্র নাথের সময় আমরা দেখাইয়াছি ৫২২ খৃঃ অব্দ। তাহা হইলে নাগার্জ্জুনও এ সময়কার লোক হইবেন।

বিদেশীয় পণ্ডিত ক্যানিংহাম সাহেব গয়ার ১৬ মাইল উত্তরে অবস্থিত নাগার্জ্জুনী গুহার কথা বর্ণনা করিয়াছেন (Cunningham's Archaelogical Survey, Vol. 1. Page 50—52) নাগার্জ্জুনের নাঁমানুসারে নাগার্জ্জুনী গুহার নামকরণ হইয়াছে। ইঁহাকে সিদ্ধ নাগার্জ্জুনও বলা হয়।

প্রবাদ আছে যে তিনি ধর্ম্ম প্রচারের জন্য উত্তরকুরু বর্ষ (বর্ত্তমান নরওয়ে স্বুইডেন) প্রভৃতি দেশ পর্য্যটন করিয়াছিলেন (২)।

নাগার্জ্জুনের সময় হইতেই বৌদ্ধগণ হিন্দুধর্ম্মের দিকে ঝুকিয়া পড়িতেছিলেন। এ সম্বন্ধে অধ্যাপক সমাদ্দার বলেন—

"Even in the time of Nagarjuna who both by example and theory thought that Brahma, Vishnu, Siva, Tara and other Hindu deities possessed the attributes which the Brahmans had ascribed to them and therefore were proper objects of worship

---

(১) ও (২) 'ভারত সভ্যতায় নাথধর্ম্মের দান' এবং 'শৈবধর্ম্ম ও যোগিজাতি'। শ্রীভোলানাথ নাথ, এম-এ, পুরাতত্ত্ব-বিশারদ।

for help. It was gradually leaning towards Hinduism which was re-establishing itself" (Glories of Magadha)

অর্থাৎ নাগার্জ্জুন বাক্যে ও কার্য্যে প্রচার করিতেছিলেন যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, তারা ইত্যাদি হিন্দু দেবদেবীতে ব্রাহ্মণমণ্ডলী যে শক্তি আরোপ করিয়াছেন তাহা সে সব দেবতাদের আছে। সুতরাং সাহায্যার্থ সেই সেই দেবতা পূজ্য। সেই নাগার্জ্জুনের সময় হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের দিকে ঝুকিয়া পড়িতেছিল এবং হিন্দুধর্ম্ম স্বীয় প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিতেছিল।

জাপানী পণ্ডিত কাকুরা কাকুজোও বলিয়াছেন—

"The first phase of Buddhism ended in Nagarjun philosophy by means of his eight negations and elucidation of the middle path and his recognition of the great self-pervading all."

তাহা হইলে নিঃসন্দেহে বুঝা যাইতেছে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রথম পরিবর্ত্তনের পরিসমাপ্তি নাগার্জ্জুনের মাধ্যমিক দর্শনে।

এ সব বিচার করিলে দৃঢ়তার সহিত বলা যায়, বৌদ্ধধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্মের অঙ্গীভূত করার ব্যাপারে নাগার্জ্জুন নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। নাগার্জ্জুন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন।

নাগার্জ্জুনের মাধ্যমিক শাস্ত্রে বুদ্ধদেবের ধর্ম্মকে দুইটী সত্যের উপর স্থাপিত বলা হইয়াছে—

"দ্বে সত্যে সমুপাশ্রিত্য বুদ্ধানাং ধর্ম্মদেশনা।
লোকসংবৃত্তি সত্যঞ্চ সত্যঞ্চ পরমার্থতঃ ॥
যে চানয়োর্ন জানন্তি বিভাগং সত্যয়োর্দ্বয়ম্।
তে তত্ত্বং ন বিজানন্তি গম্ভীর বুদ্ধশাসনে।"

অর্থাৎ বুদ্ধদেবের ধর্ম্মলোক সংবৃত্তি সত্য ও পরমার্থ সত্য এই দুইটির উপর স্থাপিত। যাহারা এই দুইটির বিভিন্নতা বুঝে না, তাহারা বৌদ্ধধর্ম্মের মর্ম্ম জানে না।

নাগার্জ্জুন আরও বলিয়াছেন—

"অপ্রতীত্য সমুৎপন্নো ধর্ম্মঃ কশ্চিন্ন বিদ্যতে।
যস্মাত্তস্মাদ শূন্যোহি ধর্ম্মঃ কশ্চিন্ন বিদ্যতে॥"

(মাধ্যমিক শাস্ত্র—২৪শ অধ্যায়, ১৯শ কারিকা)

অর্থাৎ এমন ধর্ম্ম নাই, যাহা কার্য্যকারণ সম্বন্ধ হইতে উৎপন্ন হয় নাই। অতএব সকল ধর্ম্মই শূন্যতাস্বভাববিশিষ্ট।

পার্থিব যাবতীয় বস্তুই স্বভাবহীন। এই স্বভাবহীনতাই (অনিত্যতাই) শূন্যতা ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের নাসদীয় সূক্তে এঁই শূন্যতত্ত্বের বিবরণ পাওয়া যায়।

নাগার্জ্জুনের ইন্দ্রজাল বিষয়ক গ্রন্থের নাম "কৌতুকচিন্তামণি।"

নাগার্জ্জুন বর্ণনরত্নাকরের চৌরাশী সিদ্ধাদের অন্যতম। উক্ত তালিকার এক নম্বর সিদ্ধা মীন নাথের সঠিক সময় আমরা নির্ণয় করিয়াছি ৫২২ খৃঃ অব্দ। তাহা হইলে নাগার্জ্জুনের সঠিক সময়ও ৬ষ্ঠ খৃঃ অব্দ।

যোগিগুরু কান্থাড় নাথ বা কাথাড় নাথ

সময়—৮৪৪ খৃঃ অব্দ

কান্থাড় নাথ বা কাথাড় নাথ হঠপ্রদীপিকাধৃত কান্থাড়ী নাথ। কান্থালী বা কণ্ডালীন (অধ্যক্ষ হলধৃত) তাঁহার নামান্তর।

কচ্ছ দেশের কান্থ প্রদেশে মানফারোরে কান্থাড় নাথের মঠ প্রসিদ্ধ। কান্থাড় নাথ হইতে এই মঠের উৎপত্তি হইয়াছে। কান্থাড় নাথ সংবৎ ৯০০ অব্দে (৮৪৪ খৃঃ অব্দে) কান্থকোর্টে ধুনি প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সময়ে মঢ় ও মানাই নামক দুই ব্যক্তি তাঁহাদের ভ্রাতা উনরেকে হত্যা করিয়া সিন্ধু হইতে কান্থ প্রদেশে আসেন। মঢ় কান্থকোর্টে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। দুর্গের ভিতর কান্থাড় নাথের ধুনি পড়ায় মঢ় কান্থাড় নাথজীকে ধুনি সরাইয়া নিতে বলেন; কিন্তু তিনি তাহাতে অসম্মত হন, এবং যোগবলে দুর্গ নষ্ট করেন। মঢ়ের মৃত্যুর

পর তাঁহার পুত্র সাড় কাম্বাড় নাথকে শান্ত করেন এবং কাম্বাড় নাথের নামানুসারে কাম্বাড় . দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। তিনি কাম্বাড় নাথের নামে এক বৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করেন, কিন্তু ভূমিকম্পে ইহা নষ্ট হইয়া যায়। এখন এ স্থানে একটি ছোট অতি সুদৃশ্য মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। বর্ত্তমান মানফারো গ্রামের উদিকান্ত কর্ত্তৃক উক্ত মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। জমি ভারমলজী কর্ত্তৃক প্রদত্ত হয়। (সংবৎ ১৭০৫, ১৬৪৯)।

কাম্বাড় নাথজী স্থানীয় রাজার নিকট হইতে মানফারিয় দানস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এখানকার নাথেরা কাম্বাড় নাথের পূজা করেন এবং কাথাড় উপাধি ব্যবহার করেন। কাম্বাড় কোর্টে প্রতিষ্ঠিত কাম্বাড় নাথের পদ্মাসনোপবিষ্ট প্রস্তরমূর্ত্তি আজও পূজিত হইতেছেন। * (Indian Antiquary 1878, February এবং Archaelogical Survey of India By Mr. Cunningham Vol. 1 Page 50-52 & 167) ইঁহার বিস্তৃত জীবনকথা পাওয়া যায়। তাহা হইতে উক্ত বিবরণ সঙ্কলিত হইয়াছে।

যোগিগুরু হাড়িফা (জালন্ধর) নাথ

সময়— ৬ষ্ঠ খৃঃ অব্দ হইতে ১০ম ১১শ খৃঃ অব্দ

অধ্যাপক ডাঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী বলেন— "জলন্ধর শব্দের সামান্য অর্থ মেঘ সমুদ্র। কণ্ঠসঙ্কোচ দ্বারা প্রাণবায়ুর গতিরোধ করা জলন্ধর মুদ্রা। হয়ত তিনি এই মুদ্রা করিতেন, কিংবা পাঞ্জাবের জলন্ধর নামক স্থানে তাঁহার আসন ছিল। হাড়িফা সর্ব্বত্রই জলন্ধর নামে বিশেষিত দেখিতে পাই।" গোপীচাঁদের সন্ন্যাস— ৪৫ পৃঃ) রাজা গোপীচন্দ্রের বা গোবিন্দচন্দ্রের গুরুর নাম ছিল হাড়িফা বা হাড়িপা।

"পাটীকা নগরে রাজা গোবিন্দচন্দ্র ভূপ।
জলন্ধরি হাড়িপা হইল হাড়িরূপ

সিমুপাকুমার এক সঙ্গে করি নিল।
নগর বাহিরে হাড়ি আশ্রম করিল।''

(গোবিন্দচন্দ্র গীত— ১২, ১৩ শ্লোক)

রাজা গোবিন্দচন্দ্রের রাণীদের চক্রান্তে তাঁহাদেরই প্রদত্ত বিষপানে হাড়িফার মৃত্যু হইয়াছিল এবং তিনি মৃত শরীরে জলের উপর ভাসিতেছিলেন—

''এইরূপে ভাশে হাড়ি জলের উপর
* * * *
এইশে কারোনে হাড়ির নাম জলন্ধর

(গোপীচাঁদের সন্ন্যাস— ৪৪, ৪৫ পৃঃ)

ত্রিপুরার রাজাদের আদিপুরুষের 'ফা' উপাধি দৃষ্ট হয়। ত্রিপুরার ভাষায় ফা অর্থে পিতা বুঝায়। নাথাচার্য্যদের মধ্যে হাড়িফা (হাড়িপা), কানুপা (কানফা) অন্যতম। অতএব ফা উপাধি হইতে পা বা পাব হওয়া সম্ভব কি না বিচার্য্য বিষয়। মতান্তরে পা শব্দটি তিব্বতী, ইহার অর্থ অধিকারী। পা পন্থ বা শৈব ছিলেন। ইহা দ্বারা নাথদের সহিত গোপীচন্দ্রের বংশের সম্বন্ধের পরিচয় পাওয়া যায়। (নাথপন্থ— ১০ ও ১১ পৃঃ)

''হাড়িপা হাড়ের সিদ্ধাকুলে হাড়ি নয়। ১৬৯
সর্ব্বঘটে আছে হাড় হাড়ি এক জন।
হাড়িপা মনুষ্য নহে হাড়ের সৃজন। ১৬৭
* * * *
হাড়ি নহে হাড়িফা বাউল ব্রহ্মজ্ঞানী।''

(গোবিন্দচন্দ্র গীত)

---

* শ্রীযুক্ত ভোলানাথ নাথ, এম-এ, পুরাতত্ত্ব-বিশারদ মহাশয়ের ''শৈবধর্ম্ম ও যোগিজাতি'' প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ সংক্ষেপীকৃত।

মাতা ময়নামতী স্বীয় পুত্র রাজা গোপীচাঁদকে বলিতেছেন—

"মুনি (১) বোলে যুন বাছা আমার ওত্যর (২)।
জাতি হাড়ি নহে শে হাড়িফা জলন্ধর্র (৩)॥

* * * *

হাড়ি নহে, হাড়ি নহে হাড়িফা জলন্ধর্র।
চৌলে করি পিতে (৪) পারে শপ্ত এ শাগর।
গ্যান (৫) ধ্যানে হাড়িফা শির্দ্ধা বান্ধি আছে চুড়া।
রাত্রি দিবা ফিরে হাঁড়ি জম করিয়া ঘোড়া॥
জম রাজা হএ জার নিজের নফর।
চন্দ্র যুর্জ্জ্য (৬) দুই দেব দুই কর্ন্নের কুণ্ডল॥"

(গোপীচাঁদের সন্ন্যাস— ২৪ পৃঃ)

যোগসিদ্ধিবলে হাড়িফা চন্দ্র ও সূর্য্যকে কর্ণের কুণ্ডল করিয়া রাখিয়াছিলেন। অর্থাৎ প্রাণ ও অপানকে তিনি সম্পূর্ণভাবে জয় করিয়াছিলেন।

ডক্টর তমোনাশচন্দ্র দাসগুপ্ত, এম-এ, পি-এইচ, ডি, বলেন— "হাড়িপা, কাহ্নুপা প্রভৃতি নাথ আচার্য্যগণ সকলেই জ্ঞানী ছিলেন। * * * হাড়ি-সিদ্ধাকে ইন্দ্রের পুত্র চামর ব্যজন করিতেন এবং চন্দ্র, সূর্য্য তাঁহার কুণ্ডল হইয়া কানে দুলিতেন। * * * জলন্ধর নামে পঞ্চনদ প্রদেশের অংশ বিশেষ অনেকেরই সুপরিচিত।" (ইতিহাস ও আলোচনা— নাথধর্ম্ম, শ্রাবণ, ১৩২৮ বাং) তিনি আরও বলেন— "জলন্ধরে আসিয়া তিনি দীর্ঘকাল বাস করেন, এবং সেই জন্য জলন্ধরের সিদ্ধা নামে প্রসিদ্ধ হন। * * * * * এই সকল সম্প্রদায়ের লোকেরা অধুনা সাধারণ্যে শৈব যোগী বলিয়া পরিচিত"

(১) 'গোপীচাঁদের সন্ন্যাসের' অনেক স্থানে ময়নামতীকে মুনি বলা হইয়াছে। (২) উত্তর। (৩) হাড়িফা বা জলন্ধর নাথ হাড়ি জাতীয় নহেন। (৪) চুমুকে পান করিতে পারেন। (৫) জ্ঞান। (৬) সূর্য্য।

(প্রবর্ত্তক— অগ্রহায়ণ, ১৩৪৪ বাং গোপীচন্দ্র ও নাথ সম্প্রদায়)। কাহারও কাহারও মতে হাড়িফা 'পা' পন্থের প্রবর্ত্তক। (নাথপন্থ— ১০ পৃঃ)

কনফট যোগিগণ কর্ণে কুণ্ডল ও গলদেশে নাদ ধারণ করিতেন। গোবিন্দ-চন্দ্র গীতে উক্ত হইয়াছে যে সিদ্ধা হাড়িফার শিষ্য ও সহচর ষোল শত যোগীর কর্ণে কুণ্ডল, এবং গাত্রে ভস্ম ছিল—

"হুঙ্কার ছাড়িল জুগী জোগ করি সার।
সোলসও জুগী আইল সিদ্ধা হাড়িফার ॥ ৫৯৩
কর্ণেতে কুণ্ডল দোলে ভস্ম কলেবর।
সিংহনাদ কাথা ঝুলি অতি ভয়ঙ্কর॥" ৫৯৪

(গোবিন্দচন্দ্র গীত)

অকস্মাৎ একসঙ্গে শূন্যপথে এত যোগীর আগমনে রাজার বিস্ময়ের সীমা রহিল না—

"বিস্বয় হইল রাজা না জানে বিসেষঃ।
আচম্বিতে এত জুগী আইল বঙ্গদেষ ॥ ৫৯৫
এক জুগী দেখিনু দোসর নাই ছিল।
শূন্যপথে এত জুগী কোথা হইতে আইল ॥" ৫৯৬

(গোবিন্দচন্দ্র গীত)

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে একসঙ্গে ষোল শত যোগী কি বিমানযোগে বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন? আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ইঁহারা যোগের কৌশলে শূন্যপথে একত্রে বঙ্গদেশে শুভ পদার্পণ করিয়াছিলেন। ইহা দেখিয়া বঙ্গেশ্বর বলিতেছেন—

"সিদ্ধ বটে এই জুগী ঙ্গান (১) জোগ জানে।
করিব ইহার সেবা পড়িয়া চরণে ॥ ৫৯৭

(১) জ্ঞান

জোড় হাতে কহে রাজা করিয়া মিনতি।
কিছু গ্যান (১) দেহ আমি কলিঙ্গ ভূপতি ৬০৬
হইব তোমার চেলা শুন জুগীবর।
গ্যান দিয়া কর জুগী জগতে অমর ।। ৬০৭
জুগীর চরণে রাজা কাঁপে থর ২।
পড়িল জুগীর পায় বঙ্গের ঈশ্বর ।।"

(গোবিন্দচন্দ্র গীত)

এ সব বর্ণনা হইতে বুঝা যায় যে হাড়িপা নাথ ও তাঁহার ষোল শত শিষ্য ও সহচর বাহির হইতে ১১শ। ১২শ খৃঃ অব্দে বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন।

সংস্কৃত অস্থিবাচক 'হড্ড', হিন্দী ভাষায় হাড্ডী, তৎপর পা (পাদ), ইহার প্রাচীন বাঙ্গালা হাড়িপা। অথবা পা = পাট = কাটা (আসামী ভাষায়) হাড্ডি অর্থাৎ হাড়ের কাটা মালা যার গলে সে হাড়ি পাট বা হাড়িপা।

দিল্লীর পশ্চিমাঞ্চলের অভোহর নামক স্থানের যোগীদেরে 'হরপা যোগী' বলে। হাড়িপা 'হরপা' শব্দের রূপান্তর হওয়াও সম্ভবপর। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ 'হরপ্পা' নামক স্থানের যোগীদেরে 'হরপা' যোগী বলে। হাড়িপা 'হরপ্পা' বা 'হরপা'র রূপান্তরও হইতে পারে। এখানে সুপ্রাচীন কালেও যোগিজাতির নিবাস ছিল। এখনও কিছু আছে।

বুকানন সাহেব (১৮০৯ খৃঃ অঃ) বলেন—"Haripa a religious mendicant (yogi) of remarkable sanctity" (J. A. S. B. 1838, Page 5) অর্থাৎ হাড়িফা সুপবিত্র ধার্ম্মিক যোগী ছিলেন।

এলাহাবাদের ২৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে গায়ড়া (Garhwa) নামক একটি স্থান আছে। সেখানে যোগী জালাদিত্য প্রতিষ্ঠিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তিনটী ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি আছে।

(১) জ্ঞান।

ব্রহ্মার প্রতিমূর্ত্তিতে খোদিত আছে—"শ্রীভট্টনন্তসুতেনায়ম্ জ্বালাদিত্যেন যোগিনাচিত্রকৃতো ব্রহ্মাজ্ঞান কর্ম্মসয়ঃ।" বিষ্ণুর প্রতিমূর্ত্তির নিম্নে খোদিত আছে—"শ্রীভট্টানন্ত সুতেনায়ম্ জ্বালাদিত্যেন যোগিনাজ্ঞান কর্ম্মাত্মকো বিষ্ণুরাম দেবেতি।" শিব-প্রতিমূর্ত্তির নিম্নে খোদিত আছে—"শ্রীভট্টানন্ত সুতেনায়ম্ জ্বালাদিত্যেন যোগিনাজ্ঞানভাঃ" (অস্পষ্ট) যুক্ত রুদ্রক্ত (অস্পষ্ট) কৃতঃ।"

বিশেষজ্ঞেরা ঐ গুলিকে দশম শতাব্দীর কুটীল অক্ষর বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। জ্বালাদিত্য জলন্ধর নাথের নামান্তর বলিয়াও প্রবাদ আছে। আমরা দেখাইতেছি জালন্ধর বা হাড়িপা নাথের সময় ৬ষ্ঠ খৃঃ অব্দ হইতে ১১শ বা ১২শ খৃঃ অব্দ।

সিদ্ধা হাড়িফাকে কেহ কেহ সিন্ধুদেশের লোক বলিয়া মনে করেন। তিনি ওড্ডিয়ানে যোগধর্ম্ম শিক্ষা করেন। যোগবলে তিনি অবন্তীদেশে দেবতার নিকট বলি দিবার জন্য আনীত কয়েক হাজার পাঠাকে নেকড়ে বাঘে পরিণত করিয়াছিলেন। ময়নামতীর বাগানে বসিয়া তিনি যোগসাধনা করিতেন। তাঁহার মন্ত্রশক্তিবলে বাগানের ডাব গাছ হইতে নামিয়া আসিয়া তাঁহাকে জল দান করতঃ তাঁহার জলতৃষ্ণা নিবারণ করিত (১)। তাঁহার মন্ত্রবলে নেপালের মন্দির ফাটিয়া গিয়াছিল (See J. R. A. S. B. Part 1, 1898, Page 20)। মৃত মানুষ হাড়িফার লাথি খাইয়া জীবিত হইয়া উঠিত। নিদ্রার জন্য গঙ্গাদেবী হাড়ি সিদ্ধাকে খাট আনিয়া দিতেন। (নাথপন্থ—১৩ পৃঃ)

চৌরাশী সিদ্ধার ইতিহাসে দেখা যায় ওড্ডিয়ানে পাঁচ লক্ষ নগর ছিল। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে ওড্ডিয়ান উড়িষ্যায় অবস্থিত। ফরাসী পণ্ডিত সিলভ্যাঁ লেভির মতে ওড্ডিয়ান খাস গড়ে (J. R. A. S. B. Part 1,

---

(১) গীতিকাব্যে আছে— "এক হুঙ্কার সিদ্ধাত্র দিলেক ত্রড়িয়া। উনশত নারিকেল পড়ে জীবন শোঁড়িয়া॥ শাশ নারিকেল খাইয়া গাছে লাগাএ মালা। (নাথপন্থ— ১৩ পৃঃ)

1898, Page 20)। শ্রীনলিনী দাশগুপ্তের মতে ওড্ডিয়ান বঙ্গদেশে অবস্থিত (সাধনমালা—১ম ভাগ, ভূমিকা)। Mr. Waddel সাহেবের মতে ওড্ডিয়ান উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে। ইঞ্জিনিয়ার শ্রীরাজমোহন নাথের মতে ইহা কামরূপ ও বঙ্গদেশের কোথাও অবস্থিত (কদলীরাজ্য—২৪ পৃঃ)। শেষোক্ত মতই আমরা সমর্থন করি।

অধ্যাপক ডাঃ সুকুমার সেন বলেন— "বাঙ্গালার জালন্ধরি হাড়িপা (পূর্ব্ব-বঙ্গের কবির ভাষায় হাড়িফা) নামেই প্রসিদ্ধ। জালন্ধরির রচিত 'বজ্রযোগিনী-সাধন,' 'সুদ্ধি-বজ্রপ্রদীপিকা' (হে বজ্রতন্ত্রের টিপ্পনী) শ্রীচক্রসম্বর গর্ভতত্ত্বনিধি,' "হুঙ্কারচিত্ত বিন্দুভাবনাক্রম' প্রভৃতি নিবন্ধের তিব্বতীয় অনুবাদ পাওয়া গিয়াছে। এই বাণীগুলি সব এক জনেরই লেখা না হওয়া সম্ভব। শেষের বহিটির নাম থেকে মনে হয় যে এটি যোগপন্থী জালন্ধরির রচনা। * * * * বাঙ্গালা দেশের বাহিরের কাহিনীতে বিশেষত্ব হচ্ছে হাড়িপার নামান্তর জালন্ধরির ব্যবহার।"

(নাথপন্থের দিশা— কল্যাণশ্রী, শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৫৫ বাং)

ধর্ম্মপুরাণের সৃষ্টিকাহিনীতে ধর্ম্মের হাড় হইতে হাড়িপার জন্ম উদ্ভাবন করা হইয়াছে।

মীন নাথ, গোরক্ষ নাথ, হাড়িফা নাথ, কানুপা নাথ ও গাভুর সিদ্ধা সম-সাময়িক (৬ষ্ঠ অধ্যায়, হরগৌরী ও সিদ্ধা সংবাদ দ্রষ্টব্য)। মীন নাথ বা মৎস্যেন্দ্র নাথের সময় আমরা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিয়াছি ৫২২ খৃঃ অব্দ। রাজা গোপী-চাঁদ বা গোবিন্দচন্দ্রের সময় ১০ম-১১শ খৃঃ অব্দ (গোপীচাঁদের সন্ন্যাস—সম্পাদকীয়, ৬৮ পৃঃ)। তাহা হইলে রাজার গুরু হাড়িপা বা জালন্ধর নাথের সময় ৬ষ্ঠ হইতে ১০ম-১১শ খৃঃ অব্দ বলিয়া মোটামুটীভাবে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে।

রাজা গোপীচাঁদ স্বীয় গুরু জালন্ধর নাথের সঙ্গে বন-গমনকালে তাঁহার পথশ্রম লাঘবের জন্য জালন্ধর বা হাড়িপার নির্দ্দেশে এক জাঙ্গাল (ক্ষুদ্র রাস্তা) নির্ম্মিত হয়—

"সিদ্ধায় বোলে দৈত্যবর মোর আজ্ঞা পরে।
সুরিপু যাইতে এক জাঙ্গাল দেও মোরে॥
হাড়িপার আজ্ঞা যদি দৈত্যগণ পাইল।
আজ্ঞা অনুরূপ এক জাঙ্গাল বাঁধিল॥"

(ময়নামতীর গান)

"রাজমালা' গ্রন্থে ইহাকে হাড়িফার জাঙ্গাল বলা হইয়াছে। পূর্ব্ব লালমাই পাহাড়ে হাড়িফার দীঘি আছে। * * * লালমাই পাহাড়ে শালবানপুর নামক একটি গ্রাম আছে। এখানকার শালবানের দীঘি বিখ্যাত। দীঘির পাড়ে বাসভবনের চিহ্ন আছে। ইহা হাড়িপা ও শালবানের বাসভবন বলিয়া কথিত।" (গোপীচাঁদের যোগধর্ম্মাবলম্বন— উদ্বোধন, বৈশাখ, '৫৮, বাং ১৯৩ পৃঃ)

বর্ত্তমান পাকিস্তানের ত্রিপুরা জিলার কুমিল্লার নিকটে ময়নামতী লালমাই পাহাড় অবস্থিত।

যোগিগুরু কানুপা নাথ

সময়— ৬ষ্ঠ খৃঃ অব্দ হইতে ১০ম বা ১১শ খৃঃ অব্দ

"কৃষ্ণাচার্য্য বা কানুপা, নাথ-সাহিত্যের একজন বিখ্যাত নাথ। তিনি হাড়িপা বা জালন্ধরীর শিষ্য।" (ভট্টশালীর গোপীচাঁদের সন্ন্যাস— সম্পাদকীয়, ৬৩ পৃঃ)

অধ্যক্ষ ডাঃ শহীদুল্লাহ্ বলেন— "নাথ-সাহিত্যে সিদ্ধা কানুপার নাম সুপরিচিত। ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকে এই নাম বিভিন্ন আকারে দেখা যায়, যথা— গোরক্ষবিজয়ে কানফা, কাহ্নাই, কানু। ময়নামতীর গানে— কালুফা। মীন-চেতনে— কানাই, কালফা। সুকুর মহম্মদের গোপীচাঁদের সন্ন্যাসে— কান্হাঞি, কানুফা, কানফা। গোবিন্দচন্দ্র গীতে— কানুফা, কানুপা, কানূফা। সহদেব চক্রবর্ত্তীর ধর্ম্মমঙ্গলে— কালুপা। সাধন-মাহাত্ম্যে— কানুক নাথ। কানুপা

বিখ্যাত গোপীচাঁদের দীক্ষাগুরু হাড়িপার চেলা। হাড়িপার নামন্তর জালন্ধরি।" (হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালায় সিদ্ধাকানুপার গীত ও দোঁহা— ১ পৃঃ) কেহ কেহ বলেন শিগুপা (শিগুপাদ) কানুপার প্রকৃত নাম। ইনি তন্ত্রে নিপুণতা লাভ করিয়া কৃষ্ণাচার্য্য নামে অভিহিত হইয়াছেন। তাঁহার আর এক নাম গুরু কৃষ্ণাচারী। Albert Grunwedel জার্ম্মাণ ভাষায় ৮৪ মহাসিদ্ধের এক ইতিহাস লিখিয়াছেন। তাহার নাম Die Geschichtender Vierundachtzig Zauberer (Mahasiddhas); তাহাতে গুরু কৃষ্ণচারীকে ৮৪ জন মহাসিদ্ধার মধ্যে ধরা হইয়াছে এবং পাদটীকায় বলা হইয়াছে যে, তিব্বতী ভাষায় ইঁহার নাম নগ্‌পোস্প্যোদ্‌প এবং কহন, কাহনা পা, কহন পাদ, কনপ তাঁহার অন্যান্য নাম। কৃষ্ণচারীর বাড়ী সোমপুরীতে এবং তিনি জালন্ধরির শিষ্য। এই সোমপুরী কোথায়? বুদ্ধগয়ায় একখানি শিলালিপিতে বলা হইয়াছে—"শ্রীসামতটিকঃ। প্রবর মহাযান যায়িনঃ শ্রীমৎ সোমপুর মহাবিহারীয় বিনয়বিৎ-স্থবিরবীর্য্যেন্দ্র ভদ্র (স্য)* ইত্যাদি। ইহা হইতে বুঝা যায় সোমপুরী সমতটে বা নিম্ন বঙ্গে ছিল এবং সেখানে একটি মহাবিহারও ছিল। এই সোমপুর সোমপুরীর সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। হইতে পারে কৃষ্ণাচারীও আমাদের সিদ্ধাকানুপা উভয়ে একই ব্যক্তি". (পরিশিষ্ট— ২৮ পৃঃ)। "পগসম্ জোন্ জং নামক তিব্বতীয় গ্রন্থেও কয়েক জন কৃষ্ণের (নগ্‌পো) পরিচয় পাওয়া যায়। তন্মধ্যে যিনি কহন বা বড় কৃষ্ণাচার্য্য (নগ্‌পোস্প্যোদ্‌পছেব) তিনি ওড়িষ্যার ব্রাহ্মণ বংশে উৎপন্ন ও সিদ্ধ জলন্ধর কর্ত্তৃক তন্ত্রমতে দীক্ষিত বলিয়া কথিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত নামসূচীতেও আমরা "মহাপণ্ডিত, ব্রাহ্মণ, উড়িষ্যা হইতে আগত" কৃষ্ণ বা কানুপাদের নাম পাইতেছি।" (৪ পৃষ্ঠা— সিদ্ধাকানুপার গীত ও দোঁহা)। "কৃষ্ণপাদ,

---

* বুদ্ধগয়ার দুইখানি শিলালিপি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ২৩ ভাগ।

কৃষ্ণাচার্য্য, কৃষ্ণবজ্র বা কাহ্নুপাদ সর্ব্বশুদ্ধ ৫৭ খানি বহি লিখিয়াছেন। এই ৫৭ খানি গ্রন্থের গ্রন্থকার যে একই কৃষ্ণ তাহাই বা কে বলিতে পারে? কোন জায়গায় কৃষ্ণকে মহাচার্য্য, কোন জায়গায় উপাধ্যায়, কোন জায়গায় মণ্ডলাচার্য্য বলা হইয়াছে। এক জায়গায় আবার তাঁহাকে ছোট কৃষ্ণ বলা হইয়াছে। পাঁচ জায়গায় তাঁহাকে কৃষ্ণাচার্য্য বা কাহ্নপাদ বলা হইয়াছে।" (শাস্ত্রীর বৌদ্ধগান ও দোঁহা)। তিব্বতে স্বীকৃত ৮৪ জন মহাসিদ্ধের নামের তালিকায় কৃষ্ণচারী কাহনপাদ বা কনপ সপ্তদশ স্থানীয় (চারুবাবুর শূন্য পুরাণের ভূমিকা— ৩ পৃঃ)। তাঁহার এই সকল নাম ও উপাধির বিবরণ তদ্রচিত গ্রন্থাদির উল্লেখসহ কোডিয়ার সাহেব কর্ত্তৃক প্রকাশিত তালিকায় পাওয়া যায়। (ক) পরিশিষ্ট ১।৴০—১।৶০ পৃঃ)। চর্য্যাপদের কৃষ্ণাচার্য্য নিজকে জালন্ধরী পাদের শিষ্য বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন (৩৬ সংখ্যক চর্য্যা)। এই জালন্ধরির অপর নাম হাড়িপা (শূন্য পুরাণের ভূমিকা—৪ পৃঃ)।

অধ্যাপক ডাঃ সুকুমার সেন বলেন— "কয়েকটি চর্য্যা হইতে বুঝা যায় যে কাহ্নপাদ কাপালিক যোগী এবং লেখক ছিলেন।" (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস)। অধ্যাপক তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত, এম-এ, পি-এইচ, ডি, বলেন— "* * * নাথ সিদ্ধাইগণ সকলেই কান চিরিয়া কানফাটা যোগী আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন। কালুপা, কানুপা বা কালপা নামটী বোধ হয় কানফাটা যোগীবোধক। মীনচেতনে আছে—

"পূর্ব্বদিকে হাড়িপা গেল দক্ষিণে নিমাই।
পশ্চিমে গোরক্ষ নাথ উত্তরে কানাই॥"

ইহা হইতে বোধ হইতেছে যে সিদ্ধাইগণ বাহির হইতে বঙ্গে প্রবেশ করিয়াছিলেন।" (ইতিহাস ও আলোচনা— নাথধর্ম্ম, শ্রাবণ, ১৩২৮ বাং)। শৈবদিগের বামাগামা শাখাভুক্ত কালুপাকে গ্রীয়ার্সন সাহেব সিদ্ধাই কানুপা বলিয়া মনে করেন (গ্রীয়ার্সন সাহেবের মাণিকচন্দ্র রাজার গান)। "কানুপার প্রচলিত

নাম কানাই।" (গোপীচাঁদের সন্ন্যাস— ৯ পৃঃ পাদ-টীকা)। রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর "লাম্‌সুম পথন্ পো প্রণীত তিব্বতী ইতিহাসের যে সংস্করণ প্রকাশ করেন তাহাতে দেখা যায় "নগ্‌পোস্প্যোদ্‌প—কৃষ্ণাচার্য্য, ইনি ব্রাহ্মণ জাতীয় একজন তান্ত্রিক আচার্য্য। তাঁহারই চেষ্টার ফলে গোপীপাল (১) তান্ত্রিক মতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। নগ্‌পোস্প্যোদ্‌প (বড় কৃষ্ণাচার্য্য) তিনি উড়িষ্যার ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন (তিব্বতী ইতিহাস)।

ঐ সব যে নাথসিদ্ধা কানুপার নামান্তর সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকা উচিত নহে। এখন কানুপার সময় বিচার করা যাউক।

ডাঃ শহীদুল্লাহ্ বলেন—"সিদ্ধা কানুপার নাম নাথ-সাহিত্যে সুবিদিত। তিনি পূর্ব্ববঙ্গের বিখ্যাত রাজা গোবিন্দচন্দ্রের সময় বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার গুরু ছিলেন হাড়িপা যাঁহার নামান্তর জালন্ধরিপা। রাজেন্দ্র চোল এই গোবিন্দচন্দ্রের সহিত ১০২৩ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধ করেন। তাহা হইলে সিদ্ধা কানুপা খৃঃ ১০০০ অব্দের কিছু আগে বা পরের লোক হইতেছেন। কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত শ্রীহেবজ্র পঞ্জিকা যোগরত্নমালা (ইহার তারিখ ১১৯৯ খৃঃ অব্দ) নামে একটী যোগ-শাস্ত্রের পুস্তক আছে। তাহার শেষ এইরূপ— "শ্রীহেবজ্র পঞ্জিকা যোগরত্ন মালা সমাপ্তা। কৃতিরিয়ং পণ্ডিতাচার্য্য শ্রীকাহ্নপাদানাম্ পরমেশ্বরেত্যাদি রাজাবলী পূর্ব্ববৎ। শ্রীমদ্ গোবিন্দ পাল দেবানাম্ সং ৩৯ ভাদ্র দিনে ১৪ লিখিতমিদং পুস্তকংকা শ্রীগয়া কারণ॥" খ্রীষ্টীয়াব্দে ইহার লিপিকাল হইবে ১২০০। এই পুস্তকের আলোচ্য বিষয় হইতে তাহা যে চর্য্যাকার কাহ্নুপাদের লেখা তাহা অনায়াসে বুঝা যায়। * * * যদি কাহারও এই মত গ্রহণে আপত্তি থাকে, তাহা হইলেও কানুপা যে তুরস্ক কর্ত্তৃক ১১৯৯ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালা আক্রমণের পূর্ব্বে ছিলেন, তাহা সহজে স্বীকার করা যাইতে পারে। তবে কানুপা— ১০০০ ও ১২০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বর্ত্তমান ছিলেন ইহা একরূপ নিশ্চিত। বঙ্গের রাজা

(১) আমাদের গোপীচাঁদ বা গোবিন্দচন্দ্র

গোপীচাঁদ বা গোবিন্দচন্দ্রের সহিত কানুপার নাম ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। শিলা-লিপির প্রমাণ অনুসারে বঙ্গের চন্দ্রবংশীয় রাজারা বৌদ্ধ ছিলেন এবং রাজেন্দ্র চোল ১০২৩ খ্রীষ্টীয় অব্দে গোবিন্দচন্দ্রকে পরাভূত করেন। কানুপা এই সময় বর্ত্তমান ছিলেন। তাহা হইলে কানুপাকে একাদশ শতকের প্রথম ভাগের দশম শতকের শেষ ভাগের লোক বলিয়া অনায়াসে স্বীকার করা যায়।” (সিদ্ধা কানুপার গীত ও দোঁহা— 'সিদ্ধা কানুপার গীত ও দোহা' অংশ—১পৃঃ, এবং 'সিদ্ধা কানুপা' অংশ— ৫পৃঃ)। লুইও কানুপার চর্য্যা বিচার করিলে মনে হয় ইঁহারা সমসাময়িক। লুইর সময়— ১০৩৮ খৃঃ অঃ (বৌদ্ধগান ও দোঁহা— ভূমিকা)। অধ্যাপক ডাঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় বহু যুক্তি প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে গোপীচাঁদ বা গোবিন্দচন্দ্রের সময়— ১০ম খৃঃ অব্দ। (গোপীচাঁদের সন্ন্যাস—সম্পাদকীয়, ৬৮ পৃঃ)। রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলয় শিলা-লিপির বিচারেও দেখা যায় যে (১০২০— ২৪ খৃঃ অব্দে) তিনি বঙ্গালরাজ গোবিন্দচন্দ্রকে পরাজিত করিয়াছিলেন (গৌড়-রাজমালা—৩৯ পৃঃ)। “অন্য প্রমাণ থেকে আমরা আর একটু সঠিক তারিখ পেতে পারি। আমরা দেখেছি কানুপার গুরু জালন্ধরি। জালন্ধরির গুরু ইন্দ্রভূতি যার নাম আগে করেছি। এতে খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকে আমরা কানুপার সময় ফেলতে পারি।” (শনিবারের চিঠি— আশ্বিন, ১৩৫১ বাং, ৩৮৫— ৩৮৬ পৃঃ, ডাঃ শহীদুল্লাহ্‌র 'মীন নাথ ও কানুপা')।

মীন নাথ ও কানুপা নাথ সমসাময়িক (৬ষ্ঠ অঃ হরগৌরী ও সিদ্ধাসংবাদ দ্রঃ)। মীন নাথের সঠিক সময়— ৫২২ খৃষ্ট অব্দ। তাহা হইলে কানুপার সময় ৬ষ্ঠ খৃঃ অব্দ হইতে ১০ম-১১শ খৃঃ অব্দ বলিয়া মোটামুটীভাবে সিদ্ধান্ত করা যায়।

[কানুপার রচিত চর্য্যা বা গান এবং এ সম্বন্ধীয় আলোচনা ৫ম অধ্যায়ে দেখুন।]

যোগিগুরু ধর্ম্ম নাথ বা ধরম নাথ

সময়— ৭৩৬ খৃঃ অব্দ। অন্য মতে ১৫শ খৃঃ অব্দ।

History of Kanpathas of Kutcha প্রবন্ধে ডি, পি, থক্কর বলেন—

ধর্ম্ম নাথ মৎস্যেন্দ্র নাথের শিষ্য। শোনা যায় ধর্ম্ম নাথ পেশোয়ার হইতে কাথিওবার রাজ্যে আসেন ও তপস্যার স্থান অনুসন্ধান করিতে করিতে কচ্ছ প্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি রুক্মাবতীর পূর্ব্বতীরে র‍্যাণ নামক স্থানে (মাণ্ডবীর প্রায় দুই মাইল উত্তরে) স্বীয় তপস্যার স্থান নির্দ্দিষ্ট করেন। ধর্ম্ম নাথের সঙ্গে শরণ নাথ ও গরীব নাথ নামক দুই জন সাধক ছিলেন। কেহ কেহ বলেন ধর্ম্ম নাথের সঙ্গে কেবলমাত্র গরীব নাথই ছিলেন। এই সময়ে উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্যের পিতা গাধা সিং এখানে রাজত্ব করিতেন। আবার কেহ কেহ বলেন চাবাড় রাজপুত্তের রাজা রামদেব তখন এখানকার রাজা ছিলেন। ধর্ম্ম নাথ যোগীদের নিয়মানুযায়ী একটি ছায়াযুক্ত বৃক্ষের নিম্নে ধুনি জ্বালিয়া গরীব নাথকে ভিক্ষার জন্য নগরে পাঠাইয়া দিতেন। সে স্থানের লোক ধর্ম্মহীন ছিল। ছুতার জাতীয় একটি স্ত্রীলোক ভিন্ন অন্য কেহ তাঁহাকে ভিক্ষা দিত না। তাই গরীব নাথ বনে গিয়া কাষ্ঠ সংগ্রহ করতঃ তাহা বিক্রী করিয়া ময়দা ক্রয় করিতেন এবং উক্ত স্ত্রীলোকের দ্বারা রুটী প্রস্তুত করাইয়া ধর্ম্ম নাথের ভোগ দিতেন। এই ভাবে বার বৎসর কাটিল। একদিন গরীব নাথ নিদ্রিত ছিলেন, এমন সময় বাতাসে তাঁহার গায়ের কাপড় উড়াইয়া লইয়া যায়। ধর্ম্ম নাথ সে সময় গরীব নাথের দেহে কীটপূর্ণ ক্ষতস্থান দেখিয়া সমূহ বিবরণ অবগত হইয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন এবং উক্ত ছুতার স্ত্রীলোকটিকে নগর ত্যাগ করিতে বলিলেন। তৎপর ধর্ম্ম নাথ নিজের ভিক্ষাপাত্র উপুড় করিয়া অভিশাপ দিলেন— "পত্তন সব দত্তন" অর্থাৎ পত্তন ভূগর্ভে প্রোথিত হউক। নিমেষ মধ্যে ৮৪ পত্তন ভূগর্ভে

প্রোথিত হইয়া গেল। সেই ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরের উপর বর্ত্তমান র‍্যাণ গ্রাম অবস্থিত।

ধর্ম্ম নাথ পত্তন ধ্বংস করিয়া সন্তপ্ত হন, এবং প্রায়শ্চিত্তের জন্য কঠোর তপস্যা করিবার মনস্থ করেন। তিনি ধিনোধর পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় আরোহণ করিয়া বজ্রস্থুণারি আসনে ঊর্দ্ধপদে হেটমুণ্ডে প্রস্তরাসনে দ্বাদশ বৎসর তপস্যা করেন। স্বয়ং ভগবান নয় নাথ চৌরাশী সিদ্ধা সেখানে আসিয়া ধর্ম্ম নাথকে তপঃ ভঙ্গ করিতে অনুরোধ করেন। ধর্ম্ম নাথ বলিলেন তিনি প্রথম যেদিকে চাহিবেন সে দিকের সব পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে। ভগবান গোরক্ষনাথ অন্যান্য সিদ্ধাদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া তাঁহাকে উত্তর-পূর্ব্ব কোণে সাগরের দিকে দৃষ্টিপাত করার আদেশ দিলেন। তিনি তদনুসারে সেই দিকে দৃষ্টিপাত করায় অসংখ্য জীব সমেত সাগর শুকাইয়া গেল এবং র‍্যাণ নামক ভূভাগের সৃষ্টি হইল। এ ভাবে অসংখ্য জীব নষ্ট হইতেছে দেখিয়া ধর্ম্ম নাথ বলিলেন তাঁহার তপস্যার ফল নষ্ট হইয়া যাইতেছে। গোরক্ষনাথ পদের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে বলিলেন কিন্তু ধর্ম্ম নাথ পর্ব্বতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, ফলে পর্ব্বত দ্বিখণ্ডিত হইয়া বৃহৎ দুই অধিত্যকার সৃষ্টি হইল। নাসিকার স্থান ঠিক থাকাতে তাহা নাসিকার আকার ধারণ করিল। ঐ পর্ব্বত আজিও নাসিক বা নাসিকা পর্ব্বত নামে অভিহিত হয়।

তৎপর সিদ্ধাদের পর্ব্বত অবতরণকালে সিদ্ধিপানের ইচ্ছা হইল। জলাভাবের জন্য গোপীচাঁদ সিদ্ধ কুনারি দ্বারা পর্ব্বতগাত্রে আঘাত করিয়া জল পাইলেন। ঐ গহ্বর আজিও বর্ত্তমান আছে। একটি দণ্ড দ্বারা আঘাত না করিলে এ গহ্বর হইতে জল পাওয়া যায় না। ইহার জল লোনা ছিল, তাই সিদ্ধাদের যোগবলে উত্তম জল হইল। ইহা আজিও সিদ্ধিবিড় নামে খ্যাত। এখানে সর্ব্বশ্রেণীর লোক পূজা দিয়া থাকেন। ধর্ম্ম নাথ পর্ব্বতের পাদদেশে নামিয়া সেখানে মন্দিরের স্থান নির্দ্দেশ করেন এবং সেখানে অন্নসত্র স্থাপন করেন। যে অন্ন ভিক্ষা না পাওয়াতে তিনি পত্তন ধ্বংস করিয়াছিলেন, লোকশিক্ষার জন্য

সেখানে অবতরণ করেন। তারপর তিনি কোথায় গেলেন, কেহ জানে না। সকলে বলেন তিনি আজিও জীবিত আছেন।

ধর্ম্ম নাথ ১৪৩৮ খৃঃ অব্দে কচ্ছ প্রদেশে উপস্থিত হন এবং ১৪৫০ খৃঃ অব্দে পত্তন ধ্বংস করেন। আবার এখানকার যোগীদের বংশতালিকায় দেখা যায় ধর্ম্ম নাথ সং বৎ ৭৯০তে (৭৩৬ খৃঃ অঃ) কচ্ছে আগমন করেন। ধীনোধরে ধর্ম্ম নাথের মন্দির আছে। ইহা দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে সাত ফুট, দেওয়ালের উচ্চতাও সাত ফুট হইবে। এখানে মার্ব্বেল পাথরের নির্ম্মিত ধর্ম্ম নাথের মূর্ত্তি আছে। মূর্ত্তি তিন ফুট উচ্চ, তাঁর কর্ণে দর্শন আছে। এখানে পিত্তল নির্ম্মিত শিব লিঙ্গ ও অন্যান্য অনেক দেবদেবীর মূর্ত্তি আছে। ধর্ম্ম নাথ কর্ত্তৃক জ্বালিত ঘৃতপূর্ণ দীপ আজিও জ্বালাইয়া রাখা হইয়াছে। ইহা কখনও নিভিতে দেওয়া হয় না। প্রত্যেক দিন সকালে ও সন্ধ্যায় এখানে পূজা দেওয়া হয়। আর এক অংশে ধর্ম্ম নাথের প্রজ্বলিত ধুনি আজিও জ্বালাইয়া রাখা হইয়াছে। ইহাও কখনও নিভিতে দেওয়া হয় না। গোকুল অষ্টমী ও নবমীর দিন ধুনিতে অনেক কাষ্ঠ দেওয়া হয় এবং ভাং, ময়দা ও চিনি দ্বারা প্রসাদ পাক করা হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় যত জনকেই দেওয়া হউক না কেন এই প্রসাদ ফুরায় না।

পর্ব্বতের উচ্চ চূড়ায় (১২৬৮ ফিট) ধর্ম্ম নাথের মন্দির আছে। ইহা ব্রহ্ম-ক্ষত্রি শেঠ সুন্দরজী শিভাজী ১৮৭৭ সং বৎ অব্দে নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। মন্দির মধ্যে ত্রিকোণাকার একটি গর্ত্ত আছে। প্রবাদ আছে যে এখানে মাথা রাখিয়া ধর্ম্ম নাথ তপস্যা করিয়াছিলেন। সিন্দুর ও ঘি দিয়া তাহা লেপিয়া রাখা হইয়াছে। মাড়োয়ার ও যোধপুরে ধর্ম্ম নাথের মন্দির আছে। যোধপুরের মহারাজা ইহার পৃষ্ঠপোষক (১) (Indian Antiquary of 1878, February, Article History of Kanpathas of Kutch By D. P. Khakar of Kutcha প্রবন্ধে বিস্তৃত বিবরণ আছে)।

---

(১) শ্রীভোলানাথ নাথ, এম-এ কৃত বঙ্গানুবাদ সংক্ষেপীকৃত।

যোগিগুরু বটুক নাথ

সময়— ৮ম খ্রীষ্টীয় শতাব্দী

নাথযোগী বটুক নাথ ভৈরব মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন এবং সাধনার প্রভাবে ভৈরবকে বশীভূত করিয়াছিলেন। দিগ্বিজয় উপলক্ষে বেদান্তকেশরী শঙ্করাচার্য্য উজ্জয়িনী নগরে আসিয়াছিলেন। সে সময় বটুক নাথ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। কাপালিক মত নিয়া উভয়ের মধ্যে খুব তর্ক-বিতর্ক হইয়াছিল। বটুক নাথ কাপালিক মতের উৎকর্ষতা প্রমাণ করিতেছিলেন, অপর পক্ষ আচার্য্য শঙ্কর এই মতের অসারতা প্রমাণ করিয়া অদ্বৈতমতের প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা করিতেছিলেন। বটুক নাথ তাহা সমর্থন না করায় তাঁহাকে এখান হইতে তাড়াইয়া দিবার জন্য শঙ্করাচার্য্য স্বীয় শিষ্যদিগকে আদেশ দেন। শিষ্যগণ তৎক্ষণাৎ শঙ্করাচার্য্যের আদেশ পালন করিয়াছিলেন। ইহাতে বটুক নাথ খুব ক্রুদ্ধ হইয়া একটি নরমুণ্ড হাতে লইয়া তাহা মদ্যপূর্ণ করতঃ অর্দ্ধেক মদ্য নিজে পান করিলেন, এবং অপর অর্দ্ধেক নিজের শিষ্যদের মধ্যে বিতরণ করিলেন। পরে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক হুঙ্কার ছাড়িয়া সুবিচারের জন্য স্বীয় উপাস্য দেবতা সংহার ভৈরবকে আহ্বান করিলেন। তিন বার মন্ত্রোচ্চারণের পর সংহার ভৈরব ঐ স্থানে আবির্ভূত হইলে পর আচার্য্য শঙ্কর তাহাকে নমস্কার করিয়া বলিতে লাগিলেন—

"স্বামিন্! বেদেষু শাস্ত্রেষু পুরাণেষু কর্ম্ম যৎ ॥
প্রতিপাদিতমস্তীহ তৎকর্ত্তব্যং হি ধর্ম্মতঃ।
বিপ্রাণাং কর্ম্মণা ধর্ম্মঃ সাধ্যঃ স্যাদিতি মে মতম্ ॥"

(শঙ্করবিজয়— ত্রয়োবিংশ প্রকরণ)

অর্থাৎ বেদপুরাণাদি শাস্ত্রে যে সকল কর্ম্মের বিধি-ব্যবস্থা আছে, সে সব বিধি-ব্যবস্থা অনুসারে কার্য্য করাই উচিত। বিপ্রগণের ধর্ম্ম একমাত্র কর্ম্ম দ্বারাই সাধিত হইতে পারে। ইহাই আমার মত।

ইহার পর আচার্য্য শঙ্কর আরও বলিলেন, আপনার ভক্ত বটুক নাথ বেদ-সম্মত ব্রাহ্মণাচার ত্যাগ করিয়া দুষ্ট মত গ্রহণ করতঃ ইহার প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন। আপনি এখন উপস্থিত আছেন। আপনি ইহার বিচার করুন।

"ইত্যুক্তো ভৈরব প্রাহ বিপ্রদণ্ডার্থমাগতঃ।"

(শঙ্করবিজয়— ত্রয়োবিংশ প্রকরণ)

বিপ্রের দণ্ডের নিমিত্ত সমাগত ভৈরব শঙ্করাচার্য্যের মত অনুমোদন করিলেন এবং বলিলেন বটুক নাথের মন্ত্রের প্রভাবেই আমি এখানে আসিয়াছি, তাঁহার ধর্ম্মের প্রভাবে নহে। তুমি ইহাদিগকে ব্রাহ্মণাচার গ্রহণ করাও—

"তেষাং কাপালিকানাস্তু ব্রাহ্মণ্যাচারতাং কুরু।"

(শঙ্করবিজয়—ত্রয়োবিংশ প্রকরণ)

ভৈরব অন্তর্হিত হইলে পর সশিষ্য বটুক নাথ স্বীয় মতের অসারতা উপলব্ধি করিতে পারিয়া শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া ব্রাহ্মণোচিত ক্রিয়াকাণ্ডে রত হইয়াছিলেন।

শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব ৭৮৮ এবং তিরোভাব ৮২০ খ্রীষ্টীয় শতাব্দীতে। তাহা হইলে নিঃসন্দেহে বটুক নাথের সময় ৮ম ও ৯ম শতাব্দী।

(আনন্দগিরি কৃত সংস্কৃত ভাষার শঙ্করবিজয়ম্ গ্রন্থে এ সম্বন্ধীয় বিস্তৃত বিবরণ আছে)।

যোগিগুরু বিরূপাক্ষ নাথ

সময়— ১০ম-১১শ খৃঃ অব্দ হইতে ১৪শ খৃঃ অব্দ

তন্ত্রে যে তারাগুরুপংক্তি দৃষ্ট হয়, তাহাতে আছে—

"তারাবত্যম্ব ভানুমত্যম্ব বিদ্যাম্ব মহোদর্য্যম্ব সুখদানন্দ নাথ পরমানন্দ নাথ পারিজাতানন্দ নাথ কুলেশ্বরানন্দ নাথ **বিরূপাক্ষানন্দ নাথ** ফেরস্বাঃ পূজয়েৎ। এতে মানবৌঘাঃ।"

"অথ তারা গুরুন বক্ষ্যে দৃষ্ট দৃষ্ট ফল প্রদান্ ।
উর্দ্ধকেশো ব্যোমকেশো নীলকণ্ঠো বৃষধ্বজঃ ।।
দিব্যোঘাঃ সিদ্ধিদাঃ বৎস সিদ্ধৌঘান্ শৃনু যত্নতঃ ।
বশিষ্টঃ কর্ম্ম নাথশ্চ মীন নাথো মহেশ্বরঃ ।।
হরি নাথো মানবৌঘান শৃনু বক্ষ্যামিতদ্ গুরূন্ ।
তারাবতী ভানুমতী জয়াবিদ্যামহোদরী ।।
সুখানন্দঃ পরানন্দঃ পারিজাতাঃ কুলেশ্বরঃ ।
বিরূপাক্ষঃ ফেরবীচ কথিতং তারিণীকুলং ।।
আনন্দ নাথ শব্দান্তাঃ গুরবঃ সর্ব্বসিদ্ধিদাঃ ।"

(তন্ত্রসার)

বিরূপাক্ষ নাথ অমৃতসিদ্ধ যোগ নামক এক যোগশাস্ত্রের গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহাতে আছে—"**শ্রীবিরূপাক্ষ নাথেন** কৃতে সদযোগিনাং কৃতে ।।" ইহার অন্যত্র আছে— "ইতি **বিরূপাক্ষ সিদ্ধ** বিরচিতামৃত সিদ্ধিযোগঃ সমাপ্তঃ ।"

উপরের উদ্ধৃত শ্লোক সমূহে মোটা অক্ষরে লিখিত পদগুলি লক্ষ্য করিলে বেশ বুঝিতে পারা যাইবে যে বিরূপাক্ষানন্দ নাথ, বিরূপাক্ষ, বিরূপাক্ষ নাথ, বিরূপাক্ষ সিদ্ধ সবগুলিই একজনের নাম। তন্ত্রে সুস্পষ্টভাবে লিখা আছে যে অনন্দ নাথ শব্দ যাঁহাদের নামের শেষে আছে সেই সকল গুরু সর্ব্বসিদ্ধিদাতা।

এই বিরূপাক্ষ বর্ণন রত্নাকরের নাথ চৌরাশী সিদ্ধাগণের একজন, এবং চর্য্যাচর্য্য বিনিশ্চয়ের অন্যতম চর্য্যাকার। হঠযোগ-প্রদীপিকায় এই নাম বিরূপা বা বিরূপাক্ষ আকারে দেখা যায়।

জনশ্রুতি এই যে ফিরোজ সাহের রাজত্বকালে (১৪শ খৃঃ অব্দ) বিরূপাক্ষ নাথ বর্ত্তমান ছিলেন। প্রবাদ এই যে ফিরোজ সা, সিদ্ধ বিরূপাক্ষের বরেই

দিল্লীর সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। মাণিকচন্দ্রকৃত ধর্ম্মচন্দ্র নাটক পাঞ্জাবে (পাকিস্থানসহ) প্রচলিত আছে। এই নাটকে আছে—

প্রথমে দিনে পিরোজ পাভুলোফিরে উদাস্
নগর বরহট জল্লাদিনোতাহি নিবাস্
ভিখ মাংকে নগরমে রহে বরহাট আন
ভবন প্রদক্ষিণ বিন বিনা করে পাইসে করে না পান।
প্রাত নিশাকর জোবকি অম্বা অম্বামায়ি
রাক নিচ্ছজয় ছত্রপৎ করোমোহি পারসাই
বিরূপাক্ষ যোগীরহে বীর ভদ্দরকে থান
ধুনিলকৃড়ী সিসধার ভক্তি করে দিনরাত
তাপসকে বশ সব ভায়ো দেবীদেব গণেশ
সিদ্ধসাধ তাপস করে ধর ধর নানা বেশ
সাত দিবস বর্ষাভৈ আগনা জারি যায়
আগজারায় পিরোজ পা ধুনি দে জাগায়
বিরূপাক্ষ টোপি দৈধারী জুসিস পিরোজ
তাহিদিন টুবি জল্লা দিল্লী দিনি তাহি
সো আবহি দর্শন কর জাঁবতাই ভোজগপাদসাহি।"

(ধর্ম্মচন্দ্র নাটক)

ইহার মোটামুটী মর্ম্ম এই যে— প্রথম দিন ফিরোজ হতাশ হইয়া ফিরিতে লাগিলেন। পরে জল্লাদেবী বরহাট নগরে আশ্রয় দিলেন। বাদশা ভিক্ষা করিয়া নগরে থাকিতেন এবং দেবীকে প্রদক্ষিণ না করিয়া জল পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতেন না। বাদশা প্রত্যেক রাত্রিতে 'মা! আমায় বাদশা কর' বলিয়া প্রার্থনা করিতেন। যোগী বিরূপাক্ষ বীরভদ্রের মন্দিরে অবস্থান করিতেন এবং ফিরোজ শা প্রত্যহ তাঁহার ধুনীর কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া দিতেন। সিদ্ধ সাধুর

তপস্যায় দেবদেবী গণেশ সব বশীভূত হইয়াছিলেন। সাতদিন বর্ষা নামিল। তথাপি ফিরোজ শা যোগীর ধুনী জ্বালাইয়া রাখিলেন। বিরূপাক্ষ ফিরোজের মাথায় টুপী দিয়াছিলেন। অম্বার নির্দ্দেশে বিরূপাক্ষ ফিরোজকে দিল্লীর সম্রাট করিলেন।

দিল্লীর ফিরোজ শা স্তম্ভের উপর ভয়ঙ্কর নাথের নাম খোদিত আছে। ইহা হইতে বেশ বুঝা যায় ফিরোজ শাহের রাজত্বকালে নাথ-সন্ন্যাসীদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল।

বিরূপাক্ষ চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ের অন্যতম চর্য্যাকার। চর্য্যাগুলি ১০ম-১১শ খৃঃ অব্দের রচিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। আর ফিরোজ শাহের সময় ১৪শ খৃঃ অব্দ। তাহা হইলে বিরূপাক্ষের সময় ১০ম বা ১১শ খৃঃ অব্দ হইতে ১৪শ খৃঃ অঃ বলিয়া মোটামুটীভাবে সিদ্ধান্ত করাই যুক্তিসঙ্গত হইবে।

যোগিগুরু জ্ঞানেশ্বর নাথ

সময়—১২৭৫ খৃঃ অব্দ

ডাঃ কল্যাণী মল্লিক বলেন—"মহারাষ্ট্রের সুবিখ্যাত গীতাভাষ্য রচয়িত শ্রীজ্ঞানেশ্বর মহারাজ নাথ-সম্প্রদায়ের। মহারাষ্ট্রে তিনি ও তাঁহার অগ্রজ নিবৃত্তি নাথ নাথধর্ম্ম প্রচার করেন। ১২৭৫ খৃষ্টাব্দে জ্ঞানদেবের জন্ম হয়, পরে ইঁহার নাম হয় জ্ঞানেশ্বর। ইঁহার রচিত সুললিত গীতাভাষ্য জ্ঞানেশ্বরী নামে প্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছে। মাত্র একবিংশতি বৎসর বয়সে ইনি জীবন্ত সমাধি গ্রহণ করেন। কথিত আছে তাঁহার ইচ্ছায় তাঁহার পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাত তাঁহাকে সমাধিস্থ করেন। পিতা সন্ন্যাস গ্রহণের পর পুনরায় গুরুর আদেশে গার্হস্থ্যধর্ম্ম অবলম্বন করিলে নিবৃত্তি নাথাদির জন্ম হওয়ায় ইঁহারা সপরিবারে সমাজচ্যুত হন। কিন্তু কালে জ্ঞানদেবের অদ্ভুত যোগবলের ও জ্ঞানভাণ্ডারের নিকট সকলকে মস্তক নত করিতে হয়। জ্ঞানদেব রচিত জ্ঞানেশ্বরী নামক

গীতাভাষ্যে যে ভাষার নৈপুণ্য, ভাবের গাম্ভীর্য্য অলঙ্কারচাতুর্য্য ও দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টি দেখা যায়, তাহা মহারাষ্ট্র-সাহিত্যে এক যুগ পরিবর্ত্তনের দৃষ্টান্ত স্বরূপ" (নাথপন্থ—১৬ পৃঃ)।

যোগিগুরু গরীব নাথ

সময়—১২শ খৃঃ অব্দ হইতে ১৫শ খৃঃ অব্দ

History of Kanpathas of Kutch প্রবন্ধে ভি, পি, খক্কর বলেন—

গরীব নাথ গোরক্ষ নাথের শিষ্য। এই গরীব নাথ ভূজ প্রদেশের ভাদ্লি নামক স্থানে দ্বাদশ বৎসর দণ্ডায়মান অবস্থায় গভীর তপস্যায় নিমগ্ন ছিলেন। জাঠদের ছেলেরা আম পাড়ার জন্য ঢিল ছুঁড়িত, তাহাতে গরীব নাথের তপস্যার বিঘ্ন হইত। গরীব নাথ ইহাদের উপর ক্রুদ্ধ ছিলেন। এক মতে লালঝাড়েজার জামরাইধন লাখিয়ার বীর নামক এক ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজা গরীব নাথের আশীর্ব্বাদে জাঠদিগকে বিতাড়িত করেন। রাইধন সং বৎ ১২৬১—১২৭১ (১১৭৫—১২১৫ খৃঃ অব্দে) শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন।

সিদ্ধ গরীব নাথ মুখে উচ্চারণ করিয়া রাইধনকে রাজত্ব দিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে কচ্ছ ভাষায় একটী গাথা আছে—

"গরবো গরীব নাথ, আয়ো সুথ জাবাজ
কুড়াজৎ কাঠে ভিন্নো রায়ধনকে রাজ।"

অন্য মতে গরীব নাথ রায় হামিরজীর রাজত্বকালে বর্ত্তামন ছিলেন। এই হামিরজী ভূজ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতার পিতা ছিলেন। এ সময়ে হামিরজী লাখিয়ার বীরে রাজত্ব করিতেন এবং তাঁহার ভ্রাতা আজোজিটেরার নিকটে বারাতে রাজত্ব করিতেন। হামিরজী ১৫২৮ সং বৎ-এ (১৪৭২ খৃঃ অব্দে) জীবিত ছিলেন। আজোজি গরীব নাথের অপূর্ব্ব যোগশক্তির কথা শুনিয়া

তাঁহার কৃপা ভিক্ষার জন্য আসিয়াছিলেন। গরীব নাথ তাঁহাকে একপাত্র দুগ্ধ লইয়া আসিবার আদেশ দেন। হামিরজীর সভার গায়ক লাংঘা ইহা শুনিয়া অবিলম্বে হামিরজীকে এই সংবাদ দেন। হামিরজী খুব প্রাতে আজোজীর অগ্রে দুগ্ধ নিয়া গরীব নাথের নিকটে আসেন এবং গরীব নাথ হামিরজীকে কচ্ছের অধীশ্বর বলিয়া সম্ভাষণ করেন। ইহার একটু পরেই আজোজী দুগ্ধ লইয়া উপস্থিত হইলে হামিরজীর চাতুরি প্রকাশ পায়। কিন্তু গরীব নাথের কথা অন্যথা হইবার নহে। গরীব নাথ বলিলেন ভায়াদ ব্যতিরেকে হামিরজী কচ্ছ রাজ্য শাসন করিতে পারিবেন না। এই ঘটনার সঙ্গে রাবলজাম কর্তৃক হামিরজীর হত্যার সম্বন্ধ আছে এবং রাজসভায় ভায়াদ্‌দের উচ্চস্থান অধিকার করারও সম্বন্ধ আছে। কিন্তু গরীব নাথের বাক্যানুসারে এ সব ঘটনা ঘটিয়াছে বলিয়া জনসাধারণ বিশ্বাস করে। আজোজীর বংশধরেরা হামিরজীর প্রতারণার কথা আজও বলিয়া থাকে। হামিরজী লাখিয়ার বীরে সং বং ১৫২৮ (১৪৭১ খৃঃ অব্দ) শতাব্দীতে রাজত্ব করিতেন। সুতরাং গরীব নাথের আশীর্ব্বাদ তিনি ১৫০০ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে পান নাই।

ধীনোধরে গরীব নাথের মন্দির আছে এবং সেখানে তাঁহার পূজা হয় সুতরাং গরীব নাথ ও ধিনোধরের মঠ স্থাপনের সময় ১৫০০ খৃঃ অব্দের প্রারম্ভে হইবে মনে হয়।

কচ্ছের র‍্যাণ গ্রামের মন্দিরের প্রস্তর-লিপিতে আছে—

> "সং বং ১৬৬৫ না বরষে কারতক সুদ ১৯ পীরশ্রী
> ভিখারী নাথ পীর হুয়া, পীরপাস্থ নাথনা চেলা পীরভি
> খারি নাথনা চেলা পীর পরভাত নাথ
> সধবোরম নাথনা পীর আদ নাথ
> আপীর পরভাত রাজ শ্রীখেরাংজী সুত রাজশ্রী
> ভরমলজী বারে পীর আয়াগাম রায় থরাজত

নৃপৎধীনোধরজী যে এ পাদর রাজশ্রীথেংরাজীয়ে সদা
ছিদ্ আনে গায় তরকানে স্থ অরজে কোই এ গামনো
পচার করে তেহেনে গরীব নাথনা ভবো ভবনাপাপই রাজশ্রী
ভীমনোধরমছে আইদারোধীনোধরনোচ্ছে শ্রীরাজক্রীভা ॥”

(Notes on the Kanpatha Jugis—Indian Antiquary Vol. VII. Page 298—300 by Mr. Leonard)

থানেশ্বরের সন্নিকট পিহোয়া বা পৃথুদক নামক স্থানে গরীব নাথের আর একটি মন্দির আছে। কথিত আছে যে তিনি গোরক্ষ নাথের শিষ্য। এই মন্দিরে রাজা ভোজদেব কৃত এক শিলালিপি আছে। শিলালিপির তারিখ ২৭৬ সং বৎ। কানিংহাম সাহেব অনুমান করেন এই সং বৎ শ্রীহর্ষের অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ৬০৭ শতাব্দীতে যার আরম্ভ হইয়াছে। ইহা হইতে দেখা যায় শিলালিপির বয়স ২৭৬+৬০৭=৮৮৩ খৃঃ অব্দ। কানিংহাম সাহেব বলেন,—

“In the lower part of the Western portion of the city there is a modern temple of Gharib Nath, who is said to have been the disciple of Gorak Nath. In the wall of this temple is fixed an inscription of Raja Bhojdeva son of Rambhadra Deva, dated Samvat 276 both in words and figures. This is most probably the era of Sreeharsha A. D. 607.” (Arch. Survey of Cunningham, vol. 2, Page 224)

গরীব নাথ ভাদলী, থারাওড়ি, কটডো প্রভৃতি স্থান জাঠদের নিকট হইতে দানস্বরূপ প্রাপ্ত হন। এখন পর্য্যন্ত এ সব স্থান তাঁহার বংশধরেরা ভোগ দখল করিয়া আসিতেছেন। গরীব নাথের দুই শিষ্য ওর নাথ ও পান্থ নাথ। ওর নাথ সিদ্ধ হন। ধর্ম্ম নাথের মন্দিরে তাঁহার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। পান্থ নাথের ভিখারী নাথ নামে এক শিষ্য ছিলেন। ভিখারী নাথের শিষ্য প্রভাত নাথ রাওদের নিকট হইতে র‍্যাণ গ্রাম দানস্বরূপ প্রাপ্ত হন। প্রভাত নাথ

আংগিয়ো গ্রামে লোকের বসবাস স্থাপন করেন এবং তাঁহার বংশধরেরা আজিও এই গ্রাম ভোগ দখল করিতেছেন (১) Indian Antiquary of 1878, February— Article : History of Kanpathas of Kutch by Daepat-ram Pranjiban Khakar of Kutch প্রবন্ধে এ সম্বন্ধীয় বিস্তৃত বিবরণ আছে)।

যোগিগুরু চৌরঙ্গী নাথ

হঠপ্রদীপিকাতে আছে—

"শ্রীআদি নাথ, মৎস্যেন্দ্র শারদানন্দ ভৈরবঃ।
চৌরঙ্গী মীন গোরক্ষ বিরুপাক্ষ বিলেশয়া ॥" ৫

(হঠপ্রদীপিকা, ১ম উপদেশ)

আর্য্যভূমি মাসিক পত্রিকায় ১৩৩১ বাঙ্গালার আষাঢ় সংখ্যায় "অজিতা" প্রবন্ধে "কালীঘাট ও সিদ্ধ যোগী চৌরঙ্গী" বিষয়ে বলা হইয়াছে— "এই চৌরঙ্গী কে ? ইনি একজন সিদ্ধ যোগী। গোবিন্দপুরের বনের মধ্যে ইঁহার আশ্রম ছিল। কলিকাতা মহানগরীর দক্ষিণে প্রায় দেড় ক্রোশ দূরে কালীঘাটের যে কালীকা দেবীর মূর্ত্তি আজ সহস্র সহস্র ভারতবাসী দ্বারা পূজিত, সেই মূর্ত্তি পরমভক্ত সিদ্ধ যোগী চৌরঙ্গীর সম্মুখে গোবিন্দপুরে নিবিড় বনমধ্যে সর্ব্ব প্রথম প্রকটিত হন। এই মহাপুরুষের নাম ভারতবাসী হৃদয়ে চিরতরে অঙ্কিত রাখিবার জন্যই যেন কি এক অজানিত উপায়ে আধুনিক কলিকাতার যে রাজবর্ত্ম ধর্ম্মতলার মোড় হইতে দক্ষিণ দিকে কালীঘাট পর্য্যন্ত গিয়াছে, তাহার নাম চৌরঙ্গী রাস্তা রাখা হইয়াছে। যে সময়ের কথা বলা হইতেছে কালীঘাট তখন ভাগীরথীর তীরস্থ অতি ক্ষুদ্র গণ্ড গ্রাম।" (আর্য্যভূমি —আষাঢ়, ১৩৩১ বাং)।

(১) পুরাতত্ত্ব বিশারদ শ্রীভোলানাথ নাথ, এম-এ কৃত বঙ্গানুবাদ। কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত ও সংক্ষেপীকৃত।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু বলেন—"চৌরঙ্গী নাথ একজন বিখ্যাত হঠযোগী। কাহারও কাহারও মতে তাঁহার নাম হইতে কলিকাতার দক্ষিণ ভাগস্থিত রাস্তার ও পল্লীর নাম চৌরঙ্গী হইয়াছে।" (বিশ্বকোষ—Vol. VI, চৌরঙ্গী শব্দ, ৪৮১ পৃঃ)। "কেহ কেহ বলেন তৎকালে এখানে গোরক্ষনাথের শিষ্য চৌরঙ্গী নাথ নামধারী হঠযোগীরা বাস করিতেন। তাহা হইতে এই স্থান চৌরঙ্গী নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।" (বিশ্বকোষ—Vol. III, কলিকাতা শব্দ)।

চৌরঙ্গী নাথের নামানুসারে কলিকাতার চৌরঙ্গী রোডের নামকরণ করা হইয়াছে সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।'

অধ্যাপক ডাঃ সুকুমার সেন বলেন—"বাংলায় ও বাংলার বাইরে প্রচলিত নাথপন্থ কাহিনীতে চৌরঙ্গী নাথের কোনই উল্লেখ নাই— নামটী ছাড়া। তবে এর ঐতিহাসিকতার প্রমাণ একেবারে যে নেই তা নয়। এক আচার্য্য চৌরঙ্গীর লেখা 'যোগনিবন্ধ,' 'বায়ুতত্ত্ব,' 'ভাবনোপদেশ,' মিলছে তিব্বতী অনুবাদে।" (নাথপন্থের দীশা— শারদীয়া সংখ্যা, কল্যাণশ্রী, ১৩৫৫ বাং)।

অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ বলেন—"নাথদিগের মধ্যে গোরক্ষ নাথের নামই বিশেষরূপে প্রসিদ্ধ। তিনি ভিন্ন অন্যান্য কয়েক জন নাথের মতবাদও নাথপন্থীদের মধ্যে বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ এইরূপ কয়েক জন নাথের নাম করা যাইতে পারে।

ঈশ্বর নাথ— একজন বড় সংযমী নাথ ছিলেন। ইনি সকলকে সংযম সাধন করিতে শিক্ষা দিতেন এবং পরম তত্ত্ব সৎস্বরূপ ঈশ্বরকে ভজনা করিতে উপদেশ দিতেন।

ঘুঘু নাথ— ঘুঘু নাথের প্রধান উপদেশ এক সমস্যার মধ্যে ছিল। তিনি বলিতেন—

"ঘুঘু নাথ পায়বো, জতীন কহায়বো।
সিদ্ধোন নাথবো, বোলবো পকড়াইবো॥

জদ অনহদ ভরম সুনায়বো।
সম একংকার খেলবো, শিবশক্তিম মেলবো॥
ধ্যানন ধরায়বো। উঁচু নীচ কহায়বো॥"

চম্বা নাথ— চম্বা নাথ, ঘুঘু নাথের বিপরীত উপদেশ দিয়া বলিতেন যে, যাহা বক্তব্য বলিবে, যাহা শ্রোতব্য তাহা শুনিবে, যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিবে। কোনরূপ বিচার করিবে না। সকল সময় কিন্তু হৃদয়ে ধ্যান লাগাইয়া থাকিবে।

খিস্তড় নাথ— খিস্তড় নাথ সাম্যবাদ প্রচার করিতেন। আর শব্দ বিচার উপদেশ করিতেন।

প্রজর নাথ— প্রণব সাধন বিশেষ করিয়া প্রচলন করেন। ইঁহার অন্যান্য মত গোরক্ষপন্থীদের ন্যায়।

প্রাণ নাথ— একজন বড় সাধক। ইঁহার প্রধান উপদেশ ছিল—

"নাম ভগতা সও যুগতা,
দৃঢ়তা রহিতো অরোগঁ।
প্রীতি লচ্ছণ উপদেশ অচ্ছণ,
প্রেম পায়বো জোগঁ॥"

সন্ত নাথ—পাঞ্জাবে ও নেপালে সন্ত নাথের মন্দির আছে। এই দুই স্থানে ইঁহার পূজা হয়।

ব্রহ্মনাথজী ও ভিনক্ নাথজী— নেপালে ব্রহ্মনাথজী ও ভিনক্ নাথজীর দুইটী আস্তানা আছে।" (প্রবাসী—ফাল্গুন ও চৈত্র, ১৩২৮ বাং, 'নাথপন্থ' প্রবন্ধ)।

চর্পটী নাথ—"নাথগুরু ছিলেন। ব্রহ্মচর্য্য ব্যতীত কোন সাধনাই সিদ্ধ হয় না ইহাই তাঁহার প্রধান মত। ষড় রিপু বশীভূত করার প্রণালী ইনি শিক্ষা দিতেন।" (প্রবাসী—চৈত্র, ১৩২৮ বাং, নাথপন্থ)।

চর্পটী নাথ সম্বন্ধে অধ্যাপক ডাঃ সুকুমার সেন বলেন—"এক তপস্বিনী রাজকন্যা গোরক্ষকে পতিত্বে বরণ করে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গেল। নিশীথে শয়ন কক্ষে গিয়া রাজকন্যা দেখলেন যে তাঁর স্বামী (গোরক্ষনাথ) ছয় মাসের ছেলে হয়ে কাঁদছে স্তনের জন্য। লজ্জায়, দুঃখে রাজকন্যা বিলাপ করতে লাগল। গোরক্ষনাথ বললেন, আমার দোষ নেই, তোমাকে ঠকিয়েছেন শিব * * * * *। শেষে সান্ত্বনা দিলেন, আমার এই কৌপীন ধুয়ে জল খাও, তুমি এখনি পুত্র সন্তান লাভ করবে। রাজকন্যা তাই করলে। তখন পুত্রের জন্মগ্রহণ হল। তার নাম কর্পটী নাথ রেখে ও কানে মন্ত্র দিয়ে গোরক্ষনাথ বিদায় হলেন। তাঁর গৃহবাসের এইখানেই পর্য্যবসান। * * * * *

গোরক্ষবিজয় কাহিনীতে প্রাপ্ত গোরক্ষ নাথের পুত্র কর্পটী নাথের উল্লেখ মিলছে না আর কোথাও। হিন্দী মরমীয়া সাধক কবিদের উদ্দিষ্ট চর্পটী নাথ বোধ হয় ইনিই। কর্দিয়ে-র তিব্বতী পুঁথির তালিকায় চর্পটী নাথের তিন খানা নিবন্ধের নাম রয়েছে—আর্য্যাবলোকিতেশ্বর স্তোত্র, চতুর্ভূক্ত ভবাভিবাসন ক্রম ও লোকেশ্বর স্তোত্র। প্রথম ও তৃতীয় নিবন্ধ দুইটী মনে হচ্ছে একই রচনা।" (নাথপন্থের দিশা—কল্যাণশ্রী, শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৫৫ বাং)।

গোবিন্দ নাথ—ইনি ৮ম খৃঃ অব্দে ভগবান শঙ্করাচার্য্যকে দীক্ষাদান করেন।

কেশব ভারতী }
ঈশ্বরপুরী } ইঁহারা ১৫শ খৃঃ অব্দে পতিতপাবন গৌরাঙ্গ দেবকে দীক্ষা দান করেন।

ধুল নাথজী—ইনি খৃষ্টীয় ৮ম অব্দে বঙ্গাধিপতি আদিশূরকে দীক্ষা দান করেন।

যোগিগুরু গম্ভীর নাথ

"কাশ্মীরদেশের অন্তর্গত জম্বু নামক স্থানে বাবা গম্ভীর নাথজী একজন রাজপুরোহিতের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। গৃহত্যাগের পরেই তিনি (১৭—১৮

বৎসর বয়সে) গোরক্ষপুরের শ্রীমৎ গোপাল নাথজীউর (নাথযোগী) নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন" (প্রবাসী—বৈশাখ, ১৩২৫ বাং)।

"আধুনিক যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাথসিদ্ধা কুম্ভমেলার মণ্ডলেশ্বর বাবা গম্ভীর নাথ কাশ্মীরের জম্মু প্রদেশের কোনও ধনীর সন্তান ছিলেন বলিয়া অনেকেই জানিতেন, কিন্তু এই সম্পর্কে তাঁহাকে অনেক পীড়াপীড়ি করিয়া জিজ্ঞাসা করা সত্ত্বেও তিনি গম্ভীরভাবে শুধু উত্তর দিতেন— প্রপঞ্চসে ক্যা হোগা।" (প্রবাসী —আষাঢ়, ১৩৫৭ বাং, ২৭৫ পৃঃ)।

"বাবা গম্ভীর নাথ অওঘড় সম্প্রদায়ভুক্ত দশনামীর ব্রহ্মগিরি প্রচলিত নিয়মানুসারে তিনি গলদেশে নাদ ও শেলি লম্বিত রাখিতেন এবং সন্ধ্যার পর মন্দির প্রদক্ষিণ সময়ে তিনি ঐ নাদের ব্যবহার করিতেন। সাধনই তাঁহার জীবনের সর্ব্বস্ব ছিল। এ জন্য তিনি নিজ গুরুদেবের দেহান্তে গোরক্ষপুরের গদীতে বসিবার অধিকার ও নিমন্ত্রণ পাইয়াও নিজে তাহা গ্রহণ করিলেন না। নিজের গুরুর এক শিষ্য ঐ মন্দিরে পূজারির কার্য্য করিতেন। তাঁহাকে একেবারে ঐ পূজারির পদ হইতে দায়িত্বপূর্ণ মোহান্তপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ভারত-জননী কখনও সুসন্তান লাভে বঞ্চিতা হন নাই। জননী প্রায় সহস্র বৎসর হইল রাজসিংহাসনহারা হইয়াছেন, কিন্তু যে রত্ন হাজার হাজার রাজার মুকুট মণি দিয়াও লাভ করা যায় না, সেই ধর্ম্মরত্ন চিরকাল জীর্ণ বস্ত্রে আবরিয়া স্বীয় বক্ষে চাপিয়া রাখিয়াছেন। সেই মহারত্ন বক্ষে ধারণ করিয়া তাঁহার যে সকল সুসন্তান ভারতের মুখোজ্জ্বল ও বসুন্ধরাকে পুণ্যবতী করিয়াছেন বাবা গম্ভীর নাথজী তাঁহাদের অন্যতম। তিনি বহুলোককে ধর্ম্মজ্ঞান ও ভক্তিবারিদানে কৃতার্থ করিয়াছেন। বঙ্গদেশেও বহু নরনারী তাঁহার কৃপালাভ করিয়াছেন।" (প্রবাসী—বৈশাখ, ১৩২৫ বাং)।

"গোরক্ষ নাথী আখড়া— এই আখড়াটি হরিদ্বার সহরেই প্রকাণ্ড ঘেরা বাড়ীতে স্থাপিত হইয়াছিল। এখানে নাথ-সম্প্রদায়ভুক্ত হাজার সন্ন্যাসীর আসন

নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। গুরুর আসনে যথারীতি ভোগ আরতি হইত। * * * এই আখড়াতে একজন সিদ্ধ মহাপুরুষ আসিয়াছিলেন, তাঁহার নাম বাবা গম্ভীর নাথ। ইঁহার নামটি যেমন কাজেও তেমন; একটি সাদা ধুতি পরিয়া আসনে গম্ভীরভাবে বিরাজিত থাকিতেন। সৌম্য মূর্ত্তি এই মহাত্মাকে দর্শন করিবার জন্য বহুলোক তথায় আগমন করিত। ইনি বিনয়-নম্র বচনে এবং জলদগম্ভীর স্বরে উপস্থিত সকলকে পরিতোষ করিতেন।" (স্বামী যোগানন্দ প্রণীত হরিদ্বারে কুম্ভমেলা)।

"মহাত্মা গম্ভীর নাথ—ইনি নাথ-যোগী। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে গয়াতে কপিলধারার নিকট ইঁহার আশ্রম ছিল। * * * * * মহাত্মা গম্ভীর নাথ বাবাজী এক্ষণে গোরক্ষপুরে গোরক্ষ নাথের মন্দিরে আছেন। বহু সংখ্যক ধর্ম্মপিপাসু বাঙ্গালী সেই দূরদেশে যাইয়া ইঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। গত বৎসর তিনি কলিকাতায় শুভাগমন করিয়াছিলেন। সহস্র সহস্র ধর্ম্মার্থী ইঁহাকে দর্শন করিয়াছেন এবং শত শত ব্যাকুলাত্মা নানাদিক হইতে কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া ইঁহার কৃপালাভ করতঃ দীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক কৃতার্থ হইয়াছেন।" (প্রয়াগধামে কুম্ভমেলা)।

শ্রীকুলদানন্দ ব্রহ্মচারী শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর দেহাশ্রিত অবস্থার দৈনন্দিন বৃত্তান্ত সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া লিখিয়াছেন—"মহাপুরুষ গম্ভীর নাথজী দর্শন। আজ ঠাকুরের সঙ্গে (শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সঙ্গে) গম্ভীর নাথজী দর্শনে চলিলাম। * * * * ঠাকুর বাবাজীকে (শ্রীশ্রীগম্ভীর নাথজীকে) সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। * * * * অনেকক্ষণ ঠাকুর গম্ভীর নাথজীর নিকট বসিয়া তাঁবুর দিকে আসিতে লাগিলেন। পথে জিজ্ঞাসা করিলাম ইনি কে? ঠাকুর বলিলেন, ইনি নাথ-যোগীদের মোহান্ত। চারিদিকে যে সকল ভয়ঙ্কর আকৃতি সাধুদের দেখলে, তারা গোরখপন্থী-কানফাট্টা যোগী। উহাদের ভিতরে অঘোরীও আছেন। ইনি ঐশ্বর্য্যপথে অতি কঠোর সাধনা করে সিদ্ধ হন, পরে মহাসিদ্ধ

অবস্থা লাভ করেন। হিমালয়ের নীচে এমন শক্তিশালী সাধু আর নাই। ইনি পলকে সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয় করতে পারেন। কিন্তু এখন ইনি মাধুর্য্যে একেবারে ডুবে গেছেন, ইঁহার সঙ্গে আমাদের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। বরাবর পাহাড়ে যে চারিটি মহাপুরুষ দর্শন করেছিলাম, তার মধ্যে ইনিই একজন গোরখপন্থী। আলেখী, কানফাট্টা, অঘোরী এরা সকলেই তান্ত্রিক যোগী, এদের সাধনা বড়ই কঠিন।" (শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ, ৫ম খণ্ড, ২৭৯—২৮০ পৃঃ)।

উপরে আমরা যে সকল মহাসিদ্ধ নাথাচার্য্যগণের অলৌকিক জীবন কাহিনীর পরিচয় প্রদান করিলাম, তাঁহাদের যোগৈশ্বর্য্য ও ধর্ম্মজ্ঞানের বিমল জ্যোতি সমগ্র বিশ্বের ধর্ম্মগগন উদ্ভাসিত করিয়া দীপ্তিমান্ জ্যোতিষ্কের ন্যায় চিরকাল বিরাজ করিবে এবং নাথ-জাতির গৌরবোজ্জ্বল অতীত ইতিহাসের সাক্ষ্যরূপে বিদ্যমান থাকিবে।

"মৃত্যুহীন রবে তোরা মরণেরে করি উপহাস
তোদের আলেখ্য বহি ধন্য হবে নাথ ইতিহাস।"

পঞ্চম অধ্যায়

নাথাচার্য্য ও সিদ্ধাচার্য্যেরাই বাঙ্গালা ভাষার জনক*। বাঙ্গালা রূপের ও বাঙ্গালা কবিতার উদ্ভবকাল ৫ম খৃঃ অব্দ। বাঙ্গালা ভাষার আদিম লেখক ও কবি সিদ্ধা মৎস্যেন্দ্র (মীন) নাথ। বাঙ্গালা গীতি সাহিত্যের উদ্ভবকাল ১০ম-১১শ খৃঃ অব্দ এবং ইহার প্রবর্ত্তক কাহ্নু, লুইপাদ প্রমুখ নাথাচার্য্য ও সিদ্ধাচার্য্যগণ, বৈষ্ণব গীতি সাহিত্য আদি সাহিত্য নহে। চতুর্দ্দশপদী কবিতার উদ্ভবকাল ১০ম-১১শ খৃঃ অব্দ এবং ইহার প্রবর্ত্তক সিদ্ধা কহ্নুপাদ এবং সিদ্ধা শবর নাথ।

"মোদের গরব, মোদের আশা,
আ মরি বাংলা ভাষা!
তোমার কোলে, তোমার বোলে
কতই শান্তি ভালবাসা!"

—অতুলপ্রসাদ

মানুষ মনের ভাব প্রকাশ করিবার জন্য বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে যে সকল সাঙ্কেতিক ধ্বনি ব্যবহার করে, তাহাকে ভাষা বলে। পৃথিবীর সব মানুষ মূলতঃ এক হইলেও দেশ-কালভেদে বিভিন্ন দেশের মানুষের জীবনযাত্রা-প্রণালী ও ভাষা বিভিন্ন প্রকারের। বাঙ্গালী জাতি যে বিশেষ কৌশলের ভিতর দিয়া ধ্বনিময় সঙ্কেতের সাহায্যে মনের ভাব প্রকাশ করে তাহাকে বাঙ্গালা ভাষা কহে। বর্ত্তমান পূর্ব্ব পাকিস্থান, কাছাড়, গোয়ালপাড়া, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার,

* নাথ-নেতাগণ নাথাচার্য্য, সিদ্ধ বা সিদ্ধা এবং বৌদ্ধনেতাগণ সিদ্ধাচার্য্য নামে খ্যাত ছিলেন।

ছোটনাগপুরের সাওতাল পরগণা, মানভূম, সিংভূম ও পূর্ব্ব পূর্ণিয়ায় বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত।

সমগ্র পৃথিবীর প্রায় সাড়ে ছয় কোটী লোক বাঙ্গালা ভাষায় কথা বলে। লোকসংখ্যার হিসাবে বাঙ্গালা ভাষা পৃথিবীতে সপ্তম স্থান অধিকার করে। উত্তর চৈনিক, ইংরেজী, রুষীয়, জার্ম্মানী, জাপানী ও স্পেনীয় ভাষার পরেই বাঙ্গালা ভাষার স্থান। ভারতবর্ষে বাঙ্গালা ভাষাতে অধিক লোক কথা বলে। এখানে ১২৫টী ভাষা প্রচলিত আছে। সেগুলির মধ্যে হিন্দুস্থানী ভাষার প্রসার সবচেয়ে অধিক। কিন্তু যে সব লোকের মাতৃভাষা হিন্দুস্থানী তাঁহাদের সংখ্যা বাঙ্গালীদের চেয়েও কম। ভারতভূমিতে (পাকিস্থানসহ) কমপক্ষে বিশ প্রকার বর্ণমালা ব্যবহৃত হয়, সেগুলির মধ্যে উর্দু ও নাগরী লিপি অধিক সংখ্যক লোক ব্যবহার করে। সেগুলির পর বাঙ্গালা, তামিল, তেলেগু লিপির স্থান। বাঙ্গালা ভাষা ব্যতীত আসামী ও মনিপুরী ভাষাতেও বঙ্গলিপি ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে বাঙ্গালা ভাষার চেয়ে বঙ্গলিপির পরিসরক্ষেত্র প্রশস্ততর।

নদীর মূল জলধারা এক নির্দ্দিষ্ট উৎপত্তিস্থান হইতে নির্গত হইয়া নানাবিধ বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া বহুধারায় বিভক্ত হইয়া প্রবাহিত হয়। ভাষা-প্রবাহেরও ঐরূপ মূল উৎপত্তিস্থান আছে। অনুসন্ধানীরা যেমন নদীর প্রবাহ-মূল বাহির করিতে পারেন, ঠিক সেইরূপ ভাষার প্রবাহমূলও নির্ণয় করা দুঃসাধ্য নহে। আমাদের বাঙ্গালা ভাষার মূল অনুসন্ধান করিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে ভারতীয় আর্য্যজাতির মাতৃভাষা সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষার জন্ম। সংস্কৃত ভাষার জন্মকাল বৈদিক যুগ। সাধারণ জনসমাজ কালক্রমে কঠিন সংস্কৃত শব্দের সঠিক উচ্চারণ করিতে অসমর্থ হইয়া উচ্চারণ বিকৃত করিতে লাগিল। উচ্চারণের এই বিকৃতি এবং পরিবর্ত্তন কালক্রমে নানা শাখায় বিভক্ত হইয়া নানা ভাষায় খ্যাত হইতে লাগিল। বাঙ্গালা ভাষা ইহারই একটি

বিশেষ শাখা। উচ্চারণের বিকৃতি বা পরিবর্ত্তন যদি না ঘটিত তাহা হইলে ভারতীয় আর্য্যজাতি চিরকাল একই ভাবে একই ভাষায় কথা বলিত অর্থাৎ মূল সংস্কৃত ভাষায় চিরকাল কথা বলিত।

সংস্কৃত ভাষার বিকৃত রূপই বাঙ্গালা ভাষা। এখনও দেখা যায় এমন কতকগুলি সংস্কৃত শব্দ আছে, যেগুলি কিছুমাত্র বিকৃত না হইয়া বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। যথা— বৃক্ষ, লতা, ফল, জল, ভোজন, শয়ন, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, চর্ম্ম, শক্তি, মুক্তি, ক্ষতি, বর্ম্ম, ভক্তি ইত্যাদি। কেবল যে সংস্কৃত শব্দ আজও অবিকৃত ভাবে বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহৃত হইতেছে, শুধু তাহাই নহে, অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, অনেক বিদেশীয় ভাষার শব্দ বাঙ্গালা ভাষার সহিত ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ইহার কারণ প্রাচীন বাঙ্গালার (পূর্ব্ব পাকিস্থান সহ) সহিত বিদেশীদের ঘনিষ্ট পরিচয় ছিল। বর্ত্তমানে ইহা আরও ব্যাপক ও গভীর হইতেছে। অনেক বিদেশীয় জাতি কার্য্যব্যপদেশে বাঙ্গালা দেশে আসিয়াছিল। তাঁহাদের সহিত বাঙ্গালীদের ভাবজীবনে ও কর্ম্মজীবনে নানা প্রকার আদান প্রদান হইয়াছিল। ইহার ফলে বিদেশীয় ভাষার কতকগুলি শব্দ বাঙ্গালা ভাষাতে প্রবেশ করিয়াছে। যথা— (১) প্রাচীন পারসিক ভাষার— পুঁথি, মোজা, মুচি ইত্যাদি। (২) ফারসী ভাষার— কাগজ, কলম, দোকান, আয়না, বন্দুক, চশমা, রুমাল, হুঁকা, মোকদ্দমা, কামান, আইন, নরম, জমি, জমা, শিকার ইত্যাদি। (৩) আরবী ভাষার— নমাজ, মৌলবী, কোরাণ ইত্যাদি। (৪) ফরাসী ভাষার— বুরুশ, কুপন, ফিরিঙ্গী, কার্ত্তুজ ইত্যাদি। (৫) ইংরাজী ভাষার— মাষ্টার, ডাক্তার, হাসপাতাল, চেয়ার, টেবিল, রেল, ষ্টীমার, শ্লেট, কলেরা, পকেট, স্কুল, কলেজ, অর্ডার, রেশন-কার্ড ইত্যাদি। (৬) চীনা ভাষার— চিনি, চা ইত্যাদি। (৭) জাপানী ভাষার— রিকসা ইত্যাদি। (৮) মালয় দেশীয় ভাষার— সাগু, গুদাম ইত্যাদি। (৯) ওলন্দাজী ভাষার— ইস্কাপন, টেক্কা, হরতন, রুইতন ইত্যাদি।

এই গুলির কতকগুলিকে এখনও বিদেশীয় ভাষার শব্দ বলিয়া পরিচয় করা যায়। কিন্তু এমন কতকগুলি বিদেশীয় শব্দ বহুকাল লোকমুখে প্রচলিত থাকিয়া বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতির সঙ্গে এমনভাবে মিশিয়াছে যে এগুলিকে বিদেশীয় ভাষার শব্দ বলিয়া পরিচয় করা যায় না। অনুসন্ধান করিলে আরও দেখা যাইবে যে ভারতীয় অন্যান্য ভাষার বহু সংখ্যক শব্দ বাঙ্গালা ভাষার সহিত ব্যবহৃত হইতেছে। এমন কি অনার্য্য জাতিদের ভাষার অনেক শব্দ বাঙ্গালা ভাষার সহিত ব্যবহৃত হইতেছে। প্রাচীনকালে অনেক অনার্য্যজাতি বাঙ্গালাদেশে বাস করিত। আর্য্যসভ্যতার প্রভাবে, সে সব অনার্য্যজাতির ভাষা ক্রমে ক্রমে প্রায় লোপ পাইয়াছে বটে; কিন্তু এখনও অনার্য্যজাতির ভাষার শব্দ বাঙ্গালা ভাষার সহিত ব্যবহৃত হইতেছে। যথা— খোকা, খুকি, ঢেঁকি, কুলা ইত্যাদি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি সংস্কৃত ভাষার জন্মকাল বৈদিক যুগ। বৈদিক যুগের পরেও যে দীর্ঘকাল ভারতে সংস্কৃত ভাষার প্রভাব ছিল তাহা বলাই বাহুল্য। মোটামুটী দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বে সংস্কৃত ভাষার প্রভাব বিশেষভাবে হ্রাস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে সব ভাষার উৎপত্তি হইয়াছিল বাঙ্গালা ভাষা তাহাদের অন্যতম। পৃথিবীর যাবতীয় আর্য্যভাষা সংস্কৃত ভাষার রূপান্তর বলিয়াও কেহ কেহ অনুমান করেন।

প্রত্যেক উন্নত জাতিরই ভাষার ব্যাকরণ আছে। বাঙ্গালা ভাষারও ব্যাকরণ আছে। বাঙ্গালা ভাষার রীতি ও প্রকৃতি বুঝিয়া বাঙ্গালা ব্যাকরণ লিখিবার প্রথম প্রয়াস বিদেশীয়রাই করিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ পোর্ত্তুগীজ পাদ্রি মনো-এলদা আস্ সুমপু সাঁত্ত কর্ত্তৃক রচিত। রোমান অক্ষরে ১৭৪৩ খৃঃ অব্দে পোর্ত্তুগালের রাজধানী লিসবন নগরে ইহা ছাপা হয়। বাঙ্গালা হরফে সর্ব্ব প্রথম বাঙ্গালা ব্যাকরণ হালহেড় সাহেব রচনা করেন এবং ইহা ১৭৭৮ খৃঃ অব্দে হুগলিতে মুদ্রিত হয়। বাঙ্গালী রাজা রামমোহন রায়ই বাঙ্গালীদের মধ্যে সর্ব্ব প্রথম বাঙ্গালা ব্যাকরণ লিখেন এবং ইহা মুদ্রিত হয়

১৮৮৩ খৃঃ অব্দে। অবশ্য ইহা লিখা হইয়াছিল ইহার বহু পূর্ব্বে। (আধুনিক বাঙ্গালা ব্যাকরণ ২৩শ সং, উপক্রমণিকা, ২ পৃঃ)।

বাঙ্গালা রূপের ও বাঙ্গালা কবিতার উদ্ভবকাল—৫ম খৃঃ অব্দ বাঙ্গালা ভাষার আদিম লেখক ও কবি সিদ্ধা মৎস্যেন্দ্র (মীন) নাথ কৃত্তিবাস বাঙ্গালার আদি কবি নহেন।

অধ্যক্ষ ডাঃ শহীদুল্লাহ্ বলেন— "পূর্ব্ব বাঙ্গালার বিশেষ গৌরব এই যে এই প্রদেশের প্রাচীন নাম বঙ্গাল থেকে দেশের নাম হয়েছে বাঙ্গালা বা বাংলা। পূর্ব্ব বঙ্গের শ্রেষ্ঠ গৌরব এই যে, এই দেশ থেকে বাঙ্গালা সাহিত্য এবং নাথ-পন্থের উৎপত্তি হয়েছে। মৎস্যেন্দ্র নাথ যেমন বাঙ্গালার আদিম লেখক, তেমনি তিনি নাথপন্থের প্রবর্ত্তক। তাঁহার নিবাস ছিল্ ক্ষীরোদ সাগরের তীরে চন্দ্রদ্বীপে, বর্ত্তমানে সম্ভবতঃ যাকে সন্দ্বীপ বলে।" (আনন্দ বাজার পত্রিকা, ২৩শে পৌষ, ১৩৫৫ বাং, ৬ পৃঃ)। তিনি আরও বলেন— "খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের আগে বাঙ্গালা রূপের আবির্ভাব হয়নি, এ কথা সকলেই মেনে নিয়েছেন। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তির সময় নিয়া নানা মুনির নানা মত। যতদূর দলিল প্রমাণ আমরা পেয়েছি, তাতে আমাদের বলতে হয় যে, মীন নাথই বাঙ্গালা ভাষার আদিম লেখক। তাঁর লেখা চার লাইনের একটি শ্লোক বৌদ্ধগানের টীকায় উদ্ধৃত করা হয়েছে। সে শ্লোকটী এই—

"কহন্তি গুরু পরমার্থের বাট
কর্ম্ম-কুরঙ্গ সমাধিক পাট।
কমল বিকশিল কহিহণ জমরা
কমল মধু পিবিবি ধোকেন ভমরা।"

এই শ্লোকে 'পরমার্থের' 'বিকশিল' আধুনিক বাঙ্গালা রূপের সমান। শব্দ ও ব্যাকরণ বিচারে আমরা একে প্রাচীন বাংলা বলবো।" (শনিবারের চিঠি—

নাথেরা শুধু বাঙ্গালা ভাষার আদিম লেখক নহেন। ইহারা হিন্দী ও পাঞ্জাবী ভাষারও আদিম লেখক। অধ্যাপক ডাঃ মোহন সিংহ বলেন—"He (Gorakh Nath) is claimed to have been the first known Hindi (or Panjabi) prose writer" (১) (Gorakh Nath and Mediaeval Hindu Mysticism. Page 11)। প্রমাণ যথা—(১) তিব্বতে প্রাপ্ত ও বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত একখানি পাণ্ডুলিপি। (২) পাঞ্জাব ইউনিভারসিটি লাইব্রেরীতে রক্ষিত ৩৭৪ নং পাণ্ডুলিপি। (৩) ১৯০৫ ইং প্রকাশিত বানারসী বিলাস (বোম্বাই)। (৪) ১৮৯০ ইং লাহোর হইতে প্রকাশিত গুরুমুখী ভাষার জনম সাখী। (৫) লাহোরের প্রাণসংগলীর দুইখানি পাণ্ডুলিপি।

বাঙ্গালা গীতি-সাহিত্যের উদ্ভবকাল—১০ম-১১শ খৃঃ অব্দ এবং ইহার প্রবর্ত্তক কাহ্নুপাদ, লুইপাদ প্রমুখ নাথাচার্য্য ও সিদ্ধাচার্য্যগণ।

চর্য্যাচর্য্য বিনিশ্চয় একখানি চর্য্যা বা গানের সংগ্রহ গ্রন্থ। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ১৯০৭ ইংরাজীতে নেপাল হইতে ইহা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। ইহার মোটামুটী দশ বৎসর পরে ১৩২৩ বঙ্গাব্দে উক্ত গ্রন্থখানি খণ্ডিত আকারে শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্পাদকতায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ হইতে "বৌদ্ধগান ও দোঁহা" নামক গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল ইহার ফলে ভাষাতত্ত্বামোদিগণ বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের আলোচনার এক অপূ স্থযোগ পাইয়াছেন। সেজন্য শাস্ত্রী মহাশয় ধন্যবাদার্হ।

শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত গ্রন্থের নাম দিয়াছেন 'বৌদ্ধগান ও দোঁহা' কিন্তু যে গ্রন্থ হইতে তিনি চর্য্যা বা গানগুলি সংগ্রহ করিয়াছেন, সেই

(১) অর্থাৎ এরূপ দাবী করা হয় যে গোরক্ষ নাথ হিন্দী ও পাঞ্জাবী ভাষা সর্ব্বপ্রথম গদ্য লেখক। উক্ত বহিগুলিতে তাঁহার ঐ সব গদ্য সংগৃহী হইয়াছে।

গ্রন্থখানির নাম 'চর্য্যাচর্য্য বিনিশ্চয়' বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। যে সকল পদকর্ত্তার পদ 'চর্য্যাচর্য্য বিনিশ্চয়ে' সংগৃহীত হইয়াছিল তাঁহাদের অন্ততঃ তের জন পদকর্ত্তা যে নাথসিদ্ধা, তাহা আমরা পরে দেখাইতেছি এবং অন্যান্যেরা সিদ্ধাচার্য্য (বৌদ্ধ)। শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার 'বৌদ্ধগান ও দোঁহায়' নাথ-সিদ্ধাদের গানও উদ্ধৃত করিয়াছেন। তথাপি তিনি কেন যে ইহার নামকরণ করিয়াছেন 'বৌদ্ধ গান ও দোঁহা' তাহার কোন কারণ উল্লেখ করেন নাই। তিনি হয়ত ধরিয়া নিয়াছেন নাথেরা বৌদ্ধ। (২)

তৎপর অধ্যাপক ডাঃ শহীদুল্লাহ্, হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালায় সিদ্ধা কানুপার গীত ও দোঁহা, সিদ্ধা কানুপা (ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন—বৈশাখ, ১৩২৯ বাং), সিদ্ধা কানুপার গীত ও দোঁহা (প্রতিভা—১৩২৯ বাং ৩য় সংখ্যা), কানুপার দোঁহার টীকা (প্রতিভা—১৩২৯, ৪র্থ সংখ্যা), সিদ্ধা কানুপা (প্রতিভা—১৩৩০ বাং, ২য় সংখ্যা, পরিশিষ্ট) Buddhist Mystic Songs প্রভৃতি গ্রন্থে ও প্রবন্ধে চর্য্যাগুলি লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। অধ্যাপক ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী নেপালরাজের গ্রন্থশালায় রক্ষিত 'চর্য্যাচর্য্য বিনিশ্চয়' পুঁথির সহিত ইহার তিব্বতীয় অনুবাদ মিলাইয়া চর্য্যা এবং এ গুলির টীকা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্ট জার্ণেল—৩০শ সংখ্যা)। অধ্যাপক ডাঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় 'The Origin and Development of the Bengali Language'-এ, অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসু 'চর্য্যাপদে', অধ্যাপক ডাঃ সুকুমার সেন 'প্রাচীন বাঙ্গালা ও বাঙ্গালী'তে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। Indian Historical Quarterly (Vol. III. P. 677) পত্রিকাতেও এ সম্বন্ধীয় আলোচনা দৃষ্ট হয়। বহু পরিশ্রম ও আলোচনার ফল ঐ

(২) ডাঃ কল্যাণী মল্লিক বলেন, "শাস্ত্রী মহাশয় লুইপাদ প্রভৃতির পদ সংগ্রহ করিয়া 'বৌদ্ধগান ও দোঁহা' নামে প্রচারিত করায় সিদ্ধেরা সকলেই বৌদ্ধ ছিলেন এই ভ্রান্ত ধারণা হওয়া সম্ভব।" (নাথপন্থ—১১ পৃঃ)।

লিখা কয়েকটি সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি মাত্রেরই পাঠ করা উচিত। বলাবাহুল্য এগুলি শাস্ত্রী মহাশয়ের আদর্শ অবলম্বনে লিখিত বলিয়াই মনে হয়।

চর্য্যাচর্য্য বিনিশ্চয়ের চর্য্যাগুলি সন্ধ্যা ভাষায় লিখিত। সেজন্য টীকা ব্যতীত এগুলির মর্ম্ম বুঝা খুবই শক্ত। শাস্ত্রী মহাশয় বলেন—"সন্ধ্যা ভাষার মানে আলো আঁধারি ভাষা, কতক আলো, কতক অন্ধকার, খানিক বুঝা যায়, খানিক বুঝা যায় না" [বৌদ্ধগান ও দোঁহা—(ক) ভূমিকা ৮ পৃঃ]।" সম্—পূর্ব্বক ধ্যৈ, (ধ্যান করা) + অ + আপ্ (স্ত্রী) = সন্ধ্যা। সন্ধ্যা ভাষা অর্থে বিশেষ চিন্তা করিয়া যে ভাষার (প্রচ্ছন্ন) অর্থ স্থির করিতে হয়।" (চর্য্যাপদ— ভূমিকা, ৷৷/০ পৃঃ)। চর্য্যাগুলি আলোচনা করিলে বেশ বুঝা যায় যে, অনেক স্থলে চর্য্যাতে খুব সংক্ষেপে বক্তব্য শেষ করা হইয়াছে। সেজন্য টীকা ব্যতীত এগুলির মর্ম্মার্থ বুঝা কষ্টকর। যদি টীকা না থাকিত তবে আলোচনাকারিগণ কতক আলো কতক অন্ধকারে সব কিছুই ঝাপসা দেখিতেন। সন্ধ্যা বা সমাধির সহিত বিশেষভাবে বিচার না করিয়া, কেবলমাত্র লৌকিক এবং আভিধানিক ভাষার সাহায্যে চর্য্যাতত্ত্বের বিচার করিলে অনেক স্থলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক।

'চর্য্য' অর্থ আচরণীয়, এবং 'অচর্য্য' অর্থ অনাচরণীয়। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিধি নিষেধ লইয়া চর্য্যাগুলি রচিত হইয়াছে এবং এগুলিতে এ সম্বন্ধীয় নির্দ্দেশ নিশ্চিতরূপে প্রদত্ত হইয়াছে। যে গ্রন্থে উক্ত উভয়বিধ বিষয়ের নির্দ্দেশ নিশ্চিতরূপে প্রদত্ত হইয়াছে তাহাই 'চর্য্যাচর্য্য বিনিশ্চয়'।

'চর্য্যাচর্য্য বিনিশ্চয়' নামক চর্য্যা বা গানের সংগ্রহ গ্রন্থে বিভিন্ন পদকর্ত্তার রচিত ৫০টী চর্য্যা বা গানের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এই ৫০টী চর্য্যার মধ্যে (২৩ সংখ্যক চর্য্যাটি খণ্ডিত, ২৪ ও ২৫ সংখ্যক চর্য্যার পাঠ পাওয়া যায় নাই এবং ৪৮ সংখ্যক চর্য্যাটী অনাবিষ্কৃত) সাড়ে তিনটী চর্য্যার পাঠ পাওয়া যায় নাই। অবশিষ্ট সাড়ে ছয়চল্লিশটি চর্য্যার পাঠ পাওয়া গিয়াছে।

যে সকল পদকর্ত্তার পদ 'চর্য্যাচর্য্য বিনিশ্চয়ে' সংগ্রহ করা হইয়াছে, তাহাদের নাম ও পদসংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

নাম ও পদের সংখ্যা			পদসমষ্টি
১। লুই— ১, ২৯	...	...	২
২। কুক্কুরী— ২, ৩০	...	...	২
৩। বিরূপা— ৩	...	...	১
৪। গুণ্ডরী— ৪	...	...	১
৫। ঢেণ্ঢন— ৩৩	...	...	১
৬। চাটিল্ল— ৫	...	...	১
৭। ভুসুকু— ৬, ২১, ২৩, ২৭, ৩০, ৪১, ৪৩, ৪৯		...	৮
৮। কাহ্নু— ৭, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৮, ১৯, ৩৬, ৪০, ৪২, ৪৫			১২
৯। কম্বলাম্বর— ৮	...	...	১
১০। ডোম্বি— ১৪	...	...	১
১১। শান্তি— ১৫, ১৬	...	...	২
১২। মহীধর— ১৬	...	...	১
১৩। বীণা— ১৭	...	...	১
১৪। সরহ— ২২, ২৩, ৩৮, ৩৯	...	...	৪
১৫। শবর— ২৮, ৩০	...	...	২
১৬। আর্য্যদেব— ৩১	...	...	১
১৭। দারিক— ৩৫	...	...	১
১৮। ভাদে— ৩৬	...	...	১
১৯। গুঞ্জরী ওরফে ধাম— ৪৭	...	...	১
২০। তারক— ৩৭	...	...	১

নাম ও পদের সংখ্যা			পদসমষ্টি
২১। জয়নন্দী— ৪৬	...	...	১
২২। কৌঙ্কণ— ৪৪	...	...	১
২৩। তন্ত্রীপাদ— ২৫	...	...	১

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে চর্য্যাচর্য্য বিনিশ্চয়ে ২৩ জন পদকর্ত্তার যে ৫০টি পদ সংগৃহীত হইয়াছিল, সেগুলির মধ্যে কাহ্নুপাদ বা কৃষ্ণাচার্য্যের পদসংখ্যা—১৩, ভুসুকুর—৮, সরহের—৪, কুক্কুরীপাদের—৩, লুইপাদ, শবরপাদ ও শান্তিপাদের প্রত্যেকের—২ এবং অবশিষ্ট চর্য্যাকারদের প্রত্যেকের একটী করিয়া পদ পাওয়া যাইতেছে। সেগুলির মধ্যে কাহ্নু বা কৃষ্ণাচার্য্যের এক-চতুর্থাংশের অধিক পদ থাকায় এইরূপ উক্তি খুবই যুক্তিসঙ্গত হইবে যে এই জাতীয় চর্য্যা বা গান রচনায় সে যুগে তিনি বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

'বৌদ্ধগান ও দোঁহা'র ভূমিকায় মাননীয় শাস্ত্রী মহাশয় কবিশেখরাচার্য্যের 'বর্ণন রত্নাকর' হইতে নাথ চৌরাশী সিদ্ধার এক তালিকা উদ্ধৃত করিয়াছেন আমরা ৪র্থ অধ্যায়ে সে তালিকাখানি উদ্ধৃত করিয়াছি। সে তালিকা বিচার করিলে দেখা যায় যে 'চর্য্যাচর্য্য বিনিশ্চয়ে'র চর্য্যাকারদের অনেকেই উক্ত নাথ চৌরাশী সিদ্ধাদের অন্যতম। অধ্যাপক ডাঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া চর্য্যাকার ও নাথ চৌরাশী সিদ্ধাদের যে সমীকরণ তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম—

চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ের				বর্ণন রত্নাকরের
"৩ নং	পদকর্ত্তা	বিরূপা	=	১০ নং সিদ্ধা বিরূপা
৪ নং	,,	গুণ্ডরী	=	(সম্ভবতঃ) ১৭ নং সিদ্ধাকাগুলি
৫ নং	,,	ঢেণ্টন	=	২৭ নং সিদ্ধা ঢেণ্টস
৬ নং	,,	চাটিল্ল	=	৬৪ নং সিদ্ধা চাটল
৮ নং	,,	কাহ্নু	=	১৩ নং সিদ্ধা কাহ্নু

চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ের				বর্ণন রত্নাকরের
৯ নং	,,	কম্বলাম্বর বা কামালি	=	১২ বা ৩৪ নং কমারি বা কামরি
১০ নং	,,	ডোম্বি	=	
		(দীপঙ্করের জীবনীর ডোম্বি)		১৮ নং ধোবী বা ২০ নং টোঙ্গী
১১ নং	,,	শাস্তি		৪৪ নং শাস্তি
১৪ নং	,,	সরহ		২১ নং সিদ্ধা মবহ (সম্ভবতঃ)
১৫ নং	,,	শবর		৪৩ নং সিদ্ধা শবর
১৭ নং	,,	দারিক		৯ নং সিদ্ধা দারিপা
১৮ নং	,,	ভাদে		৩২ নং (৩৭, ৭৪) সিদ্ধা ভাদে
১৯ নং	,,	ধাম বা গুঞ্জরী		৩৬ নং সিদ্ধা ধর্ম্মপা-পতঙ্গ

লিপিকর প্রমাদে নাম বিকৃত রূপ ধারণ করে, কিন্তু উপরে প্রদর্শিত সমীকরণে সন্দেহ করিবার বিশেষ কিছু নাই। তবে দেখা যাইতেছে যে চর্য্যাচর্য্য বিনিশ্চয়ের অন্ততঃ ১৩ জন পদকর্ত্তার নাম আমরা 'বর্ণন রত্নাকরে'র সিদ্ধাদের তালিকায় পাইলাম। * * * কৃষ্ণাচার্য্য বা কানুপা নাথ সাহিত্যের একজন বিখ্যাত নাথ। তিনি হাড়িপা বা জালন্ধরীর শিষ্য।" (গোপীচাঁদের সন্ন্যাস—সম্পাদকীয়, ৬৩ পৃঃ)।

অধ্যক্ষ ডাঃ শহীদুল্লাহ্ বলেন—"এখন চর্য্যাচর্য্য বিনিশ্চয়ের' কৃষ্ণাচার্য্যপাদ বা কাহ্নুপাদ যে বৌদ্ধগান ও দোঁহার ভূমিকার শেষ ভাগের উল্লিখিত বর্ণন রত্নাকরের ৮৪ সিদ্ধার মধ্যে কাহ্নু তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ১১ নং চর্য্যাপদে কৃষ্ণাচার্য্যপাদের ভণিতা কাহ্ন, কাহ্নু বলিয়া কথিত হইয়াছে। বর্ণন রত্নাকরের অন্যান্য সিদ্ধাগণ যথা—বিরূপা, দারিপা, ঢেণ্টস, ভাদে, সবর, শাস্তি, কামরী ও চাটিল যে যথাক্রমে চর্য্যাচর্য্য বিনিশ্চয়ের বিরূবা পাদা বা বিরুআ, দারিক, ঢেণ্ডণ, ভাদে, সবর বা শবর, শাস্তি বা সাস্তি, কলমাম্বর বা কামালি, চাটিল্ল বা চাটিল তাহা নিশ্চিত। বর্ণন রত্নাকরের মীন নাথ, গোরক্ষ নাথ, চৌরঙ্গী নাথ, নাথ-

সাহিত্যের ও সিদ্ধাগণের মধ্যে সুবিদিত। তবে দাঁড়াইতেছে এই যে চর্য্যাকার জালন্ধরীপা—শিষ্য কাহ্নুপাদ নাথ সাহিত্যের সিদ্ধা কানুপা ভিন্ন আর কেহ নহেন। নাথ-সাহিত্যে কানুপার গুরু হাড়িফার নামান্তর যে জলন্দরি তাহ পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। গোপীচাঁদের তিব্বতীয় আখ্যানেও গুরুকে জালন্ধরের সিদ্ধ (The Saint of Jalandhar) বলা হইয়াছে।" ('সিদ্ধাকানুপা' অংশ—৪ ও ৫ পৃঃ)। তিনি আরও বলেন—"সিদ্ধা কানুপার নাম নাথ-সাহিত্যে সুবিদিত। তিনি পূর্ব্ববঙ্গের বিখ্যাত রাজা গোবিন্দচন্দ্রের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। * * * * * ইনিই বৌদ্ধগান ও দোঁহার কাহ্নুপাদ বা কৃষ্ণাচার্য্য-পাদ। এ সম্বন্ধে ১৩২৯ সালের বৈশাখ সংখ্যা ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলনে বিশেষ-ভাবে আলোচনা করিয়াছি। * * * * * পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় হর-প্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সিদ্ধা কানুপা ও কাহ্নুপাদের একত্ব স্বীকার করিয় লইয়াছেন।" (হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালায় সিদ্ধা কানুপার গীত ও দোঁহা—১ পৃঃ ১ম ও ২য় স্তম্ভ)।

অধ্যাপক মণীন্দ্র মোহন বসু বলেন—"তিব্বতীয় ৮৪ জন মহাসিদ্ধার তালিকায় শরহের অপর নাম রাহুল ভদ্র (শূন্য পুরাণ, ভূমিকা ৩ পৃঃ)। সরহ ভনিতায় যে চারিটি পদ চর্য্যাচর্য্য বিনিশ্চয়ে সংগৃহীত রহিয়াছে তাহা এক বা একাধিক সরহ রচনা করিয়া থাকিবেন। ৪৭ সংখ্যক চর্য্যার পদশীর্ষে গুঞ্জরীপাদের নাম রহিয়াছে, কিন্তু পদের ভনিতায় 'ধামপাদ' পাওয়া যায়। ইহা হইতে মনে হয় ধর্ম্মপাদের নামান্তর গুঞ্জরীপাদ। ৪র্থ চর্য্যা রচয়িতা গুড্ডরীপাদের সহিত ইঁহার কোন সম্বন্ধ আছে কি না বলা যায় না। অন্যান্য চর্য্যা রচয়িতৃগণের মধ্যে আর্য্যদেব (বা কাণের, কণেরী), কম্বল বা কম্বলাম্বরপাদ, কুক্কুরীপাদ, জয়ানন্দ, ডোম্বী-হেরুক, তন্ত্রিপাদ, দারিকপাদ, ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মপাদ, বিরূপা (বা বিরূপাক্ষ, হঠযোগ-প্রদীপিকায়), বীণাপাদ, মহী (মহীধর?), শাবর প্রভৃতি সিদ্ধাচার্য্য-গণের নাম তিব্বতীয় ৮৪ মহাসিদ্ধার তালিকায় পাওয়া যায়। বর্ণন রত্নাকরের

নাথ-সিদ্ধাদের নামের তালিকায় চাটল ও ঢেণ্টণ নামক দুই সিদ্ধার নাম পাওয়া যায়। ইহারাই চাটিল ও ঢেণ্টণ নামক পদকর্ত্তা কি না তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। ইহা ব্যতীত নাথ-সিদ্ধাগণের নামের তালিকায় তন্তিপা, (তন্ত্রীপাদ) কহ্ন, দারিপা, বিরূপা, জলন্ধর, ভাদেভদ্র, সবর, সান্তি প্রভৃতির নামও রহিয়াছে (ক ভূমিকা, ৩৬ পৃঃ)। অতএব দেখা যাইতেছে যে চর্য্যাপদ রচয়িতা সিদ্ধাচার্য্যগণের অনেকেই তিব্বতে স্বীকৃত মহাসিদ্ধাগণের অন্তর্ভুক্ত। আবার গোরক্ষ নাথ, মীন নাথ, কৃষ্ণাচার্য্য, জালন্ধর, শবর, শান্তি প্রভৃতি নাথ সম্প্রদায়ের সিদ্ধাচার্য্য বলিয়া (১) স্বীকৃত হইয়া আসিতেছেন।" (চর্য্যাপদ-ভূমিকা, ৸৶০ পৃঃ)।

তাহার কারণ বুদ্ধদেব, মৎস্যেন্দ্র নাথ, গোরক্ষ নাথ প্রমুখ ধর্ম্মাচার্য্যগণের ধর্ম্ম বিশ্বজনীন ধর্ম্ম বা মানব ধর্ম্ম। ইহা সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল না, বা থাকিতে পারে না। সেই জন্যই "মহাযানের 'শূন্য' নাথ-সাহিত্যেও সুপরিচিত। বৌদ্ধগণের দশমীদুআর (৩নং চর্য্যা), চন্দসুজ (৪নং চর্য্যা) বা রবিশশী (১১নং চর্য্যা), গঙ্গাজউনা (১৪নং চর্য্যা), মনপবণ (১৯নং চর্য্যা), ভবনই (৫নং চর্য্যা) প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দগুলি নাথ-সাহিত্যে দশমীদ্বার, চান্দসুরুজ বা রবিশশী, গঙ্গা-যমুনা, মনপবন, ভবনদীরূপে বিদ্যমান। কৃষ্ণাচার্য্যের দোঁহার মণ রা অ (ক, ১২৯ পৃঃ) নাথ-সাহিত্যে মনুয়া। ভুসুকুর চতুরাভরণের ইঙ্গলা পিঙ্গলা নাথ-সাহিত্যে সুপ্রচুর। সহজ সিদ্ধির সাধনপ্রণালী—যথা, চিত্তস্থির করা, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস সংযত করা, বিন্দুধারণ প্রভৃতি নাথ-গ্রন্থেরও সাধনপ্রণালী।" (শূন্য পুরাণ, ভূমিকা, ৬—৭ পৃঃ)। প্রকৃত পক্ষে এই ধর্ম্মমতগুলি যোগধর্ম্মের উৎস হইতে উৎপন্ন হইয়া বিভিন্ন ভাবধারায় পরিপুষ্টি লাভ করিয়া বিশিষ্টতা সম্পন্ন হইয়াছে (২)।"

(১) নাথ-ধর্ম্মনায়কগণকে নাথাচার্য্য, সিদ্ধ বা সিদ্ধা বলা হয়, সিদ্ধাচার্য্য নহে। বৌদ্ধ ধর্ম্মনেতাগণকেই সিদ্ধাচার্য্য বলা হয়।

(২) ২য় অধ্যায়ের শেষাংশ দেখুন।

"সহজপন্থীরা বুদ্ধের দোহাই দিতেন বটে, কিন্তু খাঁটি বুদ্ধমতের সহিত তাঁহাদের সম্পর্ক ছিল অতি অল্প।" (গোপীচাঁদের সন্ন্যাস— সঃ মঃ)

যাহা হউক 'সিদ্ধা কানুপার গীতের ভাষা' সম্বন্ধে ডাঃ শহীদুল্লাহ্ আরও বলিতেছেন—

"আমরা দেখিয়াছি কানুপা বাঙ্গালী ছিলেন, তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র পূর্ব্ব-বঙ্গে ছিল। তাঁহার রচিত গীত ও দোঁহার ভাষাকে আমরা প্রাচীন বাঙ্গালা বলিতে পারি কি না— ইহাই এখন আলোচ্য। আমরা সোজাসুজি বলিতে পারি যে দোঁহার ভাষায় বাঙ্গালার কোন লক্ষণই নাঁই। কাজেই তাহা বাঙ্গালা ভাষার কোঠায় আসিতে পারে না। গীতগুলি সম্বন্ধে কিন্তু একথা বলা চলে না। আমরা এস্থলে গীতগুলির ভাষা বিশেষরূপে পরীক্ষা করিব।

ভাষার জাতি ঠিক করিতে হইলে তাহার কতকগুলি পরিচয় জানা দরকার; যেমন, তাহার ধ্বনি-বিজ্ঞান (phonology), ব্যাকরণ (morphology), বাগধারা (syntax) ও শব্দসমষ্টি (vocabulary)। (হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালায় সিদ্ধা কানুপার গীত ও দোঁহা— ১৯ পৃঃ)

এই সমস্ত দিক বিবেচনা করিয়া আমরা কানুপার গানকে প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষার গান ছাড়া আর কিছু বলিতে পারি না। সেই সময় অবশ্য মৈথিলী, উড়িয়া ও আসামীর সহিত বাঙ্গালার ভেদ অতি সামান্য ছিল। এই জন্য ঐ সকল ভাষার সহিত কিছু পরিমাণে এই গানগুলির ভাষার মিল থাকিতে পারে। কিন্তু সমন্ধের 'এর' কর্ম্মের 'রে' 'রেঁ' ইত্যাদি ব্যাকরণ ও অন্যান্য সমস্ত দিক বিবেচনা করিয়া ইহাকে বঙ্গালা ভাষার প্রাচীনতম রূপ না বলিয়া গতি নাই।" (২৪ পৃষ্ঠা) "সিদ্ধা কানুপা যে দোহাকোষ ও চর্য্যাপদসমূহ রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালা ভাষার এক প্রাচীন নিদর্শন ও অপূর্ব্ব সামগ্রী। কেবল সিদ্ধারূপে নহে, বাংলার প্রাচীন কবিরূপেও কানুপা আমাদের ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবেন।" ('সিদ্ধা কানুপা' অংশ—৫ পৃঃ ও হাজার বছরের

পুরাণ বাঙ্গালায় সিদ্ধা কানুপার গীত ও দোঁহা)। প্রসঙ্গক্রমে তিনি কানুপা নাথের বারটী গান সম্বন্ধে আরও বলিয়াছেন— "* * * বারোটী গানের ভাষা আলোচনা করে বিশেষজ্ঞেরা বলেছেন যে, সেগুলি পুরানো বাঙ্গালায় লেখা বটে।" (শনিবারের চিঠি—১৩৫১ বাং, আশ্বিন, ৩৮৪ পৃঃ, মীন নাথ ও কানুপা)।

অধ্যাপক ডাঃ সুকুমার সেন বলেন—" * * * চর্য্যাপদগুলি বাঙ্গালা পদাবলীর পূর্ব্বরূপ। পদাবলীর মত এতে রাগরাগিণীর উল্লেখ আছে এবং কবির ভনিতাও আছে।" (প্রাচীন বাঙ্গালা ও বাঙ্গালী—৩৪, ৩৫ পৃঃ)। শ্রীসুরেশচন্দ্র নন্দী 'পালরাজত্ব সময়ে শিক্ষা, সাহিত্য ও শিল্প' প্রবন্ধে বলেন— "বৌদ্ধ ও শৈব যোগীদের রচনাসম্ভারে এই যুগের বঙ্গসাহিত্য সমৃদ্ধ হয়। শৈব যোগীরা সিদ্ধ আর বৌদ্ধ যোগীরা সিদ্ধাচার্য্য নামে পরিচিত ছিলেন। সিদ্ধ ও সিদ্ধাচার্য্য সম্প্রদায় পদ, গীত, গাঁথা, দোঁহা রচনা করিয়া বিরাট বঙ্গসাহিত্যের সৃষ্টি করেন।" (মাসিক বসুমতী) পৌষ, ১৩৩৯ বাং, ৩৯৯ পৃঃ)। চর্য্যাগুলি সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় বলেন—

"গানগুলি বৈষ্ণবদের কীর্ত্তনের মত, গানের নাম চর্য্যাপদ। সেকালেও সঙ্কীর্ত্তন ছিল এবং কীর্ত্তনের গানগুলিকে পদই বলিত। তবে এখনকার কীর্ত্তনের পদকে শুধু পদ বলে, তখন চর্য্যাপদ বলিত।" [বৌদ্ধগান ও দোঁহা—(ক) ভূমিকা, ১৬ পৃঃ]। অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসু বলেন— "চর্য্যাগুলির ছন্দোবদ্ধ নাতিদীর্ঘ রচনার দৃষ্টান্তস্বরূপ, আর ভাবের দিক দিয়া দেখা যায় যে, ইহাদের মধ্যে বিবিধ তত্ত্বপূর্ণ আলোচনা রহিয়াছে। * * * প্রত্যেক চর্য্যাপদের শীর্ষদেশে রাগ রাগিণীর উল্লেখ রহিয়াছে। পটমঞ্জরী, বরাড়ী, মল্লার, মালশী, বঙ্গালী প্রভৃতি রাগ রাগিণী বৈষ্ণব পদাবলীতে সুপরিচিত। অতএব স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, যে বৌদ্ধ চর্য্যাপদগুলি বাংলা কীর্ত্তনের প্রাচীনতম নিদর্শন।"

(চর্য্যাপদ—১৵৹ পৃঃ)

বসু মহাশয় চর্য্যাগুলিকে বৌদ্ধচর্য্যা বলিয়াছেন। আবার তিনি বলিতেছেন

—"অনেকের ধারণা এই যে, চর্য্যাগুলিতে বিশেষরূপে বৌদ্ধতান্ত্রিকতার অভিব্যক্তি রহিয়াছে। কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে চর্য্যার ধর্ম্মতত্ত্ব প্রধানতঃ দার্শনিক মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত।" (চর্য্যাপদ—৩৶০ পৃঃ)। এগুলিকে নাথ ও বৌদ্ধচর্য্যা বলিলেই সঙ্গত ও শোভন হইত। এ সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। অধিকাংশ চর্য্যাপদে দার্শনিক তত্ত্বের (চর্য্যা—১, ৫, ১০, ১২, ১৩, ২৬, ২৮, ৩৫, ৩৭, ৫০) আলোচনা দৃষ্ট হয়। কয়েকটীতে যোগের (চর্য্যা—২, ১১, ৩৬) আলোচনা আছে। কয়েকটিতে তান্ত্রিক মতবাদের (চর্য্যা—৩, ৪, ২৭) উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন চর্য্যাতে যোগ ও তন্ত্রের সহিত তত্ত্বালোচনাও দৃষ্ট হয় (চর্য্যা—১৪)। গীতা ও উপনিষদের উপদেশের ন্যায় চর্য্যাগুলিতে গুরুর উপর নির্ভর করিতে বলা হইয়াছে। কোন কোন চর্য্যার তত্ত্ব যোগবাশিষ্ট রামায়ণের অনুকরণে রচিত (চর্য্যা— ৩৪, ৪৯, ৫০, ১ ইত্যাদি)। যোগবাশিষ্ট রামায়ণ ষষ্ঠ শতাব্দীর রচিত (Yogavasistha and its philosophy by B. L. Atenya. Page 38)। আর চর্য্যাগুলি ১০ম-১১শ খৃঃ অব্দের রচিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। যোগবাশিষ্ট রামায়ণ ও অন্যান্য হিন্দু শাস্ত্রেও বৌদ্ধ ধর্ম্মতত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। অধ্যাপক মণীন্দ্রবাবু পূর্ব্বে চর্য্যাগুলিকে 'বৌদ্ধ চর্য্যাপদ' বলিয়াছেন। এখন চর্য্যার ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনা করিতে গিয়া বলিতেছেন "এই চর্য্যাতত্ত্ব হিন্দু কি বৌদ্ধ তাহাও বিবেচ্য বিষয় (চর্য্যাপদ-ভূমিকা, ৩৸৶০ পৃঃ)। তিনি চর্য্যার ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনায় বহুবিধ প্রমাণ ও যুক্তিতর্ক দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের প্রকারভেদ মাত্র। (চর্য্যাপদ ১৷৷০ হইতে ২৸/০ পৃঃ)। চর্য্যাগুলি যে হিন্দুর নিজস্ব সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকা উচিত নহে। আলোচনা করিলে বুঝিতে কষ্ট হয় না যে, চর্য্যাগুলি মিত্রাক্ষর রীতিতে রচিত হইয়াছে এবং যথা সম্ভব সংক্ষেপে এগুলির ভাব প্রকাশের চেষ্টা করা হইয়াছে। এগুলিতে সংস্কৃতের জাতিছন্দ অনুসৃত হয় নাই। নাথাচার্য্য

এ সিদ্ধাচার্য্যগণ বৃত্তছন্দেই চর্য্যাগুলি রচনা করিয়াছেন। ইহা দ্বারা বাঙ্গালা-ছন্দের মূল ভিত্তি গঠিত হইয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যের জাতকর্ম্ম এ ভাবে নাথাচার্য্য ও সিদ্ধাচার্য্যগণ কর্তৃক সুসম্পাদিত হইয়াছে। বাঙ্গালা পয়ার ও ত্রিপদীর প্রাচীনতম রূপের সন্ধান এ গুলিতে আছে (১৪, ১৫, ১৬, ২৮, ৩৯, ৪১, ৪৪, ৪৯, ৫০)।

'চর্য্যাচর্য্য বিনিশ্চয়' একখানি গানের সংগ্রহ গ্রন্থ। ইহাতে বিভিন্ন চর্য্যাকার বা পদকর্ত্তার রচিত ৫০টী চর্য্যা বা গান সংগৃহীত হইয়াছিল। এ গুলির মধ্যে কৃষ্ণাচার্য্যের তেরটি চর্য্যা সংগৃহীত হইয়াছে বলিয়া দেখা যায়। তন্মধ্যে বারটি গান শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার 'বৌদ্ধগান ও দোঁহা'য় উদ্ধৃত করিয়াছেন। প্রবোধ বাবুর সম্পাদিত তিব্বতীয় অনুবাদে আর একটি পদের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। স্বরচিত চর্য্যাপদে কাহ্নু বা কৃষ্ণাচার্য্য নিজকে যোগী, কাপালিক বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন (চর্য্যা ১১০, ১১, ৪২)। চর্য্যাকার কৃষ্ণাচার্য্য আপনাকে জালন্ধরী-পাদের শিষ্য বলিয়াও স্বীকার করিয়াছেন (চর্য্যা—৩৬)। কাহ্নু নিজের রচিত চর্য্যাপদের কোন কোন স্থানে বৌদ্ধশাস্ত্রের কথা ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া কেহ কেহ তাঁহাকে বৌদ্ধ সহজপন্থী বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। কিন্তু চর্য্যাচর্য্য বিনিশ্চয়ের টীকার মুনিদত্ত বলিতেছেন কাহ্নুপাদের—"জিনপুর (জিনউর ৭নং চর্য্যা) অর্থে বুদ্ধের স্থান নহে মহাসুখপুর, জিনরত্ন (জিণর অণ ৪০ নং গানে) অর্থে বুদ্ধ নহেন চতুর্থানন্দ, ত্রিশরণ (তিশরণ ১৩ নং গানে) অর্থ বুদ্ধ, ধর্ম্ম, সঙ্ঘ নহে, কিন্তু কায়-বাক্-চিত্ত এই ত্রয়ের আশ্রয়স্থল "মহাসুখকায়"। (হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালায় সিদ্ধা কানুপার গীত ও দোঁহা—১ পৃঃ)।

টীকা সম্বন্ধে অধ্যাপক মণীন্দ্রবাবু বলিতেছেন—"প্রকৃতপক্ষে চর্য্যাগুলির মর্ম্ম গ্রহণকল্পে এই টীকার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পদগুলির মর্ম্মার্থ টীকাকার যে ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় সদগুরুর উপদেশে এই ধর্ম্মে তাঁহার প্রবেশাধিকার হইয়াছিল। অর্থাৎ তিনি সহজিয়া

ধর্ম্মতত্ত্ব বিশেষরূপেই অবগত হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত টীকায় উদ্ধৃত বিবিধ উল্লেখ হইতে তাঁহার অসীম পাণ্ডিত্যেরও পরিচয় পাওয়া যায়। অতএব সংস্কৃত টীকাটী সম্পূর্ণ ই নির্ভরযোগ্য।" (চর্য্যাপদ—ভূমিকা, ।৶০ পৃঃ)।

কানুপা বা কাহ্নুপাদ যদি সহপন্থী হইতেন তাহা হইলে সহজপন্থী এত বড় জ্ঞানী টীকাকার স্বতঃপ্রবৃত্ত ভাবে ঐ কথাগুলি নিশ্চয়ই বলিতেন না। কাহ্নুপাদ তাঁহার গানের পাঁচ স্থানে সহজ শব্দ প্রয়োগ করায়ও কেহ কেহ তাঁহাকে সহজপন্থী বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। সহজ অর্থে সহজাত। যে ধর্ম্ম যাঁহার সহিত জন্ম হইতেই উৎপন্ন হয়, তাহাই তাঁহার সহজ। নির্ব্বাণ লাভ করিয়া মহাসুখে নিমজ্জিত থাকাই সহজ সাধনার চরম লক্ষ্য। সহজ ও সহজানন্দ ব্রহ্মানন্দ, জীবাত্মা পরমাত্মার মিলনজনিত সহজানন্দোচ্ছাস। ব্রহ্মোপলব্ধি জনিত আনন্দই সহজানন্দ। যথা—"তদেব সচ্চিদানন্দং ব্রহ্ম ভবতি সহজানন্দে যদামনোলীয়তে তদাশান্তোভবতি তদেব খেচরিমাহু"—(মণ্ডল ব্রাহ্মণ উপনিষদ— ২য় ব্রাহ্মণ)।

হঠযোগ প্রদীপিকায় সহজোলী, ব্রজোলী প্রভৃতি যোগের কথা আছে। এই সহজোলীর আদর্শে বৌদ্ধ সহজ পন্থার উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। তাহা হইলে 'সহজ' বৌদ্ধদের নিজস্ব নহে।

অধ্যাপক ডাঃ সুকুমার সেন বলেন— "নাথপন্থের সাধনার চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে সহজ অবস্থা প্রাপ্তি ; যে অবস্থায় জন্ম, জরা, মৃত্যুর অতীত হওয়া যায়। জন্ম মৃত্যুর বন্ধন মানুষের স্বকৃত। প্রাণবায়ু নিরুদ্ধ, বীর্য্য উর্দ্ধোত্থিত এবং চিত্ত নিষ্ক্রিয় হলেই হয় সমতাযোগ এবং তার ফলেই সহজত্বলাভ।" (কল্যাণশ্রী— শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৫৫ বাং, নাথপন্থের দিশা)।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলিয়াছেন— "ক্রমে খুঁজিতে খুঁজিতে কৌলজ্ঞান বিনির্ণয় নামক মৎস্যেন্দ্র নাথের বা মছন্দপাদের অবতারিত একখানা তন্ত্র পাইলাম। উহাতে যে অক্ষরে লেখা সে অক্ষর খৃষ্টের নয় শত বৎসর পরে

উঠিয়া গিয়াছে। তাহাতে কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম্মের নামগন্ধও ছিল না। একখানি বৌদ্ধগ্রন্থে মীন নাথের একটী বাঙ্গালা পদ তুলিয়া বলিয়াছে যে ইহা পরদর্শন মত" (প্রবাসী— বৈশাখ, ১৩২২ বাং, বাঙ্গালার প্রাচীন গৌরব)।

চর্য্যাচর্য্য বিনিশ্চয়ের টীকার ব্যাখ্যার সমর্থনে ২৯ খানি প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে প্রমাণবাক্য উদ্ধৃত করা হইয়াছে এবং ১৪ জন পণ্ডিতের নাম করা হইয়াছে। চারিটি স্থানে বহিঃশাস্ত্রেরও উল্লেখ আছে কিন্তু তিনটী স্থানের বহিঃশাস্ত্রের বানানে বিসর্গ দেওয়া হয় নাই। প্রামাণিক গ্রন্থগুলির মধ্যে নাথ পন্থার কাহ্নু বা কৃষ্ণাচার্য্যের যোগরত্নমালা (৮ পৃঃ), শ্রীহেবজ্র— (৩, ৪, ১০, ২০, ৩১, ৩৬), নাগার্জ্জুনের অপ্রতিষ্ঠান প্রকাশ (৬, ২৪ পৃঃ) প্রভৃতি গ্রন্থের উল্লেখ আছে এবং ১৪ জন সুপণ্ডিতের মধ্যে নাথপন্থার মীননাথ (৩৭ পৃঃ), কৃষ্ণাচার্য্য (২, ৬, ৭, ৮, ১০, ১২, ১৭, ২৯, ৩৬, ৪৩, পৃঃ)।

বিরূপাক্ষপাদ (২৮ পৃঃ), সরহপাদ (৩, ৭, ১১, ১৫, ৩১, ৩৪, ৩৮, ৪৩, ৪৪, ৪৭, ৪৮, ৫০, ৫২, ৫৩, ৫৫, ৬১, ৬২, ৬৭, ৭১, ৭২, ৭৪ পৃঃ), নাগার্জ্জুনপাদ (৩, ১৬, ১৮, ২৩, ২৪, ৪২, ৪৬ পৃঃ), শান্তিদেব (৬১ পৃঃ) অন্যতম। উপরে ব্রাকেটের মধ্যে যে পৃষ্ঠাসংখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা চর্য্যাচর্য্য বিনিশ্চয়ের পৃষ্ঠানুযায়ী বুঝিতে হইবে)।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি চর্য্যাচর্য্য বিনিশ্চয়ে ৫০টী চর্য্যা সংগৃহীত হইয়াছে। এরূপ নাথ ও বৌদ্ধগীতিকা দ্বারা এক বিরাট বাঙ্গালা গীতি-সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। তন্মধ্যে কৃষ্ণাচার্য্যের— 'বজ্রগীতি', সরহের— দোহাকোষগীতি, দোহাকোষ চর্য্যাগীতি, ডাকিনী বজ্রগুহ্যগীতি, বিরূপের—বিরূপগীতিকা, বিরূপবজ্র গীতিকা, শবরের— মহামুদ্রা বজ্রগীতি, চিত্রগুহ্য গম্ভীরার্থ গীতি, লুইপাদের— লুই-পাদগীতিকা, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের (১) বজ্রাসন বজ্রগীতি, চর্য্যাগীতি, দীপঙ্কর

(১) "দীপাঙ্কুর শ্রীজ্ঞান তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত ছিলেন। কিন্তু বাঙ্গালায় আসিবার পর আর তিব্বতীয়দের সঙ্গে মিশিতে পারেন নাই। তথন

শ্রীজ্ঞান ধর্ম্মগীতিকা, ভুসুকুর— সহজগীতি প্রভৃতি গ্রন্থের উল্লেখ কোডিয়ার সাহেবের প্রকাশিত তালিকায় পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ ঐ সকল গ্রন্থ হইতে ৫০টী উত্তম পদ চর্য্যাচর্য্য বিনিশ্চয়ে সংগৃহীত হইয়াছিল।

কাহ্নুপাদ বা কানুপা শুধু চর্য্যা বা গান রচনা করেন নাই। তিনি অনেক দোঁহাও রচনা করিয়াছেন। তাঁহার রচিত দোঁহাকোষে ৩২টী দোঁহার সন্ধান পাওয়া যায়। Bendall সাহেব "সুভাষিত সংগ্রহ" নামক যে গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছেন তাহার ৪৫ পৃষ্ঠার "দোহাকোষে শ্রীকান্হপাদৈরপ্যুক্তম্" বলিয়া কয়েকটী দোঁহা আছে।

Bendall সাহেব তিব্বতী অনুবাদ হইতে দোঁহার ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন। আবার তেঙ্গুরের তিব্বতী অনুবাদ হইতে দোঁহার ইংরাজী তর্জ্জমা করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, তিব্বতীয় ভাষার ইংরাজী তর্জ্জমাও করিয়াছেন। দোঁহাগুলি বাঙ্গালা ভাষায় রচিত হয় নাই বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, সেজন্য এখানে এগুলি উদ্ধৃত করা হইল না।

শাস্ত্রী মহাশয় বলেন—"কৃষ্ণপাদ, কৃষ্ণাচার্য্য, কৃষ্ণবজ্র বা কাহ্নুপাদ সর্বশুদ্ধ ৫৭ খানি বই লিখিয়াছেন। এই ৫৭ খানি গ্রন্থের গ্রন্থকার যে একই কৃষ্ণ, তাহাই বা কে বলিতে পারে? কোন জায়গায় কৃষ্ণকে মহাচর্য্য, কোন জায়গায় উপাধ্যায়, কোন জায়গায় মণ্ডলাচার্য্য বলা হইয়াছে। এক জায়গায় আবার

তিনি বাঙ্গালাদেশে এক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন। তাহারা নাথ সম্প্রদায় নামে বিদিত" (দেল পূজার ছড়া— বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ৪৭ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ২৭০ পৃঃ, ১৩৪৭ বাং)। আমরা ২য় অধ্যায়ে দেখাইয়াছি বাঙ্গালায় নাথধর্ম্মের প্রবর্ত্তনকাল— ৩য় কি ৪র্থ খৃঃ অব্দ। আর বাঙ্গালাদেশে শ্রীজ্ঞানের জন্ম— ৯৮০ খৃঃ অব্দ। কথা এই নহে। তিনি তিব্বত হইতে বাঙ্গালায় আসিয় বৌদ্ধধর্ম্ম ত্যাগ করতঃ নাথধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, এবং রাজা ভর্ত্তৃহরির মত একটি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এর ফলেই তিব্বতীয়েরা তাঁহাকে ধর্ম্মত্যাগী বলিয়া তাহাদের দলে মিশিতে দেয় নাই।

তাঁহাকে ছোট কৃষ্ণ বলা হইয়াছে, পাঁচ জায়গায় তাঁহাকে কৃষ্ণাচার্য্য বা কাহ্নুপাদ বলা হইয়াছে। তাহার এই সকল নাম ও উপাধির বিবরণ তদ্রচিত গ্রন্থাদির উল্লেখসহ কোর্ডিয়ার সাহেব কর্ত্তৃক প্রকাশিত তালিকায় পাওয়া যায়" (বৌদ্ধ গান ও দোঁহা—১।৴০—১।৶০ পৃঃ)।

বৈষ্ণব-গীতিসাহিত্য আদি সাহিত্য নহে

ছন্দবদ্ধ ভাবমুখর নাতিদীর্ঘ রচনাকে সাধারণতঃ পদ বা চর্য্যা বলে। ভাব পদের বা চর্য্যার প্রাণ স্বরূপ। তথাপি বর্ণনাত্মক এবং তত্ত্বপূর্ণ কবিতাকেও পদ বা চর্য্যা পর্য্যায়ে গ্রহণ করা হয়। লীলা রসময় আত্মনিবেদন ও প্রার্থনার নাম কীর্ত্তনে বৈষ্ণব সাহিত্য সুপরিপুষ্ট। বলা বাহুল্য চর্য্যা পদগুলির অনুকরণে এবং বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রভাবে আমাদের দেশে এক বিরাট পদাবলী সাহিত্য গড়িয়া ঠিয়াছিল। প্রাচীন সাহিত্যেও এ সকল বিশেষত্ব পূর্ণ রচনার সন্ধান পাওয়া যায়। বৈদিক যুগে বেদের সূক্তগুলি তান লয় সহযোগে গান করা হইত। গুলি অল্প-পরিসর ছন্দেই রচিত দেখা যায়, এবং এ গুলিতে দেবদেবীর স্তুতি, প্রার্থনা ও তত্ত্বালোচনা দৃষ্ট হয়। মোটামুটীভাবে বিচার করিলে এ গুলিতে পদাবলীর প্রাচীনতম বিশেষত্ব লক্ষিত হয় এবং চর্য্যাগুলিতে ইহার পূর্ণ বিকশিত অবস্থাই দৃষ্ট হয়। চর্য্যা পদগুলিতে বাঙ্গালা পয়ার ও ত্রিপদীর প্রাচীনতম রূপ ও ছন্দের সুরের সন্ধান পাওয়া যায়। কোন কোন স্থানে সঙ্গীতকে 'গান্ধর্ব' বলা হইয়াছে (বায়ু পুরাণ—৮৬ তম ও ৮৭ তম অধ্যায়)।

বর্ত্তমানে প্রসিদ্ধি আছে যে বৈষ্ণব মহাজনগণই বাঙ্গালা পদাবলী গীতি সাহিত্যের প্রবর্ত্তক। ইহা সত্য নহে। আমরা চতুর্থ অধ্যায়ে প্রমাণ করিয়াছি যে কাহ্নু বা কৃষ্ণাচার্য্যের সময় ১০ম ১১শ খৃঃ অব্দ। বিরূপা (বিরূপাক্ষ), দারিপা (দারিক), ভাদে (ভাদ্রপাদ), ঢেণ্টেস (ঢেণ্টেন) প্রমুখ চর্যাকারদের সময়ও তাহাই। এ সময় বাঙ্গালা ভাষা বিশেষভাবে নিজস্ব বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করিয়াছিল। "বাংলার আদি ও শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব পদকর্ত্তা চণ্ডীদাস" (বিদ্যাপতি ও

চণ্ডীদাস, কবি পরিচয়— ৫পৃঃ)। ইনি ১৫শ খৃঃ অব্দের মধ্যভাগে বর্ত্তমান ছিলেন (বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস)। "বিদ্যাপতি বাংলা ও মিথিলার একজন আদি কবি ও মহাকবি ছিলেন" (বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস, কবি পরিচয়—১০পৃঃ)। ইনি ১৩৫৮— ১৪৫৮ খৃষ্টীয় শতাব্দীর মধ্যে বর্ত্তমান ছিলেন (বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস)। বিদ্যাপতি মিথিলার লোক। চৈতন্য মহাপ্রভুর জন্ম হয় ১৪৮৫ খৃঃ অব্দে এবং তিনি সন্ন্যাস অবলম্বন করেন ১৫০৯ খৃঃ অব্দে। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস চৈতন্য মহাপ্রভুর পূর্ব্ববর্ত্তী লোক। চৈতন্যচরিতামৃত হইতে জানা যায় যে চৈতন্য মহাপ্রভু চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি প্রমুখ আদর্শ পদকর্ত্তাদের রাধাকৃষ্ণ লীলা সম্বন্ধীয় পদাবলীর রসাস্বাদনে নিমগ্ন থাকিতেন এবং এ ভাবেই মিথিলার বিদ্যাপতির পদাবলী বাঙ্গালাদেশে প্রচারিত হইয়াছিল। সে সময় বাঙ্গালা ও মিথিলার ভাষা প্রায় একরূপ ছিল। আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি নাথাচার্য্য ও সিদ্ধাচার্য্যদের চর্য্যা বা গানগুলি ১০ম ১১শ খৃঃ অব্দে রচিত হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে আদি ও শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব পদকর্ত্তাগণ কর্ত্তৃক রচিত পদাবলী গীতি-সাহিত্যের মোটামুটী পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে বৈদিক যুগের অনুকরণে বাঙ্গালা পদাবলী গীতি-সাহিত্যের জাতকর্ম্ম নাথাচার্য্য ও সিদ্ধাচার্য্যগণ কর্ত্তৃক সুসম্পাদিত হইয়াছিল। তবে এ কথা অস্বীকার করা উচিত হইবে না যে বৈষ্ণব মহাজনগণের কণ্ঠেই আধুনিক পদাবলী গীতি-সাহিত্যের চরম উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

চতুর্দ্দশপদী কবিতার উদ্ভবকাল —১০ম।১১শ খৃষ্টীয় শতাব্দী এবং ইহার প্রবর্ত্তক সিদ্ধা কাহ্নপাদ ও সিদ্ধা শবর নাথ

"মাইকেল এদেশে সর্ব্বপ্রথম চতুর্দ্দশপদী কবিতা রচনার রীতি প্রবর্ত্তন করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি রহিয়াছে। একটু অনুধাবন করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণই যুক্তিহীন। তাঁহার পূর্ব্বে কি এদেশে চৌদ্দ পদে কে

কবিতাই রচিত হয় নাই? বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে চৌদ্দপদী কবিতার অভাব নাই, অতএব স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, এই জাতীয় কবিতার প্রবর্ত্তক হিসাবে মাইকেলকে গ্রহণ করা যাইতে পারে না। কেহ হয়ত বলিবেন যে, চতুর্দ্দশপদী কবিতা অর্থে ইংরাজী সনেট, অর্থাৎ বিদেশী মাল, যাহা স্বদেশী পোষাকে চালান হইয়াছে। তাহা হইলে টেবিল, চেয়ার যেমন বাঙ্গালা ভাষায় চলিয়া যাইতেছে সেইরূপ সনেট শব্দ দ্বারা মাইকেলী কবিতাগুলিকে চিহ্নিত করিলেই ইহার মূল প্রকৃতি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা জন্মিতে পারে। যাহা হউক, সনেটও ইংরাজদের নিজস্ব নহে, ইহা তাঁহারা ইতালী হইতে ধার করিয়াছেন। এখন সনেট বলিতে ভাব প্রকাশের নির্দ্দিষ্ট নিয়মে চৌদ্দপদে রচিত কবিতা বিশেষকে বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু ইতালী দেশে এই নিয়ম বিধিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে নানাভাবে সনেট রচিত হইত, পরে ইহার রচনার ধারা স্থিরীকৃত হয়। ইংরাজ কবিগণ তাহাই অবলম্বন করিয়া সনেট রচনা করিয়াছেন। মাইকেল আবার সেক্সপীয়র ও মিল্টনের অনুকরণে বাঙ্গালা ভাষায় চতুর্দ্দশপদী কবিতা নামধেয় সনেটের সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষাতেও অতি প্রাচীন কাল হইতে চতুর্দ্দশ পদে কবিতা রচনার ধারা চলিয়া আসিতেছিল। ইহার প্রাচীনতম রূপের সন্ধান ১০ম ও ৫০শ চর্য্যায় পাওয়া যায়। পরবর্ত্তীকালে বৈষ্ণব কবিগণ এই জাতীয় বহু কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইহার প্রধান বিশেষত্ব এই যে, পয়ারের ন্যায় প্রতি দুই চরণে মিল থাকে। রবীন্দ্রনাথও অনেক চৌদ্দপদী কবিতা রচনা করিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই আমাদের প্রাচীন প্রথায় রচিত হইয়াছে। অতএব আমাদের নিজস্ব চৌদ্দপদী কবিতা রচনার নিদর্শন আমরা চর্য্যাপদে পাইতেছি" (অধ্যাপক মণীন্দ্রবাবুর চর্য্যাপদ—ভূমিকা, ১৷৶০ পৃঃ)।

১০ম সংখ্যক চর্য্যাকার নাথাচার্য্য কাহ্নুপাদ এবং ৫০শ সংখ্যক চর্য্যাকার নাথাচার্য্য শবরপাদ। বর্ণন রত্নাকরের চৌরাশী সিদ্ধার তালিকায় ইঁহাদের নাম

আছে। নাথ চৌরাশী সিদ্ধাগণের নামের তালিকায় যে ইঁহাদের নাম পাওয়া যায় তাহা ডাঃ শহীদুল্লাহ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও স্বীকার করিয়াছেন। কাহ্ন ও শবর ১০ম ১১শ খৃঃ অব্দের লোক। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে মোটামুটী হাজার বৎসর পূর্ব্বে চতুর্দ্দশপদী কবিতা রচনা আরম্ভ হইয়াছিল এবং ইহার প্রবর্ত্তক কাহ্নু ও শবর নামক নাথাচার্য্যদ্বয়।

শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী বলেন—"খৃষ্টীয় সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দী হইতে মুসলমান আক্রমণের সময় দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষার যতখানি পুষ্টি বা বিস্তৃতি ঘটিয়াছিল, তাহাতে আমার বোধ হয় বৈদেশিক প্রভাব একেবারেই ছিল না; কিন্তু তাহার উপাদান বিভাগে সহজ ধর্ম্মমত, নাথপন্থীদিগের ধর্ম্মমত ও বৌদ্ধতান্ত্রিক মত বিশেষভাবেই বিবৃত রহিয়াছে। এ সময় রামায়ণ মহাভারতের অনুবাদ নাই, পুরাণ সমূহের উল্লেখ নাই। আছে কেবল বৌদ্ধ সন্ন্যাসের মত, নাথপন্থী যোগীদিগের মত, এবং সহজ ধর্ম্মমূলক সাধারণ নীতি-কথার আবৃত্তি। পূর্ব্বগামী সিদ্ধাচার্য্যগণ, নাথপন্থী যোগিগণ এবং সহজিয়াগণ যে পন্থা অবলম্বন করিয়া নিজেদের ধর্ম্মমত বাঙ্গালার লোকসমাজে প্রচার করিতেন, বাঙ্গালার ব্রাহ্মণগণ তখন সেই পন্থা অবলম্বন করিলেন। ফলে সঙ্গে সঙ্গে মনসার গান, মঙ্গলচণ্ডীর গান শিবায়ণ প্রভৃতি ব্রাহ্মণমতের অনুগামী লিখিত হইতে লাগিল" (সাহিত্য—জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪ বাং ৯৬ পৃঃ)।

নাথাচার্য্যগণের গীত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু এম-এ কৃত ভাবানুবাদ সহ নিম্নে আমরা নাথাচার্য্যগণের চর্য্যাপদ বা গানগুলি উদ্ধৃত করিলাম। বাহুল্য ভয়ে আমরা বৌদ্ধ চর্য্যাকারদের চর্য্যাগুলি এখানে উদ্ধৃত করিলাম না। চর্য্যা বা গানগুলিতে মূল পুস্তকের নম্বর থাকিবে।

৩। রাগ গবড়া

বিরুব পাদানাম্

এক সে শুণ্ডিনি দুই ঘরে সান্ধঅ।
চীঅণ বাকলঅ বারুণী বান্ধঅ ॥
সহজে থির করি বারুণী সান্ধ।
জে অজরামর হোই দিঢ় কান্ধ ॥
দশমি দুআরত চিহ্ন দেখিআ।
আইল গরাহক অপণে বহিআ ॥
চউশটি ঘড়িয়ে দেল পসারা।
পইঠেল গরাহক নাহি নিসারা ॥
এক সে ঘড়লী সরুই নাল।
ভণন্তি বিরুআ থির করি চাল ॥

ভাবানুবাদ—

এক সে শুণ্ডিনী দুই নিয়া ঘরে সান্ধে।
চিকন বাকল দ্বারা বারুণীকে বান্ধে ॥
সহজে করিয়া স্থির বারুণীকে সান্ধ।
অজর অমর হও লভি দৃঢ় স্কন্ধ ॥
চিহ্ন প্রমোদের দেখি দশমী দ্বারেতে।
গ্রাহক আপনি আসে বাহি সেই পথে
চৌষট্টি ঘটীতে মদ প্রসারিত পাই।
গ্রাহক পশিয়া খায়, সারা কিছু নাই ॥
অবধূতীরূপ ঘটী সরু তার নাল।
বিরুব বলিছে চিত্ত স্থির করি চাল ॥

৪। রাগ অরু

গুণ্ডরী পাদানাম্

তি অড্ডা চাপী জোইনি দে অঙ্কবালী।
কমল কুলিশ ঘাণ্টি করহু বি আলী॥
জোইনি তঁই বিনু খনহিঁ ন জীবমি।
তো মুহ চুম্বী কমলরস পিবমি॥
খেপহুঁ জোইনি লৈপ ন জাঅ।
মণিকুলে বহিআ ওড়ি আণে সমাঅ॥
সাসু ঘরেঁ ঘালি কোঞ্চাতাঁল।
চান্দসূজ বেণি পখা ফাল॥
ভণই গুণ্ডরী অম্হে কুন্দুরে বীর॥
নরঅ নারী মাঝেঁ উভিল চীরা।

ভাবানুবাদ—

ত্রিনাড়ী যোগিনী চাপি দেয় অঙ্ক বালী।
কমল কুলিশ যোগ করহ বিকালী॥
তোমা বিনা যোগিনি গো, ক্ষণ নাহি জীব
তোর মুখ চুম্বি রস কমলের পিব॥
ক্ষেপিলে যোগিনী নাহি মোহলিপ্ত রহে।
মণিমূল হ'তে পুনঃ ঊর্দ্ধ স্থানে বহে॥
শ্বাসঘরে রোধি দিয়া তালায় বন্ধন।
চন্দ্রসূর্য্য দুই পক্ষ কর হ খণ্ডন॥
গুণ্ডরী বলিছে— আমি কুন্দুরে বীর।
নরনারী মাঝে চিহ্ন ধরেছি যোগীর॥

৫। রাগ গুর্জরী

চাটিল্ল পাদানাম্ (৩)

ভবণই গহণ গম্ভীর বেগেঁ বাহী।
দু আন্তে চিখিল, মাঝে ন থাহী।।
ধামার্থে চাটিল সাঙ্কম গঢ়ই।
পারগামি লোঅ নিভর তরই।।
ফাড়িঅ মোহতরু পাটী জোড়িঅ।
অদৃঅ দিঢ় টাঙ্গী নিবাণে কোরিঅ।।
সাঙ্কমত চড়িলে দাহিণ বাম মা হোহী।
নিয়ড়ি বোহি দূর মা জাহী।।
জই তুম্হে লোঅ হে হোইব পারগামী।
পুচ্ছতু চাটিল অনুওর-সামী।।

ভাবানুবাদ—

গহন গভীর ভব নদী বেগে বহে।
দুই ধারে পাঁক, মাঝে থাই নাহি তাহে।।
ধর্ম্মার্থে চাটিল তায় সাঁকে দিছে গড়ি।
পারগামী লোক যেন তরে ভর করি।।
মোহতরু ফাড়ি তার পাটগুলি জোড়।
অদ্বয় টাঙ্গি দিয়া নির্ব্বাণে কর দৃঢ়।।
সাঁকোতে চড়িলে বাম ডাহিন না হও।
নিকটে রয়েছে বোধি, দূরে নাহি যাও।।
তোমাদের মাঝে যারা হবে পারগামী।
পুছিও চাটিলে, যিনি অনুত্তর-স্বামী।।

(৩). ইনি সিদ্ধা চাটেল নাথ।

৭। রাগ পটমঞ্জরী

কাহ্নুপাদানাম্—

আলি এঁ কালি এঁ বাট রুন্ধেলা।
তা দেখি কাহ্নু বিমন ভইলা ॥
কাহ্নু কহিঁ গই করিব নিবাস।
জো মনগোঅর সো উ আস ॥
তে তিনি তে তিনি তিনি হো ভিন্ন।
ভণই কাহ্নু ভবপরিচ্ছিন্না ॥
জে জে আইলা তে তে গেলা।
অবনাগবণে কাহ্নু বিমন ভইলা ॥
হেরি সে কাহ্নি নি অড়ি জিনউর বট্টই।
ভণই কাহ্নু মোহিঅহি ন পইসই ॥

ভাবানুবাদ :—

আলিতে কালিতে বাট অবরুদ্ধ কৈল।
তাহা দেখিয়া কানুপাদ বিমন হইল ॥
"কানু, তুই কোথা গিয়ে করিবি নিবাস?
যা'রা মনগোচর তা'রাই উদাস ॥"
তা'রা তিন, তা'রা তিন, তিন হয় ভিন্ন।
কানু ভণে—মোরা হই ভব পরিচ্ছিন্ন ॥
যা'রা যা'রা এসেছিল, তা'রা তা'রা গেল।
গমনাগমনে কানু বিমন হইল ॥
কানুর নিকটে আছে জিনপুর হেরি।
কানু ভণে—মোহহেতু প্রবেশিতে নারি ॥

৮। রাগ দেবক্রী

কম্বলাম্বরপাদানাম্ (৪)

সোনে ভরিতী করুণা নাবী।
রূপা থোই নাহিক ঠাবী ॥
বাহতু কামলি গঅণ উবেসেঁ।
গেলীজাম বাছড়ই কইসেঁ ॥
খুণ্টি উপাড়ী মেলিলি কাচ্ছি।
বাহতু কামলি সদ্গুরু পুচ্ছি ॥
মাঙ্গত চড় হিলে চউদিস চাহঅ।
কেড়ু আল নাহি কেঁ কি বাহবকে পারঅ।
বামদাহিণ চাপী মিলি মিলি মাঙ্গা।
বাটত মিলিল মহাসুহ সাঙ্গা ॥

ভাবানুবাদ :—

সোনা-ভর্ত্তি আছে মোর করুণা-নৌকাতে
রূপা থুইবার ঠাঁই নাহিক তাহাতে ॥
বাহরে কম্বলি তুই গগন উদ্দেশে।
গত জন্ম বাহুড়িয়া আসে দেখি কিসে ॥
খুটি উপাড়িয়া তুমি মেলি দেও কাছি।
বাহরে কম্বলিপাদ সদ্গুরু পুছি ॥
চারিদিকে চাহ তুমি চড়িয়া মার্গেতে।
কেড়ুয়াল না থাকিলে কে পারে বাহিতে ॥
বামেতে ডাহিনে চাপি মার্গ সাথে চলি।
বাটেই যাইবে তব মহাসুখ মিলি ॥

(৪) কম্বলাম্বর পাদানাম্—কামলি, কমারি বা কামরি নাথ

৯। রাগ পটমঞ্জরী

কাহ্নপাদানাম—

এবং কার দিঢ় বাখোড় মোড়িউ।
বিবিহ বিআপক বান্ধণ তোড়িউ॥
কাহ্নু বিলসঅ আসব মাতা।
সহজ নলিনীবন পইসি নিবিতা॥
জিম জিম করিণা করিণিরেঁ বিসঅ।
তিম তিম তথতা মঅগল বরিসঅ॥
ছড়গই সঅল সহাবে সুধ।
ভাবাভাব বলাগ ন ছুধ॥
দশবলর অণ হরিঅ দশদিসেঁ।
বিদ্যাকরি দমকু অকিলেসেঁ॥

ভাবানুবাদ :—

এ-বং-রূপ দৃঢ়বন্ধ বাখোড় মর্দ্দিয়া।
বিবিধ ব্যাপক যত বন্ধন তোড়িয়া॥
কৃষ্ণাচার্য্য আসবেতে মাতি লীলা করে।
সহজ নলিনীবনে পশি নির্ব্বিকারে
করীরা করিণী দেখি ছাড়ে তৃষামদ।
তথা কানু বরিষয়ে তথতা যে মদ॥
ষট গতিকা সকলেই স্বভাবতঃ শুদ্ধ।
ভাবাভাব বাল মাত্র নহে অবিশুদ্ধ॥
দশদিকে দশবল আহরণ করি।
অক্লেশে দমন কর বিদ্যারূপকরী॥

১০। রাগ দেশাখ

কাহ্নু পাদানাম্—

নগর বাহিরি রে ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।
ছোই ছোই জাহ সো ব্রাহ্মণ নাড়িআ॥
আলো ডোম্বি তোত্র সম করিব মসাঙ্গ।
নিঘিন কাহ্ন কাপালি জোই লাংগ॥
এক সো পদুমা চৌষঠ্ঠী পাখুড়ী।
তহিঁ চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী॥
হালো ডোম্বি তো পুছমি সদভাবে।
আইসসি জাসি ডোম্বি কাহরি নাবেঁ॥
তান্তি বিকণঅ ডোম্বি অবরণা চাংগেড়া।
তোহোর অন্তরে ছাড়ি নড় পেড়া॥
তুলো ডোম্বী হাঁউ কপালী।
তোহোর অন্তরে মোএ ঘেণিলি হাড়ের মালী॥
সরবর ভাঞ্জিয়া ডোম্বী খাঅ মোলাণ।
মারমি ডোম্বি লেমি পরাণ॥

ভাবানুবাদ—

তোমার কুড়িয়া ডোম্বি নগর বাহিরে।
ছুয়ে ছুয়ে যাও তুমি ব্রাহ্মণ নেড়ারে॥
ডোম্বি, তোর সহ আমি করিবই সঙ্গ।
কানু যে কাপালী যোগী নিঘৃণ উলঙ্গ॥
এক হয় পদ্ম, তার চৌষট্টি পাপড়ি।
তাহা চড়ি নাচে যেন ডোম্বীও বাপুড়ী॥

হালো ডোম্বি, পুছি আমি স্বরূপে তোমায়।
আসা যাওয়া কর তুমি কাহার নৌকায়॥
তন্ত্রী ও চাঙ্গাড়ি পাত্র ডোম্বী ত্যাগ করে।
নটের পেটিকা আমি ছাড়ি তব তরে॥
তুমি ডোম্বী, আমি কাপালিক (তব তুল্য)।
তব তরে লইয়াছি আমি হাড়মাল্য॥
সরোবর ভাঙ্গি ডোম্বি, খাও যে মৃণাল।
তোমারে মারিব ডোম্বি লইব পরাণ॥

১১। রাগপট মঞ্জরী

কৃষ্ণাচার্য্য পাদানাম্—

নাড়ি শক্তি দিঢ় ধরিঅ খট্টে।
অনহা ডমরু বাজই বীরনাদে॥
কাহ্ণু কপালী যোগী পইঠ অচারে।
দেহ ন অরী বিহরই একাকারে॥
আলি কালি ঘণ্টা নেউর চরণে।
রবিশশী কুণ্ডল কিউ আভরণে॥
রাগ দেষ মোহ লইআ ছার।
পরম মোখ লব এ মুক্তাহার॥
মারিঅ শাসু নণন্দ ঘরে শালী।
মাঅ মারিআ কাহ্ণু ভইল কবালী॥

ভাবানুবাদ—

নাড়ীশক্তি দৃঢ়ভাবে ধরি শূন্যোপরি।
অনহা ডমরু বাজে বীরনাদ করি॥

কানু যে কাপালী যোগী পশি যোগাচারে।
দেহ নগরীতে বিহরয়ে একাকারে॥
আলি কালি যেন ঘণ্টা নুপুর চরণে।
রবিশশী করিয়াছে কুণ্ডলাভরণে॥
রাগ-দ্বেষ মোহ দগ্ধি, লই তার ক্ষার।
পরম মোক্ষের লভিয়াছে মুক্তাহার॥
শ্বাস রোধি, জ্ঞানেন্দ্রিয় ঘরে শাল দিয়া।
কাপালী হয়েছে কানু মায়াকে মারিয়া॥

১২। রাগ ভৈরবী

কৃষ্ণপাদানাম্—

করুণা পিহাড়ি খেলহুঁ ন অবল।
সদ্গুরু-বোহেঁ জিতেল ভব বল॥
ফীটউ দুআ মাদেসি রে ঠাকুর।
উআরি উএসেঁ কাহ্ন নিঅড় জিনউর।
পাহিলেঁ তোড়িআ বড়িআ মারিউ॥
গ অবরেঁ তোড়িআ পাঞ্চজন্য ঘালিউ॥
মতিএঁ ঠাকুরক পরিনিবিতা।
অবশ করিআ ভববল জিতা॥
ভণই কাহ্ন অম্হে ভাল দান দেহুঁ।
চউষঠঠি কোঠা গুনিয়া লেহুঁ॥

ভাবানুবাদ—

করুণা পীড়িতে যেন খেলি নব বল।
গুরু উপদেশে জিত হ'ল ভববল॥

নাশিল আভাসদ্বয় মরিলে ঠাকুর।
উপকারী উপদেশে কাছে জিনপুর।।
প্রথমেই তেড়ে গিয়ে বড়ে গুলি মারি।
গজবর দ্বারা পাঁচজনে ঘাল করি।।
মন্ত্রী দ্বারা ঠাকুরকে করিয়া নিবৃত্ত।
অবশ করিয়া ভববল হ'ল জিত।।
কানু ভণে—দেখ আমি ভাল দান দেই।
ছকের চৌষট্টি কোঠা গণিয়াই লই।।

১৩। রাগ কামোদ

কৃষ্ণাচার্য্যপাদানাম্—

তিশরণ নাবী কিঅ অঠক মারী।
নিঅ দেহ করুণা শূনমে হেরী।।
তরিত্তা ভবজলধি জিম করি মাঅ সুইনা।
মাঝবেনী তরঙ্গম মুনিআ।।
পঞ্চতথাগত কিঅ কেড়ু আল।
বাহঅ কাঅ কাহ্নিল মা আজাল।।
গন্ধপরসর জইসোঁ তইসোঁ।
নিংদ বিছনে সুইনা জইসো।।
চিঅ কন্নহার সুণত মাঙ্গে।
চলিল কাহ্ন মহাসুহ সাঙ্গে।।

ভাবানুবাদ-

ত্রিশরণ-লীন নৌকাকরি আট মারি।
করুণা শূন্যের যোগ নিজদেহে হেরি।।

ভবপার হই, করি মায়া স্বপ্নসম।
মধ্যমায় সুখের তরঙ্গ অনুপম॥
পঞ্চ তথাগত শক্তি করি কেডুয়াল।
কায়-নৌকা বাহি কানু তর মায়াজাল
গন্ধ-পরশ যাহা তাহাই থাকুক।
নিদ্রাহীন স্বপ্নবৎ কেবল অলীক॥
চিত্ত কর্ণধার করি শূন্যতা-মার্গে।
চলে কাহ্ন মহাসুখ সঙ্গম-স্বর্গে॥

১৪। রাগ ধনসী

ডোম্বীপাদানাম্ (৫)

গঙ্গা জউনা মাঝেঁরে বহই নাই।
তহিঁ বুড়িলী মাতঙ্গী জোইঅ লীলে পার করেই॥
আহতু ডোম্বী বাহলো ডোম্বী বাটত ভইল উছারা।
সদগুরু পাঅপএ জাইব পুণু জিণউরা।
পাঞ্চ কেড়ুআল পড়ন্তেঁ মাঙ্গে পিঠত কাচ্ছী বান্ধী।
গঅণ দুখোলেঁ সিঞ্চহু পানী ন পইসই সান্ধি॥
চন্দ সূজ্জ দুই চকা সিঠি সংহার পুলিন্দা।
বাম দাহিন দুই মাগন চেবই বাহতু ছন্দা॥
কবড়ী ন লেই বোড়ী ন লেই সুচ্ছড়ে পার করই।
জো রথে চড়িলা বাহবা ন জাই কুলে কুলে বুলই॥

(৫) ডোম্বীপাদানাম—ধোবী, টোঙ্গী, (দীপঙ্করের জীবনীর তোম্বি) নাথ

ভাবানুবাদ—

গঙ্গা ও যমুনা দুই নদী মাঝে
এক নৌকাবহি চলে।
তাহে নিমজ্জিত মাতঙ্গী যোগীকে
পার করে অবহেলে ॥
বাহত ডোম্বি বাহলো ডোম্বি
পথেতে হইল দেবী।
সদ্‌গুরু পাদ প্রসাদে যাইব
পুনঃ আমি জিনপুরী ॥
পঞ্চ কেড়ুয়াল পড়িছে মার্গেতে
পিঠেতে কাছিকা বান্ধি।
শূন্য সেঁউতিতে পানী সেঁচ যেন
না পশে কায়ার সন্ধি ॥
চন্দ্র সূর্য্য দুই ঢাকা ও পুলিন্দা
সৃষ্টির সংহারকারী।
কড়ি না লইয়া সেবা না লইয়া
স্বেচ্ছায় পার করে।
যারা রথে চড়ি বাহিতে না পারে
তারা কুলে ভ্রমি মরে ॥

১৫। রাগ রামক্রী

শান্তিপাদানাম্

সঅ-সম্বে অণ-সরুঅ বি আরেঁ অলকখ লকণ ণ জাই।
জে জে উজুবাটে গেলা অনাবাটা ভইলা সোই ॥
কুলেঁ কুল মা হোইরে মূঢ়া উজুবাট-সংসারা।
বাল ভিণ একু বাকু ণ ভূলহ রাজপথ কন্ধারা ॥

মাআমোহ-সমুদারে অন্ত ন বুঝিস থাহা।
আগে নাবন ভেলা দীসই ভন্তি ন পুচ্ছসি নাহা॥
সুনাপান্তর উহ ন দীসই ভান্তিন বাসসি জান্তে।
এষা অটমহাসিদ্ধি সিঝই উজুবাট জাঅন্তে॥
বাম দাহিণ দো বাটা চছাডী শান্তি বুলথেউ সংকেলিউ।
ঘাট-ন-গুমা-খড়তড়ি ণ হোই আখি বুজিঅ বাট জাইউ॥

ভাবানুবাদ—

স্বীয় সংবেদন স্বরূপ বিচারে
অলক্ষ্য লক্ষণা ভাব।
যারা ঋজুবাটে গেল তারা দেখ
অনাবর্ত্ত হল সব॥
কূলে না ভুলিও মূর্খেরা ভাবে
সংসার ঋজু পথ।
বালকের ন্যায় বিকল্পে না ভোল
সোনাবাঁধা রাজপথ॥
মায়া মোহরূপে সমুদ্রের অন্ত
গভীরতা নাহি বুঝ।
আগে নৌকা ভেলা না দেখি, ভুলেতে
নাথে নাহি কেন পুছ॥
শূন্য পথতত্ত্ব না বুঝিতে পারি
যাইতে ভুল না কর।
অষ্ট মহাসিদ্ধি লাভ হয়, এই
ঋজুবাট যদি ধর॥

বাম ও ডাহিন দুই বাট ছাড়ি
শান্তি কেলি করে বুলে।
ঘাট গুল্ম তৃণ নাহি এই পথে
আঁখি বুজি যাও চলে ॥

১৮। রাগ গউড়া

কৃষ্ণবজ্র পাদানাম

তিনি ভুঅণ মই বাহিঅ হেলেঁ।
হাঁউ সুতেলি মহাসুহ লীলেঁ ॥
কইসণি হালো ডোম্বীতো হোরি ভাভরি আলী।
অন্তে কুলিণ জণ মাঝেঁ কাবালী ॥
তঁইলো ডোম্বী সঅল বিটা লিউ।
কাহ্নণ কারণ সসহর টালিউ ॥
কেহো কেহো তোহেরে বিরুআ বোলই।
বিদুজন লোঅ তোরে কণ্ঠ ন মেলই ॥
কাহ্নে গাই তু কামচণ্ডালী।
ডোম্বীত আগলি নাহি চ্ছিনালী ॥

ভাবানুবাদ—

এ তিন ভুবন আমি বাহি অবহেলে।
প্রসুপ্ত রয়েছি এবে মহাসুখ-লীলে ॥
কি অদ্ভুত হালো ডোম্বি, তব চতুরালি।
বাহিরে কুলীনজন, মধ্যেতে কাপালী ॥
তুমি ডোম্বি, দেবাসুর আদি নাশ কর।
কার্য্যকারণের হেতু বধ শশধর ॥

কেহ কেহ তোমা প্রতি কটু বাণি বলে।
জ্ঞানিগণ কণ্ঠ হ'তে তোমা নাহি ফেলে॥
কৃষ্ণাচার্য্য গাহে— কর্ম্মচতুরা চণ্ডালী।
ডোম্বী হ'তে বেশী কারে নাহিক ছিনালী॥

১৯। রাগ ভৈরবী

কৃষ্ণ (বজ্র) পাদানাম্

ভবনির্ব্বাণে পডহ মাদলা।
মন পবণ বেণি করণ্ডকশালা॥
জঅ জঅ দুন্দুহি সাদ উছলিআঁ।
কাহ্ন ডোম্বী-বিবাহে চলিআ॥
ডোম্বী বিবাহিআ অহারিউ জাম।
জউতুকে কিঅ আণুতু ধাম॥
অহণিসি সুরঅ-পসঙ্গে জাঅ।
জোইনিজালে রঅনি পোহাঅ॥
ডোম্বীএর সঙ্গে জো জোই রত্তো।
খণহ ন ছাড়অ সহজ উন্মত্তো॥

ভাবানুবাদ—

ভব নির্ব্বাণকে করি পটহ মাদলা।
মন-পবনকে করি করণ্ডকশালা॥
জয়ধ্বনি উঠাইয়া দুন্দুভি শব্দেতে।
চলি যায় কানু ডোম্বী বিবাহ করিতে॥
ডোম্বীকে বিবাহ করি জন্মনাশ কৈল।
যৌতুকরূপে অনুত্তর ধাম পাইল॥

অহর্নিশি সুরত প্রসঙ্গে কাল যায়।
জ্ঞানালোকে অন্ধকার রজনী পোহায়।।
ডোম্বী সঙ্গে সেই যোগী হয় অনুরক্ত।
ক্ষণমাত্র নাহি ছাড়ে সহজে উন্মত্ত।।

২২। রাগ গুঞ্জরী

সরহ পাদানাম্

অপণে রচি রচি ভবনির্বাণা।
মিছেঁ লোঅ বন্ধাবএ অপণা।।
অম্হে ণ জাণহু অচিন্ত জোই।
জাম মরণ ভব কইসণ হোই।।
জইসো জাম মরণ বি তইসো।
জীবন্তে মইলেঁ নাহি বিশেসো।।
জা এথু জাম মরণে বিসঙ্কা।
সো করউ রস-রসানেরে কঙ্খা।।
জে সচরাচর তি অস ভমন্তি।
তে অজরামর কিমপি ন হোন্তি।।
জামে কাম কি কামে জাম।
সরহ ভণতি অচিন্ত সো ধাম।।

ভাবানুবাদ—

নিজ মনে রচি রচি ভব ও নির্ব্বাণে।
বৃথা লোকে আপনাকে জড়ায় বন্ধনে।।
আমরা অচিন্ত যোগী মনে নাহি লয়।
জনম-মরণ-ভব কিরূপে বা হয়।।

জনম যেমন হয় মরণও তাই।
জনমে মরণে কোন বিভিন্নতা নাই ॥
যাহারা এখানে করে মরণের শঙ্কা।
তাহারা করুক রসায়নের আকাঙ্‌ক্ষা ॥
যারা সচরাচর ত্রিদশে ভ্রময়।
তারা অজরামর কিছুই না হয় ॥
কর্ম্ম হ'তে জন্ম, কিবা জন্ম হ'তে কর্ম্ম।
সরহ বলেন— হয় অচিন্ত্য সে ধর্ম্ম ॥

২৬। রাগ শবরী

শান্তি পাদানাম্

তুলা ধুণি ধুণি আঁসুরে আঁসু।
আঁসু ধুণি ধুণি নিরবর সেসু ॥
তউসে হেরু অণ পাবি অই।
সান্তি ভণই কিণ স ভাবি অই ॥
তুলা ধুণি ধুণি সুণে অহারিউ।
পুণ লইআঁ অপণা চটারিউ ॥
বহল বট দুই মার ন দিশঅ।
শান্তি ভণই বালাগ ন পইসঅ ॥
কাজ ন কারণজ এহু জুগতি।
সঅ সঁবেঅণ বোলথি সান্তি ॥

ভাবানুবাদ—

চিত্ত তুলা ধুণি করি আঁশে আঁশে লীন
পুনঃ আঁশ ধুণি করি অবয়বহীন ॥

এইরূপে হেতু তার না পাই সন্ধানে।
ভাবের অভাব ভাব্য নাহি, শান্তি ভণে॥
চিত্ত তুলা ধুণি শূন্যে করিয়াছি লীন।
পুনরায় আপনাকে করেছি বিলীন॥
অদ্বয়েতে দ্বৈত ভাব থাকিতে না পারে।
শান্তি বলে— মুখে ইথে প্রবেশিতে নারে॥
কার্য্য-কারণজ ভাব নাহি, এই যুক্তি।
স্বীয় সংবেদন ব্যাখ্যায় শান্তির উক্তি॥

২৮। রাগ বলাড্ডি

শবর পাদানাম্

উঁচা উঁচা পাবত তহিঁ বসই সবর বালী।
মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী॥
উমত সবরো পাগল সবরো মা কর গুলী গুহাড়া তোহোরী।
ণিঅ ঘরিণী নামে সহজ সুন্দরী॥
নানা তরুবর মোউলিল রেগঅণত লাগেলী ডালী।
একেলী সবরী এবণ হিণ্ডই কর্ণ কুণ্ডল বজ্রধারী॥
তিঅ ধাউ খাট পাড়িলা সবরো মহাসুখে সেজি ছাইলী।
সবরো ভুজঙ্গ নৈরামণি দারী পেক্ষ রাতি পোহাইলী॥
হিঅ তাঁবোলা মহাসুহে কাপুর খাই।
সুন নৈরামণি কণ্ঠে লইয়া মহাসুহে রাতি পোহাই॥
গুরুবাক্ পুচ্ছিআ বিন্ধ নিঅমণ বাণে।
একে শর সন্ধানেঁ বিন্ধহ পরমণিবাণে॥
উমত সবরো গরুআ রোষে।
গিরিবর-সিহর-সন্ধি পইসন্তে সবরো লোড়িব কইসে॥

ভাবানুবাদ—

উচা পাহাড়েতে বসতি করিছে
শবরী নামেতে বালা।
ময়ূরের পাখ করি পরিধান
গলেতে গুঞ্জার মালা॥

পাগল শবর না করিও ভুল
তোমারে বিনয় করি।
নিজের গৃহিণী সহজ সুন্দরী
আমি যে তোমার নারী॥

কায়াতরু নানা ভাবে মুকুলিল
ডাল গগনের কোণে।
একেলা শবরী এবনে বিহরে
কুণ্ডলাদি ধরি কানে॥

ত্রিধাতুতে খাট পাড়িলা শবর
সুখেতে শেজ বিছায়।
শবর-ভুজঙ্গ নৈরাত্মা দারীর
পীরিতে রাতি পোহায়॥

হৃদয় তাম্বুল কর্পূর সহিত
মহাসুখে সে যে খায়।
নৈরাত্মা-শূন্যের কণ্ঠেতে লইয়া
সুখেতে রাত্তি পোহায়॥

গুরুবাক্যধনু নিজমন বাণ
উভয়ের সমাবেশে।

পরম নির্বাণ লভ এক শরে
বিন্ধিয়া অবিদ্যা ক্লেশে ॥
উন্মত্ত শবর গুরুতর রোষে
জ্ঞানানন্দে থাকি মজি।
গিরি শিখরের সন্ধিতে প্রবেশে
তাহারে কোথায় খুঁজি ॥

৩২। রাগ দেশাখ

সরহ পাদানাম্

নাদ ন বিন্দু ন রবি ন শশিমণ্ডল।
চিঅরাঅ সহাবে মুকল ॥
উজুরে উজু ছাড়ি মা লেহুরে বঙ্ক।
নিঅড়ি বোহি মা জাহুরে লাঙ্ক ॥
হাতের কাঙ্কণ মা লেউ দাপণ।
অপণে অপা বুঝত নিঅমণ.॥
পার উআরেঁ সোই গজিই।
দুজ্জণ সঙ্গে অবসরি জাই ॥
বাম দাহিণ জো খাল বিখলা।
সরহ ভণই বাপা উজুবাট ভাইলা ॥

ভাবানুবাদ—

নাদ-বিন্দু-রবিশশী বিকল্পাদি নাই।
চিত্তরাজ স্বভাবতঃ পরিমুক্ত তাই ॥
ঋজুবাট ছাড়ি বাঁকা পথ নাহি লও।
নিকটেই আছে বোধি লঙ্কাতে না যাও ॥

হাতের কঙ্কণ জন্য না লও দর্পণে।
আপনেই আত্মতত্ত্ব বুঝ নিজ মনে ॥
বোধিচিত্ত-অনুগামী পারাপারে যায়।
দুর্জ্জনের সঙ্গে কিন্তু অধোগতি পায় ॥
বামেতে দক্ষিণে আছে খাল ও বিখাল।
সরহ ভণয়ে বাপু ঋজুবাট ভাল ॥

৩৩। রাগ পটমঞ্জরী

ঢেণ্ঢণ পাদানাম্

টালত মোর ঘর নাহি পড়িবেষী।
হাঁড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী ॥
বেঙ্গ সংসার বড় হিল জাঅ।
দুহিল দুধু কি বেণ্টে ষামাঅ ॥
বলদ বিআঅল গবিআ বাঁঝে।
পিটা দুহিএ এ তিনা সাঁঝে ॥
জো সো বুধী শোধ নিবুধী।
জো ষো চোর সোই সাধী ॥
নিতি নিতি ষিআলা ষিহে ষম জুঝঅ।
ঢেণ্ঢণ পাদের গীত বিরলে বুঝঅ ॥

ভাবানুবাদ—

টিলাতে আমার ঘর নাহি প্রতিবেশী।
হাঁড়িতে নাহিক ভাত, নিত্যই প্রবেশি ॥
এ বেঙ্গ সংসার মোর বাড়িয়া যায়।
দোহা দুধ কি আশ্চর্য্য বাঁটেতে সামায় ॥

বলদ যে বিয়াইল, গাভী হয় বন্ধ্যা।
পীঠকে দোহন করি এই তিন সন্ধ্যা।।
বালকের যাহা বুদ্ধি, জ্ঞানীর তা নয়।
যেই চিত্ত চোর সেই পুনঃ সাধু হয়।।
নিতি নিতি শিয়াল যে সিংহ সনে যুঝে।
ঢেণ্ঢণ পাদের গীত কেহ কেহ বুঝে।।

৩৪। রাগ বরাড়ী

দারিক পাদানাম্

সুনকরুণরি অভিন চারেঁ কা অবাক্ চিএ।
বিলসই দারিকঁ গঅণত পারিম কুলেঁ।।
অলক্খ লক্খন-চিত্তা মহাসুহেঁ।
বিলসই দারিক গঅণত পারিম কুলেঁ।।
কিন্তো মন্তে কিন্তো তন্তে কিন্তোরে ঝাণ বখাণে।
অপইঠান মহাসুহলীলেঁ দুলক্খ পরম নিবাণে।।
দুঃখেঁ সুখেঁ একু করিঅ ভুঞ্জই ইন্দী জানী।
স্বপরাপর ন চেবই দারিক স অলা নুত্তরমানী।।
রাআ রাআ রাআ রে অবর রাঅ মোহে রে বাধা।
লুইপা অপ সাএঁ দারিক দ্বাদশ ভুঅণে লাধা।।

ভাবানুবাদ—

শূন্য করুণার অভিন্ন মিলনে
শুদ্ধ কায়বাক্ চিতে।
বিহার করিছে দারিক সাধক
গগনের পরভিতে।।

অলক্ষ্য লক্ষণ চিত্ত সহযোগে
মহাসুখ-হিল্লোলে।
বিহার করিছে দারিক তখন
গগনের পরকূলে ॥
কি তোর মন্ত্রে কি তোর তন্ত্রে
কি তোর ধ্যান-ব্যাখ্যানে।
প্রতিষ্ঠা বিহীন মহা সুখলীলা
না হেরে পরম নির্ব্বাণে ॥
সুখে দুঃখে তুমি সমতা করিয়া
ইন্দ্রিয়াদি ভোগ কর ;
সব অনুত্তর মানিয়া দারিক
না হের স্ব পরাপর ॥
রাজা রাজা রাজা অপর রাজারে
মোহেতে সকল বন্ধ।
সিদ্ধ লুইপাদ প্রসাদে দারিক
দ্বাদশ ভুবন লব্ধ ॥

৩৫। রাগ মল্লারী

ভাদেপাদানাম্

এত কাল হাঁউ অচ্ছিলোঁ স্বমোহেঁ
এবেঁ মই বুঝিল সদ্গুরু বোহেঁ ॥
এবেঁ চিঅরাঅ মকুঁ ণঠা।
গঅণ সমুদে টলিআ পইঠা ॥

পেখমি দহদিহ সব্‌বই শূন।
চি বিহুন্নে পাপ ন পুন্ন ॥
বাজুলে দিল মো লকৃখ ভণিআ।
মই অহারিল গঅণত পসিআ ॥
ভাদে ভণই অভাগে লইয়া।
চিঅ রাঅ মই অহার কএলা ॥

৩৬। রাগ পটমঞ্জরী

কৃষ্ণাচার্য্য পাদানাম্‌

সুনবাহ্ তথতা পহারী।
মোহ ভণ্ডার লই সঅলা অহারী ॥
ঘুমইণ চেবই সপর বিভাগা।
সহজ নিদালু কাহ্নিল লাঙ্গা ॥
চেঅণ ন বেঅন ভর নিদ গেলা।
সঅল সুফল করি সুহে সুতেলা ॥
স্বপণে মই দেখিল তিহুবণ সুণ।
ঘোরিঅ অবণা গমণ বিহুণ ॥
শাখি করিব জালন্ধরি পাএ।
পাশি ন চাহই মোরি পাণ্ডি আচাএ ॥

ভাবানুবাদ—

তথতা প্রহারে এবে শূন্য মোর বাস।
মোহের ভাণ্ডার সব করিয়াছি নাশ ॥
আত্মপর ভেদ ভুলি ঘুমে অচেতন।
সহজ নিদ্রিত কাহ্নের মোহমুক্ত মন ॥

চেতনা-বেদনাহীন ঘোর নিদ্রা গেল।
সকল সুফল করি সুখেই শুইল ॥
ত্রিভুবন শূন্য দেখি সব স্বপ্নসম।
গমনাগমন ঘানি হ'ল উপশম ॥
সাক্ষী করিব আমি গুরু জালন্ধরে।
পাশমুক্ত দশা মোর পণ্ডিতে না.হেরে ॥

৩৮। রাগ ভৈরবী

সরহ পাদানাম্

কাঅ ণাবড়ি খাণ্টি মণ কেড়ুআল।
সদ্ গুরু-বঅণে ধর পতবাল ॥
চীঅ থির করি ধরহুরে নাই।
আন.উপায়ে পারণ জাই ;;
নৌবাহী নৌকা টাণঅ গুণে।
মেলি মেল সহজে জাউণ আণেঁ ॥
বাটত ভঅ খাণ্ট বি বলআ।
ভব উলোলেঁ সব বি বোলিআ ॥
কুল লই খর সোন্তেঁ উজ্জাঅ।
সরহ ভণই গঅণেঁ সমাঅ ॥

ভাবানুবাদ—

কায়রূপ নৌকাখানা, মন কেড়ুআল।
সদ্ গুরু বচনেতে ধর তুমি হাল ॥
শুদ্ধ চিত্ত স্থির করি ধর তুমি নায়।
পারে যাইবার আর নাহিক উপায় ॥

নৌবাহক বাহে নৌকা গুণেতে টানিয়া।
সহজ পথেতে চল বিপথে না গিয়া ।।
বাটেতে রয়েছে ভয়, দস্যু বলবান।
বিষয়-তরঙ্গে সব হয় কম্পমান ।।
কুল ধরি খরস্রোতে গেলে উজাইয়া।
সরহ বলিছে যাবে গগনে পশিয়া ।

৩৯। রাগ মালশী

সরহ পাদানাম্

সুইণা চ অবিদার অরে নিঅমন তো হার দোসে।
গুরুবঅণ বিহারেঁ রে থাকিব তই ঘুণ্ড কইসে ।।
অকট হুঁ ভবই গঅণা।
বঙ্গে জায়া নিলেসি পরে ভাগেল তোহোর বিণাণা ।।
অদভুঅ ভবমোহরে দিসই পর অপ্পণা।
এ জগ জলবিম্বাকারে সহজেঁ সুণ অপণা ।।
তমিআ অচ ছন্তেঁ বিস গিলেসি রে চিঅ পরবস অপা।
ঘরেঁ পরেক বুঝিঝিলে রে খাইব মই দুঠ কুণ্ডবাঁ ।।
সরহ ভণন্তি বর সুণ গোহালী কি মো দুঠ বলন্দেঁ।
একেলে জগ নাশিঅ রে বিহরহু সুচ্ছন্দেঁ ।।

ভাবানুবাদ—

স্বপন তোমার অরে নিজ মন
নাহি টুটে তোর দোষে।
গুরুর বচন বিহারে থাকিবি
ঘোর কেন মোহ বশে ।।

অদ্‌ভুত এই হুঙ্কার ভব
চিত্ত-গগনে মোর।
বঙ্গে নিলে জায়া তাহাতে ভাগিল
বিষয়-বিজ্ঞান তোর॥
অদ্‌ভুত এই ভবমোহ, অরে,
আপন পর দেখায়।
জলবিম্বাকার যেন এ জগৎ
সহজ শূন্যেতে ভায়॥
অমিয়া লভিলে বিষ গিলিবি যে
মোহ পরবশ আত্মা।
দুষ্ট কুণ্ড আমি আহার করিব
বুঝিয়া দেহে দৈরাত্মা॥
দুষ্ট গরু হতে শূন্য যে গোহাল
সরহ বলিছে ভাল।
একাই জগৎ নাশিবারে পারে
স্বচ্ছন্দে বিহরি চল॥

৪০। রাগ মালসী গবুড়া

কাহ্নু পাদানাম্

জো মণগোঅর আলাজালা।
আগম পোথী ইষ্টামালা॥
ভণ কুইসেঁ সহজ বোল বা জাঅ।
কা অবাক চিঅ জস্ যু ণ সমাঅ॥

আলে গুরু উ এসই সীস।
বাক্ পথাতীত কহিব কীস॥
জে তেঁই বোলী তে তবি টাল।
গুরু বোব সে সীসা কাল॥
ভণই কহ্ন জিণ-রঅণ বি কইসা।
কালেঁ বোব সংবোহিঅ জইসা॥

ভাবানুবাদ—

মনের গোচর যাহা আলজাল হয়।
আগম পুস্তক-ইষ্টমালা সমুদয়॥
সহজ জ্ঞানের ব্যাখ্যা করা যায় কিসে।
কায় বাক্‌চিত্ত যার মধ্যে না প্রবেশে॥
বৃথা গুরু উপদেশ দেয় শিষ্য সবে।
বাক্যের অতীত যাহা কিরূপে কহিবে॥
যে তাহা বলিতে চায় সকলই অসত্য।
গুরু বোবা শিষ্য কালা এই সার তত্ত্ব॥
কাহ্ন বলে জিনরত্ন বিকশিত হয়।
বধির সঙ্কেতে যেন বোবাকে বুঝায়॥

৪২। রাগ কামোদ

কাহ্ন পাদানাম্

চিঅ সহজে শূণ সংপুন্না।
কান্ধবিয়োএঁ মা হোহি বিসন্না॥
ভণ কইসে কাহ্ন নাহি।
ফরই অনুদিন তৈলোএ পমাই॥

মূঢ়া দিঠ নাঠ দেখি কাঅর।
ভাগ তরঙ্গ কি সোষই সাঅর॥
মূঢ়া অচ্ছন্তে লোঅ ন পেখই।
দুধ মাঝেঁ লড় অচ্ছন্তে ন দেখই॥
ভব জাই ণ আবই এথু কোই।
অইস ভাবে বিলসই কাহ্নিল জোই॥

ভাবানুবাদ—

সহজ শূন্যেতে মোর চিত্ত হয় পূর্ণ।
স্কন্ধের বিয়োগে নাহি হইবে বিষণ্ণ॥
কৃষ্ণাচার্য্য নাহি তুমি কিসে ইহা বল।
অনুদিন ভ্রমে পশি ত্রৈলোক্য মণ্ডল॥
দৃষ্টবস্তু নষ্ট দেখি মুখেরা কাতর।
বিভগ্ন তরঙ্গ কভু শোষে কি সাগর॥
মরিলেও থাকে লোক মুখেরা না দেখে।
দুধ মাঝে আছে সর নাহি পড়ে চোখে॥
ভব হৈতে নাহি যায় আসেও না ভবে।
যোগী কানু লীলা করে মজি এই ভাবে॥

৪৫। রাগ মল্লারী

কাহ্নু পাদানাম্

মণ-তরু পাঞ্চ ইন্দি তসু সাহা।
আসা-বহল পাত ফল বাহা॥
বর গুরুবঅণ কুঠারেঁ ছিজঅ।
কাহ্ন ভণই তরু পুণ ন উইজঅ॥

বাঢ়ই সো তরু সুভাসুভ পানী ।
ছেবই বিদুজন গুরু পরিমানী ॥
জো তরু ছেব ভেবউ ন জানই ।
সডি পড়িআঁ রে মূঢ়তা ভব মানই ॥
সুণ তরুবর গঅণ কুঠার ।
ছেবহ সো তরু মূল ন ডাল ॥

ভাবানুবাদ—

মনোরূপ তরু, পঞ্চেন্দ্রিয় শাখা তাহে :
বাসনা-বহুল পাত ফল সে যে বহে ॥
বজ্র গুরু বচন—কুঠারে ছেদ তারে ।
কানু বলে পুনঃ যেন জন্মিতে না পারে ॥
শুভাশুভ জলে তরু ভবে বৃদ্ধি পায় ।
গুরু উপদেশে ছেদে বিজ্ঞজন তায় ॥
যারা তরু ছেদন-ভেদন নাহি জানে ।
সরি' পড়ি' মূর্খ তারা ভবকেই মানে ;
অবিদ্যা স্বরূপ তরু গগন কুড়াল ।
ছেদ কর সেই তরু, মূল নহে ডাল ॥

৪৭ । রাগ গুঞ্জরী

ধাম পাদানাম্

কমল কুলিশ-মাঝেঁ ভই অ মিঅলী ;
সম তাজোএঁ জলিঅ চণ্ডালী ॥
ডাহ ডোম্বী ঘরে লাগেলি আগি ।
সসহর লই সিঞ্চহুঁ পানী ॥

নউ খর-জ্বালা ধূম ন দিসই।
মেরু-শিখর লই গঅণ পইসই ॥
দাঢ়ই হরিহর বাহ্ম ভড়া
ফীটা হই নবগুণ শাসন পড়া
ভণই ধাম ফুড় লেহুরে জাণী।
পঞ্চনালেঁ উঠে গেল পানী।

ভাবানুবাদ—

কমল কুলিশ মাঝে মিলিত হইল।
সমতাযোগেতে মম চণ্ডালী জ্বলিল ॥
রাগদাহযুক্ত অগ্নি লাগে ডোম্বি-ঘরে।
পরিশুদ্ধ চিত্ত-জলে সিঞ্চহ তাহারে ॥
তীব্রজ্বালা নাহি, ধূম না পড়ে নয়নে।
সুমেরু শিখরে গিয়া প্রবেশে গগনে ॥
হরিহরব্রহ্মা সব বিদগ্ধ হইল।
নবগুণ শাসনাদি ফাটিয়া পড়িল ॥
ধামপাদ বলে স্পষ্ট লহ তুমি জানি।
পঞ্চনাল দিয়া উর্দ্ধে উঠি গেল পানী ॥

৫০। রাগ রামক্রী

শবর পাদানাম্

গঅণত গঅণত তইলা বাড়ী হিএঁ কুরাড়ী।
কণ্ঠে নৈরামণি বালি জাগন্তে উপাড়ী ॥
ছাড়ু ছাড় মাআ মোহ বিষম দুন্দোলী।
মহাসুহে বিলসন্তি শবরো লইআ সুণমে-হেলী ॥

হেরি সে মোর তইলা বাড়ী খসমে সমতুলা।
সুকড়ত্র সেরে কপাসু ফুটিলা॥
তইলা বাড়ির পাসেঁর জোহ্না বাড়ী উত্রলা।
ফিটেলি অন্ধারি রে আকাশ ফুলিআ॥
কঙ্গুচিনা পাকেলা রে শবর শবরী মাতেলা।
অণুদিন শবরো কম্পি ন চেবই মহাসুহেঁ ভোলা॥
চারিবাসে গড়িলারে দিঅ চঞ্চালী।
তহিঁ তোলি শবরো ডাহ কএলা কান্দই সগুণ শিআলী॥
মারিল ভবমত্তারে দহদিহে দিধলী বলী।
হের সে সবর নিরেবণ ভইলা ফিটিল ঘবরালী॥

ভাবানুবাদ—

গগনে গগনে লগন বাটিকা
হৃদয় কুঠারে ছেদি।
কণ্ঠেতে নৈরাত্মা বালিকা লইয়া
জাগে জোগী ভব ভেদী॥
ছাড় ছাড় মায়া মোহের দ্বন্দ্বল
বিষম বিপাক ঘোর।
শবর লইয়া শূন্যতা মেয়েকে
সুখ-বিলাসেতে ভোর॥
সেইবাড়ী মোর হেরিতেছি এবে
শূন্যতার সমতুল।
কি সুন্দর রূপে ফুটিয়াছে সে যে
তাহাতে কাপাস ফুল॥

এই বাড়ী পাশে যখন উদিল
জ্ঞান-জোছনার বাটী।
আকাশ-ফুলের মত অন্ধকার
দূরে পলাইল ছুটি॥
কঙ্গুচিনা ফল পাকিয়াছে ওরে
দুজনে মাতিল ঘেরে।
সর্ব্বদা শবর কিছুই না দেখে
মহাসুখে হ'ল ভোর॥
চতুর্থ আবাস গঠন করিল
চঞ্চল ইন্দ্রিয় বেন্ধে।
তাহাতে তুলিয়া দগধ করিল
সগুণ শিয়ালী কান্দে॥
অতি বলবানে ভবের মত্ততা
দশদিশে দহি মারি।
হের সে শবর পাইল নির্ব্বাণ
শবরত্ব গেল ছাড়ি॥

াথসিদ্ধাগণের উপরোক্ত ভাবগর্ভ পদাবলী সত্যই অতুলনীয়। উহাদের ব্পূর্ব্ব ভাব-সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া বলিতে ইচ্ছা হয়—

"কি যাদু বাঙ্গালা গানে!
গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে!
গেয়ে গান নাচে বাউল,
গান গেয়ে ধান কাটে চাষা।
ঐ ভাষাতেই মৎস্যেন্দ্র নাথ (১)

(১) মূল লাইনে "ঐ ভাষাতেই নিতাই গোরা" ছিল। "নিতাই গোরা"

আনল দেশে ভক্তি ধারা ;
আছে কৈ এমন ভাষা
এমন দুঃখ-শ্রান্তি নাশা।

* * * * *

বাজিয়ে রবি তোমার বীণে
আন্‌লে মালা জগৎ জিনে !"

—অতুলপ্রসাদ

স্থলে "মৎস্যেন্দ্র নাথ" বসান হইয়াছে। কারণ মৎস্যেন্দ্র নাথ বঙ্গালা ভাষার আদিম লেখক ও নাথধর্ম্মের প্রবর্ত্তক।

ষষ্ঠ অধ্যায়

নাথ গীতিকাব্য (রচনাকাল ৫ম খৃঃ অব্দ হইতে ১৫শ খৃঃ অব্দ) ও উহার পরিচয় এবং ময়নামতী ও গোপীচাঁদের সন্ন্যাস

এমন একদিন গিয়াছে যখন ভারত (পাকিস্থানসহ) ও ভারতের বাহিরের জনসাধারণ জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে নাথধর্ম্মের পূত কাহিনী শ্রবণের জন্য সর্ব্বদা লালায়িত ছিলেন। এ সম্বন্ধে আলোচনাকারী প্রাচ্য ও প্রশ্চাত্ত্য পণ্ডিতমণ্ডলী একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে বাঙ্গালা, আসামী, মারাঠী, গুজরাটী, হিন্দী, পাঞ্জাবী, উড়িয়া, নেপালী, তিব্বতীয়, ভোটীয় (১) প্রভৃতি ভাষায় আদি নাথ, মীন নাথ, গোরক্ষ নাথ, জালন্দর বা হাড়িপা নাথ, কানুপা বা কৃষ্ণাচার্য্য নাথ, ময়নামতী, গোপীচাঁদ প্রভৃতি নাথ-সাহিত্যের প্রধান প্রধান চরিত্র অবলম্বনে অনেক গ্রন্থ ও গীতিকা রচিত ও গীত হইয়া জনসাধারণের চিত্ত বিশেষভাবে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। সাহিত্যাচার্য্য রায় দীনেশ চন্দ্র সেন বাহাদুর এগুলিকে নাথ-গীতিকা আখ্যা দিয়াছেন (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য)।

বিভিন্ন স্থানের হিন্দু-মুসলমান ও অন্যান্য কবির রচিত বাঙ্গালা নাথ-গীতিকা-গুলির মধ্যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের 'গোরক্ষবিজয়', (ইহাতে মীন নাথের পতন ও শিষ্য গোরক্ষ নাথ কর্ত্তৃক তাঁহার পুনরুদ্ধার প্রভৃতি কাহিনী বিবৃত হইয়াছে, অধ্যাপক ডাঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পাদিত ঢাকা সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশিত শ্যামদাস সেন রচিত 'মীনচেতন', (ইহা ও গোরক্ষবিজয় মূলতঃ একই গ্রন্থ) গ্রীয়ার্সন সাহেব কর্ত্তৃক উত্তর-বঙ্গ হইতে সংগৃহীত এবং ১৮৭৮

(১) G. A. S. B. 1898. Part 1, Page 22, 23.

খৃঃ অব্দে প্রকাশিত 'মাণিকচন্দ্র রাজার গান', 'ময়নামতীর গান', * দুর্লভ মল্লিক নামক স্বনামখ্যাত গ্রাম্য কবির রচিত এবং শিবচন্দ্র শীল প্রকাশিত 'গোবিন্দচন্দ্রের গান', বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্যের সংগৃহীত 'ময়নামতীর গাথা', ভবানীদাস রচিত 'ময়নামতীর পুথি', আবদুল স্কুর মোহাম্মদকৃত 'ময়নামতীর গান', আবদুল স্কুর বিরচিত ডাঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পাদিত ঢাকা সাহিত্য পরিষদ হইতে (মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর প্রদত্ত সম্পূর্ণ ব্যয়ে) প্রকাশিত 'গোপীচাঁদের সন্ন্যাস', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত 'গোপীচন্দ্র', ডাঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী ও বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত সম্পাদিত এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ ক্লাসের পাঠ্য 'ময়নামতীর গান' (এ সব গানে রাজা মাণিকচন্দ্র, ময়নামতী ও গোপীচাঁদের কাহিনীর সঙ্গে নাথধর্ম্ম ও নাথসিদ্ধাদের প্রসঙ্গ আছে) প্রভৃতি গীতিকাব্যের নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ডক্টর শ্রীমতী কল্যাণী মল্লিক বলেন— "সুদূর নেপালেও গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস বিষয়ক বাঙ্গালা নাটক পাওয়া গিয়াছে ; পুঁথিনী কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে সযত্নে রক্ষিত আছে। বঙ্গদেশে বিশেষতঃ পূর্ব্বাঞ্চলে এখনও নাথযোগীদের প্রভাব ক্ষুণ্ণ হয় নাই (নাথপন্থ)।

এই বহিগুলি বাঙ্গালার নিজস্ব। এ সব গান গাহিবার জন্য গোপীযন্ত্র নামক বাদ্যযন্ত্রের উদ্ভাবন হইয়াছিল। ইহা বাউলদের একতারা নামে সাধারণতঃ

* ময়নামতীর গাথাগুলি এক সময় দেশময় গীত হইত। আজিও রংপুর জেলায় এই গাথাগুলি গাহিবার দল আছে। রাত্রির পর রাত্রি জনসমূহ আনন্দে এই যুগীযাত্রা শুনিয়া জাগিয়া কাটায়। কুড়িগ্রাম মহকুমার সম্পন্ন বাজার বন্দরে প্রায় প্রত্যেক বৎসরই যুগীযাত্রার গীতাভিনয় হয়। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে গ্রীয়ার্সন সাহেব যখন এক বৃদ্ধ গায়েনের মুখ হইতে আবৃত্তি শুনিয়া এই যুগীযাত্রার গাঁথাটী লিখিয়া লয়েন এবং ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় তাহা প্রকাশিত করেন, তখন হইতে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি এই গাথার দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। (গোপীচাঁদের সন্ন্যাস—সম্পাদকীয় মন্তব্য, ৭৪ ও ৭৫ পৃঃ)

পরিচিত। গোপীযন্ত্র নামের সহিত গোপীচন্দ্র বা গোবিন্দচন্দ্রের স্মৃতি বিজড়িত আছে (বাঙ্গালা ভাষার অভিধান— জ্ঞানেন্দ্র দাস)।

বাঙ্গালা নাথ-গীতিকাগুলির রচনাকাল আজও নিঃসন্দেহে স্থির হয় নাই। বাঙ্গালা দেশের (পূর্ব্ব-পাকিস্থানসহ) বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান হইতে উপরোক্ত যে সব বাঙ্গালা গান বা ছড়া প্রকাশিত হইয়াছে, সেগুলির কয়েকটীই পূর্ব্ববঙ্গ হইতে সংগৃহীত। 'মীনচেতন' ময়নামতীর পাহাড়ের নিকট পাওয়া গিয়াছে। "আমাদের এই গোরক্ষবিজয়ের নাম এক প্রতিলিপিতে 'মীন নাথ চৈতন্য গোরক্ষবিজয়' লিখিত রহিয়াছে। তাহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে, সম্ভবতঃ আদৌ পুঁথিখানির পূর্ণ নাম মীন নাথ চৈতন্য গোরক্ষবিজয়' অথবা 'গোরক্ষবিজয় মীনচেতন' ছিল। হয়তঃ সংক্ষিপ্ত হইয়া তাহাই অবশেষে কোথাও 'গোরক্ষবিজয়' নামে এবং কোথাও বা 'মীনচেতন' নামে পরিচিত হইয়া গিয়াছে। ফলতঃ উভয় নামেরই বিস্তর স্বার্থকতা রহিয়াছে সন্দেহ নাই—ঢাকার পুঁথিতে উহার নাম যে এরূপেই 'মীনচেতন' হইয়া গিয়াছে, তাহা সহজেই বুঝা যায় (৫ পৃঃ)।" 'মীনচেতন' পুঁথিখানি সন ১২২৪ মাহে ২৮ চৈত্রের লেখা। উহার লেখক শ্রীতনুরাম দেবদাষ সদা এ গুরু পদে য়াস— মোকাম ভানি।" ভানি কোথায় বলিতে পারি না। এই পুঁথির বয়স (১৩২৩—১২২৪ = ৯৯) বৎসর মাত্র" (গোরক্ষবিজয়— ২০ পৃঃ, ভূমিকা)। সাহিত্যাচার্য্য দীনেশ বাবু অনুমান করেন ঢাকা সাহিত্য পরিষদের মীনচেতন (শ্যামদাসের ভণিতাযুক্ত) এর প্রকৃত রচয়িতা চট্টগ্রামবাসী সেখ ফয়জুল্লা, শ্যামদাস সেন নহেন (ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন— ১৩২৩ বাং, ভাদ্র ও আশ্বিন সংখ্যা)।

'গোরক্ষবিজয়' চট্টগ্রামে পাওয়া গিয়াছে। গোরক্ষবিজয়ের বর্ণিত ঘটনারাজী পূর্ব্বের মুসলমান আমলেরও পূর্ব্বের বলিয়া অনুমিত হয়" (গোরক্ষবিজয়—২০পৃঃ ভূমিকা)। জনাব আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ ও সাহিত্যাচার্য্য

দীনেশবাবু ইহাকে কমপক্ষেও ৫।৬ শত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া অনুমান করেন (গোরক্ষবিজয়-ভূমিকা, ২১ পৃঃ)।

'গোপীচাঁদের সন্ন্যাস' দিনাজপুর হইতে ভবানী দাসের 'ময়নামতীর গাথা' ত্রিপুরা জিলা হইতে সংগৃহীত। "পিতা, পুত্র ও মাতার চরিত্র লইয়া বঙ্গ-ভাষায় বহুতর কাব্য বিরচিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে রংপুর অঞ্চলে প্রচলিত 'মাণিকচাঁদের গান' ও দুর্ল্লভ মল্লিক রচিত 'গোবিন্দচন্দ্র গীত' মাত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে। নানা স্থান হইতে যে বহুতর ধর্ম্মমঙ্গল বাহির হইয়াছে তাহা উক্ত চরিত্রত্রয়ের আদর্শ লইয়া গ্রথিত" (বিশ্বকোষ)।

মাণিকচন্দ্র, ময়নামতী ও গোপীচাঁদের সময় ১০ম-১১শ খৃষ্টীয় শতাব্দী বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। ইঁহাদের সম্বন্ধীয় গানগুলি তাঁহাদের জীবিত-কালে না হইলেও তাঁহাদের মৃত্যুর পর হইতে রচিত ও গীত হইয়া আসিতেছে; এবং সমাজে শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এগুলিকে ক্রমশঃ নব ভাষায় সজ্জিত করা হইয়াছে (বঙ্গসাহিত্য পরিচয়)। ইঁহারা বাঙ্গালী। তাহা হইলে বাঙ্গালা গানগুলিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিতে হইবে। এসব গান বঙ্গদেশ হইতে অন্যান্য প্রদেশে এমন কি বিদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। অধ্যাপক ডাঃ সুকুমার সেন বলেন—"গোরখপন্থী যোগী-ভিক্ষুকদের প্রধান ব্যবসায় ছিল সাম্প্রদায়িক কাহিনী গেয়ে ভিক্ষা করা, এবং আনুষঙ্গিকভাবে নাট দেখানো। এদের দ্বারাই বাঙ্গালার গোপীচন্দ্রের পাঁচালী আর্য্যভাষী ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। সংস্কৃত নাটক অখ্যায়িকায় গল্প বলিয়ে যোগীভূমিকা অজ্ঞাত নয় (নাথপন্থের দীশা, কল্যাণশ্রী, শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৫৫ বাং)। আমরা ৫ম অধ্যায়ে ৫ম খৃঃ অব্দের লিখা মীন নাথের একটী ছড়া উদ্ধৃত করিয়াছি। তাহা হইলে বলা যায় বাঙ্গালা ছড়া ৫ম-৬ষ্ঠ খৃঃ অব্দ হইতে রচিত ও লোকমুখে গীত এবং প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। ১৫শ/১৬শ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত জনসাধারণের উপর এগুলির বিশেষ প্রভাব ছিল।

হিন্দী ও অন্যান্য ভাষার নাথগীতিকাগুলির মধ্যে সঙ্গীত গোপীচাঁদ ভারতী (পদ্য)। সঙ্গীত পুরাণ (পদ্য) ভক্ত বালক রামকৃত। কৌকভ-অল-হিদায়েত-রাম সাহে কর্তৃক উর্দ্দুভাষার পদ্য ছন্দে লিখিত। দশম গ্রন্থ— ব্রজভাষার পদ্য ছন্দে লিখিত। পুঁথিরত্ন জ্ঞান— জাত্তলা দাস জৌকি ও ব্রহ্ম দাস কৃত। ইহার এক কপি লণ্ডন, ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। যোগী সম্প্রদায়াবিষ্কৃতি— চন্দ্রনাথ যোগীকৃত পদ্য ছন্দের বহি। ইহার উর্দ্দু গদ্যের অমুদ্রিত সংস্করণ লণ্ডন ব্রিটিশ মিউজিয়ামে ও পাঞ্জাবী পদ্য সংস্করণ পাঞ্জাব বিশ্ব বিদ্যালয়ে রক্ষিত আছে। দরিস্থান-ই-মজাহিব— পারস্য ভাষার পদ্য ছন্দে লিখিত। গোপালচন্দ্র হালদার কর্তৃক ইহা ইংরাজিতে অনুবাদিত। ১৮৯১ খৃঃ অব্দের পাঞ্জাব লোক গণনার রিপোর্টের ৫৭ পরিচ্ছেদে (Legends of the Punjab (By Sir Richard Temple), Glossary of the Punjab Tribes and castes, Vol. II (By Mr. Rose and Mr. Emac-lagan) ইহার অনেক ইংরাজী অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে। আইন-ই-আকবরী— আবদুল ফজল সম্পাদিত। ইহার ইংরাজী সংস্করণ আছে। গোপীচন্দ ভরথরী— লক্ষণ রাম সুপিরি কৃত এবং লক্ষ্ণৌ সহরে মুদ্রিত। সিহ-রফী গোপীচন্দ— গঙ্গারাম কৃত এবং লাহোর হইতে প্রকাশিত। বারামাহ গোপীচন্দ— কবি কাশীরামকৃত এবং লাহোর হইতে প্রকাশিত। সঙ্গীত গোপীচন্দকা— বোম্বাই হইতে প্রকাশিত। গোপীচন্দ রাজা-কোথ্যাল— প্রহ্লাদীরাম পুরোহিত কৃত এবং বোম্বাই হইতে প্রকাশিত। সঙ্গীত গোপী-চন্দ ভরথরী— খেমরাজ শ্রীকৃষ্ণদাস কৃত এবং বোম্বাই হইতে প্রকাশিত। গোবিন্দচন্দ্র গীত— কটক হইতে প্রকাশিত। গোপীচন্দ কাথ্যাল— লোভীরাম কৃত এবং বোম্বাই হইতে প্রকাশিত। গোপীচন্দকা-খ্যাল— প্রহ্লাদীরাম কৃত ও বোম্বাই হইতে প্রকাশিত। সন্তলীলামৃত— মারাঠি কবি মহীপতি কৃত। ইহা প্রায় দুই শতাধিক বৎসরের প্রাচীন বহি। ইহার রচয়িতা ১৭১৫

হইতে ১৭৯০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। মৃগলুব্ধ—দ্বিজরতি দেব প্রণীত।

যোধপুর ষ্টেট লাইব্রেরীতে রক্ষিত— গমবোধ, গোরক্ষ-গণেশগোষ্ঠী, মহাদেব গোরক্ষ সংবাদ, গোরক্ষ দত্তগোষ্ঠী, কন্থড়বোধ, অষ্টমুদ্রা, পঞ্চমাতৃযোগ আভাই মাত্রা, দয়াবোধ, নার্ভী (Narve) বোধ, অকালীশ্লোক, কাফরবোধ (Kafar), প্রাণসঙ্কলী, জ্ঞানচৌত্রিশী, সাঙ্খদর্শন, নাথজীকী তিথাহ (জন্ম-তিথি), বত্রিশ লক্ষণ (Lachhan), গ্রন্থ-হোমাবরী, ছন্দ গোরক্ষ নাথজীকা, সিদ্ধ একাবশ (Ikbis) গোরক্ষ-শিষ্ট প্রমাণ গ্রন্থ, কি-ঘন-অস্তুতিকারী (৩) প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষার গ্রন্থাদির নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এগুলিতে নাথাচার্য্যদের ধর্ম্মমত, সাধনমাহাত্ম্য ও চরিত্রাদির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

মারাঠি ভাষায় ময়নামতী ও গোপীচাঁদের গান সুপ্রচলিত। কবি মহীপতি সুললিত ভাষায় ইঁহাদের লীলারসময় গান গাহিয়া জনচিত্ত অধিকার করিয়াছেন। তিনি ১৭শ খৃঃ অব্দের শেষভাগের লোক (বঙ্গবাণী— জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১ বাং, ৪৩২ পৃঃ)। মালীক মোহাম্মদকৃত পদ্মাবত ৯৪৭ সালে হিন্দী ভাষায় রচিত। ডাঃ গ্রীয়ার্সন প্রমুখ পণ্ডিতগণ ইহাকে হিন্দী ভাষার প্রাচীনতম গ্রন্থ মনে করেন। সম্ভবতঃ ১০৪৫ সালে বাঙ্গালী কবি সৈয়দ আলাওল ইহার ভাষান্তর করেন (নাথপন্থ— প্রবাসী, ফাল্গুন ও চৈত্র— ১৩২৮ বাং)। নাথাচার্য্যদের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় গান তিব্বতীয় আখ্যানেও আছে (A note on the Antiquity of Chittagong compiled from the Tibetan works Pag Samjon-zan of Sumpakhanpo and Khbab Dun of Lama Taranath By Roy S. C. Dass, C. I. E. Bahadur, J. A. S. B. 1898, Part I. Page 22, 23).

---

(৩) হিন্দীভাষার গ্রন্থাদি বেঙ্কটেশ্বর ষ্টীম প্রেস বোম্বাই ঠিকানায় পাওয়া যায়।

ডক্টর তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত, এম-এ, পি-এইচ, ডি বলেন— "* * * * তখনকার সহজবোধ্য মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় রচিত বলিয়া মাণিকচন্দ্র রাজার গান, ময়নামতীর গান প্রভৃতি গীত লোকের হৃদয়, মন অল্লেই অধিকার করিতে পারিয়াছিল। নাথ-গুরুদের অত্যাশ্চর্য্য ক্রিয়াকলাপের কথা এ সমস্ত গাথার অঙ্গীভূত বলিয়া তৎসম্প্রদায় কর্ত্তৃক ইহা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে গীত ও সেই সেই দেশের ভাষায় প্রচলিত হইয়াছে। ভিক্ষোপজীবী যোগীরা এই কাজে কম সহায়তা করে নাই" (প্রবর্ত্তক— অগ্রহায়ণ, ১৩৪৪ বাং, গোপীচাঁদ ও নাথ সম্প্রদায়)। তিনি আরও বলেন— "মাণিকচন্দ্র রাজার সময়ে যোগিগণ শৈবলক্ষণাক্রান্ত ছিলেন। নাথপন্থীদের ময়নামতীর গান, মাণিকচন্দ্র রাজার গান, মীনচেতন, গোরক্ষবিজয় প্রভৃতি গীতিপূর্ণ গ্রন্থাদি বড়ই চিত্তাকর্ষক ও অমূল্য তথ্যপূর্ণ। * * * * * নাথদের দেতাগণ সিদ্ধাই বা সিদ্ধ বলিয়া প্রসিদ্ধ। * * * * হিন্দুর দেবতা ব্রাহ্মণ; নাথপন্থীগণ মানিলেও ইঁহাদিগের স্থান মহাজ্ঞানপ্রাপ্ত সিদ্ধাইগণের অনেক নিম্নে" (নাথধর্ম্ম— ইতিহাস ও আলোচনা, শ্রাবণ, ১৩২৮ বাং)।

অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ বলেন— "নাথ সম্প্রদায়ের যোগীরা রাজা গোপীচাঁদের গান, মাণিকচাঁদের গান, গোরক্ষ নাথ ও মীন নাথের কীর্ত্তিকাহিনী দেশ-দেশান্তরে গিয়া গাহিয়া বেড়াইত। সাধুদের মুখে মুখে প্রচারিত গীতের ফলে বাঙ্গালায় ও বাঙ্গালার বাহিরে নাথপন্থীদের ধর্ম্মের কয়েকখানি পুস্তক পাওয়া গিয়াছে। * * * * গ্রীয়ার্সন ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে মাণিকচন্দ্র রাজার গান ছাপেন। এই গানের সঙ্গে পুরাণ প্রাসাদের ছাপা 'গোপীচন্দ্র কি কথা'র অনেক পার্থক্য। গ্রীয়ার্সন বলেন রাজপুতানা ও মালবপ্রান্তে এই আখ্যায়িকার যথেষ্ট প্রচলন আছে" (প্রবাসী— ফাল্গুন, ১৩২৮ বাং, নাথপন্থ)।

স্বামী অভেদানন্দ বলেন— "* * * * নাথযোগী সম্প্রদায় এক সময়ে ভারতে ও তাহার বহির্ভাগে ধর্ম্মপ্রভাব বেশ বিস্তার করিয়াছিল। সে বিষয়ে

আমরা গোপীচন্দ্রের গান, ময়নামতীর গান ও গোরক্ষবিজয় ইত্যাদি পুস্তকে সুস্পষ্ট পরিচয় পাই। এই সকল ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় পুস্তকগুলি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা এম-এ ক্লাসের পাঠ্যরূপে পড়ান হয়। ইহা আমাদের কম গৌরবের বিষয় নহে" (বিচিত্রা— পৌষ, ১৩৪২ বাং)।

শ্রীবিপিনবিহারী বিদ্যাভূষণ বলেন— "নাথপন্থীগণ যোগমার্গ অবলম্বী শৈব। * * * * * খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে বহু গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে মাণিকচাঁদের গান, গোপীচাঁদের গান বা গোবিন্দচন্দ্রের গান, ময়নামতীর পুঁথি, ময়নামতীর গান, গোরক্ষবিজয়, মীনচেতন প্রভৃতি তখনকার শক্তিশালী শৈবসাহিত্যের পরিচয় দিবার নিমিত্ত অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। এই সকল গীত কবিতা পূর্ব্বে যোগিসম্প্রদায়ের দ্বারা দেশ-বিদেশে গীত ও প্রচলিত হইত" (ভারতবর্ষ—চৈত্র, ১৩২৭ বাং)।

অধ্যাপক ডাঃ সুকুমার সেন বলেন— "* * * * নাথপন্থের প্রসার হয়েছিল যে বাংলাদেশ থেকেই তার বলবৎ প্রমাণ আছে একাধিক। প্রথম নাথ সাধনার কথা সবচেয়ে আগে পাচ্ছি পুরোণো বাংলা সাহিত্যে একাদশ দ্বাদশ শতাব্দী থেকে (১)। দ্বিতীয় নাথপন্থের যে বিশিষ্ট কাহিনীটি উত্তরাপথের সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে কণফটযোগী গায়কদের কল্যাণে, সেটির উৎপত্তি বাংলা-দেশেই। তৃতীয়, উত্তরাপথের যোগীদের সাধনসঙ্গীতের ও ছড়ার ভাষায় বাংলা শব্দের ও বাক্যাংশের অবস্থিতি দুর্লক্ষ্য নহে এবং অনেকগুলি ছড়ার মূল যে বাংলা তা বোঝা শক্ত নয়। তবে উত্তরাপথের যোগীদের প্রভাব যে ফিরে বাংলা-দেশেও পৌঁছায়নি এমন নয়। নাথযোগি সম্প্রদায়ের মধ্যে কখনো প্রাদেশিক ব্যবধান ছিল না। তাঁরা স্বভাবতঃই পরিব্রাজক। তাই দেখি সপ্তদশ শতাব্দীতে বাংলা নাথপন্থীদের সাধননিবন্ধে হিন্দী ছড়া। অধিকাংশ প্রহেলিকা ছড়ার ও

(১) মীন নাথের ৫ম খৃঃ অব্দের লিখা নাথ-সাধনার ছড়া আমরা ৫ম অধ্যায়ের প্রারম্ভে উদ্ধৃত করিয়াছি।

রূপকের উদ্ভব হয়েছিল বাংলায়। তাই হিন্দী রাজস্থানী ছড়ার মধ্যেও দেখি বাংলার মূল সুরটি হয়েছে প্রতিধ্বনিত। যেমন—

"চন্দা গোটা খুটা করিলে সুরিজ করিলে পাট
নিত উঠ ধোবা ধোবৈ ত্রিবেণীকে ঘাট।"

নাথপন্থী যোগীরা বিশেষভাবে পরিব্রাজক। তাঁদের নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে স্থানের বা ভাষার কোন বন্ধন ছিল না। * * * * * পশ্চিমা যোগিগুরুর পুরবিয়া শিষ্য এবং পুরবিয়া যোগিগুরুর পশ্চিমা শিষ্য যথেষ্টই হত। এই কারণে বাঙালী নাথপন্থীদের পুরাণো নিবন্ধে হিন্দী ছড়াও পাওয়া যাচ্ছে। যেমন উত্তরবঙ্গে প্রাপ্ত মছীন্দ্র-গোরক্ষবোধ-এ—

"কৌন পেড়ি বিন ডাল্
কৌন পংখি বিন সুবা।
কৌন পানি বিন নীর
কৌন কালি বিন মুবা।"

(নাথপন্থের দিশা, কল্যাণশ্রী, শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৫৫ বাং)

অধ্যাপক অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—"গোরক্ষ নাথের কীর্ত্তি ও ধর্ম্মমত বিজ্ঞাপক একটী গাথা-সাহিত্য ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র প্রচারলাভ করিয়াছে। নানা প্রাদেশিক ভাষায় এই সব গাথা প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। উড়িয়া ভাষায় লিখিত গোবিন্দচন্দ্রের গীত উড়িয়া দেশে পাওয়া যায়। বিহার, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ও পাঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশে হিন্দী ভাষায় রচিত গোপীচাঁদের পুঁথির প্রচলন আছে। মহারাষ্ট্র দেশে গোবিন্দচন্দ্রের প্রসঙ্গ লইয়া নানা জাতীয় নাটক রচিত হইয়াছে। ইহা যে এই গাথা-সাহিত্য হইতে উদ্ভূত ইহা বলাই বাহুল্য। এই গাথাগুলি ভারতের জাতীয় সাধনার অমূল্য সম্পত্তি, কিন্তু বর্ত্তমানে শিক্ষিত সমাজে তাহার অধিকাংশই অপরিচিত" (পল্লীশ্রী— ২য় সংখ্যা, ১৩৩১ বাং, যোগিগুরু গোরক্ষ নাথ)।

অধ্যাপক ডাঃ বেণীমাধব বড়ুয়া বলেন—"যে গোরক্ষ নাথের নামে একদিন সুদূর জালন্ধর ও সুরাষ্ট্র হইতে গৌড়, বঙ্গ ও আসাম উড়িষ্যা পর্য্যন্ত আর্য্যাবর্ত্তের সকল লোক সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিতেন তাঁহার বিষয়ে নাথসমাজ অজ্ঞ, এবং তাঁহার নামে পরিচিত হইতে যোগিছাত্রগণ লজ্জিত" (বঙ্গীয় যোগি-সমাজের মর্ম্মস্থল, প্রাণস্পন্দন ও গতিবিধি)।

অধ্যাপক ডাঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী বলেন—"আজ পর্য্যন্ত পাওয়া গান-গুলিতে বুদ্ধের নাম গন্ধও নাই। এগুলি সাফ নাথপন্থের সাহিত্য, এবং নাথ-পন্থের সাহিত্য নিদর্শন বলিয়াই এ গুলির গুরুত্ব। স্থানে স্থানে ধর্ম্ম নিরঞ্জনের উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু এই ধর্ম্মের সহিত বুদ্ধের কোন সম্পর্কই খুঁজিয়া পাইতেছি না। ধর্ম্মপূজা যে বুদ্ধের শেষ নিদর্শন, এই মতবাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রচারিত। করজোড়ে নিবেদন করিতে চাই যে, সে ধর্ম্ম যে বুদ্ধের শেষ পরিণতি এ বিষয়ে এখনও আমার গুরুতর সন্দেহ আছে" (গোপীচাঁদের সন্ন্যাস— সম্পাদকীয়, ৭৫ পৃঃ)।

গোরক্ষবিজয় মুনসী আবদুল করিম, সাহিত্য-বিশারদ কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং রাজারাও শ্রীযোগীন্দ্র নারায়ণ রায় বাহাদুরের অর্থানুকূল্যে ১৩২৪ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী ময়নামতীর গান সম্পাদন করিয়াছেন, এবং ঢাকা সাহিত্য পরিষদ ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা কয়েক বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ ক্লাসের পাঠ্য ছিল। ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী আরও গোপীচাঁদের সন্ন্যাস সম্পাদন করিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয়ের প্রদত্ত সম্পূর্ণ ব্যয়ে ইহা মুদ্রিত এবং ১৩৩২ বঙ্গাব্দে ইহা ঢাকা সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশিত। ঐগুলিতে কেবল ভারতীয় নাথপন্থের আত্মচেতনার বৈশিষ্ট্য সুপ্রতিষ্ঠিত আছে এমন নহে, বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যও সুপ্রতিষ্ঠিত আছে এবং থাকিবে। ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক বিশেষ অংশের সহিত এব

বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের সহিত বিশেষ করিয়া মূল নাথ সম্প্রদায়ের সহিত এগুলি বিশেষভাবে সম্পর্কিত। এ সম্বন্ধে সাহিত্যাচার্য্য রায় দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর বলেন—"সমস্ত ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া গোরক্ষ নাথের শিষ্য সম্প্রদায় বর্ত্তমান। এই নাথ সম্প্রদায়ের চেষ্টায়ই গোরক্ষ নাথের কীর্ত্তিবিজ্ঞাপক সাহিত্য ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র প্রচারলাভ করিয়াছে। ময়নামতীর জ্ঞান এই সাহিত্যের অন্তর্গত। * * * ধর্ম্মমঙ্গলের পুঁথিগুলির কোন কোনটীতে আমরা নাথ, গোরক্ষ নাথ, হাড়িপা, কানুপা প্রভৃতি নাথগুরুগণের সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ উল্লেখ পাই। * * এই সমস্ত গাথা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনরুত্থানের পূর্ব্ববর্ত্তী। সাধারণ সমাজে তখনও রামায়ণ মহাভারতের অনুশীলন এদেশে আরম্ভ হয় নাই। * * * যেরূপ শীতান্তে বকুল গাছের নীচে অজস্র ফুল পড়িয়া থাকে, বালিকারা আসিয়া সূতা পরাইয়া সেগুলি দিয়া মালা গাথিয়া লয়, সেরূপ 'গোরক্ষ-জয়' ছড়ার মত দ্বাদশ শতাব্দীতে বঙ্গীয় সাহিত্যের এক কোণে পড়িয়া ছিল, শ্যামদাস প্রভৃতি লেখকগণ হয়তঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতে তাহা কুড়াইয়া লইয়া সেগুলি কাব্যে পরিণত করিয়াছেন। * * *

গোরক্ষবিজয়ের মত এরূপ অপরূপ গ্রন্থ যে বঙ্গসাহিত্যের আদি যুগে রচিত হইয়াছিল, ইহা আমাদের গৌরবের কথা। গোরক্ষ যোগীর চরিত্র শরৎ শেফালিকা বা যুথিকার ন্যায় শুভ্র; তাঁহার চরিত্র-মাহাত্ম্য বঙ্গসাহিত্যের আদি যুগের একটি প্রধান দিক নির্দ্দেশক স্তম্ভ। ইহা বৌদ্ধযুগের চরিত্রবল, উচ্চ নীতি, গুরুভক্তি প্রভৃতি মহৎ গুণরাশিকে উজ্জ্বল করিয়া দেখাইতেছে। **বিশাল আদ্রিশ্রেণী যেরূপ বঙ্গদেশের সীমাচিহ্ন, গোরক্ষবিজয় এ দেশের সাহিত্যের সেইরূপ যুগনির্দ্দেশক চিহ্ন।** * * যে চরিত্রবল এবং নিঃস্বার্থ ও অহেতুকী ভক্তির উপর এই গ্রন্থের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত তাহা বঙ্গীয় অন্য কোনও পুস্তকে নাই। **যেমন অশোকস্তম্ভ বৌদ্ধযুগের নিদর্শন, এই পুস্তক তেমনই নাথ-**

অধ্যাপক ডাঃ বেণীমাধব বড়ুয়া বলেন—"যে গোরক্ষ নাথের নামে একদিন সুদূর জালন্ধর ও সুরাষ্ট্র হইতে গৌড়, বঙ্গ ও আসাম উড়িষ্যা পর্য্যন্ত আর্য্যাবর্ত্তের সকল লোক সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিতেন তাঁহার বিষয়ে নাথসমাজ অজ্ঞ, এবং তাঁহার নামে পরিচিত হইতে যোগিছাত্রগণ লজ্জিত" (বঙ্গীয় যোগি-সমাজের মর্ম্মস্থল, প্রাণস্পন্দন ও গতিবিধি)।

অধ্যাপক ডাঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী বলেন—"আজ পর্য্যন্ত পাওয়া গান-গুলিতে বুদ্ধের নাম গন্ধও নাই। এগুলি সাফ নাথপন্থের সাহিত্য, এবং নাথ-পন্থের সাহিত্য নিদর্শন বলিয়াই এ গুলির গুরুত্ব। স্থানে স্থানে ধর্ম্ম নিরঞ্জনের উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু এই ধর্ম্মের সহিত বুদ্ধের কোন সম্পর্কই খুঁজিয়া পাইতেছি না। ধর্ম্মপূজা যে বুদ্ধের শেষ নিদর্শন, এই মতবাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রচারিত। করজোড়ে নিবেদন করিতে চাই যে, সে ধর্ম্ম যে বুদ্ধের শেষ পরিণতি এ বিষয়ে এখনও আমার গুরুতর সন্দেহ আছে" (গোপীচাঁদের সন্ন্যাস— সম্পাদকীয়, ৭৫ পৃঃ)।

গোরক্ষবিজয় মুনসী আবদুল করিম, সাহিত্য-বিশারদ কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং রাজারাও শ্রীযোগীন্দ্র নারায়ণ রায় বাহাদুরের অর্থানুকূল্যে ১৩২৪ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী ময়না-মতীর গান সম্পাদন করিয়াছেন, এবং ঢাকা সাহিত্য পরিষদ ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা কয়েক বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ ক্লাসের পাঠ্য ছিল। ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী আরও গোপীচাঁদের সন্যাস সম্পাদন করিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয়ের প্রদত্ত সম্পূর্ণ ব্যয়ে ইহা মুদ্রিত এবং ১৩৩২ বঙ্গাব্দে ইহা ঢাকা সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশিত। ঐগুলিতে কেবল ভারতীয় নাথপন্থের আত্মচেতনার বৈশিষ্ট্য সুপ্রতিষ্ঠিত আছে এমন নহে, বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যও সুপ্রতিষ্ঠিত আছে এবং থাকিবে। ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক বিশেষ অংশের সহিত এবং

বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের সহিত বিশেষ করিয়া মূল নাথ সম্প্রদায়ের সহিত এগুলি বিশেষভাবে সম্পর্কিত। এ সম্বন্ধে সাহিত্যাচার্য্য রায় দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর বলেন—"সমস্ত ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া গোরক্ষ নাথের শিষ্য সম্প্রদায় বর্ত্তমান। এই নাথ সম্প্রদায়ের চেষ্টায়ই গোরক্ষ নাথের কীর্ত্তিবিজ্ঞাপক সাহিত্য ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র প্রচারলাভ করিয়াছে। ময়নামতীর জ্ঞান এই সাহিত্যের অন্তর্গত। * * * ধর্ম্মমঙ্গলের পুঁথিগুলির কোন কোনটীতে আমরা মীন নাথ, গোরক্ষ নাথ, হাড়িপা, কানুপা প্রভৃতি নাথগুরুগণের সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ উল্লেখ পাই। * * এই সমস্ত গাথা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনরুত্থানের পূর্ব্ববর্ত্তী। সাধারণ সমাজে তখনও রামায়ণ মহাভারতের অনুশীলন এদেশে আরম্ভ হয় নাই। * * *

যেরূপ শীতান্তে বকুল গাছের নীচে অজস্র ফুল পড়িয়া থাকে, বালিকারা আসিয়া সুতা পরাইয়া সেগুলি দিয়া মালা গাথিয়া লয়, সেরূপ 'গোরক্ষ-বিজয়' ছড়ার মত দ্বাদশ শতাব্দীতে বঙ্গীয় সাহিত্যের এক কোণে পড়িয়া ছিল, ফয়জুল্লা প্রভৃতি লেখকগণ হয়তঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতে তাহা কুড়াইয়া লইয়া সেগুলি কাব্যে পরিণত করিয়াছেন। * * *

গোরক্ষবিজয়ের মত এরূপ অপরূপ গ্রন্থ যে বঙ্গসাহিত্যের আদি যুগে রচিত হইয়াছিল, ইহা আমাদের গৌরবের কথা। গোরক্ষ যোগীর চরিত্র শরৎ শেফালিকা বা যুথিকার ন্যায় শুভ্র; তাঁহার চরিত্র-মাহাত্ম্য বঙ্গসাহিত্যের আদি যুগের একটি প্রধান দিক নির্দ্দেশক স্তম্ভ। ইহা বৌদ্ধযুগের চরিত্রবল, উচ্চ নীতি, গুরুভক্তি প্রভৃতি মহৎ গুণরাশিকে উজ্জ্বল করিয়া দেখাইতেছে। **বিশাল আদ্রিশ্রেণী যেরূপ বঙ্গদেশের সীমাচিহ্ন, গোরক্ষবিজয় এ দেশের সাহিত্যের সেইরূপ যুগনির্দ্দেশক চিহ্ন।** * * * যে চরিত্রবল এবং নিঃস্বার্থ ও অহেতুকী ভক্তির উপর এই গ্রন্থের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত তাহা বঙ্গীয় অন্য কোনও পুস্তকে নাই। **যেমন অশোকস্তম্ভ বৌদ্ধযুগের নিদর্শন, এই পুস্তক তেমনই নাথ-**

ধর্ম্মের একটী গৌরব জনক নিদর্শন। * * * এই অপূর্ব্ব পুঁথির গ্রাম্যভাষা ওঙ্করুচি যে পাঠককে ভ্রান্ত ও ভগ্নোৎসাহ করিবে, তিনি সাহিত্যের এক মহার্ঘ খনির পরিচয়লাভে বঞ্চিত হইবেন। * * * এই নাথ ধর্ম্মে বৌদ্ধ ও শৈবধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ উপকরণ মিশিয়া গিয়াছিল। * * * আশ্চর্য্যে বিষয় এই যে গ্রাম্য মুসলমান ও অশিক্ষিত ব্যক্তিগণ এই দুরূহ যোগমার্গের বিষয়গুলি অনুশীলন করিয়াছিল। গোরক্ষ নাথ তাঁহার গুরুকে ৩১টী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। প্রশ্নগুলি এইরূপ—"দীপ নিবিলে জ্যোতিঃ কোথা গিয়া রহে? শব্দ উঠিলে ধ্বনি চলিয়া যায় কোথা? সুগন্ধি কুসুম গন্ধ কোথা থাকি পাএ?" (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য)

জনাব আবদুল করিম, সাহিত্য-বিশারদ বলেন—"এই গোরক্ষবিজয়-কাহিনী এক সময়ে 'গাজীর গানের' পালার মত লোকমুখে গীত হইত। তাহার প্রমাণ এখনও কতকটা পাওয়া যায়। চেষ্টা করিলে আজও এ দেশের বৃদ্ধ লোকের পাকস্থলী হইতে ইহার অনেকাংশ নিষ্কাশিত করা যাইতে পারে" (গোরক্ষ-বিজয়— ভূমিকা, ১৪ পৃঃ।)

নাথসিদ্ধা সংবাদ

নাথসিদ্ধাদের জন্ম-বিবরণ প্রথম অধ্যায়ে প্রদত্ত হইয়াছে। জন্মের পর নিরঞ্জনের আজ্ঞায় হর গৌরীকে সহধর্ম্মিণীরূপে পাইলেন। তৎপর সকলে আসিয়া পৃথিবীতে বাস করিতে লাগিলেন—

"তবে যদি পৃথিবীতে য়াইল হর গৌরী।
মীননাথ হাড়িফাএ করন্ত চাকরি॥
মীননাথের চাকরি করে জতি গোরখাই।
হাড়িফার সেবা করে কানফা জোগাই॥

এহিমতে কতদিন সাধিলেক জোগ।
বাহু (৯) ভক্ষি রহিলেক তেজি উপভোগ॥
সিবের দক্ষিণ বামে হাড়িফা মিনহি।
পিষ্ট জোগে গৌরী তবে জগতের য়াই॥ ১০

(গোরক্ষবিজয়— ১০, ১১ পৃষ্ঠা)

হরগৌরী কৈলাশে গিয়া গৃহবাস করিতে লাগিলেন। একদিন গৌরী শিবকে বলিলেন, সকল সিদ্ধারা গৃহবাস করুক ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। মহাদেব বলিলেন, এঁদের যখন কাম ক্রোধ লোভ মোহ কিছুই নাই, তখন এঁদের দ্বারা সংসার হইবে কি করিয়া? দেবী এঁদের পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। মহাদেবের আহ্বানে সকল সিদ্ধা সমবেত হইয়া আহারে বসিলেন, দেবী স্বয়ং পরিবেশন আরম্ভ করিলেন। দেবীর রূপে মুগ্ধ হইয়া এক গোরক্ষনাথ ছাড়া—

"দেবীর জে রূপ দেখি জথ সিদ্ধাগণ।
কামবাণে ভেদিলেক স্থির নহে মন॥
দেবীএ করিল মায়া বিবিধ প্রকারে।
বিষম কপট মায়া কে বুঝিতে পারে॥

* * * *

কল্পিলেক মীন নাথ মনে আশ করি।
ত্রিজগতে পাই যদি এমন স্থুন্দরী॥
বিচিত্র শয়নে থাকি এমন নারী লই।
রঙ্গ কতুকে তবে রজনি গোঞাই॥
এবমস্তু বলি দেবী পাইলা এহি বর।
কদলির দেশে তুঙ্কি চলহ সত্তর॥

---

(৯) বায়ু। (১০) পিষ্টভাগে গৌরী আছে জগতের আই। ২য় পুথি 'আই' অর্থ মাতা।

সোল সয় (১১) কদলি লইয়া তুহ্মি কর কেলি।
কদলির রাজা হইবা ঝাটে জাও চলি ॥
তবে মনে চিন্তিলেক হাড়িফা সিধাই।
এমন সোন্দরি তবে আহ্মি যদি পাই ॥

* * * *

পাইতে সোন্দরি মোর মনে হাবিলাস ॥ (১২)
হাসিয়া বোলেন দেবী পাইলা এহি বর।
হাড়িরূপ ধরি যাও মনামতী ঘর। (১৩)

* * * *

কানফাএ আকলিল তাহান অন্তর।
পরম সোন্দরি যদি থাকে মোর ঘর ॥
তার সঙ্গে কেলি করি যদি মরি যাই।
তবে হ তাহান সঙ্গে আনন্দে খেলাই ॥
অঙ্গীকার কৈলা দেবী মনে বিমসিয়া।
তুরমানে চলি যাও ডাহুকা হইয়া ॥ (১৪)
জেমত মাগিলা তবে তেমত পাইলা বর।
আনন্দ কর গিয়া রমণীর ঘর ॥
তবে মনে চিন্তিলেক গাভুর সিধাই।
এমন কামিনী যদি ভজে মোর ঠাই ॥
তার লাগি যদি জাএ হাত পাও কাটা।
তথাপিহ হই আহ্মি সাল্লাবানের বেটা ॥

---

(১১) ষোল শত। (১২) অভিলাস। (১৩) ময়নামতীর গৃহ। (১৪) ডাহুকা স্থানের নাম।

আজ্ঞা (১৫) দিল ভবানী পাইলা তুহ্মি আশ।
বর পাইলা চল তুহ্মি সত মা এর পাস ॥
শত মা এ ভজিব তোরে দেখিয়া জোয়ান।
তাহার কারণে তোহ্মি পাইবা অপমান ॥"
(গোরক্ষবিজয়— ১৮ হইতে ২১ পৃঃ)

সিদ্ধাদের মনে কুভাবের উদয় হওয়ায় দেবী শাপ দিলেন। ফলে মীন নাথ ১৬ শত নারীর রাজ্যে গিয়া সিদ্ধি হারাইলেন। হাড়িপা ময়নামতীর মেহের-কুলে গেলেন। হাড়িপার সহিত ময়নামতীর অবৈধ প্রণয়ের ইঙ্গিত নাথ-সাহিত্যে পাওয়া যায়। দেবীর শাপে ডাহুকার গড়ে রমণীপ্রেমে মত্ত হওয়ায় কানুপার স্কন্ধ কাটা পড়িবার উপক্রম হইয়াছিল। তাঁহার শিষ্য বাইল (বাউল) ভাদাই তাঁহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, এবং চৌরঙ্গী নাথের বিমাতা তাঁহাকে অবৈধ প্রণয়ের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। হইতে অসম্মত হওয়ায় চৌরঙ্গীকে অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল।

এদিকে গোরক্ষ নাথ স্বীয় গুরু মীন নাথের এবং কানুপা নাথ স্বীয় গুরু হাড়িপা বা জালন্ধর নাথের অনুসন্ধান করিতেছিলেন। কানুপা গোরক্ষ নাথকে অনুসন্ধান খবর বলিতেছেন—

"কানফা বোলেন ভাই যনহ গুত্যর।
জে জে রাজ্য তর্লাশিলাম (১৬) গুরু জর্লন্ধর ॥
ওদাই গিরি (১৭) তর্লাশিলাম জথা উদিত দিবাকর।

*　*　*　*　*　*

কিশকিন্দা তর্ল্লাশিলাম বালি বানোরের পুরি।
অজর্দ্ধা (১৮) তর্ল্লশিলাম গোহোক চণ্ডালের বাড়ি ॥

---

(১৫) আজ্ঞা। (১৬) অনুসন্ধান করিলাম। (১৭) উদয়গিরি। (১৮) অযোধ্যা।

বৃন্দাবোন (১৯) পুরী মুঞি (২০) ঘরে ২ ভূর্ম্মিনু (২১)
অষ্টগিরি (২২) ভূর্ম্মিলাম জথা অন্ধ্ কার পুরি।
ষুমেরু ভূর্ম্মিঞা গেইলাম (২৩) হিমালএনগরি ॥
দেব পুরে না পাইলাম আমি গুরুর খবর।
এক ঠেঙ্গিয়া দেশে তর্ব্বাশিলাম জলন্ধ র ॥

(গোপীচাঁদের সন্ন্যাস—১৪, ১৫ পৃঃ)

এ ভাবে ভ্রমণ করিতে করিতে—

"মুনির (২৪) গোফাতে জায়া সির্থনাদ পুরিল।
সিঙ্গনাদ ষুনিঞা মুনির ধ্যান ভঙ্গ হৈল ॥
গলে বসন দিয়া শিষ্কার বন্দিল চরণ।
বশিতে আনিঞা দিল জোগের আশোন ॥

কানফা বোলেন মুনি ষুন সমাচার।
গুপিচদ্র [ন্দ্র] নামে আছে তোমার কুমার ॥
আমার গুরুকে পোতে ঘোড়ার পৈঘর।
আজি কালি করি হৈল পঞ্চ এ বছর ॥"

(গোপীচাঁদের সন্ন্যাস— ১৭ পৃঃ)

(১৯) বৃন্দাবন। (২০) আমি। (২১) ভ্রমণ করিলাম। (২২) অস্তগিরি। (২৩) গিয়াছিলাম।

(২৪) গোপীচাঁদের সন্ন্যাসে ময়নামতীকে বহু স্থানে মুনি বলা হইয়াছে। ময়নামতী ত্রিপুরার কুমিল্লার নিকটের যে ময়নামতী লালমাই পাহাড় আছে সেখানের গোফাতে যোগমগ্ন ছিলেন। কানুপা নাথ সেখানে রথ যোগে গিয়াছিলেন। এ রথ কি বিমান, না যোগবলের রথ ?

এ কথা শুনিয়া ময়নামতী বলিতেছেন—

"গুরুথে পুতিল পুত্র আমিত না জানি ॥

*　　*　　*　　*　　*

হাড়িফার নাম ষুনি জম রাজা ডরে।
তাহার শনে বাদ করে মনশ্বের শরিরে ॥
হাএ হাএ করে মুনি চক্ষের পড়ে জল।
কান্দিতে কান্দিতে মুনি পৈল মহিতল।"

(গোপীচাঁদের সন্ন্যাস— ১৭ পৃঃ)

রাজা গোপীচাঁদ হাড়িপা সিদ্ধার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। দীক্ষা গ্রহণের ফলাফল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়া সিদ্ধা রাজাকে বলিয়াছিলেন পুস্করিণী পাবে বসিয়া প্রদত্ত মন্ত্র বিশুদ্ধভাবে জপ করিতে পারিলে পুষ্করিণী জলশূন্য হইয়া যাইবে। কিন্তু রাজা যথারীতি জপ করিতে না পারায় পুষ্করিণী জলপূর্ণই রহিয়াছিল। ভুলমন্ত্র দেওয়া হইয়াছে ভাবিয়া রাজা ক্রোধান্বিত হইয়া সিদ্ধাকে ঘোড়ার আস্তাবলে পুতিয়াছিলেন। সিদ্ধা যোগমগ্ন ছিলেন। যোগভঙ্গ হইলে রাজার আর রক্ষা ছিল না। সে জন্য ময়নামতী অত্যন্ত চিন্তিতা হইয়া পড়িয়াছিলেন। সিদ্ধা কানুপা রাজাকে রক্ষা করিবার উপায় বর্ণনা করিতেছেন—

"কানফা বোলেন তুমি কান্দ অকারণ।
পুত্র বাচাইবার হেতু করহ অখন ॥
জতিগোক্ষের্র বরে তোমার হইল কুমার।
যেরূপে বাচিবে তার ষুন শমাচার ॥
শোবর্ন্ন দিয়া গঠ তুমি শোনার গুপিচন্দ।
শাক্ষাতে রাখিব তার করিয়া প্রবন্ধ (২৫) ॥

(২৫) ছলনা।

জখন পুছিবে গুরু করিতে শংহ্বার (২৬)।
শোনার গুপিচন্দ্র এহি মুনির কুমার ।।
কোপ করি শম্প দিব গুরু জলন্ধ´র ।
শোনার গোপিচন্দ জাইবে জমঘর ।।
কোপখেমা দুরে জাবে হইবে আনন্দ।
শাক্ষাতে আনিও তুমি রাজা গুপিচন্দ ।।
বাচিবে তোমার পুত্র না ভাবিহ আর ।”

(গোপীচাঁদের সন্ন্যাস— ১৮ পৃঃ)

সিদ্ধা কানুপার উপদেশে গোবিন্দচন্দ্রের স্বর্ণমূর্তি নির্ম্মিত হইল। তারপর মাটী ‘খুদিয়া’ দেখা গেল হারিপাসিদ্ধা এখনও যোগমগ্ন আছেন। স্বর্ণমূর্ত্তি হাড়িপার সাক্ষাতে স্থাপন করা হইল। এবং কানুপাসিদ্ধার ‘শিঙ্গনাদে’ হাড়িপাসিদ্ধার ধ্যান ভঙ্গ হইল। সকলেই বিনীতভাবে সিদ্ধাকে প্রণাম করিলেন; কিন্তু—

“প্রণাম না করিল কেবোল শোনার পুথ্যলি (২৭)।।
দেখিয়া হাড়িফা জলে (২৮) অগ্নি অবতার।
কানফার তরে.পুছে কি নাম ইহার ।।
কহিল কানুফা তখন করিয়া প্রবন্ধ ।
শাক্ষাতে আছেন খাড়া শোনার গুপিচন্দ ।।
শুনিয়া হাড়িফা শির্দ্ধা হুহুঙ্কার ছাড়িল।
শোনার পুথ্যলি তখন ভশ্ব হৈয়া গেল ।।”

(গোপীচাঁদের সন্ন্যাস— ১৯ পৃঃ)।

---

(২৬) সংহার। (২৭) পুতুল, মূর্ত্তি। (২৮) ক্রোধান্বিত হইলেন।

তৎপর সিদ্ধা কানুপা, ময়নামতী প্রভৃতির অনেক সাধ্যসাধনায় গোপীচন্দ্র রক্ষা পাইলেন। ময়নামতী—

"গলে বশন দিয়া কহে করিয়া প্রনাম।
পুত্র গুপীচন্দ্র গোশাঞি তোমার গোলাম॥
গুপিচন্দ্র হবে গোশাঞি তোমার নফর।
শেবোক করিয়া তুমি করহ অমর॥"

(গোপীচাঁদের সন্ন্যাস— ১৯ পৃঃ)

রাজা গোপীচাঁদের নাথধর্ম্মাবলম্বন

রাণী ময়নামতী পুত্র গোপীচাঁদ বা গোবিন্দচন্দ্রের সুখের জন্য ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু প্রতাপশালিনী মাতা ময়নামতী স্বীয় পুত্রকে বিলাসের ক্রোড়ে লালিত পালিত হওয়ার বিরুদ্ধে ছিলেন। তাই তিনি স্বীয় পুত্রকে উপদেশ দিতেছেন—

"শুন পুত্র গোপীচন্দ্র জোগে কর মন।
বরাহ্মণ গ্যান (১) সাদ (২) জুগী হইবার॥
বরাহ্মণ গ্যান সাদিলে নাহিক মরণ।
জিয়া থাক গোবিচাদ নাথে দেউক বর॥

(ময়নামতীর গান— ভবানী দাস)

"মায়াজাল বিশম জাল জম রাজার থানা।
গ্রিহেতে (৩) থাকিলে বাছা জমে দিবে হানা॥
* * * *
"ছাড় বাছা রাজ্যপাট মুখে মাখ ছাই।"
মাএ পুত্রে যুগি হৈয়া চাইর যুগ্য (৫) বেড়াই॥

(গোপীচাঁদের সন্ন্যাস— ৩১ পৃঃ)

---

(১) জ্ঞান। (২) সাধনা কর। (৩) গৃহেতে—সংসারে আবদ্ধ থাকিলে। (৫) চারি যুগ।

রাজা গোপীচাঁদ মাতা ময়নামতীকে উত্তরে বলিতেছেন—

"আরের (৬) মাএ (৭) বাটা (৮) চাহে বাকিবারে ঘর।
তুমি মাত্র কহ মোরে জুগি হইবার ॥
আর মাএ পুএ দেখি দুধ ভাত খাওাএ (৯)।
নাতিপতি লইয়া ঘরে আনন্দে গোয়াএ (১০)॥
তুহ্মি মাএ হিয়াখানি পাতারে বান্দিয়া (১১)।
নিত্য প্রতি কহ মোরে যাইতে জুগী হইয়া ॥
* * * *
কোন জুগীর সহিতে মাও কহ যাইবার।"

(মদনামতীর গান— ভবানী দাস)

"শেবক করাবে আমাক কুন যুগির ঠাঞি ॥"

(গোপীচাঁদের সন্ন্যাস— ২৪ পৃঃ)

মাতা ময়নামতী উত্তর দিতেছেন—

"মুনি বোলে বাছা বুন আমার শথানে।
শেবোক করাব তোমাক হাড়িফার চরণে ॥"
* * * *
গ্যানে ধ্যানে হাড়িফা শির্দ্ধা বান্ধি আছে চুড়া।
রাত্রি দিবা ফিরে হাড়ি জম করিয়া ঘোড়া ॥
জম রাজা হএ জার নিজের নফর।
* * * *
হেন গুরু মিলিল বাছা তোমার কর্ম্মের ফলে।
হাড়িফার শেবক হইয়া হওগা শর্ণ্যাশ।"

(গোপীচাঁদের সন্ন্যাস— ২৪ পৃঃ)

---

(৬) অপরের। (৭) মাতা। (৮) ছেলে, বেটা। (৯) খাইতে দেয়। (১০) অতিবাহিত করে। (১১) পাষাণে বান্ধিয়া।

মাতার উপদেশে রাজা সন্ন্যাস গ্রহণের সঙ্কল্প করিলেন—

"এতেক যুনিঞা রাজা কহে মাএর ঠাঞি।
নিশ্চএ হইব যুগী মোনে কিছু নাঞি॥
চারি রাণির আগে আমি বিদাএ হৈয়া আনি।
কালিকা বেহানে (১২) আমি হইব শন্যাসি (১৩)॥"

*　　*　　*　　*

"আমার গুরু হইব হাড়িফা জলন্ধর।
আমি রাজা যুগি হব তাহার কিঙ্কর॥"

(গোপীচাঁদের সন্ন্যাস— ৩১ ও ৩৮ পৃঃ)

জেহি মাত্র গুপিচন্দ্র যুগি হৈতে চাহিল।
পুত্রের কথা যুনি মুনি শর্গ (১৪) হাতে পাইল॥
বাহু পশারিয়া মুনি পুত্র নৈল কোলে।
লৈক্ষে লৈক্ষে চুম্ব্য (১৫) দিল বদন কমলে॥"

(গোপীচাঁদের সন্ন্যাস— ২৯ পৃঃ)

রাজা গোপীচন্দ্র সন্ন্যাস গ্রহণের সঙ্কল্প করিয়াছেন জানিয়া—

"যুনিয়া খেতুর কথা চারি রাণি কান্দে।
বশএ (১৬) না সম্ভরে রাণি কেশ নাহি বান্ধে॥"

(গোপীচাঁদের সন্ন্যাস— ৩২ পৃঃ)

রাজাকে সন্ন্যাস গ্রহণের সঙ্কল্প ত্যাগ করাইবার জন্য রাজরাণীরা নানাভাবে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহাতে সুফল কিছুই ফলিল না। কারণ রাজার আয়ু মাত্র আঠার বৎসর। মহাজ্ঞান লাভ করা ব্যতীত তাঁহার রক্ষা নাই। মহাজ্ঞান লাভ করিয়া তিনি অমর হইবার জন্য কৃতসঙ্কল্প—

---

(১২) আগামী কল্য সকালে। (১৩) সন্ন্যাসী। (১৪) স্বর্গ। (১৫) লক্ষ লক্ষ চুম্বন। (১৬) বস্ত্র।

"শোতোরো (১৭) বছ্যর আমি যুখে রার্জ্য করি।
আর এক বছ্যর পরে জাব জমের পুরি ॥
আঠারো বছ্যর কালে জদি গ্যান নাহি পাই।
অনিশ বছ্যর কালে জাইব জমের ঠাঞি ॥
ময়া (১৮) দুর কর রানি না বৈশ মোর কাছে।
নিশ্চএ হইব যুগি যাইব শন্যাসে ॥
এ যুক সম্পদ মোর মোনে নাহি ভাএ।
চিত্য বান্ধা আছে মোর হাড়িফার পাএ ॥
হাড়িফার চরণে আমার মোন আছে বান্ধা।
রার্জ্য পাট নারিপুরি শব মিথ্যা ধান্ধা ॥"

(গোপীচাঁদের সন্ন্যাস— ৪২ পৃঃ)

রাজ্যধন সুখ-সম্পদ বিশেষ করিয়া রাণীদের ললাম সৌন্দর্য্য নবযৌবন কিছুতেই রাজাকে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারিল না দেখিয়া রাণীরা একেবারে নিরুপায় হইয়া—

"কান্দে কান্দে চারি রানি বিরহে আনলে।
বশন তিতিল রানির নয়ানের জলে ॥
কান্দে কান্দে চারি রানি হইয়া ফাপর।
যুক্তি বিচারিল রানি মোনের ভিতর ॥
চারি রানি বোলে আমরা কান্দি অকারন।
হাড়িফাক মারিলে রাজ্যে রহিবে রাজন ॥"

(গোপীচাঁদের সন্ন্যাস— ৪২ পৃঃ)

রাজরাণীরা বিষ মিশ্রিত অন্ন ভোজন করাইয়া সিদ্ধা হাড়িপার মৃত্যু ঘটাইবার জন্য সকল প্রকার ব্যবস্থা করিয়া—

---

(১৭) সতর। (১৮) মায়া।

"রানি বোলে খেতু বাছা শিগ্রি করি জাও।
হাড়িফার তরে জায়া আমন্ত্র্ন দেও।।"

(গোপীচাঁদের সন্ন্যাস— ৪৩ পৃঃ)

রাণীদের আদেশমত রাজভৃত্য খেতু সিদ্ধাকে আহারের নিমন্ত্রণ দিলে সিদ্ধা বলিলেন রাণীদের বিষমিশ্রিত আহার্য্য প্রস্তুত করিতে বল। আমি এ সব আহার করিতে ইচ্ছুক। তৎপর—

"শেহিক্ষেনে আইল হাড়ি করিতে ভোজন ।।
*   *   *   *   *
অন্ন বেঞ্জন দিল রানি ভরি শোনার থাল।
একবারে মুখে দিল না ভরিল গাল্ ।।
*   *   *   *   *
অন্ন দিতে নারে রানি হইল ফাপোর ।।"

(গোপীচাঁদের সন্ন্যাস— ৪৪পৃঃ)

যোগশক্তি বিষের ক্রিয়া একেবারে নষ্ট করিয়া দিল বটে, কিন্তু—

"মিথ্যা মরণে হাড়ি টলিয়া পড়িল ।।
*   *   *   *   *
দেখিয়া আনন্দ হৈল রানি চারি জনে ।।"

(গোপীচাঁদের সন্ন্যাস— ৪৪ পৃঃ)

সিদ্ধার মৃত্যু ঘটিয়াছে ভাবিয়া রাজরাণীরা খুবই আনন্দিত হইলেন। অগ্নি সংকারের জন্য সিদ্ধার দেহ নদীতে নীত হইল। কিন্তু অগ্নিতে তাহার দেহ দগ্ধ হইল না। তারপর সিদ্ধার দেহ জলে ভাসাইয়া দেওয়া হইল। কিন্তু—

"শিদ্ধিজ[illegible]য়াহাড়ি আনন্দ হইল।
ফুলবাড়ীতে জায়া হাড়ি ধ্যানেতে বসিল ।।
জোগ অশোনে নাথ বসিল গোফাতে।"

(গোপীচাঁদের সন্ন্যাস— ৪৫ পৃঃ)

রাজরাণীদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল। এ দিকে রাজমাতা ময়নামতী—

"পুত্র যুগি করিবেন মএনামত্তি রাই।
নাপিত আনিঞা রাজার মস্তক মুড়িল॥
গলে কেথা দিয়া মুখে ভুশঙ্গ চড়াইল।
বগলে বগলি (১) দিল শিঙ্গনাদ গলে॥
রক্ত চন্দনের ফোটা পরাইল কপালে।
চকমকি পাথর দিল বটুয়া (২) আর্দ্ধারি। (৩)
ঘোর (৪) মেখিলি (৫) আর বোঙাশের থাপুরী॥ (৬)
গলাএ পরাইতে দিল উদ্রাক্ষের মালা। (৭)
কটিতে পরাইতে দিল জোগবশ্এ ছাল॥ (৮)
কনুচ বিপ্রশন (৯) দিল দ্বাদশ দিল হাতে।
গুরু শেবিতে জাএ রাজা মাও মুনির সাতে॥
আগে জাএ মএনামত্তি পাছে জাএ রাজা।
দেখিয়া হাহাক্যার করে মিকুলের প্রজা॥
* * * *
জেখানে হাড়িফা শির্দ্ধা আছিল বশিয়া।
শেহিখানে গেলো মুনি পুত্র শঙ্গে নৈঞা॥
গুরুকে দেখিয়া রাজা চরণ বন্দিল।
গলে বশন দিয়া নাথের শাক্ষাতে রহিল॥
হাড়িফা দেখিল যদি রাজার বদন।
যুগিরূপ দেখি বোলে না হবে মরণ॥

---

(১) ঝুলি (২) কাপড়ের ছোট থলি (৩) বটুয়ার মত পাত্র (৪) কালবর্ণে
(৫) সন্ন্যাসীর কটিসূত্র (৬) লাউর খোলের ভিক্ষাপাত্র (৭) রুদ্রাক্ষের মাল
(৮) যোগীর পরিধেয় চর্ম্ম (৯) কনুইতে পরিবার? বিপ্রসন বুঝা গেল না

মুনি বোলে যুন গুরু হাড়িফা জলন্ধর।
আজ হৈতে পুত্র হৈল তোমার কিঙ্কর ॥
তোমার চরণ বিনে অন্য নাহি জানি।
এতেক বলিয়া হশতে (১১) শম্পিল (১২) মাত্তমুনি ॥
হাড়িফা বোলেন মুনি থাক বারো মাস।
গুপিচন্দ্রক নৈঞা আমি করিগা শন্যাস ॥
এতেক বলিয়া শির্দ্ধা আশোন তুলিল।
শিঙ্গনাদ পুরিয়া হাড়ি যাত্রা করিল ॥
শন্যাশ হইতে রাজা গুরুর সঙ্গে জাএ।
* * * *
রাজ্য ছাড়িয়া রাজা জাএ বোন'পথে ॥"
(গোপীচাঁদের সন্ন্যাস — ৪৭-৪৮ পৃঃ)

দীর্ঘকাল নানাবিধ কঠোর ক্লেশ সহ্য করিয়া যোগসাধনার ফলে—

"জোগ (১) আসোন (২) করি রাজা মোহাজন (৩) হৈল ॥
জোগান্ত ভেদান্ত (৪) ভেদ সরির বি [চার]।
যুষুমূলা (৫) ভেদিয়া রাজা কায়া কৈল সার ॥
সব্দ চক্র ভেদে আর সব্দ চক্র ০০।
চৌর্দ্ধ ভুবন (৬) ভেটে আর খিড়িকি দুয়ার ॥

(১১) হস্তে (১২) সমর্পণ করিল।

(১) যোগ (২) আসন (৩) মহাজন (৪) এই ছত্র হইতে সপ্তম ছত্র পর্য্যন্ত অন্য লিপিকরের লেখা। (৫) সুষুম্না। যোগশাস্ত্রে ষটচক্র ভেদ বর্ণিত আছে। এখানে 'সব্দ' বোধ হয় সপ্ত, চক্র বলা হইয়াছে। মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ এবং আজ্ঞা— এই ষটচক্র। সহস্রার চক্র নহে, ষটচক্র ভেদ করিয়া কুণ্ডলিনীর গন্তব্য স্থান। সহস্রারকে ধরিয়া সপ্ত গণা হইয়াছে বোধ হয়। (৬) দেহ ব্রহ্মাণ্ডের চতুর্দ্দশ ভুবন।

চাকি কুণ্ডল ভেটে আর অশ (৭) তুড়ে বন্দ।
তিন তিহড়ি (৮) ভেটিয়া মোনের ভাঙ্গে ধন্দ।।
আন্তউন্থি দিয়া বন্দ দশমিত (৯) দিল তালি।
গগন মন্দিরে যুয়া (১০) করে গাভুরালি।।
ভোমর কোঠা (১১) ভেটিলা তথা শ্রীকলার হাট (১২)।
পূর্ব্ব পশ্চিম (১৩) ভেটিয়া তথা নাগাইল কপাট।।
উত্যর দক্ষিন ভেটে হেমন্ত বশন্ত।
বারোকালা (১৪) ভেটিয়া মোনের ভাঙ্গে ধন্দ।।
শোলকাল ভেটিল আর কায়া শরবর।
তিনকালা ভেটিয়া মোন কৈল একাশ্তর।।
আত্মনাম ভেটিয়া তিথের্থ্য কৈল থান [।]
একে একে ভেদিল রাজা অঙ্গের পঞ্চ জনা (১৫)।।
পিতার মেদ রসবিন্দু জননির শঙ্গ।
ভেদিল সকল তৎ প্রিথিবির রঙ্গ (১৬)।।
উজানি বাহিয়া জাএ কামার শা [লা ?] ঠামে (১৭)।
ভঙ্গ দিল জরাম্রির্ত্ত (১৮) দুষ্ট কাল জমে।।

(৭) অ হইতে ক্ষ পর্য্যন্ত অক্ষর দ্বারা চিহ্নিত ষটচক্রের কমলগুলির দলসমূহ। (৮) ত্রিপুরী। তুং মীনচেতনে। (৯) তুং মীনচেতনে দশমী দুয়ার। দেহ নবদ্বার। হয়তঃ নাভিরন্ধ্র মনে করিয়া দশ গণনা। (১০) শুকপক্ষী, এখানে কুণ্ডলিনী শক্তি, পরমানন্দ। উহা সবেগে উর্দ্ধে উঠিতে লাগিল। (১১) মীনচেতনে কাঁজল কোঠা, ব্রহ্মপুরী, দুর্লভ মল্লীকে গুপ্ত ঘর। (১২) মীনচেতনে শ্রীগোল্লার হাট। (১৩) দেহের মধ্যেই পূর্ব্বাদি দিক এবং ষড় ঋতু আছে। (১৪) কলা? (১৫) পঞ্চতত্ত্ব। (১৬) পৃথিবীর রঙ্গ। (১৭) কামারশাল — যেখানে অগ্নি জ্বলিতেছে। সহস্রার। (১৮) জরামৃত্যু।

নিজ নাম শধিল রাজা গুরুর শাক্ষাতে।
অঘোর (১৯) পড়িল রাজার মরণের পথে॥
নিকটে আছিল জতো মরণের ভএ।
মৃর্ত্তপথ দুরে গেলো রিপু হৈল খ্যএ (২০)॥
আবদুল ষুকুরে কহে জোগের বিচার॥
এই মতে জোগ শাধি হৈল তৎশার।"

(গোপীচাঁদের সন্ন্যাস— ৫৬ পৃঃ)

"সুদূর নেপালেও গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস বিষয়ক বাংলা নাটক পাওয়া গিয়াছে; এটি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে সযত্নে রক্ষিত আছে" (নাথপন্থ— ৩০ পৃঃ)।

মাণিকচন্দ্র রাজার গান শিবের গীত নামে কথিত। এই শিবের গীতে গাভীর লাঙ্গুল ধরিয়া বৈতরণী পারের কথা আছে—

"গাভির নেঙ্গুল ধরিয়া বৈতরণী হৈল পার।
রাজার পিতামাতা বৈকুণ্ঠে হৈল পার॥" ৭২৩

(গোবিন্দচন্দ্র গীত)

সিদ্ধা হাড়িপানাথ পিতৃশ্রাদ্ধে গয়ায় পিণ্ডদান ও দেবতা ব্রাহ্মণ স্থাপনের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন—

"না করিলে পিঋ(তৃ) কার্য্য গয়ায় দান পিণ্ড।
পিতামাতা তাহার ভূঞ্জিবে নরক্ কুণ্ড॥ ৪৮৮
ব্রাহ্মন লঙ্ঘযে জেবা আর গুরুজন।
ব্রাহ্মন হিংসার পাপ না হয় গনন॥" ৪৮৯

* * * *

ব্রাহ্মন সন্তোষ করে দিয়া নানা ধন।
তাহা সমান পুন্ন্য নাই তিভুবন। ৫০২

(১৯) আগড়, অর্গল। (২০) ক্ষয়।

দেবতা ব্রাহ্মন জেবা করয়ে স্থাপন।
সেই পুন্নে অতি সত্য বৈকণ্টে গমন ॥ ৫০৩

নাথেরা মূলতঃ শৈব (৩৩ পৃঃ)। ত্রিপুরার রাজারাও পূর্ব্বে শৈব ছিলেন (নাথপন্থ— ১০ পৃঃ)।

হাড়িপা নাথ হিন্দুমতে গোবিন্দচন্দ্রকে দীক্ষিত করিয়াছিলেন—

"মস্তক মুড্যাযা কর্নে মুদ্রা দিয়া ধরিব জোগির বেষ।
কহে জলন্দরি লব সঙ্গে করি আজি জাহ নিজ বাষ ॥"

(গোবিন্দচন্দ্র গীত)

কর্ণে কুণ্ডল, গলদেশে নাদ ধারণ, গাভীর লাঙ্গুল ধরিয়া বৈতরণী পারের কথা, রাজা গোবিন্দচন্দ্রের গুরু জলন্দর বা হাড়িফা নাথের পিতৃশ্রাদ্ধ, গয়ায় পিণ্ডদান ও দেবতা ব্রাহ্মণ স্থাপনের পুণ্য কীর্ত্তন, এবং হিন্দুমতে রাজাকে দীক্ষা দান ইত্যাদি দেখিয়া প্রতীয়মান হয় যে গোবিন্দচন্দ্র ও তাঁহার বংশীয়গণ হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন এবং জালন্দর নাথ ব্রাহ্মণযোগী ছিলেন। যাহারা নাথদের বৌদ্ধ বলেন তাঁহাদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইবে কি ?

সিদ্ধা গোরক্ষ নাথের নিকট রাণী ময়নামতীর দীক্ষা গ্রহণ

ময়নামতীর পিতার নাম তিলকচাঁদ। তিলকচাঁদের দুই কন্যা। ময়নামতী ও সিন্দুরমতী। তিলকচাঁদ যথাকালে ইঁহাদের পাঠশালায় পড়িতে দিলেন। তৎপর—

"রোজ রোজ যায় দুই বইন বিদ্যা পড়িবারে।
আসিবার কালে চান (১) করে এক ডিগি সরোবরে ॥

* গোরক্ষবিজয়— ভূমিকা, ৪ পৃঃ। (১) স্নান

আপনার আবোছেয়া (২) ময়না জলেতে দেখিল।
আপনার রূপ দেখি ময়না কান্দিতে লাগিল ॥
এত রূপ দিয়া বিধি কইরাছে নিরমান।
কোথায় রাখিয়া যাব জমের ভুবন ॥
অগ্নি কি মাটী গাড়ে কি জলে ভাইসে দেয়।
নিরমান (৩) করিয়া বিধি হইয়াছে নিদয় (৪) ॥
আপনার রূপ দেখি ময়না কান্দিতে লাগিল।"

(বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য সংগৃহীত ময়নামতীর গান)

পশ্চিম বাঙ্গালার তুর্ল্লভ মল্লিক নামক স্বনামখ্যাত গ্রাম্য কবির 'গোবিন্দচন্দ্র গীতে' আছে—

"যে কালে জনক গৃহে আছিলাম আমি।
মোরে জ্ঞান দিয়াছেন গোরক্ষ নাথ মুনি ॥
পাটশালে পড়ি আমি জাই নিকেতনে।
সোল শত যুগী লইয়া গোরক্ষর গমন ॥
মোরে জিজ্ঞাসিল গুরু গুণের সাগর।
রাজার ঝিয়ারি (৫) কিছু ভিক্ষা দেহ মোরে ॥
প্রণাম করিয়া আমি জাই নিকেতনে।
জুগীগণে দিব ভিক্ষা মোর হইল মোন ॥

* * * *

আসির্ব্বাদ করি গুরু মহাগ্যান দিল
চারি যুগ অমর করিয়া মোরে গেল।"

(দুর্ল্লভ মল্লিক)

(২) শরীরের ছায়া (৩) নির্ম্মাণ (৪) নির্দ্দয় (৫) রাজকন্যা

"পিতা বোলে জন্মিল (৬) কন্ন্য (৭) অতি ভাগ্যবান।
শর্ব্বক্ষণ শাস্ত্র ষুনে বড়ো ধর্ম্ম গ্যান ॥
এতেক ভাবিয়া পিতা আপোনার মোনে।
পড়িবা কারণে দিল দ্রিজ (৮) গুরুর শথানে ॥
প্রাতেক কালে প্রিতি দিনে (৯) হশতে (১০) করি খড়ি;
পড়িবা কারণে জাই গুরুদেবের বাড়ি ॥
এহি রূপে শাশত্র (১১) পড়ি গুরুর পাটশালে।
উদএ (১২) হইল গুরু আমার কপালে ॥
গুরুর বাড়ী জাই আমি শাস্ত্র পড়িতে।
দৈবযোগে দেখা হৈল জতি গোক্ষ'র শাতে ॥

* * * * *

এতো সুন্দর বাল্লে'াক (১৩) জাবে জমের পুরিতে।
গুরু বোলে শঙ্কশারে (১৪) ক্ষাতি (১৫) রাখিব ॥
নিজ নাম দিয়া কন্ন্যাক অমর করিব।
যুন্যপথ ছাড়ি নাথ ডাড়াইল (১৬) রাজ পথে ॥
শরিরের তেজ গেল যুর্জ্জ্য শতে শতে ॥" (১৭)

(গোপীচাঁদের সন্ন্যাস— ২৬, ২৭ পৃঃ)

গোরক্ষ নাথের এ সময়কার বেশ-ভূষা সম্বন্ধে ময়নামতী বলিতেছেন—

পরিধানে ছিল নাথের কপিন করপটি (১৮)।
ভূশন আছিল আর কর্ন্নে' কন্ন্য' পাটি ॥

(৬) জন্মিল (৭) কন্যা (৮) ব্রাহ্মণ, দ্বিজ (৯) প্রতিদিন (১০) হস্তে (১১) শাস্ত্র (১২) উদয় (১৩) বালিকা (১৪) সংসারে (১৫) খ্যাতি (১৬) দাঁড়াইলেন (১৭) শত শত সূর্য (১৮) কর্পটী, ছিন্নবস্ত্র।

মশতক (১৯) মুণ্ডন ছিল মুখে চাপ দাড়ি।
চরণে শোনার খড়ম হশতে শোনার নড়ি॥
গলাএ দেখিনু নাথের ইঘোর মেখিলি (২০)।
উদ্রাক্ষ (২১) ভজাঙ্ক মালা গলাএ শোভন।
কপালে চন্দন ফোটা মুখেত ভুশন (২২)॥
যুগিরূপ দেখি মোনে না করিনু আন।
গলাএ বশন দিয়া করিনু প্রনাম॥"

(গোপীচাঁদের সন্ন্যাস—২৭ পৃঃ)

তৎপর পুষ্পোত্থানের ("ফুলটুঙ্গির মৈর্দ্ধে") পৃথক উচ্চ গৃহে গুরু গোরক্ষ নাথকে বসিতে দিয়া ময়নামতী তাঁহার যোথাযোগ্য আদর অভ্যর্থনা করিলেন এবং দীক্ষাদানের জন্য প্রার্থনা জানাইলেন—

"দেখিয়া আনন্দ হৈল জাতি গোক্ষ নাথ॥
হশ্ত ধরি গুরুদেব বৈশাইল শামোনে।
এক নাম চৈর্দ্ধবেদ যুনাইল কানে॥
নাম বর্ক্ষ (২৩) যুনি তখন যুর্ন্যেত (২৪) উড়িনু।
চৈদ্য (২৫) ভুবন বাছা পর্ল্লকে (২৬) দেখিনু॥
থাবা দিয়া গুরুদেবে ধরিল বাম হাত।
ত্রিধিনি আশোনে (২৭) নাথ বৈশাইল শাক্ষাতে॥
এক অক্ষরে তিন নাম (২৮) শর্ব্বনামের শার।
শেহি ব্রহ্ম নাম গুরু যুনাইল তিন বার॥

(১৯) ব্রহ্ম (২০) মেখলা (২১) রুদ্রাক্ষ (২২) ভস্মম্, ভস্ম (২৩) নাম ব্রহ্ম (২৪) শূন্যে (২৫) চৌদ্দ (২৬) পলকে (২৭) খেচরী মুদ্রায়? (২৮) প্রণব (অ + উ + ম যোগে)

এক নামে অনন্ত নাম অনন্তে এক হএ।
শেহিশে অজপা (২৯) নাম গুরুদেবে কএ ॥
এহি নাম জপিহ বাছা আশোন করিয়া।
কি করিতে পারে জম আপনে আশিয়া ॥
আশোনে বশিয়া নাম জপিনু শাক্ষাতে।
ভঙ্গ দিল জরামৃত্তু কাল জম দুতে ॥
জোগ আশোনে জথন শাধিনু নিজ নাম।
গুরুদেব বোলে বাছা শিদ্ধি হৈল কাম ॥"

(গোপীচাঁদের সন্ন্যাস—২৭, ২৮ পৃঃ)

নির্ভরযোগ্য বিবরণাদিতে দেখা যায় বিবাহের পূর্ব্বে ময়নামতী গোরক্ষ নাথের নিকট দীক্ষিতা হইয়াছিলেন। সেসময় তাঁহার নাম ছিল— "সুবুদ্ধি তারাই"। তারা+আই (মা)। অর্থাৎ তারা মা। ভবানী দাস শিশুমতী আই নামকরণ করিয়াছিলেন। দীক্ষা গ্রহণের পর গোরক্ষ নাথ নামকরণ করিয়াছেন—"যোগপথে হৈল নাম ম এনামন্তি রাই ॥" (ময়নামতী) তৎপর গোরক্ষ নাথ বলিতেছেন— "মাণিকচন্দ্রের শঙ্গে বিভা (বিবাহ) হইব তোমার।" এসময় ময়নামতীর শেষ প্রার্থনার উত্তরে গোরক্ষ নাথ বর দিতেছেন—

"এক পুত্র হৈব তোমার আমি দিলাম বর ॥
শ্বামি রশ শেশ পুত্র করিহ ভক্ষন (৩০)।
তাহা হৈতে হৈবে তোমার গর্ভের শ্রীজন ॥
গুপিচন্দ্র নামে পুত্র হইব তোমার।
আঠার বছর প্রমাঞি (৩১) হইবে তাহার ॥
আঠারো বছরের জথন হইবে বার্দ্ধোক।

(২৯) হংসগায়ত্রী। (৩০) স্বামীর শেষ বয়সে তোমার পুত্র হইবে। রস—বীর্য্য। ভক্ষন—গ্রহণ। অর্থাৎ স্বামী সঙ্গ করা। (৩১) পরমায়ু।

তখন করাবে বাল্বোক হাড়িফার শেবক ॥
জখনে ভজিবে বাল্বোক হাড়িফার চরন।
বাড়িবে পরমাগ্রি তখন নাহবে মরন ॥
(গোপীচাঁদের সন্ন্যাস—২৯ পৃঃ)

ময়নামতী যে গুরু গোরক্ষ নাথের শিষ্যা ছিলেন তাহা ময়নামতীর গান এবং গোপীচাঁদের বৈরাগ্যগাথার অনেক স্থলেই সসম্মানে স্বীকৃত হইয়াছে। ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে শিশুকালে ময়নামতীর পাঠশালায় গমন, অধ্যয়ন ও গুরু গোরক্ষ নাথের নিকট দীক্ষা গ্রহণ প্রাচীন ও প্রবল মতবাদের উপর স্থাপিত। ইহার অতিরিক্ত কথা বলা ঐতিহাসিকগণের পক্ষে দুঃসাহসিকতা।

অধ্যাপক বিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য 'গোবিন্দচন্দ্র ও ময়নামতী' শীর্ষক প্রবন্ধে (ভারতবর্ষ—বৈশাখ, ১৩৪৮ বাং, ৫৯৫—৬০০ পৃঃ) বলেন—

"সেইকালে গোরক্ষ নাথ নামক এক সিদ্ধ যোগীর আবির্ভাব হয়। তিলকচন্দ্রের রাজবাটীতে এই যোগীর যাতায়াত ছিল, সেখানে তিনি বালিকা ময়নামতীকে প্রায়ই দেখিতেন। ময়নাকে দেখিয়া তাঁহার মনে স্নেহের সঞ্চার হইল। তিনি মনস্থ করিলেন, ইঁহাকে মহাজ্ঞান শিক্ষা দিবেন। অনন্তর বালিকার সম্মুখে গোরক্ষ নাথ স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে ময়নামতী সানন্দে তাঁহার নিকটে দীক্ষা লইতে সম্মত হইলেন। দীক্ষা দানের জন্য যে সমস্ত অনুষ্ঠানের প্রয়োজন সেসকল সম্পন্ন হইলে মন্ত্র গ্রহণের যোগ্যতা পরীক্ষা করিবার জন্য যোগিবর ময়নামতীকে দ্বাদশ বৎসরের আহার্য্য মুহূর্ত্তমধ্যে প্রস্তুত করিবার জন্য আদেশ দিলেন। আজ্ঞামাত্র ময়না পুরীমধ্যে প্রবেশ করিয়া কাঁচা হাঁড়ি ও কাঁচা পাতিলে অন্ন রন্ধন করিলেন এবং সোনার থালে সই অন্ন বাড়িয়া ঘৃত, 'আউটা দুগ্ধ' এবং 'চম্পা কলা' সহযোগে তাহা গুরুর নিকট উপস্থিত করিলেন। তখন—

"অন্ন লইয়া গোরক্ষ নাথ মনে মনে ঘুণে।
সতী কি অসতী কন্যা বুঝিব কেমনে ॥"

সতীত্ব পরীক্ষার নিমিত্ত

"বার সূর্য্যের তাপ সিদ্ধা তলপ করিল।
যতেক সূর্য্যের তাপ মৈনার গায়ে দিল ॥"

এক সূর্য্যের তেজই মানুষ সহ্য করিতে পারে না কিন্তু দ্বাদশ সূর্য্যের তেজ ময়নামতী অবলীলাক্রমে সহ্য করিলেন। গোরক্ষ নাথ বুঝিলেন এই কন্যার চরিত্র নিষ্কলঙ্ক। ময়নার হস্তের অন্ন গ্রহণে আর কোন বাধা রহিল না দেখিয়া গোরক্ষ যোগী আহারে বসিলেন এবং ময়নামতী ভক্তি সহকারে গুরুর মস্তকে আরাঙ্গিছত্র ধরিয়া রহিলেন।

"তা দেখিয়া গোর্খ নাথ মনে মনে গুণে।
এমন সুন্দরী যাইবে যমের ভবনে ॥"

না, যেমন করিয়াই হউক ইহার মৃত্যু রহিত করিতে হইবে। এই মহীয়সী রমণীকে অমর করিয়া মেহেরকুলে একটা কীর্ত্তি রাখিয়া যাইব। ইহা স্থির করিয়া গোরক্ষ নাথ সেই দিন হইতেই শিষ্যার শিক্ষা দীক্ষায় মনোযোগ দিলেন। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং গভীর অধ্যবসায়ের ফলে ময়নামতী অচিরকাল মধ্যেই মন্ত্রে তন্ত্রে বিচক্ষণ হইয়া উঠিলেন। গুরুর আশীর্ব্বাদে জরা-মৃত্যু-ব্যাধি তাঁহার করতলগত হইল। স্বয়ং যমরাজ খত লিখিয়া দিলেন। তাঁহার শরীর অগ্নিতে দগ্ধ হইবে না, জলে ডুবিবে না, অস্ত্রে বিদ্ধ হইবে না। অধিক কি—

"গুরু বোলে দিনে মৈলে মৈনামতী আই।
সূর্য্য বান্দি মাঙ্গাইব এড়া এড়ি নাই ॥
রাত্রিতে পড়িয়া মৈলে মএনামতী আই।
চন্দ্র বান্দি মাঙ্গাইব এড়া এড়ি নাই ॥

মূর্খ স্বামীর ভাগ্যে বিদূষী পত্নী জুটিলে গৃহধর্ম্ম পালন করা অনায়াসসাধ্য

হয় না। সংসারপথ দুর্গম হইয়া পড়ে; মাণিকচন্দ্রেরও তাহাই হইল। স্ত্রীর শক্তির পরিচয় পাইয়া তিনি সর্ব্বদাই সন্ত্রস্ত থাকিতেন। বাহিরে যতই পৌরুষ দেখান না কেন, মনে মনে তিনি স্ত্রীকে সর্ব্বদাই ভয় করিয়া চলিতেন। এই হেয়তাবোধগ্রন্থি রাজা মাণিকচন্দ্রকে অষ্টপ্রহর পীড়িত করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে আর একটা ব্যাপারে রাজা স্ত্রীর উপর ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইলেন। একদিন ময়না ধ্যানে বসিয়া জানিতে পারিলেন যে মাণিকচন্দ্রের পরমায়ু ফুরাইয়া আসিয়াছে। ইহা বুঝিতে পারিয়াই তিনি স্বামীকে বিরলে ডাকিয়া মহাজ্ঞান শিখিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। মহাজ্ঞান সাধন ব্যতীত বিধাতার নির্দ্দিষ্ট পরমায়ু বৃদ্ধি করিবার আর কোন উপায় নাই। আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার জন্য পতিব্রতা পত্নী স্বামীকে সেই গুপ্ত মন্ত্র দান করিতে অভিলাষী হইলেন।

কিন্তু স্ত্রীর নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিতে মাণিকচন্দ্রের পৌরুষে বাধিল। পুরুষ হইয়া নারীর নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলে রাজ্যের লোক তাঁহাকে উপহাস করিবে, লজ্জায় লোকসমাজে তাঁহার মুখ দেখাইবার উপায় থাকিবে না। স্ত্রীলোক পুরুষের, বিশেষতঃ স্বামীর গুরু হয় এমন কথা তো কেহ কোথাও শুনে নাই, কোন শাস্ত্রেও এরূপ বিধান দেখা যায় না। তিনি বীরের ন্যায় উত্তর করিলেন—

"জন্মিলে মরণ আছে সর্ব্বলোকে কএ।
আমি হব নারীর সেবক মরণের ভয়ে॥"

অকালে মরি মরিব তথাপি স্ত্রীকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিতে পারিব না। এই পৌরুষদর্পীর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা বিচলিত হইবার নয়—ইহা বুঝিতে পারিয়া ময়না অতিশয় শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। কারণ তিনি জানিতেন মহাজ্ঞান ব্যতীত মৃত্যু-দেবতার আক্রমণ রোধ করিতে পারে এমন শক্তি বিশ্বব্রাহ্মাণ্ডে আর কাহারও নাই।

দৈব অলঙ্ঘনীয়, তাহা না হইলে রাজা মন্ত্র গ্রহণ করিতে অসম্মত হইবেন কেন ? ময়নামতী বারংবার ইহাই ভাবেন। হায় হায় শক্তি থাকিতেও পতির প্রাণ রক্ষা করা অসম্ভব হইল ? একবারে নিরাশ না হইয়া পুনরায় চেষ্টা করিলেন, যদি রাজার মতের পরিবর্ত্তন হয়, কিন্তু রাজার সেই উত্তর— প্রাণের জন্য কাতর হইয়া পত্নীর নিকটে জ্ঞান লইব না। স্ত্রীর শিষ্য হইয়া প্রাণলাভ করা অপেক্ষা মৃত্যুও অনেক গুণে শ্রেয়। বার বার প্রত্যাখ্যাত হইয়াও ময়নামতী মধ্যে মধ্যে রাজাকে উপদেশ দিতে ছাড়েন না; অবশেষে রাজা ময়নার উপর অতিশয় বিরক্ত হইয়া আর কয়েকটি বিবাহ করিলেন এবং প্রথমা পত্নীর সাহচর্য্য যতদূর সম্ভব এড়াইয়া চলিতে লাগিলেন।

নূতন বধূগণের মধ্যে দেবপুরের পাঁচটি সুন্দরী কন্যা ছিলেন। ইহাদের প্রতিই রাজার প্রগাঢ় অনুরাগ পরিলক্ষিত হইল।

নবীনা সপত্নীগুলি স্বামীর প্রেম পাইলেও সংসারের কর্ত্তৃত্বভার জ্যেষ্ঠার হাতেই রহিয়া গেল। দেবপুরিকাগণ ইহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না, সুতরাং কোন্দল বাধিল। তাঁহারা কর্ত্তা এবং কর্ত্তৃত্ব উভয়কেই চান, একটি লইয়া সুখী হইবেন কেন ? রাজা কলহের মীমাংসা করিতে গিয়া নবতনীদেরই পক্ষ লইলেন এবং প্রথমা পত্নীকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া ফেরুসা নামক নগরে পাঠাইয়া দিলেন। রাজবধূ ময়না সেখানে গিয়া একটি ক্ষুদ্র কুটীর বাঁধিয়া অনাথিনীর ন্যায় বাস করিতে লাগিলেন। একদিকে সুসজ্জিত প্রাসাদে বহুপত্নী-পরিবৃত হইয়া

"মহারাজা রাজ্য করি খায় পাটের উপর।"

আর অন্য দিকে

"মএনামতী চরকা কাটি ভাত খায় বন্দরের ভিতর ॥"

মাণিকচাঁদের রাজত্বে নির্ধন বলিয়া কেহ ছিল না। দেশে সোনারূপার ছড়াছড়ি। কৃষকের পুত্র যে, সেও সোনার ভাটা লইয়া নির্ভয়ে খেলা করে।

যে কাঠ-পাতা বিক্রয় করিয়া সংসার চালায়, হাতী না চড়িয়া সেও বেড়াইতে বাহির হয় না। যে নিতান্ত দরিদ্র সেও খাসা তাজী ঘোড়ায় চড়ে। চাটাই বিছাইয়া হীরা মণি মাণিক্য শুকাইতে দেয়। প্রত্যেকের বাড়িতেই বড় বড় পুষ্করিণী, কেহ অপরের পুষ্করিণী হইতে জল আনিবার প্রয়োজন অনুভব করে না।

ঋণ কাহাকে বলে দেশে কেহ জানে না। গৃহস্থের মেয়েরা সোনার কলসীতে জল আনে এবং সোনার পাছড়া পরিধান করে। দাসী পর্য্যন্ত পাটের কাপড় পরিতে ঘৃণা বোধ করে। মাণিকচাঁদের রাজত্বকে লোকে রাম রাজত্বের সঙ্গে তুলনা করে বটে, কিন্তু এত সুখ, এত ঐশ্বর্য্য বোধ হয় রামচন্দ্রের রাজত্বেও ছিল না। কিন্তু এহেন রাজত্বেও দুঃখ দারিদ্র্য দেখা দিল। ময়নামতীর ফেরুসাগমনের পর হইতেই মাণিকচন্দ্র পীড়িত হইলেন, রাজকর্ম্মচারিগণ সুযোগ পাইয়া ধনরত্ন লুণ্ঠন করিতে লাগিল। অধিক অর্থ উপার্জ্জনের আশায় দেওয়ান কর বৃদ্ধি করিয়া দিল। শেষে এমন অবস্থা হইল যে প্রজারা আর কর দিতে পারে না। কৃষক লাঙ্গল ও বলদ বিক্রয় করে, ফকির দরবেশকে ঝোলা কাঁথা বেচিতে হয়, সাধু সদাগর নৌকা বেচিয়া রাজার কর দেয়। এমন কি রোগশয্যায় শুইয়া

"খাজনার তাপত বেচে দুধের ছাওয়াল।"

মাণিকচাঁদ সবই শুনিতেছেন। কিন্তু তিনি করিবেন কি? শয্যা হইতে উঠিবার পর্য্যন্ত তাঁহার সামর্থ্য নাই। প্রজাদের জন্য চিন্তা করিয়া তাঁহার রোগ আরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ময়নামতীর জন্যও যে হৃদয়ের এক কোণে একটু বেদনা ছিল না তাহাই বা কে বলিতে পারে? দূর-দেশান্তর হইতে কত বৈদ্য কত ধন্বন্তরি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের ব্যবস্থা মত নানা রকমের ঔষধ ও পথ্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।

কিন্তু সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া রাজার পীড়া উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিল। ওদিকে স্বর্গে বসিয়া শমন রাজা চিত্রগুপ্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন— মাণিকচন্দ্রের আর কত বাকি? চিত্রগুপ্ত দপ্তর দেখিয়া উত্তর দিলেন— ছয় মাস।

একদিন দুইদিন করিয়া দেখিতে দেখিতে ছয়মাস প্রায় অতিবাহিত হইতে চলিল। মাণিকচন্দ্রের জীবন প্রদীপও প্রায় নিবু নিবু হইয়া আসিয়াছে। বিধাতৃদেবের আজ্ঞা পাইয়া গোদা নামক যমদূত 'চামের দড়ি' এবং লোহার 'ডাঙ্গ' সহ উপস্থিত। আর কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই রাজার প্রাণবায়ু বহির্গত হইবে। রাজা বুঝিতে পারিলেন—আর বিলম্ব নাই, সময় ঘনাইয়া আসিয়াছে। মৃত্যুকালে সকলের সঙ্গেই দেখা হইল। রাজা আশা করিয়াছিলেন, ময়নামতীও দেখা করিতে আসিবেন কিন্তু তিনিই কেবল আসিলেন না। ময়নামতী নারী হইলেও সাধারণ স্ত্রীলোকের সহিত তাঁহার অনেক বিষয়ে পার্থক্য ছিল। অতিশয় দুঃখের কারণ ঘটিলেও তিনি বিহ্বল হইতেন না এবং পরম আনন্দের সময়েও শান্ত ও সংযত থাকিতেন। স্বামীর মৃত্যু যখন অবশ্যম্ভাবী তখন সেখানে গিয়া অন্যান্য সপত্নীর সহিত নিষ্ফল রোদন করিয়া কোন লাভ নাই। মৃতসঞ্জীবনী ত্যাগ করিয়া হলাহল সেবন করিতে যে ব্যক্তি বদ্ধপরিকর, তাঁহার নিকটে গিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করা কি একান্ত নিরর্থক নয়?

মৃত্যু রোধ করিবার শক্তি তাঁহার ছিল এবং সে শক্তি তিনি স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া প্রয়োগ করিতে গিয়াছিলেন; কিন্তু মাণিকচাঁদ তাহা গ্রহণ করেন নাই, এখন কেবলমাত্র চক্ষুজল সম্বল করিয়া মুমূর্ষু স্বামীর শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইতে তাঁহার ইচ্ছা হইবে কেন? মরণসাগরের প্রান্তদেশে দাঁড়াইয়া আজ মাণিকচাঁদের মনে অন্য চিন্তা নাই। অতিদূরে যাহার অবস্থান কেমন করিয়া সে-ই যেন আজ আপনার জন হইয়া উঠিল। পৃথিবীর কাছে শেষ বিদায় লইবার পূর্ব্বে তিনি একবার ময়নাকে দেখিবার ইচ্ছা জানাইলেন। রাজবাক্য লইয়া বার্ত্তাবহ ফেরুসা নগরে ময়নামতীর কুটীরে আসিয়া অভিবাদনান্তে নিবেদন করিল—

"ছয়মাসের কহিলা রাজা মহলের ভিতর।
দেখা করিবারে চায় রাজরাজেশ্বর ॥"

সংবাদ শুনিয়াই ময়নামতী ধ্যানে বসিলেন এবং মুহূর্ত্তমধ্যে রাজার

অবস্থা জ্ঞাত হইয়া বেঙ্গাপাত্রের সহিত রাজবাটী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সেখানে পৌঁছিতেই—

"যখন ধর্ম্মী রাজা ময়নাকে দেখিল।
কপালে মারিয়া চড় রাজা কান্দিতে লাগিল।"

যিনি একদিন দর্পভরে বলিয়াছিলেন—জন্ম হইলেই মৃত্যু হইবে, সেই বীরই আজ প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইলেন।

ময়না প্রবোধ বাক্যে রাজাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন— মহারাজ, চিন্তা করিও না, আমি থাকিতে মৃত্যু তোমার কি করিতে পারে? আমার একটি মাত্র বাক্য রক্ষা কর, শমন রাজার কোন অধিকার তোমার উপর থাকিবে না।

"কিছু জ্ঞান কহি দিমু আড়াই অক্ষর।
পৃথিবী টলিলে না যাইবে যমঘর ॥"

এখনও সময় আছে, মহাজ্ঞান গ্রহণ করিয়া অক্ষয় যৌবন এবং অনন্ত জীবন লাভ কর। গর্ব্বান্ধ হইয়া মহামূল্য প্রাণ বৃথা নষ্ট করিয়া লাভ কি?

মহাজ্ঞানের প্রস্তাবে রাজার সুপ্ত চৈতন্য আবার জাগরিত হইল। মনের সকল দুর্ব্বলতা নিমেষমধ্যে দূর হইয়া গেল। অকম্পিত কণ্ঠে রাজা উত্তর করিলেন —প্রাণভয়ে ভীত হইয়া রাজা মাণিক্যচন্দ্র স্ত্রীর জ্ঞান গ্রহণ করিবে না। পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিমে উদয় হইলেও মাণিক্যচন্দ্রের প্রতিজ্ঞা অটল।

ময়না বুঝিলেন—বিধাতার এইরূপ ইচ্ছা, তাহা না হইলে আসন্ন মৃত্যু দেখিয়াও রাজার মতি পরিবর্ত্তিত হইল না কেন?

মহাজ্ঞান গ্রহণ করিতে রাজা কোনরূপে স্বীকৃত হইলেন না দেখিয়া ময়নামতী স্বীয় শক্তির দ্বারা স্বামীর মৃত্যু রোধ করিবার জন্য চেষ্টা আরম্ভ করিলেন। রাজার শয়নকক্ষে চারিটা রক্ষাপ্রদীপ জ্বালাইয়া দেওয়া হইল, প্রদীপগুলি দিবা-রাত্র জ্বলিতে থাকিল। তাহার পর—

"চাইর কলসী জল থুইলে বিরলে ভরিয়া।
যেই রোগের যেই দাওয়া আনিল ধরিয়া॥"

ঔষধপত্র প্রস্তুত হইলে ময়নামতী গুরুস্মরণ করিয়া স্বামীর পদতলে বসিলেন; বসিতেই দেখিলেন কৃষ্ণদেহ ভীষণ আকৃতি এক পুরুষ পাশ এবং দণ্ড ধারণ করিয়া রাজার শিয়রে দণ্ডায়মান। ময়নার কিছু অজ্ঞাত ছিল না, এই বিরাট-কায় পুরুষটিকে দেখিয়াই তিনি বুঝিলেন—ইনি শমনের প্রেরীত জনৈক দূত এবং মাণিকচন্দ্রের প্রাণ লইয়া যাইবার উদ্দেশ্যেই ইঁহার এস্থানে পদার্পণ। তথাপি প্রশ্ন করিলেন—হে নবাগত, ইতিপূর্ব্বে রাজগৃহে তোমাকে কখনও দেখিয়াছি বলিয়া ত স্মরণ হয় না। তোমার পরিচয় কি? কোথা হইতে তোমার আগমন? কেনই বা তুমি শিরোদেশে দাঁড়াইয়া আছ? গোদাযম আত্মপরিচয় দিয়া উত্তর করিল—বিধাতার আদেশে তোমার স্বামীর প্রাণপুরুষকে লইয়া যাইবার জন্য এস্থানে আসিয়াছি। ইহা শুনিয়া ময়না অনুনয় বিনয় করিয়া যমদূতের নিকট স্বামীর প্রাণ ভিক্ষা চাহিলেন। যমদূত উত্তর করিল—আমি আজ্ঞাবহ মাত্র, প্রাণ ভিক্ষা দিবার আমার তো কোন অধিকার নাই। কিন্তু ময়না তাহার কথায় কান না দিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

ময়নার ক্রন্দনে ব্যথিত হইয়া এবং পুরস্কারস্বরূপ একটি টাঙ্গন লাভ করিয়া গোদা যম সেদিনকার মত ফিরিয়া আসিল।

প্রথম দিন আসিয়াছিল একজন, দ্বিতীয় দিন আসিল দুইজন, তৃতীয় দিনে সংখ্যা আরও বাড়িল। এই ভাবে গোদা যম সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া প্রতিদিনই মাণিকচাঁদের বাড়ি যাতায়াত করিতে লাগিল এবং ময়নামতীও প্রতিদিন ধন রত্ন দিয়া যমকে ফিরাইয়া দিতে লাগিল। অবশেষে যমদূতকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য মনুষ্য জীবন পর্য্যন্ত দান করিতে হইল। স্বামীকে রক্ষা করিবার জন্য ময়না নিজের ভ্রাতাকে যমদূতের হাতে সমর্পণ করিলেন। ভেট পাইলে যমদূত এক-দিনের জন্য রাজাকে ত্যাগ করিয়া যায় আবার পরদিনই বহু অনুচর সহ দেখা

দেয়। এইভাবে কিছুদিন চলিলে রাজভাণ্ডার শূন্য হইয়া গেল, হস্তিশালার সব হস্তী, অশ্বশালার সব অশ্ব শেষ হইল। যমদূতের হাতে অর্পিত হইবার ভয়ে দাস-দাসী আত্মীয়-স্বজন বাড়ি ছাড়িয়া প্রস্থান করিল। এবার ময়না প্রমাদ গণিলেন। এখন কেমন করিয়া যমকে প্রতিনিবৃত্ত করিবেন তাহা ভাবিয়া রাণীর মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইল।

শেষে স্থির করিলেন—অদৃষ্টে যাহা আছে তাহা কে লঙ্ঘন করিতে পারে? তথাপি আর একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিব, যদি স্বামীর মত পরিবর্ত্তন করিতে পারি। এই সঙ্কল্প করিয়া ময়না স্বামীর চরণ ধরিয়া গলদশ্রুনয়নে বলিলেন—প্রিয়তম, এখনও আমার কথা রাখ। মানুষের জীবন অবহেলার বস্তু নয়। সামান্য জিদের বশবর্ত্তী হইয়া তাহা ত্যাগ করা তোমার ন্যায় বুদ্ধিমান ব্যক্তির পক্ষে শোভা পায় না। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু এবার যমদূত আসিলে আর বোধ হয় তাহাকে বাধা দিতে পারিব না। মহারাজ, আর প্রত্যাখ্যান করিও না। স্ত্রীলোক বলিয়া আমাকে সহস্রবার উপেক্ষা করিতে পার তাহাতে আমি দুঃখ করিব না, কিন্তু মহাজ্ঞান তো তাচ্ছিল্যের বস্তু নয়। পণ্ডিতগণ কুস্থান হইতেও কাঞ্চন তুলিয়া লইবার পরামর্শ দেন। নারীকে ঘৃণা করিলেও নারীর মন্ত্রকে অবজ্ঞা না করিয়া গ্রহণ কর। এস প্রস্তুত হও।

"আমার শরীরের অমর জ্ঞান তোমাকে শিখাই।
স্ত্রী পুরুষে বুদ্ধি করি যমের দায় এড়াই॥"

কিন্তু রাজা হিমালয়ের ন্যায় অচল। তিনি স্থির কণ্ঠে উত্তর করিলেন—

"এমনি যদি আমার প্রাণ যায় ছাড়িয়া।
তবুত মাইয়ার জ্ঞান না নিব শিখিয়া॥"

ময়নামতী দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন।

পরদিবস সাজসজ্জা করিয়া গোদা যম বহু অনুচর সহ যথাসময়ে উপস্থিত হইল। আজ তাহারা প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছে—কোন প্রলোভনে মুগ্ধ

হইবে না, কোন ভীতি প্রদর্শন গ্রাহ্য করিবে না, কোন বাধা বিপত্তি মানিবে না যেমন করিয়াই হউক মাণিকচাঁদের প্রাণ শমনরাজের দরবারে উপস্থিত করিবেই করিবে।

ময়নামতী প্রস্তুত ছিলেন, তিনিও স্বামীর প্রাণরক্ষার জন্য যথারীতি অনুনয় বিনয় আরম্ভ করিলেন ; কিন্তু গোদা বিচলিত হইল না, আজ সে রাজার প্রাণ লইবেই, তখন ময়নামতী নানাবিধ উপঢৌকন আনিলেন, গোদাযম তাহাও প্রত্যাখ্যান করিল। রাজমহিষী তখন অনন্যোপায় হইয়া—

"মহামন্ত্র গিয়ান লইল হৃদয়ে জপিয়া।
চণ্ডী কালীরূপ হইল কায়া বদলিয়া॥"

রুদ্রচণ্ডীর মূর্ত্তি ধরিয়া হাতে তৈল পাটের খাঁড়া লইয়া ময়না যমদূত বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। তাঁহার রণরঙ্গিনী মূর্ত্তি দেখিয়া গোদার সাহস অন্তর্হিত হইল, ভয়ে পলায়ন করিয়া সে সরাসরি মহাদেবের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল—

"মহাদেব অইত ময়না গিয়ানে ডাঙ্গর।
কেমন করি আইনবেন রাজাকে যমপুরীর ভিতর॥"

মহাদেব বুঝিলেন ময়নামতী পতিপার্শ্বে থাকিতে কাহারও সাধ্য নাই যে রাজার প্রাণ বাঁধিয়া লইয়া আসে। সুতরাং মাণিকচাঁদের মৃত্যু ঘটাইতে হইলে সর্ব্বাগ্রে ময়নাকে স্থানান্তরিত করা দরকার। ইহা ভাবিয়া মহাদেব সব যম-দূতকে একত্র করিয়া প্রত্যেককে পৃথক পৃথক কাজের ভার দিলেন। আদেশ পাইয়া 'বাওথুকরা যম' বায়ুরূপে রাজার শয্যাগৃহে গিয়া চারিটি প্রদীপ নিবাইয়া চার কলসী গঙ্গাজল ঢালিয়া ফেলিল। 'ভাড়ুয়া যম' বিড়ালরূপ ধরিয়া ময়নার সংগৃহীত ঔষধগুলি ভক্ষণ করিল।

'নলুয়া যম' ব্রহ্মনলদ্বারা শ্বেত কূয়ার জল শুষিয়া লইল। 'হুতাশন' নামধারী যম সুযোগ দেখিয়া ঠিক এই সময় রাজার কণ্ঠে মরণ তৃষ্ণা জাগাইয়া তুলিল।

তৃষ্ণায় অস্থির হইয়া রাজা জল চাহিতেই দাসীরা জল আনিবার উদ্যোগ করিল; কিন্তু 'বুদ্ধি যম' রাজাকে বুদ্ধি দিল— ময়নার হাতে ভিন্ন জল খাইও না। অমনি রাজা বলিয়া উঠিলেন—

"এমনি যদি আমার প্রাণ যায় চলিয়া।
তবু বান্দির হাতের জল খাব না পালঙ্কে শুতিয়া ॥"

অগত্যা জল আনিবার জন্য সোনার ঝারি লইয়া ময়নাকেই যাইতে হইল। গিয়া দেখেন রাজ-প্রাসাদের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে বিন্দুমাত্র জল নাই, শ্বেতকূয়া পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ শুষ্ক; সুতরাং বাধ্য হইয়া ময়না গঙ্গাভিমুখে চলিলেন। যমদূতগণ প্রস্তুত হইয়াই ছিল, রাজপথে পা দিতেই তাহারা সকলে মিলিয়া রাজার হাত পা বাঁধিয়া বার মোকামে বার ডাঙ্গ বসাইয়া দিল। আর গোদা

"রাজার জিউ নিল লাংটিত বান্ধিয়া।
সোনার ভমরা হৈল যম কায়া বদলাইয়া ॥
যে মাটিতে জল ভরে ময়না হেট মুণ্ড হৈয়া।
মাথার উপর দিয়া জিউ নিগ্যাল বান্ধিয়া ॥"

ময়না নীচের দিকে মুখ করিয়া জল ভরিতেছেন গোদা যম ভ্রমরের রূপ ধরিয়া যে আকাশ পথে উড়িয়া যাইতেছে তাহা তিনি দেখিতে পান নাই। কিন্তু সে গঙ্গাদেবীর দৃষ্টি এড়াইতে পারিল না। ভ্রমররূপী গোদাকে দেখিয়াই গঙ্গা বুঝিতে পারিলেন যে মাণিকচাঁদের প্রাণ লইয়া সে পলাইতেছে। তখন গঙ্গা ময়নাকে ডাকিয়া বলিলেন—

"ওগো মা, যার জন্যে জল ভরো তুমি হেট মুণ্ড হৈয়া।
সে তোর দুলাল স্বামী গেল পার হৈয়া ॥"

ইহা শুনিয়াই ময়না চমকিত হইয়া কপালে করাঘাত করিতে লাগিলেন। তাঁহার শীর্ষের সিন্দুর এবং হস্তের শঙ্খ মলিন হইয়া আসিল। জল আনিবার জন্য কেন স্বামীকে ত্যাগ করিয়া আসিলাম— এই বলিয়া তিনি অনুতাপ

করিতে লাগিলেন। হায় হায় মুহূর্ত্তের ভুলে স্বামীকে চিরজীবনের মত হারাইলাম। পথে বাহির হইবার পূর্ব্বে কেন ভাবিয়া দেখি নাই যে রাজ মরণ পিপাসা আর কিছু নয়, যমেরই ছলনা মাত্র? এই ভাবে পতিশোকে কাতর হইয়া ময়না কিছুক্ষণ রোদন করিলেন কিন্তু অগৌণেই তাঁহার সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল, মনে মনে ভাবিলেন—এ আমি কি করিতেছি? শোকে অভিভূত হইয়া অনর্থক কালক্ষেপ করিতেছি কেন? যতক্ষণ নিজের প্রাণ আছে ততক্ষণ পতির প্রাণের আশা বিসর্জ্জন দিব না। স্বামীকে বাঁচাইবার জন্য আমার সকল শক্তি প্রয়োগ করিব। এতদিন ধরিয়া কি সাধনা করিলাম আজ তাহার পরীক্ষা হইবে। এই বলিয়া ময়না যমালয়ের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিছুদূর অগ্রসর হইতে না হইতেই দেখিলেন সম্মুখে এক বৃহৎ নদী। সে নদী প্রস্থে এত বড় যে একবার খেয়া দিতে হইলে অন্তত এক বৎসর সময় লাগে। নৌকা করিয়া যাইবারও উপায় নাই। এমন স্রোত যে এক খণ্ড তৃণ পড়িলে শতখণ্ড হইয়া যায়, তাহার উপর—

"এক এক ঢেউ উঠে পর্ব্বতের চূড়া"

মহাজ্ঞানের অধিকারীর পক্ষে এই সকল বাধা অতি তুচ্ছ। গুরু স্মরণ করিয়া এবং ধর্ম্মদেবের নাম লইয়া ময়নামতী অবলীলাক্রমে নদী পার হইয়া গেলেন। মন্ত্রপ্রভাবে পথের সকল বাধা অতিক্রম করিয়া রাণী যখন যমপুরীতে উপস্থিত হইলেন তখন সেখানকার সকলে ভয়ে নিজ নিজ ইষ্টদেবের নাম স্মরণ করিতে আরম্ভ করিল। গোদা যম নিশ্চিন্তমনে অন্তঃপুরে বসিয়াছিল, ময়নার আগমন-সংবাদ পাইয়া

"হাতে মাথে গোদাযম কাঁপিয়া উঠিল।"

বিপদ আসন্ন দেখিয়া গোদা প্রাণভয়ে একটা খড়ের স্তূপের অন্তরালে লুক্কায়িত হইয়া রহিল। ময়না জ্ঞানদৃষ্টির দ্বারা তাহা দেখিতে পাইয়া সর্পরূপ ধারণ করিলেন।

"চ্যাঁদা ঘোড়া হইয়া ময়না ঝম্প দিল।
চটকি যাইয়া গোদা যমের ঘাড়েতে বসিল ॥"

গোদা উপায়ান্তর না দেখিয়া মূষিকরূপ ধারণ করিয়া গর্ত্তের মধ্যে আত্মগোপন করিল। কিন্তু ময়নার হাতে নিস্তার নাই, তিনিও বিড়ালরূপ পরিগ্রহ করিলেন। গোদা যম যেরূপই গ্রহণ করে, ময়না তৎক্ষণাৎ তাহার ভক্ষকের আকৃতি ধারণ করেন। অবশেষে গোদার আত্মরক্ষার সকল চেষ্টা নিষ্ফল করিয়া ময়না তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। তাহার পর সে কি শাস্তি! হাত পা চর্ম্মরজ্জু দিয়া বাঁধিয়া তাহার মুখে ঘোড়ার লাগাম পরাইয়া—

"এক লম্ফ দিয়া গোদার পিঠেতে চড়িল।
লোহার মুদ্গর দিয়া ডাঙ্গাইতে লাগিল ॥"

প্রহারে জর্জ্জরিত হইয়া গোদা যম উচ্চৈঃস্বরে রোদন আরম্ভ করিল কিন্তু ময়নার হাত হইতে পরিত্রাণ করিবে কে? গোদার চীৎকারে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল কাঁপিয়া উঠিল কিন্তু কেহ সাহস করিয়া তাহার নিকটে আসিল না; তখন স্বয়ং মহাদেব আসিয়া নানা প্রবোধবাক্যে ময়নাকে শান্ত করিয়া বলিলেন যে, রাজার আয়ুষ্কাল ফুরাইয়া যাওয়ায় দেবতাগণের আদেশেই গোদা যম তাহার প্রাণপুরুষকে আনয়ন করিয়াছে। ইহাতে তাহার কোন অপরাধ নাই এবং বিধাতৃ-নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মে বাধা দেওয়া তাঁহার মত জ্ঞানসম্পন্না নারীর পক্ষে সঙ্গত নয়। তাঁহার পরামর্শে গোদা যমকে দণ্ড না দিয়া ময়নামতী বরং তাহাকে মুক্তি দিন। তাহা হইলে দেবতাগণ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন।

ময়না বুঝিলেন বিধাতৃনির্দ্দেশ অন্যথা করা অসম্ভব। সুতরাং মহাদেবের উপদেশ অনুযায়ী গোদাকে ছাড়িয়া দিলেন। দেবতাগণও সন্তুষ্ট হইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া ময়নাকে বিদায় দিলেন।

ময়নামতী যখন রাজবাটী ফিরিয়া আসিলেন তখন মাণিকচন্দ্রের পত্নীগণ

এবং জ্ঞাতিবর্গ শোকে মুহ্যমান হইয়া মৃতদেহ ঘিরিয়া বসিয়া আছেন। তখনও পর্য্যন্ত সৎকারের কোন উদ্যোগ আয়োজন হয় নাই। ময়না আসিয়াই লোকজন ডাকাইয়া শব তুলিবার ব্যবস্থা করিলেন। কীর্ত্তনিয়াগণ নামগান করিতে লাগিল, হরিধ্বনি সহকারে মাণিকচাঁদের মৃতদেহ গঙ্গাতীরে আনীত হইল। ময়নার অনুরোধে গঙ্গাদেবী মাঝদরিয়ায় বালুচর করিয়া দিলেন। সে বালুচরে চিতাশয্যা প্রস্তুত হইলে মাণিকচন্দ্রকে তদুপরি শায়িত করাইয়া সাধ্বী ময়না স্বয়ং তাঁহার পার্শ্বে শয়ন করিলেন। জ্ঞাতিগণ চিতার চতুষ্পার্শ্বে চন্দন কাঠ স্তূপাকার করিয়া সাজাইয়া তাহার উপর ঘৃত তৈল প্রভৃতি সহজ দাহ্য পদার্থ-সমূহ ঢালিয়া দিয়া দূরে সরিয়া আসিল। ময়নামতী তখন সকলের নিকটে শেষ বিদায় প্রার্থনা করিয়া স্বহস্তে চিতায় অগ্নি সংযোগ করিলেন, দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল। সাত দিন সাত রাত্রি ধরিয়া চিতা জ্বলিল, মর্ত্ত্যের ধূম স্বর্গে পৌঁছিল। এই হুতাশনের তাণ্ডবলীলা দেখিতে দেখিতে লোকে আহার নিদ্রা ভুলিয়া গেল।''

(ভারতবর্ষ— ১৩৪৮ বাং বৈশাখ, ৫৯৫-৬০০ পৃঃ)

ময়নামতী সহমরণের চেষ্টা করিলেন, কি আশ্চর্য্য অগ্নি তাঁহাকে দাহন করিতে সমর্থ হয় নাই—

''উত্যর (১) শিঅয়ে (২) রাজাক চুলিতে (৩) রাখিল।
রাজার বাম পাশে মুনি.(৪) আশোন করিল।।
চতুপাশে (৫) কাশ্‌ট (৬) তার দিল শাজাইয়া।
মুনির আগ্যাএ (৭) অগ্নি দিলেন জালিয়া।।
জ্বলিয়া উঠিল যখন ব্রহ্ম হুতাশন।
নিজনাম (৮) জপে মুনি করিয়া আশন।।

(১) উত্তর (২) শিয়রে (৩) শ্মশানের যে নির্দ্দিষ্ট স্থানে শবদেহে অগ্নি প্রদান করা হয় (৪) ময়নামতী (৫) চারিদিকে (৬) কাষ্ঠ, কাঠ (৭) আজ্ঞা (৮) ইষ্টনাম।

মাণিকচন্দ্র পুড়িয়া হইল ভস্বধূলি।
তিতাবস্ত্রে উঠে মুনি নৈঞা ভিজা চুল (৯)।
সপ্ত দিবা রাত্রি জদি হুতাশন জলে॥
কি করিতে পারে মুনির নিজ নামের বলে॥
অগ্নিতে পুড়িয়া রাজা হইল শংঙ্গার (১০)।
ম্রিকুলে চলিল মুনি পুত্র বুঝাইবার (১১)॥
গুপিচন্দ্র দেখিল আইল মা ও মুনি।
কান্দিতে লাগিল রাজা সঙ্গে চারি রানি॥"

(গোপীচাঁদের সন্ন্যাস— ৬, ৭ পৃঃ)

তন্ত্র-মন্ত্র চর্চ্চায় ময়নামতীর 'ডাকিনী' আখ্যা হইয়াছিল। জনসাধারণের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে ময়নামতী যমের শক্তির অতীত হইয়াছেন এবং দেবতাগণ তাঁহার আজ্ঞাবহ হইয়াছেন। গোরক্ষ নাথ প্রদত্ত মহাজ্ঞানপ্রাপ্তা ময়নামতীকে মহাদেব পর্য্যন্ত ভয় করিতেন। মহাদেব বলিতেছেন—

"মোর কথা কন যদি ময়নার বরাবর।
কৈলাস ভুবন মোর কৈর্ব্বে লণ্ডভণ্ড॥"

(মাণিকচন্দ্র রাজার গান)

সোহহং নাম। শিবনাম। যোগী বা যোগীনী সিদ্ধ হইলে বুঝিতে পারেন তিনি ও শিব অভিন্ন (৯) ময়নামতী স্নান করিয়া ভিজা বস্ত্রে আর্দ্র কেশে সহমরণের জন্য স্বামীর পাশে ছিলেন, অগ্নিকুণ্ড হইতে ঠিক সেই অবস্থায়ই উঠিয়া আসিলেন। (১০) সংহার (১১) কুমিল্লার নিকটে ময়নামতী লালমাই পাহাড়ে গোবিন্দচন্দ্রের রাজধানী ছিল। এ স্থান এবং ইহার সংলগ্ন স্থানকে ম্রিকল অর্থাৎ মেহেরকুল বলিত। এখানকার বর্ণনায় দেখা যাইতেছে, এখানে মাণিকচন্দ্রের মৃত্যু হয় নাই। তাহা হইলে তাঁহার রংপুরের রাজধানীতেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে বলিতে হইবে। বর্ণনায় আরও দেখা যাইতেছে মৃত সৎকারের পর পুত্রকে প্রবোধ দিবার জন্য ময়নামতী মেহেরকুলে আসিয়াছিলেন।

মাতা ময়নামতীর প্রতি সন্দিগ্ধমনা পুত্রের নানা পরীক্ষার কথা ও মাতা-পুত্রের তত্ত্বালোচনা গোপীচন্দ্রের পাঁচালীতে দৃষ্ট হয়। পুত্র মাতাকে প্রশ্ন করিতেছেন—

"কোন বিরিখের (১২) বোঁটা আমি মা কোন বিরিখের ফল।"

(গোপীচন্দ্রের পাঁচালী)

মাতা উত্তর দিতেছেন—

"মন-বিরিখের বোটা তুই তন্ (১৩) বিরিখের ফল ॥
গাছের নাম মহুহর, ফলের নাম রসিয়া।
গাছের ফল গাছে থাকে, বোটা পড়ে খসিয়া ॥
কাটিলে বাচে না কাটিলে মরে ;
তুই বিরিখের একটি ফল জাননি (১৪) সে ধরে ॥

(গোপীচন্দ্রের পাঁচালী)

গীতিকাব্যে গোরক্ষ নাথ

অনেক মন্ত্রে গোরক্ষ নাথের দোহাই আছে। তাঁহার আজ্ঞায় হলাহলের জ্বালাও দূর হয়। সদাশিবের আজ্ঞার মত গোরক্ষ নাথের আজ্ঞা স্থাবর-জঙ্গম ভূত-প্রেত দৈত্য-দানবেরাও মানিয়া চলিত। আজকাল শিক্ষিত সম্প্রদায় ভূত-প্রেতের অস্তিত্বে বিশ্বাস হারইয়া ফেলিয়াছে। আধুনিক শিক্ষিত সমাজ এবং আধুনিক ভাবাপন্ন জনসাধারণ মন্ত্রে-তন্ত্রে বিশ্বাস হারাইলেও পল্লীর অসহায় গৃহস্থ ও রাখালগণ গোরক্ষ নাথকে গো-রক্ষাকারী দেবতা বলিয়া আজও বিশ্বাস করে।

গোরক্ষ নাথের কৃপায় গরু বাঁচে, গাই বিয়ায়। অগ্রহায়ণে গোবৎসের নর্ত্তনে কৃষকের প্রাঙ্গণ আনন্দে ভরিয়া উঠে। সুতরাং অসহায় কৃষকেরাই গোরক্ষ নাথের ধার ধারে। বৈশাখে স্বীয় গাভীর দুধে ক্ষীরের লাড্ডু করিয়া

(১২) বৃক্ষের (১৩) স্তন (?) (১৪) জননী (?)

প্রত্যেক গৃহস্থ গোরক্ষ নাথের পূজা দেয়। একমাত্র ক্ষীরের লাড়ুই এই পূজার উপকরণ। রাখালেরাই এই পূজার পুরোহিত, 'হেচ্চ' ইহার বীজমন্ত্র। যদিও 'পরথম' বৈশাখেই পূজার কথা, ইহার বীজমন্ত্রে পাওয়া যায়, তথাপি বৈশাখের যে কোনও দিন সন্ধ্যাকালে পূজা করা হয়। সন্ধ্যাকালে সকল রাখাল সর্দ্দারের বাড়ীতে সমবেত হইয়া, একজন রাখাল গোরক্ষ নাথের 'রণা' গাহিতে থাকে। 'রণা'র এক একটি চরণ বলা হইলে সকল রাখাল সমস্বরে 'হেচ্চ' বলে। 'রণার' পর 'নাচাড়ী' গাওয়া হয়। এই 'রণা' ও 'নাচাড়ী'ই গোরক্ষ নাথের পূজা ও বিসর্জ্জনের মন্ত্র। 'রণা' গান আরম্ভের পূর্ব্বেই রাখালগণ সম্মুখের একখানি পিড়ির উপর গরুর এক গাছি 'দড়ি' ও একটি 'লড়ি' রাখেন। এই গোরক্ষ দেবতার প্রতিমা। গান শেষ হইলে কতকগুলি ক্ষীরের লাড়ু গোরক্ষ নাথের উদ্দেশ্যে আড়াইবার মাটীতে ফেলিয়া দেওয়া হয়। তারপর প্রসাদ স্বরূপ সব লাড়ু রাখালেরা খায়। লাড়ু খাওয়া শেষ হইলে একজন ব্যতীত সকল রাখাল গোয়াল ঘরে প্রবেশ করে এবং 'আব্বো' দেয়। মুখ অল্প ফাঁক করিয়া 'অ-ও' শব্দ করিতে করিতে হাতের তালু দিয়া মুখের উপর ধীরে ধীরে আঘাত করিলে যে শব্দ হয়, তাহাই 'আব্বো' দেওয়া। গোয়াল ঘরে রাখালেরা 'আব্বো' দিলে বাহিরে দণ্ডায়মান রাখাল জিজ্ঞাসা করে—

"তোরা কে? আমরা গোরখের রাখাল।"
"গেছিলি কোথায়? গাইবাছুর আশীর্ব্বাদ করতে।"
"দেখলি কি কি? বার শ বলদ, তের শ গাই।"

গোরক্ষ নাথ ঠাকুরকে কৃষকেরা ভয় ও ভক্তি করে। ইনি রুষ্ট হইলে গরু-বাছুরের অকল্যাণ হইবে বলিয়া তাহাদের দৃঢ় ধারণা। এসব স্থলে গোরক্ষ নাথের যোগী মূর্ত্তির বিশ্লেষণ নাই। এখানে তিনি কৃষকদের ঠাকুর। ছড়ায় আছে—

"তোমার গোরখ কেমনে চিনি (?) হেচ্চ।"
"হাতে লড়ী মাথায় টিকি .... হেচ্চ।"

অন্য ছড়ায় আরও দেখা যায়—

"গোয়াল ভাই, গোয়াল ভাই
আমার গোরখর সিন্নি দেওয়া চাই।
তোমার গোরখেরে চিনি কি ভায়?
হাতে হুলা মাথায় টুপ
এইলা আমার গোরক নাথ ঠাকুর।"

* * * * *

রাখুয়াল মেল * * * কালা নারে ধলা,
মায় মানডে গোরখের সিন্নি সাতছড়ি কলা।
সাতছড়ি কলা নারে সাত গাইয়ের দুধ—
গোরখ নাথে'র কৃপায় বাচ্যা উঠে মায়ের মরা পুত।"

* * * * *

আসল গোরখ্ নাথ ... ... হেচ্চ।
বসল পাটে ... ... হেচ্চ।
হাতে হাতে ... ... হেচ্চ।
প্রসাদ বাটে ... ...হেচ্চ।

গোরক্ষ নাথের পূজার আর এক প্রকার মন্ত্র—

গোরক লাই গোরক লাই।
কবলী গাইয়ের দুগ্ধ খাই।
দুগ্ধকটি লড়ে চড়ে।
সাত রাখুয়াল পইড়া মরে।

* * * * *

সাত রাখুয়াল জিইল (১) আমার গোরক নাথের পুইনে (২)।

---

(১) জীবিত হইল, (২) পুণ্যবলে।

কাছাড়, শ্রীহট্টের গ্রাম্য ছেলেরা কার্ত্তিক মাসে দলবদ্ধ ভাবে প্রাতে ও সন্ধ্যায় নিম্নের গাথা গাহিয়া ভিক্ষা করিত। গাথা একটি ছেলে গাহিত ও অন্যান্যেরা সমস্বরে আবৃত্তি করিত—

"গোরা নাথরে গোরা নাথ,
গোরা নাথে দিলে বর—
এই ঘর সবন্নি থর।" ইত্যাদি

গোরা নাথ, গোরক্ষ নাথের নামান্তর। ছড়ায় বলা হইতেছে গোরক্ষ নাথের আশীর্ব্বাদে ঘর স্বর্ণপূর্ণ হয়। আদিনাথ সম্বন্ধীয় ঠিক ঐ জাতীয় ছড়াও গীত হইত।

"রাইক মান জানি হরি সাজল
অদ্ভুত যোগিক রঙ্গ।
* * * * * *
জয় জয় গোরখ নাথ বলি নাগর
জটিলা দ্বারহিঁ পাই।
যোগি ভোগি বলি করু অন্বেষণ
চন্দ্রশেখর বলি যাই।
গোরখ জাগাই শিঙ্গাবর কর তহিঁ
(শ্রীশ্রীসঙ্কীর্ত্তনামৃত—১৩৮ পৃঃ, পদ সংখ্যা,৪০৬, ৪০৭)

গোবিন্দ দাসের একটি পদে আমরা পাই—

"গোরখ জাগাই শিঙ্গাধ্বনি শুনাইতে জটিলা ভিক আনি দেল।"

'গোরখ জাগাই' অর্থাৎ গোরক্ষ নাথ জাগ্রত হও। বর্ত্তমানকালে বৈষ্ণবেরা 'হরে হরে, রাধে রাধে, জয় গৌরনিতাই প্রভৃতি বাক্য উচ্চারণ করিয়া ভিক্ষা করেন। প্রাচীন আমলের সাধু সন্ন্যাসীরা 'গোরখ জাগাই' বলিয়া শিঙ্গাধ্বনি করতঃ ভিক্ষা করিতেন। এ ভাবে পূর্ব্ব ভারতের পল্লী গোরক্ষ নাথের নামে

মুখরিত হইত। গোলক ধাঁধাঁ শব্দটি গোরক্ষের সাঙ্কেতিক ভাষার পদাবলী গোরক্ষ ধন্দা হইতে উৎপত্তি বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন।" (নাথপন্থ—৪৪ পৃঃ)

"কানে পরি কুণ্ডল চলিব যোগী হৈয়া।"

(চৈতন্য-ভাগবত, মধ্যখণ্ড, ২৬শ অধ্যায়)

"মহীপাল যোগীপাল গোপীপাল গীত।
ইহা শুনিয়া যত লোক আনন্দিত।"

(চৈতন্য-ভাগবত)

মহীপাল ও যোগীপালের গীত প্রচলিত আছে কি না জানি না। কিন্তু গোপীপাল বা গোবিন্দচন্দ্রের গীত সমগ্র ভারতে এমন কি তিব্বতীয় আখ্যানেও বিশেষভাবে সমাদর লাভ করিয়াছে।

এ সব নাথদের বিরুদ্ধবাদী নানা ধর্ম্ম সম্প্রদায়ে গোরক্ষ নাথের যথেষ্ট প্রভাবের পরিচায়ক।

গোরক্ষ নাথের যোগৈশ্বর্য্যের কথা

নাথদের মধ্যে গোরক্ষ নাথই বিশেষরূপে প্রসিদ্ধ। তাঁহার সম্বন্ধে ভারতের সর্ব্বত্র অদ্ভুত অদ্ভুত প্রবাদ প্রচলিত আছে। প্রসিদ্ধ প্রবাদগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

গোরক্ষ রাজ্যের তিনি মঙ্গল-দেবতা ছিলেন। পরে নেপাল রাজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া নেপাল রাজ্য মৎস্যেন্দ্রের অধিকার হইতে চ্যুত করেন।

রাইট সাহেব তাঁহার নেপালের ইতিহাসে (পৃঃ ১৪০) লিখিয়াছেন, নেপালে প্রবাদ আছে যে, গোরক্ষ নাথ জলের সমস্ত উৎপত্তি স্থান বন্ধ করিয়া দিয়া ১২ বৎসর অনাবৃষ্টির সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তবে জলের মুখ ছাড়িয়া দিবার পদ্ধতি অন্যরূপ (Sylvain Levi, Le Nepal, i, pp 348, 351)

রাজা রসালু পাঞ্জাবের একজন বীর। সিয়ালকোটের রাজা শাল বাহন দুইটী বিবাহ করেন। এক পত্নী রাণী লোনান সপত্নীপুত্র পুরাণের প্রতি আসক্ত হন। কিন্তু পুরাণ তাঁর অভিলাষ পূর্ণ না করায় রাণী তাঁর শাস্তি বিধান করেন। তাহাতে পুরাণের হাত পা কাটিয়া ফেলা হয়। কিন্তু গোরক্ষ নাথের কৃপায় পুরাণ সারিয়া গিয়া ফকির হন। গোরক্ষের প্রসাদে রসালুর জন্ম হয়। রসালু ও শ্রীসিয়ালপতি এক ব্যক্তি বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে (R. C. Temple— Punjab Legends, i, 1, Stel, p 247)

গুঁগা পীর। গুঁগা পীরের বাপ তাঁহার পত্নীকে তাড়াইয়া দেন। পত্নী গোরক্ষ নাথের নিকট কয়েকটি মরিচ পান। গোরক্ষ নাথ তাহা দুধের সঙ্গে মিশাইয়া খাইতে বলেন। তাহা খাইয়া গুঁগার জন্ম হয়, ইঁহার পিতার ঘোটকীও দুধ ও মরিচের পাত্র লেহন করিয়া গর্ভবতী হয়। গুঁগার মাসীও দুইটী যব পাইয়াছিলেন। তাহাতে দুইটী পুত্র প্রসব করেন (North Indian Notes and Queries)

সিদ্ধা গোরক্ষ নাথ যখন কামাখ্যায় গিয়াছিলেন, তখন এক দুষ্টা স্ত্রী ভিক্ষা মাগিতে মাগিতে গোরক্ষ নাথের এক গরীব চেলার নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং তাহাকে নিজের কাছে আটকাইয়া রাখে। গোরক্ষ নাথ রাগিয়া সেই রাজ্যের সকলকে পাথর করিয়া দিলেন। তখন সেখানকার রাজা কাঁদিয়া তাঁহার চরণে পতিত হইলে কৃপা করিয়া সকলকে উদ্ধার করিলেন।

ক্রুক্‌স্ সাহেব অনেকগুলি আখ্যায়িকার অবতারণা করিয়া বলিয়াছেন যে, প্রবাদ অনুসারে তিনি সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন ছিলেন। এমন কি তিনি ব্রহ্মার প্রতি-দ্বন্দ্বী হইয়া মানবের ভাগ্যও পরিবর্ত্তন করিতে পারিতেন। গ্রিয়ার্সন বলিয়াছেন যে, কখনও কখনও তাঁহাকে শিবের চেয়ে বড় বলিয়া দেখান হইয়াছে (J. A. S. B. pt I, 1878, p 139)। বুকানন হামিলটন গোরক্ষ নাথের অলৌকিক শক্তির উদাহরণ দিয়াছেন (Mont Martin's Eastern India, ii, p 484)

গন্ধর্ব্ব রাজার কন্যা অমর স্বামী লাভের জন্য শিবের আরাধনা করিয়াছিলেন। তাহার ফলে—

"সেবক বৎসল হর কৃপাএ বলিলা।
গোর্খনাথ স্বামী করি তাকে বর দিলা ॥
* * * *
শিবের বচনে কন্যা বরিলেক জাই (১) ॥
স্বামী পাইয়া বিরহিনী চলি য়াইল (২) ঘর।
নাথেরে লইয়া গেল মন্দির ভিতর ॥
যতি সতী গোর্খনাথ জ্ঞানে কৈল ভর।
ছয় মাসের শিশু হইল মন্দির ভিতর ॥
দুগ্ধ খাইবারে চাহে কান্দে ওয়া ওয়া।
তা দেখিয়া রাজকৈন্যা হইল আচাভুয়া ॥ (৩)
ভাল স্বামী পাইল (৪) দুগ্ধ খাইবারে চাহে।
শুনি কি বলিব মোরে বাপ আর মাও (মাএ) ॥ (৫)
হাসিব সকল লোক কি করিলুম কাজ।
বর না পাইলম মুই (৬) পাইলুম বড় লাজ ॥" (৭)

(গোরক্ষবিজয়— ৩৫, ৩৬ পৃঃ)

"স্তন খাইতে চাহে শিশু কান্দে হোয়া হোয়া।
তা দেখিয়া রাজকন্যায় বলে আচাভুয়া ॥
ভাল স্বামী পাইল আমি দুগ্ধ খাইতে চায়ে।
শুনি কি বলিব মোর বাপে আর মায়ে ॥"

(মীনচেতন— ৮ পৃঃ)

---

(১) স্বামী বরণ করিলেন। (২) আসিল (৩) চমৎকৃত ? (৪) পাইলাম। (৫) পিতা এবং মাতায়। (৬) আমি। (৭) বড় লজ্জা পাইলাম।

দুঃখে লজ্জায় রাজকন্যা বিলাপ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। গোরক্ষ নাথ রাজকন্যার বিলাপের উত্তরে বলিতেছেন—

"স্ত্রী পুরুষ নহি আহ্মি নাহি বীর্য্য বল।
শুখনা জে কাষ্ঠ মোর শরীর সকল।।
গন্ধহীন পুষ্প আমি মান্দারের ফুল।
শরীরেত রস নাহি কাঠা (৪) সমতুল।।"

(গোরক্ষবিজয়— ৩৭, ৩৮ পৃঃ)

তারপর গোরক্ষ নাথের নির্দ্দেশে তাঁহার লেংটী ধুইয়া জল পান করায় রাজকন্যা পুত্ররত্ন লাভ করেন।

গোখের্র বচন কন্যা শিরেতে বাধিয়া।
কর্পটি পাখালি পানি খাইলেক (৫) গিয়া।।
গোখের্র কর্পটি ধুই খাইলেক পানি।
সেইখনে গর্ভবতী হইল কন্যাখানি।।
দশ দণ্ড পশ্চাতে ছাওয়াল (৬) জন্মিল।
সর্ব্ব অঙ্গে সিদ্ধার ভেস সাক্ষাতে দেখিল।।"

(গোরক্ষবিজয়— ৩৮, ৩৯ পৃঃ)

'কর্পটি' ধৌত জল পান করায় ইঁহার জন্ম হয়। সে জন্য ইঁহার নাম কর্পটী নাথ রাখিয়া, এবং ইহার কানে মন্ত্র দিয়া গোরক্ষ নাথ চলিয়া গেলেন।

কদলীর মায়ামুগ্ধ হইয়া মীন নাথ রাজসিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। তিনি আবার মায়াজাল ছিন্ন করিতে পারিবেন কি না পরীক্ষা করিবার জন্য গোরক্ষ নাথ, মীন নাথের পুত্র বিন্দু নাথকে হত্যা করিয়া আবার প্রাণ দান করিয়াছিলেন। শোকাতুর মীন নাথ বলিতেছিলেন :—

---

(৪) কাঠ। (৫) পান করিলেন। (৬) ছেলে।

"কাল রূপে আইলা (৭) গোর্খ মোর মোনে লএ (৮)।
বৃদ্ধকালে পুত্রশোক শরীরে না সএ (৯)॥
কান্দিতে কান্দিতে নাথ হৈল অচেতন।
উদ্দেসিয়া (১০) গোর্খে কিছু বলিলা বচন॥
আমি হই শিষ্যপুত্র (১১) তুমি মহাজন।
জীয়াইমু (১২) আপন ভাই মারিছি যখন॥
স্থন পুত্র গোর্খনাথ বচন নির্ঘাৎ।
কিরূপে জীয়াবা (১৩) কহ বিন্দক জে নাথ॥
এ বলিয়া মীননাথ উচ্চস্বরে কয়।
স্তুতি ভক্তি করি কহে গোর্খমহাশয়॥
কেবা মারে তোহ্মার পুত্র কেন মর তুহ্মি।
মারিছি আহ্মার ভাই জিয়াই দিমু (১৪) আহ্মি॥
তা স্থনিয়া মীননাথ মেলিল নয়ান।
য়ান য়ান (১৫) বলি তবে বলিল বচন॥
যান্ত কথায়াহুতি গোর্খে মারে তুড়ি।
উড়িয়া বসিল ম্রেতা (১৬) জীবন সঞ্চারি॥
পুত্র পাইয়া মীননাথ কোলে তুলি লইল।
জতিজতি করি মীনে গোর্খেরে বাখানিল॥

(গোরক্ষবিজয়— ১৮৫,১৮৬ পৃঃ)

একদিন স্বয়ং ভগবতী দুর্গাদেবী তাঁহার কামরূপিণী সজ্জায় সজ্জিতা হইয়া গুরু গোরক্ষ নাথের ব্রহ্মচর্য্য প্রভাব পরীক্ষার জন্য গমন করিলেন—

---

(৭) আসিল। (৮) লয়। (৯) সহ্য হয় না। (১০) উদ্দেশ্য করিয়া। (১১) শিষ্য পুত্রতুল্য। (১২) জীবন দান করিব। (১৩) জীবিত করিবা। (১৪) জীবন দান করিব। (১৫) আন আন। আনয়ন কর। (১৬) মৃতা।

"এমত ভাবিয়া দেবী করিল গমন।
বিবস্ত্র হইয়া দেবী দিল দরসন ॥
পন্থেতে সুতিলা (১) দেবী বিবস্ত্র হইআ।
উর্দ্ধমুখী দুই জানু প্রকাশ করিআ ॥
সেইদিগে গোর্খে যদি চাহিতে লাগিলা।
শিবের ঘরিণী (২) দেবী সাক্ষাতে দেখিল ॥
বিবসন (৩) দেখি তানে (৪) মনেত ভাবিল।
অতি বড় লঘু বেটি কি কর্ম্ম করিল ॥
আস্তে আস্তে উঠি তবে গোর্খ গেল ধাইয়া।
ঢাকিল যোনির দ্বার গাছের পত্র দিয়া ॥
ততক্ষণে গোর্খনাথ হইল অন্তধ্যান (অন্তর্দ্ধান)।
লজ্জা পাইয়া দেবী গেল আপনার স্থান ॥"

(গোরক্ষবিজয়— ৩১ পৃঃ)

ভগবতী ছাড়িবার পাত্রী নহেন। তিনি আবার মাছির রূপ ধরিয়া গোরক্ষের নিকট গিয়া তাঁহার পেটের ভিতর প্রবেশ করিলেন। "ধ্যানেতে জানিল নাথ দেবীর এই কর্ম্ম" (৩২ পৃঃ)। গোরক্ষ নাথও ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি—"তালি দিয়া বৈসে নাথ দশমী ত্তে দ্বার (দ্বারে)" (৩২ পৃঃ)। এইবার ভগবতী দুর্গাদেবীর উপায় নাই। নিজশক্তি বলে তিনি আর বাহিরে আসিতে পারিলেন না, ফলে—

"পথ এড়ি (৫) দেয় মোরে চলি জাম (৬) ঘরে ॥
বড় ক্লেস পাই আহ্মি তোহ্মার উদরে।"

(গোরক্ষবিজয়— ৩২ পৃঃ)

---

(১) শয়ন করিলেন। (২) গৃহিণী। (৩) উলঙ্গ। (৪) তাঁহাকে (৫) ছাড়িয়া। (৬) চলিয়া যাইব।

দেবীর অনুনয় বিনয়ে গোরক্ষ নাথ তাঁহার মার্গপথে দেবীকে বাহির হইবার সুযোগ দিলেন—

"মার্গপথ এড়ি দিল বাহের হইবার ॥"

(গোরক্ষবিজয়— ৩২ পৃঃ)

বঙ্গভূমি গুরু গোরক্ষনাথের প্রধান কার্য্যক্ষেত্র ছিল বলিয়া অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা—

"গোর্খ নাথ চলি গেল বঙ্গনিকেতন ॥"

(মীনচেতন)

গোরক্ষবিজয়ে দেখা যায় তিনি বার বার বিজয়নগর ও বকুলতলায় গমনাগমন করিয়াছেন। জনাব আবদুল করিম, সাহিত্য-বিশারদ রাজসাহীর বিজয় সেনে রাজধানী বিজয়নগরকে উক্ত বিজয়নগর বলিয়া অনুমান করেন (গোরক্ষবিজয়—ভূমিকা, ২৫ পৃঃ)। প্রত্নপ্রেমিক শ্রীরাজমোহন নাথ আসামের নওগাঁ জিলা বকুলিয়াকে উক্ত বকুলতলা বলিয়া মনে করেন (কদলীরাজ্য— ৩৮ পৃঃ)।

অখণ্ড বাঙ্গালা দেশের চারিটি স্থানে গুরু গোরক্ষ নাথের চারিটি সাধনপী থাকারও প্রমাণ আছে—

"আত্মমাটী আছে কিছু মেহারকুল নগরে।
নিজ মাটি আছে কিন্তু বিক্রমপুর সহরে ॥
আর আছে আত্মমাটী তরপের দেশ।
চাটিগ্রাম পূর্ব্ব মাটি জানিবা বিশেষ ॥"

(ময়নামতীর পুঁথি)

বর্ত্তমান পাকিস্থানের ত্রিপুরা জিলার কুমিল্লার পাঁচ মাইল পশ্চিমে লালমা পাহাড়। এই পাহাড়ের উত্তর অংশের নাম ময়নামতীর টীলা। ময়নামত টীলার পূর্ব্বাংশ জুড়িয়া মেহারকুল পরগণা। ইহাই মেহারকুল নগর (গো চাঁদের সন্ন্যাস—সম্পাদকীয় মন্তব্য, ১০ পৃঃ)। ঢাকা জিলার 'বিক্রমপুর' এ

শ্রীহট্ট জিলার 'তরপ' সর্ব্বজন-সুপরিচিত, এবং 'চাটিগ্রাম' যে বর্ত্তমান 'চট্টগ্রাম' তাহাও নিঃসন্দেহে বলা যায় (গোরক্ষবিজয়— ভূমিকা, ২৫ পৃঃ)।

বর্ণনা হইতে বুঝিতে কষ্ট হয় না যে বিক্রমপুরই গোরক্ষ নাথের বিশেষ প্রিয় স্থান ছিল। "মেহেরকুল নগরে" গোরক্ষ নাথের একটি সাধনপীঠ ছিল সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকা উচিত নহে। বিক্রমপুর ও তরপের কোন্ স্থান গোরক্ষ নাথের সাধনপীঠ ছিল তাহা অনুসন্ধান করা আবশ্যক। চট্টগ্রামের কক্স বাজারের সন্নিহিত সমুদ্রের মহেশখালি দ্বীপের আদিনাথ তীর্থে উক্ত সাধন-পীঠ ছিল বলিয়া অনুমিত হয়।

গুজরাট, লাহোর, কটক, বোম্বাই, আগরা ও মহারাষ্ট্রে প্রচলিত গাথা

বাঙ্গালার বাহিরে গোপীচাঁদের কথা এইরূপ—গোপীচাঁদ বাঙ্গালাদেশের রাজা ছিলেন। ভর্ত্তৃহরির ভগিনী মৈনামতি ইঁহার মাতা। গোরক্ষ নাথ যখন ভর্ত্তৃহরিকে জ্ঞানোপদেশ দিয়াছিলেন, তখন ময়নামতীও গোরক্ষ নাথের নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন এবং গোরক্ষ নাথের কৃপায় তিনি বুঝিতে পারিয়া-ছিলেন যে, সংসারে আবদ্ধ জীবের নিস্তার নাই। বাঙ্গালার রাজার সহিত ময়নামতীর বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার এক পুত্র গোপীচন্দ্র ও কন্যা চন্দ্রাবলী। পিতার মৃত্যুর পর গোপীচন্দ্র বাঙ্গালার রাজা হইয়াছিলেন। তিনি বিলাসে মাতিয়া উঠায় ময়নামতী গোপীচন্দ্রকে ডাকিয়া বলিলেন যদি অমর হইতে চাও তবে জালন্দর নাথের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া কদলী বনে চলিয়া যাও। মাতার উপদেশানুসারে গোপীচাঁদ সিদ্ধ হইলেন ও ভগ্নী চন্দ্রাবলীকেও সিদ্ধ করিলেন।

গোরক্ষপন্থীদের মধ্যে প্রথা আছে যে সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বে গুরুর আজ্ঞা লইয়া নিজ ঘরে গিয়া নিজের স্ত্রীকে মা বলিয়া সম্বোধন করতঃ ভিক্ষা চাওয়া,

এবং স্বামীকে—'পুত্র, ভিক্ষা লও' বলিয়া স্ত্রীর ভিক্ষা দেওয়া। এভাবে ভিক্ষা লইয়া গুরুর নিকট গেলে, তখন গুরুর বিশ্বাস হয় যে শিষ্য যোগসাধনে সমর্থ হইবে। গোপীচন্দ্র এভাবে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এ সময় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে আলাপ আলোচনা হইয়াছিল তাহা অবলম্বন করিয়া নানা গীতিকাব্য রচিত হইয়াছে। লোকমুখে নানাস্থানে গীত হইয়া এগুলির অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

মহারাষ্ট্রের প্রবাদ অনুসারে ত্রৈলোক্যচাঁদের পুত্র গোপীচাঁদ (১) গৌড়বঙ্গের রাজধানী কাঞ্চননগরে রাজত্ব করিতেন—

"গৌড় বংগাল দেশী নিশ্চিত
কাঞ্চনগর আসে কীঁ।
তে থেঁ ত্রৈলোক্যচন্দাচা সুত।
গোপীচন্দমী রাজা নিশ্চিত ॥"

রাজমাতা মৈনাবতী একদিন গবাক্ষ দিয়া দেখিলেন এক দিব্যমূর্ত্তি সন্ন্যাসী বিক্রয়ের জন্য মাথায় করিয়া কাঠের বোঝা লইয়া যাইতেছেন। সন্ন্যাসীর নাম জলন্দর। তাঁহার মূর্ত্তি দেখিয়া রাজমাতা তাঁহার শিষ্যা হইলেন। একদিন রাজা যখন রাজমহিষীদের সহিত প্রমোদে মত্ত, এমন সময় তাঁহার শরীরে উষ্ণ জলবিন্দু পড়িল। ইহা তাঁহার মাতার অশ্রুবিন্দু জানিয়া তিনি মাতার নিকট গিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করায়, মাতা পুত্রকে আত্মার উদ্ধারের জন্য জালন্দর নাথের শিষ্যত্ব গ্রহণের উপদেশ দিলেন। ইহাতে রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া জলন্দর নাথকে স্তূপীকৃত গোময়ের মধ্যে পুতিয়া ফেলিলেন। জলন্দরের প্রিয় শিষ্য কানুপা গুরুর অন্বেষণে বাহির হইয়া

(১) গোপীচাঁদের পিতা মাণিকচাঁদ। ময়নামতীর পিতার নাম তিলকচাঁদ। এই তিলকচাঁদকেই ভুলক্রমে গোপীচাঁদের পিতা ত্রৈলোক্যচাঁদ বলা হইয়াছে।

এ রাজ্যে আসিলেন। মৈনাবতী তাঁহাকে গুরুর খবর জিজ্ঞাসা করিলে কানুপা বলিলেন তোমার পুত্র গুরুকে গোময় স্তূপে পুতিয়াছেন। মৈনাবতী রাজাকে জলন্দরের প্রভাবের কথা জানাইলে গোপীচাঁদ ভীত হইয়া জলন্দর নাথের স্মরণ লইলেন।

কিছুদিন পরে সে রাজ্যে মাচ্ছেন্দ্র নাথ ও গোরক্ষ নাথ আসিলেন। কানুপা তাঁহাদের সঙ্গে রাজার পরিচয় করাইয়া দিলেন। মাচ্ছেন্দ্র নাথ রাজা ও রাজমাতার অনুরোধে জালন্দরের ক্রোধাগ্নি হইতে রাজাকে রক্ষা করিতে সম্মত হইলেন। স্বর্ণ, রৌপ্য ও লৌহের তিনটী অবিকল রাজমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া গোময় স্তূপের নিকট রাখা হইল। তারপর এ সব মূর্ত্তির পিছন হইতে জলন্দরকে ডাকিবার জন্য রাজাকে আদেশ করিলেন। রাজার তিনবার আহ্বানে তিনটি মূর্ত্তি ভস্মীভূত হইয়া গেল। এ সব দেখিয়া রাজা এত ভীত হইলেন যে চতুর্থবার ডাকিতে তাঁহার আদৌ সাহস হইল না। মচ্ছেন্দ্র নাথের আদেশে সাহসে ভর করিয়া আহ্বান করিতেই জলন্দর বলিলেন— এখনও বাঁচিয়া আছ কি? রাজা উত্তর দিলেন ইহা তাঁহারই আশীর্ব্বাদ। জলন্দর তাঁহাকে চিরজীবী হইবার আশীর্ব্বাদ দিলেন।

রাজা তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে চাহিলে জলন্দর নাথ বলিলেন— তুমি রাজার ছেলে, সন্ন্যাসের কঠোর নিয়ম পালন করিতে পারিবে কি?

রাজা উত্তর দিলেন—

"সেজ পলঙ্কে আগ লগাবু গুরুজী
সুখে করু বনডা কেবাঁ রাজ জী।"

অর্থাৎ সজ্জা ও পালঙ্কে আগুন লাগাইয়া দিয়া সুখে বনে রাজত্ব করিব।

রাজার দৃঢ়তা দেখিয়া জালন্দর নাথ তাঁহাকে দীক্ষা দিতে সম্মত হইলেন। এখন সন্ন্যাসের প্রচলিত নিয়ম অনুসারে মুণ্ডিত মস্তক, গৈরিক পরিহিত রাজার

স্বীয় প্রিয়তমা রাণীকে মাতা সম্বোধন করিয়া ভিক্ষা চাহিবার পালা আসিল। রাণী অশ্রুপূর্ণ নেত্রে গদ গদ কণ্ঠে বলিলেন—

"ভুল্যোরে ভুল্যোরে রাজা
সতরে গোপী চন্দন
পীয়া! পরদেশে ন জতাঁ এজী।"

অর্থাৎ সত্যই কি রাজা গোপীচন্দ্র আমাকে ভুলিলে? প্রিয়! বিদেশে যাইও না।

কিন্তু রাণীর অশ্রুধারা রাজার হৃদয়কে গলাইতে পারিল না।

"এরে সে জড়িয়ে মুজকে নিদরানা আবেনে
মায়ে মনে রাজ না ভাবে এজী॥"

অর্থাৎ এই শয্যায় আমার নিদ্রা হয় না; আমি এ রাজ্য চাহি না।

রাজা পরমার্থের জন্য বিরাট বিষয়ার্থ বিসর্জ্জন দিলেন।

এ দুঃখ রাণী ব্যতীত আর কে বুঝিবে (?)—

"কোন কোন রাজা তোরী সঙ্গমে চলে গীনে
কোনরে করেগী দো দো বাঁতা হোজী
কোন কোন রাজা তোরী চরণ পখালশেনে
ক্যাঁরে জমশো দুধনে ভাতা হোজী।"

অর্থাৎ রাণী বলিতেছেন রাজা! তোমার সঙ্গে কে কে যাইবে? কে তোমার সঙ্গে কথা কহিবে? তোমার চরণ কে ধোয়াইয়া দিবে? এবং কে তোমাকে দুধ ভাত খাওয়াইবে?

রাজা উত্তর দিলেন—

"ধনীনে পানী মোরী সঙ্গমে চলে গীনে
রেন করেগী দো দো বাতা হোজী

গঙ্গানে যমুনা মারা চরণ পখালশেনে
ঘের ঘের দুধনে ভাতা হোগি ॥”

অর্থাৎ ধুনী এবং জল আমার সঙ্গে যাইবে। রাত্রি আমার সঙ্গে কথা কহিবে। গঙ্গা এবং যমুনা আমার চরণ ধৌত করিবে এবং বাড়ী বাড়ী দুধ ভাত খাইব।

তৎপর রাজা স্ত্রীকে 'মা' সম্বোধন করিয়া ভিক্ষা চাহিলে রাণী—'পুত্র, ভিক্ষা লও' বলিয়া এক মুষ্টি ভিক্ষা দিলেন।

ক্রন্দনধ্বনি উঠিল। রাজ্যময় হাহাকার পড়িল। এখনও গুজরাটের জনসাধারণের বিশ্বাস গোপীচাঁদ অমর। বঙ্গেশ্বর গোপীচাঁদের কথা বাঙ্গালীরা ভুলিতে বসিয়াছেন, কিন্তু ভারতবর্ষ শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাকে স্মরণ করিতেছে। এখনও গুজরাটের বাউল সম্প্রদায় একতারাযোগে জলন্দর নাথ, ময়নামতী ও গোপীচাঁদের গান গাহিয়া জীবিকার সংস্থান করে। ইঁহাদের কথা প্রাদেশিক ভাষায় সঙ্গীত ও কাব্যের উপাদান যোগাইয়াছে। বহু পশ্চিম ভারতীয় রঙ্গালয়ে ইঁহাদের অদ্ভুত কীর্ত্তির অভিনয় দর্শকসমাজকে চমৎকৃত করিতেছে।

আজও গুজরাটের স্ত্রীলোকেরা দুর্গাপূজার নবরাত্রির সময় এ সব গান গাহিয়া থাকে। বহু ছিদ্রবিশিষ্ট একটী মাটীর পাত্রের ভিতর আলো রাখিয়া সেই পাত্রটি মাথায় করিয়া গুজরাটের রমণীরা হাতে হাত দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঐ সব গান গাহিয়া থাকে। এ সব গানকে তথাকার প্রচলিত ভাষায় 'গরবা' বলে। 'গরবা' সম্ভবতঃ 'গর্ভ দীপ'।

(গুজরাটের লোক-সাহিত্যের সুপ্রসিদ্ধ সংগ্রাহক শ্রীঝভেরীচন্দ মেঘানী মহাশয়ের গুজরাটী ভাষার "রটিয়ালী রাত" (সুন্দর রজনী) নামক সংগ্রহ গ্রন্থে এ সম্বন্ধীয় বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়।)

উপরোক্ত আলোচনা হইতে বুঝা গেল হাড়িপা, কানুফা, গোরক্ষ নাথ মুখ নাথ-সিদ্ধাগণ যোগবলে অসাধ্য সাধন করিতে পারিতেন, এমন কি

মৃত্যুকেও জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহারা বিষয় বাসনা হইতে মুক্ত ছিলেন এবং কামিনী কাঞ্চন পরিত্যাগ করিয়া ভগবচ্চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন প্রবল প্রতাপ নৃপতিরাও তাঁহাদের চরণে মস্তক অবনত করিতেন। অনেব নৃপতি নাথ-গুরুগণের শিষ্যত্ব গ্রহণ পূর্ব্বক রাজৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়াছিলেন নাথ-গুরুগণ অনন্যসাধারণ চরিত্র ও অলৌকিক যোগবিভূতির বলে জন সাধারণের মনে অপূর্ব্ব প্রভাব বিস্তার করিয়া সর্ব্বত্র দেবতা নির্ব্বিশেষে পূজিং ও সম্মানিত হইতেন। এই সকল নাথসিদ্ধার জীবনকাহিনী অবলম্বন করিঃ বিভিন্ন ভাষায় যে সকল সাহিত্য ও গীতিকাব্য রচিত হইয়াছিল জনসাধারণে মনে তাহাদের প্রভাব এবং নানা ভাষার বিশেষতঃ বঙ্গভাষার, সাহিত্যভাণ্ডাে তাহাদের অবদান অতুলনীয়। মীনচেতন, ময়নামতীর গান, মাণিকচন্দ্রের গা গোরক্ষবিজয় প্রভৃতি তথ্যবহুল গীতিপূর্ণ গ্রন্থগুলির চিত্তাকর্ষণী শক্তি অপরিসীম এই সকল গীতিকাব্য রামায়ণ ও মহাভারতের ন্যায় প্রাচীনকালে পরম ভক্তি ভরে পঠিত ও মুখে মুখে গীত হইত। নাথ-সাহিত্যই যে বঙ্গভাষার ভিত্তি রচ করিয়াছে এবং নাথ-গুরুগণ যে জনসাধারণের ধর্ম্ম-চেতনাতে নূতন শক্তি গতির সঞ্চার করিয়াছিলেন তাহা প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণ স্বীকার করিয়া থাকেন এমন একদিন ছিল যখন নাথ-গুরুগণের প্রবর্ত্তিত ও প্রচারিত ধর্ম্মমত এব তাঁহাদের অমৃতময়ী বাণী সর্ব্বত্র সমাদৃত ও প্রচলিত ছিল। সকলেই বিশ্বা করিত—

"নাথপন্থকা বাণী ৰারো সব্ দুনিয়াসে ন্যারা হৈ।"

সপ্তম অধ্যায়

ভারতীয় নাথ যোগিরাজগণের ইতিবৃত্ত
ও
নাথসিদ্ধাগণের রাজ্য পরিচালনা

যোগিগুরুগণ ধর্ম্মজগতের একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন। সেজন্য জনসাধারণ তাঁহাদিগকে যোগেশ্বর, যোগিমহারাজ, যোগিরাজ, মোহান্তরাজ, মোহান্ত-মহারাজ, নাথাচার্য্য, নাথজী, নাথমহারাজ প্রভৃতি নৃপোচিত আখ্যায় অভিহিত করিত।

ধর্ম্মগুরু নাথাচার্য্যগণ যে কেবল ধর্ম্মজগতেই একচ্ছত্র আধিপত্য করিতেন এমন নহে, আবশ্যক হইলে লৌকিক ব্যাপারেও তাঁহারা ক্ষমতা পরিচালনা করিতেন। যুদ্ধবিদ্যায়ও তাঁহারা পারদর্শী ছিলেন, শিষ্যগণকে তাঁহারা যুদ্ধ-বিদ্যা শিক্ষা দিতেন এবং অস্ত্রে-শস্ত্রে সুসজ্জিত রাখিতেন। তাঁহাদের ঐহিক ও পারত্রিক ক্ষমতায় ভীত হইয়া রাজগণও তাঁহাদের বন্ধুত্বলাভে লালায়িত হইতেন, এবং দেহরক্ষী ও রাজ্যরক্ষী সৈন্যরূপে তাঁহাদিগকে নিয়োগ করিতেন। কোন অত্যাচারী রাজাকে দমন করা আবশ্যক হইলে বা কোন অধার্ম্মিক রাজাকে জয় করার প্রয়োজন হইলে তাঁহারা তৎক্ষণাৎ অস্ত্রধারণ করিতে কিছু মাত্র দ্বিধাবোধ করিতেন না।

আজকালও তীর্থাধ্যক্ষ ও মঠাধ্যক্ষ যোগিরাজগণ শত শত শিষ্য সমন্বিত হইয়া গজবাজী ও অস্ত্রশস্ত্র সহ যখন কুম্ভমেলায় বা অপর কোন স্থানে গমন করেন, তখন এক এক জন রাজা সৈন্যসহ কোন অভিযানে যাইতেছেন বলিয়া ভ্রম হয়।

কর্ণেল টড সাহেব তাঁহার রাজস্থানে লিখিয়াছেন—

"The priests of Ekalinga are termed Gosain or Goswami... There are numerous class of Gosains who have adopted celibacy, and who yet follow employments both in commerce and arms. The mercantile Gosians are amongst the richest individuals in India,.........,...The Gosains who profess arms, partake of the character of the Knights of St. John Jerusalem. They live in monasteries scattered over the country, possess lands, and beg, or serve for pay when called upon. As defensive soldiers, they are good. Siva, their patron, is the God of war, and like him they make great use of intoxicating herbs, and even spiritual liquors. In Mewar they can always muster many thousand's of the Kanfara Jogis, or spiritual ascetics......The poet Chand gives an animated description of the bodyguard of the King of Conouj which was composed of these monastic warriors." (Rajasthan— Vol. I, Ch. XIX. Page 546)

"The Kanfurra Jogis or Gosains are in great bodies often in many thousands, and are sought as allies, especially in defensive warfare." (Rajasthan, Vol. I, Ch. VI, Page 77 foot note.)

অর্থাৎ একলিঙ্গের পূজারী ব্রাহ্মণেরা গোসাই বা গোস্বামী নামে অভিহিত হইতেন। কৌমার্য্য-ব্রতাবলম্বী গোসাইদের মধ্যে অনেক শ্রেণীবিভাগ ছিল। তাহারা বাণিজ্যাদি এবং যুদ্ধাদি ব্যাপারেও অংশ গ্রহণ করেন। ব্যবসা-জীবী গোসাইরা ভারতে বিশেষ সমৃদ্ধিশালী সম্প্রদায়। অস্ত্রধারী গোসাইরা জেরুজালেম এর সেণ্ট জনের 'নাইট' উপাধিধারী ব্যক্তিদের সমতুল্য। তাহারা ভারতের বিভিন্ন স্থানে সঙ্ঘারামে অবস্থান করেন; কাহারও কাহারও ভূমি-সম্পত্তিও আছে; কেহ কেহ ভিক্ষাও করিয়া থাকেন এবং প্রয়োজন হইলে

বেতন-ভোগী হইয়া চাকুরীও করেন। আত্মরক্ষাকারী সৈন্য হিসাবেও তাহারা যথেষ্ট পারদর্শী। ইহাদের কুলদেবতা শিবও যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ এবং তাঁহারই মত উহারা নানা প্রকার উত্তেজনা-বর্দ্ধক লতাপাতা এমন কি মন্ত্রেরও ব্যবহার করিয়া থাকেন। কবি চাঁদ এই মঠবাসী যোদ্ধাদের দ্বারা গঠিত কনৌজের রাজার রক্ষীবাহিনীর জীবন্ত বর্ণনা দিয়াছেন। এই কানফুরা যোগী বা গোসাইরা দলে দলে দেশরক্ষা কার্য্যে আহূত হইতেন।

টড সাহেব রাজস্থানে আরও লিখিয়াছেন উদয়পুরের ছয় মাইল দূরে এক-লিঙ্গ শিবের মন্দির। এই মন্দিরের পুরোহিতকে গোসাই বলা হয়। এই গোসাইরা ভীষণ যুদ্ধ করিতে পারে এবং এই জন্য ইহারা হাজার হাজার কান-ফট যোগী সংগ্রহ করিতে সমর্থ।

বিশ্বকোষ তৃতীয় খণ্ডে এ সম্বন্ধীয় বিবরণ আছে। কনৌজের এইরূপ এক দল যোগী দেহরক্ষী সম্বন্ধে চাঁদ কবিও অতি জ্বলন্ত ভাষায় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। দেশ রক্ষার জন্য দেশের যোগিগণ যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারেন। তাঁহারা প্রয়োজন হইলে দেশে শান্তি ও ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য রাজ সিংহাসনেও আরোহণ করিতে পারেন। এইরূপে শিখ গুরুগণের অঙ্গুলি-হেলনে সমস্ত শিখগণ প্রবল প্রতাপান্বিত মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিয়াছিলেন। শাহজলালের আদেশে তদীয় শিষ্যগণ শ্রীহট্টরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া শ্রীহট্ট জয় করিয়া লইয়াছিলেন।

যোগীরা যে কেবল নিরীহভাবে ধর্ম্মপ্রচার করিয়াই বেড়াইতেন এমন নহে, তাঁহারা অত্যাচারী রাজাকে উপদেশ দানে স্বীয় শিষ্যত্বে আনিয়া দমন করিতেন। অথবা আবশ্যক হইলে এরূপ রাজার হস্ত হইতে রাজদণ্ড কাড়িয়া লইয়া স্বয়ং রাজ্যশাসন করিতেন (Rajasthan, Vol.—I, Ch. XIX, Page 545) ভারতের ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। এরূপ ঐহিক সম্পদ ভোগ যোগশাস্ত্রের বিরোধী নহে। অনাসক্ত ভাবে রাজ্য ভোগ করিতে পারিলে যোগী

সকল প্রকার ভোগ্য বস্তুই ভোগ করিতে পারেন। পরম যোগী রাজর্ষি জনক অনাসক্ত ভাবে রাজ্যভোগ করিয়াছেন। তপোবলসম্পন্ন বিশ্বামিত্র রাজদণ্ড পরিচালনা করিয়াছেন। ভগবান শঙ্করাচার্য্য রাজশরীরে প্রবেশ করিয়া কামকলা সাধনের সঙ্গে সঙ্গে রাজকার্য্য পরিচালনা করিয়াছেন। যে ভাবেই হউক না কেন, অনেক যোগী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে রাজদণ্ড পরিচালনা করিয়াছেন। আমরা এখন এ সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

দিল্লীর সিংহাসনে যোগীরাজবংশ

রাজত্বকাল— সম্ভবতঃ ৩৭ খৃঃ অব্দ হইতে ৬৪১ খৃঃ অব্দ।

মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মাকৃত 'রাজাবলী' ও দয়ানন্দ সরস্বতীকৃত 'সত্যার্থ প্রকাশিকা'তে পাল উপাধিধারী ষোল জন নাথরাজার উল্লেখ আছে। 'রাজস্থান,' 'রাজতরঙ্গিনী' 'আইন-ই-আকবরী' প্রভৃতি গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে সেসময় ভারতীয় সর্ব্ব-শ্রেণীর রাজাদের সাধারণ উপাধি পাল ছিল। "Pal or Pati the universal adjunct to every proper name, indicates the pastoral race of these invaders" (Rajasthan Vol. 11, Page 3, foot note)।

'রাজাবলী' মতে উক্ত পাল উপাধিধারী রাজগণ ৯৩ সম্বতের বা ৩৬ খৃষ্টাব্দের পর অর্থাৎ বর্ত্তমান সময় হইতে ১৮৮৮ বৎসর পূর্ব্বে আরম্ভ করিয়া ৬৪১ বৎসর ৫ মাস কাল দিল্লীর সিংহাসনে রাজত্ব করিয়াছিলেন। 'সত্যার্থ প্রকাশিকা'-মতে এই রাজগণ ৩৭২ বৎসর ৪ মাস ২৭ দিন পর্য্যন্ত দিল্লীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন। উভয় তালিকায় নামের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, উহা সামঞ্জস্য করা কঠিন নহে। কিন্তু রাজত্বকালের যে পার্থক্য দেখা যায় তাহার সামঞ্জস্য বিধান করা সুকঠিন।

কর্ণেল টড সাহেব তাঁহার রাজস্থানে লিখিয়াছেন যে বিক্রমাদিত্য দিল্লীর রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হওয়ার পর দিল্লী ত্যাগ করিয়া উজ্জয়িনীতে স্বীয় রাজধানী

স্থানান্তরিত করেন। তাহার আট শতাব্দী পরে টুনার বংশীয় অনদ পাল দিল্লীতে রাজ্য স্থাপন করেন। রাজতরঙ্গিনীর মতে অনদ পাল সম্বৎ ৮৪৮ বা খৃষ্টীয় ৭৯২ অব্দে রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছিলেন। রাজতরঙ্গিনীতে যোগিরাজগণের রাজত্বের যে সময় দেওয়া হইয়াছে তাহাতে যদি কোন ভুল না থাকে তবে বিক্রমাদিত্যের দিল্লী ত্যাগের পর ও অনদ পালের দিল্লীতে রাজ্য স্থাপনের পূর্ব্ববর্ত্তী সময় মধ্যে তাঁহারা রাজত্ব করিয়ছিলেন বলিতে হইবে। রাজতরঙ্গিনীতে লিখিত আছে যে এই অষ্ট শতাব্দীর মধ্যে শিবলোক হইতে আগত কতিপয় রাজা ইন্দ্রপ্রস্থে (দিল্লীতে) রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং টুনার বংশীয়গণের আগমনের পূর্ব্বে অনেক বৎসর তথায় অরাজকতাও ছিল "Princes from Sewaluk.........held it during this time and it long continued desolate until the Tunars" (Rajasthan)। এই সময় দিল্লীতে বৌদ্ধ বা জৈন ধর্ম্মাবলম্বী কোন রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না। চীনের জনৈক পরিব্রাজক খৃষ্টের ৫ম শতাব্দীতে ভারতে আসিয়া কতিপয় বৎসর এখানে থাকিয়া এদেশ পর্য্যটন করেন। তৎপর ৬২৯ খৃঃ অব্দে চীনের ২য় পর্য্যটক হুয়েন সাঙ ভারতে আসিয়া কতিপয় বৎসর এখানে থাকিয়া নানাস্থান ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা তাঁহাদের ভ্রমণ বৃত্তান্তে এদেশীয় রীতি-নীতি ধর্ম্ম প্রভৃতি এবং বৌদ্ধরাজগণের বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এ সময় তাঁহারা দিল্লীতে কোন বৌদ্ধ রাজা রাজত্ব করিতেন বলিয়া উল্লেখ করেন নাই।

মুঙ্গেরের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ মধ্যে মহারাজদেব পাল প্রদত্ত একখানা তাম্রফলক পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে তিনি বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পর রাজত্ব করেন, এবং ৩৩ সম্বতে ২১শে মার্গশীর্ষ (অগ্রহায়ণ) তারিখে এই তাম্রশাসন দ্বারা একজন বেদজ্ঞ যোগীকে মিসিকা নগরী ও তৎসংলগ্ন সমুদয় ভূমি দান করেন লিখিত আছে (এসিয়াটিক রিসার্চ— ১ম খণ্ড, ১১২-১১৭ পৃঃ)। উক্ত তাম্রশাসনে তাঁহাদের ব্রাহ্মণদের উৎসবে যোগদান, তাঁহাদের নিকট হইতে

তাহার পর তাঁহার পুত্র (১৪) মদন পাল ৩৯।৯ মাস সাম্রাজ্য করেন। তাহার পর তাহার পুত্র (১৫) ধর্ম্ম পাল ৪৫ বৎসর সাম্রাজ্য করেন। তাহার পর তাঁহার পুত্র (১৬) বিক্রম পাল ৪৪।৩ মাস সাম্রাজ্য করেন।

এই বিক্রম পাল মহাবল পরাক্রান্ত ছিল। যে সকল রাজা ইহাকে কর না দিত, সে-রাজাদিগকে তিনি যুদ্ধে পরাজয় করিয়া তাহাদের স্থানে কর লইতেন। বহবঁচ দেশে তিলকচন্দ্র নামে এক রাজা ছিল। সে কখন কর দিত, কখন দুষ্টতা করিয়া কর দিত না। বিক্রম পাল তাহার দুষ্টতাতে ক্রুদ্ধ হইয়া অনেক সৈন্যসামন্ত লইয়া তাহার উপর চড়াউ করিলেন এবং বড যুদ্ধও করিলেন, কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছাতে ঐ যুদ্ধে তিলকচন্দ্র রাজার হাতে নষ্ট হইলেন। এইরূপ সমুদ্র পালের ষোড়শ পুরুষ বিক্রম পালেতে সর্ব্বশুদ্ধ ৬৪১।৩ মাসেতে অধিকার সমাপ্ত হইল' (রাজাবলী)।

পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতী কৃত **'সত্যার্থ প্রকাশিকা'**তে আছে— "শ্রীমন্ মহারাজ সায়ম্ভুব মনু হইতে মহারাজা যুধিষ্ঠির পর্য্যন্ত মহারাজদিগের ইতিহাস মহাভারতাদিতে লিখিত আছে। ইহা হইতে সজ্জনগণ উত্তরাংশের ইতিহাসের অবস্থা কিয়ৎ পরিমাণে বিদিত হইবেন। বিদ্যার্থী সম্মিলিত "হরিশ্চন্দ্র চন্দ্রিকা" এবং "মোহন চন্দ্রিকা" নামে যে দুই পাক্ষিক পত্র শ্রীনাথদ্বার হইতে প্রকাশিত হইত এবং যাহা রাজপুতনা দেশে, মেবার রাজ্যে, উদয়পুরে এবং চিতৌড় গডে বিশেষ বিদিত তাহা হইতে আমি এই বিষয় অনুবাদ করিয়াছি। যদি এইরূপে আমাদের আর্য্য সজ্জনগণ ইতিহাস এবং বিদ্যাপুস্তক সকল অন্বেষণ করিয়া প্রকাশ করেন তাহা হইলে দেশের বিশেষ লাভ হইতে পারে। বিক্রম সম্বতের ১৭৮২ বৎসরের লিখিত এক প্রাচীন পুস্তক কোন বন্ধুর নিকট প্রাপ্ত হইয়া উক্ত পত্রের সম্পাদক মহাশয় চলিত সংবতের ১৯৩৯ বর্ষের মার্গশীর্ষ মাসের শুক্ল পক্ষের ১৯—২০ কিরণে অর্থাৎ দুই পাক্ষিক পত্রে মুদ্রিত করিয়াছিলেন। উহা নিম্ন-লিখিতের প্রমাণে জানিতে হইবে। "আর্য্যাবর্ত্তে দেশীয় রাজবংশাবলী—ইন্দ্রপ্রস্থে

শ্রীমহারাজ যশ পাল পর্য্যন্ত আর্য্যগণ রাজ্য করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহারাজ যুধিষ্ঠির হইতে মহারাজ যশ পাল পর্য্যন্ত বংশাবলী অর্থাৎ পুরুষ অনুমান ১২৪ (এক শত চব্বিশ) জন রাজা ৪১৫৭ বৎসর ৯ মাস ১৪ দিন মধ্যে হইয়াছিলেন। ইহাদের বৃত্তান্ত :—

(১) শ্রীমন্মহারাজ যুধিষ্ঠির প্রভৃতির বংশ অনুমান ৩০ পুরুষ ১৭৭০ বর্ষ, ১১ মাস এবং ১০ দিনের মধ্যে হইয়াছিল। ইহার বিস্তার :— ১ম যুধিষ্ঠির * * * * ৩০শ ক্ষেমক।

(২) রাজা ক্ষেমকের প্রধান পাত্র বিস্রবা রাজা ক্ষেমককে বিনাশ করিয়া রাজ্য করিয়াছিলেন। তাহারা সমুদয়ে ১৪ পুরুষ ৫০০ শত বৎসর ৩ মাস এবং ১৭ দিনের মধ্যে হইয়াছিল। তাহার বিস্তার :— ১ম বিস্রবা * * * * * ১৪ বীর সালসেন।

(৩) প্রধান পাত্র বীর মহারাজা বীর সালসেনকে বিনাশ করিয়া রাজ্য করেন। ১৬ পুরুষে ৪৪৫ বৎসর ৫ মাস ৩ দিনের মধ্যে হইয়াছিল। ইহার বিস্তার :— ১ম রাজা বীর মহারাজা * * * ১৬ আদিত্যকেতু।

(৪) প্রয়াগের রাজা ধন্ধর মগধ দেশের রাজা আদিত্যকেতুকে বিনাশ করিয়া রাজ্য করিয়াছিলেন। ৯ পুরুষ ৩৭৪ বৎসর ১১ মাস ২৬ দিন মধ্যে হইয়াছিল। ইহার বিস্তার :— * * * ৯ রাজ পাল।

(৫) সামন্ত মহান পাল রাজ পালকে মারিয়া রাজ্য করেন। ১ পুরুষ ১৪ বৎসর। ইহার বিস্তার নাই।

(৬) রাজা মহান পালের রাজ্যের পর রাজা বিক্রমাদিত্য অবন্তিকা (উজ্জয়িনী) হইতে আক্রমণ করতঃ রাজা মহান পালকে মারিয়া রাজ্য করেন। ১ পুরুষ ৯৩ বৎসর। ইহার বিস্তার নাই।

(৭) শালিবাহনের প্রধান পাত্র পৈঠনের যোগিরাজা সমুদ্র পাল

বিক্রমাদিত্যকে মারিয়া রাজ্য করেন। ১৬ পুরুষ ৩৭২ বৎসর ৪ মাস ২৭ দিন মধ্যে হইয়াছিল। ইহাদের বিস্তার :—

রাজপুরুষদের নাম	রাজত্বকাল বর্ষ	মাস	দিন
১। সমুদ্র পাল	৫৪	২	২০
২। চন্দ্র পাল	৩৬	৫	৪
৩। সহায় পাল	১১	৪	১১
৪। দেব পাল	২৭	১	২৮
৫। নরসিংহ পাল	১৮	০	২০
৬। সাম পাল	২৭	১	১৭
৭। রঘু পাল	২২	৩	২৫
৮। গোবিন্দ পাল	২৭	১	১৭
৯। অমৃত পাল	৩৬	১০	১৩
১০। বলি পাল	১২	৫	২৭
১১। মহী পাল	১৩	৮	৪
১২। হরি পাল	১৪	৮	৪
১৩। সীম পাল (কোন কোন মতে ভীম পাল)	১২	১০	১৩
১৪। মদন পাল	১৭	১০	১৯
১৫। ধর্ম্ম পাল	১৬	২	২
১৬। বিক্রম পাল	২৪	১১	১৩

সত্যার্থ প্রকাশিক)

এখন উভয় গ্রন্থের নাম বিচার করা যাউক।

রাজাবলীমতে রাজার নাম ও রাজত্বকাল	সত্যার্থ প্রকাশিকা মতে রাজার নাম ও রাজত্বকাল	
১। সমুদ্র পাল	১। সমুদ্র পাল	৫৪।২।২০
২। চন্দ্র পাল ৪০।৫	২। চন্দ্র পাল	৩৬।৫।৪
৩। নয়ন পাল ৫১।৫	৩। সহায় পাল	১১।৪।১১
৪। দেশ পাল ৪৭।২	৪। দেব পাল	২৭।১।২৮
৫। নরসিংহ পাল ৪৮।৩	৫। নরসিংহ পাল	১৮।০।২০
৬। সুত পাল ৩৭।১১	৬। সাম পাল	২৭।১।১৭
৭। লক্ষ পাল ৩৮।৩	৭। রঘু পাল	২২।৩।২৫
৮। অমৃত পাল ২৭।৬	৮। গোবিন্দ পাল	২৭।১।১৭
৯। মহী পাল ৩৯।২	৯। অমৃত পাল	৩৬।১০।১৩
১০। গোবিন্দ পাল ৫৫।৫	১০। বলি পাল	১২।৫।২৭
১১। হরি পাল ২৪।৯	১১। মহী পাল	১৩।৮।৪
১২। ভীম পাল ৪৮।৮	১২। হরি পাল	১৪।৮।৪
১৩। আনন্দ পাল ৩১।২	১৩। সীম পাল বা ভীম পাল	১২।১০।১৩
১৪। মদন পাল ৩৯।৯	১৪। মদন পাল	১৭।১০।১৯
১৫। ধর্ম্ম পাল ৪৫	১৫। ধর্ম্ম পাল	১৬।২।২
১৬। বিক্রম পাল ৪৪।৩	১৬। বিক্রম পাল	২৪।১১।১৩

(নামের ডান পার্শ্বের সংখ্যাগুলি রাজত্বকালের বৎসর, মাস, দিন বুঝিতে হইবে)

উভয় গ্রন্থের ১, ২, ৫, ১৪, ১৫ ও ১৬ নং নামের মধ্যে বেশ মিল আছে। রাজাবলীর ক্রম অনুসারে ৮, ৯, ১১ ও ১২ নং নাম সত্যার্থ প্রকাশিকার ক্রম

অনুসারে যথাক্রমে ৯, ১১, ১২ ও ১৩ নং বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে বটে, কিন্তু নামগুলির মধ্যে বেশ মিল আছে। ইহা যে লিপিকর-প্রমাদে বা শ্রুতিভ্রংশে উলট-পালট হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। অন্যান্য নামগুলি লিপিকর-প্রমাদে এবং শ্রুতিভ্রংশে বিকৃতরূপ ধারণ করিয়াছে সে সম্বন্ধেও সন্দেহ করিবার বিশেষ কিছুই নাই। এত প্রাচীন বিবরণ বিকৃত হওয়া একান্তই সম্ভবপর। সে জন্য মনে হয় উক্ত রাজাদের নাম সম্বন্ধে সন্দেহ করা উচিত হইবে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি রাজত্বকালের সামঞ্জস্য করা সুকঠিন বটে।

মগধে ও বাংলায় যোগিরাজবংশ

সেন রাজাদের পূর্ব্বে অনেক পাল উপাধিধারী নাথ রাজা মগধে ও বাঙ্গালায় রাজত্ব করিয়াছেন। তাঁহাদের বংশ-তালিকা তিব্বতের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক লামা তারা নাথের ইতিহাসে পাওয়া যায়। তাহা এই—"১। গোপাল ২। দেব পাল ৩। রাজ্য পাল ৪। ধর্ম্ম পাল ৫। মসু রক্ষিত ৬। ধান পাল ৭। মহী পাল ৮। মহা পাল ৯। শ্যাম পাল ১০। শ্রেষ্ঠ পাল ১১। চণক পাল ১২। বীর পাল ১৩। ন্যায় পাল ১৪। অমর পাল ১৫। হস্তী পাল ১৬। ক্ষান্তি পাল ১৭। রাজপাল দেব ১৮। যক্ষ পাল।" "এই রাজাদের রাজত্বকালে শৈব-নাথধর্ম্ম বাঙ্গালায় বিশেষ পুষ্টিলাভ করে, এবং তিব্বত ইত্যাদি দেশে প্রচারিত হয়। সেন রাজাদের রাজত্বকাল ১:৫৯—১১৮৫ খৃঃ অব্দ। ইঁহাদের পূর্ব্বে ৬৯৮ বৎসর পাল বংশীয়েরা গৌড়ে রাজত্ব করিয়াছিলেন। আইন-আকবরী মতে ৫ খৃঃ অব্দের প্রারম্ভে পাল বংশীয়দের অভ্যুদয় হইয়াছিল। ঐতিহাসিকেরা বঙ্গদেশে পাল রাজাদের রাজত্বকাল ৮ম হইতে ১০ম খৃষ্টীয় শতাব্দী বলিয়া মনে করেন।

রাজাবলী মতে মহী পাল ও ধর্ম্ম পাল সমুদ্র পালের বংশোদ্ভব। কাপ্তেন লেয়ার্ড সাহেব ও মহী পালকে সমুদ্র পালের বংশজ বলিয়াছেন (J. R. A. S

—1853 ও Page 518)। বিশ্বকোষে ধর্ম্ম পালের রাজ্যারম্ভকাল ৭৮৫ খৃঃ অব্দ বলিয়া লিখিত আছে। ভাগলপুর হইতে প্রাপ্ত নারায়ণ পালের তাম্রশাসন, প্রভাকর চরিত নামক জৈন গ্রন্থ, রাজেন্দ্র চোলের সমসাময়িক তামিল কবি কম্বনের রামায়ণ প্রভৃতি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে ৮ম খৃঃ অব্দের শেষ বা ৯ম খৃঃ অব্দের প্রারম্ভে মগধে ও গৌড়ে ধর্ম্ম পাল রাজত্ব করিয়াছেন। মহী পাল এ সময় উত্তর রাঢ়ে রাজত্ব করিয়াছেন। দিনাজপুরের মহীপাল দীঘি ইঁহারই কীর্ত্তি বলিয়া অনুমিত হয়।

রাজা মৎস্যেন্দ্র (মীন) নাথ ও কদলীরাজ্য
রাজত্বকাল সম্ভবতঃ ৭ম খৃঃ অব্দ

যোগেশ্বর মৎস্যেন্দ্র (মীন) নাথ যে কেবল হিন্দু ধর্ম্মাচার্য্য ছিলেন এমন নহে, তিনি বিভিন্ন রাজ্যের রাজদণ্ড পরিচালনা করিয়াছেন বলিয়াও প্রমাণ পাওয়া যায়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্ত্তৃক প্রকাশিত (১৩২৪ বাং) গোরক্ষ-বিজয়ের বিবরণে দেখা যায় তিনি কদলী রাজ্যের রাজদণ্ড পরিচালনা করিয়া-ছিলেন। কদলী রাজ্যের নামান্তর নারীরাজ্য। ইহা সমগ্র নাথ সম্প্রদায় এবং দেশ বিদেশের ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিত মণ্ডলীর নিকট সুপরি-চিত। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গোরক্ষবিজয়ের বিবরণ হইতে জানা যায় যে মীন নাথের অন্বেষণে গোরক্ষ নাথ শূন্য পথে সে রাজ্যে গিয়াছিলেন। গোরক্ষ নাথের বর্ণনায় সে রাজ্যের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। যথা—

"আসন করিয়া নাথ শূন্যে কৈল ভর।
সাচন উড়এ জেন গগন উপরে॥
চলিতে চলিতে নাথে গগনেত জাএ।
গগনে থাকিয়া নাথ কুতুহলে চাহে॥

আলগ আসন নাথ জাএ ধিরে ধিরে।
চন্দ্র সূর্য্য জেন মত পৃথিবী বেহারে ॥
বায়ুপথে জাএ নাথ গগনের স্থলে।
রত্নমনি পতাকা দেখে প্রতি ঘর চালে ॥
আড়ে আড়ে চাহে নাথ শূন্যে ভর করি।
মঙ্গল বিধানে দেখে কদলির পুরি ॥
একে একে গোর্খ নাথে সর্ব্ব রাজ্য চাহে।
অগুরু চন্দন গন্ধ সর্ব্ব রাজ্যে পাএ ॥
নাথে বোলে এহি রাজ্য বড় হএ ভালা।
চারি কড়া কড়ি বিকাএ চন্দনের তোলা ॥
লোকের পিধন পাটের পাছড়া।
প্রতি ঘর চালে দেখে সোনার কোমড়া ॥
কার পথরির (১) পানি কেহ নহি খাএঁ।
মণি মাণিক্য তারা রৌদ্রেতে শুখাএ ॥
এক রাউলের ঘরে দুই চারি মাই।
সোল সয় (২) কদলি একলা মিনর ঠাই ॥
স্থানে স্থানে দেখে সব অমরা নগর।
সকল নগরে দেখে উচ্চ উচ্চ ঘর ॥
সুবর্ণের ঘর সব পতাকা রচিত।
সকল দেশের লোক রওনে (৩) ভুসিত ॥
রাজ্যের সকল দেখে তার ভাল রঙ্গ।
প্রতি ঘর দ্বারে দেখে হিরণ্যের টঙ্গ ॥

(১) পুষ্করিণী (২) ষোল শত (৩) রত্নে

ধন্য ধন্য রাজনগর করিয়া বাখানি।
সুবর্ণের কলসে সর্ব্ব লোকে খাএ পানি॥
অপূর্ব্ব রাজ্য দেখে দির্ব্ব দির্ব্ব স্থান।
গুরুর দেসে গিআ মিলে ততক্ষণ॥
উত্তম পুস্কনি দেখে সুনিম্মিত (৪) জল।
হংস চকোর চরে মৃণালের ফুল॥
চারি পাড়ে নানা পুষ্প পরম সুন্দর।
আম কাঠোয়াল (৫) য়ার নারিকল॥
তাল খাজুর আর নানা বর্ণ ফুল।
তাহার উত্তর পাড়ে উত্তম বকুল॥
বকুলের ছায়াএ দেখে জলে য়ার স্থলে।
আসন লামাই বৈসে বকুলের তলে॥"

(গোরক্ষবিজয়— ৫৩ হইতে ৫৭ পৃঃ)

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে কদলীরাজ্য ধনৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ লক্ষ্মীর ভাণ্ডার-স্বরূপ ছিল। এখানে জনসাধারণের অভাব বলিতে কিছুই ছিল না। আমরা পরে দেখাইতেছি যে কমলা ও মঙ্গলা নাম্নী দুই ভগ্নী এই রাজ্যের সিংহাসনাধিকারিণী ছিলেন। রাজ্যের নাম কদলীদেশ, রাজধানীর নাম কদলীনগর, এমন কি অধিবাসীবৃন্দও কদলী নামে পরিচিত। গোরক্ষবিজয়ের মতে সে রাজ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যাধিক্যবশতঃ প্রতি 'বাউলের' (পুরুষের) গৃহে দুই চারি জন হিসাবে স্ত্রীলোক ছিলেন। আর গোপীচাঁদের সন্ন্যাসের বিবরণে দেখা যায় সে রাজ্যে পুরুষ ছিল না। সে রাজ্যের রাজা, প্রজা, দেওয়ান সকলেই স্ত্রীলোক ছিলেন। এমন কি পুরুষের অভাবে সে রাজ্যের স্ত্রীলোকেরা কামরূপ যাইয়া

(৪) সুনির্ম্মল (৫) কাঁটাল।

ঋতুরক্ষা করিতেন। শুধু তাহাই নহে; কোন স্ত্রীলোকের গর্ভে 'বেটা' (ছেলে) 'শ্রীজন' (স্বজন) হইলে তাহাকে নষ্ট করিয়া দেওয়া হইত। তাই সে রাজ্যে পুরুষের রক্ষা ছিল না। সে জন্য এই রাজ্য পুরুষহীন ছিল। যথা—

"শ্রীরাজা শ্রীপ্রজা শ্রীরাজ্যের (৬) দওান।
নারি বিনে নাহি রার্জ্যে পুরুশের ত্রান॥

*　　*　　*　　*

রিতুস্তান (৭) করে নারি জায়া (৮) কামরূপ॥
কামরূপ নগরে আছে পুরুশের বসতি।
তথা জাএ নারি জে জন হএ রিতবর্তি (৯)॥
কামরূপ জায়া নারি ভূঞ্জে'ন শ্রীঙ্গার (১০)।"

*　　*　　*　　*

গর্ভেভ্যের (১১) ভিতর জার শ্রীজন হয় বেটা (১২)।
রাম চক্রবানে পুত্রের মুণ্ড জাএ কাটা॥

*　　*　　*　　*

শ্রীয়া পাটনে নাহি পুরুষের পরিত্রান॥
তকারণে নাহি রাজ্যে পুরুশের নেশ (১৩)।

(গোপীচাঁদের সন্ন্যাস— ১৫ পৃঃ)

নাথসিদ্ধা মীন নাথ কদলীরাজ্যের মায়াজালে আবদ্ধ হইয়া সিদ্ধি হারাইয়াছিলেন এবং কদলীরাজ্যের রাজপদ লাভ করিয়াছিলেন। যথা;—

"মীন নাথ আইল জবে　　দেখিয়া কদলি সবে
তানে চাহে রাখিতে ভোলাই।

(৬) শ্রী স্ত্রীলোক (৭) ঋতু স্নান (৮) যাইয়া (৯) ঋতুবতী (১০) সহবাস (১১) গর্ভের (১২) ছেলে (১৩) লেশ

জ্ঞান ধ্যানে দেখি স্থির সোন্দর জে শরীর
আহ্মি সবে (১৪) যদি তারে পাই ॥
মঙ্গলা কমলা দুই জতেক কদলি লই
নানা রসে ছিঙ্গার করিব।
মীন নাথ ভোলাইতে সব য়াইল (১৫) একচিত্তে
চারিভিতে বেড়িয়া রহিল ॥
কদলির হেন বেশ শিরেত লম্বিত কেশ
কবরী জে বাধিল মস্তকে।
যদি পোর (১৬) পুষ্পমালা কবরীত শোভা ভালা
জেন দেখি বিজুলি চমকে ॥
গুরুতর হইল ভার তাতে দোলে রণ্ডন হার (১৭)
হস্তপদ জ্বল এ উর্ঝলে (১৮)।
কটিত কিঙ্কিনী চরণে নপুরধ্বনি
দেখিয়া মুনির মন টলে ॥
কটাক্ষ নয়ানে চাহে হর ব্রহ্মা মোহ পাএ
এরূপে করিল দরসন।
মীনের সম্মুখে বসি (আসি) মঙ্গলা কমলা বসি
কহে সবে বচন মধুর ॥
নয়ানে নয়ানে চাহে হাত লাড়ি কথা কহে
ঠমকে দেখায় দুই স্তন।
উরু পরে দিয়া তালি আলিঙ্গন দেহি নারী
ছলে মীন নাথেরে বুঝাএ ॥

(১৪) আমরা সকলে (১৫) সব আসিল (১৬) পর (১৭) রত্নহার (১৮) উজ্জ্বলতর

কোন দেশে তোহ্মার ঘর মাগি খাও নিরন্তর
কি কারণে না কর গৃহ বাস।
এমত বয়স কালে না থাক কামিনীর কোলে
অঙ্গে কেনে পরিয়াছ ভস্ম ॥
ভাঙ্গা কাথা ভাঙ্গা ঝুলি বেড়াও কাঁধেত তুলি
এ সকল কিসের অন্তর।
হাতে কেনে দণ্ড বাড়ি কর্ণে দিয়াছ কৌড়ি
নিরন্তর বঞ্চ একস্বর ॥
মোর দেশে নাহি রাজা তোহ্মারে করিমু পূজা
স্ত্রীপাট, আহ্মি সব হই।
সোল সত কদলি এহি তার রাজা আহ্মি
মঙ্গলা কমলা (আমি) দুই ॥
এহি দেশে হও রাজা তোহ্মারে করিব পূজা
আহ্মি সব কর পরিণয়।
এড় তোহ্মি এহি ভেস ভুঞ্জ এহি রাজ্য দেশ
নবদণ্ড ছত্র ধর মাথাএ ॥
আহ্মি হাত পাএ ধরি চোয়রে বাতাস করি
দাসী হউক কদলিরগণ
বিচিত্র বসন পৈর ভাঙ্গা ঝুলি কাথা এড়
সিঙ্গাসনে কর আরোহণ ॥
কদলীর রূপ দেখি মীন নাথ হইল সুখী
শুনি সব বচন মধুর।
পুলকিত হইল মীন দেখিয়া জে সর্ব্বজন
দেখি সব জতেক যুবক (যুবতী) ॥

ভোলেতে পড়িল মীন বৰ্জ্জিল গুরুর চিন্ত
কদলিতে গেল মন মজি।

* * * *

সোল সয় কদলি ধরি আসনেত মীন তুলি
স্নান করাএ সবে মিলি !
সিঙ্গাসনে বৈসাইল নানা বস্ত্র পৈরাইল
ছত্র ধরে করি হুলাহুলি ॥
কদলীতে মীন রাজা নানা মতে করে পূজা
নারীগণে ধরে হাত পাএ
কেলি কুতহলে বৈসে (১) কতদিন কামরসে
অঙ্গে অঙ্গ দিয়া নিদ্রা জাএ
তেজিল গুরুর বোল সব হইয়া গেল ভোল
কামরসে মগ্ন হইয়া মতি ॥”

(গোরক্ষবিজয়— ২৪ হইতে ২৯ পৃঃ)

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে কদলীরাজ্যের অধিশ্বরী হইলেন মঙ্গলা ও কমলা নামক দুই জন স্ত্রীলোক এবং এই রাজ্যের স্ত্রীলোকের সংখ্যা ১৬০০ শত। তাঁহারা নানা ভাবে ছলনা করিয়াছিলেন। তাহার ফলে নারীদের ললাম সৌন্দর্য্য এবং নব যৌবনে মুগ্ধ মীন নাথ সিদ্ধি হারাইয়া কদলীরাজ্যের রাজ-পদাভিষিক্ত হইয়াছিলেন।

কৃষ্ণদাস বাবাজী (কেহ কেহ বলেন লালদাস বাবাজী) মোটামুটি দুই শতাধিক বৎসরের পুরাতন হিন্দী ভক্তমাল গ্রন্থ ও ইহার টীকা অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালা ভক্তমাল গ্রন্থ সম্পাদন করেন। তাহাতে মীন নাথের রাজত্ব-লাভের বিবরণ পাওয়া যায়। কিন্তু মীন নাথ কোন্ রাজ্যের রাজা ছিলেন

(১) ক্রীড়াকৌতুকে উন্মত্ত হইয়া।

সে সম্বন্ধে কোন উল্লেখ উক্ত গ্রন্থে পাওয়া যায় না। আমরা উক্ত গ্রন্থ হইতে আবশ্যক অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

"মীন নাথের শিষ্য গোরখ নাথ নাম।
দোঁহাই সাধনাসিদ্ধ দোঁহেই নিষ্কাম॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে এক রাজার সদনে।
অতিথি হইলা রাজা করিলা সম্মান॥
দাম্ভিক বিষয়ীমত্ত হিংসা ব্যবহার।
স্বাভাবিক স্বতঃসিদ্ধ হয়তো রাজার॥
মীন নাথ সাধু স্বাভাবিক সদাচার।
দেখিয়ে উপজে দয়া দুর্গতি রাজার॥
গোরখ নাথেরে কহে কিছুকাল থাকি।
অবৈষ্ণব রাজা ইহ মূঢ় প্রায় দেখি॥
হিতচেষ্টা করি কিছু যদি কৃষ্ণভক্তি।
লওয়াইতে পারি কোনরূপে দিয়ে শক্তি॥
গোরখ নাথ কহে এই অবৈষ্ণব স্থানে।
একক্ষণ নাহি রহা এইতো বিধান॥
পুনঃ পুনঃ গোর্খ নাথ বারণ করিলা।
কদাচ না শুনে মীন নাথ রহি গেলা॥
* * * *
রাজার সহিত রাজবিষয়ী হইলা।
রাজা নিজ কন্যা তারে বরণ করিলা॥
গোর্খ নাথ বহু চেষ্টা করিয়া দেখিলা।
ছাড়াইতে না পারিয়া পলাইয়া গেলা॥
* * * *

কথোক দিবসে রাজা কাল প্রাপ্তি হইল।
মীন নাথ রাজসিংহাসনেতে বসিল ।।

(ভক্তমাল গ্রন্থ)

গোরক্ষবিজয়ের বিবরণের সহিত উক্ত বিবরণের আগাগোড়া মিল নাই। এখানে জনপ্রবাদ মিশিয়া প্রাচীন বিবরণ বিকৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। মীন নাথের এক পুত্র ছিল সে সম্বন্ধে উক্ত গ্রন্থ দুখানি সম্পূর্ণ একমত।

যাহা হউক সিদ্ধা কানুপা নাথ স্বীয় গুরু হাড়িপা বা জালন্দর নাথের অন্বেষণে ভ্রমণ করিতে করিতে কদলীদেশে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। সে রাজ্যে পুরুষের প্রবেশাধিকার ছিল না। তাই তিনি স্ত্রীরূপে সেখানে গিয়াছিলেন—

"স্ত্রীরূপে শেহি রাজ্য করিলাম. ভূর্ম্মন (১)।
নারির বেশে কামরূপ ঘরে ঘরে ভূক্মিনু।

* * * *

কোদালি সহরখানি ভূর্ম্মে ঘরে ঘর (২)।"

(গোপীচাঁদের সন্ন্যাস— ১৫ ও ১৩ পৃঃ)

সে রাজ্য হইতে ঘুরিয়া আসিয়া কানুপাসিদ্ধা গোরক্ষ নাথকে মীন নাথের সংবাদ দিতেছেন—

"তোমার গুরু মিন্নাথ আছে কোদালি সহরে।
রাত্রিদিবা থাকে নাথ নটিনির বাশোরে (৩)॥
নটি নইয়া মিন্যাথ হইয়াছে বিভোর।
দাড়িচুল পাকিল অথন জাবে জম ঘর ।।"

(গোপীচাঁদের সন্ন্যাস— ১৫ পৃঃ)

---

(১) ভ্রমণ (২) ঘরে ঘরে ভ্রমণ করিলাম (৩) বাসরে

কানুপা আরও বলিতেছেন—

"দেখিলুম মীননাথ বল শক্তি নাই।
* * * *
তাহার পশ্চাতে গেলুম যমের ভুবন।
তথাতে দেখিলুম গিয়া তাহার লিখন॥
তিন দিন আয়ু তার আছএ বিশেষ।
নিবারে যমের দূতে করিছে আদেশ॥"

(গোরক্ষবিজয়— ৪২ পৃঃ)

কদলী-মায়ামুগ্ধ মীন নাথ সিদ্ধি হারাইয়া যমপথযাত্রী। তাঁহার আয়ু মাত্র তিন দিন আছে। এ সংবাদ পাইয়া—

"হেন মতে গোর্খ গেল যমের আলয়।
সভা করি যমরাজা বসিয়া আছএ॥
গোর্খেরে দেখিয়া যম উঠিলা আপনে।
হাতে ধরি বৈসাইল আপন আসনে॥
যমরাজে বোলে শুন গোর্খ মহাযতি।
কি কারণে আগমন কহ মহামতি॥
গোর্খ নাথে বোলে শুন ধর্ম্ম অধিকারী।
আম্মার (১) বচন শুন অবধান করি॥
অনাদি নিধন জ্ঞান মীন মহাশয়।
গুরু শাপে কদলিতে পাইল পরাজয়॥
ভোলিয়া রহিছে মীন কদলির পুরী।
তাহারে তলপ কেনে করিছ অধিকারী॥
যোগী যদি আনিতে চাহ আপন ভুবন।

(১) আমার

চল যাই তোহ্মি আহ্মি (২) ব্রহ্মার সদন ॥
বিমস্তিয়া চাহ তুহ্মি না চিন আপনা।
ভাল মতে ভাবি চাহ আহ্মি কোন জনা ॥
আহ্মার জতেক তেজ জানিবা অখন।
পৃথিবী সহিতে তোরে করিমু গ্রহণ ॥
কে দিল বিষয় তোরে কহ মোর ঠাই।
কহ কহ বোলি গোর্খ বোলিল কিটাই (৩) ॥
সাক্ষী হইয় সবই তিন ভুবন।
এ বলিয়া ঝুলি কাথা লইল তখন ॥
হুঙ্কার করিআ গোর্খে কামে কৈল মন।
টলমল হৈল জথ যমের ভুবন ॥
গোর্খের দেখিয়া কোপ যম কাপে ডরে।
জতেক কাগজ আনি দিলেক গোচরে ॥
একে একে জথ কাগজ চাহে বিচারিয়া।
আপনা গুরুর লেখা নেয়ন্ত উধারিয়া (৪)
শুনিয়া যমের কথা হরষিত মন।
কাগজ চাহিয়া লেখা পাইল তখন ॥
লিখন মুছিয়া নাথ বলিল বিশেষ।
আর না করিয় যম এমন সাহস ॥"

(গোরক্ষবিজয়— ৪৭, ৪৮ পৃঃ)

যমপুরী হইতে গোরক্ষ নাথ বকুলতলাতে ফিরিয়া আসিলেন এবং তথা হইতে নটিনীর বেশে—

---

(২) তোমি আমি (৩) অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া (৪) উদ্ধার করিয়া।

"নাটুয়ার (৪) ভেসে জাইমু গুরুতে বুঝাইতে।" (৭৭ পৃঃ)

*

"এই মতে চলি জাএ মীনের সভাত।" (৮০ পৃঃ)

* * * *

"নারীগণে দেখিয়া তবে নাটুয়া সোন্দরি।
কদলি সকলে করে নাটুয়া কাড়াকাড়ি।।" (৮০ পৃঃ)

* * * *

"মীনের দ্বায়ারে (৫) গিয়া মাদলে দিল হাত।
দুই কর্ণ পাত্তি স্থনে রাজা মীন নাথ।" (৮১ পৃঃ)

* * * *

"প্রণাম করিয়া নাথ মাদলে দিল হাত।
লোমাঞ্চিত হইয়া বৈসে রাজা মীন নাথ।।"
ডিমিকি ডিমিকি করি মাদলে দিল হাত। (৯৩ পৃঃ)
অমৃত সিঞ্চিল জেন দিয়া কর্ণ পথ।।
তাহার পশ্চাতে বাম মাদলেত ঘাত।
সর্ব্বপুরী মোহিত করিল গোর্থ নাথ।।" (৯৪ পৃঃ)

(গোরক্ষবিজয়)

তৎপর মুখে কোন কথা না কহিয়া গোরক্ষ নাথ মাদলের সাথে মন্দিরার ঝঙ্কারে ও নূপুরের তালে প্রহেলিকার সঙ্কেতে গুরুকে তত্ত্বকথা শুনাইতে লাগিলেন—

"পুখরিতে পানি নাই পাড় কেন বুড়ে।
বাসা ঘরে ডিম্ব নাই ছাও কেন উড়ে।।

(৪) নটীনির বেসে (৫) দরজায়

নগরে মনুষ্য নাহি ঘরে ঘরে চাল। (১৩৭ পৃঃ)
আন্ধালে দোকান দিয়া খরিদ কর কাল॥ (১৩৮ পৃঃ)
(গোরক্ষবিজয়)

জাগ যোগী কনক-বাবলিয়া গুরুদেব মেহলৌ বঠৌ।
খোঁজতা খোঁজতা সতগুরু পায়া সহজৈ ভাবৈ নৈট টৌ।"
(নাথপন্থের দিশা—কল্যাণশ্রী, শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৫৫ বাং)

এই ভাবেই—

"না চেন্ত গোর্খ নাথ তালে করি ভর।
মাটিতে না লাগে পদ আলগ উপর॥
নাচন্তি জে গোর্খনাথ ঘাঘরের রোলে।
কায়া সাধ কায়া সাধ মাদলে হেন বোলে॥
নবীন কুকিলে জেন আধ আধ বোলে।
কায়া সাধ কায়া সাধ মন্দিরাএ বোলে॥
হাতের ঠমকে নাচে পদ নহি লড়ে।
গগন মণ্ডলে জেন বিজলি সঞ্চরে॥
হাতের ঠমকে নাচে গাঅ (৬) নহি লড়ে।
আপনে ডুবাইলা ভরা গুরু মোচন্দরে॥
অবধান কর বাপু নোয়াম জে মাথা।
মুখেতে উত্তর নাহি মাদলেতে কথা॥
গোর্খনাথ নাচয় নেপুর রুণুঝুনু।
শুনিয়া জে মীন নাথ পুলকিত তনু॥
(গোরক্ষবিজয়— ৯৩, ৯৪, ৯৫ পৃঃ)

(৬) গাত্র, দেহ

"সাধ সাধ আপনা কায়া মাদলেত বোলে।
সর্ব্ব ধন হারাইলা কামিনীর কোলে ॥

* * * *

নাচেন্ত গোর্খ নাথ শূন্যে করি ভর।
মাটীতে না লাগে পাও আলগা উপর ॥
কায়া সাধ কায়া সাধ গুরু মোচন্দর।
তুমি গুরু মোচন্দর জগত ঈশ্বর ॥
মাদলের তাল স্তনি ভোলে মীন জাএ।
মাদলের রাএ (৭) কেনে গুরু মোরে কহে ॥ (৯৯ পৃঃ)
নাট কর নাটুয়া তাল বাহ ছলে।
তোহ্মার মাদলে কেনে গুরু গুরু বোলে ॥
এক সিস্য য়াছে (৮) মোর জতি গোরখাই।
আর সিস্য আছে মোর গাভুর সিধাই ॥
দুই সিস্য য়াছে মোর আহ্মি জানি ভাল।
তোহ্মি কেনে গুরু হেন মোরে বল ছলে ॥ (১০০ পৃঃ)

* * * *

নাচন্ত জে গোর্খ নাথ মাদলেত হাত।
সিস্য পুত্র চিনি লও গুরু মীন নাথ ॥

(গোরক্ষবিজয়)

গোরক্ষ নটির নাচগানে মুগ্ধ হইয়া—

"মীনে বোলে জদি হও জতি গোরখাই।
আলগ আসনে নাট কর দেখি চাহি ॥

---

(৭) শব্দে (৮) আছে

মীনের স্থনিয়া হেন মধুর বচন।
আলগ আসনে নাট করে ততক্ষণ ॥
দেখিয়া যে মীন নাথ বুঝিয়া না বুঝে।
তুমি যদি গোর্খ হও নাচ জল মাঝে ॥
জল পরে থাল রাখি নাট কর তোহ্মি।
তবে গোর্খ নাথ হও জানিবাম আহ্মি ॥
মীনের বচন স্থনি গোর্খ মোহাজন।
জলের উপরে নাচে জেহেন খঞ্জন ॥
মীনে বোলে সাচা পুএ জতি গোরখাই।
পড়িছি কামিনীর ভোলে কিরূপে এড়াই ॥”

(গোরক্ষবিজয়— ১০৪, ১০৫ পৃঃ)

আরে গোর্খা কি করিনু কি বিষ খাইনু।
আপনার মুখেতে আনল জ্বালি দিনু ॥
ধিক ধিক মোরে এবে কি করিব কহ।”

(ভক্তমাল গ্রন্থ)

“গোর্খ নাথ কহে ছাড়ি এখনি চলহ ॥

(ভক্তমাল গ্রন্থ)

উত্তরে মীন নাথ বলিতেছেন—

“বির্ধ (৯) কাল হইলুম মুই না পারি চলিতে।
মাগিয়া খাইতে না পারিমু কহিলাম তোহ্মাতে ॥
তবে পাকিল মাথার কেস আয়ু হইল সেস।”

(গোরক্ষবিজয়— ১৩২ পৃঃ)

---

(৯) বৃদ্ধ

তদুত্তরে—

"কহিতে কহিতে গোর্খ হাতে মারে তুড়ি।
বিচলিত মীন নাথ রাজ্য পাট ছাড়ি॥
উলটিয়া কৈল গোর্খে মীন কর্ণে লাগি।
জ্ঞানের প্রভাবে তান (১০) ভ্রম গেল ভাগি (১১)॥"

(গোরক্ষবিজয়— ১৫২ পৃঃ)

গোরক্ষ নাথের প্রস্তাবে মীন নাথের সুমতি জন্মিল। তিনি কদলী রাজ্য ত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন এবং প্রস্থানের আয়োজন করিতে লাগিলেন। এমন সময় মীন নাথের পুত্রকে কোলে লইয়া রাজমহিষী আসিয়া উপস্থিত হইলেন—

"হেন কালে সাজি রথ কদলির জুবতি।
নানা ভেসে রহে সব মীনেরে আহুতি।
কাকে করি মোহাদেবী বিন্দুক নাথেরে।
সাজিয়া রহিল দেবী মীনের গোচরে॥"

(গোরক্ষবিজয়— ১৫৫ পৃঃ)

কদলী রাজ্যের ষোল শত নারীকে অশ্রুনীরে ভাসাইয়া, গোরক্ষ নাথের আপত্তি সত্ত্বেও কিছু ধনরত্ন সঙ্গে লইয়া মীন নাথ কদলীরাজ্য ত্যাগ করিলেন। অনাবশ্যক বোধে পথিমধ্যে গোরক্ষ নাথ এ সব ধনরত্ন গুরুর অজ্ঞাতসারে ফেলিয়া দিতে লাগিলেন। মীন নাথ—

"হারে গোর্খা কি করিলে এহেন পদার্থ।
টানিয়া ফেলিলি সব বহু মূল্য অর্থ॥"

(ভক্তমাল গ্রন্থ)

তখন—

"গোর্খ নাথ কহে প্রভু এ কোন পদার্থ।
আমি বুঝি এতো মাত্র কেবল অনর্থ॥

(১০) তাঁহার (১১) ভাঙ্গিয়া। ভ্রম দূর হইল।

অতি তুচ্ছ দ্রব্য এত প্রস্রাব করিতে।
ইহা হইতে উত্তম নিকশে কত মতে॥"

(ভক্তমাল গ্রন্থ)

তদুত্তরে ক্রোধান্বিত স্বরে—

"মীন নাথ কহে গোর্খ প্রলাপ কি কহ।
মণিমুক্তা ঝরে তব প্রস্রাবের সহ (?)॥"

(ভক্তমাল গ্রন্থ)

এ সব কেবলমাত্র বাক্যাড়ম্বর নহে—

"গোর্খ নাথ কহে দেখ ঝরে কি না ঝরে।
এত কহি প্রস্রাব কয়য়ে ধীরে ধীরে॥
মণিমুক্তা আদি কত ঝরিতে লাগিল।
মীন নাথ দেখি আপনারে ধিক দিল॥"

(ভক্তমাল গ্রন্থ)

এ সব দেখিয়া মীন নাথ নিজের শোচনীয় অধঃপতনের বিষয় উপলব্ধি করিতে ারিয়া—

"আরে গোর্খা তুঞি মোরে উদ্ধার করিলি।
শিষ্য হৈয়া গুরুবত কার্য্য যে কৈলি॥"

(ভক্তমাল গ্রন্থ)

কদলীর প্রেমাসক্ত মীন নাথকে উদ্ধার করিয়া গুরুপুত্র বিন্দু নাথ সহ দলীরাজ্য ত্যাগকালে কদলীকে গোরক্ষ নাথ শাপ দিলেন—

"চন্দ্র-সূর্য্য সাক্ষি করি গোর্খ নাথে বোলে॥
মুখে খাও মুখে বর্ছ মুখে জাও সঙ্গ।
গোর্খের শাপেতে উঠ হইয়া পতঙ্গ॥

বিক্ষে'র (বৃক্ষের) ফলমূল বসি কর পান।
এহি শাপ দিল তোরে করি সমাধান ॥
এ বলিয়া জতি নাথ হাতে দিল তুড়ি।
বাদুর হইয়া সব কদলি গেল উড়ি ॥

* * * *

তবে গোর্খ নাথে আসনে কৈল মন।
বিন্দু নাথেরে কৈলা আসন আরোহণ ॥
আসনে তুলিয়া তিন করিলা গমন।
এই মতে চলি গেলা বিজয়নগর ॥"

(গোরক্ষবিজয়— ১৯৭ ও ১৯৮ পৃঃ)

"হে গুরু গোরক্ষ নাথ, মোহমুগ্ধ গুরুর পতনে
যে শিক্ষা লভিলে তুমি তব দীর্ঘ তাপস জীবনে
মহাজ্ঞান হ'তে তাই ঢের বড়। বিরূপা শক্তির
পাষাণ হৃদয়ে তুমি সঞ্চারিলে বাৎসল্যের ক্ষীর।

* * * *

মনে জাগে সেই চিত্র যত্নভরে ধরি দুটী হাতে
পঙ্কিল পল্বল হতে উদ্ধারিছ গুরু মীন নাথে।
গুরু হতে শিষ্য বড় এই সত্য জাগে তার সনে,
জগতের জ্ঞানালোকে যুগে যুগে ক্রমবিবর্ত্তনে,
শিষ্য পরম্পরাক্রমে সাধনার শক্তি বেড়ে যায়,
শিষ্যধারা মগ্নপ্রায় ভগ্ন জানু গুরুরে বাঁচায়।
শ্রান্ত হয়ে গুরু যদি ব্রতভঙ্গে সুখশয্যাগত,
শিষ্য করে উদ্‌যাপন গুরুত্যক্ত অসমাপ্ত ব্রত।"

(কবিশেখর কালিদাস রায়—ভারতবর্ষ, কার্ত্তিক, ১৩৫০ বাং)

সায়নাচার্য্যকৃত শঙ্করবিজয়ম্ গ্রন্থের ৯ম অধ্যায়ে দেখা যায় শঙ্করাচার্য্য (৮ম খৃঃ অঃ) কোনও মৃত রাজার শরীরে প্রবেশকালে তাহার শিষ্য সনন্দন তাঁহাকে একটি প্রাচীন ইতিহাস বলিয়াছিলেন। তাহা এই—

"মৎস্যেন্দ্রনামাহি পুরা মহাত্মা গোরক্ষমাদিশ্য নিজাঙ্গগুপ্ত্যৈ।
নৃপস্য কস্যাপিতনুং পরাসোঃ প্রবিশ্য তৎপত্তনমাসসাদ॥ ৮০
ভদ্রাসনাধ্যাসিনী যোগিবর্য্যে ভদ্রাণ্য নিদ্রাণ্যভবনে প্রজানাম।
ববর্ষকালেষু বলাহকোঽপি শস্যানি চাসাস্য ফলাণ্যভবন্॥ ৮১
বিজ্ঞায়বিজ্ঞা সচিবানৃপস্যকায়ে প্রবিষ্টং কমপিহ দিব্যম্।
সমাদিশন্ বাজসরোরুহাক্ষীঃ সর্ব্বাত্মনাতস্য বশীক্রিয়ায়ৈ॥ ৮২
সঙ্গীত লাস্যাভিনয়াদিকেষু সংসক্তচেতা ললিতেষু তাসাম্।
স এব বিস্মৃত্য মুনিঃ সমাধিং সর্ব্বাত্মনা প্রাকৃত বদ্‌বভুব॥ ৮৩

(শঙ্করবিজয়ম— ৯ অধ্যায়, ৮০—৮৩)

অর্থাৎ পুরাকালে মৎস্যেন্দ্র নাথ নামক এক মহাত্মা আপনার শরীর রক্ষা করিবার জন্য আপনার শিষ্য গোরক্ষকে আজ্ঞা দিয়া কোন এক মৃত রাজার শরীরে প্রবেশ করেন এবং পরে তিনি আপনার রাজ্য প্রাপ্ত হন। ঐ যোগিবর রাজসিংহাসনে উপবেশন করার পর প্রজাবর্গের অক্ষয় মঙ্গল বিধান হইতে লাগিল। সুবিজ্ঞ সচিবমণ্ডলী নৃপশরীরে কোনও এক স্বর্গীয় পদার্থ প্রবিষ্ট হইয়াছে জানিয়া সম্পূর্ণরূপে তাঁহাকে বশীকরণ করার নিমিত্ত নৃপতির কমল-লোচনা কামিনীদিগকে আদেশ করেন। যে কামিনীদিগকে আদেশ করা হয় তাঁহাদিগে রসুললিত সঙ্গীত, নৃত্য ও অভিনয়াদি কার্য্যে সংলগ্নচিত্ত থাকিয়া ঐ মুনিবর সমাধি বিস্মরণপূর্ব্বক সম্পূর্ণরূপে সাধারণ মানুষের মত অবস্থাসকল প্রকাশ করিলেন।

অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ বলেন— "সন্তলীলামৃতে আছে যে, গোরক্ষ নাথ মৎস্যেন্দ্র নাথকে স্ত্রীরাজ্যে দেখিতে পান। সেখানে মৎস্যেন্দ্র নাথ

সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া রাণী প্রমীলাকে লইয়া মাতিয়া ছিলেন। মহীপতি গোরক্ষ ও মৎস্যেন্দ্রকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। মছন্দর নাথ বা মৎস্যেন্দ্র নাথের প্রধান শিষ্য গোরক্ষ নাথ। প্রবাদ আছে গোরক্ষ নাথ শিষ্য হইয়া তপস্যা করিবার জন্য বনগমন করেন, এবং বহু বর্ষ পরে ফিরিয়া আসেন। ইতঃমধ্যে মছন্দর বিষয়বাসনায় লিপ্ত হইয়া যোগভ্রষ্ট হন। এই সময় গোরক্ষ গুরুদেবের গৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হন। গুরু তথায় বেশ্যার নাচ দেখিতেছিলেন। ইহা দেখিয়াই গোরক্ষ নাথ নিজ সিদ্ধিবলে এমনই লীলা করিলেন এবং বাদ্যযন্ত্রের এমনই ধ্বনি করিতে লাগিলেন— "মছন্দর জাগ, গোরখ আসিয়াছে" যে উহা শুনিতে শুনিতে মচন্দরের জ্ঞান হইল ;— গোরখকে ডাকিয়া বলিলেন— "এখন তুমি আমার গুরু" (প্রবাসী—ফাল্গুন, ১৩২৮ বাং)।

যাহা হউক সিদ্ধা মীন নাথের নারীপ্রেমে মত্ত হওয়ার এবং রাজপদ প্রাপ্তির অতি সত্য ঘটনাটি যুগে যুগে নানা স্থানে নানা ভাবে চিত্রিত হইয়া নব নব রূপ ধারণ করিয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য।

সাহিত্যাচার্য্য রায় দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর বলেন—"গোরক্ষ ভগবতীর সমস্ত প্রলোভন একটি একটি করিয়া জয় করিয়া য়িহুদিশ্রেষ্ঠ ভাবের মত অকুণ্ঠিত ভাবে স্থৈর্য্যপরায়ণ। নারীর ললাম সৌন্দর্য্য ও প্রেম নিবেদনের নব নব কষ্টি-পাথরে তাঁহার চরিত্র কতবার কষিত হইল, কিন্তু প্রত্যেক বারই প্রমাণিত হইল তাহা খাঁটি সোনা। পার্ব্বতী শিবের নিকট স্পর্দ্ধা করিয়া বলিয়াছিলেন, তাঁহার মায়ার নিকট যোগীর সাধনা কোন্ ছার। অন্যান্য যোগীরা রূপের জালে পড়িয়া ধৃত হইলেন, মীন নাথ স্বয়ং মীনের মতই জালে আবদ্ধ হইলেন, কিন্তু গোরক্ষ নাথের নিকট পার্ব্বতীর উচ্চ শির হেট হইল। গোরক্ষ নাথ কিরূপে নর্ত্তকী সাজিয়া কদলীপত্তনে তাঁহার গুরুকে উদ্ধার করেন, মৃদঙ্গের ধ্বনিতে গুরুর উদ্বোধন কিরূপে ফুটিয়া উঠিছিল, 'কায়া সাধ' উপদেশ বারংবার

মৃদঙ্গ হইতে ধ্বনিত হইয়া কিরূপে কদলীপত্তনের রাজপ্রাসাদ কম্পিত হইয়াছিল তাহা পাঠক নিজে পড়িয়া কৃতার্থ হইবেন" (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য)।

"সেন সাম দাসে কহে গোক্ষ মহাশয়।
আনন্দে করিল তবে কদলি বিজয় ।।"

(মীনচেতন— ৪৭ পৃঃ)

নারীরাজ্য, স্ত্রীরাজ্য ও কদলী রাজ্যের আধুনিক স্থান নির্ণয়

'মহাভারতে' এবং তিব্বতীয় ভাষার 'পাগশাম জোনবজান' গ্রন্থে কদলী ক্ষেত্রের উল্লেখ আছে (J. R. A. S. Bengal, 1898, Part I, Page 20)। শিখগুরু নানকরচিত 'প্রাণ-সংগলী' গ্রন্থের ৩১শ অধ্যায়ে আছে—"কজরীবন মাছংদ্র নাথ।" বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গোরক্ষবিজয়ে 'কদলি', 'কদলি-নগর' "কদলির সভা", গোপীচাঁদের সন্ন্যাসে 'কোদালি সহর', পদুমাবতীর যোগিখণ্ডে 'কজরীবন', গোবিন্দচন্দ্র গীতে 'কদলিবন' এর এবং জৈমিনী মহাভারতে ও বাৎসায়নের কামসূত্রে স্ত্রীরাজের উল্লেখ আছে। সন্তলীলামৃতে নারীরাজ্যের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। একটি নারীরাজ্য তিব্বতের উত্তর-পশ্চিমাংশবর্ত্তী একটি জনপদ। গরবাল ও কুমায়ূনের মধ্য দিয়া যে পাঁচটি গিরিপথ ভোটরাজ্যাভিমুখে গিয়াছে, নারীরাজ্য তাহার প্রান্তভাগে অবস্থিত। প্রবাদ আছে যে পূর্ব্বে এখানে নারীরা রাজত্ব করিতেন (বিশ্বকোষ—১০ম ভাগ, নারীশব্দ)।

যে কদলীরাজ্যের রাজা, প্রজা, দেওয়ান সবই স্ত্রীলোক ছিলেন, সে কদলীরাজ্যকে স্ত্রীরাজ্য বা নারীরাজ্য বলা একান্তই সম্ভবপর। উক্ত কদলীরাজ্য, স্ত্রীরাজ্য ও নারীরাজ্য একই রাজ্য ছিল বলিয়া অনুমিত হয়।

ঢাকা মিউজিয়ামের অধ্যক্ষ ৺ডাঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী অনুমান করেন

স্ত্রীস্বাধীনতার দেশ কামরূপ, মনিপুর ও ব্রহ্মদেশই কদলীরাজ্য (ময়নামতীর গান—১২২ পৃঃ)। অধ্যক্ষ ডাঃ শহীদুল্লাহর অনুমান কাছাড় জিলাই কদলী-রাজ্য (Les chantes Mystiques—Page 27)। অধ্যাপক হারাণচন্দ্র চাকলাদার বাহ্লিক দেশকে বক্ত্রিয়া ধরিয়া স্ত্রীরাজ্যের অবস্থিতি, তাহারই নিকটে নেহাত উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কোথাও হইবে বলিয়া অনুমান করিয়াছেন (Social life in ancient India studies in Vatsyana's Kamasutra—Page 59—60)। ডাঃ গ্রীয়ার্সন সাহেব মহাভারতের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বলেন ডেরাডুন হইতে আরম্ভ করিয়া হৃষীকেশ বদরিকাশ্রম, এবং ইহার উত্তরে হিমালয়প্রান্ত পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানই কদলীবন। স্থানীয় লোকেরা এই স্থানকে কজরীবন বলে।

"জউ ভল হোতা রাজ অউ ভোগু।
গোপীচন্দ নহিঁ সাধত জোগু॥
উহ-উ সিসিটি ভউ দেখা পরেবা।
তজরাজ কজরীবন সেবা॥

(পদ্মাবতীর যোগীখণ্ড)

তিনি আরও বলেন, এখানে অনেক কদলীবৃক্ষ ও হাতী দেখিতে পাওয়া যায়। সিদ্ধা না হইলে এই বনে কেহ প্রবেশ করিতে পারিত না। এখনও এই বনে হনুমান সুখে বিরাজ করিতেছেন বলিয়া প্রবাদ আছে (নাথপন্থ—প্রবাসী, ফাল্গুন, ১৩২৮ বাং)। কেহ কেহ বর্ত্তমান জয়ন্তিয়া পরগণাকে মহাভারতোক্ত নারীদেশ বলিয়া মনে করেন। নারীদেশের অধিপতি প্রমীলা যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব বন্ধন করিয়া অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করেন এবং পরাস্ত হন। (১)

আসাম পূর্ত্তবিভাগের ইঞ্জিনিয়ার প্রত্নপ্রেমিক শ্রীরাজমোহন নাথ অনেক যুক্তিপ্রমাণ দ্বারা দেখাইয়াছেন যে আসাম উপত্যকার নগাঁও জিলার কন্দলী

(১) সংক্ষিপ্ত ভারত-কথা।

মৌজাই প্রাচীন কদলীরাজ্য ছিল (সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকা—১৩৪৭ বাং, ৪র্থ সংখ্যা ও কদলীরাজ্য —৩৬, ৩৭ পৃঃ)।

উপরোক্ত আলোচনায় দেখা যাইতেছে যে, কদলীরাজ্যের আধুনিক স্থান-নির্ণয় সম্বন্ধে বিভিন্ন পণ্ডিত বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। যাহা হউক পণ্ডিতদের কথিত কদলীরাজ্য, স্ত্রীরাজ্য ও নারীরাজ্য একই রাজ্য বলিয়া অনুমিত হয়। ইহার একটি তিব্বতের উত্তর-পশ্চিমাংশে অবস্থিত এবং অন্যান্যগুলি ভারতে (পাকিস্থান সহ) অবস্থিত।

আমরা ৪র্থ অধ্যায়ে প্রমাণ করিয়াছি যে নেপালরাজ স্বীয় দেশের দ্বাদশ-বর্ষব্যাপী দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টি নিবারণ করার উপায় উদ্ভাবনের জন্য ৫২২ খৃঃ অব্দে (৩য় অধ্যায়ে এ সম্বন্ধীয় স্মৃতি ফলকের নকল দেখুন)। মীন নাথকে বিশেষভাবে নিমন্ত্রণ করিয়া নেপালে নিয়াছিলেন। মীন নাথ তথায় গিয়া এ সব দুর্দৈবের অবসান করিয়াছিলেন। নেপালীদের মধ্যে প্রবাদ আছে যে মীন নাথ শেষ বয়সে কামরূপ হইয়া নেপালে গিয়াছিলেন এবং মীন নাথের অনুসন্ধানে গোরক্ষ নাথ তথায় গিয়াছিলেন। (১) গোরক্ষবিজয়ের বিবরণে নিঃসন্দেহে বলা হইয়াছে যে মীন নাথ শেষ বয়সে নারীপ্রেমে মত্ত হইয়া সিদ্ধি হারাইয়াছিলেন (১৩২ পৃঃ)। যদি মীন নাথ ভারতীয় (পাকিস্থান সহ) কোন কদলীরাজ্যে বা নারীরাজ্যের প্রেমজালে আবদ্ধ হইয়া সিদ্ধি হারাইতেন তবে নারীপ্রেমে মত্ত একজন সিদ্ধিহারা যোগীকে কি নেপালরাজ তাঁহার দেশের কল্যাণ কামনায় বিশেষভাবে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার দেশে লইবার চেষ্টা করিতেন ? আর সিদ্ধিহারা মীন নাথ কি তথায় গিয়া প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করিয়া দ্বাদশ বর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ দূর করিতে পারিতেন ? কদলীমায়ামুক্ত বৃদ্ধ মীন নাথের পক্ষে এ সময় আবার

(১) ডক্টর শহীদুল্লাহর 'মীন নাথ ও কানুপা'—শনিবারের চিঠি, আশ্বিন, ১৩৫১ বাং)

সাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভের চেষ্টা সুকঠিন ছিল সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই এরূপ অনুমানও যুক্তিহীন নহে।

অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ বলেন—"মৎস্যেন্দ্র নাথ ভোগবিলাসে রত থাকিতেন বলিয়া তাঁহার শিষ্য গোরক্ষ নাথের আদেশে নেপালাধিপতিকে আজও এক একটি ব্রাহ্মণ কন্যা মৎস্যেন্দ্র নাথের মঠের সহিত বিবাহ দিতে হয়। ঐ প্রথা মহারাজের কৌলিক নিয়ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ঐ সমস্ত বিবাহিতা কন্যা মঠে সতীরূপে থাকিয়া সেবাকার্য্যে জীবনাতিপাত করে। ইহারা নাথিনী।"

(প্রবাসী—ফাল্গুন, ১৩২৮ বাং, নাথপন্থ)

মীন নাথ শেষ বয়সে (৫২২ খৃঃ অব্দে) নেপাল গিয়া নেপাল, তিব্বত প্রভৃতি স্থানে স্বীয় প্রভাব পূর্ণভাবে বিস্তার করার পর ৬ষ্ঠ খৃঃ অব্দের শেষ ভাগে বা ৭ম খৃঃ অব্দের প্রারম্ভে (৪র্থ অধ্যায় মৎস্যেন্দ্র নাথের সময় বিচার দ্রঃ) তিব্বতের উত্তর-পশ্চিমাংশবর্ত্তী নারীরাজ্যের (কদলীরাজ্যের) নারীপ্রেমে মত্ত হইয়া সিদ্ধি হারাইয়া রাজপদ লাভ করিয়াছিলেন, এবং সেই জন্যই গোরক্ষ নাথ নেপালাধিপতিকে উক্ত নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়, যাহার ফলে নেপালাধিপতি পুরুষানুক্রমে গোরক্ষ নাথের উক্ত নির্দ্দেশ অবনতমস্তকে পালন করিয়া আসিতেছেন। অতএব মীন নাথ তিব্বতের উত্তর-পশ্চিমাংশবর্ত্তী নারীরাজ্যের প্রেমাবদ্ধ হইয়া তথায় রাজত্ব করিয়াছেন বলিয়াই অনুমিত হয়। "মৎস্যেন্দ্র নাথ যোগমার্গভ্রষ্ট হইয়া নারীরাজ্যের অধিশ্বরী রাণী প্রমীলার প্রেমাস্পদ হইয়া পড়েন" (নেপালভ্রমণ-বৃত্তান্ত—মানসী ও মর্ম্মবাণী, পৌষ, ১৩২৯ বাং)

মীন নাথের অন্বেষণে গোরক্ষ নাথ কদলীতে গিয়া মীন নাথের খনিত এক অতীব রমণীয় সরোবরের তীরে বিশ্রাম করিতেছিলেন, সে সময় যোগিজাতীয়া এক রমণী—

"আহ্মি কহি সাদা চিত্তে পাইলে মীনের দূতে
প্রাণি লইব জানিয়া বৈদেসি (বিদেশী)।

* * * *

জোগি বাড়ীতে জোগি যাইবা অন্নজলে স্থিতি পাইবা
কিবা য়ার (আর) হইবেক বএ (ব্যয়)।
তোহ্মি আহ্মি ঙ্গাতি (জ্ঞাতি) জন এক গোত্রে উতপন (উৎপন্ন)
তাতে পুনি দোষ নাহি হএ ॥
গাভুর জোগিয়া তুহ্মি জোয়ান যোগিনি আহ্মি
জেবা থাকে করিমু বেবহার।

* * * *

কাটিমু চিকন সুতি তোহ্মিহ বুনিবা ধুতি
হাটে নি বেচিলে পাইবা কৌড়ি।

* * * *

তবে সে সমাজে যাইবা মদের ঘটি আগে পাইবা
কথা কহিবা দুই হাত লাড়ি।
(গোরক্ষবিজয়— ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭ পৃঃ)

এই সব কথার উত্তরে গোরক্ষ নাথ বলিতেছেন—

"হাসিয়া উত্তর দিল জতি গোরখাই।
ভাল কথা কহিয়াছ কদলীর মাই ॥
মাগিয়া খাইএ আহ্মি বেড়াই নানা দেস।

* * * *

সুনিয়া দেশের কথা বড় লাগে ভয়।
মাগিয়া খাইতে য়াইলুম জীবন সংসয় ॥
কোন দেশে নহি সুনি এমত প্রমাদ।"
(গোরক্ষবিজয়— ৬৮ পৃঃ)।

মীন নাথ নেপাল, তিব্বত প্রভৃতি দেশে স্বীয় ধর্ম্মপ্রভাব বিশেষভাবে বিস্তার করিয়াছিলেন। অতএব সে সমস্ত স্থানের যে সব লোক তাঁহার ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন তাঁহারা নাথদের সধর্ম্মী। সে সব দেশের স্ত্রীলোকেরা কুটীরশিল্পে সিদ্ধহস্ত। সামাজিক হিসাবে বিচার করিলে দেখা যায়, পার্ব্বত্য জাতির মধ্যে উৎসব ব্যাপারে কলসী কলসী মদ্যপানের রীতি আছে। গোরক্ষ নাথ যোগিনীকে বলিতেছেন—"জোগি রাউল সকলে খোটা দিব তোরে ॥" (৭০ পৃঃ) এই 'রাউল' শব্দ কোন্ ভাষা হইতে উৎপন্ন জানি না। "রাউলী অর্থে বৌদ্ধসন্ন্যাসীকে বুঝায়" (গোরক্ষবিজয়—ভূমিকা, ২৮ পৃঃ)। ঐ সব দেশ বৌদ্ধধর্ম্মে প্লাবিত ছিল। মীন নাথ, গোরক্ষ নাথ ইহাদিগকে হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষা দেন (২য় অধ্যায় দ্রঃ); তথাপি ঐ সব অঞ্চলে সে সময়ও বৌদ্ধ-প্রভাব ছিল, এখনও আছে। তারপর গোরক্ষ নাথ 'যোগিনী'র কথার উত্তরে যাহা বলিয়াছেন, সে সব কথা সম্পূর্ণ অপরিচিত দূর দেশের পক্ষেই প্রয়োজ্য। পার্ব্বত্য অঞ্চলের উপত্যকায় খনিত সরোবরই অতীব রমণীয় হইয়া থাকে। কদলীরাজ্যে স্ত্রীপ্রাধান্য ছিল। আজও পার্ব্বত্য অঞ্চলে স্ত্রীপ্রাধান্য দৃষ্ট হয়। তারপর 'যোগিনি' গোরক্ষনাথের রূপে মুগ্ধ হইয়া গোরক্ষ নাথের মত একজন অতি শ্রদ্ধেয় সন্ন্যাসীর নিকট যে ভাষায় ও যে ভঙ্গীতে প্রেম ভিক্ষা করিয়াছেন, তাহা আর্য্যভাষী ভারতের কোনও রমণীর পক্ষে অসাধ্য বলিয়াই আমাদের ধারণা। তারপর 'যোগিনি' গোরক্ষ নাথকে ভয় দেখাইয়া তাঁহার বাড়ীতে লইবার চেষ্টা করিতেছেন—

"কথা হোতে আইস (১) জোগি কোন দেসে ঘর।
কি হেতু আসিছ তুহ্মি কদলি নগর ॥
জখনে হইছে রাজা ঈশ্বর মিনাই।
তদবধি এহি দেশে বিদেসি জোগি নাই" ॥ (৫৮ পৃঃ)

---

(১) কোথা হইতে আসিয়াছ।

"পরদেসী জোগি পাইলে লইয়া জাএ ধরি।
দক্ষিণ পাটনে মিয়া তারে পালাএ মারি (২)॥
লাখে লাখে জোগি সব পালাইল মারি।
মৃত জোগির গন্ধে পথ বহিতে না পারি॥" (৫৭পৃঃ)

"চল জাই আহ্মার (জ্ঞে) বাড়ি।
(গোরক্ষবিজয়— ৬৩ পৃঃ)

অনুসন্ধানকারী 'লাখে লাখে জোগি'কে হত্যা না করা হইলেও কয়েক জনকে যে হত্যা করা হইয়াছে সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। এরূপ নির্দ্দয় কার্য্য পার্ব্বত্য অঞ্চলেই সহজসাধ্য।

কদলীমায়ামুক্ত মীন নাথ গোরক্ষ নাথকে বলিতেছেন—

"তোমারে দেখিয়া মোর পাট্টা হেন বুক।
মৃত্তু কালে (৩) না দেখিলুম গাভুর সিধার মুখ॥
কাথা ঝুলি নেয় পুত্র যার (৪) লাউয়া লাঠি।
তোহ্মার হস্তেতে মোরে দেয় (দিও ?) মুষ্টি মাটি॥"
(গোরক্ষবিজয়— ১১৬ পৃঃ)।

দীর্ঘকাল যাবত যিনি আত্মীয়-স্বজনহীন অবস্থায় বিদেশে থাকেন, তাঁহার মুখ হইতে উক্তরূপ উক্তিই বাহির হওয়া স্বাভাবিক।

তারপর কাহার কোনও আত্মীয় নিরুদ্দেশ হইলে প্রথমতঃ দেশে খবর করিয়া তাঁহাকে পাওয়া না গেলে বিদেশে খবর করা হয়। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি মীন নাথের অন্বেষণে গোরক্ষ নাথ নেপাল গিয়াছিলেন। ভারতে (বর্ত্তমান পাকিস্থানসহ) খবর করিয়া তাঁহাকে না পাইয়াই গোরক্ষ নাথ

(২) হত্যা করে। (৩) মৃত্যুকালে (৪) আর

প্রতিবেশী রাষ্ট্র নেপাল হইয়া তিব্বতে গিয়া আমাদের কথিত নারীরাজ্যে মীন নাথকে পাইয়াছিলেন বলিয়া অনুমান করা অসঙ্গত নহে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি রাজমোহন বাবু তাঁহার "কদলীরাজ্যে" কন্দলীকে কদলী-রাজ্য বলিয়াছেন। এখন সে সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। তিনি বলেন আসামের "নগাঁও সহর হইতে ১১ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে কন্দলী নামে একটি মৌজা আছে। সেই মৌজার স্থানে স্থানে প্রাচীন মন্দিরের নিদর্শন এবং হর-পার্ব্বতীর ভগ্ন মূর্ত্তি ও শিবলিঙ্গ পাওয়া গিয়াছে। ডবকা ও কন্দলীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে ২৫৪৬ ফিট উচ্চ কমলাদেবীর পর্ব্বত আছে। এই পর্ব্বতের উপর প্রাচীন মন্দির ও পুষ্করিণীর ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। স্থানীয় লোকেরা এখনও ভক্তিবিমিশ্রিত ভীতির সহিত সেই পর্ব্বতের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া থাকে। কালিকাপুরাণে এই কমলাদেবীর স্থানকে রক্তদেবীর পীঠ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, এবং এই পর্ব্বতের দক্ষিণ-পূর্ব্বে আর একটি পর্ব্বতে হেরুক নামে শিবলিঙ্গ আছে বলিয়া উল্লিখিত আছে (১)। এই পর্ব্বত বর্ত্তমানে লিঙ্গথোয়া পর্ব্বত নামে পরিচিত" (৩৫ পৃঃ)।

কদলীরাজ্যে প্রচুর অগুরু চন্দনকাষ্ঠ ছিল। সে সম্বন্ধে রাজমোহনবাবু বলিতেছেন— "কন্দলী ও বামুনী পাহাড়ের পারিপার্শ্বিক মিকির পাহাড়ে এখনও পর্য্যাপ্ত অগুরু চন্দন পাওয়া যায় এবং মহলদারেরা এখনও উহা দেশ বিদেশে রপ্তানী করিয়া থাকে। পার্ব্বত্য লোকের নিকট হইতে এখনও অনেক সময় 'চারি কড়ায়' 'এক তোলা' চন্দন কাষ্ঠ পাওয়া অসম্ভব নহে" (৩৭ পৃঃ)।

"কদলী দেশবাসীগণ যে নাথধর্ম্মে বিশ্বাসী যুগী জাতীয় ছিল, তাহার

(১) কালিকা পুরাণ (বঙ্গবাসী) ৭৯ অঃ ১৬৫। এখনও লোকের বিশ্বাস, কমলাদেবীর স্থান দর্শন করিব এই উদ্দেশ্য লইয়া গেলে পাহাড়ে পথ হারাইয়া যায়; তবে শিকারীরা প্রায়ই সেই স্থান দেখিতে পায়। Nowgong District Gazetteerএ এই স্থানের উল্লেখ আছে— ৬ পৃঃ।

বহুল প্রমাণ আলোচ্য গ্রন্থে (গোরক্ষবিজয়ে) পরিলক্ষিত হয়" (গোরক্ষবিজয়-ভূমিকা— ২৭ পৃঃ) ; এবং সে রাজ্যের মেয়ে লোকেরা পাটের পাছড়া প্রস্তুত করিতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। সে সম্বন্ধে রাজমোহনবাবু বলিতেছেন— "কন্দলী মৌজার সন্নিকটবর্ত্তী ননই, দীঘলদড়ি, পেটভরা প্রভৃতি স্থানে বর্ত্তমানেও হাজার হাজার নাথযোগীর বাস। তাহারা বর্ত্তমানেও 'পাটের পাছড়া' প্রস্তুত করিতে সিদ্ধহস্ত, এবং তাঁহাদের মেয়েরা এখনও পাটের 'চিকণ সুত্তি' কাটিয়া বেশ দু' পয়সা রোজগার করে। পাটের সুতার পোকার চাষ এই জাতীয় লোক ভিন্ন অন্য কেহ জানে না। কন্দলীর পাটের সুতা আজকালও বিখ্যাত (District Gazetter Nowgong, Page 144)। পুরুষেরা বর্ত্তমানে অধিকাংশই বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী ও কৃষিকর্ম্মপরায়ণ ; এখন কৌল ধর্ম্মের চক্রে সাধারণতঃ তাহারা বসে না, এবং সমাজে মদের ঘটী আগে পাইবার আকাঙ্ক্ষা এখন কাহারও নাই (৩৭ পৃঃ)।

গোরক্ষ নাথের শাপে সব কদলী বাদুড় হইয়া উড়িয়া গিয়াছিল। সে সম্বন্ধে রাজমোহন বাবু বলেন— "কন্দলী চা-বাগানের তিন মাইল ঈশান কোণে পাহাড়ের উপর বাদুলী কুরুং নামে একটি গুহা আছে। সরকারী কঠিয়াতলী আমলকী সদর রাস্তা হইতে প্রায় দেড় মাইল পাহাড়ের উপর যাইতে হয়। বৃহৎ শিলাময় পর্ব্বতের নিম্নদেশে পর্ব্বতের ভিতরে এক প্রশস্ত গহ্বর আছে। সম্মুখে বৃহৎ প্রস্তর যেন প্রাচীরস্বরূপে রক্ষিত হইয়াছে। এই প্রাচীর বাহিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলে, নীচের গহ্বরের দ্বারদেশ দেখা যায়। গহ্বরের দুইটী দ্বার ; ভিতর অতি প্রশস্ত, কিন্তু ঘোর অন্ধকারময়। এই গুহার ভিতর লক্ষ লক্ষ বাদুড় বাস করে। মানুষের আগমনের শব্দে ইহারা এমনই এক তুমুল আলোড়ন করে যে মনে হয় যেন ভূমিকম্পে সমগ্র পর্ব্বত কম্পিত হইতেছে। পার্শ্ববর্ত্তী অধিবাসীরা গুহাটিকে দেবতার স্থান বলিয়াই সম্মান করে, এবং এই বাদুড়গুলিকে কমলাদেবীর আশ্রিত অনুচর বলিয়া বিশ্বাস করে।

27

কন্দলী পর্ব্বতের অপর অংশের নাম বামুনী পর্ব্বত। এই পর্ব্বতের স্থানে স্থানে জলপ্রপাত, গুহা ও প্রাচীন মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ আছে। বাদুলী-কুরুংয়ের আট মাইল উত্তরে প্রাচীনকালের ধ্বংসাবশেষপূর্ণ চম্পানালা পাহাড় হংসধ্বজ রাজার নগর ছিল বলিয়া প্রবাদ আছে" (৩৬ পৃঃ)।

"চতুর্দ্দশ পঞ্চদশ শতাব্দীতেও কন্দলীর বিশিষ্ট অধিবাসীদের পদবী 'কন্দলী' ছিল। অনন্ত কন্দলীর মহাভারত ও ভাগবতের অনুবাদ সুপরিচিত; মাধব কন্দলীর সপ্তকাণ্ড রামায়ণের অনুবাদ অসমীয়া ভাষার অমূল্য সম্পদ। কন্দলী মৌজায় এখনও মাধব কন্দলীর বাড়ী আছে (৩৭ পৃঃ)।

"নগাঁওবাসীরা একটু অনুনাসিকত্বপ্রিয়। তাঁহারা বদুলা আতা নামক বৈষ্ণবগুরুকে 'বন্দুলা আতা' বলে, বাদুলীকে (বাদুড়) বান্দুলী বলে। তাঁহাদের নিকট প্রাচীন 'কদলী' 'কন্দলী' হইয়া গিয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে নগাঁও জিলার কন্দলীই প্রাচীন কদলীরাজ্য, এবং কমলা দেবী পর্ব্বতই কদলীরাণী কমলার নগর ছিল। কন্দলী পর্ব্বতের বাদুলী কুরুংএর বাদুড় হইতেই কমলা দেবীর ষোল শত সঙ্গিনীর বাদুড় হওয়ার কল্পনা করা হইয়াছে" (কদলীরাজ্য— ৩৮ পৃঃ)।

সিদ্ধা গোরক্ষ নাথের শাপে সব কদলী বাদুড় হইয়া উড়িয়া গিয়াছিল। এই অতি সত্য ঘটনাটিকে রাজমোহনবাবু কল্পনা বলিয়াছেন। তাঁহার উক্তির পক্ষে তিনি কোনও যুক্তি-প্রমাণ দিতে পারেন নাই। যুক্তি-প্রমাণহীন উক্তি নিছক কল্পনা মাত্র।

রাজমোহনবাবু কল্পনারাজ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে 'কদলীরাজ্যে' (১২ পৃঃ) প্রবেশ করিয়া যুক্তি-প্রমাণহীন নব গোরক্ষ নাথের ও নব মৎস্যেন্দ্র নাথের অস্তিত্বের অবতারণা করিয়াছেন। তিনি ভাবাবেগে বলিতেছেন— "মৎস্যেন্দ্র নাথ ও গোরক্ষ নাথ প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায় ও মঠে যুগে যুগে কত মৎস্যেন্দ্র ও গোরক্ষ আবির্ভূত হইয়াছেন তাহার ইয়ত্তা করিবে? শঙ্করাচার্য্যের

প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায় ও মঠাধিপতি ইদানীং কালেও শঙ্করাচার্য্য নামে পরিচিত" (যোগিসখা— জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৯ বাং)। অতএব জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধ প্রতিজ্ঞার মত রাজমোহনবাবু সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিলেন মৎস্যেন্দ্র ও গোরক্ষের "ইয়ত্তা কে করিবে?" ইহা যুক্তিযুক্ত প্রমাণ নহে, নিছক কল্পনা মাত্র [৪র্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য]।

গোবিন্দচন্দ্র গীতে আছে কদলীর বন কামরূপের উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত ছিল এবং কদলী মায়ামুগ্ধ মীন নাথকে উদ্ধার করার জন্য গোরক্ষ নাথ সেখানে গিয়াছিলেন। গুরুমুখী পাঞ্জাবী ভাষার গোরক্ষ অবদেশে আছে গোরক্ষ নাথ কামাখ্যায় গিয়া অনেক শিষ্য করেন। গোপীচাঁদের সন্ন্যাসে আছে কদলীরাজ্যে পুরুষের অভাবে তথাকার স্ত্রীলোকেরা ঋতুরক্ষার জন্য কামরূপ যাইতেন। কামরূপ নওগাঁ জিলার সংলগ্ন। রাজমোহনবাবুর কথিত কন্দলী (কদলী) রাজ্য হইতে স্ত্রীলোকদের পক্ষে কামরূপ যাতায়াত করা সহজসাধ্য ছিল। অন্যান্য পণ্ডিতদের কথিত কদলী, নারী বা স্ত্রীরাজ্য হইতে সেই অন্ধকার যুগে স্ত্রীলোকদের পক্ষে ঋতুরক্ষার জন্য কামরূপ যাতায়াত করা অসম্ভব ছিল বলিয়াই মনে হয়। এই কামরূপের যাদুবিদ্যার কথা কাহারও অবিদিত নাই। "কদলীরাজ্য যে স্ত্রীস্বাধীনতার দেশ ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। স্ত্রীস্বাধীনতার দেশ বলিলে সে কালে একমাত্র প্রাচীন কামরূপকেই বুঝাইত। কারণ আর কোন দেশের স্ত্রীজাতি ঐ দেশের নারীজাতির মত স্বাধীন ছিল না। আজও লোকপ্রবাদে সে কথা ঘোষিত হইতেছে" (গোরক্ষবিজয়—ভূমিকা, ২৬ পৃঃ)। ভাই বালাকী 'জনম সাথী' গ্রন্থের ৩৩৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন গুরু নানকের অনুচর মর্দ্দানাকে কামাখ্যার একজন নারী গলায় সূতা বাঁধিয়া ভেড়ায় পরিণত করিয়া দিয়াছিল। সংবাদ পাইয়া বাবা সাহেব অনেক চেষ্টার পর সঙ্গীটিকে উদ্ধার করিতে পারিয়াছিলেন। এখনও সাধারণের বিশ্বাস যে কামরূপ গেলে পুরুষকে ভেড়া বানাইয়া রাখা হয়। সম্ভবতঃ মীন নাথের সেই দশাই হইয়াছিল।

তাঁহার পতনের পর হইতে বোধ হয়, ঐ প্রবাদ বিশেষরূপে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল" (গোরক্ষবিজয়— ভূমিকা, ৩১ পৃঃ)।

বর্ত্তমান শ্রীহট্ট, গোয়ালপাড়া, কামরূপ, কোচবিচার, রংপুর, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি জিলা নিয়া প্রাচীন কামরূপ রাজ্য গঠিত ছিল। কদলীরাজ্য যে স্ত্রী-স্বাধীনতার দেশ ছিল সে সম্বন্ধে মতভেদ নাই। কামরূপের কামাখ্যায় আজও স্ত্রীস্বাধীনতা কম নহে। বর্ত্তমানেও আসাম উপত্যকার প্রায় সর্ব্বজাতীয় স্ত্রীলোক সংসারের প্রায় সব কার্য্য সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন। গোরক্ষ নাথ—

"সুভক্ষণে য়াসিয়া কদলিত দিল পাও।
নাটের নগরে গিয়া করিলেন্ত ভাও॥"

(গোরক্ষবিজয়— ৮০ পৃঃ)

আসামী ভাষায় যাত্রাগানকে 'ভাওনা' বলে। যাত্রাগানের পাঠকে 'ভাও' ও পাঠকারীকে 'ভাওরীয়া' বলে।

এ সব বিবরণও রাজমোহনবাবুর কদলীরাজ্যের বিবরণকে দৃঢ় করার সহায়তা করে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ডাঃ শহীদুল্লাহ কাছাড় জিলাকে কদলীরাজ্য বলিয়াছেন। প্রাচীন কাছাড় জিলা নওগাঁ জিলা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, যে নওগাঁ জিলাতে রাজমোহনবাবুর কথিত কদলীরাজ্য ছিল। সে মতে প্রাচীন কাছাড় জিলাই কদলীরাজ্য।

কিন্তু আর একটি বিষয় বিবেচনা করা আবশ্যক। যদি নগাঁও জিলার কদলীই কদলীরাজ্য হয়, তবে আসাম ও ইহার সংলগ্ন অঞ্চলে এ সম্বন্ধীয় গীতি-কাব্য প্রচলিত নাই কেন? কামরূপের কমতারাজ্য সম্বন্ধীয় গীতিকাব্য রংপুর জিলা পর্য্যন্ত বিস্তৃত দেখা যায়। কামরূপে ময়নামতী গোপীচাঁদের কাহিনী প্রচলিত আছে। আসামের যোড়হাটের শ্রীরূপেশ্বর দত্তের 'জনা গাভরুর গীত'

প্রভৃতিতে নওগাঁ জিলার কয়েকটি প্রাচীন রাজ্যের নাম আছে, কিন্তু কন্দলী (কদলী) রাজ্যের কোন উল্লেখ নাই কেন?

গুরু গোরক্ষ নাথ কদলীরাজ্যের যে বর্ণনা দিয়াছেন ময়নামতীর পুঁথিতে মাণিকচাঁদের মেহারকুলের ঠিক সেইরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয় (গোরক্ষবিজয়—ভূমিকা, ২৭ পৃঃ)। "ময়নামতীর পুঁথির মত এই গ্রন্থেও 'কার পুখরির পানি কেহ নাহি খাএ" এরূপ উক্তি আছে। পুকুরের কথা বলিতে গেলে চট্টগ্রাম, নোয়াখালি ও ত্রিপুরা জেলায় যত পুকুর আছে বাঙ্গালার বা তার বাহিরের আর কোন জেলায় তত পুকুর আছে কি না বলিতে পারি না। উক্ত তিন জেলাবাসী লোকের মত আর কোন দেশের লোক এমন গর্ব্ব করিয়া এরূপ উক্তি করিতে পারে তাহা আমাদের জানা নাই। এক সময় কুচজাতীয়েরা দলবদ্ধ হইয়া দেশের নানা স্থানে গিয়া বাস করিয়াছিল। অদ্যাপি ত্রিপুরা জিলার স্থানে স্থানে তাহাদের খনিত পুষ্করিণীপুঞ্জ (পুঞ্জ বলিলাম, কেন না, একই স্থানে রাশি রাশি পুষ্করিণী খনিত হইয়াছে) কোচের কাটা পুকুর বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। ইহারা কাহারও পুষ্করিণীর জল কেহ খাইত না, তাই এই পুষ্করিণীপুঞ্জের সৃষ্টি হইয়াছিল" (গোরক্ষবিজয়—ভূমিকা, ৩০ পৃঃ)।

ত্রিপুরা জিলার ময়নামতী লালমাই পাহড় নাথ সিদ্ধাদের কর্ম্মকেন্দ্র ছিল। এখানে নাথসিদ্ধা জালন্ধর বা হাড়িপা রাজা গোপীচাঁদকে সন্ন্যাসের দীক্ষা দিয়াছিলেন। এখানেও প্রাচীন দীঘির ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এ বিচারে ত্রিপুরা জিলাকেই কি কদলীরাজ্য বলিতে হয়?

এ সব বিচার বিবেচনা করিয়া আমরা অনুমান করি তিব্বতের উত্তর-পশ্চিমাংশবর্ত্তী নারীরাজ্যের নারীপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া মীন নাথ তথাকার রাজপদ লাভ করিয়াছিলেন। নারীপ্রেমমুক্ত মীন নাথ দেশে ফিরিয়া মহানাদে রাজদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন বলিয়াই মনে হয়।

মহানাদে যোগিরাজবংশ

রাজা মীন নাথ— রাজত্বকাল সম্ভবতঃ ৭ম খৃঃ অব্দ।

শ্রীরমেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ বলেন—"হুগলী জেলায় মহানাদ নামে একটী প্রাচীনতম গ্রামের অদ্যাপি অস্তিত্ব দেখা যায়। এই মহানাদের প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপ এখন বিস্মৃতির গর্ভে নিমজ্জিত। কেবলমাত্র গোপালভাড়ের 'মানাদের জাত' এই উক্তিটিই এখন পূর্ব্বপরিচয় মাত্র দাঁড়াইয়াছে। সাধারণে 'মানাদের জাত' কথাটি বুঝে না। মহানাদের অপভ্রংশ 'মানাদ' এবং জাত অর্থে মেলা বুঝায়। এখানে স্মরণাতীতকাল হইতে শ্রীশ্রী৺জটেশ্বর নাথ শিব বিরাজমান আছেন প্রতি বৎসর শিবরাত্রি উপলক্ষে এখানে একটি মেলা হয়। প্রায় ১৫।২০ বৎসর পূর্ব্বেও এই মেলায় বহু জনসমাগম হইত। পূর্ব্বে বাংলাদেশের এইটিই ছিল সুবৃহৎ মেলা এবং জটেশ্বর নাথ ছিলেন একমাত্র জাগ্রত দেবতা। তখন তারক নাথ প্রচারিত হন নাই। তৎকালে বহু দূরদেশ হইতেও লোক শিবরাত্রি উপলক্ষে মানসিক করিত। উহাতে যে বিপুল জনসমাগম হইত তাহাতে দেবালয়ের প্রশস্ত বৃহৎ তোরণদ্বারও অপ্রশস্ত হইয়া দাঁড়াইত। 'মানাদের জাত' উক্তিটীর উৎপত্তি ইহা হইতেই। মগরা হইতে বি, পি, রেলওয়ের একটি ছোট লাইন তারকেশ্বর গিয়াছে। এই লাইনের পার্শ্বেই মহানাদ গ্রাম অবস্থিত মগরা হইতে ইহার আট মাইল ব্যবধান। মহানাদ এখন জঙ্গলাকীর্ণ শ্বাপদ ও ব্যাঘ্রসঙ্কুল গ্রাম মাত্র। এককালে ইহা একটি রাজধানী ছিল। প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ, গড়, এবং সুবৃহৎ ভগ্নবাটীর নিদর্শন, ইষ্টক, প্রস্তর, স্তম্ভ ইত্যাদি এখনও বিদ্যমান। চন্দ্রদত্ত ও চন্দ্রদ্বীপ নামক দুইটী বৃহৎ মৃত্তিকাস্তূপ এখন চন্দ্রকেতু রাজার নাম স্মরণ করিয়া দিতেছে। শুনা যায় যে, তিনি শ্রীশ্রী৺জটেশ্বর নাথের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার রাজবাটীর সংলগ্ন ঠাকুরবাড়ী বিদ্যমান ছিল। কাগজপত্রে দেখা যায় যে বশিষ্টগঙ্গা নামক পুষ্করিণী ও দ্বাদশ কুণ্ড তিনি ৺জটেশ্বর নাথকে দান করেন। দ্বাদশ কুণ্ডের মধ্যে ন

কুণ্ডের চিহ্ন রহিয়াছে। তন্মধ্যে তিনটী কুণ্ড সংস্কার হওয়ায় এখনও বর্ত্তমান আছে। সংস্কার অভাবে ৬টী কুণ্ডের কেবল চিহ্নমাত্র রহিয়াছে। তিনটী কুণ্ড লুপ্ত। * * * * স্যার উইলিয়াম হাণ্টারকৃত হুগলী জেলা গেজেটিয়ারেও এ সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। * * * * * ১৩৩২ সালে বর্ত্তমান মোহান্ত শ্রীমৎ লছমী নাথ যোগেশ্বর যোগিরাজ ইহার পুনরুদ্ধার করেন। হিন্দু ও মুসলমানদিগের মধ্যে এখনও বিশ্বাস আছে যে এই কুণ্ডে স্নান ও মানসিক করিলে মৃতবৎসা স্ত্রীলোক জীবিত সন্তান প্রসব করে, এবং নিজেও বাঁচিয়া যায় (পঞ্চপুষ্প—আশ্বিন, ১৩৪০ বাং)। অন্য প্রবাদ অনুসারে জানা যায় যে এখানে একটী দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ পতিত হয়। বায়ুসঙ্ঘাতে উক্ত শঙ্খ হইতে মহানাদ (মহাশব্দ) উত্থিত হওয়ায় স্থানটীর নাম মহানাদ হইয়াছে (বিশ্বকোষ ৩য় খণ্ড)।

মহানাদ বর্ত্তমানে তেলিনীপাড়ার জমিদারদের জমিদারীভুক্ত। শ্রীপ্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত "মহানাদ বা বাঙ্গালার গুপ্ত ইতিহাস" গ্রন্থেও এ সম্বন্ধীয় অনেক বিবরণ পাওয়া যায়। উহাতে আছে— ৺জটেশ্বর নাথ মহাদেবের মোহান্তগণ চেলা-পরম্পরায় যোগিরাজ নামে খ্যাত। ইহারা কানফাট্টা নাথপন্থী ও হঠযোগী। এই জটেশ্বর মহাদেবের যোগিরাজের অধীনে আরও দুইটি শাখা ছিল। তাহার একটি— জেলা ২৪ পরগণা, থানা রাজারহাট, পোঃ দমদম অধীন গোরক্ষবাসিনী নামক স্থানে গোরক্ষ নাথের মঠ, এবং অন্যটী জেলা মেদিনীপুর, থানা পাঁশকুড়ার অন্তর্গত শ্যামসুন্দরপুর পাটনা গ্রামস্থিত ৺সিদ্ধিনাথ ঠাকুরের মন্দির।"

'রাঢ়ের প্রাচীন ইতিহাস' শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীপ্রভাসচন্দ্র পাল প্রত্নতত্ত্ববিদ বলেন— "বর্ত্তমান হুগলী জেলার অন্তর্গত প্রাচীন রাঢ়দেশ পুণ্যতীর্থ ও অন্যতম রাজধানী। প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে মহানাদ এক পুণ্যতীর্থ। মহামুনি বশিষ্ট তারাপীঠ হইতে মহানাদে আসিয়া আশ্রম স্থাপনপূর্ব্বক শেষ জীবন যাপন করিয়াছিলেন। * * * * তৎকালীন আশ্রমটি জিয়াৎকুণ্ড, মুক্তকুণ্ড, সিদ্ধকুণ্ড,

যজ্ঞকুণ্ড, অগ্নিকুণ্ড, গোদকুণ্ড, ক্ষীরকুণ্ড, কুকুরকুণ্ড, যোগিনীকুণ্ড, দুর্গাকুণ্ড, গৌরী-কুণ্ড এবং রাধাকুণ্ড নামক দ্বাদশকুণ্ড দ্বারা সীমাবদ্ধ ছিল। মহামুনি বশিষ্ট ব্যতীত অন্যান্য মুনি ঋষি এই আশ্রমে তপস্যা করিতেন, তাহা বলাই বাহুল্য। আদি তীর্থঙ্কর শ্রীশ্রীগোরক্ষ নাথ স্বীয় ধর্ম্মমত প্রচারকালে মহানাদে শুভাগমন করেন। তাঁহারই সময় হইতে এই আশ্রমটী নাথমঠ নামে অভিহিত হয়। জীয়াৎকুণ্ডের দক্ষিণতীরে যোগিগণের সমাধি রহিয়াছে। তন্মধ্যে একটী জীবন্ত সমাধি নামে বিদিত। কোন হঠযোগী জীবন্ত অবস্থায় সমাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া এই প্রকার নামকরণ হইয়াছে। রাজপুতনায় এই রকম জীবন্ত সমাধি পরিদৃষ্ট হয়। সুপ্রাচীনকাল হইতে মঠটী নাথ-সম্প্রদায়ের মোহান্তগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছে। মোহান্তগণের সঠিক ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া যায় না তবে খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে যে সকল মোহান্ত কর্ত্তৃক মঠের মন্দিরাদির সংস্কার হইয়াছে তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দিলাম।

খৃষ্টীয় ১৮০৮ অব্দে মোহান্ত মহারাজ অচল নাথ'যোগিরাজ ৺জটেশ্বর নাথ মহাদেবের মন্দিরটী সংস্কার করেন। খৃষ্টীয় ১৮৪৩ অব্দে ভগবন্ত নাথ যোগেশ্বর যোগিরাজ জোড়বাংলামন্দিরে অন্নপূর্ণা দেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি যোগিনীকুণ্ডের পঙ্কোদ্ধার করেন। কুণ্ড হইতে আবিষ্কৃত দুইটী প্রস্তরময় বুদ্ধমূর্ত্তি মন্দিরাভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ১৮৯৮ অব্দে মোহান্ত মহারাজ নথ্যু নাথ যোগেশ্বর যোগীরাজ ৺জটেশ্বর নাথ মহাদেবের মন্দির সংলগ্ন নাটমন্দির নির্ম্মাণ করেন এবং মঠের প্রাঙ্গণটী একটি ইষ্টকনির্ম্মিত উচ্চ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত করেন। খৃষ্টীয় ১৯০৫ অব্দে মোহান্ত মহারাজ খুসী নাথ যোগেশ্বর যোগিরাজ ৺জটেশ্বর নাথ মহাদেবের মন্দিরটীর সংস্কার করেন এবং মন্দিরের চতুপার্শ্বস্থ বারান্দাটী নির্ম্মাণ করেন। খৃষ্টীয় ১৯১৩ অব্দে মোহান্ত মহারাজ সমর নাথ যোগেশ্বর যোগিরাজ মঠের ভিতর বাটীর ইষ্টকনির্ম্মিত প্রাচীর নির্ম্মাণ করেন ও একটী ইন্দিরা খনন করাইয়া দেন। খৃষ্টীয় ১৯২৫-১৯৩৬ অব্দ পর্য্যন্ত

মোহান্ত মহারাজ লছমী নাথ যোগেশ্বর যোগিরাজ কর্ত্তৃক বশিষ্টগঙ্গায় ইষ্টক-নির্ম্মিত ঘাট প্রস্তুত, জীয়ৎকুণ্ডের ও ক্ষীরকুণ্ডের পঙ্কোদ্ধার, শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা, সমাধিসংস্কার, নলকূপ প্রতিষ্ঠা ও উদ্যান রচনাদির কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছিল।

সম্রাট জাহাঙ্গীর বাদশাহের রাজত্বকালে (১৬২২ খৃঃ অঃ) বিজ্জল ভূপতির অনুমতিক্রমে পাটনানিবাসী জগন্মোহন পণ্ডিত রাঢ়দেশস্থ এই মহানাদ নগর পরিদর্শন করেন। তাঁহার রচিত—"দেশাবলীবিবৃতি" নামক গ্রন্থে "অথমানতে দেশবিবরণম্" বলিয়া নগরের উল্লেখ আছে। (১) * * * * এই পুঁথি ব্যতীত সহদেব চক্রবর্ত্তীর ধর্ম্মমঙ্গল পাঠে অবগত হওয়া যায় মীন নাথ নামে জনৈক যোগী মহানাদের রাজা ছিলেন। উভয় পুঁথি হইতে বেশ প্রমাণিত হয় যে, তৎকালে মাহানাদে যোগিজাতির বসতিবিস্তার ও আধিপত্য ছিল" (ভারতবর্ষ—শ্রাবণ, ১৩৫৬)।

অধ্যাপক ডাঃ সুকুমার সেন বলেন—"কদলীকে বাদুড় করে উড়িয়ে দিয়ে গুরু মীন নাথ ও গুরুপুত্র বিন্দু নাথকে সঙ্গে নিয়ে গোরক্ষ ফিরে এলেন বিজয় নগরে। কোন কোন মতে অতঃপর মীন নাথ মহানাদে গিয়ে যোগিরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। "হুগলী জেলার প্রাচীন স্থান মহানাদে নাথপন্থী যোগীপীঠের চিহ্ন এখনও আছে এবং সহদেব চক্রবর্ত্তীর ও দ্বিজ লক্ষণের অনিল পুরাণে এখানকার জনশ্রুতি ঐতিহ্য স্থান পেয়েছে" (নাথপন্থের দিশা—কল্যাণশ্রী শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৫৫ বাং)।

৺অক্ষয় কুমার দত্ত বলেন—"ত্রিবেণীর প্রায় চারি ক্রোশ পশ্চিমে মহানাদ নামক গ্রামে এই সম্প্রদায়ী (কানফট) একটী যোগিরাজার নিবাস আছে। তিনি বিস্তর ভূমি ও অন্যান্য নানা সম্পত্তির অধিকারী। তাঁহার অনেক গুলি শিষ্য থাকে। মৃতুকালে তাঁহাদের মধ্যে একজনকে বিষয়ের উত্তরাধিকারী করিয়া

(১) পুঁথিখানি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে সংরক্ষিত আছে।

যান। এইরূপে ঐ যোগিরাজার প্রণালী চলিয়া আসিতেছে” (ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়— ১৮০৪ শকাব্দ)

কদলীর মায়া ত্যাগ করিয়া আবার যোগসাধনা করিবার জন্য গোরক্ষ নাথ মীন নাথকে যে পরামর্শ দিয়াছিলেন, তাহার উত্তরে মীন নাথ বলিয়াছিলেন—

“চলিতে না পারি আহ্মি গাএ (১) নাহি বল।
কেমতে য়ানিব (২) বোল জোগ এসকল ॥
মাগিতে নারিমু য়ার ঘরে ঘরে জ্বাই (৩)।
কদলির রাজা আহ্মি ঈশ্বর মিনাই ॥
বির্ধ (বৃদ্ধ) কাল হইলুম মুই না পারি চলিতে।
মাগিয়া খাইতে না পারিমু কহিলাম তোমাতে ॥
তবে পাকিল মাথার কেস আয়ু হইল সেস।
এ মত কালেত য়ার (৪) কি য়াছে সাহস ॥”

(গোরক্ষবিজয়— ১৩১, ১৩২ পৃঃ)

তাহা হইলে কদলীমায়ামুক্ত মীন নাথ পুনরায় যোগসাধনা করেন নাই, এমন কি ভিক্ষা করিবার মত শক্তিও তাঁহার দেহে ছিল না। গোরক্ষ নাথ, মীন নাথ ও মীন নাথের পুত্র বিন্দু নাথকে উদ্ধার করিয়া—“এই মতে চলি গেলা বিজয়নগর” (গোরক্ষবিজয়— ১৯৮ পৃঃ)। এই বিজয়নগর কোথায় ? অধ্যাপক ডাঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী মীনচেতনের আলোচনায় রাঢ়দেশান্তর্গত রাজসাহীর বিজয়নগরকে উক্ত বিজয়নগর বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। মহানাদও রাঢ়দেশান্তর্গত।

(১) শরীরে। (২) কেমনে যোগসাধনা করিব। (৩) গৃহে গৃহে যাইয়া ভিক্ষা করিতে পারিব না। (৪) আর।

তাহা হইলে কদলীর মায়াজালমুক্ত মীন নাথ দেশে ফিরিয়া আসিয়া ৭ম খৃঃ অব্দে মহানাদে রাজদণ্ড পরিচালনা করিয়াছেন, এবং মহানাদেই তিনি দেহরক্ষা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

রাজা জালন্ধর (হাড়িপা নাথ)

সময়— ১০ম-১১শ খৃঃ অব্দ

ডক্টর শ্রীমতী কল্যাণী মল্লিক বলেন—"নেপালে প্রাপ্ত গোবিন্দচন্দ্রের সন্ন্যাস নাটকে জালন্ধরের যে বৃত্তান্ত আছে তাহাতে বুঝা যায়, জলন্ধর দেশে তিনি জালন্ধরী নৃপতি নামে খ্যাত ছিলেন, এবং সাত শত রাণীর মায়া কাটাইয়া তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। পুঁথিটি সপ্তদশ শতাব্দীর; কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে উহা রক্ষিত হইয়াছে। অগ্নি-দেবতার বরে হস্তিনাপুরের অপুত্রক রাজার পুত্ররূপে জালন্ধর জন্মগ্রহণ করেন। এইরূপ বৃত্তান্ত আছে। যোধপুররাজ মানসিংহের উপর জালন্ধর নাথ কৃপা করেন এবং উজ্জয়িনীর রাজা ভর্তৃহরিও জালন্ধরের শিষ্য হইয়া রাজ্য ত্যাগ করেন। সিদ্ধসাহিত্যে ভর্তৃহরির নাম বিচার নাথ। এই ভর্তৃহরির নাম বিচার নাথ। এই ভর্তৃ হরির ভগিনী ময়নামতীই বঙ্গীয় গোপীচন্দ্রের মাতা, এবং জালন্ধর নাথ গোপীচন্দ্রের গুরু। বঙ্গীয় কাব্যে জালন্ধর নাথ হাড়িপা নামেই প্রসিদ্ধ" (নাথপন্থ— ৫, ৬ পৃঃ)। (১)

রাজকুমার চৌরঙ্গী নাথ

সময়— ১০ম-১১শ খৃঃ অব্দ

ডক্টর শ্রীমতী কল্যাণী মল্লিক বলেন—"গোরক্ষবিজয় গ্রন্থে মৎস্যেন্দ্রের আর এক শিষ্যের নাম আমরা পাই, তিনি গাভুর সিদ্ধাই অর্থাৎ যুবক সিদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহার গুরুদত্ত নাম চৌরঙ্গী নাথ। প্রবাদ আছে, ইঁহার পিতা

(১) জালন্ধর বা হাড়িপা নাথ সম্বন্ধীয় বিস্তৃত বিবরণ ৪র্থ অধ্যায়ে দেখুন।

বঙ্গদেশের পাল রাজাদের অন্যতম রাজা ছিলেন। বিমাতার অসন্তোষের কারণ হইয়া রাজপুত্র তাঁহার আদেশে চারি হস্তপদ হীন অবস্থায় নগরের বাহিরে পরিত্যক্ত হইলেন। এইরূপ অবস্থায় মৎস্যেন্দ্র কর্তৃক তিনি উদ্ধারপ্রাপ্ত হইয়া নাথ-যোগী হইলেন এবং চারি হস্তপদহীন স্মারকস্বরূপ চৌরঙ্গী নাথ নামে পরিচিত হইলেন। কলিকাতার চৌরঙ্গী চৌরঙ্গী নাথের নামে হয় এবং কালীঘাটের কালী গোরক্ষ নাথ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। কিংবদন্তী রূপে ইহা চলিয়া আসিতেছে" (নাথপন্থ— ৫ পৃঃ)।

নাথযোগীদের সহিত পাল রাজাদের বংশের সম্বন্ধ ছিল, এখন সে সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক।

মুন্‌সী আবদুল করিম, সাহিত্য-বিশারদ বলেন— "ত্রিপুরার রাজগণের আদি পুরুষগণেরও 'ফা' উপাধি দৃষ্ট হয়। মহারাজ ত্রিপুরেশ্বরের জন্ম শিব অংশসম্ভূত বলিয়া ইতিহাসে বর্ণিত আছে। ত্রিপুরার রাজগণ বহুকালাবধি শৈব ছিলেন। তাঁহাদের বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষা আধুনিক। হাড়িফা ও কানফার 'ফা' উপাধির সহিত তাঁহাদের কোন সংশ্রব আছে কি না, তাহা অনুসন্ধানের বিষয়" (গোরক্ষবিজয়— ভূমিকা, ৪ পৃঃ)। ডক্টর শ্রীকল্যাণী মল্লিক, এম. এ. পি. এইচ. ডি. বলেন— "কথিত আছে, সন্তকবি দাদূ এক সময়ে নাথযোগি ছিলেন। তখন তাঁহার নাম ছিল কুম্ভারী পাব্। সিদ্ধ-সাহিত্যে বঙ্গীয় রাজা গোপী-চন্দ্রের নাম শৃঙ্গারী পাব্। এই 'পাব্' শব্দ হইতে বৌদ্ধ পা-সিদ্ধাদের সহিত নাথযোগিদের সম্বন্ধ ছিল এইরূপ ধারণা হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু 'পা' শব্দটি কি 'ফা' শব্দের রূপান্তর? ত্রিপুরার রাজাদের আদি পুরুষের 'ফা' উপাধি দৃষ্ট হয়, মহারাজ ত্রিপুরেশ্বরের জন্ম শিব অংশসম্ভূত বলিয়া ইতিহাসে বর্ণিত আছে; ত্রিপুরার রাজারাও পূর্ব্বে শৈব ছিলেন। * * * * * ত্রিপুরার ভাষায় 'ফা' অর্থে পিতা। গোপীচন্দ্রের গুরুর নাম ছিল হাড়িফা বা হাড়িপা। * * * * * নাথযোগিদের মধ্যে কানফা বা কাণিপা অন্যতম, অতএব 'ফা'

উপাধি হইতে 'পা' বা 'পাব্' হওয়া সম্ভব কি না অনুসন্ধানের বিষয়। মতান্তরে 'পা' শব্দটি তিব্বতী, ইহার অর্থ অধিকারী। এই 'পা' পন্থীরা শৈব ছিলেন। * * * * * ইহা দ্বারা নাথ সম্প্রদায়ের সহিত গোপীচন্দ্রের বংশের সম্বন্ধের পরিচয় পাওয়া যায়" (১০, ১১ পৃঃ)। নাথযোগি চৌরঙ্গী নাথের পিতা সম্ভবতঃ বঙ্গীয় পাল রাজাদের মধ্যে দেব পাল নামে পরিচিত" (নাথপন্থ— ১৫ পৃঃ)।

গোরক্ষবিজয়ে দেখা যায় সিদ্ধা চৌরঙ্গী নাথের নামান্তর গাভুর সিদ্ধা। গাভুর অর্থাৎ যুবক অবস্থায় সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া যোগসাধনে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহাকে গাভুর সিদ্ধা অর্থাৎ যুবক সিদ্ধা বলা হইত এবং পরে সম্ভবতঃ ইহাই তাঁহার নামান্তর হইয়া পড়িয়াছিল (১)। গোরক্ষ-বিজয়ে গাভুর সিদ্ধাকে "সাল্লাবানের বেটা" বলা হইয়াছে—

"তার লাগি যদি জাএ হাত পাও কাটা।
তথপিহ হই আমি সাল্লাবাণের বেটা॥

(গোরক্ষবিজয়)

ভোজরাজের পূর্ব্ব পুরুষ মহারাজা বিক্রমাদিত্যের পৌত্র শালিবাহনের নামান্তর হইতেছে— শালবান (২)। কুমিল্লার লালমাই অঞ্চলে শালিবাহনের নামানুসারে 'শালবান'পুরও আছে। ইহাতে মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে যে এই লালমাই অঞ্চলে শালিবাহনের শাসনদণ্ড পরিচালিত হইয়াছিল। এই শালবান গ্রামের সহিত চৌরঙ্গী নাথের নাম জড়িত আছে—

"যেন মত চৌরঙ্গী গেল শালবান নগরে।
যেন মত ইচামতি বল কৈল তারে॥"

(ব্রহ্ম যোগী)

কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে চৌরঙ্গী নাথ শালবান রাজার পুত্র ছিলেন।

---

(১) গোরক্ষবিজয়-ভূমিকা, ২৩ পৃঃ। (২) ত্রিপুরার প্রত্নৈশ্বর্য্য ও নাথ-সাহিত্যের দান (যোগিসখা, মাঘ— চৈত্র, ১৩৫২ বাং)।

তাঁহার পিতা এক নীচ জাতীয়া রমণীর প্রেমে মজিয়া ছিলেন, কিন্তু রমণীটি চৌরঙ্গী নাথের প্রতিই অনুরক্ত ছিল। কিন্তু চৌরঙ্গী নাথ রমণীর প্রস্তাবে অসম্মত হওয়ায় রমণীর চক্রান্তে চৌরঙ্গী অন্ধ হইয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করতঃ চৌরঙ্গী সিদ্ধা নামে খ্যাত হন। ব্রহ্ম যোগী গ্রন্থের শালবান রাজার প্রণয়পাত্রী 'ইচামতি বল কৈল তারে' দ্বারা কিংবদন্তীর বল প্রয়োগই দৃঢ় হয় (৩)।

নাট্যসম্রাট ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ কৃত "পূর্ণচন্দ্র নাটকে" পূর্ণচন্দ্রকে শ্যাল কোট রাজ্যের রাজা শালিবানের পুত্র বলা হইয়াছে। এই নাটকে পূর্ণচন্দ্রের প্রতি সৎমার ব্যবহারের যে বৃত্তান্ত পাওয়া যায় তাহার সহিত গোরক্ষবিজয় ও ব্রহ্ম যোগী গ্রন্থের বিবরণের বেশ সাদৃশ্য আছে। গোরক্ষবিজয়ে আছে—

"বর পাইলা চল তুমি সত মা এর পাশ ॥
সত মাএ ভজিব তোরে দেখিয়া জোয়ান।
তাহার কারণে তুমি পাইবা অপমান ॥"

(গোরক্ষবিজয়)

তবে কি ঐ পূর্ণচন্দ্রই গাভুরসিদ্ধা বা চৌরঙ্গী নাথ? মুনসী আব্দুল করিম, সাহিত্য-বিশারদ বলেন—"এই কথাগুলির দ্বারা গোরক্ষবিজয়ে যে ঘটনার আভাস দেওয়া গিয়াছে, পূর্ণচন্দ্র নাটকে সৎমার ব্যবহার ও তৎকর্তৃক পূর্ণচন্দ্রের লাঞ্ছনায় তাহাই পরিস্ফুট করা হইয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস" (গোরক্ষ-বিজয়-ভূমিকা, ২৩ পৃঃ)। তিনি আরও বলেন—"শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয়ের প্রচারিত "শ্রীচন্দ্রদেবের তাম্র শাসন" হইতে জানা যায়, পূর্ণচন্দ্র নামক এক মহানুভব ব্যক্তির সুবর্ণচন্দ্র নামক এক পুত্র ছিলেন। সুবর্ণচন্দ্রের পুত্র ত্রৈলোক্যচন্দ্র বঙ্গান্তর্গত চন্দ্রদ্বীপের রাজপদ লাভ করেন। তাঁহার এক পুত্র শ্রীচন্দ্র বিক্রমপুরে রাজত্ব করিতেন। তিনি তথা হইতে তাম্র শাসন প্রচারিত করিয়াছিলেন। সুবর্ণচন্দের অপর পুত্র মাণিকচন্দ্র রাণী ময়নামতীর স্বামী ও

(৩) ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাস।

গোবিন্দচন্দ্রের বা গোপীচাঁদের পিতা এবং পাটিকায়া বা মেহারকুলের রাজা ছিলেন। দুর্ল্লভ মল্লিকের গোবিন্দচন্দ্র গীতে উক্ত আছে—

"সুবর্ণচন্দ্র মহারাজা ধাড়িচন্দ্র পিতা।
তার পুত্র মাণিকচন্দ্র শুন তার কথা॥"

'ধাড়ি' শব্দে 'বৃহৎ', সুতরাং 'পূর্ণ' অর্থ করিয়া কেহ কেহ "ধাড়িচন্দ্র" অর্থে "পূর্ণচন্দ্র" ধরিয়া লইয়াছেন। সুতরাং বলিতে হইবে, প্রাক্তন তাম্রশাসনোক্ত পূর্ণচন্দ্রই "চন্দ্ররাজ" বংশের আদি পুরুষ ছিলেন। গোবিন্দচন্দ্র গীতের উদ্ধৃত পদানুসারে ও ধাড়িচন্দ্রের (পূর্ণচন্দ্রের) পুত্র সুবর্ণচন্দ্র এবং তৎপুত্র মাণিকচন্দ্র বলিয়া জানা যায়" (গোরক্ষবিজয়-ভূমিকা, ২৩, ২৪ পৃঃ)।

অন্যত্রও দেখা যায়— ধাড়িচন্দ্রের পুত্র সুবর্ণচন্দ্র। সুবর্ণচন্দ্রের পুত্র মাণিক-চন্দ্র এবং মাণিকচন্দ্রের পুত্র গোবিন্দচন্দ্র (বাঙ্গালা পুরাবৃত্ত)। গাভুর সিদ্ধা চৌরঙ্গীনাথ গোরক্ষ নাথের শিষ্য ছিলেন। পূর্ণচন্দ্র নাটকে পূর্ণচন্দ্রকেও গোরক্ষ নাথের মন্ত্র-শিষ্য বলা হইয়াছে। এখন এই পূর্ণচন্দ্রের সঙ্গে পালরাজ বংশের সম্পর্ক আছে কি না বিচার্য্য বিষয়।

[চৌরঙ্গী নাথ সম্বন্ধীয় অন্যান্য বিবরণ ৪র্থ অধ্যায়ে দেখুন]

মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মাকৃত "রাজাবলী" ও দয়ানন্দ সরস্বতীকৃত "সত্যার্থ প্রকাশিকা"তে পাল উপাধিধারী রাজাগণকে সুস্পষ্ট ভাষায় যোগীবংশোদ্ভব বলা হইয়াছে। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু বলেন— "যোগিগণ পাল-বংশীয় রাজন্যগণকে পাল উপাধিধারী নাথরাজা বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন" (বিশ্বকোষ,— ১৬শ ভাগ, যু— রোচ্য)। কেহ কেহ বলেন যোগিজাতীয় রাজাগণ প্রজাপুঞ্জকে পুত্রের ন্যায় পালন করিতেন বলিয়া পাল উপাধি পাইয়া-ছিলেন (বিষ্ণুচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের মুক্তাশ্রম)। আবার কেহ কেহ বলেন, যে-সময়ের কথা সে সময় ভারতীয় সর্ব্ব শ্রেণীর রাজাদের সাধারণ উপাধি পাল ছিল (Rajsthan— Vol. 2, Page 3)। কিন্তু শেষোক্ত মত বিচারসহ নহে

বলিয়া অনুমিত হয় কারণ রাজাবলী ও সত্যার্থ-প্রকাশিকাতে রাজা যুধিষ্ঠিরের নাম পর্য্যন্ত আছে। কিন্তু রাজা যুধিষ্ঠির, রাজা রামচন্দ্র প্রভৃতির পাল উপাধি কোথাও কেহ পাইয়াছেন বলিয়া জানি না।

নাথ রাজাগণ প্রজাপুঞ্জকে পুত্রের মত পালন করিতেন, এজন্য প্রজাসাধারণ তঁহাদের পাল (পালনকর্ত্তা) উপাধি দিয়াছিলেন, এরূপ উক্তিই সত্য হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক এবং এসম্বন্ধে সন্দেহ করা উচিত হইবে না বলিয়াই আমরা মনে করি।

রাজা ভর্ত্তৃহরি নাথ

সময়—খৃঃ পূর্ব্ব ১ম শতাব্দী। অন্যমতে—৬৫০ খৃঃ অব্দ

"রাজা গন্ধর্ব্ব সেন ও রাজা ভর্ত্তৃহরি" প্রবন্ধে বলা হইয়াছে—"শ্রীযুক্ত নিখিল নাথ রায়, বি-এল, 'চূণার চরণাদ্রি' প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—'ভর্ত্তৃহরি উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্যের ভ্রাতা এবং উজ্জয়িনী হইতে এক ক্রোশ উত্তরে শিপ্রা নদীর তীরে ভূগর্ভস্থ অট্টালিকা মধ্যে ধ্যানস্থ ভর্ত্তৃহরি ও তাহার গুরু গোরক্ষ নাথ, রাণী পিঙ্গলার মূর্ত্তি বিদ্যমান আছে" (সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা— ১৩২৮ বাং)।

রায় জলধর সেন বাহাদুর বলেন—"উজ্জয়িনীর উত্তরে শিপ্রার তীরে মাইলখানেক দূরে ভর্ত্তৃহরি গুহার অবস্থান। এই গুহার দক্ষিণে বণমুক্তেশ্বর, পশ্চিমে শিপ্রা, উত্তরে কালিকা মাতা। এই গুহায় যাবার রাস্তা দক্ষিণে। প্রথম দরজায় প্রবেশ করলেই বামদিকে প্রথমে ভর্ত্তৃহরির গুরু গোরক্ষ নাথের সমাধিস্থান দেখা যায়" (ভারতবর্ষ— আষাঢ়, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ)।

ডক্টর কল্যাণী মল্লিক বলেন— "যুক্ত প্রদেশের চুণারে ভর্ত্তৃহরির দুর্গ আছে, রাজা ভর্ত্তৃহরি সিংহাসন ত্যাগ করিয়া গোরক্ষ নাথের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন" (১৭ পৃষ্ঠা)। * * * * "জালন্ধরী নাথ, ভর্ত্তৃহরি নাথ প্রভৃতি যোগীরা ভারতের উত্তর অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন" (নাথপন্থ— ৪১ পৃঃ)।

"ভর্ত্তৃহরি-আড্ডা— সাধু সম্প্রদায়বিশেষ। বিক্রমাদিত্যের ভ্রাতা ভর্ত্তৃহরি এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তন করেন। রাজা ভর্ত্তৃহরি কোন যোগীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইজন্য তাঁহার প্রবর্ত্তিত সাম্প্রদায়িকগণও যোগী নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহারা বাদ্যযন্ত্র হস্তে ভর্ত্তৃরাজার গুণগান করিয়া বেড়ায়। কাশীধামের রাওরিতলা নামক স্থানে তাঁহাদের প্রধান আড্ডা। ইহারা গেরুয়া বসন পরে, এবং শবদেহ সমাধিস্থ করে" (বিশ্বকোষ— ভর্ত্তৃহরি যোগিশব্দ, ২৮৪ পৃঃ)

অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ বলেন— "নাথ-যোগী ভর্ত্তৃহরি বা ভরথরী কতকগুলি মুদ্রা সাধন করিতেন। তিনি সাধারণতঃ বলিতেন ত্রিকুটীর মণ্ডলের উপর যে চৈতন্যপুঞ্জ বিরাজিত আছে, তাহা উল্টাইয়া দিয়া লাভ কি? উর্দ্ধকে অচল স্থির করিয়া দেওয়াই পরম কার্য্য। পিণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের সন্ধিস্থানে (ইঁহাদের সাঙ্কেতিক শব্দ অর্দ্ধ উর্দ্ধ) নিরঞ্জন বাস করেন। ইড়া পিঙ্গলার একীকরণ রূপ গ্রন্থি স্থির করিতে হইবে। এটী প্রধান সাধনা। ইড়া পিঙ্গলাকে ইঁহারা চন্দ্র সূর্য্য বলিয়া থাকে" (প্রবাসী— চৈত্র, ১৩২৮ বাং, নাথপন্থ)।

"উজ্জয়িনী নগরের পার্শ্বে রাজা ভর্ত্তৃহরির গুহা আছে। রাজা ভর্ত্তৃহরি সংসার ত্যাগ করিয়া প্রথমে এই স্থানে আশ্রয় লন। * * * * গুহার মধ্যে সোজা হইয়া দাঁড়াইলে উপরে মাথা ঠেকে। গুহার মধ্যে তিন দিকে থাম আছে। থামে কতকগুলি অস্পষ্ট মূর্ত্তি খোদিত আছে। তন্মধ্যে কেবল কেদারেশ্বর লিঙ্গের পূজা হয়। বামদিকের গুহায় দুইটী কাল পাথরের মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহাদের একটী কিছু উচ্চে, অপরটি নীচে। এখানকার লোকেরা বলে উপরে গোরক্ষ নাথ, নীচে তাঁহারই শিষ্য ভর্ত্তৃহরি" (বিশ্বকোষ— উজ্জয়িনী শব্দ, ৩২১ পৃঃ)।

১৯০৯ খৃঃ অব্দে বারাণসীধাম হইতে হিন্দী ভাষায় মুদ্রিত "বড়া ভরথরী চরিত্র" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে ভর্ত্তৃহরি যোগীবেশে সঙ্গলী দ্বীপে যাইয়া গোরক্ষ নাথের সহিত দেখা করেন। তৎপর কামরূ (প) দেশে ও তৎপর

কনকামে (কনকক্ষেত্রে) গমন করেন, তথা হইতে আবার সঙ্গলী দ্বীপে যাইয়া গোরক্ষ নাথের শিষ্য হন। উক্ত বহিতে গোরক্ষ নাথের প্রভাব বিশেষভাবে বর্ণিতআছে

প্রসিদ্ধ জার্ম্মাণ পণ্ডিত মোক্ষমূলার অমিতায়ুধান সূত্রের ভূমিকায় বলিয়াছে: ভর্ত্তৃহরির মৃত্যুকাল ৬৫০ খৃঃ অব্দ।

রাজা গোপীচাঁদ (গোবিন্দচন্দ্র) নাথ

সময়—১০ম ১১শ খৃঃ অব্দ

অধ্যাপক ডাঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী বলেন— "নাথ-সাহিত্যের হাড়িপা শিষ্য যোল বঙ্গ বা যোল দণ্ড বা মেহারকুলের রাজা, সর্ব্বভারতগীত কীর্ত্তি গোপীচাঁদ এবং বঙ্গালরাজা গোবিন্দচন্দ্রের অভিন্নতা সম্বন্ধে আর বড় সন্দেহ থাকা উচিত নহে" (গোপীচাঁদের সন্ন্যাস— সম্পাদকীয়, ৬৮ পৃঃ)। নামে ঐক্য দেশে ঐক্য এবং সময়ের ঐক্যে অভিন্নত্ব সপ্রমাণ হইয়াছে। অধ্যাপক প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় বলেন—"গোবিন্দচন্দ্র বা গোপীচাঁদ মাতার পীড়নে বা হইয়া গোরখনাথ প্রবর্ত্তিত যোগী-সম্প্রদায়ভুক্ত হইতে বাধ্য হন" (জ্ঞানভার ১ম খণ্ড, ১ম সং, ৩৭৮ পৃঃ)।

ভগবান রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনের জন্য রাজ্য রাজসম্মানাদি পরিত্যা করিয়া বনে গিয়াছিলেন। ইহাই রামায়ণের অন্যতমপ্রধান বিষয়। ঠিক সে রূপ মাতৃআজ্ঞা পালনের জন্য রাজা গোপীচাঁদ বা গোবিন্দচন্দ্র রাজ্য, রাজভোগ তৃণবৎ তুচ্ছ করিয়া স্বীয় গুরু হাড়িপা নাথের সঙ্গে বনচারী হইয়াছিলে এ সম্বন্ধে অধ্যাপক ডাঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী বলেন— "পরমার্থের জন্য বিষা বিসর্জ্জন আমাদের ভারতে নূতন নহে। এই সময়টায় যেন রাজ্য ছাি সন্ন্যাসী হওয়ার ধুম পড়িয়া গিয়াছিল। আধুনিক কালের অধিবাসিগণ ইহা অধ্যাত্মিকতার আতিশয্য না দেখিয়া জাতীয় জীবনের অবসাদই দেখি পাইবেন। এই সময়ে মুসলমানের তরবারি ধূমকেতুর মত ভারতের গগ

দেখা দিয়াছিল। গোপীচাঁদ যখন সংসারবিরাগী হইয়া হাড়িপার সঙ্গে বনে জঙ্গলে ঘুরিতেছিলেন, দীপঙ্করশ্রী যখন নিজের ধর্ম্মজীবন গড়িতেছিলেন, তখন সুলতান মামুদ পশ্চিম ভারত লুঠিয়া ছারখার করিতেছিলেন। রাজ পুত্রগণের তখন ধর্ম্মপথ না খুঁজিয়া কর্ম্মপথের সন্ধানে আত্মনিয়োগ করাই কর্ত্তব্য ছিল; কিন্তু ঘটিয়াছিল অন্য রকম। গোপীচাঁদ সংসার ছাড়িয়া হাড়িপার সহিত বাহির হইলেন" (গোপীচাঁদের সন্ন্যাস— সম্পাদকীয়, ৬৮ পৃঃ, ৪র্থ স্তম্ভ)।

ভট্টশালী মহাশয় অনেক যুক্তিতর্ক ও প্রমাণ দ্বারা দেখাইয়াছেন যে বর্ত্তমান পাকিস্থানের কুমিল্লার নিকট যে ময়নামতী লালমাই পাহাড় বিদ্যমান আছে, এখানেই রাজা গোপীচাঁদ বা গোবিন্দচন্দ্রের রাজধানী ছিল এবং তাঁহার সময় ১০ম।১১শ খৃঃ অব্দ (গোপীচাঁদের সন্ন্যাস— সম্পাদকীয়, ৬৮ পৃঃ)।

ধাড়িচন্দ্রের পুত্র সুবর্ণচন্দ্র, সুবর্ণচন্দ্রের পুত্র মাণিকচন্দ্র, মাণিকচন্দ্রের পুত্র গোবিন্দচন্দ্র। মাণিকচন্দ্রের রাণী ও গোপীচাঁদ বা গোবিন্দচন্দ্রের মাতার নাম ময়নামতী। মাণিকচন্দ্রের রাজত্বকাল ৯৭০ হইতে ৯৯০ খৃঃ অব্দ এবং গোবিন্দ-চন্দ্রের রাজত্বকাল ১০০৫ হইতে ১০৩০ খৃঃ অব্দ (বাঙ্গালা পুরাবৃত্ত)। গোবিন্দ-চন্দ্র যোল বঙ্গের রাজা ছিলেন। যোল বঙ্গের অর্থ কি? সম্ভবতঃ পঞ্চ গৌড় যেমন তেমনি।

বর্ত্তমান পাকিস্থানের ত্রিপুরা জিলার কুমিল্লার নিকটে লালমাই রেলষ্টেসন হইতে কুমিল্লা সহর পর্য্যন্ত বিস্তৃত দশ এগার মাইল রেলপথের সামান্তরালে লালমাই ময়নামতী পাহাড়শ্রেণী বিরাজিত। ইহা উত্তর-দক্ষিণে ১০।১১ মাইল দীর্ঘ হইবে। পাহাড়ের উত্তর অংশের নাম ময়নামতীর পাহাড় এবং দক্ষিণ অংশের নাম লালমাই পাহাড়। লালমাই পাহাড়ের নামানুসারে লালমাই রেলষ্টেসনের নামকরণ হইয়াছে। ময়নামতী লালমাই পাহাড়ের মাঝামাঝি স্থানের কিছু উত্তরে বিস্তৃত সমভূমি আছে। এখানে দুর্গাদি দ্বারা সুরক্ষিত ক্ষুদ্র সহর ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। কার্য্যোপলক্ষে সামরিক পূর্ত্তবিভাগের লোকেরা এ

স্থান খননকালে মন্দিরের ভগ্নাবশেষ বহু ধাতব মূর্ত্তি এবং পট্টিকেরা-নামাঙ্কিত মুদ্রা পাইয়াছেন। পাহাড়ের সমস্ত পশ্চিম-প্রান্ত জুড়িয়া আট দশ মাইলখানেক পাটিকারা পরগণা বর্ত্তমান এবং সমগ্র পূর্ব্বদিকটা জুড়িয়া মেহারকুল পরগণা অবস্থিত। পাটিকারা বিখ্যাত নগর ছিল—

"তোর বাপের ঘর ছিল সঙ্কছরা মাটি।
তাহাতে বিছাইল পুনঃ গঙ্গাজল পাটি ॥"

(ময়নামতীর গান)

এখানে অতি উত্তম পাটী প্রস্তুত হইত। পাটিকারা নামটি অতি উত্তম পাটী প্রস্তুতির জন্যই হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। "ধাড়িচন্দ্র এই সময় বঙ্গে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার রাজধানী পাটিকা বলিয়া উল্লেখ আছে" (বাংলা পুরাবৃত্ত)। পাটিকারা নামের সহিত পাটিশব্দ যোগের অনুমান পাটিকা নামের দ্বারাও সমর্থিত হয়। পাটিকারাজ্য লোপ পাইয়া পরে মেহেরকুলের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। মেহেরকুলের শেষ রাজা পাটিকারাও কমলাঙ্কে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেন। রাণী ময়নামতী পাটিকারার সহিত উত্তরবঙ্গের রাজ্যও শাসন করিতেন। রংপুর জেলার ময়নামতী কোট তাহার নিদর্শন। পাটিকারার অধিকার রংপুর হইতে কামরূপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। গোবিন্দ-চন্দ্র ও ময়নামতীর গানে ত্রিপুরার কোন উল্লেখ না থাকায় মনে হয় ত্রিপুরার রাজা কর্ত্তৃক বিজিত হওয়ার পর ঐ সব অঞ্চল ত্রিপুরার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। খৃষ্টের ১২শ শতাব্দীতে ত্রিপুরার রাজগণ সমগ্র ত্রিপুরাতে আধিপত্য বিস্তার করেন (গোপীচাঁদের সন্ন্যাস)। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে কুমিল্লার নিকট অবস্থিত ময়নামতী লালমাই পাহাড়ে গোপীচাঁদের রাজধানী ছিল।

"ত্রিপুরা জেলার লালমাই ও ময়নামতী অঞ্চলে নাথসিদ্ধা পুরুষগণ সম্বন্ধীয় অপরিমিত সাক্ষাৎ ও পরম্পরা নিদর্শন বর্ত্তমান রহিয়াছে। ত্রিপুরাই যে নাথ-যোগিগণের কাহিনী ও তাঁহাদের শিষ্য ও অনুচর রাণী ময়নামতী ও তৎপুত্র

রাজা গোপীচাঁদ গোবিন্দচন্দ্রের উপাখ্যানের প্রধান লীলাক্ষেত্র তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই" (ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাস—২১৫ পৃঃ) ।

(নাথযোগী হাড়িপা বা জালন্দর নাথের নিকট রাজা গোপীচাঁদের দীক্ষা-গ্রহণ ও রাজপদত্যাগের করুণ কাহিনী ষষ্ঠ অধ্যায়ে দেখুন)।

মহানাদে রাজা মহেন্দ্রনারায়ণ নাথ

রাজত্ব সময়—সম্ভবতঃ ১৬০০ খৃঃ অব্দ

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ ; সি, আই, ই, মহাশয় যে রাঢ়-বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন তাহার মহানাদের বিচারে আছে—

"অথ মানত দেশ বিবরণম্ ।

যোগিজাতি-গৃহে জাতো ভাগ্যবান্ সর্ব্বলক্ষণঃ ।
মহেন্দ্রনারায়ণঃ নৃপো মানাত-নগরে পুরা ॥
মৃত্তিকাময়-দুর্গস্ত মর্য্যাদাভিঃ সমন্বিতঃ ।
স্থাপিতা বেণু বৃক্ষাস্ত দুর্গমধ্যে পুরানৃপৈঃ ॥
প্রাচীনা রাজবাটী চ বর্ত্ততে ভগ্নবাটীকা ।
রাজবাট্যা পার্শ্ববর্ত্তী বহবো যোগিজাতয়ঃ ॥
মানাত বিখ্যাত রাঢ় দেশেষু ॥"

বিখ্যাত রাঢ় দেশের মানাত (মহানাদ, হুগলী) নগরে পুরাকালে যোগিজাতি গৃহে সর্ব্বলক্ষণযুক্ত ভাগ্যবান মহেন্দ্রনারায়ণ নামক নৃপ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সুরক্ষিত মৃত্তিকাময় দুর্গ দ্বারা পুরী রক্ষিত ছিল। নৃপগণ দুর্গমধ্যে বেণুবৃক্ষ রোপণ করিয়াছিলেন। এখনও রাজবাটীর ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। তাহার চারিদিকে বহু সংখ্যক যোগিজাতির বাস।

মুসলমান রাজত্বের পূর্ব্বে মহানাদ (মানাত) ইতিহাস কুয়াসাচ্ছন্ন। কেবলমাত্র জাহাঙ্গীর বাদশাহের আমলে (১৬২২ খৃঃ অঃ) ইহার উল্লেখ আছে।

শাহসুফি সুলতানের কেচ্ছা, বিশ্বকোষ, ৩য় খণ্ড, এবং স্যার উইলিয়াম হাণ্টার কৃত হুগলী জিলা গেজেটিয়ারে ইহার বিবরণ পাওয়া যায়। প্রথমোক্ত বহিতে আছে "পাণ্ডবরাজা, মহানাদে রাজধানী।" ইহাতে মনে হয় যে, সে সময় হইতে মহানাদ রাজধানী ও পাণ্ডব রাজার রাজ্য মুসলমান বিজয়ীদের হাতে আসে। মহানাদ ১ম ও ২য় খণ্ডের বিবরণ বিচার করিয়া দেখা গিয়াছে যে মোটামুটী তিন শত বৎসর পূর্ব্বে মহেন্দ্রনারায়ণ নাথ নামক এক রাজা মহানাদে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। এই রাজবংশ বহুকাল হইতে প্রচলিত ছিল। রাজবাটীর সংলগ্ন মন্দিরের ধারে এখনও বেণু বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা এখন জনশূন্য জঙ্গলাকীর্ণ অবস্থায় আছে বটে; কিন্তু পূর্ব্বে এখানে বহু সংখ্যক যোগিজাতির বাস ছিল। রাজবাটীর সম্মুখের সদর দরজার দক্ষিণে বহুকালাবধি নাথদের বাস ছিল। কিছুদিন পূর্ব্বেও কানাইনাথ নাথ, সিদ্ধেশ্বরনাথ নাথ দুর্গাচরণ নাথ ও তাঁহাদের বংশধরদের বাস ছিল। এখনও পরিত্যক্ত বাসভূমির চিহ্ন আছে। সর্ব্বশেষে দুর্গাচরণের বংশে একজন বিধবা এবং হারাধনের দৌহিত্রতনয় বাস করিতেন।

কাশ্মীরে যোগিরাজবংশ

কাপ্তেন হাডউয়িক সাহেব তাঁহার ফতেগড় হইতে শ্রীনগর পর্য্যন্ত ভ্রমণ-কাহিনী ১৭৯৬ খৃষ্টীয় শতাব্দীতে এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশ করেন। তিনি কাশ্মীররাজের পুস্তকালয়ে কাশ্মীরের রাজাদের যে বংশতালিকা পাইয়াছিলেন তাহাতে নিম্নলিখিত নাথ-রাজাদেরও নাম ছিল:—

রাজার নাম				রাজত্বকাল
১। জগন নাথ	...	...	...	৫৫ বৎসর
২। বাইজী নাথ	...	...	...	৬৫ ,,
৩। গোকুল নাথ	...	...	...	৫৪ ,,

রাজার নাম	রাজত্বকাল
৪। রাম নাথ	৭৫ বৎসর
৫। গোপী নাথ	৮২ ,,
৬। লছমী নাথ	৬৭ ,,
৭। প্রেম নাথ	৭১ ,,

(Asiatic Society Research Vol. VI. Page 338)

আসামে যোগিরাজবংশ

যোগিরাজা মাঙতরা

আসাম গবর্ণমেণ্টের অর্থে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত কামরূপ অনুসন্ধান সমিতি অহোম ভাষায় লিখিত ছয়খানি এবং অসমীয়া ভাষায় লিখিত এগারখানি প্রাচীন পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছিলেন। "পুৰণি অসম বুৰঞ্জী"—উপরোক্ত পুস্তকগুলির মধ্যে একখানি। উক্ত পুস্তকের বিবরণ হইতে জানা যায় যে যোগিবংশোদ্ভব মাঙতরা নামক জনৈক রাজা উজান (আপার) আসামের কোনও রাজ্যে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহাতে উক্ত রাজ্য ও রাজার বিস্তৃত কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। আসাম গবর্ণমেণ্ট Department of Historical and Antiquarian Studies, Assam, নামক আর একটি অনুসন্ধান সমিতি গঠন করিয়া অনুসন্ধান কার্য্য চালাইতেছেন। উক্ত সমিতিগুলি এ সম্বন্ধে কোনও বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন কিনা জানি না।

যাহা হউক 'পুৰণি অসম বুৰঞ্জী' ২০—২৫ পৃষ্ঠায় এ সম্বন্ধে যে বিবরণ আছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল—

"পূর্ব্বে নড়া রজাক মাঙতরা এ করভার দিছিল। পাচে দুই তিনি বারো নড়া রাজা সহিতে যুদ্ধ করি নোৱাৰি পুনর্ব্বার নড়া রাজাতে শরণাপন্ন হৈ তাঙ্গর প্রীতি করি করভার দি আছিল। পাচে নড়া রাজা সন্তোষ হৈ মাঙতরাত জী একক বিবাহ দিলে। মাঙতরা কুলত "জুগি"। কতোদিন থাকি মাঙতরাএ

বড়কাপর এখান, বটা কোতঙ এখান স্ত্রীর শোণিতেরে বুলায় অনেক চিত্র সোণরূপর মলমা করি জীএকত কৈ নড়া রাজালৈ দি পঠালে, বোলে যেনে উপায়ে পার বাপেরে গাত লই হেন করিবি। পাচে জীএকে সেই কাপর আনি নড়ারাজাক দি বোলে কাপর দুখানি তুমি লবর নিমিত্তে জোয়াঞা দিছে। নড়ারাজা বোলে ভাল লম। এই বুলি পাত্রমন্ত্রী সকলত সুধিলে বোলে মাঙতরা যে কাপর দিছে গাত লোৱা যাব নে নেযাব? পাত্রমন্ত্রী সকলে বোলে বিদেশৰ বস্ত্র যদি উত্তম হই তাক ৰাজা পৰিধান কৰিবলৈ ভাল নহই। এইবুলি কলত ৰাজা শুনি থাকিল। পাচে মেল ভাঙি ভিতৰলৈ গলত জীএকে সেৱা কৰি বোলে তোমাৰ সেৱাত লাগিবৰ নিমিত্তে ৰাজাএ অত্যন্ত আদৰ কৰি দিছে। তুমি পিন্ধিবৰ নুশুনিলে তাঙ্গৰ অসন্তোষ পাব, মোকো খণ্ড কৰিব। এইবুলি কলত রাজাএ কাপৰ গাত লগে। দুই এক দিনৰ পাচত নড়াৰাজাৰ কপালৰ চক্ষুটো গুছিল। আগতকৈ তেজশক্তিও হ্রাস হল।

পাচে জীএকে গৈ সকলো কথা মাঙতৰাত কলত মাঙতৰা হৰ্ষ কৰি লোকজন আহিলা পাতি তিয়াৰ কৰি নড়াৰাজাৰ সম্মুখে যুদ্ধক আহিল। নড়াও যুদ্ধৰ কথা শুনি প্ৰধান মন্ত্ৰী বৰ গোহাঞিক লোকজন দি মাঙতৰাৰ নৰাৰ লগত সম্মুখে পথালে। বৰ গোহাঞে বোলে মঞি যুদ্ধ করি নাহোমানে।

কোনোজনে কোনো কথা কলে তাক নলবা। তাঙ্গৰ দ্ৰোহিয়া জগৰী-য়াকো ৰাখি থবা। দণ্ড বন্ধ নকৰিবা আৰু মোৰা কোনো কথা লগাই কলে তাৰো নলবা। মঞি আহিলে বিচাৰ কৰি দণ্ড কৰিবা। পাচে ৰাজা বোলে ভাল, তঞি মাঙতৰাক যুদ্ধ কৰি নাহমানে মঞি একো কথা নকৰো। পাচে বৰ গোহাঞি যুদ্ধলৈ গল। তিনি অহিন যুদ্ধ কৰিলে, মাঙতৰাৰ বহুত লোক পাঠল। যুদ্ধে নোৱাৰি মাঙতৰা হুহকি থাকিল। পাচে মন্ত্ৰণা কৰি বোলে ই বৰ গোহাঞি থাকে মানে মঞি যুদ্ধে নোআৰো। এইবুলি এপাত স্বৰ্ণৰ কাণ্ড গঢ়াই তাতে লেখিলে বোলে মঞি নড়াৰাজাৰ সকল দিনৰ বেটা পো,

যেনেতেনে আপনাৰ মঙ্গহ জীএকক মোত দিছে। মঞি যুদ্ধলৈ নাহো ঘাতো ৰৰ গোহাঞিএ মোলৈ কলে বোলে নড়াৰাজা অনেকৰূপে ৰাজাকো আমাকো দুখ কষ্ট দিএ। ইয়াৰ ভোগ উঠিল, তেঞো যুদ্ধলৈ আহক! আমি যুদ্ধ কৰোঁ বুলি গৈ, তেঞোকো আনি নড়াৰাজাক খেদি ৰাজ্য পাতি লম। এইবুলি গোহাঞিএ কলত হে মঞো আহিছো। এতিয়া যদি নাযাবলৈ বোলে নিচই কই কব, সেইদিনা মঞি যাম।

পাচে সেইকাণ্ড পাত সৈন্যৰ মাঝলৈ মাৰিলে। তাকে ভাল মানুহ এটাই পাই গোহাঞে নজানাকৈ নড়াৰাজালৈ দি পথালে। কাণ্ড পাতত এই লেখা পাই জিজ্ঞাসা নকৰি বোলে এয়েহে মোৰ প্রধান শত্রু; ইয়াক ততে মাৰকগৈ, এইবুলি মানুহ পথালে। সেই মানুহ গৈ গোহাঞিক দাৰে কাটে; টাঙ্গনেৰে টঙনিয়াই দুই তিনি দিনেও তেও নমৰে। পাচে গোহাঞিএ বোলে নড়াৰাজাৰ ৰাজ্যক দুদ্দিনে পালে। ই ৰাজা আৰু মোক নাৰাখে। আপুনি হে দুখ পাওঁ, এইবুলি গোহাঞে কলে তেওঁ আন ঠাইত কাটিলে ঘুছিলে মঞি নমৰো। দক্ষিণফালে শেষত কাটিলেহে মৰো, পাচে সিহতে তাতে খুচি মাৰিলে। গোহাঞিক মাৰিবৰ শুনি মাঙতৰাএ খেদি আহি ৰাজ্য মাৰিলে। ম্লেচ্ছাচাৰ গুছায় তাম পিতলৰ মূৰ্ত্তি সাজি সেৱা পূজা কৰিবলৈ ৰাজ্যক দিলে।" "* * * পাচে নড়াৰাজা আপোনাৰ দেশলৈ গৈ মাঙতৰাক কৰভাৰ দি মিলি থাকিল গৈ। * * *"

"* * * এতেকে নড়াৰাজাক যদি হঠাইলৈ ধৰি অনা গলহেতেঁন সেই বাটে মাঙতৰাএ খেদি আহিল হেঁতেন। * * *"

ইহার মোটামুটি মর্ম্ম এই যে— নড়া নামক রাজাকে কর দিয়া মাঙতরা রাজা করদরাজ্যে রাজত্ব করিতেন। স্বাধীনতা লাভের জন্য রাজা মাঙতরা দুই তিন বার নড়ারাজার সহিত যুদ্ধ করিয়া পরাজিত হইয়াছিলেন এবং নড়া রাজার শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার সহিত পরম প্রীতিতে আবদ্ধ হইয়াছিলেন।

ফলে নড়ারাজার মেয়ের মাণ্ডতরা রাজার সহিত বিবাহ হইয়াছিল। মাণ্ডতরা রাজা 'কুলত জুগি" জাতীয় অর্থাৎ যোগিবংশোদ্ভব ছিলেন। মাণ্ডতরা রাজা স্বীয় সাহায্যে নড়ারাজাকে বশ করার চেষ্টা করেন। ফলে নড়ারাজার শক্তি হ্রাস হইতেছিল। তৎপর উভয় পক্ষে যুদ্ধ বাঁধিল, যুদ্ধে নড়ারাজা পরাজিত হইয়া মাণ্ডতরা রাজাকে কর দিয়া রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন, এবং স্বীয় রাজ্য হইতে ম্লেচ্ছাচার দূর করিয়া হিন্দু আচার প্রচলনের এবং তামা ও পিত্তলের নির্ম্মিত মূর্ত্তি গঠন করিয়া সেবাপূজার ব্যবস্থা করেন।

এখানকার "সেবাপূজা" খুব সম্ভব শিবপূজা হইবে। লিপিকরপ্রমাদে শিবপূজা স্থলে "সেবাপূজা লিখা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কারণ আসামে বিশেষ করিয়া আসাম উপত্যকায় সেবাপূজা নামে কোনও পূজা প্রচলিত আছে বলিয়া আমরা জানি না।

বর্ত্তমান অধ্যায়ে আমরা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, নাথাচার্য্যগণ ও নাথবংশোদ্ভব বহু শক্তিশালী ব্যক্তি সমগ্র ভারতে বা তদন্তর্গত প্রদেশে বংশানুক্রমে রাজদণ্ড পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন এবং যুদ্ধস্থলে আক্রমণকারী অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রুকে পরাস্ত করিয়া দেশের স্বাধীনতা ও সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন। নাথাচার্য্যগণের এইরূপ রাজ্যভোগলিপ্সা ও বিষয়ানুরক্তি দেখিয়া হয়তো অনেকে বিস্মিত হইবেন এবং তাঁহাদের আদর্শভ্রষ্টতা ও নৈতিক অধঃপতন অনুমান করিয়া হতাশ হইবেন। এইরূপ সংশয়াপন্ন ব্যক্তিদিগকে আমরা এই প্রবোধ দিতে চাই যে, নাথাচার্য্যগণ আপাতঃ দৃষ্টিতে ভোগাশক্ত প্রতীয়মান হইলে বিষয়ের কর্দ্দম তাঁহাদের অন্তঃকরণ স্পর্শ করিতে পারে নাই। "মন এবং মনুষ্যানাম কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।" তাঁহারা কর্ত্তব্যবোধে রাজর্ষি জনকের ন্যায় নিষ্কামভাবে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিয়া যুগপৎ নিষ্কাম কর্ম্মানুরাগিতা ও সংসার বৈরাগ্যের আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহারা ছিলেন প্রকৃত কর্ম্মযোগী।

তাঁহারা যাহা কর্ত্তব্য বুঝিতেন, 'কামসংকল্পবিবর্জ্জিত' হইয়াই তাহা করিতেন ; সুতরাং তাঁহাদের যোগিত্ব বা সন্ন্যাসিত্ব নষ্ট হইত না।

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ ॥

গীতা—৬।১

সুখ-দুঃখে— লাভ-অলাভে— জয়-পরাজয়ে সর্ব্বাবস্থাতেই তাঁহাদের সমত্ববুদ্ধি অক্ষুণ্ণ থাকিত ; অতএব তাঁহারা বাহ্যতঃ বিষয়াসক্ত হইলেও প্রকৃতপক্ষে বিষয়বিমুক্তই ছিলেন।

ধর্ম্মজগতে মৎস্যেন্দ্র নাথ বা মীন নাথ অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তথাপি তাঁহার অভাবনীয় পতন ঘটিয়াছিল। কদলীরাজ্যে গমন পূর্ব্বক তিনি নারীপ্রেমে আসক্ত হইয়া বিষয়ে বিজড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন। যোগী হইয়াও তনি ভোগী হইয়াছিলেন ; কামনা-বাসনার দাস হইয়া ঘোর সংসারাসক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। মৎস্যেন্দ্র নাথের দৃষ্টান্ত হইতে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, ইন্দ্রিয় জয় করা নিতান্ত সহজ নহে। কামনা-বাসনার অগ্নিকণা অনেক সময় সংযতেন্দ্রিয় যোগী বা তাপসের অন্তঃকরণে লুক্কায়িত থাকে ; পরে বিষয়ের সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ পাইলে উহা প্রধূমিত হইয়া ক্রমশঃ লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করিয়া বিষয়ভোগে লিপ্ত হয় এবং সাধকের অধঃপতন ঘটায়। শাস্ত্র-পুরাণ-ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। সুতরাং মৎস্যেন্দ্র নাথের অধঃপতনে বিস্মিত হইবার কারণ নাই।

গোরক্ষ নাথ ছিলেন একজন সিদ্ধ যোগী। এই সিদ্ধ মহাপুরুষ চিরভাস্বর জ্যোতিষ্করূপে ধর্ম্মাকাশে বিরাজ করিতেন। তিনি ছিলেন মহাযোগী মৎস্যেন্দ্র নাথের যোগ্যতম শিষ্য। বহুদিন গুরুর চরণ দর্শনে বঞ্চিত গোরক্ষ নাথ অনেক সন্ধান-অনুসন্ধানের পর জানিতে পারিলেন যে তদীয় গুরুদেব কদলীরাজ্যে নারী-প্রেমাসক্ত ও কদলীরাজ্যের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া অবস্থান করিতেছেন। এই

সংবাদে তিনি অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়া গুরুদেবের উদ্ধারমানসে কদলীরাজ্যে গমন করিলেন। কি ভাবে তিনি মৎস্যেন্দ্র নাথের উদ্ধারসাধন করেন তাহা ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।

স্বকীয় যোগমহিমা-প্রভাবে কদলীমায়ামুগ্ধ গুরুর উদ্ধারসাধন করিয়া গোরক্ষনাথ গুরুভক্তির যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন তাহা অতুলনীয়। যোগ্য শিষ্যের যোগ্য কাজই তিনি করিয়াছিলেন। গুরুর শক্তি এখানে শিষ্যের শক্তির নিকট পরাজয় স্বীকার করিল। ইহাতে মৎস্যেন্দ্র নাথের লজ্জিত হইবার কোন কারণই ছিল না। বরং পুত্রের পাণ্ডিত্য যেমন শিক্ষকের—অনুজের জ্ঞানগরিমা যেমন অগ্রজের—পুত্রের প্রতিভা যেমন পিতার সম্মান ও আনন্দ বৃদ্ধি করে, সেইরূপ গোরক্ষ নাথের অপূর্ব্ব যোগমহিমা ও চরিত্রমাধুর্য্য গুরু মৎস্যেন্দ্র নাথের গৌরব ও সম্মান অধিকতর বাড়াইয়া দিয়াছিল। সাধনজগতেও সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে পুরুষকারের একান্ত প্রয়োজন। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন—"উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং"। মানুষের জীবনে উত্থান-পতন অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং পতনে হতাশ হইবার কারণ নাই, এবং পতিতের প্রতি ঘৃণা বা বিদ্রূপ প্রদর্শন করিবার হেতু নাই। অধঃপতিত পুনঃ উত্থিত হইতে পারে—যদি তাহার থাকে ধৈর্য্য, অধ্যবসায় ও পুরুষকার। সাধনমার্গে ও অধ্যাত্মিক জগতেও ইহা সত্য। মৎস্যেন্দ্রনাথই তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত।

আমরা নানা প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে, যোগিরাজগণ একদা নিপুণতার সহিত রাজ্যশাসন—দক্ষতার সহিত সৈন্য পরিচালন এবং অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিয়া সাংসারিক জীবনেও প্রভূত ধনমানযশঃ অর্জ্জনে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং পবিত্র আদর্শ জীবন যাপন করিয়া লোকশিক্ষার সহায়তা করিয়াছিলেন। ইহা ঐতিহাসিক সত্য।

৭ম অধ্যায়ের ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়সমূহের আলোচনা হইতে বুঝা গেল যে, নাথাচার্য্যগণ 'সর্ব্বভূত হিতেরত' হইয়া 'জগদ্ধিতায়' জীবন উৎসর্গ করিয়া যেমন

ধর্ম্মজগতে বিজয়কেতন উড্ডীন করিয়াছিলেন, সেইরূপ বৈষয়িক জীবনেও দক্ষতার সহিত ও নিস্পৃহভাবে রাজদণ্ড পরিচালনা করিয়া জ্ঞান ও কর্ম্মের অপূর্ব্ব সমন্বয় সাধনপূর্ব্বক প্রকৃত সন্ন্যাসীর চরম আদর্শ সর্ব্বজনসমক্ষে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। লোকচিত্তে তাঁহারা ধর্ম্মের ও কর্ম্মের যে প্রেরণা জাগাইয়াছিলেন, তাহা আজও অতীতের অন্ধকার ভেদ করিয়া সুদূর গগনে অবস্থিত ধ্রুবনক্ষত্রের স্থায় ক্ষীণ আলোকরশ্মি বিকীরণ করিতেছে। সেই রশ্মিসাহায্যে কত পথভ্রান্ত মানব জীবনে পথের সন্ধান পাইতেছে। কিন্তু যাঁহারা একদা ধর্ম্মরাজ্যে একচ্ছত্র সম্রাট্‌রূপে বিরাজ করিতেছিলেন এবং যাঁহারা সংসারে ভোগলালসা-বিনির্মুক্ত সংসারী সাজিয়া অনুপম ত্যাগের বাণী বিশ্ববাসীকে শুনাইয়া গিয়াছেন, তাঁহারা আজ কোথায়? বিধাতার অলঙ্ঘনীয় নিয়মে তাঁহারা আজ কালকবলে নিপতিত—তাঁহাদের গগনস্পর্শী গৌরবস্তম্ভ আজ ভূলুণ্ঠিত। তাই ইংরাজ কবি গাহিয়াছেন :—

"Sceptre and crown
Must stumble down......

অর্থাৎ— রাজদণ্ড কিম্বা সিংহাসন
একদিন লভিবে পতন ;—

... ... ('প্রতিধ্বনি'—বৈশাখ, ১৩৬০ বাং)

তাঁহারা পরলোকগত হইলেও, তাঁহারা যে মহৎ আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন তাহার অনুবর্ত্তন করিলে তাঁহাদের অধঃপতিত বংশধরগণ অনুপ্রাণিত হইবে এবং পূর্ব্বপুরুষগণের মহিমোজ্জ্বল ও গৌরবময় ঐতিহ্য তাঁহাদের হৃদয়ে নূতন শক্তি সঞ্চার করিবে। যেমন—

"Lives of greatmen often remind us
We can make our lives sublime."

অষ্টম অধ্যায়

যোগিজাতির বর্ণবিচার

বর্ণভেদের উৎপত্তি

আদি মানুষ সরলস্বভাব বন্যমানুষের জীবন যাপন করিত। তাহাদের সমাজ, ধর্ম্ম, শিল্প, বাণিজ্য কিছুই ছিল না। ক্রমবিকাশের ফলে তাহাদের আকৃতি ও প্রকৃতির উন্নতি সাধিত হইতে থাকে এবং দৈহিক সামাজিক ও নৈতিক প্রয়োজনের তাগিদে তাহাদের মধ্যে কালক্রমে সমাজ, ধর্ম্ম, কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য গড়িয়া উঠে। সমাজ গঠিত হইলে সমাজ রক্ষার জন্য ধর্ম্মের বা নৈতিক নিয়মের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য সামাজিক প্রয়োজনেই ক্রমশঃ প্রবর্ত্তিত হয়। সমাজব্যবস্থার স্থিতি, পুষ্টি ও সংরক্ষণ জন্য এবং কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতির সম্প্রসারণ ও সংগঠন নিমিত্ত কালে বিভিন্ন প্রকৃতির লোকের আবশ্যক হয়। সমাজ সুসম্বদ্ধ হইলে গ্রাম, নগর ও দেশ গড়িয়া উঠিতে লাগিল; দেশরক্ষার জন্য ও দেশবাসীকে চালিত, পালিত ও নিয়ন্ত্রিত করিবার নিমিত্ত রাজার অধীনে রাজ্য গঠিত হইল। সমাজ যখন এইরূপ জটিল আকার ধারণ করিল, তখন সমাজরক্ষা, দেশরক্ষা ও ধর্ম্মরক্ষার কাজে বিভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন কর্ম্ম করিবার প্রয়োজন হইল। সমাজের বা দেশের জনসাধারণ সমাজ, ধর্ম্ম ও দেশের প্রতি তাহাদের কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে সজাগ হইয়া স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে কর্ত্তব্যের ভার গ্রহণ করিল এবং সমাজ ধর্ম্মরক্ষার উপযোগী বিভিন্ন প্রকারের কাজ বাছিয়া লইল। এই প্রকারে প্রকৃতি অনুসারে কর্ম্মভেদ এবং কর্ম্ম অনুসারে শ্রেণীভেদ কালক্রমে গড়িয়া উঠিল এবং সমাজে বদ্ধমূল হইল।

এখানে একটা কথা বলিয়া রাখি। জগৎ সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই ত্রিগুণাত্মক, মানুষের প্রকৃতিও এই ত্রিগুণের সংমিশ্রণে গঠিত। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের পা

পুণ্যজনিত সংস্কার মানুষের জন্ম হইতে জন্মান্তরে সংক্রমিত হয়। এই সংস্কারই প্রকৃতি। এই সংস্কার মানুষের সহজাত। সংস্কার বা প্রকৃতির বিরুদ্ধে মানুষের কোন কাজ করিবার শক্তি নাই। বরঞ্চ তাহার অনুগমন করাই মানুষের ধর্ম্ম।

মানুষের প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা। সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোকের ধর্ম্ম সাত্ত্বিক অর্থাৎ সত্য, সরলতা, অমানিতা, ক্ষমশীলতা, নির্লোভতা ইত্যাদি তাহার ধর্ম্ম; রাজসিক প্রকৃতির লোকের ধর্ম্ম রাজসিক অর্থাৎ প্রভুত্ব, ক্ষমতা, প্রতিপত্তি, সুখসম্পদ্ ইত্যাদি লাভের উদ্দেশ্যে কর্ম্ম করাই তাহার ধর্ম্ম; আর তামসিক প্রকৃতির লোকের ধর্ম্ম তামসিক অর্থাৎ অত্যধিক নিদ্রা, আলস্য, ভয়, মূঢ়তা ইত্যাদি কার্য্যই স্বভাবসিদ্ধ।

জগতে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক— এই তিন শ্রেণীর মানুষ দেখিতে পাওয়া যায়। গুণভেদ অনুসারে মানুষের কর্ম্মভেদ হইয়া থাকে। এই গুণভেদ ও কর্ম্মভেদ অনুসারেই নানা বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে।—

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ। গীতা—৪।১৩।

চতুর্ব্বর্ণ বলিতে বুঝায়— ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র— এই চারি বর্ণ। প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে দেখা যায়, প্রাচীনকালে কোন বর্ণভেদ ছিল না, তখন একই বর্ণ ছিল। মহাভারতে আছে—

ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাম্ সর্ব্বং ব্রহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্বর্ণতাং গতম্॥
একবর্ণমিদং পূর্ব্বং বিশ্বমাসীদ্ যুধিষ্ঠির।
কর্ম্মক্রিয়া বিশেষেণ চাতুর্ব্বর্ণ্যং প্রতিষ্ঠিতম্॥

অর্থাৎ পুরাকালে ভারতবর্ষে বর্ণবিভাগ ছিল না। কালক্রমে এক বর্ণেরই মানুষগণ গুণকর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র— এই চারিবর্ণে বিভক্ত হইয়াছে। "একবর্ণমাসীৎ পুরা"— অর্থাৎ পুরাকালে একটি মাত্র বর্ণ ছিল—

তাহা ব্রাহ্মণ। এই ব্রাহ্মণ হইতে কালে মানুষের গুণ ও কর্ম্মের ভেদানুসারে অপর তিন বর্ণের সৃষ্টি হয়।

এক্ষণে উল্লিখিত চতুর্ব্বর্ণের গুণ ও কর্ম্মের কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাক। ব্রাহ্মণের মধ্যে সত্ত্ব গুণের প্রাধান্য; সুতরাং তাঁহার কর্ম্মও সাত্ত্বিক। অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, ধর্ম্মানুশীলন, ধর্ম্মপ্রচার, শাস্ত্রোপদেশ ইত্যাদি ত্যাগমূলক কার্য্যই তাঁহার ধর্ম্ম। ক্ষত্রিয়ের মধ্যে কিঞ্চিৎ সত্ত্বগুণের এবং বেশীর ভাগ রজঃগুণের প্রাধান্য; সুতরাং তাঁহার কর্ম্মও রাজসিক। দেশের শান্তিরক্ষা, বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা, যুদ্ধবিগ্রহাদিই তাঁহার কর্ম্ম। বৈশ্যের মধ্যে রজঃ-গুণের আধিক্য ও তমঃগুণের অল্পতা বিদ্যমান। কৃষিবাণিজ্যাদি দ্বারা দেশের ধনবৃদ্ধি করাই তাহার কর্ম্ম। শূদ্র তমোগুণাপন্ন। কায়িক শ্রমের দ্বারা অন্য তিন বর্ণের সেবা করিয়া তাঁহাদিগকে স্ব স্ব কর্ত্তব্যসাধনে সহায়তা করাই শূদ্রের কর্ম্ম। পৃথিবীর সকল দেশের ও সকল জাতির মধ্যেই এই চারি বর্ণের অস্তিত্ব আছে। এই চারি বর্ণের মিলিত কর্ম্ম ব্যতিরেকে কোন দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে না এবং সমাজের, দেশের ও রাষ্ট্রের কৃষ্টি-পুষ্টি-বৃদ্ধি সম্ভবপর হয় না।

উপরোক্ত চারি বর্ণের উৎপত্তি সম্বন্ধে শাস্ত্রে উক্ত আছে—

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ বাহূরাজন্যকঃ কৃতঃ।
উরু তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত॥ (ঋগ্বেদসংহিতা)

অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ; বাহু হইতে ক্ষত্রিয়; উরু হইতে বৈশ্য এবং চরণ হইতে শূদ্রের উৎপত্তি হয়। ইহার অর্থ—ব্রহ্মা মুখ ব্যাদান করিলে ব্রাহ্মণ বহির্গত হয়; তাঁহার বাহু বিদীর্ণ করিয়া ক্ষত্রিয় বহির্গত হয় উরু ভেদ করিয়া বৈশ্যের জন্ম হয় এবং পদযুগল ভেদ করিয়া শূদ্র বহির্গত হয়।

উদ্ধৃত শ্লোকটীর মধ্যে যে রূপক অর্থ নিহিত আছে তাহা এই— ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা। ইহা মুখের কার্য্য; সুতরাং ব্রাহ্মণ সৃষ্টিকর্ত্তা

মুখস্বরূপ। দেশরক্ষা যুদ্ধবিগ্রহাদি ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য। ইহা বাহুবলের উপর নির্ভর করে বলিয়া ক্ষত্রিয় সৃষ্টিকর্ত্তার বাহুস্বরূপ। কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যাদি দ্বারা দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করা বৈশ্যের কর্ত্তব্য। ইহাতে দেশ হইতে দেশান্তরে—স্থান হইতে স্থানান্তরে গমনাগমন প্রয়োজন হইয়া পড়ে। উরুযুগলের শক্তি ব্যতিরেকে এই শ্রমসাধ্য কার্য্য সাধিত হইতে পারে না; সুতরাং বৈশ্য সৃষ্টিকর্ত্তার উরুস্বরূপ। অপর তিন বর্ণের সেবা শূদ্রের কর্ত্তব্য। পদযুগলের সাহায্য ব্যতীত দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল সময় যেমন স্ব স্ব কার্য্য করিতে পারে না, সেইরূপ শূদ্রের সেবা ব্যতীত অন্য তিন বর্ণের লোক নিজ নিজ কর্ত্তব্যসাধন-পূর্ব্বক সমাজের মঙ্গলসাধনে সমর্থ হয় না। চরণযুগলের উপর নির্ভর না করিয়া দেহ দাঁড়াইতে পারে না। তদ্রূপ শূদ্রের সেবা ব্যতিরেকে সমাজও টিকিতে পারে না। সুতরাং শূদ্রের উৎপত্তি সৃষ্টিকর্ত্তার চরণযুগলে আরোপিত হইয়াছে। এই রূপক অর্থ হইতেও বুঝা গেল—বর্ণভেদ কর্ম্মগত; বংশগত নহে।

ঋগ্বেদ হিন্দুদের প্রাচীনতম গ্রন্থ। গীতা ও অন্যান্য শাস্ত্র ইহার অনেক পরে রচিত ও প্রচারিত। প্রাচীনকালে বর্ণভেদ ছিল না তাহা প্রথমেই উক্ত হইয়াছে। কিন্তু ঋগ্বেদ হইতে উদ্ধৃত শ্লোকে দেখা যাইতেছে যে, প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছিল। সুতরাং রক্ষণশীল পণ্ডিতগণ ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণের, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি ইত্যাদি—উদ্ধৃত শ্লোকের এইরূপ অর্থ করিয়া বর্ণভেদ জন্মগত করিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু আমাদের বক্তব্য এই যে, ঐ শ্লোকটী ঋগ্বেদ-সংহিতা হইতে উদ্ধৃত হইলেও উক্ত ঋগ্বেদের ন্যায় প্রাচীন নহে। সমাজে বর্ণভেদ প্রথা প্রচলিত হইবার পরে উহা রচিত হইয়া ঋগ্বেদ সংহিতায় স্থানলাভ করিয়াছে। সামাজিক প্রয়োজনে পরবর্ত্তী যুগে বর্ণভেদের সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু তখন উহা জন্মগত ছিল না—গুণগত ও কর্ম্মগত ছিল।

আমরা ইতিহাসে দেখিতে পাই, আর্য্যেরা যখন ভারতে আগমন করেন, তখন এই দেশে অনার্য্যেরা বাস করিত। আর্য্য ও অনার্য্যদের যুদ্ধকাহিনী আমরা ইতিহাসে ও পুরাণে পড়িয়া থাকি। বহুদিন যুদ্ধের পর অনার্য্যগণ যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া আর্য্যদের বশ্যতা স্বীকার করে। এই অনার্য্যগণই পরে শূদ্র নামে অভিহিত হইয়া হিন্দুসমাজে স্থান লাভ করে। আর্য্যগণ বিজিত অনার্য্যদিগকে দাসত্বে নিয়োজিত করেন। এইভাবে গুণকর্ম্মানুসারে চতুর্ব্বর্ণের প্রবর্ত্তন হয়।

প্রাচীন যুগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—এই চতুর্ব্বর্ণের বিভাগ ছিল সত্য, কিন্তু বর্ণসমূহের মধ্যে কোন হিংসা, দ্বেষ, ঘৃণা বিদ্যমান ছিল না এবং তাহাদের মধ্যে কোন সামাজিক প্রতিবন্ধকতাও ছিল না। ঐ সকল বর্ণের মধ্যে বৈবাহিক আদান-প্রদান প্রচলিত ছিল। প্রত্যেক বর্ণই সমাজ-দেহের অপরিহার্য্য অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইত এবং প্রত্যেক বর্ণের কার্য্যকেই সমান মর্য্যাদা দেওয়া হইত। এই বর্ণভেদ গুণগত ও কর্ম্মগত ছিল বলিয়া একই বর্ণের বা পরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তি এবং একই পিতার সন্তানগণ স্ব স্ব গুণকর্ম্মানুসারে কেহ ব্রাহ্মণত্বের, কেহ ক্ষত্রিয়ত্বের, কেহ বৈশ্যত্বের এবং কেহ শূদ্রত্বের অধিকারী হইত। ইহার প্রমাণ ব্যাস, বশিষ্ট, বিশ্বামিত্র, বাল্মীকি প্রমুখ ঋষিগণ। ধীবরকন্যার গর্ভজাত হইয়াও মহামতি ব্যাস গুণকর্ম্মানুসারে জগৎপূজ্য ঋষি হইয়া ব্রাহ্মণ বলিয়া সম্মানিত হইয়াছিলেন; বশিষ্ট ও বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন; এবং চ্যবন ঋষির কুলাঙ্গার দস্যু পুত্র রত্নাকর সাধন ও তপস্যাপ্রভাবে ব্রাহ্মণত্ব ল করিয়া মহামুনি বাল্মীকি নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। "সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—এই চারি যুগেই বহু ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রজাতীয় লোক সৎকর্ম্ম ও সদাচার দ্বারা ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন,—শাস্ত্রে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ বিদ্যমান আছে।" বায়ুপুরাণে দেখিতে পাই :—

পুত্রোগৃৎস্যমদস্যাপি শুনকো যস্য শৌনকঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্যাঃ শূদ্রাস্তথৈবচ ॥
এতস্য বংশে সম্ভূতাঃ বিচিত্রৈঃ কর্ম্মভির্দ্বিজাঃ ॥

গৃৎস্যমদ জনৈক ক্ষত্রিয়; তাহার পুত্র শুনক এবং শুনকের পুত্র শৌনক। এই শৌনক ক্ষত্রিয়বংশসম্ভূত হইলেও তাহার পুত্রগণ বিভিন্ন কর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র জাতিতে পরিণত হইয়াছিল।

এই প্রাচীন সমাজব্যবস্থার আমলে ব্রাহ্মণের ছেলে চিকিৎসক, ক্ষত্রিয়ের ছেলে অধ্যাপক, বৈশ্যের ছেলে সেনানায়ক এবং শূদ্রের ছেলে শাস্ত্রকারক হইতে পারিত, তাহাতে কোন বাধা ছিল না।

এখন যেমন ব্রাহ্মণত্ব জাতিগত হইয়া পড়িয়াছে, পুরাকালে সেরূপ ছিল না। মহাভারতে বর্ণিত আছে—

শৌচাচারস্থিতঃ সম্যগ্‌ বিঘসাশী গুরুপ্রিয়ঃ।
নিত্যব্রতী সত্যপরঃ স বৈ ব্রাহ্মণ উচ্যতে ॥
সত্যং দানমথাদ্রোহ আনৃশংস্যং ত্রপা ঘৃণা।
তপশ্চ দৃশ্যতে যত্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ ॥

অর্থাৎ "বাহ্য ও আভ্যন্তর এই বিবিধ শৌচ ও সদাচারে যিনি সম্যগ্‌রূপে অবস্থিত— যিনি যজ্ঞশিষ্টভুক্— যাঁহার সেবা ও অকপট ভক্তিতে গুরুজন প্রসন্ন থাকেন—নিত্যব্রতপরায়ণতা যাঁহার স্বভাব— আর যিনি কায়মনোবাক্যে সত্য প্রতিপালন করিয়া থাকেন তিনিই ব্রাহ্মণ। সত্য, দান, অহিংসা, অনৃশংসতা, লজ্জা, সর্ব্বভূতে দয়া এবং তপস্যা যাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় তিনিই ব্রাহ্মণ বলিয়া স্মৃতিশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন।" (সনাতন হিন্দু)

উপরোক্ত গুণাবলী যাহার মধ্যে দৃষ্ট হইত তিনিই বর্ণনির্ব্বিশেষে ব্রাহ্মণ বলিয়া সমাদৃত হইতেন। ঐ সকল গুণ না থাকিলে এবং অধ্যয়ন অধ্যাপনাহীন হইলে ব্রাহ্মণও শূদ্র বলিয়া পরিগণিত হইতেন :—

যো হ নধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥ মনু

অর্থাৎ যে ব্রাহ্মণ বেদ অধ্যয়ন না করিয়া অন্যবিধ শ্রম করিয়া থাকেন তিনি জীবদ্দশাতেই সবংশে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন। শাস্ত্রানুসারে বিচার করিলে বর্ত্তমান যুগে প্রকৃত ব্রাহ্মণ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

গুণ ও কর্ম্মই যে বর্ণের নির্দ্দেশক ছিল তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়ঃ—

শূদ্রোঽপি শীলসম্পন্নো গুণবান্ ব্রাহ্মণোভবেৎ।
ব্রাহ্মণোঽপি ক্রিয়াহীনঃ শূদ্রাৎ প্রত্যবরো ভবেৎ॥

অর্থাৎ শূদ্রও যদি শীলসম্পন্ন হয় তাহা হইলে সে গুণবান্ ব্রাহ্মণ বলিয়া সম্মানিত হইবে এবং ব্রাহ্মণ ক্রিয়াহীন হইলে শূদ্র অপেক্ষা অধম বলিয়া পরিগণিত হইবে।

ন জাতিঃ পূজ্যতে রাজন্ গুণাঃ কল্যাণকারকাঃ।
চণ্ডালমপি বৃত্তস্থং তং দেবাঃ ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥ গৌতমসংহিতা।

অর্থাৎ জাতি পূজনীয় নহে; গুণই কল্যাণকর। চণ্ডালও যদি ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া সদ্বৃত্তিসম্পন্ন হয়, তাহা হইলে তাহাকে দেবগণ ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করেন।

ন জাত্যা ব্রাহ্মণশ্চাত্র ক্ষত্রিয় বৈশ্য এব চ।
ন শূদ্রো ন চ বৈ ম্লেচ্ছো ভেদিতঃ গুণকর্ম্মভিঃ॥ শুক্রনীতি।

অর্থাৎ জাতির দ্বারা নহে, গুণকর্ম্মের দ্বারাই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বা ম্লেচ্ছ নির্ণীত হইয়া থাকে।

ক্রিয়াহীনশ্চ মূর্খশ্চ সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিতঃ।
নির্দ্দয়ঃ সর্ব্বভূতেষু বিপ্রশ্চণ্ডালঃ উচ্যতে॥

অর্থাৎ ক্রিয়াকাণ্ডহীন, মূর্খ, ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য, প্রাণিগণের প্রতি নির্দ্দয় ব্যক্তি জাতিতে ব্রাহ্মণ হইলেও তাহাকে চণ্ডাল বলিতে হইবে।

বৈষ্ণবশাস্ত্রেও আমরা দেখিতে পাই :—

চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ।
হরিভক্তিবিহীনস্তু দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ॥

অর্থাৎ হরিভক্তিপরায়ণ ব্যক্তি চণ্ডাল হইলেও দ্বিজোত্তম ; আর হরিভক্তি-বিহীন ব্যক্তি ব্রাহ্মণ হইলেও তিনি চণ্ডালেরও অধম।

কৃষ্ণ না ভজিলে দ্বিজ নহে কদাচিত
পুরাণে প্রমাণ এই শিক্ষা আছে নীত। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল।

অর্থাৎ কৃষ্ণভজনবিহীন ব্যক্তি দ্বিজপদবাচ্য হইতে পারেন না। পক্ষান্তরে যে কোন জাতির লোক কৃষ্ণভজন করিলে তিনি দ্বিজত্বের অধিকারী হইতে পারেন।

উপরোক্ত আলোচনাসমূহ হইতে দেখা গেল যে, গুণ ও কর্ম্মভেদেই বর্ণ-বিভাগ হইয়াছিল এবং বর্ণ জাতিগত বা বর্ণগত ছিল না। যে কোন বর্ণের বা জাতির লোক সদ্‌গুণের অনুশীলন ও সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণত্বের অধিকারী হইতে পারিত। ইহাতে যেমন কর্ম্মের মর্য্যাদা দেওয়া হইত তেমনি সকলেই মানসিক ও দৈহিক উৎকর্ষ সাধন দ্বারা সমাজে শ্রেষ্ঠত্ব লাভের সুযোগ পাইত।

জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা

পৌরাণিক যুগে সমাজের লোকসংখ্যা যখন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল—জীবনযাত্রা যখন আরও জটিল আকার ধারণ করিল—জীবন ধারণের উপযোগী আরও নূতন নূতন দ্রব্য উৎপাদনের প্রয়োজন ও চাহিদা ক্রমাগত বাড়িতে লাগিল, তখন মানুষের সামাজিক মর্য্যাদা লাভের এই স্বাধীনতা

সঙ্কুচিত হইতে আরম্ভ করিল। সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য তখন স্ব স্ব রুচি ও প্রবৃত্তি অনুসারে বৃত্তিনির্ব্বাচনের সুবিধা কাহাকেও দেওয়া আর সম্ভবপর হইল না। সুতরাং ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব ও বৈশ্যত্ব আর গুণকর্ম্মগত না থাকিয়া বংশগত ও কালে জাতিগত হইল এবং শাস্ত্রও তদনুসারে রচিত ও সামাজিক অনুশাসন বিধিবদ্ধ হইল। অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, যাগ-যজ্ঞ-পূজা-তপস্যা ব্রাহ্মণের, যুদ্ধবিগ্রহাদি ক্ষত্রিয়ের, কৃষি-বাণিজ্য, গোরক্ষাদি বৈশ্যের, অপর তিন বর্ণের সেবা শূদ্রের নির্দ্দিষ্ট বর্ণগত ধর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইল। এইরূপে শাস্ত্র-শাসিত হিন্দুসমাজে বৃত্তি বর্ণগত ও ক্রমে জন্মগত হইয়া উঠিল। পুরুষানুক্রমে একই বৃত্তি অনুসরণ করাতে এক দিকে যেমন শিল্পোৎপাদিকা বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধিত হইতে লাগিল, অন্য দিকে তেমনই সেই সেই বৃত্তি বংশগত হইয়া উঠিল, বৃত্তি অনুসারে বংশ হইতে জাতি গঠিত হইল এবং কালক্রমে জাতিভেদ প্রথার প্রচলন হইল এবং কর্ম্মকার, কুম্ভকার, স্বর্ণকার, তৈলকার, সূত্রধর, তন্তুবায়, মোদক, বারুজীবী প্রভৃতি বহুবিধ জাতি ক্রমশঃ গড়িয়া উঠিল। সমাজের মঙ্গলের জন্যই জাতিভেদ প্রথার প্রবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল। কোন জাতি বা সমাজকে অবনমিত করিবার হীন উদ্দেশ্য ইহার মূলে ছিল না। বর্ত্তমান যুগে জাতিভেদ নিন্দিত ও ঘৃণাসূচক হইলেও ইহা ঘৃণামূলক নহে। সমাজের সংগঠন ও সংহতির জন্য ইহার প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল।

অস্পৃশ্যতার যে বিষময় ব্যাধি হিন্দুসমাজদেহকে পঙ্গু করিয়া দিয়াছে, তাহা জাতিভেদ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। অস্পৃশ্যতার অবশ্যম্ভাবী ফলে বহুসংখ্যক লোক ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া হিন্দুসমাজকে দুর্ব্বল করিয়া দিয়াছে। তাহার শোচনীয় পরিণাম আমরা এখন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হাড়ে হাড়ে অনুভব করিতে পারিতেছি। অখণ্ড ভারতের অঙ্গচ্ছেদ ঐ অস্পৃশ্যতারূপ বিষব্রণের সুদূর-প্রসারী পরোক্ষ প্রতিক্রিয়া তাহাতে সন্দেহ নাই। নানক, চৈতন্য প্রমুখ মহা-পুরুষগণ—বিশেষতঃ চৈতন্যদেব এবং নাথ-গুরুগণ জাতিভেদ রহিত করিয়া

অস্পৃশ্যতা দূরীকরণে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও সফলকাম হইয়া যাইতে পারেন নাই। এই আগাছা সমাজের সর্ব্বদেহে শিকড় চালাইয়া দিয়া বদ্ধমূল হইয়া পড়িয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেব ও নাথ-গুরুগণ জাতিভেদ মানিতেন না। তাঁহারা জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলকেই প্রেম বিতরণ করিয়া কোলে টানিয়া লইতেন। 'পাষণ্ডদলনে' আছে :—

> বৈষ্ণব দেখিয়া যেবা জাতিবুদ্ধি করে
> তাহার সমান পাপী নাহিক সংসারে॥

ইহাতে জাতিভেদের প্রতিই পরোক্ষভাবে ঘৃণা প্রদর্শন করা হইয়াছে। হিন্দু-ধর্ম্ম পরম উদার ধর্ম্ম। তাহাতে অস্পৃশ্যতার স্থান ছিল না; তথাপি হিন্দুসমাজে কিরূপে অস্পৃশ্যতা প্রবেশ করিয়াছে, তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে চাই। অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, জ্ঞানালোচনা যখন জাতিগতভাবে ব্রাহ্মণের একচেটিয়া হইয়া উঠিল, তখন ঐ সকল কার্য্য নিজেদের মধ্যে নিবদ্ধ রাখিবার জন্য যেমন তাহাদের মধ্যে চেষ্টা চলিতে লাগিল, তেমনি সম্মান-প্রতিপত্তিলাভের বাসনা ও প্রভুত্বপ্রিয়তা তাহাদের উত্তরোত্তর বাড়িয়া গেল। তারপর ঐ সকল কার্য্যে বাহ্য শুচিতা রক্ষা করিবার প্রয়োজন হইল এবং উহা রক্ষা করাও তাঁহাদের পক্ষে সহজও ছিল। বাহ্য শুচিতার দিকে অধিকতর ঝোঁক দেওয়াতে ব্রাহ্মণ ক্রমশঃ ব্রাহ্মণত্ব হারাইয়া একেবারে নৈষ্ঠিকী হইয়া উঠিল। ব্রাহ্মণেতর অন্যান্য জাতির লোকেরা— জীবন ধারণের জন্য যাহাদিগকে শ্রমের কাজ গ্রহণ করিতে হইয়াছিল তাহারা বাহ্যাচার ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করিতে অসমর্থ হওয়াতে ব্রাহ্মণদের ঘৃণাভাজন হইয়া পড়িল। এইরূপে ব্রাহ্মণগণ বহুসংখ্যক জাতিকে অস্পৃশ্য ও পতিত করিয়া দূরে সরাইয়া দিলেন এবং সমাজের ঘোর অনিষ্টসাধন করিলেন। যে ব্রাহ্মণ একদিন হিন্দুসমাজের কর্ণধার ছিলেন, তাঁহারা এখন পৃথক্ এক জাতিতে পরিণত হইলেন—শম, দম, তিতীক্ষা ইত্যাদি গুণ হারাইয়া ফেলিলেন এবং নানা কুসংস্কার ও সংকীর্ণতা তাঁহাদের চিত্তে প্রবেশ করিল

প্রভুত্বপ্রিয় ও ক্ষমতালোলুপ ব্রাহ্মণ সম্মান ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য অনেক উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। "সেই উদ্দেশ্যে তাঁহারা বিভিন্ন জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা অলীক গল্প রচনা করিয়া জাতিভেদের সমর্থন করিলেন এবং ব্রাহ্মণেতর জাতীয় লোকদিগের মনে ভয়-ভক্তি-শ্রদ্ধা উৎপাদনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন—এমন কি ভগবানের বক্ষে ভৃগুপদচিহ্ন অঙ্কিত করিয়া ব্রাহ্মণকে ভগবানেরও উপরে স্থাপন করিতে প্রয়াসী হইলেন,—এইরূপ অসংখ্য অলীক শাস্ত্রবচন দ্বারা তাঁহারা ব্রাহ্মণজাতির মহিমা, প্রাধান্য ও প্রভুত্ব চিরস্থায়ী করিতে সমর্থ হইলেন। ক্ষমতালোলুপ ব্রাহ্মণ গুরুতা ও পৌরোহিত্যরূপ দুইটী সুদৃঢ় লৌহশৃঙ্খলে অপর সকলকে শৃঙ্খলিত করিয়া তাহাদিগকে ক্রীতদাস অপেক্ষাও অধম মানবে পরিণত করণান্তর আপন প্রভুত্ব ও প্রাধান্য দৃঢ়তর করিলেন।" ('নাথধর্ম্ম'—যোগিসখা, ১৩৫৮ মাঘ)। এইরূপে ব্রাহ্মণ আদর্শচ্যুত হইয়া হিন্দুসমাজকে ধ্বংসের পথে ঠেলিয়া দিলেন। শ্রমের কার্য্য সমাজের পক্ষে অপরিহার্য্য হইলেও ইহা তেমন মর্য্যাদা পাইল না, বরং ঘৃণ্য ও নিন্দনীয় হইল। শ্রমশিল্প অনুসরণকারী বহু জাতি সমাজের নিম্নস্তরে স্থানলাভ করিল এবং বহু জাতি অনাচরণীয় ও অস্পৃশ্য বলিয়া পরিগণিত হইল। হিন্দুসমাজের পরিচালক ও নিয়ামক ব্রাহ্মণগণ এইরূপে কতকগুলি জাতির কপালে অনাচরণীয়তার ও অস্পৃশ্যতার তিলক পরাইয়া দিয়া তাহাদিগকে দাবাইয়া রাখিলেন। মূল কথা প্রকৃত ব্রাহ্মণত্বের অভাবে ব্রাহ্মণের অধঃপতন হইল এবং ব্রাহ্মণের অধঃপতনেই হিন্দুজাতির অধঃপতন আরম্ভ হইল। অস্পৃশ্য, ও অনাচরণীয় বলিয়া বহুকাল লাঞ্ছিত, অপমানিত, উৎপীড়িত ও অত্যাচারিত হওয়ার ফলে ঐ সকল নিগৃহীত জাতির আত্মচেতনা ও আত্মসম্মানবোধ তিরোহিত হইল—তাহাদের অন্তরাত্মা সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল এবং নিজের অদৃষ্ট বা ভাগ্যের উপর দোষারোপ করিয়াই তাহারা সন্তুষ্ট রহিল। এই কারণেই মেরুদণ্ডহীন হিন্দুজাতি বিশ্বের দরবারে আর খাড়া হইয়া দাঁড়াইতে পারিল না। মুসলমান মৌলভীগণ ও খৃষ্টান

মিশনারীরা হিন্দুসমাজের এই অস্পৃশ্যতার রন্ধ্র দিয়া ঢুকিয়া হাজার হাজার লোককে মুসলমান ও খ্রীষ্টান করিয়া ফেলিল।

১৯০১ সালের সেন্সাস্ রিপোর্টের অধ্যক্ষ মাননীয় রিজলী সাহেব লিখিয়াছেন—"পূর্ব্ববঙ্গের অনুমান এক কোটী পাঁচ লক্ষ মুসলমান হিন্দুসমাজের পোদ ও নমঃ-শূদ্র—এই দুইটী শ্রেণী হইতে গিয়াছে।" বুঝুন, কি ভীষণ ব্যাপার! তাই আজ বাঙ্গালা দেশে দেখিতে পাই সমগ্র হিন্দুর সংখ্যা ২ কোটী ২২ লক্ষ, আর মুসলমানের সংখ্যা ২ কোটী ৭৮ লক্ষ। (আনন্দবাজার হইতে উদ্ধৃত)।

মান্দ্রাজের লর্ড বিশপ হোয়াইট হেড্ সাহেব ইংলণ্ডের "Nineteenth Century" পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন—"যদি আমরা ভারতবর্ষের পাঁচ কোটি অস্পৃশ্য জাতির লোককে খ্রীষ্টান করিতে পারি, তাহা হইলে তাহারা আমাদের শক্তি বৃদ্ধি করিবে। অস্পৃশ্যদিগকে খ্রীষ্টান করিতে পারিলে ভারতের অন্যান্য শূদ্রদিগকে খ্রীষ্টান করিবার সুবিধা হইবে।"

এইরূপে হিন্দু তাহার আপন ভাইকে পর করিয়াছে, আর মুসলমান ও খ্রীষ্টানগণ তাহাদিগকে আশ্রয় দিয়া নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছে। এই অস্পৃশ্যতা দূরীকরণমানসে নাথাচার্য্যগণ সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং সাম্য-মৈত্রী-প্রেমের বাণী সকলকে শুনাইয়াছিলেন। চৈতন্যদেব আচণ্ডাল সকলকেই প্রেম বিতরণ করিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া সকলের সমান অধিকার উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন। এ যুগের মহামানব মহাত্মা গান্ধী অস্পৃশ্যতা দূর করিবার জন্য জীবনপাত করিয়া গিয়াছেন। দুঃখের বিষয় মহাপুরুষগণের চেষ্টা সম্যক্‌রূপে ফলবতী হয় নাই। তাই এই মহাপাপ সমাজ হইতে বিদূরিত করিবার জন্য ভারত সরকার আইন পাশ করিয়াছেন। আইনের লগুড় মাথায় না পড়িলে আমাদের চৈতন্য সঞ্চার হইবে না।। তুর্কীর কামালপাশার আইনের মুগুর ভারতেও আবশ্যক।

উচ্চ-নীচ, ছোট-বড় এই বৈষম্য তুলিয়া দিতে হইবে। যাঁহারা সত্যিকার

ব্রাহ্মণ, এ কর্ত্তব্য তাঁহাদেরই। তথাকথিত ছোটরাই সমাজবৃক্ষের গোড়া, সুতরাং গোড়া কাটিয়া দিলে, আগা টিকিবে কেমন করিয়া? গোড়া আগাকে ধারণ করিয়া আছে বলিয়াই বৃক্ষের বৃক্ষত্ব। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন:—

আগা বলে আমি বড়, তুমি ছোট লোক।
গোড়া হেসে বলে, ভাই, ভাল তাই হোক॥
তুমি উচ্চে আছ ব'লে গর্ব্বে আছ ভোর।
তোমারে করেছি উচ্চ—এই গর্ব্ব মোর॥

বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে—কলকব্জা যন্ত্রপাতির যুগে—হিন্দুর সমাজবন্ধনে আবার ভাঙ্গন ধরিয়াছে। বিজ্ঞানবলে এখন অল্প লোকের পরিশ্রমে বহু দ্রব্য উৎপাদিত হইতেছে; সুতরাং বহু লোক কর্ম্মহীন হওয়াতে বেকার সমস্যা বাড়িয়া গিয়াছে। অতএব জাতিগত বৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকা আর সম্ভবপর হইতেছে না। জাতিবর্ণ-ধর্ম্ম এখন লোপ পাইতে বসিয়াছে। যোগ্যতা ও পটুতা থাকিলে ইচ্ছানুসারে যে কোন বৃত্তি গ্রহণ করিবার পথে কোন বাধাই এখন নাই। ব্রাহ্মণ শূদ্রবৃত্তি, শূদ্র বৈশ্যবৃত্তি, ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণবৃত্তি গ্রহণ করিতেছে। সূত্রধর কর্ম্মকার হইয়া লৌহ পিটাইতেছে—মালাকার তন্তুবায় হইয়া বস্ত্রবয়ন করিতেছে—ব্রাহ্মণপুত্র সেলুন খুলিয়া ক্ষৌরকার্য্য চালাইতেছে—বৈদ্য-কায়স্থ-পুত্র লণ্ড্রী রাখিয়া বস্ত্র ধোলাই করিতেছে। এই অন্ন-সমস্যার দিনে চাটুজ্জে-বাড়ুজ্জে-মুখুজ্জের বিনামার দোকানের এবং ভট্টাচার্য্যের পাটার দোকানের অভাব নাই। অর্থ-সমস্যা তথা বেকার-সমস্যাই ইহার একমাত্র কারণ। এই আপদ্‌কালে বৃত্তিভেদ করিলে চলিবে না। যুগধারার সহিত আমাদিগকে খাপ খাওয়াইয়া চলিতে হইবে।

যোগধর্ম্ম প্রচারক নাথাচার্য্যগণের বংশধর শৈব-যোগিগণও অন্যান্য শ্রেণীর ন্যায় সামাজিক পরিবর্ত্তনের ফলে জাতিতে পরিণত হইয়া পড়িল। জীবিকা

অর্জ্জনের তাড়নায় তাহারাও শুধু যোগচর্চ্চা ও যোগধর্ম্ম প্রচারে নিরত থাকিতে পারিলেন না; বরং স্ব স্ব রুচি, প্রবৃত্তি ও যোগ্যতা অনুসারে বিভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করিলেন। তাঁহারাও ক্রমশঃ আদর্শভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হইলেন; কিন্তু আদর্শচ্যুত হইয়াও তাহারা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন দিয়া ব্রাহ্মণের পদানত হইয়া পড়েন নাই। ব্রাহ্মণশাসিত হিন্দুসমাজে যোগিগণের এই অনমনীয়তা শুধু ব্রাহ্মণের কেন— ব্রাহ্মণাশ্রিত অন্যান্য জাতিরও ঈর্ষা উৎপাদন করিল; অতএব যোগীদের উপর সামাজিক দমন নীতি চলিতে লাগিল— তাহাদিগকে নানা সামাজিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার আয়োজন হইল এবং তাহাদের উপর অনেক রকমের কঠোর বিধিনিষেধ আরোপিত হইল। ব্রাহ্মণদের এই অত্যাচার ও অবিচার হিন্দুসমাজের অনেক জাতিকেই অল্প-বিস্তর সহ্য করিতে হইয়াছিল। বিগত ১৩৫৯।১০ই পৌষ তারিখে কলিকাতায় বঙ্গীয় কায়স্থসভার যে অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে উক্ত সভার সহ সভাপতি এবং সাধনা ঔষধালয়ের অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম-এ মহাশয় তাঁহার ভাষণে ব্রাহ্মণ্য অত্যাচারের যে চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"... ... ব্রাহ্মণেরা আমাদিগকেও শূদ্ররূপে বিবেচনা করিতেন এবং ইহার ফলে ক্ষত্রিয়গণের যথার্থ বংশধররূপে আমাদের প্রাপ্য নানা ন্যায্য অধিকার হইতে আমরা বঞ্চিত হইয়াছিলাম। আমরা তৎকালে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতে পারিতাম না ... ...। এমন কি ব্রাহ্মণেরা দেবতার মতই আমাদের হাতে পক্ক অন্ন গ্রহণ করিতেন না। ঊর্দ্ধদেহিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রেও মৃত্যুর পর ত্রিশ দিন অতিবাহিত না হইলে আমরা শ্রাদ্ধ কর্ম্মের অধিকারী ছিলাম না। শাস্ত্রের তথাকথিত ন্যাসরক্ষকগণ আমাদের পক্ষে সংস্কৃত কলেজে প্রবেশাধিকার ও শাস্ত্র-পাঠ নিষেধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। আমাদের পুরাঙ্গনাগণের নামের অন্তে 'দেবী' শব্দ ব্যবহারও নিষেধ ছিল। তাহাদিগকে একটী সকুণ্ঠ 'দাসী' শব্দে সন্তুষ্ট থাকিতে হইত। ঈশ্বরের নামে এই সকল ও অন্যান্য বিধিনিষেধ

আমাদের উপর আরোপিত হইয়াছিল ও কড়াকড়ি ভাবে ঐগুলি প্রতিপালিত হইত। ইহার জন্য শুধু কঠোর ব্রাহ্মণ্যশাসনই নহে, আমাদের নিজেদের কুসংস্কারও দায়ী ছিল ... ... ।”

(‘যুগান্তর’ ১১ পৌষ, ১৩৫৯)

ব্রাহ্মণ্যশাসনের কঠোরতা যোগীরাও বেশ ভালভাবেই অনুভব করিয়াছে। তাহারা কোন কালেই ব্রাহ্মণের অধীনতা স্বীকার করে নাই বলিয়া ব্রাহ্মণ্য যোগীদের শাস্ত্রীয় ও ধর্ম্মীয় অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতে পারে নাই। যোগীরা আবহমান কাল হইতে বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া আসিতেছে—নিজেরা দেবপূজা করিতেছে— দেবতার ভোগ নিবেদন করিতেছে— জননে মরণে চিরদিনই ব্রাহ্মণবৎ দশাশৌচ পালন করিয়া আসিতেছে। অনাচরণীয় শূদ্র বলিয়া অন্যায়ভাবে বিবেচিত ও আচরিত হইলেও যোগীরা কখনও নিজদিগকে শূদ্র বলিয়া স্বীকার করে নাই। সংস্কৃত কলেজের টোলবিভাগে এবং কোন কোন দেবমন্দিরে যোগীদের প্রবেশাধিকার ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হইলেও তাহারা উহা গ্রাহ্য করে নাই। বহু যোগিছাত্র ব্রাহ্মণচালিত বিভিন্ন টোলে বা চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত অধ্যয়নপূর্ব্বক একাধিক উপাধি লাভ করিয়া কৃতবিদ্য হইয়াছেন এবং যোগীরা বহু মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বহস্তে উহাদের উপাস্য দেবতার সেবাপূজা করিয়া আসিতেছে। কঠোর দারিদ্র্যবশতঃ যোগিজাতি অনেক সময় ব্রাহ্মণ্য অত্যাচার অবশ্য নীরবে সহ্য করিয়াছে। সামাজিক নির্য্যাতনে ও রাজ-অত্যাচারে তাহারা অনেক স্থলে যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিলেও শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট ব্রাহ্মণাচার পরিত্যাগ করে নাই। ব্রাহ্মণশাসিত বঙ্গদেশে যোগীদের এই তেজস্বিতা ও নির্ভীকতা প্রশংসনীয়।

যোগিজাতির পুনরুত্থানের আন্দোলন

ব্রাহ্মণ ও যোগীর মধ্যে প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি জাতির ন্যায় যোগিজাতিও ব্রাহ্মণ

কর্তৃক নিপীড়িত ; তারপর রাজকোপে পতিত হইয়া তাহারা আরও নির্য্যাতিত হইয়াছিল। কায়স্থ-বৈদ্যের মত তাহাদের অর্থশক্তি ও বিদ্যাবল থাকিলে নানা প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও হয়তো যোগীরা টলিত না। সমাজের অন্যায় অবিচার যখন ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করিতে লাগিল তখনই বহুদিন ধরিয়া নির্য্যাতিত যোগীদের মনে আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মোন্নতি লাভের বলবতী চেতনা জাগিয়া উঠিল। তাহাদের জন্মগত অথচ লুপ্ত ব্রাহ্মণত্বের অধিকার পুনরুদ্ধারের জন্য যোগীদের মধ্যে নব-জাগরণের সাড়া দেখা দিল এবং অচিরকাল মধ্যে এই জাগরণ আন্দোলনে পরিণত হইল। এই আন্দোলনের ইতিহাস ও তাহার বিকাশ গ্রন্থের নবম অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে; সুতরাং পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। স্বর্গীয় মনিমোহন, রামকুমার, কৃষ্ণচন্দ্র, বিষ্ণুচন্দ্র প্রমুখ স্বজাতিপ্রাণ ব্যক্তিগণ এই আন্দোলনের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহাদের এই আন্দোলনের ফলে ১২৭৯ সালে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সমাজের পণ্ডিতকুল-চূড়ামণিগণ—১২৮৪ সালে ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত রাজনগরের রাজা বলরাম সেনগুপ্ত মহোদয়ের সভাপতিগণ এবং ১২৯০ সালে বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের সভাপতিবৃন্দ যোগিজাতির ব্রাহ্মণত্ব স্বীকার করিয়া উপবীত গ্রহণের ব্যবস্থা প্রদান করেন। এই আন্দোলনের ঢেউ সুদূর কাছাড় পর্য্যন্ত বিস্তারলাভ করে। এইরূপে যোগিজাতির মধ্যে উপবীতের বহুল প্রচলন হইতে লাগিল এবং আত্মবিস্মৃত জাতির মনে আবার আত্মচেতনা জাগিয়া উঠিল। পরবর্ত্তী যুগে স্বর্গীয় হরিমোহন নাথ, অরবিন্দ-বন্ধু নাথ, অম্বিকাচরণ নাথ, শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ নাথ, বিদ্যাবাচস্পতি প্রমুখ স্বজাতিবান্ধবগণ এই আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করিয়া তুলেন। ব্রাহ্মণ্যগোড়ামি ও ব্রাহ্মণাধিপত্যের বিরুদ্ধে এইরূপ জাতীয় আন্দোলন বোধ হয় যোগিজাতির মধ্যেই প্রথম সুরু হইয়াছিল। যোগীদের আন্দোলনের বিশেষত্ব এই যে, তাহারা শুধু স্বাধিকার লাভ করিতে যত্নপর ছিল না; সমদশা-পন্ন অন্যান্য অধঃপাতিত জাতিদের প্রতিও তাহারা হস্তপ্রসারণ করিয়া তাহা-

দিগকে সমৃদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছে। শ্রীযুক্ত যোগেশবাবু তাঁহার উল্লিখিত ভাষণের আর এক স্থানে একটা সুন্দর যুগোপযোগী কথা বলিয়াছেন—"...... সামাজিক অধিকার ও সুবিধা সম্পর্কিত ব্যাপারে আমাদের হিন্দুসমাজের প্রত্যেক নরনারীই স্ব স্ব বৃত্তিনির্ব্বিশেষে অতঃপর যাহাতে নিজকে ব্রাহ্মণ মনে করে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে......।" ব্রাহ্মণত্ব অর্থে মনুষ্যত্ব বুঝায়; সুতরাং ব্রাহ্মণত্ব লাভের অধিকার সকলেরই আছে। যোগিজাতির আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্যও ছিল ইহাই। তাহারা নিজেরা যেমন ব্রাহ্মণত্বের দাবী করিয়াছে, ব্রাহ্মণেতর অন্যান্য জাতির মনেও ব্রাহ্মণত্ব লাভের অভিলাষ জাগাইতে চেষ্টা করিয়াছে। অধঃপতনের পঙ্কে নিমজ্জিত অন্যান্য জাতিকেও টানিয়া তুলিতে তাহারা চেষ্টা করিতে বিরত হয় নাই। যোগিজাতির এই পতিতোদ্ধারের মনোভাব সত্যই ব্রাহ্মণোচিত। যোগীদের আন্দোলনের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া ব্রাহ্মণ্যশাসনে নিষ্পেষিত ও অবিচারে নির্য্যাতিত অন্যান্য জাতিরাও স্বাধিকার লাভের উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণবিরোধী আন্দোলন আরম্ভ করিয়া দিল— তাহারাও বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তাই কবি বলিয়াছেন—

যারে তুমি নীচে ফেল, সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে।
পশ্চাতে রেখেছ যারে, সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে॥

(রবীন্দ্রনাথ)

মোটকথা যোগিজাতির এই আন্দোলনের অনুকরণে বহু জাতি যে আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিল তাহা অস্বীকার করিবার যো নাই। উপবীত আন্দোলনের সূত্রপাত যোগিদিগকে উপহাস উপদ্রব অনেক কিছুই সহ্য করিতে হইয়াছিল; কিন্তু ঐ উপহাস-উপদ্রবকারীরাই আবার নিজেদের মধ্যে উপ-বীতের আন্দোলন করিয়াছিলেন—এ দৃশ্য আমরা চোখে দেখিয়াছি।

আন্দোলনের হোমানল জ্বলিতেই লাগিল। তারপর ৺অরবিন্দবন্ধু নাথ মহাশয় ১৩১১ সালে যোগিসখা পত্রিকার প্রচলন করিয়া এবং শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ

নাথ, এম-এ, বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয় ১৩১৭ সালে আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠা করিয়া আসাম ও বঙ্গের যোগিগণের মধ্যে সঙ্ঘশক্তি জাগাইয়া জাতিটাকে সংবদ্ধ করেন। ইহার ফলে দেশবিভাগের পূর্ব্বে যোগিজাতি সত্যই একটা আত্মপ্রতিষ্ঠিত শক্তিশালী জাতি বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। শিক্ষার বহুল প্রচলনে এবং সদ্ভাব, প্রীতি ও একতার বাণী প্রচারের ফলে জাতিটা সুসংহত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু দেশবিভাগের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপে জাতি ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়াতে ইহার সঙ্ঘশক্তি হ্রাস পাইয়াছে।

যোগিজাতির ব্রাহ্মণত্বের অধিকার এবং উপবীত গ্রহণের ন্যায্য দাবী সমর্থিত হইয়াছে। যোগিজাতির ধর্ম্মপরায়ণতা, নিরীহতা, সরলতা, পরোপকারিতা, উদারতা, নির্ভীকতা, তেজস্বিতা প্রভৃতি গুণাবলী ইহাদের ব্রাহ্মণোচিত চরিত্রই সমর্থন করে। তা'ছাড়া অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, সংস্কৃতানুরাগ, চিকিৎসানৈপুণ্য, চিন্তাশীলতা, বুদ্ধিমত্তা, প্রেমপ্রবণতা প্রভৃতি কর্ম্ম ও গুণ ইহাদের উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত ব্রাহ্মণোচিত সংস্কৃতিরই প্রমাণ। অতএব যোগিজাতি ব্রাহ্মণভুক্ত তাহাতে সন্দেহ নাই।

বিরুদ্ধবাদিগণের মত খণ্ডন

যোগিজাতির ব্রাহ্মণত্ব খ্যাতনামা পণ্ডিতমণ্ডলী কর্ত্তৃক প্রমাণিত ও স্বীকৃত হইলেও অনেকে এই জাতিকে ব্রাহ্মণবর্ণভুক্ত বলিয়া মানিতে চাহে না। কেহ বলে ইহারা অহিন্দু—কেহ বলে অন্ত্যজ,—কেহ বলে ইহাদিগকে বৌদ্ধ—আবার কেহ বলে ইহারা বিশেষ ধর্ম্মসম্প্রদায় হইতে উদ্ভূত আধুনিক জাতি। এই সকল বিরুদ্ধ মত আমরা খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিব।

ভারতবর্ষের কোন্ জাতির উৎপত্তির পিছনে কতটুকু ঐতিহাসিক তথ্য আছে জানি না। আমরা দেখাইয়াছি বৈদিকযুগে জাতিভেদ ছিল না। পুরাণে

উপপুরাণেই নানা জাতির এবং উচ্চ-নীচ অনেক জাতির রক্তসংমিশ্রণে বিভিন্ন সঙ্কর বা অন্ত্যজ জাতির উৎপত্তির বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। একটা ঐতিহাসিক সত্য আমরা এখানে বলিয়া রাখি। ভারতবর্ষ মুসলমানের ও ইংরাজের অধীন হওয়ার পর থেকে উচ্চ-নীচ বহুজাতির সহিত বৈদেশিক নানা জাতির সঙ্গমে বিভিন্ন জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। প্রকৃত আর্য্যশোণিত কত জনের ধমনীতে কতটুকু প্রবাহিত আছে তাহা বলা কঠিন। মূল কথা এখনকার সকল জাতিই অল্প-বিস্তর সঙ্কর বা অন্ত্যজ জাতি। মৌলিকত্ব কাহারও অক্ষুণ্ণ নাই। বিভিন্ন শাস্ত্র হইতে যোগিজাতির উৎপত্তি বিষয়ক বহু প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া আমরা গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে দেখাইয়াছি যে, এই জাতি পবিত্র জাতি—ইহারা অন্ত্যজ নহে—ইহারা ব্রাহ্মণ। বিভিন্ন জাতীয় স্ত্রী-পুরুষের সঙ্গমে যোগি-জাতির উৎপত্তি হয় নাই সুতরাং যোগিজাতি সঙ্করবর্ণ নহেন এবং কোন প্রকার সাঙ্কর্য্যদোষেও কলুষিত নহেন।" এই জাতির রুদ্রোৎপত্তি শাস্ত্রবিহিত ও চির প্রসিদ্ধ। এই জন্য ইহারা নিজদিগকে রুদ্রজব্রাহ্মণ বলিয়াও পরিচয় দিয়া থাকেন। অতএব যোগিজাতি মৌলিক জাতি। পুরাণ রচিত হইবার পূর্ব্বেও যোগিজাতির অস্তিত্ব ছিল ; সুতরাং যোগিজাতি আধুনিক নহে। পুরাণাদি শাস্ত্রেও প্রাচীন হিন্দুসমাজে প্রচলিত আচার-নীতি, সংস্কার-সংস্কৃতি, ধর্ম্ম-কর্ম্ম ইত্যাদির বর্ণনা শাস্ত্রকারগণ দিয়া গিয়াছেন। ঐ সকল বর্ণনা হইতে সন-তারিখ-বর্ষ আমরা আবিষ্কার করিতে না পারিলেও প্রাচীনকালের লোকদের ধর্ম্ম-শিক্ষা-সংস্কৃতি সমন্বিত একটা ইতিহাসের সন্ধান পাইতে পারি। প্রাচীনকালের ধর্ম্ম, সাহিত্য ও ভাবাদর্শের ধ্বনি আমরা পুরাণাদিতে শুনিতে পাই। অতএব পুরাণাদি শাস্ত্র রচিত হইবার বহু পূর্ব্ব থেকেই যোগিজাতির অস্তিত্ব ছিল এবং তাহাদের কৃষ্টির ও চিন্তার একটা ধারা যে চলিয়া আসিতেছিল তাহাও সহজে অনুমেয়। যোগিজাতির এই ইতিহাস মানুষের অজ্ঞাত থাকিলেও বা জ্ঞানগম্য না হইলেও অতীত তাহার স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে :—

যাহাদের কথা ভুলেছে সবাই
তুমি (অতীত) তাহাদের কিছু ভোল নাই।
বিস্মৃত যত নীরব কাহিনী
স্তম্ভিত হ'য়ে বও। (রবীন্দ্রনাথ)

যোগিজাতি অব্রাহ্মণ এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা অদ্যাপি যাহারা পোষণ করেন, তাহাদের প্রতি আমাদের বক্তব্য এই। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি—যোগিজাতি ব্রাহ্মণশাসিত হিন্দুসমাজে থাকিয়াও চিরকালই ব্রাহ্মণের অধীনতা অস্বীকার করিয়া বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড সম্পাদন করিয়া আসিতেছে। তাহাদের এই তেজস্বিতা ও নির্ভীকতা ব্রাহ্মণোচিত। তাহারা আবহমান কাল হইতে ব্রাহ্মণের ন্যায় দশাশৌচ পালন করিয়া আসিতেছে, নিজেরাই পৌরোহিত্য সম্পাদন করিয়া থাকে, দেবদেবীর পূজা করে, স্বহস্তে পাচিত ভোগ দেবদেবীকে নিবেদন করে, প্রণব মন্ত্র উচ্চারণ করে, চিরকালই স্ত্রী-পুরুষের নামান্তে বিশেষতঃ ক্রিয়াকলাপ উপলক্ষে যথাক্রমে 'দেবী' ও 'দেবনাথ' উপাধি ব্যবহার করে; শালগ্রামশীলা স্পর্শ ও পূজা করে, বহু দেবমন্দিরের অধিকারী ও পূজক হইয়া স্বহস্তে পূজার্চ্চনা সম্পাদন করে— টোল বা চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করে। এই সমস্ত অধিকার অব্রাহ্মণের অধিকার নহে। তাহারা ব্রাহ্মণ না হইলে ব্রাহ্মণপ্রধান সমাজে এই সকল ব্রাহ্মণোচিত আচার ও অধিকার পালন ও লাভ করিতে সমর্থ হইত না। যোগিজাতি ভিন্ন অন্য কোন জাতি এই সকল ব্রাহ্মণোচিত আচার গ্রহণ করিতে সাহসী ও সমর্থ হয় নাই। তা'ছাড়া সামবেদ অনুসারেই যোগীরা ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করিয়া থাকে। সামবেদে একমাত্র ব্রাহ্মণেরই অধিকার। এতদ্ভিন্ন যোগীদের সাধারণ উপাধি 'নাথ' শ্রেষ্ঠত্ববাচক। অতএব যোগিজাতি অহিন্দু নহে—অব্রাহ্মণ নহে—তাহারা ব্রাহ্মণবর্ণভুক্ত; তাহা না হইলে তাহারা ব্রাহ্মণের সমকক্ষতার জন্য কখনই সমর ঘোষণা করিত না। তাই কর্ণেল উপেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি

মহাশয় তাঁহার 'Dying Race' (ধ্বংসোন্মুখ জাতি) নামক গ্রন্থে বলিয়া গিয়াছেন :—

"Yogis would never have dared to enter into any contest with the Brahmins had they not been convinced of the fact that their origin was in no way inferior to that of the Brahmins."

অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের উৎপত্তি অপেক্ষা যোগিজাতির উৎপত্তি কোনও অংশে হীন নহে—এ বিষয়ে যোগীদের দৃঢ় বিশ্বাস না থাকিলে তাহারা কখনই ব্রহ্মণদের সহিত বিরোধ করিতে সাহসী হইত না।

উপরোক্ত যে সকল আচার যোগীরা পালন করিয়া আসিতেছে, তাহাতেই প্রমাণিত হয় যে তাহারা ব্রাহ্মণবর্ণভুক্ত। অধ্যাপক কালীপ্রসন্ন দাশ গুপ্ত, এম-এ মহাশয় তাঁহার "হিন্দুসমাজবিজ্ঞান" গ্রন্থের এক স্থানে বলিয়াছেন :—

"বিবাহ, শ্রাদ্ধ, অশৌচপালন এবং অন্যান্য ধর্ম্ম ও সামাজিক ক্রিয়াদি কেহ বৈশ্যোচিত, কেহ বা শূদ্রোচিত বিধানে সম্পন্ন করিয়া থাকে। ক্বচিৎ কেহ ব্রাহ্মণোচিত কি ক্ষত্রিয়োচিত আচারেও করে। এই সব অনুষ্ঠানাদি চারিটি বর্ণের অনুরূপ চারি প্রকারের মাত্র বিহিত হইয়াছে,—সুতরাং ইহার কোনও না কোনও বিধান অনুসারেই সকলকে চলিতে হইবে। বর্ণবিভাগের নিয়মে মূলতঃ ইহারা কোন্ বর্ণের মধ্যে পড়ে, ইহা হইতেই তাহা বুঝা যায়।" এই লক্ষণ অনুসারে বিচার করিলে যোগিজাতি যে ব্রাহ্মণ বর্ণের অন্তর্গত তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না।

কোন কোন স্থানে যোগীরা আচারভ্রষ্ট হইয়া শূদ্রবৎ প্রতীয়মান হইয়া থাকে সত্য; কিন্তু অনুসন্ধিৎসু সমালোচক ও গবেষক কুসংস্কারবর্জ্জিত হইয়া যদি অনুসন্ধান করেন তবে দেখিতে পাইবেন, রাজকোপ, কঠোর দরিদ্রতা, অজ্ঞতা, পারিপার্শ্বিক অন্য জাতির চাপ ও নিষ্পেষণ, পৌরোহিত্য ও গুরুতা ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণদের প্রোপেগাণ্ডা, বৃত্তিসমস্যা ইত্যাদি বহুবিধ কারণ যোগিগণের আচার

প্রভুতার মূলে বিদ্যমান রহিয়াছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যোগিজাতি কস্মিনকালে ব্রাহ্মণের আধিপত্য বা অধীনতা স্বীকার করে নাই। ইহাই তাহাদের বৈশিষ্ট্য। এই মূল সূত্রটি ধরিয়া গবেষণা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে—যোগিজাতি অজ্ঞ, দরিদ্র ও শূদ্রবৎ প্রতীয়মান হইলেও তাহারা ঐ বৈশিষ্ট্যটুকু হারায় নাই। একদেশদর্শী সমালোচক ও গবেষকগণ এই মূল সূত্রটি ধরিবার ও বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া যোগিজাতির সম্বন্ধে অন্ধের হাতী দেখার মত সঙ্কীর্ণ ও পক্ষপাতদুষ্ট অভিমত প্রকাশ করিয়া এই জাতির প্রতি অবিচার করিয়া থাকেন। অন্যান্য অনেক জাতির ন্যায় যোগিজাতির অনাচরণীয়তা প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ্য অত্যাচারের ফল। স্বর্ণকার, সূত্রধর, সুবর্ণবণিক, বৈশ্যসাহা প্রভৃতি কতিপয় জাতির বৃত্তিগত কোন জঘন্যতা না থাকিলেও ব্রাহ্মণ্য অনুশাসনের ফলেই তাহারা অনাচরণীয় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। হিন্দুসমাজের নিয়ামক ও পরিচালক ব্রাহ্মণগণ উদারদৃষ্টিসম্পন্ন হইলে অনেক জাতিকে লাঞ্ছিত হইতে হইত না ও তাহাদের ন্যায্য সামাজিক অধিকারও নষ্ট হইত না। কিন্তু সুখের বিষয় স্বাধীন ভারতে অবস্থার মোড় ফিরিতেছে। অবস্থার চাপে পড়িয়া সকলেই রক্ষণশীলতা ও জাতিগত বিদ্বেষবুদ্ধি পরিত্যাগ করিতেছে। কালে হয়তো জাতির বালাই লইয়া ঝগড়া বিবাদ করিতে হইবে না।

যোগিজাতি মৌলিক জাতি

যোগিজাতি যে আধুনিক জাতি নহে—মৌলিক জাতি, এ সম্বন্ধে এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করিয়াছি। সুপ্রাচীন কালে ভারতবর্ষে একমাত্র ব্রাহ্মণ বর্ণই ছিল। তাহার পর ব্রাহ্মণ বর্ণ হইতে ক্রমশঃ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শূদ্র—এই তিন বর্ণের উৎপত্তি হয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র যথাক্রমে জ্ঞানবল, বাহুবল, ধনবল ও শ্রমবলের প্রতীক। এই চারি বর্ণের মানুষই

জগতের সর্ব্বত্র পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। আমরা পূর্ব্বে ইহা বর্ণনা করিয়াছি। বেদাদি প্রাচীন শাস্ত্রে যোগিজাতির স্বতন্ত্র কোন উল্লেখ না থাকিলেও যোগিজাতি যে প্রথম বর্ণ ব্রাহ্মণের অন্তর্গত, তাহা আমরা পুনরায় দেখাইতে চেষ্টা করিব। ধর্ম্মমতানুসারে ব্রাহ্মণগণ কালক্রমে দ্বিধাবিভক্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের মধ্যে রুচিগুণানুসারে কেহ কেহ বেদের কর্ম্মকাণ্ডের পক্ষপাতী হইয়া পড়েন। তাঁহারা যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠানকেই ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিলেন এবং অধিকতর পুণ্য সঞ্চয়ের বাসনাহেতু যাগযজ্ঞ সম্পাদনকালে দেবতাদের উদ্দেশে পশুবলি এমন কি নরবলি দিতেও অভ্যস্ত হইয়া উঠিলেন। ইতিহাসে আছে—আদিমযুগে ভারতবর্ষে আর্য্য এবং অনার্য্য বা আদিম অধিবাসীদের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া "বহুতর অনার্য্য ও আদিম অধিবাসী আর্য্যসমাজে মিলিয়া মিশিয়া যায়। আর্য্যেরা অনার্য্যদের আচরিত অনেক ধর্ম্মমত গ্রহণ করেন এবং অনার্য্যেরাও আর্য্যদের আচরিত বহু মত স্বীকার করিয়া লয়। অনার্য্যেরা রাক্ষস ও যক্ষপূজায় পশুবলি দিত। কর্ম্মকাণ্ড-পরায়ণ ব্রাহ্মণেরা ক্রমে ক্রমে অনার্য্য-সেবিত পশুহিংসা নিজেদের ধর্ম্মমতে গ্রহণ করিয়া যাগযজ্ঞে পশুহত্যা করিতে অভ্যস্ত হইলেন; পরিশেষে এমন কি নরবলি দিতে অভ্যাস করিলেন।" সাধারণ লোকেরাও বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া বেদের কর্ম্মকাণ্ড অবলম্বন করিয়া চলিতে লাগিল। বেদবাদী ব্রাহ্মণেরা স্বর্গলাভের প্রলোভন দেখাইয়া ব্রাহ্মণেতর জাতিকে ও সাধারণ লোকদিগকে কর্ম্মকাণ্ডবিহিত যাগযজ্ঞে এবং পশুবলি ও নরবলিতে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। এইরূপে বেদের কর্ম্মকাণ্ডের অনুগামী ব্রাহ্মণেরা ক্রমশঃ হিংসাপরায়ণ হইয়া উঠিলেন। এইজন্য গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই হিংসা ও কামনামূলক কর্ম্মকাণ্ডের নিন্দা করিয়া অর্জ্জুনকে নিষ্কাম কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করিতে উপদেশ দিয়াছেন :—

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্য বিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ ॥

কামাত্মনঃ স্বর্গপরাঃ জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্য গতিং প্রতি ॥
ভোগৈশ্বর্য্য প্রসক্তানাং তয়াপহৃত চেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥

অর্থাৎ "হে পার্থ, অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ বেদের কর্ম্মকাণ্ডের স্বর্গাদি ফল প্রকাশক প্রীতিকর বাক্যে অনুরক্ত ; তাহারা বলে বেদোক্ত কাম্য কর্ম্মাত্মক ধর্ম্ম ভিন্ন আর কিছু ধর্ম্ম নাই ; তাহাদের চিত্ত কামনা-কলুষিত, স্বর্গই তাহাদের পরম পুরুষার্থ। তাহারা ভোগৈশ্বর্য্য লাভের উপায়স্বরূপ বিবিধ ক্রিয়াকলাপের প্রশংসাসূচক আপাতঃ মনোরম বেদবাক্য বলিয়া থাকে ; এই সকল শ্রবণ রমণীয় বাক্যদ্বারা অপহৃতচিত্ত, ভোগৈশ্বর্য্যে আসক্ত ব্যক্তিগণের কার্য্যাকার্য্য নির্ণায়ক বুদ্ধি স্থির থাকিতে পারে না (ঈশ্বরে একনিষ্ঠ হয় না)।"

(শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ, বি-এ সম্পাদিত শ্রীগীতা হইতে অনুবাদ গৃহীত)

অপর পক্ষে "ব্রাহ্মণদের মধ্যে যাঁহারা অতিবুদ্ধিমান্ ও জ্ঞানানুশীলনকারী ছিলেন, তাঁহারা কর্ম্মকাণ্ড ত্যাগ করিয়া এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড কিরূপে উৎপন্ন হইল, কে ইহা উৎপাদন করিল, সেই বিশ্বকারণের স্বরূপই বা কিরূপ—এই সমস্ত অতি দুর্ব্বোধ্য ও নিগূঢ় বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন এবং যুক্তিপরম্পরা অবলম্বন করিয়া একমাত্র অদ্বিতীয়স্বরূপ বিশ্বকারণের অস্তিত্বজ্ঞান উপার্জ্জন করিলেন। এই বিশ্বকারণকে তাঁহারা কেহ পরমাত্মা, কেহ পরমব্রহ্ম, কেহ বা ভগবান বলিয়া নামকরণ করিলেন। এই পরমতত্ত্বজ্ঞান সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য ছিল না; যাঁহারা অপেক্ষাকৃত অধিক বুদ্ধিমান্, চিন্তাশীল ও বিচক্ষণ ছিলেন, তাঁহারাই তাহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহারা উপনিষদ্ ও দর্শনশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এই দার্শনিক তত্ত্ববাদীদের মধ্যে এক সম্প্রদায় ছিলেন যোগ-ধর্ম্মাবলম্বী। তাঁহারা যোগবলে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়া প্রকৃত ব্রাহ্মণ-পদবাচ্য হইলেন। যোগসাধন করিতে হইলে অহিংস ও নিরামিষাশী হইতে হয়। তাঁহারা

হিংসামূলক কর্ম্মকাণ্ডের ও যাগযজ্ঞের এবং জীবহিংসার বিরোধী হইয়া অহিংসাই পরমধর্ম্ম— এই অহিংস ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন।" ইহারাই পরে যোগি ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হন।

যোগশাস্ত্র সদাচার বিষয়ক প্রামাণিক গ্রন্থ। যিনি যোগী হইবার ইচ্ছা রাখেন না, তিনি পূর্ণ সদাচারী হইতে পারেন না। শম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি— যোগের এই আটটি অঙ্গ। ইহাকে রাজযোগ বা অষ্টাঙ্গযোগ বলা হইয়া থাকে। আবার অহিংসা, সত্য, অস্তেয় (পরদ্রব্যে স্পৃহাশূন্যতা), ব্রহ্মচর্য্য (কায়মন বাক্যদ্বারা মৈথুন ত্যাগ) এবং অপরিগ্রহ (কাহারও দান বা উপহার গ্রহণ না করা) ইহাদের নাম যম। শৌচ সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধান— এই কয়েকটীকে নিয়ম বলে। উক্ত আটটি অঙ্গের মধ্যে সকলের পূর্ব্বে যম এবং যমের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে অহিংসার উল্লেখ রহিয়াছে। মনে হয় সদাচার ও যোগের প্রথম সোপান—অহিংসা। যে ব্যক্তি অহিংসক নহে, সে যোগী বা সদাচারী হইতে পারে না। এই অষ্টাঙ্গযোগে সিদ্ধি লাভ করিতে পারিলে চিত্ত শুদ্ধ-স্ফটিকবৎ নির্ম্মল হয় এবং চিত্ত নির্ম্মল হইলে আত্মস্বরূপ বা ব্রহ্মজ্ঞান উহাতে প্রতিভাত হয়। যোগসিদ্ধ পুরুষের চিত্ত বিষয় কামনা বিমুক্ত হইয়া নির্ব্বাত প্রদেশস্থিত দীপশিখার ন্যায় ভগবচ্চিন্তা স্থির-লক্ষ্য থাকে :—

যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
যোগিনোযতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ॥ (৬।১৯ গীতা)

যোগসাধন দুষ্কর হইলেও ইহা ব্যতীত চিত্তশুদ্ধি হয় না এবং চিত্ত শুদ্ধ না হইলে ভগবৎ সাক্ষাৎকার ঘটে না। ভগবানকে পাইবার জন্য এবং আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে যে সকল যোগিব্রাহ্মণ যোগচর্য্যা করিতেন তাঁহারাই পরবর্ত্তী কালে যোগী নামে পরিচিত হইয়া যোগিজাতিতে পরিণত হন। ৺দুলালচন্দ্র নাথ চৌধুরী বিদ্যাভূষণ প্রণীত "রুদ্রজ ব্রহ্মণজাতি" গ্রন্থের ভূমিকায় বিখ্যাত সমাজ

সংস্কারক পণ্ডিতপ্রবর দিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন— "ব্রাহ্মণগণই সাধনপ্রণালী ও উপাসনাভেদে যথাক্রমে জ্ঞানী, কর্ম্মী, যোগী ও ভক্তরূপে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিলেন।"

কর্ম্মকাণ্ডবাদী ব্রাহ্মণগণ ধর্ম্মের নামে পশুবলি ও পশুমাংস ভোজন অভ্যাস করিতে করিতে হিংসাপরায়ণ হইয়া উঠিলেন। ধর্ম্মের আদর্শগত এই পার্থক্য-হেতু যোগিব্রাহ্মণ ও বৈদিকব্রাহ্মণগণের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইল। ধর্ম্ম লইয়া বিরোধ ও শোণিতপাতের দৃষ্টান্ত অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতবর্ষেও বিরল নহে। "অবনীমণ্ডলে ধর্ম্মনিবন্ধন যত যুদ্ধ, যত যন্ত্রণা, যত নরহত্যা ও যত রক্তপ্রবাহ প্রবাহিত হইয়াছে, এত আর কিছুতেই হয় নাই। খ্রীষ্টানেরক্রুসেড্ ও মুসলমানের ধর্ম্মসংগ্রাম স্মরণ করিলে এখনও হৃদয় কম্পিত হইতে থাকে। হিন্দু ও বৌদ্ধ-দিগের চিরবদ্ধ বিসম্বাদে বৌদ্ধধর্ম্মকে ভারতবর্ষ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়াছে। যুক্তিবিরোধী, বিদ্বেষী, স্বমতাসক্ত ধর্ম্মপ্রচারকেরা এমনই ক্রোধান্ধ ও হতবুদ্ধি হয় যে, সেদিনও ভারতভূমি নরশোণিতে অভিষিক্ত হইয়াছিল। অনতিপ্রাচীন শৈব ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে যেরূপ ঘোরতর বিসম্বাদ উপস্থিত হইয়াছিল, পূর্ব্বকালীন বৈদিকব্রাহ্মণ ও যোগিব্রাহ্মণদের মধ্যেও তদনুরূপ বিরোধ ও বিদ্বেষ সংঘটিত হইয়াছিল।" ধর্ম্মসংক্রান্ত বিরোধের ফলে যোগিব্রাহ্মণগণ বৈদিকব্রাহ্মণগণের সংস্রব ত্যাগ করিয়া যোগধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সকলকেই যোগশিক্ষা দিতেন। এইরূপে গুরুগিরি করিবার ফলে তাঁহাদের ধর্ম্ম নাথধর্ম্ম বলিয়া অভিহিত হয়। 'নাথ' শব্দের অর্থ গুরু। গুরুগিরি করিলেও তাঁহাদের ব্রাহ্মণত্ব যায় নাই— যেমন অধুনাতন ব্রাহ্মণ গোস্বামীগণের যায় না।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে দেখা গেল, যোগিজাতি মূলতঃ ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের এক বিভাগ যোগমার্গাবলম্বী হইয়া যোগিব্রাহ্মণ বা যোগী নামে আখ্যাত হন। যোগধর্ম্ম অতি উদার। বৈদিক ব্রাহ্মণগণ শূদ্রদিগকে বেদপাঠের অধিকার

দেন নাই ; কিন্তু যোগিগণ যোগসাধনার চাবিকাটি তাঁহাদের নিজেদের কাছেই রাখিয়া দেন নাই। তাঁহারা বর্ণ ও সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সকলকেই যোগশিক্ষা দিতেন এবং ব্রহ্মজ্ঞান লাভে উহাদিগকে সহায়তা করিতেন।

যোগধর্ম্মের উদ্ভবকাল— বৈদিকযুগ। ইহার প্রবর্ত্তক যোগেশ্বর মহাদেব। বেদও মহাদেবকে সর্ব্বজ্ঞানের আধার ও সর্ব্বজ্ঞ মহারুদ্র বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। যোগশাস্ত্র তাঁহারই কথিত। এ সকল কথা আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলিয়াছি। যোগধর্ম্ম হইতে কালে কিরূপে শৈবধর্ম্ম ও নাথধর্ম্ম উৎপত্তি লাভ করে তাহাও দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। নাম ভিন্ন হইলেও যোগধর্ম্ম, শৈবধর্ম্ম ও নাথধর্ম্ম তত্ত্বতঃ একই। শিব হিংস্র ব্যাঘ্রের চর্ম্ম বসনরূপে ধারণ করিয়াছেন— ভয়ঙ্কর বিষধর সর্পকে দেহে স্থান দিয়াছেন— সর্ব্বজনের অবজ্ঞেয় ভস্ম দেহে লেপন করিয়াছেন— অসামান্য রূপযৌবনসম্পন্না ঐশ্বর্য্যশালিনী গৌরীকে উতঙ্কে বসাইয়াও নির্ব্বিকারচিত্তে ধ্যানস্তিমিতলোচনে বিরাজ করিতেছেন— ভয়সঙ্কুল ও সকলের পরিত্যাজ্য শ্মশানকেই ধ্যানের প্রকৃষ্ট স্থান বলিয়া নির্ব্বাচন করিয়াছেন। শিবের 'রজতগিরিসন্নিভ' প্রশান্ত মূর্ত্তিতে সাম্য, মৈত্রী, প্রেম, বৈরাগ্য, অন্তঃশুদ্ধতা, নির্ব্বিকারতা—এই গুণগুলিই ফুটিয়া উঠিয়াছে। হিংসা, ভয়, ক্রোধ, ঘৃণা, অবজ্ঞা, কামনা-বাসনা, গর্ব্ব-অহঙ্কার প্রভৃতি উৎকট ও নিকৃষ্ট বৃত্তিগুলি যেন শিবমূর্ত্তিতে একেবারে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। এই জন্যই বোধ হয় যোগিগণ শিবকে আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়া যোগধর্ম্মের উদ্ভাবকত্ব তাঁহার উপর আরোপ করিয়াছেন ; সুতরাং যোগধর্ম্মের নামান্তর শৈবধর্ম্মের একটা সার্থকতা পাওয়া গেল।

প্রাচীনকালে প্রচারিত যোগসাধনের প্রণালীগুলি সুসংবদ্ধ ছিল বলিয়া মনে হয় না। ইহা শ্রুতির ন্যায়ই গুরুশিষ্য-পরম্পরা চলিয়া আসিতেছিল। যখন ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্ম এতদুভয়ের মধ্যে সমন্বয়সাধনের প্রয়োজন হইয়াছিল, তখনই সম্ভবতঃ ইহা শাস্ত্রাকারে প্রকাশিত হইয়া থাকিবে। গুরু গোরক্ষ

নাথই শৈবধর্ম্ম বা নাথধর্ম্মের সংস্কারক। যোগসম্বন্ধীয় তাঁহার অনেক গ্রন্থের নাম শুনিতে পাওয়া যায়। নাথাচার্য্যগণের মধ্যে তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বাপেক্ষা যোগৈশ্বর্য্যশালী ছিলেন বলিয়া বর্ণিত আছে। কিন্তু তাঁহার আবির্ভাবকাল ও সময় সম্বন্ধে প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন গবেষকের মতানুসারে গোরক্ষ নাথের সময় পড়ে ৫ম হইতে ১৫শ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। বঙ্গদেশে নাথধর্ম্মের প্রবর্ত্তনকাল তৃতীয় কি চতুর্থ খ্রীষ্টাব্দ। বৈদিকযুগের শেষ সময়ে যখন বেদের প্রাণহীন কর্ম্মকাণ্ড ও নিষ্ঠুর পশুবলির প্রতি লোকের বিতৃষ্ণা জন্মিল, তখন উপনিষদের ঋষিগণ অহিংসার বাণী প্রচার করিতে লাগিলেন। এই সময়ে বেদ-বিরোধী জৈনধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্মের উদ্ভব হইল। জৈনধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ২৪ জন তীর্থঙ্কর মধ্যে ঋষভ, পার্শ্বনাথ ও মহাবীর—এই তিন জনের নামই সমধিক উল্লেখ-যোগ্য। ইহারা যোগিগুরুগণের নিকট যোগধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া যোগাচার্য্য হইয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের* প্রতিষ্ঠাতা ও প্রচারক নেপালের ক্ষত্রিয়কুমার শাক্যসিংহও যোগিগুরুর নিকট যোগশিক্ষা করিয়াছিলেন। যোগিগুরুগণের দীক্ষার ফলে "এইভাবে হিন্দুযোগী, ব্রাহ্মণযোগী, বৌদ্ধযোগী, জৈনযোগী, ক্ষত্রিয়যোগী, বৈশ্যযোগী, শূদ্রযোগী প্রভৃতি বহুশ্রেণীর যোগী ছিলেন।* শাক্যসিংহ বেদ না মানিলেও বৌদ্ধমন্ত্রে বৈদিক প্রণবমন্ত্রের সন্নিবেশ করিয়াছিলেন। যোগধর্ম্মের বা নাথধর্ম্মের অহিংস ধর্ম্মই তিনি প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি তথাকথিত ব্রাহ্মণগণের প্রাধান্য স্বীকার করিতেন না এবং জাতিভেদ মানিতেন না। এই জন্য ব্রাহ্মণগণ তৎপ্রচারিত ধর্ম্মের বিরোধী হইলেও এবং তাঁহার ধর্ম্মকে "পাষণ্ডীধর্ম্ম" বলিয়া নিন্দা করিলেও জনসাধারণ বুদ্ধের সাম্য ও অহিংসামূলক ধর্ম্মই দলে দলে গ্রহণ করিতে লাগিল। পরে রাজশক্তির সহায়তায় বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতময় ও ভারতের বাহিরেও ছড়াইয়া পড়িল। বঙ্গদেশেই বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাবল্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনুভূত হইয়াছিল।

বাঙ্গালায় কেহ অবৌদ্ধ ছিল বলিয়া জানা যায় না। বৌদ্ধধর্ম্মের প্লাবনে যখন ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইল, তখন শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। শঙ্করাচার্য্য যোগী গোবিন্দ নাথের নিকট যোগ শিক্ষা করিয়াছিলেন। শঙ্করদিগ্বিজয় গ্রন্থে তাহার উল্লেখ আছে। এদিকে নাথ-গুরুগণও এই ধর্ম্মসঙ্কটকালে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন না। বিশেষ করিয়া মৎস্যেন্দ্র নাথ ও তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য গোরক্ষ নাথ পরম যোগধর্ম্ম ভারতের সর্ব্বত্র প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহারা জাতিভেদ মানিতেন না। "যত্র জীব তত্র শিব"—ভগবান্ সর্ব্বভূতে সমভাবে বিরাজিত—সর্ব্ব জীবের ভিতর এক অক্ষয়, অব্যয় পরমাত্মা বিরাজ করিতেছেন—এই পরম ও চরম সাত্ত্বিক জ্ঞান তাঁহারা লাভ করিয়াছিলেন এবং তাহাই প্রচার করিয়াছিলেন। নাথগুরুগণের সাম্য, মৈত্রী ও প্রেমের উদার বাণীতে আকৃষ্ট হইয়া বৌদ্ধ, অবৌদ্ধ, মুসলমান, স্পৃশ্য, অস্পৃশ্য সকলেই নাথধর্ম্মের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। ইহারা সকলেই 'নাথ' এই বিশেষত্বজ্ঞাপক উপাধি ধারণ করিয়া কালে নাথধর্ম্ম ও নাথযোগীদিগকে আরও শক্তিশালী করিয়া তুলে। আর্য্যগণ ধর্ম্ম ও কৃষ্টি দিয়া যে কত বিভিন্ন ধর্ম্মের বিভিন্ন জাতিকে নিজেদের অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছিলেন তাহার সংখ্যা নাই। নাথাচার্য্যগণও সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া এই উদার ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছেন:—

কেহ নাহি জানে, কাহার আহ্বানে, কত মানুষের ধারা।
দুর্ব্বার স্রোতে, এল কোথা হ'তে, সমুদ্রে হ'লো হারা॥
হেথায় আর্য্য হোথা অনার্য্য
হেথায় দাবিড় চীন ;
শক হূন দল পাঠান মোগল
এক দেহে হ'লো লীন॥ (ভারততীর্থ)

নাথগুরুগণ কৃষ্টি, ধর্ম্ম ও জ্ঞান দিয়া যে বিভিন্ন জাতিকে তাঁহাদের অত্যুদার বিশাল বাহুপুটে স্থান দিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহাদের হিন্দুত্ব ও ব্রাহ্মণত্বই প্রকাশ পায়। উপরোক্ত নাথযোগিগণই বঙ্গের নাথজাতি বা যোগিজাতি এবং মৎস্যেন্দ্র নাথ, গোরক্ষ নাথ, চৌরঙ্গী নাথ প্রমুখ ধর্ম্মাচার্য্যগণ তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ।

নাথধর্ম্মাচার্য্যগণের ও শঙ্করাচার্য্যের অবিশ্রান্ত প্রচারের ফলে হিন্দুধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে একটা সমন্বয় সাধিত হইল। বৌদ্ধরাজগণের পতনের পর বৌদ্ধধর্ম্মের পতন ঘটিল; নূতন ভাবে সংস্কৃত হইয়া ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম আবার নবজীবন লাভ করিল এবং ব্রাহ্মণগণের ও হিন্দুরাজাদের প্রাধান্য ও প্রভুত্ব আবার আস্তে আস্তে বাড়িয়া উঠিল। তখন হিন্দুরাজগণ যোগী ও বৌদ্ধদিগের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। সেই অত্যাচারের ফলে বহু বৌদ্ধ স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব স্বীকার পূর্ব্বক হিন্দুসমাজে প্রবেশ করিয়া আত্মরক্ষা করিল। যোগীরা ও বৌদ্ধগণের মধ্যে যাহারা ব্রাহ্মণগণের প্রাধান্য স্বীকার করে নাই তাহাদিগকে হিন্দুরাজা ও ব্রাহ্মণগণ নিকৃষ্ট শ্রেণীতে স্থান দিলেন। রাজা ও ব্রাহ্মণের কোপানলে পড়িয়া যোগিগণ এইরূপে অধঃপতিত হইলেন। বাঙ্গালা দেশের যোগীরাও রাজা বল্লালসেনের কোপে পড়িয়া দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এত অত্যাচার ও উৎপীড়ন সত্ত্বেও যোগিগণ ব্রাহ্মণের অধীনতা স্বীকার করে নাই—তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

যোগিজাতি ধর্ম্মসম্প্রদায় হইতে উদ্ভূত—কেহ কেহ এইরূপ মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। মৎস্যেন্দ্র নাথ, গোরক্ষ নাথ প্রভৃতি নাথ-গুরুগণের ধর্ম্মশিষ্যেরা নাথ-সম্প্রদায়ে পরিণত হইয়াছিলেন, তাহা ইতিপূর্ব্বে দেখাইয়াছি। উক্ত নাথগুরুগণের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্ব হইতে অর্থাৎ বৈদিক যুগ হইতে যোগীরা যোগধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন এবং দার্শনিক যুগ হইতেও যোগধর্ম্ম বা

শৈবধর্ম্মের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব যোগিজাতি অতি পরবর্ত্তী যুগে ধর্ম্মসম্প্রদায় হইতে উদ্ভূত বোধ হইলেও ইহারা মৌলিক জাতি। আধুনিক জাতিসমূহের মূল অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে তাহারা কোন গোত্র, বংশ, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় হইতে উদ্ভূত। তবে কেহ কিছু দিন আগে এবং কেহ কিছু দিন পশ্চাতে। শাক্যসিংহের পূর্ব্বেও যেমন বহু সাধক বুদ্ধ হইয়াছিলেন—যীশুখ্রীষ্টের পূর্ব্বেও যেমন বহু ক্রিশ্চিয়ান বিদ্যমান ছিলেন—হজরত মহম্মদের পূর্ব্বেও যেমন আরও অনেক নবি ছিলেন, সেইরূপ মৎস্যেন্দ্র নাথ, গোরক্ষ নাথ, চৌরঙ্গী নাথ প্রমুখ নাথাচার্য্যগণের পূর্ব্বেও বহু যোগাচার্য্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সকল সুপ্রাচীন যোগাচার্য্য বর্ত্তমান যোগিজাতির ঊর্দ্ধতন পূর্ব্বপুরুষ।

যোগীরা বৌদ্ধ নহে

কোন কোন প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক যোগীদিগকে বৌদ্ধ আখ্যা দিতেও ছাড়েন নাই। বৌদ্ধধর্ম্ম ও নাথধর্ম্মের মধ্যে সাদৃশ্য আছে বটে। বৌদ্ধদিগের মধ্যেও যোগাচার্য্য ছিলেন। যোগীরা শিবের উপাসক, বৌদ্ধেরা নিরঞ্জনের উপাসক। ফলে উভয়েই ব্রহ্মের উপাসক। উভয় ধর্ম্মেই হিংসা ও জাতিভেদের স্থান ছিল না। আধুনিক থিয়সফিষ্ট সোসাইটীর ন্যায় বৌদ্ধধর্ম্মের ও নাথধর্ম্মের আচার্য্যগণ হিন্দু, মুসলমান ইত্যাদি সকল সম্প্রদায়ের শিক্ষেচ্ছু ব্যক্তিগণকে যোগধর্ম্ম শিক্ষা দিতেন। যোগবলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার পর তাঁহাদের জাতিপাঁতি জ্ঞান থাকিত না। তাঁহারা জাতিবর্ণ ও সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর বহু ঊর্দ্ধে উঠিয়া যাইতেন এবং তখন তাঁহারাই প্রকৃত ব্রাহ্মণপদবাচ্য হইতেন। নাথাচার্য্যগণ হিন্দুধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে একটা সমন্বয় সাধন করিয়াছিলেন—এ কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। প্রবাসী পত্রিকার ১৩৫১, মাঘ সংখ্যায় যোগানন্দ ব্রহ্মচারী লিখিয়াছেন—"মৎস্যেন্দ্র নাথ, গোরক্ষ নাথ প্রভৃতি সিদ্ধাগণ হিন্দু

ও বৌদ্ধ উভয়েরই ধর্ম্মগুরু। বৌদ্ধ-ধর্ম্মগ্রন্থে তাঁহারা বৌদ্ধ এবং হিন্দু-যোগ-গ্রন্থে তাঁহারা হিন্দু ধর্ম্মগুরু বলিয়া অভিহিত। তাঁহারা সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়কারী ছিলেন। যোগসাধনা কালে তাঁহারা যোগী, প্রেমভক্তি প্রকাশে বৈষ্ণব, সৎকর্ম্মানুশীলনে বৌদ্ধ, জৈন ও খ্রীষ্টান।" ধর্ম্ম সমন্বয় করিতে হইলে সমন্বয় কর্ত্তাকে অবশ্য নিজধর্ম্মের কিছু ত্যাগ করিতে এবং পরধর্ম্মের কিছু গ্রহণ করিতে হয়। জ্ঞান ও বিচারশক্তিবলে উভয় ধর্ম্মের সারাংশ মিলাইয়া মিশাইয়া ধর্ম্মের এক নূতন রূপ দিতে হয়। এই কারণেই হয়তো নাথধর্ম্মে ও উহার অনুবর্ত্তী যোগিজাতিতে কিঞ্চিৎ বৌদ্ধপ্রভাব সঞ্চারিত হইয়া থাকিবে। মোগলযুগে এইরূপ ধর্ম্মসমন্বয়ের চেষ্টা হইয়াছিল। আল্লোপনিষদ্ নামে একখানা উপনিষদ্ ঐ সময় রচিত হইয়াছিল বলিয়া শুনা যায়। মোগলসম্রাট আকবরের ইলাহিধর্ম্ম এইরূপ সমন্বয় চেষ্টারই ফল। অন্যান্য ধর্ম্মের মূল নীতিগুলি আকবর ইলাহিধর্ম্মে গ্রহণ করিয়াছিলেন। গুরু নানকও হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মের সমন্বয় সাধন করিতে এই-রূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন। হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্ম্মের লোকই নানকের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। এইভাবেই শিখসম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়া শিখজাতির অভ্যুদয় হইল। হিন্দুসমাজের কোন কোন স্থানে 'দরিয়াপীর', 'সত্যপীর', 'মাণিকপীর' ইত্যাদি পীর পয়গম্বরের গান, ছড়া ও পূজা প্রচলিত আছে। দেশের তৎকালীন অবস্থা বিবেচনায় প্রবল মুসলমান ধর্ম্মের কবল হইতে হিন্দুধর্ম্মকে বাঁচাইবার জন্য এইরূপ উপায় অবলম্বনের হয়তো প্রয়োজন হইয়াছিল; যেহেতু মুসলমান শুধু সাম্রাজ্য বিস্তার ও রাজত্ব করিতেই ভারতবর্ষে এসেছিলেন না—অন্যান্য ধর্ম্মের লোপ-সাধন করিয়া ইস্‌লাম ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করাও তাহাদের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। মুসলমানের ঐকান্তিকী চেষ্টা সত্ত্বেও সনাতন হিন্দুধর্ম্মের সুদৃঢ় ভিত্তি শিথিল না হইলেও তদানীন্তন ধর্ম্মাচার্য্যগণকে ধর্ম্মরক্ষার্থ দেশকাল বিবেচনা করিয়া আচার-নীতির কিছুটা ওলট-পালট করিতে হইয়াছিল। বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মের উপর মুসলমানী প্রভাব কিছু কিছু পরিলক্ষিত হইলেও, হিন্দুধর্ম্ম যেমন মুসলমান ধর্ম্ম

হইতে বিভিন্ন, সেইরূপ শৈবধর্ম্ম বা নাথধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে বিভিন্ন। মৎস্যেন্দ্র নাথ ও গোরক্ষ নাথ বৌদ্ধজগতেও শৈবাচার্য্য ও নাথগুরু বলিয়াই স্বীকৃত ও পূজিত হইয়াছিলেন— এ কথা আমরা চতুর্থ অধ্যায়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা পূর্ব্বক প্রমাণ করিয়াছি। অতএব যোগিজাতি বৌদ্ধ নহে। যোগিজাতি বৌদ্ধ হইলে অন্যান্য জাতিও বাদ পড়ে না। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাবল্যে বঙ্গদেশে হিন্দুধর্ম্মের অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বাঙ্গালীর পূর্ব্বপুরুষ সকলেই বৌদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। বঙ্গদেশে বেদজ্ঞ খাঁটি ব্রাহ্মণ না পাওয়াতেই আদিশূরকে কান্যকুব্জ (বর্ত্তমান কনোজ) হইতে ব্রাহ্মণ আনাইতে হইয়াছিল— ইহা ইতিহাসের কথা।

কঠোর দারিদ্র্যবশতঃ এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে যোগিজাতির সামাজিক উন্নত অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে সত্য। অর্থ ও শিক্ষা আজকাল সামাজিক মর্য্যাদার মাপকাটী। যোগিসমাজে এই দুই বস্তুরই অভাব। প্রধানতঃ এই কারণে তাহারা কোন কোন স্থলে সমাজের অনেকটা নিম্নস্তরে নামিয়া পড়িয়াছে এবং আগেকার সম্মান ও প্রতিপত্তি হারাইয়াছে। কিন্তু "একদা এই প্রবল পরাক্রান্ত যোগিজাতি বঙ্গদেশে ও পূর্ব্বভারতে প্রভুত্ব করিয়া গিয়াছেন। ইঁহারা রাজাদের গুরু ছিলেন, সন্ন্যাসী হইলেও ধর্ম্মযুদ্ধাদিতে যোগ দিতেন, আবার দর্শনের গ্রন্থ ও পদ্যাদি রচনা করিতেন। রংপুর, ময়মনসিং, বাখরগঞ্জ, নোয়াখালি, ঢাকা, ত্রিপুরা প্রভৃতি অঞ্চলে এখনও লক্ষাধিক * যোগীর বাস থাকিলেও তাঁহাদের পূর্ব্বগৌরব অক্ষুন্ন নাই। দারিদ্র্যবশতঃ উচ্চশিক্ষায় বঞ্চিত হইলেও তাঁহাদের মধ্যে তিন সহস্রাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী আছেন। গ্রাসাচ্ছাদনের নিমিত্ত এখন ইঁহারা তন্তুবায়, মনিহারী, চূণ বিক্রয় প্রভৃতি ব্যবসায় অবলম্বনে বাধ্য হইয়াছেন।" (নাথপন্থ—বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ— ডক্টর শ্রীমতী কল্যাণী মল্লিক)

* ১৯২১ সালের সেন্সাস্ অনুসারে ঐ সকল জিলার যোগিজাতির সংখ্যা প্রায় দুই লক্ষ ত্রিশ হাজার।

রাজকোপে পতিত এবং ব্রাহ্মণশাসিত সমাজের নিগ্রহভাজন হইয়া যোগি-জাতি উৎকট বৃত্তিসমস্যার সম্মুখীন হইল। এইরূপ বৃত্তিসমস্যা উপস্থিত হইলে এক বর্ণের লোক অন্য বর্ণের বৃত্তি গ্রহণ করিতে পারে—শাস্ত্রে এরূপ ব্যবস্থা আছে। এই ব্যবস্থা শাস্ত্রে 'আপদ্ধর্ম্ম' নামে অভিহিত হইয়াছে। এই আপদ্ধর্ম্মানুসারে দুঃস্থ ও দুর্গত যোগিজাতি জীবিকার্জ্জনের জন্য প্রধানতঃ সহজ অথচ অতি প্রয়োজনীয় বস্ত্র বয়নবৃত্তি গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল।

স্থানভেদে যোগিজাতির মধ্যে আকৃতি প্রকৃতিগত, আচারগত ও ব্যবসায়-গত ভেদবিভেদ লক্ষ্য করিয়াও অনেকে এই জাতিকে অন্ত্যজ ও ম্লেচ্ছ বলিতেও কুণ্ঠিত হন না। এই সকল একদেশদর্শী গবেষক যোগিজাতির ঐতিহ্য ও প্রাচীন ইতিহাস সম্যকরূপে আলোচনা করিবার ক্লেশ স্বীকার না করিয়া এই প্রাচীন জাতির বিশাল সমাজদেহের কোন্ অঙ্গে সামান্য একটু ক্ষত আছে তাহারই উপর ভিত্তি করিয়া একটা সাধারণ মন্তব্য প্রকাশ পূর্ব্বক এই জাতির প্রতি অবিচার করিয়া থাকেন। একটা ধারণা মনে বদ্ধমূল করিয়া গবেষণা করা চলে না। আমরা বহু উদাহরণ ও অভিমত সংগ্রহ করিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে দেখাইয়াছি—যোগিজাতি অতি উন্নত জাতি—ইহারা অন্ত্যজ বা সঙ্কর জাতি নহে। আমরা আরও বিস্তারিত ভাবেই দেখাইয়াছি নাথগুরুগণ দেবতার ন্যায় পূজিত হইতেন এবং তাঁহাদের পূজার জন্য অনেক মন্ত্রও রচিত হইয়াছিল। ইহা হইতে প্রমাণিত হয়—নাথযোগিগণ সর্ব্বত্র ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বিবেচিত ও সম্মানিত হইতেন।

ধর্ম্মের অতি সুমহৎ আদর্শ নাথগুরুগণ অনুসরণ ও প্রচার করিতেন। "সর্ব্বখল্বিদং ব্রহ্ম"—"তত্ত্বমসি"—এইরূপ মহতী বাণী প্রচার করিয়া তাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার জন্য সকলকে উদ্‌বুদ্ধ করিতেন। তাঁহাদের চিত্ত ধর্ম্ম ও সমাজের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে নিবদ্ধ ছিল না। তাঁহারা সর্ব্বদাই পরম ও চরম সত্যের অন্বেষণে ব্যস্ত থাকিতেন।

মাতা চ পার্ব্বতী দেবী পিতা দেবো মহেশ্বরঃ।
বান্ধবাঃ শিবভক্তাশ্চ স্বদেশ ভুবনত্রয়ম্ ॥

এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানেরই উহারা ছিলেন ধারক ও বাহক। গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন :—

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ ॥ ১০।২০ গীতা।

অর্থাৎ ভগবান্ পরমাত্মারূপে সর্ব্বভূতের অন্তঃকরণে অবস্থিত; তিনিই ভূতগণের আদি, মধ্য ও অন্ত। তিনি সর্ব্বব্যাপী। গীতার অন্যত্র আছে—

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ ॥ ৬।২৯ গীতা।

অর্থাৎ যিনি যোগযুক্ত তিনি সর্ব্বভূতের মধ্যে আত্মাকে এবং আত্মাতে সর্ব্বভূতকে সমানভাবে দর্শন করিয়া থাকেন।

নাথগুরুগণ গীতার এই চরমতত্ত্বের সাধক ছিলেন। তাঁহারা ভেদজ্ঞান সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং সর্ব্বজীবের ও সর্ব্বপদার্থের মধ্যে ভগবৎ সত্তার উপলব্ধি করিতেন। অতএব তাঁহারা "জাতিবর্ণ ও সম্প্রদায়ের বহু উর্দ্ধে উঠিয়া যাইতেন। তাঁহারাই ছিলেন প্রকৃত ব্রাহ্মণপদবাচ্য।"

"একমাত্র বিশুদ্ধ চরিত্রই ব্রাহ্মণত্বের লক্ষণ। চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত কেহই ব্রাহ্মণ হইতে পারেন না। যিনি ক্রোধ ও মোহের অতীত, অহিংসক ও জিতেন্দ্রিয় তিনিই ব্রাহ্মণ। যিনি সর্ব্বভূতে সমদর্শী—সকলকেই আত্মবৎ জ্ঞান করেন, তিনি অন্য কর্ম্ম করুন বা না করুন, তিনিই ব্রাহ্মণ। যিনি দয়ালু, ক্ষমাবান্, সরল, চরিত্রবান্, তিনিই ব্রাহ্মণ। ইহা ব্যতীত অপরে ব্রাহ্মণ নহে।"

যোগস্তপো দমো দানং ব্রতং শৌচং দয়া ঘৃণা।
বিদ্যাবিজ্ঞানমাস্তিক্যমেতদ্ ব্রাহ্মণ লক্ষণম্ ॥ বশিষ্টসংহিতা।

অর্থাৎ যোগ, তপঃ, দম, দান, ব্রত, সদাচার, দয়া, ঘৃণা (সরলতা), বিদ্যা

(পরমার্থ বিষয়ক বিদ্যা), বিজ্ঞান (ভগবৎ স্বরূপ ও তাঁহার বিভূতির উপলব্ধি) এবং আস্তিক্য (পরমেশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে দৃঢ়বিশ্বাস)—এইগুলিই ব্রাহ্মণের লক্ষণ।

উপরোক্ত সূত্রগুলি ধরিয়া বিচার করিলে দেখা যায় নাথগুরুগণ শুদ্ধচিত্ত, চরিত্রবান্, জিতেন্দ্রিয়, সমদর্শী, হিংসাদ্বেষ-বিবর্জ্জিত, ক্ষমাশীল, দয়াশীল এবং সর্ব্বহিতে রত ছিলেন ; সুতরাং তাঁহারা এবং তাঁহাদের বংশধরগণ ব্রাহ্মণ।

* "যোগিজাতির বর্ণবিচার" প্রবন্ধ রচনায় নোয়াখালির প্রবীণ সমাজ-নেতা শ্রীযুক্ত ভারতচন্দ্র নাথ, উকিল মহাশয় উপদেশ ও উপকরণ দিয়া এবং স্থলবিশেষে সংশোধন করিয়া দিয়া যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। গ্রন্থকার।

নবম অধ্যায়

অখণ্ড ভারতের যোগিজাতির উত্থান-পতন ও জাগরণের ইতিহাস

১৮৬১ খৃষ্টীয় শতাব্দীর ৫ই জানুয়ারী তারিখে স্বনামখ্যাত বিদেশীয় পণ্ডিত Mr. B. H. Hodgson সাহেব Royal Asiatic Society of Great Britain & Ireland সঙ্ঘের অধিবেশনে "Notice on Budhist symbol" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধের এক স্থানে তিনি প্রসঙ্গক্রমে লিখিয়াছিলেন—"Seem to point to Nathism or Saintism as the bridge uniting the orthodox and heterodox the Brahmanical and Saugata Sect" অর্থাৎ নাথপন্থীরা বা সন্ন্যাসধর্ম্মীরা গোড়া ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম এবং প্রগতিশীল সৌগতধর্ম্মের মিলনসেতুর কার্য্য করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। উক্ত প্রবন্ধটী আলোচ্য সনের Journal of Royal Asiatic Society of Great Britain & Ireland পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। উক্ত প্রবন্ধে মৎস্যেন্দ্র নাথ ও গোরক্ষ নাথ সম্বন্ধীয় কিঞ্চিৎ আলোচনাও ছিল এবং মৎস্যেন্দ্র নাথের একখানি ও গোরক্ষ নাথের তিনখানি চিত্রও উহাতে প্রকাশিত হইয়াছিল।

উক্ত প্রবন্ধে খুব সম্ভব হড্‌সন্ সাহেবই সর্ব্বপ্রথম Nathism (নাথপন্থ) সম্বন্ধে আলোচনার সূত্রপাত করিয়াছিলেন। এ দেশীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ই সর্ব্বপ্রথম হড্‌সন্ সাহেবের উক্ত লেখা হইতে প্রেরণা লাভ করিয়া এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও আলোচনা আরম্ভ করেন, এবং হড্‌সন্ সাহেবের 'Nathism'কে 'নাথপন্থ' নামে অভিহিত করেন। তৎপর তিনি 'নাথপন্থ' সম্বন্ধে অনেক তথ্য আবিষ্কার করেন। তাঁহার

অনুকরণে দেশীয় অনেক ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক ও পুরাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত এ সম্বন্ধে বহু গবেষণা ও আলোচনা করিয়াছেন। বিদেশীয় পণ্ডিত গ্রীয়ার্সন সাহেব সর্ব্বপ্রথম উত্তরবঙ্গের রঙ্গপুর জিলা হইতে নাথ-গ্রাম্যগীতিকা সংগ্রহ করিয়া ১৮৭৮ ইংরাজিতে এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশ করিলে পর এ সম্বন্ধে এ দেশীয় পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে বিদেশীরাই এ দেশবাসীর পথ-প্রদর্শক।

যাহা হউক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতমণ্ডলীর অনুসন্ধানের ফলে নিঃসন্দিগ্ধ-রূপেই জানা গিয়াছে যে, মোটামুটী সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে নাথযোগীদের এসিয়াব্যাপী খ্যাতি ছিল। এই নাথ-সম্প্রদায় ধর্ম্মজগতে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। এমন কি নাথ-সম্প্রদায় গুরু-সম্প্রদায় বলিয়া খ্যাতি-লাভও করিয়াছিল। “বর্ত্তমান নাথবংশ বা যোগিজাতি যোগমার্গের ঋষিদিগের বংশজাত বলিয়া কথিত” (দৈনিক বসুমতী—২২শে জুন, ১৯৫৩ ইং)। নাথপন্থী সন্ন্যাসীরা ঊর্ণনির্ম্মিত সূত্র ধারণ করিয়া থাকেন। এই সূত্রকে ইঁহারা ‘সেলী’ বলেন। ইঁহারা অঙ্গুলি পরিমিত এক প্রকার কৃষ্ণ পদার্থ পরিয়া থাকেন, ইহাকে তাঁহারা নাদ বলেন। যোগী-সম্প্রদায় ‘মেখলা’, ‘বিষ্টি’, ‘সেলী’ ও ‘বিশতি’ দেহে ধারণ করিয়া থাকেন। ইঁহাদের অনেক পরিভাষা আছে। ইঁহারা মর্য্যাদাকে ‘বেলা’, গুরুশব্দে ‘শব্দ’, ধ্যানকে ‘ডিবী’, সন্তোষকে ‘ভুক্তি’ বলেন। গোরক্ষপন্থীরা ‘আদেশ’ শব্দে ‘নমস্কার’ ও ‘উপদেশ’ বুঝিয়া থাকেন।

ডক্টর শ্রীকল্যাণী মল্লিক, এম, এ ; পি, এইচ, ডি, বলেন— “প্রায় সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে নাথ-সম্প্রদায় নামক যোগীদের ভারতব্যাপী খ্যাতি ছিল। এই যোগিগণের আসমুদ্র হিমাচল গতিবিধি থাকায় তাঁহাদের কীর্ত্তি ও কাহিনী ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে অদ্যাপি বর্ত্তমান” (নাথপন্থ—১ পৃঃ)। তিনি আরও বলেন— “নাথযোগীরা কর্ণের উপাস্থি ভেদ করিয়া ধাতু বা গণ্ডারের শৃঙ্গনির্ম্মিত কুণ্ডল ধারণ করিয়া অপরাপর যোগী হইতে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেন। কর্ণ-

ভেদ দ্বারা যোগজ সিদ্ধিলাভ হয় ও পরমাত্মাদর্শন হয় বলিয়া কুণ্ডলের অপর নাম দর্শনী। কানফাটা যোগীরা কর্ণের কোমল নিম্নভাগ ছেদন করেন। * * * কুণ্ডল ব্যতীত হস্তে পিত্তলাদির বলয়, গলায় হিংলাজ ও আশাপুরী নামক মালা এবং রুদ্রাক্ষের মালাধারণ রীতি আছে। ইহা ব্যতীত গলায় সেলী নামক উর্ণ উপবীতে শিংনাদ নামে দুই তিন অঙ্গুলি পরিমাণ কৃষ্ণবর্ণ শিংএর বংশীধারণ রীতি আছে। এই শিংনাদ পবিত্রী নামক বলয়াকার দ্রব্য হইতে লম্বিত হয়। এই শিংনাদ ও পবিত্রী জগৎকারণের প্রতীকরূপে যোগীরা ধারণ করেন। গৈরিক বা শ্বেতবস্ত্র ধারণ, জটা ধারণ বা মুণ্ডিত মস্তক হওয়া এবং ললাটে ত্রিপুণ্ড ধারণ নাথযোগীদের মধ্যে প্রচলিত। সাধনের নিমিত্ত ধুনি ও চিবুকভার ন্যস্ত করিবার জন্য আচল নামে খঞ্জযষ্টি ব্যবহৃত হয়। দণ্ড ও শিখা ধারণ ইঁহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। পাণ্ডবেরা মৃত আত্মীয়ের পিণ্ড-দান সময়ে গণ্ডারচর্ম্ম নির্ম্মিত পাত্রে জলদান করেন, তাই গণ্ডারের চর্ম্মকে ইঁহারা পবিত্র মনে করেন। * * * শ্বাস-প্রশ্বাসের সংখ্যাদি হইতে শুভাশুভ ফল নির্ণয়, কবচ ঔষধাদি বিতরণ ইঁহাদের মধ্যে দেখা যায়। শিব-রাত্রিতে ও নাগপঞ্চমীতে যোগীদের বিশেষ উৎসব হয়। অন্নবিতরণ যোগীদের গৌরবের বিষয়। যোগীদের ইষ্টমন্ত্র শিব-গোরক্ষ, ইঁহাদের দীক্ষাকাল পৌষ হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত প্রশস্ত। কোন যোগীর মৃত্যু হইলে তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হয়; তৎপূর্ব্বে হিন্দুত্বের বৈশিষ্ট্যস্বরূপ মুখাগ্নি করার প্রথা আছে। মুসল-মানেরাও যোগীদের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতেন। একত্রে আহারাদি না করিলেও নাগপঞ্চমীর দিন হিন্দু ও মুসলমান যোগীরা একত্রে 'গুগা' গীত গাহিয়া ভিক্ষা করেন। * * * শিবরাত্রিতে গোরক্ষগীত গাওয়া হয়। * * * মহাসিদ্ধেরা গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালন করেন না; তাঁহারা অবধূত, জ্ঞানই তাঁহাদের দণ্ড, তন্ময়তা যোগরূপ, সূত্রই তাঁহাদের উপবীত, পরমাত্মায় স্থিতিই তাঁহাদের সন্ধ্যা। এই পরমাত্মা দ্বৈতাদ্বৈতের সগুণ-নির্গুণের অতীত, তিনি বিশ্বোত্তীর্ণ

ও নাথস্বরূপ। নিজের সহিত এই পরমাত্মার একতা উপলব্ধিই নাথপন্থের আদর্শ। শাস্ত্রপাঠ দ্বারা কেবল জ্ঞানার্জ্জন বা অনুপযুক্ত বহু শিষ্য গ্রহণ নাথগুরুর আদর্শ নহে। মহাজ্ঞান অর্থাৎ যোগযুক্ত জ্ঞান লাভ করিয়া কায়াসাধন দ্বারা অজর অমরত্ব প্রাপ্তি নাথগণের প্রেয়" (নাথপন্থ—১৯ হইতে ২৩ পৃঃ)।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে অতি প্রাচীনকাল হইতে বহুসংখ্যক নাথযোগী বসবাস করিতেছেন। এখনও গুজরাট, কাথিয়াবাড়, বিহার, উড়িষ্যা, রাজপুতনা, মধ্য প্রদেশ, যুক্ত প্রদেশ প্রভৃতিতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অনেক নাথযোগী ব্রাহ্মণাদি বর্ণের জনগণের—এমন কি রাজরাজোড়াদের গুরুপদে এবং বিভিন্ন মঠ-মন্দিরাদির মোহান্তপদে অধিষ্ঠিত আছেন (তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। বিহার প্রদেশের নাথযোগীদের সাধারণ উপাধি গোসাই, অর্থাৎ গোস্বামী। গোসাই বলিলেই এ সব অঞ্চলে নাথযোগীদেরে বুঝায়। মানভূম, বীরভূম, গাজীপুর, ছাপরা, গয়া, পাটনা, কাশী প্রভৃতি অঞ্চলের বহুসংখ্যক যোগীর পৈতৃক ব্যবসায় গুরুতা কার্য্য। অনেকে রঙ্গিন সূতার মালা ও অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া বিক্রী করিয়া থাকেন। এ সব অঞ্চলের অধিকাংশ নাথযোগী ভিক্ষা উপলক্ষে ভারত-ভ্রমণ করেন। দলবদ্ধ হইয়া ইহারা ভারতের বাহিরে নেপাল, তিব্বত পর্য্যন্ত গমনাগমন করেন। ইহাদের পক্ষে প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুতে দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ নিষিদ্ধ। গুজরাট, কাথিয়াবাড় অঞ্চলের অনেক নাথযোগী অবিবাহিত জীবন যাপন করেন। নেপালের যোগিজাতি সম্বন্ধে নেপাল ভ্রমণকারী শ্রীগোপেন্দ্র নাথ দত্ত "পশ্চিম নেপালে" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন— "একদল যোগী এ সব মন্দিরের পূজারী। প্রত্যেকের বয়স কুড়ি বৎসরের নীচে ও অবিবাহিত, এদের পাঁচ বৎসর অবধি পূজার অধিকার আছে। কাল পূরণের পরে অবশ্য এদের বিবাহ করিতে অনুমতি দেওয়া হয়। তখন আর একজন তরুণ যোগী এদের স্থান অধিকার করেন" (রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকা— ২৪শে আশ্বিন, ১৩৬০ বাং, ১২ পৃঃ)।

গুজরাট, কাথিয়াবাড় অঞ্চলের যে সব নাথযোগী বিবাহ করিয়া সংসারধর্ম্ম পালন করেন তাঁহাদের প্রায় সকলেই নিরক্ষর কৃষিজীবী বা ভিক্ষোপজীবী। প্রয়াগ অঞ্চলের যোগীদের সকলের উপবীত নাই। ইহার কারণ সম্বন্ধে তাঁহারা বলেন, পূর্ব্বে ভারতের সকল প্রদেশের যোগিজাতির উপবীত ছিল, মধ্য যুগে এই জাতির পক্ষে উপবীত হইতে নাদবিন্দু শ্রেষ্ঠ ধারণা হওয়ায় অনেক স্থলে যোগীরা উপবীত ত্যাগ করিয়া নাদবিন্দু ধারণ করেন; পরে নাদবিন্দুও ত্যাগ করিয়া একমাত্র রুদ্রাক্ষের মালাকেই উপবীত ও নাদবিন্দুর মত সম্মানের চক্ষে দেখেন। ইহারা এবং মধ্যভারত ও যুক্তপ্রদেশের এই মতাবলম্বী যোগীরা আবার উপবীত গ্রহণ করিতেছেন। গোরক্ষপুর অঞ্চলের যোগীদের কর্ণে কুণ্ডল ও গলদেশে নাদবিন্দু আছে। অখণ্ড পাঞ্জাবের কোন কোন অঞ্চলের যোগীরা ভরথরি নামে অর্থাৎ ভর্ত্তৃহরি সম্প্রদায় নামে পরিচিত এ সব অঞ্চলের নাথদের মধ্যে অনেকের পীর উপাধি দৃষ্ট হয়। মুসলমান জনসমাজের উপর নাথদের প্রভাব বিস্তারই ইহার কারণ (১)।

উড়িষ্যায়ও অনেক নাথের বাস আছে। কঙ্কণ প্রদেশে আজকাল ইহাদের সংখ্যা অল্প। পর্ত্তুগীজগণ যখন সালসেট অধিকার করেন তখন তাঁহারা কানেড়ী (Kanhari) গুহাতে বহুসংখ্যক নাথযোগী দেখিয়াছিলেন। তাঁহারা নাকি তথায় যোগাচারী নাথযোগীদের তিন হাজার গুহা দেখিয়াছিলেন। বোম্বাই অঞ্চলের নাথদের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা অতি অল্প। গোপীচন্দ্র সম্বন্ধীয় বিলাপ-গীতিকা গোপীযন্ত্রের সাহায্যে মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় গাহিতে পারেন এমন যোগী খুব কম পাওয়া যাইবে।

পেশোয়ার, লাহোর, অমৃতসহর, আম্বালা, রোটাস, কিরাণা, কাথিওয়াবাড় প্রভৃতি অঞ্চলে এখনও নাথযোগীদের বেশ প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে। বেরারে অনেক নাথযোগীর বাস। ইহাদের অধিকাংশই গৃহী, তাঁহাদের সংযোগী বলে।

(১) Social Reformer. June 2, 1934

দাক্ষিণাত্যের নাসিকে যে সব নাথযোগী বাস করেন তাঁহারা ধরম নাথ বা ধর্ম্ম নাথকে গুরু বলিয়া গ্রহণ করেন। কচ্ছদেশীয় ইতিকথায় দেখা যায় সেখানকার নাথেরা খুব পরাক্রান্ত ছিলেন। প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে পশ্চিম কোটেশ্বর এবং পূর্ব্বাঞ্চলের আজপালে ইঁহাদের প্রসিদ্ধ আখড়া ছিল। জুনাগড়ের এক দল নাথসন্ন্যাসী ইঁহাদের এই আখড়া ছিনাইয়া লইয়াছিলেন। ধিনোধরের যোগীরা তথাকার পাহাড়ের নিম্নে সুরক্ষিত মঠে বাস করেন। মঠের আশে-পাশে ইঁহাদেব থাকিবার স্থানও আছে।

আদিতে নাথযোগীরা শৈব ছিলেন। ইঁহারা যোগের সহজ মতে উপাসনা করেন। গোরক্ষপন্থীরা হঠযোগের মতে উপাসনা করেন। নাথযোগীদের শিব গোত্র। ইঁহারা দশাশৌচ পালন করেন। মৃতদেহ যোগাসনে বসাইয়া মুখাগ্নি করতঃ সমাধিস্থ করেন। নাথযোগীদের মধ্যে কয়েকটি গোত্র দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—কশ্যপ, মীন, সত্য, গোরক্ষ, আই, আদিভৈরব, বীর। সাধারণতঃ নাথেরা আপনাদিগকে ঐ সর্ব গোত্রের বলিয়া পরিচয় দেন। বটুক গোত্রের নাথ জুনাগড়ে আছে। বাঙ্গালা দেশের নাথদের মধ্যে প্রায় সবই কশ্যপ বা আই গোত্রের। "বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব ক্রমশঃ লুপ্ত হইলেও এখনও বঙ্গদেশে নাথ উপাধিধারী যোগিজাতি তাঁহাদের স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছেন। নাথধর্ম্মের জীবনীশক্তির ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম প্রমাণ" (নাথপন্থ—১৫ পৃঃ)।

আসাম-বাঙ্গালা (পাকিস্থান সহ) ভিন্ন ভারতের অন্যান্য প্রদেশের নাথযোগী-দের সামাজিক সম্মান এখনও ব্রাহ্মণদের সমকক্ষ। কোথাও কোথাও ইঁহাদের সম্মান ব্রাহ্মণদের সামাজিক সম্মানের অনেক উচ্চে। জনসাধারণ ইঁহাদের এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলিয়া সম্মান করেন এবং মাননীয় নাথযোগিগণকে ইঁহারা নাথজী, নাথ-মহারাজজী, মোহান্তজী, মোহান্ত মহারাজজী, নাথবাবা প্রভৃতি সম্মান-সূচক সম্বোধন করিয়া থাকেন। ডক্টর শ্রীকল্যাণী মল্লিক, এম, এ ; পি, এইচ, ডি, বলেন—"একদা এই প্রবল পরাক্রান্ত যোগিজাতি বঙ্গদেশে ও পূর্ব্বভারতে প্রভুত্ব

করিয়া গিয়াছেন। ইঁহারা রাজাদের গুরু ছিলেন। * * * পূর্ব্বভারত ব্যতীত পশ্চিমভারতেও নাথধর্ম্মের যথেষ্ট বিস্তার ও প্রতিপত্তি হইয়াছিল” (নাথপন্থ)।

বল্লালী-অত্যাচারে আসাম-বাঙ্গালার যোগিজাতির অবস্থা শোচনীয়; কিন্তু সাধারণভাবে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের নাথদের বর্ত্তমান অবস্থাও সন্তোষজনক নহে। সমাজের অধিকাংশ লোক নিরক্ষর ও দরিদ্র হওয়ায় এবং ইঁহারা বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়ায় প্রত্যেক প্রদেশের যোগিজাতি দুর্ব্বলতাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। শিক্ষা, দীক্ষা, আচার, ব্যবহার, রীতিনীতিতে তাঁহারা দিন দিন বল্লালী-অত্যাচারে উৎপীড়িত আসাম-বঙ্গের যোগিজাতির ন্যায় হীন হইয়া পড়িতেছেন এবং ক্রমশঃ যোগিজনোচিত আচার ব্যবহার হইতে স্খলিত হওয়ায় ইঁহাদের অনেকের গুরুতা ব্যবসায় ব্রাহ্মণদের করতলগত হইতেছে।

এই দরিদ্র দুর্ব্বল নিরক্ষর সমাজকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া সমবেতভাবে আধ্যাত্মিক আত্মোন্নতির ও সমাজোন্নতির প্রচেষ্টা করা শুধু প্রয়োজনীয় নহে, একান্ত অপরিহার্য্য। বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন প্রদেশে এই আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে, ইহাও নিঃসন্দেহে আনন্দের বিষয়। জাতির মধ্যে একতা, সদ্ভাব ও প্রীতি স্থাপনের জন্য এলাহাবাদ হইতে ‘যোগেন্দ্র’ নামক মাসিক একটি হিন্দী পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে। শ্রীমোহননাথ শর্ম্মা ইহার সম্পাদক ও শ্রীজয়নাথ যোগেশ্বর ইহার সঞ্চালক। বিহারপ্রান্তীয় গোস্বামীসভার প্রতিষ্ঠা করিয়া বিহার ও ইহার প্রতিবেশী অঞ্চলের যোগিজাতি আত্মোন্নতি ও সমাজোন্নতির চেষ্টা করিতেছেন। মধ্যপ্রদেশের যোগিজাতি সংযুক্ত প্রান্তীয় বাধা (ব্রাহ্মণ) মহাসভা প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বজাতি-হিতকর কার্য্য করিতেছেন। ইঁহাদের চেষ্টায় অখিল ভারতীয় যোগেশ্বর মহাসভার প্রতিষ্ঠাও হইয়াছে। কিন্তু অখিল ভারতীয় যোগেশ্বর মহাসভার কার্য্য খুব মন্থরগতিতে চলিতেছে বলিয়া মনে হয়। ইহার কর্ত্তৃপক্ষ জাতিগঠনে প্রত্যেক প্রদেশের তীক্ষ্নদৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া কার্য্যকরী পন্থা অবলম্বন করিবেন বলিয়া আমরা আশা করি, অন্যথায় ভারতের

বিভিন্ন প্রদেশের যোগিজাতির মধ্যে আসাম-বঙ্গের বল্লালী-অত্যাচারের শোচনীয় অবস্থা ঘটিবার আশঙ্কা কম নহে।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের নাথযোগিগণের মুখপাত্রগণ আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনী ও ইহার মুখপত্র যোগিসখার সংবাদ অবগত হইয়া সানন্দে আমাদের সহিত জাতিগঠন সম্বন্ধীয় ব্যাপারে সহযোগিতা করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন এবং ভারতের যোগি-জনসাধারণকে একটি সঙ্ঘের পতাকাতলে সমবেত করিয়া সঙ্ঘবদ্ধভাবে কার্য্য করার প্রয়োজনীয়তাও স্বীকার করিয়া এ সম্বন্ধে যাবতীয় বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন করারও প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। আমেদাবাদের মোহান্ত শ্রীধনসুখ নাথ মহাশয় আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনীর সাধারণ সম্পাদক শ্রীপ্রমথনাথ নাথ, বি-এ মহাশয়ের নিকট ৮।১২।৪৫ তারিখে লিখিয়াছিলেন—"* * * অখিল ভারত নাথযোগি-সম্মেলন প্রতিষ্ঠার যে প্রস্তাব আপনি করিয়াছেন, তাহাতে আমার পূর্ণ সহানুভূতি আছে। জাতির উন্নতিবিধায়ক এইরূপ প্রতিষ্ঠানের কার্য্যে আমি সর্ব্বান্তঃকরণে সহায়তা ও সহযোগিতা প্রদর্শন করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছি। * * * আমি আহমেদাবাদের মানেক নাথ গদির মোহান্ত। আহমেদাবাদে আমার প্রচুর ভূসম্পত্তি আছে। আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মোহান্ত শ্রীমনসুখ নাথজী কাথিয়াবাড়ের অন্তর্গত জুনাগড় ষ্টেটের একজন জায়গীরদার। আমার জনৈক আত্মীয় মহামান্য যোধপুর মহারাজের রাজগুরুপদে অধিষ্ঠিত আছেন। তিনি যোধপুর সিটির অন্তর্গত মহামন্দির সিটির জায়গীরদার।"

বিহারের ডোমচাঁদ হইতে পণ্ডিত জগন্নাথ গোস্বামী শ্রদ্ধেয় প্রমথবাবুকে ১৫।৪।৪৭ তারিখে লিখিয়াছিলেন—"* * * শুনিয়াছি রাজগুরু যোগিবংশ গ্রন্থে আমাদের জাতির উৎপত্তি বিষয়ক বিবরণ আছে। আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক শীঘ্র এই গ্রন্থ পাঠাইয়া দিবেন।" * * * তিনি আবার লিখিয়াছিলেন—"প্রয়োজনের সময় আপনার প্রেরিত রাজগুরু যোগিবংশ পাইয়া খুব উপকৃত হইয়াছি।"

শ্রীধনসুখ নাথ কাথিয়াবাড় হইতে ৩০।৫।৪৭ তারিখে আবার শ্রদ্ধেয় প্রমথবাবুকে লিখিয়াছিলেন—"যোগেন্দ্র পরিচালনে আপনাদের সহযোগিতা চাই। * * * 'যোগেন্দ্র' পত্রিকার প্রকাশ করার জন্য রাজগুরু যোগিবংশ গ্রন্থের হিন্দী অনুবাদ করিয়াছিলাম। * * * আমরা এই গ্রন্থের হিন্দী অনুবাদ প্রকাশ করিতে চাই। আপনি গ্রন্থকারের অনুমতি সংগ্রহ করিয়া দিবেন। এই গ্রন্থও একখানি পাঠাইবেন।" (ইংরাজী ভাষায় লিখিত পত্রের সংক্ষিপ্ত মর্ম্মানুবাদ)।

বিগত ১৯।৩।৫৩ তারিখে আহম্মদাবাদ হইতে মোহান্ত ধনসুখ নাথজী প্রমথবাবুকে যে পত্র দিয়াছেন তাহাতে তিনি বাঙ্গালাদেশের সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত পরিবারবর্গের এক তালিকা চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। উক্ত তালিকা তাঁহার নিকট যথাসময়ে প্রেরিত হইয়াছে। তাঁহার বিবাহযোগ্য পুত্র ও কন্যা দুইই আছে। বাঙ্গালাদেশে পুত্রকন্যার বিবাহ দিয়া এই দেশের যোগিগণের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন তাঁহার অন্তরের বাসনা বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ভিন্ন ভাষাভাষীদের মধ্যে ব্যাপকভাবে বৈবাহিক আদানপ্রদান সহজ ও সম্ভবপর নহে।

দেশবিভাগের ফলে বঙ্গদেশ দ্বিধাবিভক্ত হইয়াছে। স্বজাতিবহুল জিলাসমূহ—ঢাকা, বরিশাল, নোয়াখালি, ময়মনসিং, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা এক্ষণে পূর্ব্বপাকিস্তানের অন্তর্গত। উত্তরবঙ্গের জিলাসমূহের অধিকাংশই পূর্ব্বপাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত; সুতরাং ঐ সকল জিলার যোগিজাতি বর্ত্তমানে ভিন্ন দেশের অধিবাসী। আমরা উহাদের সহিত মিলন-সূত্র অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করিলেও কালে তাহাদের সহিত আমাদের বিচ্ছেদ ঘটিবেই। একান্ত আপন জন হইয়াও তাহারা অনাত্মীয় হইয়া পড়িবে। শিক্ষা, সংস্কৃতি, ভাষা ও রাষ্ট্রীয় অধিকার বিভিন্ন হইলে, তাহাদের সহিত আমাদের ঘনিষ্টতা ক্রমশঃই লোপ পাইবে। উহাদের সহিত অবাধ মেলা-মেশার সুযোগ সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছে—বৈবাহিক আদানপ্রদানও বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে; সুতরাং সমাজদেহের যে একটা মোটা অংশ ভবিষ্যতে ছিন্ন হইয়া পড়িবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীহট্ট জিলার অনেক স্বজাতি ভাইকেও আমরা এইরূপে হারাইব। আসামের সহিত সংযোগসূত্রও যেন শিথিল হইয়া পড়িতেছে। প্রচার ও আন্দোলনের অভাবই ইহার প্রধান কারণ। অবাধ গমনাগমনের অসুবিধাহেতু প্রচার ও আন্দোলন ব্যাহত হইয়াছে। তা'ছাড়া স্বাধীন ভারতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের অধিবাসীদের মধ্যে মিলনস্পৃহা ও সম্প্রীতির ভাবটাও যেন আগের চেয়ে মন্দীভূত হইয়া পড়িয়াছে।

উপরোক্ত বাধা ও অন্তরায় সত্বেও আমাদিগকে বৃহত্তর যোগিসমাজ গঠনোদ্দেশ্যে ভারত ইউনিয়নের বিভিন্ন রাষ্ট্রের যোগিগণের সহিত সংযোগসূত্র প্রতিষ্ঠার ও ঘনিষ্ঠতা স্থাপনের চেষ্টা করিতে হইবে। অখিল-ভারত নাথ-সম্মেলন —এইরূপ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া সর্ব্বভারতীয় আন্দোলন চালাইতে হইবে। কিন্তু ভাষাভেদ আমাদের মিলনপথে প্রবল বাধারূপে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বলা-বাহুল্য হিন্দী রাষ্ট্রভাষা ও সর্ব্বভারতীয় ভাষারূপে পরিগণিত হইলে এই বাধা অপসারিত হইবে। দুঃখের বিষয়, ভারত ইউনিয়নের অন্যান্য রাষ্ট্রের কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি মিলনের হস্ত প্রসারিত করিলেও, ভাষার বিভিন্নতা হেতু আমরা তাঁহাদিগকে টানিয়া লইতে পারিতেছি না। সুতরাং বৃহত্তর উদ্দেশ্য সাধনমানসে হিন্দী আমাদের একান্ত শিক্ষণীয়।

ব্যক্তি বা সমাজের উন্নতির দুইটি দিক আছে, যথা, (১) বাহ্য উন্নতি এবং (২) আভ্যন্তর উন্নতি। সকল প্রকারের কার্য্যকরী শিক্ষালাভ এবং ভোগসুখ-স্বাচ্ছন্দ্যাদি সম্বন্ধীয় উন্নতিই বাহ্য উন্নতি এবং ধর্ম্ম, সত্য, ত্যাগ, সংযম, পরার্থপরতা প্রভৃতি বিষয়ক উন্নতিই হইল আভ্যন্তর উন্নতি। মুষ্টিমেয় ত্যাগী, সংযমী, সংসার-যাতনা-মুক্ত, নিবৃত্তিপন্থী, অসাধারণ ব্যক্তি বাহ্য উন্নতিকে উপেক্ষা করিয়া আভ্যন্তর উন্নতিসাধনে সমর্থ হইলেও সাধারণ নরনারী এবং তাঁহাদের সমষ্টিস্বরূপ জাতির পক্ষে উহা অসম্ভব বলিতেই হইবে। সমাজের সাধারণ নরনারী অভাব-অনটনের প্রেরণায় এবং আত্মরক্ষার তাড়নায় বাহ্য উন্নতির

দিকে ধাবিত হইতে বাধ্য হয়। এজন্য তাহারা আভ্যন্তর উন্নতিসাধনে অক্ষম। কিন্তু আভ্যন্তর উন্নতি অগ্রাহ্য করিয়া যে সব সমাজ বাহ্য উন্নতিলাভ করিয়াছে তাহাদের শান্তির পথেও নানাবিধ বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হইতে দেখা গিয়াছে। এ সব কারণে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে সংসারী যোগিগণের পক্ষে সকল সমস্যার সমাধান এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বাহ্য ও আভ্যন্তর উভয়বিধ উন্নতিসাধনের চেষ্টা করা শুধু প্রয়োজনীয় নহে—একান্ত অপরিহার্য্য।

এ সম্বন্ধে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ নাথ, এম-এ বিদ্যাবাচস্পতি মহোদয় বলেন,—

"আমাদের জাতীয় ঐতিহ্য গৌরবময় হইলেও আমরা যদি অযোগ্য হই, কেবল ঐতিহ্যই আমাদিগকে গৌরবমণ্ডিত করিতে পারিবে না। আত্মোন্নতির চেষ্টায় তাহা আমাদিগকে প্রেরণা যোগাইতে পারে মাত্র, উৎসাহ দান করিতে পারে মাত্র। গৌরবময় ঐতিহ্যকে স্মৃতিপথে জাগ্রত রাখিয়া সেই ঐতিহ্যের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী যদি আমরা হইতে না পারি, তাহা হইলে ঐতিহ্যের দোহাই দিয়া পূর্ব্বপুরুষের মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মৌখিক দাবী হইবে বিড়ম্বনা মাত্র। আমাদের ঐতিহ্যের মূল স্তম্ভটী ছিল, একটি সরস সজীব পুষ্পিতফলিত কল্পতরুবিশেষ—তাহা ছিল আধ্যাত্মিকতার কল্পতরু। সেই কল্পতরুকে আশ্রয় করিয়া, সেই কল্পতরুর মধুময় রসে পরিসিঞ্চিত ও পরিপুষ্ট হইয়াই আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, আচার ব্যবহারাদিরূপ লতিকা মনোরম চাকচিক্য ধারণ করিয়াছিল; পুষ্পে ফলে পরিশোভিত হইয়া অখণ্ড ভারতের এবং ভারতের বাহিরেরও অনেক স্থানের সতৃষ্ণ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। লতিকার সঞ্জীবনী শক্তির উৎস সেই কল্পতরুকে বাদ দিয়া কল্পতরুতে বেষ্টিত লতিকার অনুকরণে কোনও লতিকা দ্বারা যদি আমরা আমাদিগকে সজ্জিত করিতে চাই, তবে তাহা হইবে প্রাণহীন দেহের মতন নিরর্থক আত্মপ্রবঞ্চনা মাত্র।"

আসাম-বাঙ্গালার (পূর্ব্বপাকিস্তানসহ) যোগিজাতির মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস

বাঙ্গালা দেশে (পূর্ব্বপাকিস্তানসহ) যোগিজাতির আগমন সম্ভবতঃ তৃতীয় খ্রীষ্টাব্দে।

প্রতিষ্ঠালাভ সম্ভবতঃ ৪র্থ হইতে ১১৫৮ খৃঃ অব্দ।

বল্লালী-অত্যাচারকাল— ১১৫৯ হইতে ১১৮৫ খৃঃ অব্দ।

অধঃপতনকাল— ১১৫৯ হইতে ১৮৭৫ খৃঃ অব্দ।

আসামে যোগিজাতির আগমন— ১১৫৯ হইতে ১১৮৫ খৃঃ অব্দ।

পুনরুত্থানের সূচনা— ১৮৭৬ খৃঃ অব্দ।

বঙ্গদেশীয় যোগিজাতির সামাজিক সংস্থান, পুরুষানুক্রমিক রীতিনীতি, ক্রিয়াকলাপ, প্রচলিত কিম্বদন্তী প্রভৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক বুকানন সাহেব বলেন—"যে বংশে রাজা গোপীচন্দ্র (গোবিন্দচন্দ্র) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই বংশীয় বঙ্গেশ্বরগণের রাজত্বকালে এই যোগী সম্প্রদায় সম্ভবতঃ তাঁহাদের পৌরোহিত্যে নিযুক্ত ছিলেন। ইঁহারা পালবংশীয় বৌদ্ধরাজগণের সহিত পশ্চিমভারতবর্ষ হইতে বঙ্গদেশে আসিয়া বাস করেন" (বিশ্বকোষ—১৬শ ভাগ, যু-রোচ্য)। বিদেশীয় প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক হ্যামিল্টন সাহেব বলেন—"পালরাজারা ৮ম হইতে ১০ম খৃষ্টীয় শতাব্দী পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইঁহারা যোগিজাতিকে খুবই শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। ইহাই অত্যন্ত সম্ভবপর যে এই পালরাজগণের রাজত্বকালে সাধারণে যুগী নামে কথিত যোগিজাতি বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। নাথেরা শৈবযোগীদের বংশধর এবং ইঁহারা সম্ভবতঃ শৈবধর্ম্মপ্রধান বারাণসীর নিকট হইতে বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন। ইহা একান্ত সম্ভবপর যে এই জাতি স্বেচ্ছাচারী রাজার কোপানলে পড়িয়া হিন্দুসমাজে নির্ব্বাসন লাভ করিয়াছিলেন

(Ethnological report on Yogi cast of Chittagong by Mr. Hamilton in 1901)। খ্যাতনামা বিদেশীয় ঐতিহাসিক গ্রীয়ার্সন সাহেব বলেন, "গোরক্ষ নাথ ও তাঁহার সম্প্রদায়স্থ যোগিগণ পশ্চিম ভারতবর্ষ হইতে বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন। মাণিকচন্দ্র রাজার সময় ইঁহারা শৈবলক্ষণাক্রান্ত ছিলেন" (মাণিকচন্দ্র রাজার গান)। আমরা ২য় অধ্যায়ে দেখাইয়াছি যে নাথেরাই শৈবধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। তাহা হইলে শৈবধর্ম্ম-প্রধান বারাণসীর বা তন্নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে যোগিজাতি বঙ্গদেশে এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন বলিয়াই মনে হয়।

এখন দেখা যাউক যোগিজাতি কোন সময়ে সর্ব্বপ্রথম বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন। বুকানন সাহেব বলিয়াছেন পালবংশীয় রাজাদের সময় (৮ম হইতে ১০ খৃঃ অব্দ) যোগিজাতি বঙ্গদেশে আসিয়াছেন। এ কথা দ্বারা তিনি যদি ইহাই বুঝাইতে চাহেন যে এ সময় যোগিজাতি সর্ব্বপ্রথম বঙ্গদেশে আসিয়াছেন, তাহা হইলে তাঁহার উক্তি আমরা বিচারসহ বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। কারণ আমরা ৫ম অধ্যায়ে দেখাইয়াছি যে নাথেরা ও বৌদ্ধেরাই বাঙ্গালা ভাষার জনক, এবং বাঙ্গালারূপের উদ্ভবকাল ৫ম খৃঃ অব্দ। নাথসিদ্ধা মীন নাথ বাঙ্গালা ভাষার আদি লেখক এ সম্বন্ধে মতভেদ নাই। তাহা হইলে মীন নাথ ও তাঁহার সম্প্রদায়ের লোকেরা ৪র্থ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বেই বা ৪র্থ খৃঃ অব্দে সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালাদেশে শুভ পদার্পণ করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকা বাঞ্ছনীয় নহে। অবশ্য ইহার পরেও যোগিজাতি বাহির হইতে দলে দলে বাঙ্গালাদেশে আসিয়াছিলেন।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু বলেন— "বৌদ্ধপ্রভাবের সময়ও এ যোগী সম্প্রদায়ের প্রাধান্য লোপ হয় নাই। * * * রাজা গোপীচন্দ্র, মাণিকচন্দ্র প্রভৃতি রাজগণপ্রসঙ্গে যোগিগুরু হইতে দীক্ষাপ্রাপ্তির প্রমাণ পাওয়া যায়। বৌদ্ধ-প্রাধান্যের সময়ে সম্ভবতঃ বঙ্গবাসী যোগিগণের আচারহীনতার সূত্রপাত হয়। অথবা বৌদ্ধপ্রাধান্যের হ্রাস ও হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় ঘটিলে বৌদ্ধবিদ্বে

হিন্দুগণ কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাকল্পে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের সম্মান বৃদ্ধি এবং নাথ-গুরুগণের সম্ভ্রম বিনষ্ট হয়" (বিশ্বকোষ—১৬শ ভাগ, যু-রোচ্য)।

যোগিজাতি বঙ্গদেশে দীর্ঘকাল প্রভুত্ব করার পর (৪র্থ খৃঃ অব্দ হইতে ১১৫৮ খৃঃ অব্দ) রাজা বাল্লাল সেনের অত্যাচারে (১১৫৯—১১৮৫ খৃঃ অব্দ) এই জাতির অধঃপতন আরম্ভ হয়। লক্ষ্মণ সেনের আমলে (১১৮৫—১২০৬ খৃঃ অব্দ) মুসলমানেরা বাঙ্গালাদেশের একাংশ অধিকার করেন। মুসলমানরাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় একটু লাভ হইল এই যে তথাকথিত উন্নত ও উচ্চহিন্দুরা তথাকথিত অনুন্নত ও নিম্নহিন্দুদের উপর যথেষ্ট জুলুম করিতে পারে নাই। বাল্লালের অত্যাচারে উৎপীড়িত নাথেরা মুসলমানদের সহিত সখ্যতা স্থাপন করিয়া আত্মরক্ষার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। সেই জন্যই দেখা যায় মুসলমানদের অনেক ধর্ম্মমন্দির নাথ কর্ত্তৃক সংস্কৃত হইয়াছে। পাণ্ডুয়ার কয়েকটি ধ্বংসপ্রাপ্ত মস্‌জিদ লালকালোয়ার নাথ পুনঃ সংস্কার করাইয়া দিয়াছিলেন (Asiatic Researches Vol. 39. Page 302)।

বল্লাল সেনের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া বঙ্গীয় শৈবনাথেরা অনেকে বঙ্গদেশ ত্যাগ করেন, এবং অবশিষ্ট অনেকে ছদ্মবেশে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেন। ফলে বাঙ্গালার শৈবধর্ম্ম লুপ্তপ্রায় হইয়া দাঁড়াইল এবং প্রেমাবতার গৌরাঙ্গ-সুন্দরের প্রেমের বন্যায় বাঙ্গালাদেশে বৈষ্ণবপ্রাধান্য স্থাপিত হইতে লাগিল।

আমরা বল্লালচরিতের বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি যে স্বেচ্ছাচারী রাজসিংহ বল্লালই এই জাতির সর্ব্বনাশসাধন করিয়াছেন, এবং এই জাতির আচার্য্যদের শাপে বল্লাল সেনেরও সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়াছে।

"কস্মিংশ্চিৎকালে পদ্মাক্ষী বল্লালদয়িতা পুরা।
শঙ্করং পূজিতং তত্র৹ মহাস্থানমুপাগতা ॥ ১

কোনও সময়ে বল্লাল-দয়িতা পদ্মাক্ষী শঙ্করের পূজার নিমিত্ত সেই মহাস্থানে উপস্থিত হইলেন। স্বর্ণ-রৌপ্য নিৰ্ম্মিত বহুবিধ দ্রব্য, শঙ্করের জন্য আত-পত্র,

গৃহীত্বা বহুদ্রব্যানি হৈমানি রজতানি চ।
আতপত্রঞ্চ দেবস্য দেব্যাশ্চ কর্ণপালিকাম্॥ ২
প্রালম্বিকাঞ্চ কটকং কিরীটং কণ্ঠভূষণম্।
অঙ্গদং কঙ্কণং সারশনঞ্চ নূপুরাদিকম্॥ ৩
বস্ত্রাণি চ মহার্হাণি পতাকাঞ্চ ধ্বজানি চ।
যজ্ঞ-সূত্রাণি গন্ধানি নানোপকরণানি চ॥ ৪
অর্চ্চয়ামাস দেবং সা দেবীং চস পুরোহিতঃ।
নৈবেদ্যৈ স্তৈরলঙ্কারৈশ্ছত্রেণ চ পরং মুদা॥ ৫
পূজয়িত্বা গতাদেবী সারুহ্য হয়নং বরম্।
পুরোহিতঃ স্থিতস্তত্র দ্রব্যানামংশকাঙ্ক্ষয়া॥ ৬
স মহান্তং ধর্ম্মগিরিং বলদেব উবাচ হ।
ভবস্ত দেহি মে ভাগং মৎপ্রাপ্যমচিরেণ ভোঃ॥ ৭
তচ্ছ্রুত্বা তদ্বচঃ স্থানাধিপং স প্রত্যুবাচ তম্।
অদদাম ন কস্মৈচিৎ ভাগমেব কদাচন। ৮
অতো ন দদ্যাম্ ভবতে গচ্ছ গচ্ছ গৃহং ব্রজ।
ইত্থং তাভ্যামভূত্তত্র বাক্পারুষ্যং কিয়ৎক্ষণম্॥ ৯

শঙ্করীর জন্য কর্ণপালিকা, প্রালম্বিকা, কটক, কিরীট, কণ্ঠভূষণ, অঙ্গদ, কঙ্কণ, সারশন, নূপুরাদি বহুমূল্য বস্ত্র, ধ্বজ পতাকা, যজ্ঞসূত্র ও গন্ধাদি বিবিধ উপকরণ দ্বারা পদ্মাক্ষী শঙ্করের পূজা করিলেন এবং রাজপুরোহিত দেবীর পূজা করিলেন। ছত্রালঙ্কারাদি বিবিধ উপহার দ্বারা পূজা সমাপন করিয়া দেবী পদ্মাক্ষী যানারোহণে চলিয়া গেলেন, কিন্তু পূজোপকরণাদির অংশলাভের আশায় রাজপুরোহিত সেই স্থানে অবস্থান করিলেন। ১-৬

রাজপুরোহিত বলদেব মহানুভব ধর্ম্মগিরিকে বলিলেন, "আমার প্রাপ্য অংশ আমাকে শীঘ্র প্রদান করুন।" এই কথা শুনিয়া মন্দিরাধ্যক্ষ বলিলেন, "আমি কোনও সময়ে কাহাকেও ভাগ দেই নাই; সুতরাং তোমাকেও দিব না। যাও,

বলদেবস্ততঃ ক্রুদ্ধো দেবলেশং শশাপহ।
নিপতধ্বমরেঃ মূঢ় ন তে ভদ্রং ভবিষ্যতি। ১০
শ্রুত্বা তদ্দেবলেশস্তং ক্রোধম্লেচ্ছাননাননঃ।
বলদেবং গণ্ডদেশে চপটেন ব্যতীতড়ৎ॥ ১১
আদিশৎ ব্যায়তান্ শিষ্যান্ এষোপসার্য্য তামিতি।
ততস্তে পুরুষাশ্চক্রুঃ গুরোরাজ্ঞাপ্রপালনম্।
বলদেবস্ততোঽগচ্ছদ্দ্রুতন্নৃপতি সন্নিধিম্॥ ১২
আদ্যোপান্তং যথাবৃত্তং নৃপে সর্ব্বমচীকথৎ।
পার্ষদা ব্রাহ্মণাশ্চাপিচক্রুস্তস্য সমর্থনম্॥ ১৩
বলদেবস্য বাক্যস্য প্রোচুশ্চ দণ্ড্যতাং গিরেঃ।
এবং বিজ্ঞায় রাজাসাবপমানং পুরোধসঃ।
মন্যুনা স প্রজজ্বাল বহ্নিনা পটলং যথা॥ ১৪
নির্ব্বাস্যতাং ধর্ম্মগিরি রাষ্ট্রাম্মেস্বগণৈঃ সহ।
ইতি রাজা রুদ্রানাগমন্বশাৎ দণ্ডনীয়কম্॥ ১৫

যাও তুমি গৃহে চলিয়া যাও।” এইরূপে সেই স্থানে উভয়ের মধ্যে কিয়ৎক্ষণ বাগ্‌বিতণ্ডা চলিতে লাগিল। অতঃপর বলদেব ক্রুদ্ধ হইয়া ধর্ম্মগিরিকে এই বলিয়া অভিসম্পাত দিলেন :—“রে মূঢ়, তোর সর্ব্বনাশ হইবে, তোর মঙ্গল হইবে না।” ৭—১০

ইহা শুনিয়া ক্রোধে দেবলেশ ধর্ম্মগিরির বদন ম্লেচ্ছের বদনের ন্যায় হইল। তিনি বলদেবের গণ্ডদেশে চপটাঘাত করিলেন এবং তাহাকে ঐ স্থান হইতে অপসারিত করিয়া দিবার নিমিত্ত বলবান্ শিষ্যদিগকে আদেশ করিলেন। শিষ্যগণও গুরুর আদেশ প্রতিপালন করিল। তারপর বলদেব সেই স্থান হইতে দ্রুতবেগে বল্লালরাজ-সমীপে গমন করিয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ জ্ঞাপন করিলেন; পার্ষদ ব্রাহ্মণগণও বলদেবের বাক্যের সমর্থন করিয়া গিরিকে দণ্ড-বিধান করিবার জন্য বলিলেন। তখন রাজা স্বীয় পুরোহিতের অপমানের বিষয়

নিধিগুর্ণানাং স্বজনৈকবন্ধুঃ
সত্য বিধাতুর্দ্বিজবর্য্যবাক্যম্।
চকার রাষ্ট্রাৎ স বহিষ্কৃতং তং
গণেন সার্দ্ধং কিল রাজসিংহঃ॥ ১৬

(বল্লাল-চরিত, ৭ম অধ্যায়।)

বল্লাল-চরিতের উত্তরখণ্ডে বল্লাল কর্ত্তৃক যোগিজাতি ও সুবর্ণ বণিক জাতির অধঃপতন নিম্নরূপ বর্ণিত আছে—

"সুবর্ণ-বণিজো রাজ্যে দুঃশীলা ধনগর্ব্বিতাঃ।
কুর্ব্বন্তি স্ম দ্বিজাতীনাং রাজ্ঞশ্চ মানলাঘবম্॥ ৭
ততঃ সংক্রুদ্ধো মতিমান্ দুর্ব্বৃত্তদমনোত্তমঃ।
বভূব যত্নবান্স্তেষাং শাসনায় নৃপোত্তমঃ॥ ৮
সুবর্ণবণিজাং স্বামী বল্লভানন্দনামকঃ।
আসীদ্দুষ্টো ধন-শ্রেষ্ঠো রাজদ্রোহী চ গর্ব্বিতঃ॥ ৯

অবগত হইয়া অগ্নিসংযোগে শুষ্ক তৃণের ন্যায় ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়া দণ্ডনায়ক রুদ্রনাগকে আদেশ করিলেন, "স্বগণসহ ধর্ম্মগিরিকে আমার রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দাও।" ১০—১৫

স্বজনৈক-বন্ধু গুণনিধি রাজ-সিংহ বল্লাল স্বগণসহ ধর্ম্মগিরিকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। ১৬

(অধ্যক্ষ রাধাগোবিন্দ নাথ, এম, এ, কৃত অনুবাদ)

বল্লাল সেনের রাজ্যে দুষ্ট-স্বভাব সুবর্ণ-বণিকেরা ধনহেতু অহঙ্কৃত হইয়া ব্রাহ্মণ-গণের ও রাজার মানহানি করিতে লাগিল। ৭। তাহাতে দুষ্টদমন-নিপুণ বুদ্ধিমান নৃপবর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগের শাসনের জন্য যত্নবান হইলেন। ৮। বল্লভানন্দ নামে সুবর্ণ-বণিকদিগের এক দুষ্টস্বভাব অধিপতি অত্যন্ত ধনী হওয়াতে গর্ব্বিত হইয়া রাজদ্রোহী হইয়াছিল। ৯। তাহাতে বল্লাল রাজা

তৎসকাশং ততো দূতো রাজ্ঞা তেন চ প্রেষিতঃ।
শাসন-পত্র-দানেন বশীকরণমিচ্ছতা ॥ ১০
এতস্মিন্নন্তরে কালে রাজ্যে দ্বিজাতিভিঃ সহ।
বভূব বৈরভাবশ্চ যোগিনাং রাজ্যবাসিনাং ॥ ১১
অথ শিবচতুর্দ্দশ্যাং নিশীথে শঙ্করস্য চ।
জটেশ্বরস্য পূজার্থং বহুলোকাঃ সমাগতাঃ ॥ ১২
বলদেব ভট্ট নামা রাজ-পুরোহিত স্তদা।
কাম্যপূজন-কর্ম্মার্থং রাজ্ঞোঽসৌ সমুপস্থিতঃ ॥ ১৩
বহু রত্নানি বৈ দৃষ্ট্বা যোগিরাজ উবাচ তম্।
যদ্ যদ্ দ্রব্যাণি অত্রৈব উপস্থিতানি পূজনে।
রাজ্ঞো বা অপরেষাং বা নিত্যকাম্যব্রতাদিষু।
যোগিভোগ্যানি পূজান্তে নান্যেষামধিকারিতা ॥ ১৪।১৫

শাসনপত্র দ্বারা তাহাকে বশীভূত করিতে ইচ্ছা করিয়া তাহার নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। ১০

এই সময়ের মধ্যে (বল্লাল সেনের) রাজ্যে ব্রাহ্মণদিগের সহিত রাজ্যস্থ যোগিজাতীয় ব্যক্তিগণের শত্রুতা জন্মিয়াছিল। ১১। একদা শিবচতুর্দ্দশী তিথিতে দ্বিতীয় প্রহর রাত্রির সময়ে জটেশ্বর মহাদেবের পূজার জন্য অনেক লোক আগমন করিয়াছিল। ১২। ঐ সময়ে বলদেব ভট্ট নামক রাজার পুরোহিত রাজার কাম্যপূজাদানের জন্য উপস্থিত হইয়াছিল। ১৩। (তাঁহার নিকট) অনেক রত্ন দেখিয়া যোগিরাজ তাঁহাকে বলিলেন—"এই স্থানে রাজা বা অপর কোন লোকের নিত্য (প্রত্যহ করণীয়), কাম্য (স্বেচ্ছাপূর্ব্বক করণীয়), অথবা ব্রত প্রভৃতিতে করণীয় পূজার জন্য যে যে দ্রব্য উপস্থিত করা হইয়াছে, ১৪। পূজা শেষ হইলে সেইগুলি যোগীদিগেরই প্রাপ্য হইবে; অন্য কাহারও (ঐ সকল দ্রব্যে) অধিকার নাই"। ১৫। ইহা শুনিয়া বলদেব রুক্ষভাষায় তাঁহাকে বলিলেন, হে যোগিরাজ, পরের দ্রব্য ও সম্পত্তি প্রভৃতিতে লোভ করিও না।

এতচ্ছ্রুত্বা বলদেবঃ প্রোবাচ তীক্ষ্ণভাষয়া।
লোভঃ মা কুরু যোগীশ পরদ্রব্যধনাদিষু ॥ ১৬
আরক্তচক্ষুর্যোগীন্দ্রশ্চকার বাক্যপীড়িতঃ।
সবলেন বলদেবং তৎসকাশাদ্বহিষ্কৃতম্ ॥ ১৭
বলদেব-স্তুতোঽগচ্ছৎ সংক্রুদ্ধ্য রাজসন্নিধৌ।
আদ্যন্তমবদৎ সর্ব্বং যথাসাববমানিতঃ ॥ ১৭
রাজ্যস্থা ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে মত্বা তদবমানিতাঃ।
অভিযোগং তত শ্চক্রু-র্যোগিনাং শাসনায় চ ॥ ১৮
এতদাকর্ণ্য স রাজা ক্রোধান্ধো ঘূর্ণলোচনঃ।
দুষ্টানাং দর্পচূর্ণায় প্রতিজ্ঞা মকরোত্তদা ॥ ২০

—সেনরাজবংশজো বল্লালঃ প্রত্যভিজানিতোঽহম্। যদি দুঃশীলান্ হিরণ্য বণিজঃ অধমজাতীয়ানাং মধ্যে ন গণয়িষ্যামি, বল্লভানন্দস্য দুরাত্মনঃ সমুচিত দণ্ডবিধানং ন করিষ্যামি, ধর্ম্মগর্ব্বিতানাং ভণ্ডযোগিনাঞ্চ উৎসাদনং ন করিষ্যামি, তদা গো-ব্রাহ্মণ-যোষিতাদি-ঘাতেন যানি পাতকানি ভবিষ্যানি, তানি মে ভবিষ্যন্তীতি। অন্ধরাজস্য শতপুত্রবিনাশায় ভীমসেনো যাদৃশীং প্রতিজ্ঞামকরোৎ এতেষাং সম্বন্ধে প্রতিজ্ঞা মে তাদৃশী জ্ঞাতব্যা। এভিঃ সহ অদ্যাবধি একাসনোপবেশনম্, এতেষাং দানাদিগ্রহণং, যজন-যাজনাদিকং, সাহায্যমাত্রং বা যে করিষ্যন্তি, তেঽপি পতিতা ভবিষ্যন্তীতি। অতএব পট্টসূত্রাদি ধারণং ব্যর্থম্।

১৬। যোগিরাজ (বলদেবের) এই বাক্যে মর্ম্মাহত হইয়া চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলদেবকে স্বয়ং বলপূর্ব্বক তাঁহার সমীপ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। ১৭। তাহাতে বলদেব রোদন করিতে করিতে রাজার নিকট গেলেন এবং যেরূপে (যোগিরাজ কর্ত্তৃক) অপমানিত হইয়াছিলেন, সেই সমস্ত বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বলিলেন। ১৮। অনন্তর রাজ্যবাসী সমস্ত ব্রাহ্মণ সেই বলদেবের অপমানে (আপনাদিগকেও) অপমানিত মনে করিয়া যোগিদিগের শাসনের জন্য (রাজার নিকট) অভিযোগ করিলেন।

পূর্ব্বস্মাৎ স মহারাজো রুদ্রজান্ ব্রাহ্মণান্ প্রতি।
দানত্যাগাদ্বীতরাগঃ স্ব-পিতৃশ্রাদ্ধবাসরে ॥ ২১
পুরোহিতস্যাপমানাৎ ক্রোধার্কঃ প্রথরোদিতঃ।
বল্লভানন্দ-সম্বন্ধাৎ প্রথমং যঃ প্রকাশিতঃ ॥ ২২
অথাসৌ রাজা বল্লালঃ ক্রোধাবেশঃ বিকম্পিতঃ।
চকার শপথং তস্যাং সভায়াং পার্ষদান্বিতঃ ॥ ২৩

তাহা শুনিয়া সেই রাজা ক্রোধে অন্ধ হইয়া চক্ষুর্দ্বয় ঘূর্ণিত করিয়া তখনই দুষ্টদিগের দর্প চূর্ণ করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিলেন। ২০। রুদ্র হইতে উৎপন্ন ব্রাহ্মণগণ (আশ্রম যোগিগণ) রাজার পিতৃশ্রাদ্ধের দিবস দান গ্রহণ করিতে স্বীকার করেন নাই বলিয়া তিনি পূর্ব্ব হইতেই তাহাদিগের উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন ২১। সুতরাং বল্লভানন্দের সম্বন্ধে (ব্যবহারে) প্রথমতঃ প্রকাশিত তাঁহার ক্রোধরূপ সূর্য্য এক্ষণে নিজপুরোহিতের অপমানে তীব্ররূপে উদিত হইল। ২২। অনন্তর বল্লাল রাজা ক্রোধাবেশ হেতু কম্পিত কলেবর হইয়া সেই সভায় সভাসদ্গণের নিকট এইরূপ শপথ করিলেন, ২৩।—"আমি সেন রাজবংশজাত বল্লাল নামে বিখ্যাত। যদি দুষ্ট সুবর্ণবণিকদিগকে অধম জাতির মধ্যে পরিগণিত না করি, দুরাত্মা বল্লভানন্দের সমুচিত দণ্ড বিধান না করি, ও ধর্ম্মাচরণ দ্বারা অহঙ্কৃত ভণ্ড যোগীদিগের বিনাশ-সম্পাদন না করি, তাহা হইলে গো, ব্রাহ্মণ ও স্ত্রী প্রভৃতি হত্যা করিলে যে সকল পাপ হইয়া থাকে, সেই সকল পাপ যেন আমার হয়।" অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্র বধ করিবার জন্য ভীমসেন যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, এই সকল জাতির বিষয়ে আমারও সেইরূপ প্রতিজ্ঞা জানিবে। অদ্য হইতে যাহারা এই সকল জাতীয় লোকদিগের সহিত এক আসনে উপবেশন, ইহাদিগের দান প্রভৃতি গ্রহণ, পূজা পৌরোহিত্য প্রভৃতি, অথবা কেবল সাহায্যও করিবে, তাহারাও পতিত হইবে।" উক্ত বল্লাল-চরিত-গ্রন্থের পরিশিষ্টাধ্যায়ে পীতাম্বর নাথের শিবোত্তর প্রাপ্তি, বল্লালের প্রতি তাহার অভিশাপ এবং বল্লালের অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ বিসর্জ্জন সম্বন্ধে নিম্নরূপ বর্ণিত আছে,—

ততো যেন প্রকারেণ বল্লালো নিধনং গতঃ।
অগ্নিদাহন-যোগেন স্বজনৈঃ সহ তচ্ছৃণু॥ ১৪
আসীত্তদ্রাজ্যমধ্যে চ নাথপীতাম্বরাখ্যকঃ।
পূর্ব্বস্মান্নরনাথেন গুরুবৎ সোঽপি পূজিতঃ॥ ১৫
ততস্তদ্রাজকন্যায়া বরলক্ষণনিশ্চয়ে।
যোগী পিতাম্বরোঽবাদীৎ বাক্‌সিদ্ধো জ্যোতিষী তথা। ১৬
এতয়োর্বরকন্যয়োর্বিবাহ-মিলনং যদি।
বিবাহবাসরে কন্যা বৈধব্যং যাস্যতি ধ্রুবম্॥ ১৭
এতচ্ছ্রুত্বা মহারাজো ভূয়োঽপি চাষ্টব্রাহ্মণান্।
আদেশমকরোদেতল্লক্ষণ-জ্ঞানকারণম্॥ ১৮
ততস্তে ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে জ্যোতিঃশাস্ত্রবিশারদাঃ।
অব্রুবন্ বরকন্যয়োঃ সর্ব্বলক্ষণমুত্তমম্॥ ১৯
তেষাং যুক্ত্যা তু সংরুধ্য পীতাম্বরং ততো নৃপঃ।
দদৌ তদ্বরকন্যয়োর্ব্বিবাহং ব্রাহ্মণাজ্ঞয়া॥ ২০

তাহার পর বল্লাল যেরূপে অগ্নিদাহদ্বারা স্বজনবর্গের সহিত বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা শুন। ১৪। তাঁহার রাজ্যের মধ্যে পীতাম্বর নাথ নামে (একজন) যোগী ছিলেন; রাজা তাহাকে পূর্ব্ব হইতেই গুরুবৎ পূজা করিতেন। ১৫। অনন্তর (একদা) সত্যবাদী, জ্যোতির্ব্বেত্তা, যোগী পীতাম্বর বল্লাল-রাজকন্যার বরের লক্ষণ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—১৭। যদি এই বরকন্যার বিবাহদ্বারা মিলন হয়, তাহা হইলে কন্যা বিবাহ-দিবসেই নিশ্চয় বৈধব্য দশা প্রাপ্ত হইবে। ১৭। মহারাজ ইহা শুনিয়া বরের লক্ষণ নির্ণয় করিবার নিমিত্ত পুনর্ব্বার আট জন ব্রাহ্মণকে আদেশ করিলেন। ১৮। অনন্তর জ্যোতিষ-শাস্ত্র-নিপুণ সেই সকল ব্রাহ্মণ বর ও কন্যার সকল লক্ষণই ভাল বলিলেন। ১৯। পরে রাজা সেই সকল ব্রাহ্মণের পরামর্শে পীতাম্বরকে কারাগারে আবদ্ধ করিয়া ব্রাহ্মণদিগের অনুমতি লইয়া সেই বর ও কন্যার বিবাহ দিলেন। ২০।

কিমাশ্চর্য্যং তদা রাত্রাবুদরাময়-হেতুনা।
বৈদ্যেন বর্জ্জিতো ভূত্বা লেভে তু মরণং বরঃ॥ ২১
ভীতশ্চ বিস্মিতো রাজা তূর্ণং মুমোচ যোগিনম্।
সন্তোষ্য বিবিধৈঃ স্তোত্রৈঃ পুরস্কৃতঃ যথোচিতম্॥ ২২
ততঃ পীতাম্বরোঽবাদীৎ কিং মে কার্য্যং ধনাদিনা।
মহ্যং শঙ্করসেবার্থং দেহি ভূমিন্তু কিঞ্চন॥২৩
এতচ্ছ্রুত্বা স বল্লালঃ প্রহৃষ্টো যোগিনে তদা।
প্রচুরাং ভূমিসম্পত্তিং দদৌ তদ্দেবনামিতাং॥২৪
এতস্মিন্তে গতে কালে বিরোধো যোগিভিঃ সহ।
যদজায়ত তদ্রাজ্যে বিস্তরাৎ পূর্ব্বসূচিতঃ।
পীতাম্বরো মানহীনঃ অতো যোগিগণৈঃ সহঃ।
অপমানাগ্নি দগ্ধোঽসৌ দদৌ শাপং তদা নৃপে॥ ২৫।২৬

কি আশ্চর্য্য! সেই রাত্রিতেই বর উদরাময় (ওলাউঠা) রোগে বৈদ্য-বর্জ্জিত হইয়া (বৈদ্যেরা অসাধ্য রোগ বলিয়া ত্যাগ করাতে) মরণপ্রাপ্ত হইলেন। ২১। (তাহাতে) রাজা ভীত ও বিস্ময়াপন্ন হইয়া সেই যোগীকে নানাবিধ স্তব স্তুতি দ্বারা সন্তুষ্ট ও যথোচিত পুরস্কার করিয়া শীঘ্রই কারামুক্ত করিলেন। ২২। অনন্তর পীতাম্বর বলিলেন, আমার ধনরত্নে কি প্রয়োজন? কেবল শঙ্করের সেবার জন্য আমাকে কিছু ভূমি দান করুন। ২৩। সেই বল্লাল রাজা ইহা শুনিয়া অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া যোগীকে তখনই তাঁহার দেবতার (শঙ্করের) অনেক ভূসম্পত্তি প্রদান করিলেন। ২৪।

এইরূপে কিছুকাল গত হইলে, যখন বল্লালের রাজ্যে যোগীদিগের সহিত বিরোধ উপস্থিত হইল, যাহা পূর্ব্বে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ২৫। তখন পীতাম্বর ঐ কারণে যোগীদিগের সহিত মানহীন হওয়াতে অপমানানলে দগ্ধ হইয়া রাজাকে শাপ দিলেন— ২৬। যেরূপ আমি স্বগণ সহিত অপমানানলে দগ্ধ ও দণ্ডিত হইলাম, সেইরূপ রাজাও স্বগণের সহিত জলন্ত অগ্নিতে দগ্ধ

যথাপমানদগ্ধোঽস্মি দণ্ডিতশ্চ গণৈঃ সহ।
ভবিষ্যতি তথা দগ্ধঃ স্বগণৈ র্জ্জলদগ্নিনা॥ ২৭
দণ্ডিতা যোগিনঃ সর্ব্বে রাজ্যত্যাগেন নিষ্কৃতাঃ।
কেচিত্তিষ্ঠন্তি কৃচ্ছ্রেণ শূদ্রবৎ বর্ণিতং পুরা॥ ২৮
অথ বর্ষান্তরে প্রাপ্তে দৈবচক্রাৎ সুদারুণাৎ।
বিক্রমপুরমধ্যে চ রামপাল গ্রামে তদা।
বায়াহুম্ নাম ম্লেচ্ছোঽসৌ যুদ্ধার্থং সুসমাগতঃ॥ ২৯
যযৌ যুদ্ধে চ বল্লালঃ বিপক্ষসম্মুখং তথা।
প্রণম্য মাতরং স্ত্রীভ্যো দত্ত্বালিঙ্গন চুম্বনম্॥ ৩০
স্ত্রিয়োঽব্রুবংস্তু রাজানং বাষ্পাকুলিত-লোচনৈঃ।
যদিস্যাদশিবং যুদ্ধে কিং নো নাথ গতিস্তদা॥ ৩১
ততোঽবদসৌ রাজা সংচুম্ব্যালিঙ্গ্য তাঃ পুনঃ।
দুরাত্ম-যবনাদ্ধর্ম্মং সতীত্বং রক্ষিতুঞ্চৈব।
শ্রেয়ো মৃত্যুশ্চ যুস্মাকং চিতাদাহেন নিশ্চিতম্॥ ৩২

হইবে। ২৭। (যাহা হউক), যোগীরা সকলে দণ্ডিত হইয়া রাজ্যত্যাগপূর্ব্বক নিস্তার পাইলেন; (কিন্তু) কেহ কেহ অতি কষ্টে শূদ্রের ন্যায় (রাজ্যে) রহিলেন, ইহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। ২৮।

অনন্তর (যোগীদিগের সহিত বিরোধের পর) এক বৎসর অতীত হইলে, দারুণ দৈববশে বিক্রমপুরের অন্তর্গত রামপাল নামক গ্রামে বায়াহুম নামে এক ম্লেচ্ছ (বল্লালের সহিত) যুদ্ধ করিতে আসিলেন। ২৯। বাল্লাল, মাতাকে প্রণাম এবং স্ত্রীদিগকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করিয়া শত্রুর অভিমুখে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। ৩০। তাঁহার স্ত্রীগণ অশ্রুপূর্ণনয়নে তাঁহাকে কহিলেন, "নাথ! যদি যুদ্ধে কোন অমঙ্গল ঘটনা হয়, তাহা হইলে আমাদের গতি কি হইবে?" ৩১। অনন্তর সেই রাজা তাঁহাদিগকে পুনর্ব্বার চুম্বন ও আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "দুরাত্মা যবনের হস্ত হইতে ধর্ম্ম ও সতীত্ব রক্ষা করিবার জন্য চিতাতে দগ্ধ হইয়া মরাই তোমাদিগের পক্ষে নিশ্চয় শ্রেয়ঃ। ৩২। তোমরা পূর্ব্ব হইতেই

কপোত-যুগলং দূতং মমামঙ্গলসূচকম্।
পূর্ব্ব-প্রস্তুত-চিতায়াং দৃষ্টৈব মরণং ধ্রুবম্॥ ৩৩
ইত্যুক্ত্বা স চ বঙ্গেশো জগাম সময়ং যথা।
বভূব বিজয়ী ম্লেচ্ছৈঃ সংগ্রামে তত্র তৈঃ সহ॥ ৩৪
স্বসৈন্যৈঃ স্বজনৈ স্তত্র বিজয়োন্মত্ত-ভূপতিঃ।
অনবধান-যোগেন কপোতৌ স্বগৃহং গতৌ॥ ৩৫
বিহঙ্গ-মিথুনং দৃষ্ট্বা কৃতান্ত-দূতসন্নিভম্।
রাজান্তঃপুরচারিণ্যশ্চক্রুঃ প্রাণবিমোচনম্॥ ৩৬
রণক্ষেত্রাত্ততো রাজা আগত্য নিজমন্দিরম্।
দদর্শ ক্ষণমাত্রেণ সর্ব্বনাশং সুদুঃসহম্॥ ৩৭
দৃষ্টিমাত্রেণ স ক্ষিপ্তস্তূর্ণং ক্ষিপ্ত্বা তু পাবকে।
আত্মানং, সর্ব্বসন্তাপং মুমোচ স্ত্রীগণৈঃ সহ॥ ৩৮

বল্লাল-চরিতম্—পরিশিষ্টম্।

চিতা প্রস্তুত করিয়া রাখিবে; যদি আমার কোন অমঙ্গল হয়, তাহা হইলে এক যোড়া পায়রা দূত হইয়া তোমাদিগের নিকট উপস্থিত হইবে, তাহা দেখিলেই তোমরা (চিতায় পড়িয়া) নিশ্চয় মরিবে।” ৩৩। এই বলিয়া সেই বঙ্গেশ্বর যুদ্ধে যাত্রা করিলেন, এবং তথায় সেই ম্লেচ্ছদিগের সহিত যুদ্ধে জয়ী হইলেন। ৩৪।

সেখানে রাজা নিজ সৈন্য এবং অনুচরবর্গের সহিত জয়োন্মত্ত হইয়া রহিলেন; (এদিকে) তাঁহার পায়রা দুইটী অনবধানতাবশতঃ তাঁহার গৃহে ফিরিয়া গেল। ৩৫। যমদূতের ন্যায় সেই পক্ষীযুগল দেখিয়া রাজার অন্তঃপুরবাসিনী রমণীগণ (চিতানলে) প্রাণত্যাগ করিল। ৩৬। অনন্তর রাজা যুদ্ধক্ষেত্র হইতে নিজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, ক্ষণকালের মধ্যেই অতীব অসহ্য সর্ব্বনাশ (হইয়াছে) দেখিলেন। ৩৭। উহা দেখিয়াই তিনি ক্ষিপ্ত হইয়া, শীঘ্রই আপনাকে অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত করিয়া, স্ত্রীদিগের সহিত সকল সন্তাপ মোচন করিলেন। ৩৮

পণ্ডিত শশিভূষণ ভট্টাচার্য্য কৃত অনুবাদ।

জনশ্রুতি এই যে রাজা বল্লাল সেনের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া একদল যোগিজাতি আত্মরক্ষার জন্য (১১৫৯—১১৮৫ খৃঃ অঃ) বঙ্গদেশ হইতে আসাম উপত্যকায় আসিয়া সর্ব্বপ্রথম গোয়ালপাড়া জেলার যোগীগোফায় আশ্রয় লইয়াছিলেন।

তৎপর ইঁহারা তথা হইতে ক্রমশঃ বংশবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আসাম উপত্যকার অন্যান্য জিলায় ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন। বর্ত্তমান পাকিস্তানের শ্রীহট্ট ও আসাম রাজ্যের কাছাড় জিলার যোগিজাতির পূর্ব্বপুরুষেরা ত্রিপুরা জিলার চাঁদপুর ও লাকশাম হইয়া উক্ত দুই জিলায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। আসাম উপত্যকার এবং কাছাড় শ্রীহট্টের বর্ত্তমান যোগিজাতি ইঁহাদেরই বংশধর। অধঃপতিত অবস্থায় ইঁহাদের মোটামুটী আট শত বৎসর কাটিয়াছিল। এই সুদীর্ঘকাল বঙ্গদেশ ও আসামের যোগিজাতির ইতিহাস লোকসমাজে লুপ্তপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিল। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ভরতচন্দ্র শিরোমণি মহোদয় ১২৭৯ বঙ্গাব্দের ১২ই চৈত্র তারিখে সর্ব্বপ্রথম যোগিজাতিকে শ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া এক ঘোষণা প্রকাশ করেন। তৎপর আলোচ্য সনের ২১শে চৈত্র তারিখে আন্দুলমৌহিয়াড়ীর জমিদার ৺ব্রজেন্দ্র কুণ্ড চৌধুরী মহাশয়ের ভবনের এক শ্রাদ্ধসভায় সমাগত পণ্ডিতগণ যোগিজাতির জন্ম অতি উৎকৃষ্ট বলিয়া সাব্যস্ত করেন এবং পণ্ডিতপ্রবর ভরতচন্দ্র শিরোমণি সম্পাদিত যোগি-সংস্কারব্যবস্থা ও আগম-সংহিতা নামক গ্রন্থের বিবরণ পণ্ডিতমণ্ডলী কর্ত্তৃক আলোচিত, বিচারিত ও স্বীকৃত হয়। তৎপর ১২৮০ বঙ্গাব্দের ১৫ই বৈশাখ দিবসে পাইকপাড়ার মহারাণী কাত্যায়নীর ভবনে বধূ ছোটরাণীর শ্রাদ্ধ উপলক্ষে নবদ্বীপ ও অন্যান্য নানাস্থানের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণ সমবেত হইয়াছিলেন। এ সভায়ও উপরোক্ত সভার বিষয়াদি আলোচিত ও পুনঃ স্বীকৃত হয় এবং পণ্ডিতমণ্ডলী সর্ব্বসম্মতিক্রমে এক ভাষপত্রে যোগিজাতিকে শ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া ঘোষণা করেন। এ সব বিভিন্ন বিবরণ ও ভাষপত্রাদি এবং আগম-সংহিতার

বচনাদি একত্রে "যোগিসংস্কার-ব্যবস্থা ও আগম-সংহিতা" নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা ১৮৬৭ সালের ২৫ আইন অনুসারে ২১।৬।১৮৭৬ ইংরাজীতে ৫৪৮ নম্বরে বঙ্গীয় সরকার বাহাদুর হইতে রেজিষ্টারী করা হইয়াছিল। এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানিই এই জাতির পুনরুত্থানের প্রথম সোপানস্বরূপ। ৺কৃষ্ণচন্দ্র নাথ, ৺মনিমোহন নাথ, ৺বিষ্ণুচন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য প্রমুখ নাথাচার্য্যগণই এই প্রাথমিক আন্দোলনের নেতা ছিলেন।

তৎপর প্রধানতঃ ইঁহাদেরই চেষ্টায় ফরিদপুর জিলার লোনসিংহ গ্রামের সাত জন স্বজাতি ১২৮৪ সালের ২৪শে ফাল্গুন তারিখে আসাম-বাঙ্গালার যোগিজাতির মধ্যে সর্ব্বপ্রথম উপনয়নসংস্কার গ্রহণ করেন। অধ্যাপক ডাঃ বেণীমাধব বড়ুয়া বলেন—" * * * বিগত ইংরাজী ১৯১০ সন হইতে বাঙ্গালার সর্ব্বত্র সকল ধর্ম্মাবলম্বীর ও সকল সমাজের মধ্যে জাগরণের প্রবল উদ্দীপনা দেখা দিয়াছে। আমার বলিবার উদ্দেশ্য নয় যে, ঠিক এই সময়ে বাঙ্গালায় সর্ব্বপ্রথম বিশেষতঃ আপনাদের সমাজে উপনয়নের প্রশ্ন উঠিয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহার বহু বৎসর পূর্ব্বেই আপনাদিগের মধ্যে এই উদ্দীপনার সঞ্চার দেখা যায়। যে সময় আপনাদিগের মধ্যে উপবীত গ্রহণের প্রশ্ন উঠে তখনও ন্যাশনেল কংগ্রেস বা জাতীয় মহাসভা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই" (বঙ্গীয় যোগিসমাজের মর্ম্মস্থল, প্রাণস্পন্দন ও গতিবিধি)।

উক্ত উপনয়ন সংস্কার মহোৎসব সম্পাদন পূর্ব্বক নৌকাযোগে ফিরিবার পথে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত রামকুমার ন্যায়রত্ন ও কৃষ্ণচন্দ্র নাথ মহাশয়দ্বয় গোয়ালন্দের নিকটে পদ্মায় নৌকাডুবিতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। অপরাপর সঙ্গীগণ দৈবানুগ্রহে কোনও প্রকারে প্রাণরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মনিমোহন-জীবনীতে এ সম্বন্ধীয় বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়।

ঢাকা বিক্রমপুরের যোগিজাতি রাজনগরের রাজা রাজবল্লভের তদানীন্তন বংশধরগণের নিকট উপবীত গ্রহণের অনুমতি চাহিলে ১২৮৪ সালের ৯ই শ্রাবণ

তারিখে তাঁহারা রাজসভার সম্মতি লাভ করিয়া উপবীত গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন। ১২৮৪ সালে ৺বিষ্ণুচন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বর্দ্ধমানাধিপতির নিকট এ সম্বন্ধে আবেদন করিয়া সফলকাম হইয়াছিলেন। এভাবে প্রাপ্ত বিভিন্ন স্থানের অনুমতিপত্র মুদ্রিত করিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় আসাম-বাঙ্গালার স্বজাতিবহুল স্থানে প্রেরণ করেন। এমনই ভাবে সমাজ-সংস্কারের কথা আসাম-বাঙ্গালার প্রায় সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছিল। বিভিন্ন স্থানে নূতন উৎসাহে বিচ্ছিন্নভাবে সভা-সমিতি হইতে লাগিল। নানাবিধ বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়া কোন কোন স্থানে উপনয়নসংস্কারও হইতে লাগিল। পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের যোগিজাতির মধ্যে সর্ব্বপ্রথম কাছাড়ের ৺রামচরণ নাথ মাঝারভুঞা মহাশয় উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন আসাম-বাঙ্গালার যোগিজাতির মধ্যে কোনও অখণ্ড সঙ্ঘ বা জাতীয় বার্ত্তা প্রচারের কোনও সংবাদ পত্র ছিল না। ১৩১১ বাঙ্গালার বৈশাখ মাস হইতে যোগিসখা মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়া ৺অরবিন্দ বন্ধু নাথ (২৪ পরগণা) মহাশয় জাতির মহৎ কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন। তখন হইতে জাতীয় সংবাদাদি যোগিসখায় প্রকাশিত হইতে লাগিল। ইহা দ্বারা বিভিন্ন স্থানের যোগিজাতির মধ্যে মিলনের পথ ক্রমশঃ সুগম হইতে লাগিল। ১৩১৪ বাঙ্গালার ফাল্গুন মাসে কলিকাতার ভবানীপুরের কৃষ্ণচন্দ্র নাথ মহাশয়ের বাড়ীতে আহূত একটি সভায় শ্রদ্ধাস্পদ রাধাগোবিন্দ নাথ, এম-এ, বিদ্যাবাচস্পতি মহোদয় আসাম-বাঙ্গালার যোগিজাতিকে সঙ্ঘবদ্ধ করার প্রস্তাব করিলেন। উপস্থিত সকলেই মুক্তকণ্ঠে এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। দয়াময় ভগবান হয়ত অলক্ষিতে থাকিয়া বলিয়াছিলেন—'তথাস্তু'। ১৩১৫ বাঙ্গালায় শ্রীরাধাগোবিন্দ বাবু কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যাপকের কার্য্যে যোগদান করেন। কলিকাতায় যাহার সূচনা ভগবৎ কৃপায় কুমিল্লাতে তাহারই পূর্ণ পরিণতি ঘটিয়াছিল। রাধাগোবিন্দের আহ্বানে ১৩১৭ বাঙ্গালার ৬ই কার্ত্তিক তারিখে সমগ্র আসাম-বঙ্গের প্রতিনিধি ও দর্শকগণ কুমিল্লাতে সমবেত হইয়া

তাঁহারই সভাপতিত্বে আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনী গঠন করেন। ১৩১৮ বাঙ্গালার কার্ত্তিক মাস হইতে উক্ত সম্মিলনীর মাসিক মুখপত্ররূপে 'যোগিসম্মিলনী পত্রিকা' প্রকাশিত হয়। রাধাগোবিন্দবাবু ইহার প্রথম সম্পাদক ছিলেন।

কুমিল্লাতে আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনীর (২) প্রথম বার্ষিক অধিবেশন আহ্বান করা খুবই যুক্তিযুক্ত হইয়াছিল। কুমিল্লা বর্ত্তমান পূর্ব্ব-পাকিস্তানের ত্রিপুরা জিলার সদর ষ্টেসন। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে যত স্বজাতির বাস এক ত্রিপুরা জিলাতে তদপেক্ষা দশ বার হাজার বেশী স্বজাতির বাস। পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গে যত স্বজাতির বাস ত্রিপুরা জিলার সংলগ্ন শ্রীহট্ট ও কাছাড় জিলাতে প্রায় তত স্বজাতির বাস। পূর্ব্ববঙ্গের (বর্ত্তমান পূর্ব্ব-পাকিস্তান) যোগিজাতির সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গের প্রায় পাঁচ গুণ অধিক ছিল এবং আসামের যোগিজাতির সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গের প্রায় তিন গুণ অধিক ছিল। আসাম-বাঙ্গালার যোগিজাতির মোট সংখ্যার প্রায় অর্দ্ধেক লোক ত্রিপুরা জিলা এবং ইহার সংলগ্ন নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট ও কাছাড় জিলার আধিবাসী ছিলেন। এখনও এই সংখ্যা যথেষ্ট হ্রাস পাইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। পূর্ব্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গ এখন ইসলামিক পূর্ব্বপাকিস্তান রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ায় সেখানে হিন্দুর বসবাস অসুবিধাজনক হইয়া পড়িয়াছে। সেজন্য অনেক স্বজাতি ঐ সব অঞ্চল ত্যাগ করিয়া পশ্চিমবঙ্গে, আসামে ও ভারতের অন্যান্য রাজ্যে প্রায় সর্ব্বহারা হইয়া আসিয়া পড়িতেছেন। সেজন্য ঐ সব স্থানের স্বজাতির সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু হ্রাস পাইতেছে। বর্ত্তমানে আমরা দুইটি রাষ্ট্রের অধিবাসী হইলেও আমরা একই পরিবারভুক্ত জনগণের মত পূর্ব্বের ন্যায় সঙ্ঘবদ্ধভাবে আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনীর অধীনে থাকিয়া আমাদের উন্নতি চিন্তা করিব ইহাই সম্মিলনীর একান্ত কাম্য। কুমিল্লার নিকটে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ লালমাই ময়নামতীর টীল্লা

(২) অতঃপর সম্মিলনী বলিতে আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনীকেই বুঝিতে হইবে।

অবস্থিত। ইহা নাথসিদ্ধাদের কর্ম্মকেন্দ্র ছিল। এখানে নাথাচার্য্য জালন্দর বা হাড়িপা নাথ রাজা গোপীচাঁদ বা গোবিন্দচন্দ্রকে দীক্ষা দান করিয়াছিলেন। কাছাড় এবং শ্রীহট্ট জিলার করিমগঞ্জ মহকুমার একাংশ ভিন্ন ঐ সব স্বজাতি-বহুল জিলাগুলি এখন পাকিস্তান রাষ্ট্রে অবস্থিত।

আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনীর ধারাবাহিক ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে ইহা নিজের গণ্ডী দিন দিন বৃদ্ধি করিয়া দেশের ও কালের পরিবর্ত্তন অনুসারে নিজের মতবাদ ও কার্য্যধারার পরিবর্ত্তন করিয়া সমাজের বিভিন্ন মতাবলম্বী জনগণকে ইহার বিশাল ক্রোড়ে টানিয়া লইতেছে। ইহা নিজের শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিবার হীন স্বার্থপরতা পরিহার করিয়া সমগ্র হিন্দুসমাজ তথা সমগ্র দেশের কার্য্যে ও চিন্তায় সহযোগিতার হস্ত প্রসারণ করিয়া আসিতেছে। শিক্ষা ও কর্ম্মের গুণে যোগ্যতা অর্জ্জন করিবার চেষ্টা না করিয়া কেবল পূর্ব্ব-পুরুষগণের মহিমা গাহিলে প্রতিষ্ঠা লাভ করা সম্ভবপর নহে, এই কঠোর সত্য সম্মিলনী উপলব্ধি করিতে পারিয়া সেইভাবে কার্য্য করিতেছে। সম্মিলনী বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আজ চত্বারিংশ বর্ষে শুভ পদার্পণ করিয়াছে। নিম্নে ইহার বিগত কয়েক বৎসরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল—

"নবজীবনের সঙ্কটপথে
হে তুমি অগ্রগামী
তোমার যাত্রা সীমা মানিবে না
কোথাও যাবে না থামি।"

—রবীন্দ্রনাথ

১। **প্রথম বার্ষিক অধিবেশন :—**১৩১৭ বাঙ্গালার ৬ই কার্ত্তিক বর্ত্তমান পাকিস্তানের ত্রিপুরা জিলার কুমিল্লা সহরে শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ, এম-এ, বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয়ের সভাপতিত্বে সম্মিলনীর প্রথম বার্ষিক অধিবেশন হয়। সভায় প্রায় পাঁচ শতাধিক দর্শক ও প্রতিনিধি সমবেত হইয়াছিলেন। প্রত্যেক

জিলা হইতে অন্ততঃ দুই জন সদস্য লইয়া ইহার সাধারণ সমিতি গঠিত হয়। রাধাগোবিন্দবাবু ইহার সভাপতি ও ৺শ্রীদাম চন্দ্র ভৌমিক, সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন। আর একটি প্রস্তাবে জাতির উৎপত্তি ও অবস্থা ইত্যাদি সর্ব্বসাধারণকে জানাইবার জন্য রাধাগোবিন্দের সম্পাদকতায় 'বঙ্গীয় যোগিজাতি' নামক একখানি পুস্তিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত হয়, এবং তদনুসারে কার্য্যও হয়। এই সভার জন্য কোন অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হয় নাই।

২। **দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন**:—১৩১৮ বাঙ্গালার ২৫শে আশ্বিন ঢাকা বিক্রমপুরের আরিয়ল গ্রামের শ্রীবনমালী নাথ মহাশয়ের বাড়ীতে নোয়াখালির ৺কৃষ্ণসুন্দর মজুমদার, বি-এল, মহাশয়ের সভাপতিত্বে দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন হয়। অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ হইতে সম্পাদক শ্রীঅম্বিকাচরণ নাথ বি-এল, মহাশয় সকলকে অভ্যর্থনা করেন। সভায় প্রায় এক সহস্র দর্শক ও প্রতিনিধি সমবেত হইয়াছিলেন। সর্ব্বপ্রথম যোগিজননেতা ৺বিষ্ণুচন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয়। তৎপর স্বজাতি ও স্বদেশের উন্নতিজনক কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। আলোচ্য বর্ষে প্রচারকার্য্যের ফলে জাতির মধ্যে এক নূতন জাগরণের সাড়া পড়িয়াছিল। ফলে অনেক স্থানে জাতীয় সঙ্ঘ স্থাপিত হইয়াছিল।

১৩১৮ বাঙ্গালার কার্ত্তিক মাস হইতে 'যোগি-সম্মিলনী' নামক সম্মিলনীর মাসিক মুখপত্র প্রকাশ করা হয়, এবং সম্মিলনীর চেষ্টার ফলে এই জাতির দরিদ্র ছাত্রদের জন্য গভর্ণমেণ্ট হইতে বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্থা হয়।

৩। **তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন**:—১৩১৯ বাঙ্গালার ১৫ই কার্ত্তিক ফরিদপুর জেলার টেংরা নামক স্থানে শ্রীজগবন্ধু নাথ ও শ্রীকৃষ্ণবন্ধু নাথ মহাশয়দ্বয়ের বাড়ীতে গোয়ালপাড়ার ৺হরিপ্রসাদ নাথ মহাশয়ের সভাপতিত্বে উক্ত অধিবেশন হয়।

সভায় শিক্ষাবিস্তার, বিভিন্ন সমাজে আদান প্রদান, বাল্যবিবাহ দূরীকরণ,

জেলা-সমিতি, পল্লী-সমিতি ও ছাত্রাবাস স্থাপন প্রভৃতি তেরটী প্রস্তাব আলোচিত ও গৃহীত হয়। এই সভার প্রস্তাবানুসারে স্বজাতীয় অংশীদারদের অর্থে শঙ্কর প্রেস স্থাপিত হয় (১)।

৪। **চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশন**:—১৩২০ বাঙ্গালার ২রা কার্ত্তিক তারিখে চট্টগ্রাম সহরে বর্দ্ধমানের ডাঃ ৺জগচ্চন্দ্র নাথ মহাশয়ের সভাপতিত্বে উক্ত অধিবেশন হয়। সভায় প্রায় পনরশত প্রতিনিধি ও দর্শক উপস্থিত ছিলেন। অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষে সভাপতি শ্রীধনঞ্জয় নাথ এবং সম্পাদক ৺হরিমোহন নাথ মোক্তার সকলকে অভ্যর্থনা করেন। এই সভায় সর্ব্বপ্রথম উপনয়ন সংস্কার গ্রহণের প্রস্তাব গৃহীত হয়। এতদ্ব্যতীত স্বজাতি ও স্বদেশের কল্যাণকর উনিশটী প্রস্তাব আলোচিত ও গৃহীত হয়।

৫। **পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশন**ঃ— ১৩২১ বাঙ্গালার পৌষ মাসে নোয়াখালি জিলার ফেনী শহরে চট্টগ্রামের ৺বংশীবদন নাথ, উকীল মহাশয়ের সভাপতিত্বে সম্মিলনীর ৫ম বার্ষিক অধিবেশন হয়। এই সভায় ৺হরিমোহন নাথ, মোক্তার মহাশয় সম্মিলনীর স্থায়ী সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন এবং স্বজাতি ও স্বদেশের উন্নতিজনক কয়েকটি প্রস্তাব আলোচিত ও গৃহীত হয়। এই অধিবেশনের জন্য কোন অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হয় নাই।

৬। **ষষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশন**ঃ—১৩২২ বাঙ্গালার আশ্বিন মাসে কুমিল্লার নাথ-ছাত্রাবাসের ছাত্রদের চেষ্টায় নিয়মরক্ষা মানসে চট্টগ্রামের ৺হরিমোহন নাথ, মোক্তার মহাশয়ের সভাপতিত্বে কুমিল্লা সহরে উক্ত অধিবেশন হইয়াছিল। সভায় স্বজাতি ও স্বদেশের কল্যাণকর নানাবিধ আলোচনা হয়।

(১) রাধাগোবিন্দবাবু প্রমুখ কয়েকজন অংশীদার এই প্রেসটি সম্মিলনীকে দান করিয়াছেন। ইহাতে রাধাগোবিন্দের মোটামুটী আট শত টাকার অংশ ছিল।

৭। **সপ্তম বার্ষিক অধিবেশনঃ—** ১৩২৩ বাঙ্গালায় ৭ম বার্ষিক অধিবেশনের কার্য্য বন্ধ ছিল। এ সময় সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সভাপতি শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয় নানা কারণে ইহার সংশ্রব ত্যাগ করেন; ফলে সম্মিলনীর প্রতি স্বজাতি-সাধারণের আস্থা শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

৮। **অষ্টম বার্ষিক অধিবেশনঃ—** ১৩২৬ বাঙ্গালার পৌষ মাসে ময়মনসিংহ জিলার নেত্রকোণা সহরে চব্বিশ পরগণার ৺অরবিন্দবন্ধু নাথ মহাশয়ের সভাপতিত্বে ৮ম বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল। সভায় প্রায় চারি শত দর্শক ও প্রতিনিধি সমবেত হইয়াছিলেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীমহেশচন্দ্র নাথ, বি-এল, উকীল ও সম্পাদক শ্রীযুধিষ্ঠির নাথ মহাশয়দ্বয় সকলকে অভ্যর্থনা করেন।

এই সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে যোগিসখাকে সম্মিলনীর মুখপত্র করা হয় এবং শ্রীঅম্বিকাচরণ নাথ, বি-এল মহাশয় সম্মিলনীর কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটীর সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। এ সময় যোগিসখার পরিচালকগণকে সম্মিলনীর কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটীর সদস্য শ্রেণীভুক্ত করা হয়।

৯। **নবম বার্ষিক অধিবেশনঃ—**১৩২৫ বাঙ্গালার ২রা কার্ত্তিক তারিখে কলিকাতার রামমোহন লাইব্রেরীতে নোয়াখালির শ্রীভারতচন্দ্র নাথ, উকীল মহাশয়ের সভাপতিত্বে সম্মিলনীর নবম বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল। সভায় সমবেত দর্শক ও প্রতিনিধির সংখ্যা প্রায় এক সহস্র হইয়াছিল। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীনরেন্দ্রনাথ দালাল, জমিদার, বি-এল ও সম্পাদক শ্রীইন্দুভূষণ নাথ মহাশয়দ্বয় সকলকে অভ্যর্থনা করেন। সভায় গৃহীত প্রস্তাবাবলীর মধ্যে সম্মিলনীর পূর্ব্ব নিয়মাবলীর স্থলে পরিবর্দ্ধিত, পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত নিয়মাবলী গ্রহণ প্রস্তাবটিই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১০। **দশম বার্ষিক অধিবেশনঃ—** ঢাকা জিলার বিক্রমপুরে আচার্য্য

১৪। **চতুর্দ্দশ বার্ষিক অধিবেশন**ঃ—১৩৩০ বঙ্গাব্দের ১৩ই ও ১৪ই কার্ত্তিক তারিখে বাথরগঞ্জ জিলার ঝালকাঠি বন্দরে গোয়ালপাড়ার ৺হরেন্দ্র নারায়ণ নাথ মহাশয়ের সভাপতিত্বে উক্ত সভা হয়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীরাধাবল্লভ হালদার ও সম্পাদক ৺বঙ্কবিহারী হালদার সকলকে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করেন। আচার্য্য ৺প্রফুল্লচন্দ্র রায়, অধ্যাপক ডাঃ ৺বেণীমাধব বড়ুয়া, ব্যারিষ্টার নিশীথচন্দ্র সেন প্রমুখ বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ মনীষিগণ এই সভায় উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। এই সভায় যে সব প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল সেগুলির মধ্যে অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন, যোগিজাতিকে অনুন্নত তালিকাভুক্ত না করার জন্য গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ জ্ঞাপন, এবং ভারতের যোগিজাতির মধ্যে একতাস্থাপন উদ্দেশ্যে নিখিল-ভারত যোগি-সম্মিলনী গঠন প্রস্তাবই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৫। **পঞ্চদশ বার্ষিক অধিবেশন**ঃ—১৩৩১ বাঙ্গালার ১৩ই ও ১৪ই পৌষ তারিখে মুর্শিদাবাদ জিলার বিশাল সাগর দীঘির ধারে ব্রাহ্মণী গ্রামে ৺রসরাজ নাথ কবিরাজ মহাশয়ের অর্থব্যয়ে নোয়াখালির ৺কৃষ্ণসুন্দর মজুমদার, বি-এল মহাশয়ের সভাপতিত্বে উক্ত অধিবেশন হয়। সভায় প্রায় পাঁচ শত দর্শক ও প্রতিনিধি সমবেত হইয়াছিলেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীসতীশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এবং সম্পাদক শ্রীপ্রমথনাথ নাথ, বি-এ সকলকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। এবার অনেক ভিন্ন জাতীয় বিশিষ্ট ভদ্রলোক অভ্যর্থনা, সমিতির সদস্য শ্রেণীভুক্ত হইয়া অধিবেশনের কার্য্যে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। গৃহীত প্রস্তাবাবলীর মধ্যে শিক্ষার জন্য বিদেশযাত্রীকে সমাজে গ্রহণ, প্রত্যেক জিলায় যোগমঠ স্থাপন, সম্মিলনীর পক্ষ হইতে প্রতি বৎসর বঙ্গীয় রাষ্ট্রীয়সভায় ও হিন্দুসভায় দুই জন হিসাবে প্রতিনিধি প্রেরণ, মাদকদ্রব্য বর্জ্জন প্রস্তাবই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৬। **ষোড়শ বার্ষিক অধিবেশন**ঃ—১৩৩২ বাঙ্গালার ১৪ই ও ১৫ই

আশ্বিন তারিখে বর্দ্ধমান জিলার দাঁইহাটে শ্রীরঘুনাথ নাথ ও শ্রীরাধিকাপ্রসাদ নাথ মহাশয়দ্বয়ের চেষ্টায় ও অর্থব্যয়ে চট্টগ্রামের ৺হরিমোহন নাথ, মোক্তার মহাশয়ের সভাপতিত্বে উক্ত অধিবেশন হয়। সভায় প্রায় ছয় শত দর্শক ও প্রতিনিধি সমবেত হইয়াছিলেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীরজনীকান্ত নাথ ও সম্পাদক শ্রীপ্রমথনাথ নাথ, বি-এ মহাশয়দ্বয় সকলকে অভ্যর্থনা করেন। গৃহীত প্রস্তাবাবলীর মধ্যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, বাগ্মীবর সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ রাষ্ট্রনেতাগণের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম স্থাপন, 'যোগিসখা'র কভারের উপর প্রতিষ্ঠাতা ৺অরবিন্দবন্ধু নাথ মহাশয়ের নাম মুদ্রণ, ঢাকার শ্রীঅম্বিকাচরণ নাথ মহাশয়কে 'আচার্য্য' উপাধি দান প্রস্তাবগুলিই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৭। **সপ্তদশ বার্ষিক অধিবেশন** ঃ—১৩৩৩ বঙ্গাব্দের ১লা ও ২রা কার্ত্তিক তারিখে হাওড়া জিলার রামরাজাতলায় সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীনরেন্দ্রনাথ দালাল, বি-এল মহাশয়ের সভাপতিত্বে উক্ত অধিবেশন হইয়াছিল। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীইন্দুভূষণ নাথ ও সম্পাদক শ্রীশশিভূষণ নাথ মহাশয়দ্বয় সকলকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। গৃহীত প্রস্তাবাবলীর মধ্যে মুসলমান কর্ত্তৃক অপহৃতা চট্টগ্রামের যশোদাসুন্দরীকে সমাজে পুনর্গ্রহণ, যোগিজাতির কুৎসা রটনাকারী পণ্ডিত শ্যামাচরণ কবিরত্নের বিরুদ্ধে মানহানির মোকর্দ্দমা আনয়ন, যোগিসখার কভারের উপর সম্মিলনী-প্রতিষ্ঠাতার নাম মুদ্রণ এবং সম্মিলনীর নিয়মাবলীর সংশোধন প্রস্তাবই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৮। **অষ্টাদশ বার্ষিক অধিবেশন** ঃ—১৩৩৪ বাঙ্গালার ২১শে ও ২২শে আশ্বিন কাছাড় জিলার নরসিংহপুর গ্রামে ২৪ পরগণার ভূষণচন্দ্র নাথ, এম-এ, বি-টি মহাশয়ের সভাপতিত্বে উক্ত অধিবেশন হইয়াছিল। দুই শতাধিক মহিলাসহ সভায় প্রায় পাঁচ হাজার দর্শক ও প্রতিনিধি সমবেত হইয়াছিলেন। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট রায় মহেন্দ্রনাথ দে চৌধুরী, রায় অঘোর নাথ অধিকারী প্রমুখ বহু

সংখ্যক ভিন্ন জাতীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ৺দীননাথ লস্কর, মোক্তার এবং সম্পাদক ৺গোলকচন্দ্র নাথ বড়ভুঞা সকলকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। সভায় গৃহীত প্রস্তাবাবলীর মধ্যে পণ্ডিত শ্যামাচরণ কবিরত্নের বিরুদ্ধে মোকর্দ্দমা দায়ের করা (১), শিক্ষা, সন্ধ্যা আহ্নিক প্রভৃতি বাধ্যতামূলক করা, স্বজাতিসেবার পুরস্কারস্বরূপ ৺হরিমোহন নাথ, মোক্তার মহাশয়কে নাথবন্ধু উপাধি দ্বারা ভূষিত করা, 'ভারতমাতা' বহির লেখিকা মিস মেয়ো ও মিঃ পিলচারের ভারতবিরোধী জঘন্য মিথ্যা উক্তির প্রতি ঘৃণা প্রকাশ প্রস্তাবই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আজ পর্য্যন্ত সম্মিলনীর যতটা অধিবেশন হইয়াছে সেগুলির মধ্যে এই অধিবেশনই ছিল সর্ব্বাপেক্ষা বিরাট অধিবেশন।

১৯। **ঊনবিংশ বার্ষিক অধিবেশন ঃ—**কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যক্ষ ও সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠাতা শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ, এম-এ, বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয়ের সভাপতিত্বে ১৩৩৫ বাঙ্গালার ৯ই এবং ১০ই কার্ত্তিক তারিখে খুলনা সহরের টাউন হলে উক্ত অধিবেশন হয়। সভায় প্রায় দেড় হাজার দর্শক ও প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সম্মিলনীর জন্মদাতা শ্রীরাধাগোবিন্দ নানা কারণে সম্মিলনীর ৭ম বর্ষে ইহার সংশ্রব ত্যাগ করেন এবং ১৯শ বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতিরূপে পুনরায় সম্মিলনীতে যোগদান করায় জাতির প্রাণে নূতন আশার সঞ্চার হয়। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রমুখ কয়েকজন বঙ্গমাতার শ্রেষ্ঠ সন্তান উক্ত অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীমহানন্দ সরকার এবং সম্পাদক শ্রীশরচ্চন্দ্র নাথ, বি-এল মহাশয়দ্বয় সকলকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। সভায় গৃহীত

(১) উক্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে চট্টগ্রাম আদালতে কবিরত্নের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হইয়াছিল। বিচারপতি কবিরত্নের কার্য্যের তীব্র নিন্দা করিয়া আইনের আওতায় পড়ে না বলিয়া কবিরত্নকে মুক্তি দিয়াছিলেন।

প্রস্তাবাবলীর মধ্যে দেশের স্বার্থরক্ষার জন্য সাইমন কমিশন বর্জ্জন করা, দেশের রাষ্ট্রনীতিতে যোগদান করিয়া দেশকে স্বাধীন করার চেষ্টা করা, শ্রেণী ও বংশগত পৌরোহিত্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা, যোগিসভায় ব্যক্তিগত স্বাধীন মত প্রকাশের সুযোগ দেওয়া, সম্মিলনীর পূর্ব্বনিয়মাবলীর পরিবর্ত্তে সর্ব্বজনস্বীকৃত নূতন নিয়মাবলী গ্রহণ প্রস্তাবই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সভায় সমাজে বিধবা বিবাহ হওয়া উচিত কি না তৎসম্বন্ধে প্রথম আলোচনা হয়।

২০। **বিংশ বার্ষিক অধিবেশনঃ**— ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের ১৩ই এবং ১৪ই পৌষ তারিখে নদীয়া জিলার ভেড়ামারা নামক গ্রামে কাছাড়ের ৺দীননাথ নাথ লস্কর, মোক্তার মহাশয়ের সভাপতিত্বে উক্ত অধিবেশন হইয়াছিল। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ৺শশিভূষণ নাথ সাহা ও সম্পাদক শ্রীপ্রমথনাথ নাথ, বি-এ সকলকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। সভায় গৃহীত প্রস্তাবাবলীর মধ্যে পশ্চিমদেশীয় স্বজাতিগণের সঙ্গে মিলনসূত্র স্থাপনের ব্যবস্থা করা, স্বজাতীয় গুরু-পুরোহিতগণকে সমাজের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া হিন্দুসমাজের যে কোনও আচারবান ব্যক্তিকে দীক্ষা দিতে ও তাঁহাদের পৌরোহিত্য করিতে আহ্বান করা, সম্মিলনীকে অনধিক তিন মাসের মধ্যে গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করিয়া লওয়া, জাতীয় তথ্য আবিষ্কারের জন্য পালিভাষায় অভিজ্ঞ একজন স্বজাতিকে নেপালে প্রেরণ করার প্রস্তাবগুলিই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রবীণগণের সহিত তরুণগণের মতভেদের ফলেই আলোচ্য অধিবেশনস্থলে জমিদার শ্রীনলিনী কিশোর রায়, বি, এস-সি মহাশয়ের সভাপতিত্বে আসাম-বঙ্গ যোগি-যুবসঙ্ঘের প্রথম বার্ষিক অধিবেশন হয়। শ্রীইন্দুভূষণ নাথ মহাশয় ইহার কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটীর প্রথম সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। এই অধিবেশনের প্রায় সমস্ত ব্যয়ভার ৺শশিভূষণ বাবু ও তাঁহার অগ্রজ জানকী বাবু বহন করেন।

২১। **একবিংশ বার্ষিক অধিবেশনঃ**— ১৩৩৭ বাঙ্গালার ১৭ই ও ১৮ই আশ্বিন তারিখে ২৪ পরগণার নৈহাটীতে আচার্য্য অম্বিকাচরণ নাথ, বি-এল

মহাশয়ের সভাপতিত্বে উক্ত অধিবেশন হয়। সভায় প্রায় পাঁচ শত দর্শক ও প্রতিনিধি সমবেত হইয়াছিলেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ৺অরবিন্দবন্ধু নাথ মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে সহঃ সভাপতি শ্রীভবেন্দ্রলাল নাথ, বি, এস-সি ও সম্পাদক শ্রীআশুতোষ নাথ সকলকে অভ্যর্থনা করেন। কাছাড় শ্রীহট্টের যোগিজাতিকে অনুন্নত শ্রেণীভুক্ত করার জন্য নিজকে যোগিজাতির প্রতিনিধি এই মিথ্যা পরিচয় দিয়া শ্রীহট্টের শ্রীযোগেশচন্দ্র নাথ, বি-এল সাইমন কমিশনের নিকট যে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন, সভায় তাহার তীব্র প্রতিবাদ করা হয়। সম্মিলনীকে তিন মাসের মধ্যে গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করিয়া লওয়ার প্রস্তাবও উক্ত অধিবেশনে গৃহীত হইয়াছিল। এই অধিবেশনের সঙ্গে শ্রীপ্রমথনাথ নাথ, বি-এ মহাশয়ের সভাপতিত্বে আসাম-বঙ্গ যোগি-যুবসঙ্ঘের ২য় বাষিক অধিবেশনও হইয়াছিল।

২২। ✓**দ্বাবিংশ বার্ষিক অধিবেশন** ঃ— ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের ১১ই ও ১২ই পৌষ তারিখে নোয়াখালি জিলার চৌমুহনী বন্দরে বেগমগঞ্জ স্কুল-প্রাঙ্গণে সম্মিলনীর ২২শ বাষিক অধিবেশন বিরাট আড়ম্বরের সহিত সম্পন্ন হয়। ৺অরবিন্দবন্ধু নাথ মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। জমিদার ৺নবেন্দ্রকিশোর রায় ও শ্রীক্ষেত্রমোহন ভৌমিক, বি-এল যথাক্রমে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ও সম্পাদক ছিলেন। নির্ব্বাচিত সভাপতি মহাশয় চৌমুহনী রেলষ্টেশনে পৌছিলে সহস্রকণ্ঠে বিবিধ জয়ধ্বনিতে সর্ব্বদিক প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল। সাত শত স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী, নেতৃবৃন্দ ও জনসাধারণ রেলষ্টেসনে উপস্থিত হইয়া সভাপতি মহাশয়কে অভ্যর্থনা জ্ঞাপনপূর্ব্বক বিপুল জনতা সুশৃঙ্খলভাবে একটী শোভাযাত্রী দল গঠন করিয়া তাঁহাকে সভাস্থলে লইয়া গিয়াছিলেন। শোভাযাত্রার সঙ্গে হস্তী, অশ্ব, মোটরযান ও দেশীয় ব্যাণ্ড বাদ্য ছিল। সম্মিলনী সভাপতির প্রতি এই রাজোচিত সম্বর্দ্ধনা প্রদর্শন এই সর্ব্বপ্রথম। সভায় দশ সহস্রাধিক জনসমাগম হইয়াছিল। সর্ব্বপ্রকারের সুশৃঙ্খল বিরাট

আয়োজন, এত অধিক জন-সমাগম, এতগুলি সুস্থকায় বলিষ্ঠ উচ্চশিক্ষিত যোগিযুবকের একত্রে সম্মিলন, সভাপতি মহাশয়ের অভ্যর্থনা ও ইহার বিরাট স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী সম্মিলনীর ইতিহাসে অভূতপূর্ব্ব দর্শনীয় এবং, বিস্ময়কর ব্যাপার ছিল।

সভায় গৃহীত প্রস্তাবাবলীর মধ্যে সম্মিলনীর বার্ষিক অধিবেশনের নির্ব্বাচিত সভাপতিকে পরবর্ত্তী বৎসরের স্থায়ী সভাপতিরূপে গণ্য করা, বয়নশিল্পীদের সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া নিখিল-ভারত তন্তুবায়-সঙ্ঘ গঠন করা, দেশীয় সুতা দ্বারা নিজের প্রস্তুত কাপড় ব্যবহার সম্বন্ধীয় প্রস্তাবই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই অধিবেশনের সঙ্গে শ্রীরামচরণ নাথ, এম-এ, বি-এল মহাশয়ের সভাপতিত্বে আসাম-বঙ্গ যোগি-যুবসঙ্ঘের ৩য় বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল।

২৩। ত্রয়োবিংশ বার্ষিক অধিবেশন:—এই অধিবেশন হয় নাই (১৩৩৯ বঙ্গাব্দ)।

২৪। চতুর্বিংশ বার্ষিক অধিবেশন:—১৩৪০ বাঙ্গালার ১৫ই ও ১৬ই আশ্বিন তারিখে শ্রীপ্রমথনাথ নাথ, বি-এ মহাশয়ের উদ্যোগে নদীয়ার চুয়াডাঙ্গার টাউন হলে কুমিল্লার ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ, এম-এ, বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয়ের সভাপতিত্বে উক্ত অধিবেশন হইয়াছিল। শ্রীজগদীশচন্দ্র সরকার, বি-এল, উকিল ও শ্রীতারাপদ পণ্ডিত যথাক্রমে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ও সম্পাদক ছিলেন। সভায় গৃহীত প্রস্তাবাবলীর মধ্যে শ্রীহট্ট ও কাছাড়ের যোগিজাতিকে আসাম গভর্ণমেণ্ট অনুন্নত জাতির তালিকাভুক্ত করার তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন, নারীহরণ ও নারীধর্ষণের প্রতিকারকল্পে কঠোর আইন প্রণয়নের জন্য সরকার বাহাদুরের দৃষ্টি আকর্ষণ, এবং শ্রীশরচ্চন্দ্র নাথ, বি-এল (খুলনা), শ্রীসুরেশচন্দ্র নাথ মজুমদার (কাছাড়), শ্রীপ্রমথনাথ নাথ, বি-এ (নদীয়া), শ্রীরামচরণ নাথ, এম-এ, বি-এল (বরিশাল), শ্রীসত্যকুমার নাথ মজুমদার (ময়মনসিংহ) মহাশয়গণকে লইয়া যোগিসখার সম্পাদকসঙ্ঘ গঠন প্রস্তাবই

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই অধিবেশনের সঙ্গে শ্রীশরচ্চন্দ্র নাথ, বি-এল মহাশয়ের সভাপতিত্বে আসাম-বঙ্গ যোগি-যুবসঙ্ঘের ৫ম বার্ষিক অধিবেশন হয়। বঙ্গের সুসন্তান আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় এই অধিবেশনে শুভাগমন করিয়া ইহার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। বহু মুসলমান ও ভিন্ন জাতীয় হিন্দুযুবক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া অধিবেশনকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছিলেন।

বিশেষ অধিবেশনঃ—আসাম গভর্ণমেণ্ট সুরমা উপত্যকা বিভাগের [শ্রীহট্ট (১) ও কাছাড়] যোগিজাতিকে অনুন্নত জাতির তালিকাভুক্ত করায় সমগ্র জাতির পক্ষ হইতে ইহার তীব্র প্রতিবাদ করা হয়। বহুসংখ্যক আবেদন নিবেদন প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়। নিম্নে দুইখানি নিবেদনের অবিকল নকল প্রদত্ত হইল :

আসামবাসী নাথ-যোগিগণের "ভাগ্য-বিপর্য্যয়" শীর্ষক নিবেদনে বলা হইয়াছে—

১৩৪০ বাং ১৬ই ফাল্গুনের আনন্দবাজার পত্রিকায় দেখা গেল যে, আসাম নির্ব্বাচকমণ্ডলীর মধ্যে সদস্যপদ লইয়া খুব মতভেদ ঘটিয়াছে, এবং ঐ বিষয় মীমাংসার জন্য কামরূপের ডেপুটী কমিশনারের সভাপতিত্বে একটি আলোচনা-সভা হইয়াছিল। তদুপলক্ষে এসোসিয়েটেড্ প্রেসের সংবাদে প্রকাশ, "এখন সমস্যা হইতেছে এই যে, সুত ও নাথ সম্প্রদায়কে (আসামের) অনুন্নত সম্প্রদায়ের পর্য্যায়ে ফেলা হইবে কি না। আর যদি ফেলা হয় উহারা সংরক্ষিত আসনের অধিকারী হইবে কি না। বিষয়টী উভয় সম্প্রদায়ের মীমাংসার জন্য পাঠান হইয়াছিল। জানা গিয়াছে যে, তাঁহারা অনুন্নত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত থাকিতে চাহেন। লোক-গণনার সুপারিণ্টেডেণ্ট ইঁহাদের 'হিন্দু বহির্ব্বর্ত্তী শ্রেণী' এই আখ্যা দিয়াছেন।"

(১) বর্ত্তমান পাকিস্তানের শ্রীহট্ট জেলা পূর্ব্বে আসাম গভর্ণমেণ্টের সুরমা উপত্যকাবিভাগের অধীনে ছিল।

এসোসিয়েটেড্ প্রেসের এই সংবাদ সম্পূর্ণ সত্য কি না তাহা কোন সরকারী কাগজপত্রে প্রকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত সঠিক জানা যাইতেছে না। যদি ইহা সত্য হয় তাহা হইলে আসামবাসী যোগি-সম্প্রদায়ের পক্ষে ইহা নিদারুণ বিড়ম্বনা সন্দেহ নাই। কারণ আমরা যতদূর জানি তাহাতে ইতঃপূর্ব্বে আসাম গেজেটে অনুন্নত শ্রেণীর যে তালিকা বাহির হইয়াছিল তাহাতে যোগী বা নাথ-সম্প্রদায়ের কোন উল্লেখ ছিল না। সম্ভবতঃ ইতঃমধ্যে আসামবাসী যোগিগণের কোন স্বয়ংসিদ্ধ অভিভাবক বোধ হয় ব্যক্তিগত প্রয়োজনে, আসামী নাথ যোগীদিগকে কেবলমাত্র অনুন্নত শ্রেণীভুক্তির ব্যবস্থা করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই—তাহাদিগকে একেবারেই "হিন্দু বহির্ব্বর্ত্তী শ্রেণী" করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন।

কয়েক মাস পূর্ব্বে, বঙ্গবাসী নাথযোগিগণ, কলিকাতা গেজেটে আপনাদিগকে অনুন্নত শ্রেণীভুক্ত দেখিয়া তুমুল আন্দোলন ও তীব্র প্রতিবাদ আরম্ভ করিয়াছেন এবং খুব সম্ভব এ যাবৎ বঙ্গের বিভিন্ন স্থান হইতে বোধ হয় শতাধিক প্রতিবাদ-পত্র সরকারী দপ্তরে প্রেরিত হইয়াছে। এসোসিয়েটেড্ প্রেসের এই সংবাদ পাইয়া অতঃপর আসামবাসী যোগিগণও আর নীরব থাকিতে পারিবেন না। আসামের কোন স্থানের কে বা কাহারা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে আসামবাসী যোগিগণের ললাটে যে কলঙ্ককালিমা লিপ্ত করিয়াছেন তাহা যখন সত্যপ্রিয় সরল আসামবাসী যোগিগণ আকস্মিক অশনিপাতের মত অবগত হইবেন তখন নিশ্চয়ই তাঁহারা নিশ্চিন্ত না থাকিয়া প্রত্যেক বাড়ী হইতে, গ্রাম হইতে, জেলা হইতে এবং সমগ্র আসাম হইতে এই অসম্মান ও বেদনার তীব্র প্রতিবাদ আরম্ভ করিতে অগ্রসর হইবেন।

যোগিজাতির উচ্চ সম্মানের আদর্শ লইয়া ইতঃপূর্ব্বে আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনীর দ্বাদশ অধিবেশনে নওগাঁ জেলায়, ত্রয়োদশ অধিবেশনে কামরূপ জেলায়, এবং অষ্টাদশ অধিবেশনে কাছাড় জেলায়, সমগ্র আসামবাসী যোগি-গণের যে অসামান্য উৎসাহ দেখা গিয়াছে, এবং আসামের বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানী

প্রবীণ জননেতা স্বর্গীয় হরিপ্রসাদ নাথ, শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনারায়ণ নাথ এবং শ্রীযুক্ত দীননাথ লস্কর মহাশয়দিগকে যথাক্রমে আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনীর তৃতীয় অধিবেশনে, চতুর্দ্দশ অধিবেশনে ও উনবিংশ অধিবেশনে সভাপতিরূপে ওজস্বিনী ভাষায় যে ভাবে যোগিজাতির উচ্চজাতিত্বের ঘোষণা করিতে শোনা গিয়াছে; যে আসামবাসী নব্য নেতাগণের মধ্য হইতে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র নাথ মজুমদার মহাশয় "রাজগুরু যোগিবংশ" প্রচার করিয়া আসাম ও বঙ্গের সমগ্র যোগিজাতির মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন; এবং বল্লালী বিকৃত নীতির ফলে বঙ্গবাসী যোগিগণের সর্ব্বনাশ হইলেও যে আসামের যোগিসম্প্রদায় আপনাদের জাতীয় স্বাতন্ত্র্য ও মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই আসামবাসী যোগিগণের মধ্য হইতে আজ যে কেহ কেহ কোন এক অজানা মরীচিকার অনুসন্ধানে আপনাদিগকে অনুন্নত শ্রেণীভুক্ত করিয়া সমগ্র যোগিজাতির আত্মসম্মান বিসর্জ্জন দিবেন ইহা সহজে বিশ্বাস করিতে পারা যায় না।

হে আমাদের আসামবাসী যোগিবন্ধুগণ, আপনাদের মধ্যে যাঁহারা অনুন্নত পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া আপনাদের নিজের এবং বঙ্গবাসী যোগিভ্রাতাগণের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনীর উদ্দেশ্য ও আদর্শ পণ্ড করিতে উদ্যত হইয়াছেন, যাঁহারা বিরাট হিন্দুসমাজ হইতে বহির্ভূত হইয়া যোগিজাতিকে এক অভূতপূর্ব্ব অদ্ভুত জাতির পর্য্যায়ভুক্ত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন তাঁহাদের এই মর্ম্মান্তিক অপকার্য্যের প্রতিকারের জন্য গ্রামে গ্রামে, জেলায় জেলায় এবং সমগ্র আসামে সভা করিয়া আপনাদের তীব্র প্রতিবাদ আসাম সরকারকে জ্ঞাত করিতে বিলম্ব করিবেন না।

বিনীত—

শ্রীঅম্বিকাচরণ নাথ, বি-এল, সভাপতি, আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনী, ঢাকা। শ্রীহরিমোহন নাথ, মোক্তার, সম্পাদক, আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনী, চট্টগ্রাম। শ্রীঅরবিন্দবন্ধু নাথ, এফ-টি-এস, বেনারস। শ্রীনরেন্দ্রনাথ দালাল, এডভোকেট,

হাইকোর্ট, কাউন্সিলার কলিকাতা কর্পোরেশন। শ্রীপাঁচকড়িলাল নাথ, বি-এল, এডভোকেট, হাইকোর্ট, কলিকাতা, সভাপতি, রিফর্ম্ম ফাইনান্স কমিটী, কলিকাতা। শ্রীক্ষেত্রনাথ দালাল, এম-এ, বি-এল, ম্যানেজিং ডাইরেক্টার, নাথ-ব্যাঙ্ক, কলিকাতা। শ্রীভূষণচন্দ্র নাথ, এম-এ, বি-ই-ডি, সৎসঙ্গ আশ্রম, পাবনা। শ্রীযদুবর নাথ, বি-এল, উকীল, কলিকাতা। শ্রীশশীকুমার ভৌমিক, উকীল, আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনীর প্রতিনিধি-সভা ও রিফর্ম্ম ইমারজেন্সি কমিটীর সভাপতি। শ্রীহরেন্দ্রনাথ নাথ, বি-এল। শ্রীইন্দুভূষণ নাথ। শ্রীপ্রমথনাথ নাথ, বি, এ। শ্রীশচীন্দ্রকুমার রায়, জমিদার, নোয়াখালী। শ্রীচন্দ্রশেখর ভৌমিক, বি-এল, এডভোকেট; কলিকাতা হাইকোর্ট। শ্রীভবেন্দ্রলাল নাথ, বি-এসসি, কলিকাতা। শ্রীরামচরণ নাথ, এম-এ, বি-এল, বরিশাল। শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র নাথ, কলিকাতা। শ্রীনরেন্দ্রকুমার ভৌমিক, বি-এল, উকীল, কলিকাতা। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ নাথ, কলিকাতা। শ্রীগীতাচরণ দেবনাথ ভট্টাচার্য্য, কলিকাতা।

"আসামবাসী যোগিগণের প্রতি" শীর্ষক নিবেদনে বলা হইয়াছে—

"আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে, প্রস্তাবিত শাসন-সংস্কারে বাঙ্গালা ও আসাম প্রদেশের হিন্দুগণকে—বর্ণ-হিন্দু ও অবনত হিন্দু—এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে গভর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিয়াছিলেন যে বঙ্গ ও আসামের নাথগণ বা যোগিজাতি অবনত হিন্দু-শ্রেণীর তালিকাভুক্ত হইবার যোগ্য। কিন্তু আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনী ও সমগ্র বঙ্গবাসী যোগিগণের তীব্র প্রতিবাদে বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট বাঙ্গালার যোগী বা নাথদিগকে উক্ত অবনত হিন্দুর তালিকা হইতে খারিজ করিয়া বঙ্গীয় যোগিজাতির প্রতি সুবিচার করিয়াছেন। আসাম গভর্ণমেণ্ট এযাবৎ আসামবাসী কাছাড় ও শ্রীহট্টের যোগীদিগকে হিন্দু বহির্ভূত-শ্রেণীর (Hindu Exterior Caste) তালিকা হইতে খারিজ করেন নাই। তজ্জন্য সম্মিলনীর গত চুয়াডাঙ্গা অধিবেশনের ১৬শ প্রস্তাব অনুসারে, সম্মিলনীর স্থায়ী সভাপতি শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ নাথ, এম-এ, বিদ্যাবাচস্পতি

মহাশয় ১লা ফেব্রুয়ারি তারিখে সম্মিলনীর তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়া আসাম গভর্ণমেণ্টকে একখানি পত্র দিয়াছিলেন; সম্প্রতি ৯ই ফেব্রুয়ারি তারিখে আসাম গভর্ণমেণ্টের রিফর্ম্ম অফিসার উক্ত পত্রের উত্তর দিয়াছেন। (নিম্নে পত্রখানি অবিকল মুদ্রিত করা হইল।) উক্ত পত্রের মর্ম্ম এই যে,—"আসামের নাথগণের অবস্থা সম্বন্ধে আপনি যে মত প্রকাশ করিয়াছেন আমি তাহা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহি। অধিকন্তু আসামবাসী যোগীদের পক্ষে আপনার যে কিছু বলিবার অধিকার আছে এ কথাও আমি স্বীকার করিতে পারি না। যেহেতু আসামের নাথদিগের মধ্যে অনেকেই আপনার অভিমতকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিয়াছেন। আর একটি কথা এই যে, আগামী সপ্তাহে শিলং সহরে অবনত শ্রেণীর লোকদের একটী সভা আহূত হইবে, উহাতে যোগদান করিবার নিমিত্ত অনেক বিশিষ্ট নাথ ভদ্রলোক ওসম্বন্ধে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন।"

আসামবাসী যোগিগণের উপর, আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনীর অধিকার অস্বীকার করিতে কে বা কাহারা যে আসাম গভর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দিয়াছে তাহা অদ্যাপি আমরা অবগত নহি। কিন্তু আসাম গভর্ণমেণ্টের এইরূপ অন্যায় অভিমতের ফলে আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনী বিশেষভাবে অপমানিত মনে করিয়াছেন। হইতে পারে, আসামের কয়েকজন ব্যক্তি ব্যক্তিগত স্বার্থ সাধন উদ্দেশ্যে সম্মিলনীর অধিকার ও উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়াছে এবং আপনাদিগকে আসামবাসী যোগিগণের স্বয়ং প্রতিনিধি মনে করিয়া অনুন্নত শ্রেণীভুক্ত হইবার জন্য আসাম গভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়াছে কিন্তু আসামের সমগ্র যোগিজাতি যে এইরূপ জন কয়েক ব্যক্তির পরামর্শ গ্রহণ করিয়া এবং আপনাদিগকে অবনত শ্রেণীভুক্ত করিয়া বাঙ্গালার যোগিগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে চাহিবেন ইহা আমরা আদৌ বিশ্বাস করিতে পারি না। কারণ সম্মিলনীর প্রায় প্রত্যেক অধিবেশনে বাঙ্গালার যোগিগণের সহিত আসামবাসী যোগিগণ, জাতীয় উন্নতির আশা, উদ্দেশ্য ও সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় সম্পূর্ণ একমত ছিলেন এবং এখনও আছেন। ধর্ম্মে,

কর্ম্মে, সামাজিক মর্য্যাদায় বঙ্গবাসী যোগিগণের সহিত আসামবাসী যোগিগণের কোন পার্থক্য নাই। উভয় প্রদেশের প্রতিনিধিগণ প্রায় পঁচিশ বৎসর যাবৎ একযোগে যোগিজাতির উন্নতিকর আন্দোলন করিয়া আসিতেছেন। আজ কাহারও কোন প্রলোভনেই এতদিনকার প্রতিষ্ঠিত একতা বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না। আসামের যাহারা এইরূপ বিচ্ছেদ ঘটাইয়া আসামবাসী যোগিগণের ললাটে কলঙ্ককালিমা লিপ্ত করিতে অগ্রসর হইতেছে, আসামবাসী যোগিগণ কোন প্রলোভনেই তাহাদের নেতৃত্ব স্বীকার করিবেন না।

আসাম গভর্ণমেণ্টের ভ্রম অপনোদনের জন্য, বঙ্গ ও আসামের যোগিজাতির মধ্যে একতা রক্ষার জন্য, আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনীর মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, এবং সর্ব্বোপরি আসামবাসী যোগিগণকে হিন্দু-সাধারণের অন্তর্ভুক্ত রাখিবার জন্য, আপনারা অবিলম্বে প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক নগরে, প্রত্যেক জেলায় সভা আহ্বান করিয়া রিফর্ম্ম অফিসারের মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করুন এবং আসাম গভর্ণমেণ্টকে বুঝাইয়া দিন যে, আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনীই আসাম ও বঙ্গের যোগিজাতির একমাত্র সাধারণ সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং আসামবাসী যোগিগণের পক্ষে কথা বলিবার সম্পূর্ণ অধিকার আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনীর আছে, এবং আসামবাসী যোগিগণ কোন প্রলোভনেই সাধারণ বর্ণ-হিন্দু হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অনুন্নত শ্রেণীভুক্ত হইতে চায় না।

ঐ সকল সভায় গৃহীত প্রস্তাব ও প্রতিবাদ সমূহ আসাম গভর্ণমেণ্টের রিফর্ম্ম অফিসারের নিকট এবং আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনীর সম্পাদকের নিকট পাঠাইয়া সম্মিলনী ও সমগ্র যোগিজাতির সম্ভ্রম রক্ষা করুন—ইহাই আমাদের বিনীত নিবেদন। ইতি—

বিনীত আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনীর পরিচালক সমিতির সদস্যগণ—

শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ, শ্রীনরেন্দ্রনাথ দালাল, শ্রীচন্দ্রশেখর ভৌমিক, শ্রীইন্দুভূষণ

নাথ, শ্রীপ্রমথনাথ নাথ, শ্রীসুরেশচন্দ্র নাথ মজুমদার, শ্রীশরচ্চন্দ্র নাথ, শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র নাথ, শ্রীরামচরণ নাথ।

N. B—[রিফর্ম্ম অফিসারের পত্রের অবিকল নকল (True Copy)].

Government of Assam.
Reforms Office—No. 2079 Fr.

From C. S. Mullan, Esq. M. A., I C. S, Reforms Officer
to the Government of Assam

To Babu Radhagabinda Nath, M. A., President, Assam-Banga Yogi-Sammilani, Chuadanga (Nadia).

Shillong, the 9th February, 1934.

Sir,

With reference to your letter No. 105, dated the 18th February, 1934, I have the honour to say that I am not prepared to accept your opinion on the position of the Naths of Assam nor indeed can I accept your claim to speak on behalf of them when so many of them have entirely repudiated your views. I am to add that a conference of the Depressed classes will be held at Shillong next week and that many prominent Nath gentlemen of this province have gladly accepted the invitation to attend it.

Your obedient servent,
C. S. Mullan,
Reforms Officer to the Government of Assam.

আমাদের যোগিজাতি এ সব আবেদনে বিশেষভাবে সাড়া দিয়াছিলেন। এ সমস্ত অবিচারের প্রতিকারের জন্য সম্মিলনীর ওয়ার্কিং কমিটীর নির্দ্দেশে শ্রীসুরেশচন্দ্র নাথ মজুমদার মহাশয়ের উদ্যোগে ও তাঁহারই সভাপতিত্বে শ্রীহট্টের ভাড়াউড়া নিবাসী ৺নবীনচন্দ্র নাথ মহাশয়ের বাড়ীতে ১৩৪১ বাঙ্গালার ১৮ই আষাঢ় তারিখে এক সভা হয়। সে সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৬ই ভাদ্র তারিখে

শ্রীহট্টের সিংহবীজ গ্রামে আচার্য্য অম্বিকাচরণ নাথ, বি-এল মহাশয়ের সভাপতিত্বে আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনীর এবং শ্রীহট্টের ৺লোকনাথ নাথ মহাশয়ের সভা-তিত্বে সুরমা উপত্যকা (শ্রীহট্ট, কাছাড়) যোগি-সম্মিলনীর এক একটি বিশেষ ধিবেশন হইয়াছিল। প্রথমোক্ত সভায় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ৺লোকনাথ থ ও সম্পাদক শ্রীসুরেশচন্দ্র নাথ মজুমদার মহাশয়দ্বয় সকলকে অভ্যর্থনা ন(১)। উভয় সভায় সরকার বাহাদুরের কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া স্তাব গৃহীত হয়। সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টার ফলে গভর্ণমেণ্ট যোগিজাতির নাম অনুন্নত জাতির তালিকা হইতে খারিজ করিতে বাধ্য হন (আসাম গভর্ণমেণ্টের শাসন সংস্কার বিভাগের ১৯৩৫ ইং ১লা মার্চ্চ তারিখের ২৪০০—০১ এফ—আর নম্বর ও ২৪০২—০৩ এফ—আর নং আদেশ দ্রষ্টব্য)।

এই আন্দোলনের নেতাগণের মধ্যে ৺লোচনমণি নাথ, ৺রাজেন্দ্রলাল নাথ, ৺দুলালচন্দ্র নাথ চৌধুরী, ৺গোলকচন্দ্র নাথ বড়ভুঞা প্রমুখ স্বর্গীয় নেতৃবৃন্দের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এ সময় আন্দোলন পরিচালনার অর্থাদি সংগ্রহের জন্য শ্রীসুরেশচন্দ্র নাথ জুমদার মহাশয়ের সভাপতিত্বে 'সুরমা ভেলি নাথ ইমারজেন্সি ভাণ্ডার' প্রতিষ্ঠিত ইয়াছিল (যোগিসখা—কার্ত্তিক ১৩৪১ বাং, ২২৫ পৃঃ)।

২৫। পঞ্চবিংশ বার্ষিক অধিবেশনঃ— ১৩৪২ বঙ্গাব্দের ৭ই ও ৮ই বৈশাখ তারিখে বগুড়া সহরের টাউন হলে জমিদার শ্রীনরেন্দ্রনাথ দালাল, বি-এল মহাশয়ের সভাপতিত্বে উক্ত অধিবেশন হয়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, বি-এল, উকিল ও সম্পাদক ৺নীলকণ্ঠ পণ্ডিত সকলকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। এই অধিবেশনের সঙ্গে হাইকোর্টের এডভোকেট শ্রীচন্দ্রশেখর ভৌমিক, বি-এল মহাশয়ের সভাপতিত্বে আসাম-বঙ্গ যোগি-যুব-

(১) যোগিসখা—কার্ত্তিক, ১৩৪১বাং, ২১৭ পৃঃ।

সঙ্ঘের ৬ষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল। সভায় স্বজাতি ও স্বদেশের উন্নতি-জনক নানা বিষয় আলোচনা হইয়াছিল।

২৬। **ষড়্‌বিংশ বার্ষিক অধিবেশন**ঃ— আসামের দরং জিলার মঙ্গলদৈ মহকুমার ঘোড়াবান্ধা গ্রামে ১৩৪২ বঙ্গাব্দের ২৯শে ও ৩০শে চৈত্র তারিখে নোয়াখালির শ্রীচন্দ্রশেখর ভৌমিক, বি-এল, এ্যাড্‌ভোকেট মহাশয়ের সভাপতিত্বে উক্ত অধিবেশন, এবং কাছাড়ের শ্রীসুরেশচন্দ্র নাথ মজুমদার মহাশয়ের সভাপতিত্বে আসাম-বঙ্গ যোগি-যুবসঙ্ঘের ৭ম বার্ষিক অধিবেশন হয়। সভায় প্রায় তিন হাজার স্বজাতি, শতাধিক বিশিষ্ট ভিন্ন জাতি, এবং প্রায় শতাধিক মহিলা সমবেত হইয়াছিলেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীনবীনচন্দ্র ডেকা, সহঃ সভাপতি শ্রীহলিরাম নাথ ও সম্পাদক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ ভুঞা মহাশয়গণ স্বেচ্ছা-সেবক, প্রতিনিধি, দর্শক প্রভৃতি সমভিব্যাহারে ঐক্যতান বাদন সহকারে সভাপতি মহাশয়দ্বয়ের অভ্যর্থনা করেন। সম্মিলনীর এবারকার অধিবেশনের বিশেষত্ব এই যে নূতন নির্ব্বাচনে সম্মিলনী প্রায় সম্পূর্ণভাবে নবীনদের হাতে আসিয়া পড়ে। নবীনদের প্রতি প্রবীণদের যে অবিশ্বাস তাহা এবার প্রায় সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত হয়।

২৭। **সপ্তবিংশ বার্ষিক অধিবেশন**ঃ— ১৩৪৩ বাঙ্গালার ১৩ই ও ১৪ই চৈত্র তারিখে কামরূপ জেলার সরভোগ গ্রামে জমিদার শ্রীনরেন্দ্রনাথ দালাল (২৪ পরগণা) মহাশয়ের সভাপতিত্বে উক্ত অধিবেশন হয়। মহিলাগণসহ সভায় প্রায় এক হাজার লোক সমবেত হইয়াছিলেন। উক্ত অধিবেশনের সঙ্গে শ্রীহট্টের শ্রীদুর্গাচরণ নাথ মহাশয়ের সভাপতিত্বে আসাম-বঙ্গ যোগি-যুব-সঙ্ঘের ৮ম বার্ষিক অধিবেশনও হইয়াছিল। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীভোগরাম নাথ মহাশয়ের নেতৃত্বে এক জনসঙ্ঘ ঐক্যতান বাদন সহকারে সভাপতি মহাশয়দ্বয়ের অভ্যর্থনা করেন। নির্ব্বাচিত সভাপতি শ্রদ্ধেয় নরেন্দ্রবাবু প্রথম দিনের সভার পর বিশেষ কারণে বিদায় গ্রহণ করায়, শ্রীচন্দ্রশেখর ভৌমিক, বি-এল মহাশয়ের সভাপতিত্বে ২য় দিনের কার্য্য শেষ হয়।

২৮। **অষ্টাবিংশ বার্ষিক অধিবেশন**ঃ— আচার্য্য অম্বিকাচরণ নাথ, বি-এল (ঢাকা) মহাশয়ের সভাপতিত্বে ১৩৪৫ বাঙ্গালার ৩রা ও ৪ঠা বৈশাখ তারিখে চট্টগ্রাম সহরে উক্ত অধিবেশন হয়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নাথবন্ধু ৺হরিমোহন নাথ ও সম্পাদক শ্রীরমেন্দ্রমোহন নাথ, বি-এল, উকীল মহাশয়দ্বয় সকলকে অভ্যর্থনা করেন। সভায় গৃহীত প্রস্তাবালীর মধ্যে সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠাদিবস পালন, বস্ত্রশিল্প ও কুটীরশিল্পের উন্নতির জন্য প্রচারকার্য্য করা এবং বয়নশিল্পের পুনরুদ্ধারমানসে ভ্রাম্যমান বয়নবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারী দৃষ্টি আকর্ষণ করা ইত্যাকার প্রস্তাবগুলিই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই অধিবেশনের সঙ্গে গোয়ালপাড়ার শ্রীযুক্তা অবলা নাথ, বি-এ মহাশয়ার সভানেতৃত্বে আসাম-বঙ্গ যোগি-যুবসঙ্ঘের ৯ম বার্ষিক অধিবেশন হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তিনি সভায় উপস্থিত হইতে না পারায় শ্রীহট্টের উকিল শ্রীহলধর ভৌমিক, বি-এল মহাশয়ের সভাপতিত্বে উক্ত অধিবেশন হয়।

২৯। **উনত্রিংশ বার্ষিক অধিবেশন**ঃ—১৩৪৫ বাঙ্গালার ২৫শে ও ২৬শে চৈত্র তারিখে গোয়ালপাড়া জিলার লক্ষ্মীগঞ্জ বাজারের খুটাখাট গ্রামে কাছাড়ের শ্রীসুরেশচন্দ্র নাথ মজুমদার মহাশয়ের সভাপতিত্বে ২৯শ বার্ষিক অধিবেশন এবং চট্টগ্রামের শ্রীদেবেন্দ্রকুমার নাথ মহাশয়ের সভাপতিত্বে আসাম-বঙ্গ যোগি-যুবসঙ্ঘের ১০ম বার্ষিক অধিবেশন হয়। অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক ৺যোগেন্দ্রচন্দ্র নাথ মহাশয়ের নেতৃত্বে অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যগণ, প্রতিনিধি, দর্শক এবং তিন শতাধিক স্বেচ্ছাসেবকসহ ঐক্যতান বাদন সহকারে নানাবিধ ধ্বনি ও কুললক্ষ্মীদের হুলুধ্বনির মধ্যে সভাপতিদ্বয়কে অভ্যর্থনা করা হয়। সভায় প্রায় চারি হাজার জনসমাগম হইয়াছিল। ইঁহাদের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যা পাঁচ শত হইবে। এই অধিবেশনে যত অধিক সংখ্যক স্বজাতীয় এবং অপর জাতীয় মহিলা যোগদান করিয়াছিলেন সম্মিলনীর আর কোন অধিবেশনে সেরূপ দেখা যায় নাই। সভায় গৃহীত প্রস্তাবাবলীর মধ্যে যে সব স্বজাতি ভিন্ন ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন,

তাঁহারা বা তাঁহাদের বংশধরগণ যথাযোগ্য শুদ্ধিকার্য্য করিয়া এই জাতির অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিবেন এই প্রস্তাবটিই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ত্রিংশ বার্ষিক অধিবেশনঃ—১৩৪৭ বঙ্গাব্দের ১৮ই ও ১৯শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে রংপুর জিলার শাঁখারিপাড়া গ্রামে অধ্যাপক শ্রীরামচরণ নাথ, এম-এ, বি-এল মহাশয়ের সভাপতিত্বে সম্মিলনীর ৩০শ বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল। সভায় পাঁচ শতাধিক লোক উপস্থিত ছিলেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীরাসবিহারী নাথ এবং সম্পাদক শ্রীসুকুমার নাথ মহাশয়দ্বয়ের নেতৃত্বে একদল স্বেচ্ছাসেবক ও নেতৃবৃন্দ ভূতছড়া রেলষ্টেসন হইতে সভাপতি মহাশয়কে যথাযোগ্য সম্বর্দ্ধনা সহকারে সভাস্থলে লইয়া আসেন। এই সভায় যে সব প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল সেগুলির মধ্যে নিখিল-ভারত যোগি-সম্মিলনী গঠন উদ্দেশ্যে শ্রীচন্দ্রশেখর ভৌমিক, বি-এল, শ্রীসুরেশচন্দ্র নাথ মজুমদার, শ্রীরেবতীমোহন ভৌমিক, বি-টি, অধ্যাপক শ্রীরামচরণ নাথ, এম-এ, বি-এল, শ্রীভবেন্দ্র লাল নাথ, বি, এস-সি এবং শ্রীহরিপ্রসাদ নাথ মহাশয়গণকে লইয়া একটি অনুসন্ধান সমিতি গঠনের প্রস্তাবই উল্লেখযোগ্য।

৩১। **একত্রিংশ বার্ষিক অধিবেশন**ঃ—১৩৪৮ বাঙ্গালার ১৭ই ও ১৮ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে ঢাকা জিলার শিবালয়ের বিশাল যমুনা-সৈকতে উক্ত অধিবেশন হয়। খুলনার শ্রীশরচ্চন্দ্র নাথ, বি-এল, উকিল মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি, সম্পাদক, অন্যান্য সদস্যবৃন্দ, স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী এবং প্রতিনিধি ও দর্শকগণ যথাযোগ্য সম্বর্দ্ধনা সহকারে সভাপতি মহাশয়ের অভ্যর্থনা করেন। সভায় প্রায় আট শত প্রতিনিধি ও দর্শক যোগদান করিয়াছিলেন। সভায় গৃহীত প্রস্তাবাবলীর মধ্যে ভারতের কুটীর-শিল্পের প্রধান বস্ত্র বয়নশিল্পের প্রসার বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা, বাঙ্গালাদেশের স্কুলে বালকদের সহিত বালিকাদের সহশিক্ষার আইন রহিত করা, এবং ঢাকা জিলার দাঙ্গায় দুর্গত স্বজাতিদের অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করার প্রস্তাবই উল্লেখযোগ্য।

এই অধিবেশনের সঙ্গে চট্টগ্রামের শ্রীযুক্তা মহামায়া দেবীর সভানেতৃত্বে আসাম-বঙ্গ যোগি-যুবসঙ্ঘের ১২শ বার্ষিক অধিবেশন হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু অনুমতি লওয়ার ক্রটীতে পুলিশ আপত্তি উত্থাপন করায় এই অধিবেশন হয় নাই।

৩২। **দ্বাত্রিংশ বার্ষিক অধিবেশন** ঃ— ১৩৪৮ বাঙ্গালায় পৃথিবীব্যাপী প্রলয়ঙ্কর মহাযুদ্ধের ফলে অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব প্রভৃতি বিশ্বব্যাপী হাহাকারের মধ্যে এই অধিবেশন হয় নাই।

৩৩। **ত্রয়ত্রিংশ বার্ষিক অধিবেশন** ঃ—(১৩৪৯ বাং) উপরোক্ত কারণে এই অধিবেশনও হয় নাই।

৩৪। **চতুস্ত্রিংশ বার্ষিক অধিবেশন** ঃ— (১৩৫০ বাং) উপরোক্ত কারণে এই অধিবেশনও হয় নাই।

৩৫। **পঞ্চত্রিংশ বার্ষিক অধিবেশন** ঃ—১৩৫১ বাঙ্গালার ২রা চৈত্র তারিখে নাথবন্ধু ৺হরিমোহনের জন্মভূমি চট্টগ্রামের ডোমখালী গ্রামে তাঁহার বৎসরান্ত সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধবাসরে আচার্য্য শ্রীঅম্বিকাচরণ নাথ, বি-এল (ঢাকা) মহাশয়ের সভাপতিত্বে উক্ত অধিবেশন হইয়াছিল। সভায় গগনবিদারী বিবিধ জয়ধ্বনি, মঙ্গলসূচক বাদ্যধ্বনি এবং অবিরল পুষ্প ও লাজ বর্ষণের মধ্যে সম্মিলনী-সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ নাথ, বি-এ মহাশয় নাথবন্ধুর মর্ম্মরমূর্ত্তির আবরণ উন্মোচন করেন। সভায় গৃহীত প্রস্তাবাবলীর মধ্যে নাথবন্ধু প্রমুখ কয়েকজন স্বজাতিহিতৈষীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ, কারারুদ্ধ যুগাবতার মহাত্মা গান্ধীর মুক্তিতে আনন্দ প্রকাশ, কারারুদ্ধ অন্যান্য দেশকর্ম্মিগণের মুক্তির দাবী, বঙ্গীয় সরকারের সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বঙ্গীয় মাধ্যমিক শিক্ষাবিলের প্রত্যাহার দাবী এবং শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত (আনন্দবাজার—পূজাসংখ্যা, ১৩৫১ বাং) যোগিজাতির মর্য্যাদা-হানিকর ও গ্লানিকর 'মুক্তি' প্রবন্ধের তীব্র প্রতিবাদ সম্বন্ধীয় প্রস্তাবগুলিই উল্লেখযোগ্য।

৩৬। **ষড়ত্রিংশ বার্ষিক অধিবেশন** ঃ—১৩৫২ বঙ্গাব্দের ৯ই ও ১০ই

কার্ত্তিক তারিখে বরিশাল জিলার কাউখালি বন্দরে অধুনালুপ্ত সুপ্রসি
নাথব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডাইরেক্টার শ্রীক্ষেত্রনাথ দালাল, এম-এ, বি-এ
(নোয়াখালি) মহাশয়ের সভাপতিত্বে উক্ত অধিবেশন হইয়াছিল। অভ্যর্থন
সমিতির সভাপতি অধ্যাপক শ্রীরামচরণ নাথ মহাশয় সকলকে অভ্যর্থনা করেন
এক বিরাট জনসঙ্ঘ সভাপতি মহাশয়কে লইয়া বিবিধ জয়ধ্বনি পূর্ব্বক বন্দ
প্রদক্ষিণ করেন এবং বিপুলভাবে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। সভায় গৃহীত
প্রস্তাবাবলীর মধ্যে বস্ত্র ও সূতা সমস্যার সমাধানে যথাযোগ্য সহায়তা করা
তাঁতশিল্পের উন্নতির ব্যবস্থা করা, দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার অধিবাসীবৃন্দের
সাম্রাজ্যবাদীদের হস্ত হইতে মুক্তিলাভের প্রচেষ্টাকে সমর্থন, আজাদহিন্দ ফৌজের
বিচার-ব্যবস্থা স্থগিত রাখার জন্য গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ জ্ঞাপন এবং অনধিব
দুই মাসের মধ্যে আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনীকে গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী
করিয়া লওয়ার প্রস্তাবই উল্লেখযোগ্য। এই শেষ প্রস্তাবটি ১৩৩৬ বাঙ্গালা
ভেড়ামারা অধিবেশনে, ১৩৩৭ বাং নৈহাটি অধিবেশনে, এবং ১৩৫২ বা
কাউখালি অধিবেশনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইলেও অত্যন্ত পরিতাপের বিষ
সম্মিলনীর কর্ত্তৃপক্ষ দীর্ঘ তেইশ বৎসরেও ইহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারে
নাই।

বিশেষ অধিবেশন ঃ—বিশ্বব্যাপী নিদারুণ অস্বাভাবিক পরিস্থিতির জ
কাউখালি অধিবেশনের পর সম্মিলনীর আর কোন বাষিক অধিবেশন হয় নাই
সেজন্য সম্মিলনীর সাধারণ কাজকর্ম্ম অচল প্রায় হইয়া পড়িয়াছিল এবং ইহা
মাসিক মুখপত্র যোগিসখা পত্রিকা বন্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। তারপর দেশ
বিভাগের ফলে (ভারত ও পাকিস্তান) বঙ্গদেশ ও আসাম দ্বিধাবিভক্ত হই
পড়ে। সুতরাং দেশবিদেশের স্বজাতি-সাধারণের সঙ্গে সম্মিলনীর যোগসূ
ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। এসব সমস্যার সমাধান, জাতিকে এই প্রতিকূ
অবস্থায় সঙ্ঘবদ্ধ করণ, সম্মিলনী ও যোগিসখাকে পুনরুজ্জীবিত করণ এব

লোকগণনা, বাস্তুহারা সমস্যা ও আইন-সভার আসন্ন নির্ব্বাচনে আমাদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য বিগত ২১।১।৫১ ইংরাজি তারিখে কলিকাতার ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট হলে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ, এম-এ, বিদ্যাবাচস্পতি মহোদয়ের সভাপতিত্বে সম্মিলনীর একটী বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। সভায় তিন সহস্রাধিক পুরুষ এবং পাঁচ শতাধিক মহিলা সমবেত হইয়াছিলেন। জমিদার শ্রীনরেন্দ্রনাথ দালাল, বি-এল মহাশয় সভার উদ্বোধন করেন। এই সভার ফলে সম্মিলনীর অচলপ্রায় অবস্থা সচল হইল এবং ১৩৫৮ বাং বৈশাখ হইতে যোগিসখা প্রত্রিকাও প্রকাশিত হইতে লাগিল।

উ থান-পতন জগতের চিরন্তন নিয়ম। যে যোগিজাতি একদা সমাজে বরণীয় হইয়াছিল, কালের অলঙ্ঘনীয় নিয়মে সেই জাতির পুনরায় অবনতি ঘটিয়াছিল। সুতরাং সামাজিক মান-মর্য্যাদা হারাইয়া যোগিজাতি হিন্দুসমাজে লাঞ্ছিত হইতেছিল। রাজকোপ তাহাদের এই লাঞ্ছনা ও অধঃপতনের কারণ বলিয়া তাহারা রাজা বল্লাল সেনের উপর দোষারোপ করিয়া থাকে। রাজার সন্তোষ বা অসন্তোষ একটা জাতির ভাগ্যনিয়ন্ত্রণে যে অনেকটা সমর্থ তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু একটা জাতির অধঃপতনের প্রধান কারণ হইল তাহার আদর্শভ্রষ্টতা ও চরিত্রহীনতা। বল্লাল সেনের আমলে ত্যাগী যোগী ভোগী হইয়া পড়িয়াছিল। যোগ্যতা হারাইয়া লোভী, গর্ব্বিত, স্বার্থপর ও ক্ষমতালোলুপ হইয়াছিল। ইহার প্রমাণ আমরা "বল্লাল চরিত" বর্ণিত ধর্ম্মগিরির চরিত্রে পাইয়া থাকি। দীর্ঘকাল এইরূপ অধঃপতিত অবস্থায় কাটাইয়া যোগিজাতির মধ্যে আবার উত্থানের চেষ্টা লক্ষিত হইল। অবনতির পঙ্কে নিমজ্জিত থাকিলেও আভিজাত্যবোধের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ইহাদের অন্তঃকরণে বিদ্যমান ছিল। সেই স্ফুলিঙ্গই পুনঃ তাহাদিগকে উদ্বোধিত ও অনুপ্রাণিত করিল। কতিপয় সমাজহিতাকাঙ্ক্ষী ও চিন্তাশীল ব্যক্তি অগ্রণী হইয়া এই জাতির উদ্ধারকল্পে আত্মনিয়োগ করিলেন। তদবধি যে প্রচেষ্টা ও আন্দোলন এই জাতির মধ্যে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার ফলে দীর্ঘ দিনের

অবসাদ কাটাইয়া যোগিজাতি আবার জাগিয়া উঠিল। উন্নতির পথে তাহারা এক্ষণে অনেকখানি আগাইয়া গিয়াছে। তাহাদের মনে এখন আত্মচেতনা জাগিয়াছে ও উন্নতিলাভের বলবতী বাসনা ও চেষ্টা তাহাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হইতেছে। শুধু পূর্ব্ব-পুরুষের গৌরব ঘোষণা করিয়া কোন ব্যক্তি বা জাতি বড় হইতে পারে না। "সংসারে সেই বড় হয় বড় গুণ যার।" আদর্শে স্থির থাকিয়া যোগিজাতি যদি যোগ্যতা অর্জ্জনে সমর্থ হয়, তাহা হইলে তাহারা আরব্ধ মুক্তি-সংগ্রামে জয়লাভ করিতে পারিবে সন্দেহ নাই।

দশম অধ্যায়

ভারতবর্ষে যোগিজাতির সংখ্যা (১)

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট এদেশে লোকগণনার প্রথা সর্ব্বপ্রথম প্রবর্ত্তিত করেন। ইংরাজ সরকারের পূর্ব্বে এদেশে লোকগণনার প্রথা ছিল না। লোকগণনার ফলে প্রত্যেক জাতি আপনাদের স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যা জানিতে পারে; প্রত্যেক দশ বৎসরে তাহাদের সংখ্যার কি পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধি হইল এবং শিক্ষাদি বিষয়ে জাতির উন্নতি বা অবনতি কি পরিমাণ হইল তাহাও বুঝিতে পারে। ১৮৭১ খৃঃ অব্দ হইতে প্রতি দশ বৎসর অন্তর এক একবার ভারতে লোকগণনা হইয়া যাইতেছে। পূর্ব্বে এ প্রথা প্রচলিত ছিল না বলিয়া পূর্ব্বকালে কোন্ জাতির সংখ্যা কি পরিমাণ ছিল সম্যক জানিবার উপায় নাই। তবে প্রাচীন ভারতের যোগিজাতির প্রভাব-প্রতিপত্তির কথা পর্য্যালোচনা করিলে মনে হয় পূর্ব্বকালে ইঁহাদের সংখ্যা অল্প ছিল না। প্রসিদ্ধ বিদেশীয় ঐতিহাসিক টেলবয়েজ হুইলার সাহেব বলেন—পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে নাথেরা ধর্ম্ম চিন্তা করিয়া পবিত্রজীবন যাপন করিতেন। প্রাচীনকালে ইঁহারা সংখ্যায় অল্প ছিলেন না (ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ ও নেপালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—১১৬ পৃঃ, পাদটীকা)।

প্রত্যেক লোকগণনার পর ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট প্রত্যেক জাতি সম্বন্ধে অনাবশ্যকভাবে ভ্রমপূর্ণ অথবা অসম্পূর্ণ একটা বিবরণ প্রকাশ করিতেন। ইহা লোকগণনার বিষয়ীভূত নহে। এইরূপ প্রথা অন্য কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না। ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট জাতি-সংঘাত সৃষ্টি করিয়া ভারতীয় সমাজকে ছিন্নভিন্ন করতঃ

(১) এখানে ভারতবর্ষ বলিতে ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান এই উভয় রাষ্ট্রকেই বুঝিতে হইবে।

নিজদের শাসন কায়েম করারই পণ্ডশ্রম করিয়াছিলেন। "Divide and rule" অর্থাৎ ভেদবিভেদ সৃষ্টি করিয়া শাসন করাই ছিল তাঁহাদের লক্ষ্য।

ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট ১৮৭১, ১৮৮১, ১৮৯১, ১৯০১, ১৯১১, ১৯২১, ১৯৩১ এবং ১৯৪১ ইংরাজিতে এক একবার করিয়া মোট আট বার ভারতে লোকগণনা করিয়াছেন। ঐ সব সরকারী বিবরণী হইতে যোগিজাতি সম্বন্ধীয় সংগৃহীত তথ্য নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল। বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধের জন্য ১৯৪১ ইংরাজীর লোক-গণনার রিপোর্ট প্রকাশিত হয় নাই।

১৯৪৭ ইংরাজীর ১৫ই আগষ্ট ভারতবর্ষ দেশটিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে; ফলে একটি ক্ষুদ্র অংশ পাকিস্তান এবং বৃহৎ অংশ ভারতবর্ষ নামে খ্যাত হইয়াছে। এই অধ্যায়ে বিভিন্ন সনের লোকগণনায় যেসব বিবরণ উদ্ধৃত করা হইয়াছে, সেসব বর্ত্তমানের পাকিস্তান সহ অখণ্ড ভারতবর্ষের বিবরণ বলিয়া ধরিতে হইবে। যথা—আসাম বলিতে বর্ত্তমান পাকিস্তানের শ্রীহট্ট জিলা সহ, বঙ্গদেশ বলিতে বর্ত্তমান পাকিস্তানের পূর্ব্ববঙ্গ সহ (পূর্ব্ব-বঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ), পাঞ্জাব বলিতে পূর্ব্ব ও পশ্চিম পাঞ্জাব ইত্যাদিরূপে বুঝিতে হইবে।

এই অধ্যায়ের শেষভাগে যে সারাংশের তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে তাহাতে দেখা যাইবে যে কোন কোন গণনায় আমাদের সংখ্যা বিশেষভাবে হ্রাস পাইয়াছে। ইহার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে যে অনেক স্থানের যোগিজাতির পুরোহিতশ্রেণী নিজদিগকে যোগিজাতি পরিচয় না দিয়া ব্রাহ্মণজাতি বলিয়া লোকগণনার কাগজে লিখাইয়াছেন। এ সম্বন্ধে আসাম ও বঙ্গদেশের পুরোহিত শ্রেণীর কার্য্যই আদর্শস্থান দখল করিয়াছে। আসাম উপত্যকার কয়েক সহস্র যোগিজাতি অপর জাতির উস্কানিতে উৎসাহিত হইয়া জলাচরণীয় হইবার লোভে জাতির নাম গোপন করতঃ আপনাদিগকে কলিতা জাতি বলিয়া লোকগণনায় পরিচয় দিয়াছেন। শিবসাগর জিলাই উক্ত কাপুরুষোচিত কার্য্যের কেন্দ্রভূমি। উত্তরবঙ্গ ও পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন

অঞ্চলের যোগিজাতি আজও আত্মগোপন করিয়া থাকেন এবং কোন কোন অঞ্চলের যোগীরা আপনাদিগকে বৈরাগী (বৈষ্ণব) জাতি বলিয়া পরিচয় দিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইয়া কালযাপন করেন। লোকগণনার কাগজপত্রে ইঁহারা অনেকেই নিজদিগকে যোগিজাতি বলিয়া পরিচয় দেন নাই। ডাঃ সুকুমার সেন বলেন—"নাথপন্থী সন্ন্যাসী ও শ্রাবক একদা বাংলাদেশের সর্ব্বত্র ছিল। উত্তরবঙ্গ ছাড়া অন্যত্র এঁরা সাধু হলে বাউল-দরবেশ-বৈষ্ণবদের সঙ্গে মিশে গেছেন; গৃহস্থ হলে স্বতন্ত্র 'জুগী' জাতিতে পরিণত হইয়াছেন" (কল্যাণশ্রী ১৩৫৫ বাং, শারদীয়া সংখ্যা, নাথপন্থের দিশা)।

গোরক্ষপন্থী নাথযোগী সম্প্রদায়ের মধ্যে কখনও প্রাদেশিক ব্যবধান ছিল না। তাঁহারা স্বভাবতঃই পরিব্রাজক। সাধনসঙ্গীতের ছড়া গাহিয়া ইঁহারা ভিক্ষা করিয়া বেড়াইয়া থাকেন। ইঁহাদের অনেকেই বৈষয়িক কার্য্যের ধার ধারেন না। দারিদ্র্যবশতঃ অনেক স্থানের যোগিজাতি শিক্ষায় বঞ্চিত। লোকগণনার ব্যাপারে ইঁহাদের আগ্রহের অভাব সুবিদিত। অশিক্ষার ফলে ইত্যাকার নানা কারণে যে সংখ্যা হ্রাস হইয়াছে সে সম্বন্ধে সন্দেহ করা উচিত হইবে না।

আমরা ভারতবর্ষের (পাকিস্তানসহ) যে হিসাব সংগ্রহ করিয়াছি তাহা অসম্পূর্ণ। সমগ্র বিবরণ সংগ্রহ করা সময় ও ব্যয় সাপেক্ষ। আমরা সমগ্র ভারতের (পাকিস্তানসহ) যোগিজাতির মোট সংখ্যার মধ্যে মোটামুটি আট লক্ষ স্বজাতির সন্ধান পাইয়াছি। সমস্ত বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারিলেও সমগ্র ভারতে যোগিজাতির মোট সংখ্যা নির্দ্ধারণ করা সুকঠিন সন্দেহ নাই। কিন্তু স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস বলেন—"ভারতবর্ষে বিশ লক্ষ কবীরপন্থী, আট লক্ষ নানকপন্থী, **পঞ্চাশ লক্ষ নাথপন্থী,** প্রায় দুইক্রোড় রামায়ৎ ও তুলসী-রামী, এক লক্ষ দাদুপন্থী, পঞ্চাশ লক্ষ নাগাপন্থী এবং প্রায় পাঁচ ছয় ক্রোড় অন্যান্য পন্থীরা শ্বাসে প্রশ্বাসে নামজপ আজও করিতেছেন" (অখণ্ড-সংহিতা—৫ম খণ্ড, ১ম সং, ১৫৪ পৃঃ)।

নির্ভরযোগ্য কোন্ বিবরণের সহায্যে তিনি উক্ত সংখ্যা নির্ণয় করিয়াছেন জানি না। যে ৫০ লক্ষ নাথপন্থী শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম জপে ব্যস্ত, তাঁহারা সম্ভবতঃ বিষয়-বিরাগীই হইবেন। যদি তাহাই হয়, তবে বিষয়-বাসনালিপ্ত গৃহী যোগীর সংখ্যা কত ?

অখণ্ড বাঙ্গালাদেশের এবং আসামের যোগিজাতির মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গের যোগিজাতি সংখ্যায় ও সম্মানে উচ্চ আসন দখল করিয়াছিলেন। দারিদ্র্যবশতঃ উচ্চশিক্ষায় বঞ্চিত থাকিলেও পূর্ব্ববঙ্গের তিন সহস্রাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-ধারী ছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের বর্ত্তমান যোগিজাতির সংখ্যা পাঁচ লক্ষাধিক হইবে বলিয়া মনে হয়। পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার পর পূর্ব্ববঙ্গ বা পূর্ব্বপাকিস্তান হইতে দলে দলে যোগিজাতি পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের বিভিন্ন স্থানে আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছেন। আসামের বর্ত্তমান সংখ্যা দুই লক্ষাধিক হইবে বলিয়া অনুমিত হয়। তাহা হইলে পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের বর্ত্তমান যোগিজাতির সংখ্যা দাঁড়ায় মোটামুটি সাত লক্ষ।

আসামে যোগিজাতির সংখ্যা

(আসাম গভর্ণমেণ্টের ১৮৭১ সালের সেন্সাস্ রিপোর্ট হইতে সংগৃহীত)

জিলা	যোগী	কাটুনী(১)	মোট
গোয়ালপাড়া	৬৮৮৫	৮২২৬	১৫১১১
কামরূপ	৫৩১৪	৮৩৯৩	১৩৭০৭
দরঙ্গ	৯৬০০	৮৪৯৫	১৮০৯৫

(১) আসাম উপত্যকার যোগিজাতির মধ্যে যাহারা গুটীপোকা প্রতিপালন করে এবং তাহা হইতে উৎপন্ন সুতা কাটে তাহাদিগকে কাটুনী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ব্যবসায় হিসাবে এক জাতির মধ্যে এরূপ বিভাগের কোন যৌক্তিকতা দেখা যায় না।

জিল	যোগী	কাটনী	মোট
নওগাঁ	১৬৬৪	১৪৭৪৬	১৬৪১০
শিবসাগর	৪০৯০	১৩০৯	৫৩৯৯
আসাম উপত্যকার মোট	২৭৫৫৩	৪১১৬৯	৬৮৭২২
শ্রীহট্ট ও কাছাড়ের মোট সংখ্যা			৯৩৩৫০
আসাম প্রদেশের সর্ব্বমোট			১৬২০৭২

১৮৮১ সালের লোকগণনায় আসামের যোগিজাতি

(আসাম গভর্ণমেণ্টের ১৮৮১ সালের সেন্সাস্ রিপোর্ট হইতে সংগৃহীত)

জিলা	পুরুষ	স্ত্রী	মোট
কাছাড়	৪৪৮৩	৩৯৯২	৮৪৭৫ f
শ্রীহট্ট	৪২১৬৬	৪০০০৪	৮২১৭০
স্থরমা উপত্যকার মোট	৪৬৬৪৯	৪৩৯৯৬	৯০৬৪৫
জিলা	**যোগী**	**কাটুনী**	**মোট**
গোয়ালপাড়া	১৪৭৩১	×	১৪৭৩১
কামরূপ	৩৪১	১৯৩৪৮	১৯৬৮৯
দরং		১৭৯৩৭	১৭৯৩৭
নওগাঁ	৭০১২	১৬৬০৯	২৩৬২১
শিবসাগর		৫৪০৪	৫৪০৪
লক্ষীমপুর		৫৪৯	৫৪৯
আসাম উপত্যকার মোট	২২০৮৪	৫৯৮৪৭	৮১৯৩১
আসাম প্রদেশের সর্ব্বমোট			১৭২৫৭৬ জন

f আলোচ্য সনে কাছাড় জিলার শিলচর মহকুমার সংখ্যা—৫০৫০ জন এবং হাইলাকান্দি মহকুমার সংখ্যা ৩৪২৫ জন ছিল।

১৮৯১ সালের লোকগণনায় আসামের যোগিজাতি

(আসাম গভর্ণমেণ্টের ১৮৯১ সালের সেন্সাস্ রিপোর্ট হইতে সংগৃহীত)

জিলা	মোট সংখ্যা
কাছাড়	১১১৬৩ জন
শ্রীহট্ট	৭৭৩৯২ ,,
গোয়ালপাড়া	১৩৯৬৭ ,,
কামরূপ	১৭৪০৬ ,,
দরঙ্গ	১৮৭৯৫ ,,
নওগাঁ	২১৭৯২ ,,
শিবসাগর	৬২২১ ,,
লক্ষ্মীমপুর	৯৪৮ ,,
অন্যান্য জিলা	৬২ ,,
আসাম প্রদেশের সর্ব্বমোট	১৬৭৭৪৬

১৯০১ সালের লোকগণনায় আসামের যোগিজাতি

(আসাম গভর্ণমেণ্টের ১৯০১ সালের সেন্সাস্ রিপোর্ট হইতে সংগৃহীত)

জিলা	পুরুষ	স্ত্রী	মোট
কাছাড়	৫৭৫৫	৫২৯৩	১১০৪৮
শ্রীহট্ট	৩৯৬১৩	৩৯৩০২	৭৮৯১৫
গোয়ালপাড়া	৬৯০৪	৬৯০০	১৩৮০৪
কামরূপ	৮৬৩৬	৮৮১৮	১৭৪৫৪
দরং	৮৫৪২	৮৫০৮	১৭০৫০
নওগাঁ	৭৩৩৪	৭৭১১	১৫০৪৫
শিবসাগর	৩৪২৪	২৮৬৭	৬২৯১

জিলা	পুরুষ	স্ত্রী	মোট
লক্ষীমপুর	৭২৪	৬৮৫	১৪০৯
লুসাই পাহাড়	৪	×	৪
উত্তর কাছাড়	১০৫	১০	১১৫
নাগা পাহাড়	৩	×	৩
খাসিয়া জয়ন্তিয়া পাহাড়	১৩	২	১৫
গারো পাহাড়	৮	৫	১৩
আসাম প্রদেশের সর্ব্বমোট	৮১০৬৫ —	৭৯১০১ —	১৬০১৬৬

মণিপুর করদরাজ্যে পুরুষ—১ জন মাত্র।

১৯১১ সালের লোকগণনায় আসামের যোগিজাতি

(আসাম গভর্ণমেণ্টের ১৯১১ সালের সেন্সাস্ রিপোর্ট হইতে সংগৃহীত)

জিলা	পুরুষ	স্ত্রী	মোট
কাছাড়	৬২৭৮	৫৭১৫	১১৯৯৩
শ্রীহট্ট	৪০৪৩৩	৩৮৭০৯	৭৯১৪২
খাসিয়া জয়ন্তিয়া পাহাড়	৫৮	২	৬০
নাগা পাহাড়	×	×	×
লুসাই পাহাড়	৫	×	৫
গোয়ালপাড়া	৮৩০২	৭৯১৪	১৬২১৬
কামরূপ	৯৩৮৯	৯৪৪৭	১৮৮৩৬
দরং	৯০৮৪	৪৯০৭	১৩৯৯১
নওগাঁ	৮৪৬৬	৮৫৮১	১৭০৪৭

জিলা	পুরুষ		স্ত্রী		মোট
শিবসাগর	৩৩৫১		২৯৭৩		৬৩২৪
লক্ষীমপুর	৭৮৮		৬৭৮		১৪৬৬
গারো পাহাড়	১৪		×		১৪
আসাম প্রদেশের মোট	৮৬১৬৮	—	৭৮৯২৬	—	১৬৫০৯৪

আলোচ্য সনে মণিপুর করদ রাজ্যে কেবল পুরুষের সংখ্যা তিন জন মাত্র।

আসামে প্রত্যেক এক হাজার পুরুষের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা—১১১ জন। প্রত্যেক এক হাজার স্ত্রীলোকের মধ্যে শিক্ষিতার সংখ্যা—৫ জন। প্রত্যেক এক হাজার পুরুষ ও স্ত্রীলোকের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা—১৮ জন। প্রত্যেক এক হাজার পুরুষের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষিতের সংখ্যা—৩৫ জন। প্রত্যেক এক হাজার স্ত্রীলোকের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষিতা নাই।

১৯২১ ইং সালের সেন্সাসে আসামের যোগিজাতির সংখ্যা

(আসাম গভর্ণমেণ্টের ১৯২১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট হইতে সংগৃহীত)

(১) প্রতি জেলার লোকসংখ্যা :— যে জেলায় আমাদের স্বজাতীয় যত লোক আছেন তাহা নিম্নে লিখিত হইল :—

	জেলা	পুরুষ	স্ত্রী	মোট
	আসাম-প্রদেশ	৮২৯৯১	৭৮৪৫০	১৬১৪৪১
১।	সুরমা উপত্যকা ও পার্ব্বত্য বিভাগ—	৪২৩৭০	৩৯৯১৯	৮২২৮৯
	কাছাড়	৬৩৬১	৫৭২৯	১২০৯০
	শ্রীহট্ট	৩৫৯৯৮	৩৪১৯০	৭০১৮৮
	খাসিয়া ও জয়ন্তীয়া পাহাড়	৫	০	৫
	নাগা পাহাড়	৬	০	৬
	লুসাই পাহাড়	০	০	০

জিলা	পুরুষ	স্ত্রী	মোট
২। আসাম উপত্যকা বিভাগ	৪০৬১৩	৩৮৫২৬	৭৯১৩৯
গোয়ালপাড়া	৮৬৪৯	৭৯৯৮	১৬৬৪৭
কামরূপ	৯৬৫৯	৯০৭৬	১৮৭৩৫
দরং	৯৫৪৬	৯১৭০	১৮৭১৬
নওগাঁ	৯১৮১	৯০৯৬	১৮২৭৭
শিবসাগর	৩০৭৪	২৬৯৮	৫৭৭২
লক্ষ্মীপুর	৫০২	৪৮৮	৯৯০
গারু পাহাড়	২	০	২
৩। সদিয়া ফ্রন্টিয়ার ট্র্যাক্ট :—	১	৩	৪
৪। বালিপাড়া ঐ ঐ :—	০	০	০
৫। মণিপুর রাজ্য :—	৭	২	৯

(২) সমগ্র বঙ্গদেশ ও

আসামের লোকসংখ্যা :—	১৯২১	১৯১১	বৃদ্ধি + কম —
বঙ্গদেশ	৩৬৬০২১	৩৬১৩৫৭	+ ৪৬৬৪
আসাম	১৬১৪৪১	১৬৯০৯৭	— ৭৬৫৬
সর্ব্বসমষ্টি	৫,২৭৪৬২	৫৩০৪০৪	— ২৯৯২

(৩) প্রতি বিভাগের লোকসংখ্যা—

বিভাগের নাম	১৯২১ সালের	১৯১১ সালের	বৃদ্ধি + কম —
১। সুরমা উপত্যকা ও মণিপুর	৮২২৯৮	৯১২০৩	— ৮৯০৫
২। আসাম উপত্যকা ও সদিয়া ফ্রন্টিয়ার	৭৯১৪৩	৭৭৮৯৪	+ ১২৪৯
মোট	১৬১৪৪১	১৬৯০৯৭	— ৭৬৫৬

(৪) যোগিজাতির লোকসংখ্যা অনুসারে বিভিন্ন জেলার স্থান—

জেলার নাম	মোট সংখ্যা	জেলার নাম	মোট সংখ্যা
শ্রীহট্ট	৭০১৮৮	লক্ষ্মীপুর	৯৯০
কামরূপ	১৮৭৩৫	মণিপুর	৯
দরং	১৮৭১৬	নাগা পাহাড়	৬
নওগাঁ	১৮১৭৭	খাসিয়া ও জয়ন্তীয়া পাহাড়	৫
গোয়ালপাড়া	১৬৬৪৭		
কাছাড়	১২০৯০	সদিয়া	৪
শিবসাগর	৫৭৭২	গারু পাহাড়	২

(৫) যোগিজাতির শিক্ষা :—

	মোট	পুরুষ	স্ত্রী
আসামের লোকসংখ্যা	১৬১৪৪১	৮২৯৯১	৭৮৪৫০
১। তন্মধ্যে যাহারা লেখাপড়া জানে	১৩৬১৬,	১২৭৬০	৮৫৬
২। তন্মধ্যে যাহারা লেখাপড়া জানে না	১৪৫৮৪২	৬৯২২৫	৭৬৬১৭
৩। তন্মধ্যে যাহারা ইংরাজী জানে	৭৩৭	৭২৫	১২

মোট ১৬১৪৪১ জন লোকের মধ্যে মাত্র ১৩৬১৬ জন লোক অর্থাৎ শতকরা ৮·৪ জন লেখাপড়া জানে এবং ৭৩৭ জন লোক অর্থাৎ শতকরা ·৪৫ জন ইংরেজী জানে।

(৬) পারিবারিক অবস্থা :—

	পুরুষ	স্ত্রী
আসাম প্রদেশ	৮২৯৯১	৭৮৪৫০
১। তন্মধ্যে অবিবাহিত	৪৬৪০৮	২৮৬২০
২। ঐ বিবাহিত	৩০৯২৫	৩১৩২৯
৩। যাহাদের স্ত্রী মরিয়াছে	৪৬৫২ জন পুরুষ।	
৪। বিধবা		১৭৫২৪ জন স্ত্রীলোক।

(৭) জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় :—

আসামের যোগিজাতির মধ্যে ৪৮৩৭১ জন পুরুষ এবং ১৩৬০৮ জন স্ত্রীলোক কর্ম্মক্ষম এবং ৯৭৪৭৯ জন তাহাদের পোষ্য। ১৭৭৪ জন পুরুষ এবং ১৮১৫ জন স্ত্রীলোকের প্রধান পেশা বস্ত্রবয়ন। বস্ত্রবয়নকারীদিগের মধ্যে ১০৫৪ জন পুরুষ এবং ৬২২ জন স্ত্রীলোকের অন্যতর বা সহকারী পেশাও আছে। ২৬৭৪ জন পুরুষ এবং ৭৭০ জন স্ত্রী অন্যতর পেশা অবলম্বন করিয়াছেন।

৪০২৪০ জন পুরুষ এবং ৮৭৩২ জন স্ত্রীলোক সর্ব্বপ্রকার কৃষিকার্য্য করেন। ৬২২ জন গোপালন ও গোয়ালার কার্য্য করেন। ৩৯৫ জন শিল্পকার্য্য করেন। এষ্টেটের ম্যানেজার ও এজেণ্ট প্রভৃতিতে ৪২ জন, ট্র্যান্স্‌পোর্টে অর্থাৎ রেলওয়ে ষ্টীমার প্রভৃতি যানবাহনে ১১৮ জন। ব্যবসা বাণিজ্যে ৯১৩ জন। পাব্‌লিক ফোর্সে ১০৫ জন। পাবলিক এড্‌মিনিষ্ট্রেসনে ৬৪ জন। ধর্ম্মপ্রচারে বা গুরুগিরিতে ১২৪ জন। উকীল, ডাক্তার এবং শিক্ষক প্রভৃতিতে ১৮৬ জন। গৃহকার্য্যে ৪৪৯ জন; কণ্ট্র্যাক্টর, কেরাণী, ক্যেসিয়ার প্রভৃতিতে ৪১ জন; অন্যান্য ২০৭ জন।

(৮) মন্তব্য :—

উপরোক্ত সেন্সাস্‌ রিপোর্ট দৃষ্টে সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন যে আমাদের যোগিজাতি শিক্ষাবিষয়ে এখনও কত পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছেন। তাহাদের শতকরা মাত্র ৮॥ জন লোক লেখাপড়া জানেন, এবং শতকরা মাত্র অর্দ্ধ জন ইংরেজী জানেন।

১৯১১ সালের সেন্সাসের সহিত ১৯২১ সেন্সাসের তুলনায় দেখা যায় যে গত দশ বৎসরে আমাদের লোকসংখ্যা মোট ৭৬৫৬ জন কমিয়া গিয়াছে। একমাত্র শ্রীহট্ট জেলাই এইজন্য সম্পূর্ণ দায়ী। শ্রীহট্ট জেলায় মোট ৮৯৫৪ জন লোক কমিয়া গিয়াছে। আসামের মাননীয় সেন্সাস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্‌ মহোদয় তদীয় রিপোর্টে ইহার প্রকৃত কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে যোগিজাতির অধিকাংশ পুরোহিতই তাহাদের সম্প্রদায় হইতে পৃথক হইয়া

পড়িয়াছেন, ইহাই সংখ্যা হ্রাসের কারণ। পূর্ব্ববর্ত্তী সেন্সাসে যোগীর ব্রাহ্মণগণ যোগিজাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল কিন্তু সম্প্রতি যোগিব্রাহ্মণদের এক সম্প্রদায় তাহাদের অনুরূপ উৎপত্তির দাবী করিয়া তাহাদিগকে 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া সেন্সাসে লেখাইয়াছে এবং নাথ ও মহান্ত উপাধির পরিবর্ত্তে শর্ম্মা, চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি (অভিনব) উপাধি ধারণ করিয়াছেন। লক্ষ্মীপুর জেলায় তাহাদের ৭০ জনকে "যোগীর ব্রাহ্মণ" বলিয়া লেখা হইয়াছে।

বঙ্গদেশে যোগিজাতির সংখ্যা

১৮৯১ ইংরাজীর লোকগণনায় বঙ্গদেশে যোগিজাতি (বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের ১৮৯১ ইংরাজীর সেন্সাস রিপোর্ট হইতে সংগৃহীত)।

জেলা	পুরুষ	স্ত্রী	মোট
রাজসাহী বিভাগ	**১৭৯৪৯**	**১৫৭৮২**	**৩৩৭৩১**
রাজসাহী	১২৫০	১১৮৮	২৪৩৮
দিনাজপুর	৮১০৫	৭০৮৩	১৫১৮৮
রঙ্গপুর	৩১২২	৩০৯৭	৬২১৯
বগুড়া	২৭৮৮	২২৫০	৫০৩৮
পাবনা	৬৭২	৫৫২	১২২৪
দার্জ্জিলিং	৩৮৮	২৯০	৬৭৮
জলপাইগুড়ি	১৬২৪	১৩২২	২৯৪৬
ঢাকা বিভাগ	**৪৪৩১৮**	**৪২৮৫৫**	**৮৭১৭৩**
ঢাকা	৯১০৬	৯২৬৬	১৮৩৭২
ফরিদপুর	২৬২৬	২৭৭৯	৫৪০৫
বাখরগঞ্জ	১১৭৫৬	১০৬৪৮	২২৪০৪
ময়মনসিংহ	২০৮৩০	২০১৬২	৪০৯৯২

জিলা	পুরুষ	স্ত্রী	মোট
চট্টগ্রাম বিভাগ	**৭২৮২৯**	**৭৪৪৯৩**	**১৪৭৩২২**
চট্টগ্রাম	১৫৫৮৮	১৭১৩৫	৩২৭২৩
নোয়াখালি	২২২৭৭	২২৭২৪	৪৫০০১
ত্রিপুরা	৩৪৮০৯	৩৪৬৩২	৬৯৪৪১
পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম	১৫৫	২	১৫৭
বর্দ্ধমান বিভাগ	**৯৮৪৪**	**১০৪৫২**	**২০২৯৬**
বর্দ্ধমান	২০৬৭	২১৯৪	৪২৬১
বাঁকুড়া	২১৫	২৮৫	৫০০
বীরভূম	৭৯৪	৮৬৫	১৬৫৯
মেদিনীপুর	২২৫৩	২৩৩২	৪৫৮৫
হুগলী	২৩৪৪	২৪৮৭	৪৮৩১
হাওড়া	২১৭১	২২৮৯	৪৪৬০
প্রেসিডেন্সি বিভাগ	**২৮৪৩৪**	**২৬৮৪০**	**৫৫২৭৪**
কলিকাতা	১৪৩৩	১২৭৭	২৭১০
নদীয়া	৪৮৮৩	৪৯৪৩	৯৮২৬
যশোহর	৫৯১৪	৫৮৪৬	১১৭৬০
মুর্শিদাবাদ	২০২৯	২০৪২	৪০৭১
খুলনা	৬০৪০	৫২৬১	১১৩০১
চব্বিশ পরগণা	৮১৩৫	৭৪৭১	১৫৬০৬
সর্ব্বমোট	১৭৩৩৭৪	১৭০৪২২	৩৪৩৭৯৬

০১ ইংরাজীর (১৩০৮ বাং) লোকগণনায় বঙ্গদেশে যোগিজা

বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের ১৯০১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট হইতে সংগৃহীত)

জেলা	পুরুষ	স্ত্রী	মোট
বর্দ্ধমান	১৯৭১	২১৮৭	৪১৫৮
বীরভূম	৭৮৫	৮১৮	১৬০৩
বাঁকুড়া	৬৯৪	৯৭৯	১৬৭৩
মেদিনীপুর	২৫৩৭	২৬৪১	৫১৭৮
হুগলী	১৫৪১	১৫২১	৩০৬২
হাওড়া	২০৬৫	১৯৯৭	৪০৬২
২৪ পরগণা	৭০৪৯	৬৯৪০	১৩৯৮৯
নদীয়া	৪২৬২	৪৪৪৯	৮৭১১
মুর্শিদাবাদ	১৯৩১	২১৭৯	৪১১০
যশোহর	৫০৪২	৪৮৫০	৯৮৯২
খুলনা	৫৯৪০	৬৩৬৪	১২৩০৪
রাজসাহী	২২০৪	১৯৪৭	৪১৫১
দিনাজপুর	৩৫১৮	৩৯৪০	৭৪৫৮
জলপাইগুড়ি	১১৮০	১০৮২	২২৬২
রংপুর	৩০০৫	৩০২৭	৬০৩২
বগুড়া	১৭৬৬	১৫৫২	৩৩১৮
পাবনা	৫৫৬	৪৭১	১০২৭
ঢাকা	৮৮৭৪	৯২৭৮	১৮১৫২
ময়মনসিংহ	২৩১০৬	২১৫৮০	৪৪৬৮৬
ফরিদপুর	২৩৩১	২৫৭৩	৪৯০৪
বাখরগঞ্জ	১১৬৪৫	১০৩৪৫	২১৯৯০

জেলা	পুরুষ	স্ত্রী	মোট
ত্রিপুরা	৩৪৬৮০	৩৩৬৪৯	৬৮৩২৯
নোয়াখালি	২৩০৯০	২৩৮৭১	৪৬৯৬১
চট্টগ্রাম	১৬৮৮৮	১৮০৪১	৩৪৯২৯
পার্ব্বত্য ত্রিপুরা	১১৮৮	৮২৬	২০১৪
মোট	১৬৭৮৪৮	১৬৭১০৭	৩৩৪৯৫৫

আলোচ্য সনের কলিকাতা ও মালদহের সংখ্যা পাওয়া যায় নাই। এই দুই জিলার সংখ্যা মোট সংখ্যার সহিত যোগ করিলে আলোচ্য সনের বঙ্গদেশের মোট সংখ্যা পাওয়া যাইবে।

১৯১১ সালের লোকগণনায় বঙ্গদেশে যোগিজাতি

যে জিলায় যোগিজাতীয় যত লোক আছে ১৯১১ সালের সেন্সাস্ রিপোর্ট অনুসারে নিম্নে তাহা লিখিত হইল :—

	পুরুষ	স্ত্রী	মোট
বঙ্গদেশ	১৮২,৯০৩	১৭৮,২৩৮	৩৬১,১৪১
বর্দ্ধমান বিভাগ	৮৫১৪	৮৭০৫	১৭২১৯
বর্দ্ধমান	১৬৮৪	১৮৪৩	৩৫২৭
বীরভূম	৬১৮	৬৫৪	১২৭২
বাঁকুড়া	২৯৭	৩৩৫	৬৩২
মেদিনীপুর	২৫১৮	২৫৯৯	৫১১৭
হুগলী	১২৭০	১২৩০	২৫০০
হাওড়া	২১২৭	২০৪৪	৪১৭১
প্রেসিডেন্সি বিভাগ	২৪৪০৯	২৩৩৭১	৪৭৭৮০
২৪ পরগণা	৭১৮৬	৬৭৪৫	১৩৯৩১

জিলা	পুরুষ	স্ত্রী	মোট
কলিকাতা	১৩১২	১১১৮	২৪৩০
নদীয়া	৩৯৮২	৪০২৫	৮০০৭
মুর্শিদাবাদ	১৭৫০	১৮৩৪	৩৫৮৪
যশোহর	৪৩৩৯	৪২৬২	৮৬০১
খুলনা	৫৮৪০	৫৩৮৭	১১২২৭
রাজসাহী বিভাগ	১৩৮১২	১২৯২৫	২৬৭৩৭
রাজসাহী	২১৭১	১৯৪৮	৪১১৯
দিনাজপুর	৩৬৯৫	৩৪৯০	৭১৮৫
জলপাইগুড়ি	১১৭০	১০৭৫	২২৪৫
দার্জ্জিলিং	৩৪২	২৭৪	৬১৬
রংপুর	৩৩৫৮	৩৩০৯	৬৬৬৭
বগুড়া	২১৬৯	১৯৮৫	৪১৫৪
পাবনা	৫৬৩	৪৬৩	১০২৬
মালদহ	৩৪৪	৩৮১	৭২৫
ঢাকা বিভাগ	৪৭৫৮৮	৪৫৪১৩	৯৩০০১
ঢাকা	১০০৩৬	১০১৫৬	২০১৯২
ময়মনসিং	২৩৯২৭	২২৫৯৫	৪৬৫৮২
ফরিদপুর	২৫৭৪	২৬২৪	৫১৯৮
বাখরগঞ্জ	১০৯৯১	১০০৩৮	২১০২৯
চট্টগ্রাম বিভাগ	৮৩৩৫০	৮৩৪৯১	১৬৬৮৪১
ত্রিপুরা	৩৯৫৭২	৩৮৪০৩	৭৭৯৭৫
নোয়াখালি	২৬৫৫৮	২৬৬৭৯	৫৩২৩৭
চট্টগ্রাম	১৭১৩১	১৮৪০৬	৩৫৫৩৭

জিলা	পুরুষ	স্ত্রী	মোট
পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম	৮৯	৩	৯২
দেশীয় রাজ্য	৫২২৫	৪৩৩৩	৯৫৫৮
কুচবিহার	২৬৪৪	২৪৩৬	৫০৮০
পার্ব্বত্য ত্রিপুরা	২৫৮১	১৮৯৭	৪৪৭৮
সিকিম	১১৪	১০৭	২২১

বঙ্গদেশে প্রত্যেক এক হাজার পুরুষ ও স্ত্রীলোকের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা—১৩০ জন।

প্রত্যেক হাজারে শিক্ষিত পুরুষের সংখ্যা—২৫০ জন।

প্রত্যেক হাজারে শিক্ষিতা স্ত্রীলোকের সংখ্যা—৫ জন।

প্রত্যেক হাজারে স্ত্রী পুরুষের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষিতের সংখ্যা—৫১ জন।

প্রত্যেক হাজার পুরুষে ইংরাজী শিক্ষিতের সংখ্যা—১০১ জন।

প্রত্যেক হাজার স্ত্রীলোকের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষিতা—১ জন।

(Census of India 1911 vol. I)

বঙ্গদেশে প্রত্যেক হাজার পুরুষের মধ্যে

৫ বৎসর বয়স্কদের সংখ্যা	১২৪ জন
৫—১২	১৯১ ,,
১২—১৫	৭২ ,,
১৫—৪০	৪০৫ ,,
৪০ এবং তদূর্দ্ধ	২০৮ ,,

বঙ্গদেশে প্রত্যেক হাজার স্ত্রীলোকের মধ্যে—

৫ বৎসর বয়স্কাদের সংখ্যা	১৩৪ জন
৫—১২	১৮৯ ,,

১২—১৫	বৎসর বয়স্কাদের সংখ্যা		৫৬ জন
১৫—৪০	...	...	৪২২ „
৪০ এবং তদূর্দ্ধ	...	...	১৯৯ „

(Census of India 1911 vol. I)

১৯২১ সালের সেন্সাসে বঙ্গদেশের যোগিজাতি

(বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের ১৯২১ সালের সেন্সাস্ রিপোর্ট হইতে সংগৃহীত)

(১) যে জিলায় যোগিজাতীয় লোক যত আছে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

জিলা	পুরুষ	স্ত্রী	মোট
বঙ্গদেশ	১৮৬১৬৬	১৭৯৭৪৪	৩৬৫৯১০
বর্দ্ধমান বিভাগ	৬৯৪০	৭০৮৩	১৪০২৩
বর্দ্ধমান	১২২৬	১২৬৮	২৪৯৪
বীরভূম	৪৫৪	৪৫৮	৯১২
বাঁকুড়া	২৮৩	২৩৫	৫১৮
মেদিনীপুর	১৯৯৮	২২১৯	৪২১৭
হুগলী	৯৭৫	১০৪৯	২০২৪
হাওড়া	২০০৪	১৮৫৪	৩৮৫৮
প্রেসিডেন্সি বিভাগ	২৪৯৫৬	২৩৪৮০	৪৮৪৩৬
২৪ পরগণা	৭৫১৩	৬৮৫৯	১৪৩৭২
কলিকাতা	১৫৫৮	১২৪৪	২৮০২
নদীয়া	৩৭২৫	৩৫২২	৭২৪৭
মুর্শিদাবাদ	১৩৯৭	১৪১৭	২৮১৪
যশোহর	৪৭৬৬	৪৫৮৩	৯৩৪৯
খুলনা	৫৯৯৭	৫৮৫৫	১১৮৫২

জিলা	পুরুষ	স্ত্রী	মোট
রাজসাহী বিভাগ	১৫৩৫০	১৩৮৮১	২৯২৩১
রাজসাহী	২১৭৭	২০২২	৪১৯৯
দিনাজপুর	৪৩২৭	৪০৬৭	৮৩৯৪
জলপাইগুড়ি	১৩৭৩	১১১৯	২৪৯২
দার্জ্জিলিং	৩৭৮	২৯৪	৬৭২
রংপুর	৩১৯৮	২৯৩৬	৬১৩৪
বগুড়া	২২২৯	২০৮৬	৪৩১৫
পাবনা	৪৭১	৩৯৪	৮৬৫
মালদহ	১১৯৭	৯৬৩	২১৬০
ঢাকা বিভাগ	৪৮৬১১	৪৬৪৩৯	৯৫০৫০
ঢাকা	১০৪২১	১০৪৩৩	২০৮৫৪
ময়মনসিং	২৪৪৯৬	২৩১১১	৪৭৬০৭
ফরিদপুর	২৫২৪	২৮১৪	৫৩৩৮
বাখরগঞ্জ	১১১৭০	১০০৮১	২১২৫১
চট্টগ্রাম বিভাগ	৮৫১৪৯	৮৪২৬৫	১৬৯৪১৪
ত্রিপুরা	৩৯০৩১	৩৮৪৭৩	৭৭৫০৪
নোয়াখালি	২৮৬৪৬	২৭২১৪	৫৫৮৬০
চট্টগ্রাম	১৭৩৭০	১৮৫৭১	৩৫৯৪১
পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম	১০২	৭	১০৯
দেশীয় রাজ্য	৫১৬০	৪৫৯৬	৯৭৫৬
কুচবিহার	২৪০৫	২১৬৬	৪৫৭১
পার্ব্বত্য ত্রিপুরা	২৭৫৫	২৪৩০	৫১৮৫
সিকিম	৫৩	৫৮	১১১

(২) প্রতি বিভাগের লোকসংখ্যা

বিভাগের নাম (লোকসংখ্যা অনুসারে)	১৯২১ সালের সংখ্যা	১৯১১ সালের সংখ্যা	বৃদ্ধি + কম –
১। চট্টগ্রাম বিভাগ ও পার্ব্বত্য ত্রিপুর	১৭৪৫৯৯	১৭১৩১৯	+২৩৮০
২। ঢাকা বিভাগ	৯৫০৫০	৯৩০০১	+২০৪৯
৩। প্রেসিডেন্সি বিভাগ	৪৮৪৩৬	৪৭৭৮০	+৬৫৬
৪। রাজসাহী বিভাগ কুচবিহার	৩৩৮০২	৩১৮১৭	+১৯৮৫
৫। বর্দ্ধমান বিভাগ	১৪০২৩	১৭২১৯	–৩১৯৬
সিকিম	১১১	২২১	–১১০
মোটসংখ্যা	৩৬৬০২১	৩৬১৩৫৭	+৪৬৬৪

(৩) প্রতি প্রদেশের লোকসংখ্যা

প্রদেশের নাম (লোকসংখ্যা অনুসারে)	১৯২১ সালের সংখ্যা	১৯১১ সালের সংখ্যা	বৃদ্ধি + কম –
পূর্ব্ববঙ্গ	৩০৩৪৫১	২৯৬১৩৭	+৭৩১৪
পশ্চিমবঙ্গ	৬২৪৫৯	৬৪৯৯৯	–২৫৪০
সিকিম	১১১	২২১	–১১০
মোট সংখ্যা	৩৬৬০২১	৩৬১৩৫৭	+৪৬৬৪

(৪) যোগিজাতির লোকসংখ্যা অনুসারে বিভিন্ন জিলার স্থান

জেলার নাম	মোট সংখ্যা
ত্রিপুরা	৭৭৫০৪
নোয়াখালি	৫৫৮৬০
ময়মনসিং	৪৭৬০৭

জিলার নাম	মোট সংখ্যা
চট্টগ্রাম	৩৫৯৪১
বাখরগঞ্জ	২১২৫১
ঢাকা	২০৮৫৪
২৪ পরগণা	১৪৩৭২
খুলনা	১১৮৫২
যশোহর	৯৩৪৯
দিনাজপুর	৮৩৯৪
নদীয়া	৭২৪৭
রংপুর	৬১৩৪
ফরিদপুর	৫৩৩৮
পার্ব্বত্য ত্রিপুরা	৫১৮৫
কুচবিহার	৪৫৭১
বগুড়া	৪৩১৫
মেদিনীপুর	৪২১৭
রাজসাহী	৪১৯৯
হাওড়া	৩৮৫৮
মুর্শিদাবাদ	২৮১৪
কলিকাতা	২৮০২
বর্দ্ধমান	২৪৯৪
জলপাইগুড়ি	২৪৯২
হুগলি	২০২৪
বীরভূম	৯১২
পাবনা	৮৬৫

জিলার নাম	মোট সংখ্যা
দার্জ্জিলিং	৬৭২
বাঁকুড়া	৫১৮
সিকিম	১১১
পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম	১০৯

(৫) যোগিজাতির শিক্ষা ঃ—

	মোট	পুরুষ	স্ত্রী
বঙ্গদেশের লোকসংখ্যা	৩৬৫৮৯১	১৮৬১২৬	১৭৯৭৭৫
১। তন্মধ্যে যাহারা লেখাপড়া জানে	৫৬৪৭৯	৫৩৯২৪	২৫৫৫
২। তন্মধ্যে যাহারা লেখাপড়া জানে না	৩০৯৪১২	১৩২২০২	১৭৭২১০
৩। তন্মধ্যে যাহারা ইংরেজী জানে	৫৪৭৫	৫৩৫৬	১১৯

মোট ৩৬৫৮৯১ জন লোকের মধ্যে মাত্র ৫৬৪৭৯ জন লোক অর্থাৎ শতকরা ১৫·৪ জন লেখাপড়া জানে এবং ৫৪৭৫ জন লোক অর্থাৎ শতকরা ১·৫ জন ইংরেজী জানেন।

(৬) পারিবারিক অবস্থা ঃ—

বঙ্গদেশ	পুরুষ	স্ত্রী
(সিকিম সহ)	১৮৬১২৬	১৭৯৭৬৫
১। তন্মধ্যে অবিবাহিত	৯৩২৫৮	৫৪৭০০
২। তন্মধ্যে বিবাহিত	৮৩৪৯২	৮২৬০০
৩। যাহাদের স্ত্রী মরিয়াছে	৯৩৭৬ জন পুরুষ	
৪। বিধবা (widow)	৪২৪৬৫ জন স্ত্রীলোক	

(৭) জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় ঃ—

বঙ্গদেশের যোগিজাতির মধ্যে ১০৫৪৯৬ জন পুরুষ এবং ২২০৮১ জন স্ত্রী লোক কর্ম্মক্ষম এবং মোট ২৩৮৩১৪ জন তাহাদের পোষ্য। উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তি-

দিগের মধ্যে মোট ৩২৯৯৭ জন পুরুষ এবং ১৩২৫৪ জন স্ত্রীলোকের প্রধান পেশা বস্ত্র বয়ন। ৪৩৫৫ জন পুরুষ এবং ১৯১ জন স্ত্রী লোক সহকারী বা অন্যতর পেশা অবলম্বন করিয়াছেন।

বস্ত্র বয়নকারীদিগের মধ্যে ৮৬৪১ জন পুরুষ এবং ৬৫৪ জন স্ত্রীলোকের অন্য সহকারী পেশাও আছে। ২৩৫৪ জন পুরুষ এবং ৩৪৩ জন স্ত্রীলোকের জমির খাজনার আয় হইতে জীবিকা নির্ব্বাহ হয়। ৩৩৫৮০ জন পুরুষ এবং ৩১৪২ জন স্ত্রীলোক সর্ব্বপ্রকার কৃষিকার্য্য করেন। এজেণ্ট, জমিদারী এষ্টেটের ম্যানেজার, ফরেষ্ট অফিসার এবং তৎ-কেরাণী ও খাজানা আদায়কারী প্রভৃতিতে মোট ৪২৫ জন। ব্যবসা বাণিজ্যে মোট ১০৬১৭। পাব্লিক ফোর্স এবং পাব্লিক এড্মিনিষ্ট্রেসনে ২৯৬ জন, তন্মধ্যে ১৯ জন গেজেটেড্ অফিসার আছেন, ১০৮৪ জন উকীল, ডাক্তার এবং শিক্ষক আছেন। **Religious** ধর্ম্ম-প্রচারে বা গুরু-গিরিতে ২৩৩ জন আছেন। কণ্ট্রাক্টর, কেরাণী এবং কেশিয়ার প্রভৃতিতে ৩৭৮ জন। গৃহকার্য্যে ২৯০৯ জন, খনি এবং শিল্প প্রভৃতি কার্য্যে মালিক ম্যানেজার কেরাণী এবং কারিকর প্রভৃতিতে ৫৩২০ জন। ট্র্যান্সপোর্টে অর্থাৎ রেলওয়ে ষ্টীমার প্রভৃতি যানবাহনে ৭১৫ জন লোক কার্য্য করিতেছেন। কয়লার খনিতে ১৭ জন, কটন মিলে ৬৭ জন, জুট মিলে ১২২৮ জন, লৌহ ও ইস্পাতের কার্য্যে ৬০, মেসিনারী এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কার্য্যে ১১৩ জন, কাগজের কলে ৯ জন, ময়দার কলে ২ জন, রেলওয়ে ডক এবং ষ্টীমারের কারখানায় ৩৪৮ জন, রেশমের কার্য্যে ২ জন এবং চা বাগানে ৯০০ জন কার্য্য করিতেছেন।

(৮) মন্তব্য :—উপরোক্ত সেন্সাস রিপোর্ট দৃষ্টে সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন যে শিক্ষা বিষয়ে এখনও যোগিজাতি কত পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। আমাদের স্বজাতির শতকরা মাত্র ১৫ জন লেখাপড়া জানেন এবং শতকরা মাত্র ১।। দেড় জন ইংরেজী জানেন।

১৯১১ সালের সেন্সাসের সহিত ১৯২১ সালের সেন্সাসের সংখ্যার তুলনায়

দেখা যায় যে বঙ্গদেশের যোগিজাতির মধ্যে গত ১০ বৎসরে পূর্ব্ববঙ্গে মোট ৭৩১৪ জন লোক বৃদ্ধি হইয়াছে এবং পশ্চিমবঙ্গে ২৫১৪ জন এবং সিকিমে ১১০ জন লোক কমিয়া গিয়াছে অর্থাৎ মোটের উপর ৪৬৬৪ জন লোক বৃদ্ধি হইয়াছে।

১৯৩১ সালের লোকগণনায় বঙ্গদেশে যোগিজাতির সংখ্যা

মোট সংখ্যা—৩৮৪,৬৩৪

পুরুষ—১৯৭,৮১৭

নারী—১৮৬,৮১৭

প্রতি ১০০০ জন পুরুষে নারীর সংখ্যা ৯৪৪ জন

জিলা	মোট সংখ্যা	পুরুষ	নারী
বর্দ্ধমান	২২৯৬	১০৭৬	১২২০
বীরভূম	৮৭১	৪৪৫	৪২৬
বাঁকুড়া	৩৯৮	১৬৮	২৩০
মেদিনীপুর	৫২৬৭	২৬৯২	২৫৭৫
হুগলি	৩১৫৪	১৪৭২	১৬৮
হাওড়া	৩৬৭৬	১৯৩৭	১৭৩৯
হাওড়া টাউন	৭৩৬	৪২৫	৩১১
২৪ পরগণা	১৩২২৭	৭০০৭	৬২২০
কলিকাতার উপকণ্ঠ	৯৩৫	৫১৪	৪২১
কলিকাতা	৩২৯৭	১৮০৪	১৪৯৩
নদীয়া	৬৮৬৬	৩৪২২	৩৪৪৪
মুর্শিদাবাদ	৩০৭১	১৫৩৩	১৫৩৮
যশোহর	৬৯০৯	৩৭২১	৩১৮৮
খুলনা	১২৪১২	৬২৯০	৬১২২

জিলা	মোট সংখ্যা	পুরুষ	নারী
রাজসাহী	৩৬৩৮	১৮৮৬	১৭৫২
দিনাজপুর	৮১৫০	৪২৮৬	৩৮৬৪
জলপাইগুড়ি	১৭০৮	১০২৯	৬৭৯
দার্জ্জিলিং	৭৫২	২৯৫	৪৫৭
রংপুর	৬৩৬০	৩২৩৪	৩১২৬
বগুড়া	৩৮৯৭	২১৫৭	১৭৪০
পাবনা	১০২৩	৫৬৩	৪৬০
মালদহ	১৪৮৭	৭৫০	৭৩৭
ঢাকা	২১৩৯৩	১০৯৫০	১০৪৪৩
ময়মনসিং	৪৫৪৮৮	২৩৬৯৮	২১৭৯০
ফরিদপুর	৬৮২৭	৩৪৯৯	৩৩২৮
বাখরগঞ্জ (বরিশাল) *	২২০৭৫	১১৭২৫	১০৩৫০
ত্রিপুরা	৮৪৮৯৫	৪৩৩৫৬	৪১৫৩৯
নোয়াখালি	৬৫৭৭৯	৩৪০১০	৩১৭৬৯
চট্টগ্রাম	৩৭৭৭০	১৮২৫৩	১৯৫১৭
চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য	১১২	৭০	৪২
কুচবিহার	৪৪৩১	২৩৫১	২০৮০
ত্রিপুরারাজ্য	৭৫৬২	৪২৩৩	৩৩২৯

(কলিকাতা গেজেট ১৪ জুলাই—১৯৩২)

বঙ্গদেশে যোগিজাতির সংখ্যা ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইতেছে তাহা নিম্নলিখিত বিবরণী হইতে প্রতীয়মান হইবে :—

সাল	লোকসংখ্যা	সাল	লোকসংখ্যা	সাল	লোকসংখ্যা	সাল	লোকসংখ্যা
১৯০১	৩৪২৬৭০	১৯১১	৩৬১১৪১	১৯২১	৩৬৫৯১০	১৯৩১	৩৮৪৬৩৪

অতএব ত্রিশ বৎসরে বঙ্গদেশে যোগিজাতির সংখ্যা ৪১৯৬৪ জন বাড়িয়াছে ; কিন্তু শুধু সংখ্যায় বাড়িলে কি হইবে ? শিক্ষার সমধিক প্রচলন দ্বারা ইহাদিগকে মানুষ করিতে না পারিলে কোনই ফল নাই। আমরা শিক্ষার পথে কতদূর অগ্রসর হইয়াছি তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

শিক্ষিত পুরুষ ও নারী	৪৩৬৮৪
শিক্ষিত পুরুষ	৩৮৭৭৪
শিক্ষিতা নারী	৪৯১০
অশিক্ষিত পুরুষ ও নারী	৩৪০৯৫০
অশিক্ষিত পুরুষ	১৫৯০৪৩
অশিক্ষিতা নারী	১৮১৯০৭
ইংরাজী জানা পুরুষ ও নারী	৬৮৮০
ইংরাজী জানা পুরুষ	৬৪০৩
ইংরাজী জানা নারী	৪৭৭

(কলিকাতা গেজেট ২১ জুলাই ১৯৩২)

১৯২১ সালে যোগিজাতির সংখ্যা ছিল ৩৬৫৯১০ জন ; শতকরা ৫০ হারে বর্দ্ধিত হইয়া ইহাদের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৩৮৪৬৩৪ জন। তাঁহারা প্রধানতঃ পূর্ব্ববঙ্গেই বহু পরিমাণে দৃষ্ট হয়। ত্রিপুরাতে—৮৪৮৯৫ জন ; নোয়াখালিতে—৬৫৭৭৯ জন এবং ময়মনসিংহে—৪৫৪৮৮ জন। এই তিন জিলাতেই বঙ্গীয় যোগিজাতির অর্দ্ধেকের বেশী লোক বাস করে। পূর্ব্ববর্ত্তী লোকগণনায় যোগি-জাতি ধর্ম্মাশ্রমাচারী জাতি হইতে উদ্ভূত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। রঙ্গপুর জিলার যোগিজাতি গোপীচাঁদের গান গাহিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে। * * * * * * * * * * * * * * (Vide Census of India Vol. V. Part I Page 467).

বিহার উড়িষ্যায় যোগিজাতি

১৮৯১ ইং লোকগণনায় বিহার উড়িষ্যায় যোগিজাতি

[বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের ১৮৯১ ইং (১২৯৮ বাং) সেন্সাস্ রিপোর্ট হইতে সংগৃহীত]

জিলা	পুরুষ	স্ত্রী	মোট
পাটনা বিভাগ	৪৯৭৪	৫৯১১	১০৮৮৫
পাটনা	৭৮৫	৮৫০	১৬৩৫
গয়া	১২৩৭	১৫৯১	২৮২৮
সাহাবাদ	৯৯৭	১১৬৩	২১৬০
দ্বারভাঙ্গা	২০০	২২১	৪২১
মজফরপুর	৬৩৫	৯৩৩	১৫৬৮
সারণ	৪৬৫	৫৭৩	১০৩৮
চম্পারণ	৬৫৫	৫৮০	১২৩৫
ভাগলপুর বিভাগ	১৫৫৪২	১৫১৭৭	৩০৭১৯
ভাগলপুর	২৮২	১৭৪	৪৫৬
মুঙ্গের	২৬৫	৩৩৮	৬০৩
পূর্ণিয়া	৭৫৭৭	৭০৯৭	১৪৬৭৪
মালদহ	৬৬৫৬	৬৭৪২	১৩৩৯৮
সাওতাল পরগণা	৭৬২	৮২৬	১৫৮৮
উড়িষ্যা বিভাগ	৪২২৫	৪২৭৯	৮৫০৪
কটক	৩৩৩৪	৩৩৯৯	৬৭৩৩
বালেশ্বর	৭৯৩	৭৮৫	১৫৭৮
আঙ্গুলও	৯৮	৯৫	১৯৩

জিলা	পুরুষ	স্ত্রী	মোট
ছোটনাগপুর বিভাগ	১৯৬০	২১৩৯	৪০৯৯
হাজারিবাগ	৫১২	৬১৭	১১২৯
লোহার্দগাও পালামু	৪১১	৪৬৫	৮৭৬
মানভূম	৮৭৯	৯০২	১৭৮১
সিংভূম	১৫৮	১৫৫	৩১৩
মোট	২৭৩৪৩	২৮১৫৬	৫৫৪৯৯

[উপরোক্ত বিভাগগুলি পূর্ব্বে বাঙ্গালাদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯১২ সনে এগুলিকে বঙ্গদেশ হইতে পৃথক করিয়া বিহারের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। সেজন্য ইহাদিগকে বিহারের যোগিজাতি বলিয়াই ধরা হইয়াছে।—সম্পাদক]

১৯০১ ইং গণনায় বিহার উড়িষ্যায় যোগিজাতি *

[বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের ১৯০১ ইং সেন্সাস্ রিপোর্ট হইতে সংগৃহীত]

জেলা	পুরুষ	স্ত্রী	মোট
পাটনা	৭৬০	৯৫৬	১৭১৬
গয়া	১০৭৬	১১৫৫	২২৩১
সাহাবাদ	৭৪১	৬১১	১৩৫২
চম্পারণ	—	—	—
সারণ	—	—	—
মজফরপুর	৬৩১	৭৫৮	১৩৮৯

* পূর্ব্বে এগুলি বঙ্গদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯১২ ইংরাজীতে এগুলিকে বঙ্গপ্রদেশ হইতে পৃথক করিয়া বিহার উড়িষ্যার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। সেজন্য ইহাদিগকে এখানে বিহার উড়িষ্যার যোগিজাতি বলা হইয়াছে।

—সম্পাদক।

জেলা	পুরুষ	স্ত্রী	মোট
দারভাঙ্গা			—
ভাগলপুর			—
পূর্ণিয়া	২৬৬৫	২৬১২	৫২৭৭
সাওতাল পরগণা	১১৫৬	৯৭১	২১২৭
কটক	৩৩৩৮	৩৪১৪	৬৭৫২
বালেশ্বর	৮৮৮	৯০৭	১৭৯৫
পুরী	৬১৮	৬৫৭	১২৭৫
হাজারীবাগ			
রাচী			
পালামু	—	—	
মানভূম	৮৭০	৮৭৫	১৭৪৫
উড়িষ্যা করদ রাজ্য	৯০৪	৯৬৮	১৮৭২
মোট	১৩৬৪৭	১৩৮৮৪	২৭৫৩১

মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে যোগিজাতি

[মাদ্রাজ সরকারের ১৮৮১ ইং সেন্সাস্ রিপোর্ট হইতে সংগৃহীত।]

	পুরুষ	স্ত্রী	মোট
শৈবধর্ম্মাবলম্বী	২৬৩১	২৬০৭	৫২৩৮
বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী	১০১২	৯৯৭	২০০৯
অন্যান্য ,,	৮৫২	৮৪৩	১৬৯৫
মোট	৪৪৯৫	৪৪৪৭	৮৯৪২

আলোচ্য সনে উত্তর আরকট, দক্ষিণ আরকট, তানজুর, ত্রিচিনাপল্লী,

মাতুরা, ত্রিণেবেলী, সালেম, কয়াম্বাটুর, মান্দ্রাজ এই কয়টি জিলায় তামিল ভাষাভাষী যোগিজাতির সংখ্যা নিম্নরূপ পাওয়া গিয়াছে—

পুরুষ	স্ত্রী	মোট
১৬৬৮	১৫৭৭	৩২৪৫

আলোচ্য সনে গঞ্জাম, ভিজাগাপট্টম, গুদাবরী, কুটাপ, করনুল, বেলারী, উত্তর আরকট, দক্ষিণ আরকট, সালেম, ভিজাগাপট্টম এজেন্সিতে তেলেগু ভাষা-ভাষী যোগিজাতির সংখ্যা নিম্নরূপ পাওয়া গিয়াছে—

পুরুষ	স্ত্রী	মোট
১২৫২	১৩১২	২৫৬৪

আলোচ্য সনে কানাড়া জিলায় কানাড়ি ভাষাভাষী যোগিজাতির সংখ্যা নিম্নরূপ পাওয়া গিয়াছে—

পুরুষ	স্ত্রী	মোট
৮১৪	৮৪২	১৬৫৬

অন্যান্য ভাষাভাষী স্ত্রী পুরুষের মোট সংখ্যা— ১৪৭৭।

সর্ব্বমোট সংখ্যা..................................৮৯৪২ জন।

১৮৯১ ইংরাজী (১২৯৮ বাং) লোকগণনায় করদ মিত্র রাজ্যে যোগিজাতি।

	পুরুষ	স্ত্রী	মোট
উড়িষ্যা করদরাজ্যে	৭২১	৭৩৬	১৪৫৭
ছোটনাগপুর ,,	৩৮৫	৩৮৪	৭৬৯
কোচবিহার ,,	২৬০৪	২৩৬৮	৪৯৭২
মোট	৩৭১০	৩৪৮৮	৭১৯৮

(ভারত গবর্ণমেণ্টের ১৮৯১ সালের লোকগণনার রিপোর্ট হইতে সংগৃহীত)

মধ্য ভারতবর্ষে যোগিজাতি—১৮৯১ ইংরাজী

(ভারত গবর্ণমেণ্টের ১৮৯১ ইং সালের সেন্সাস্ রিপোর্ট হইতে সংগৃহীত।)

সাগর, দামোহ, জব্বলপুর, মান্দলা, সিয়নি, নরসিংহপুর, হোসঙ্গাবাদ, নিমার, বেতুল, চিন্দোয়ারা, ওয়ার্ধা, নাগপুর, চান্দা, বান্দারা, বালাঘাট, রায়পুর, বিলাসপুর, সম্বলপুর নামক জিলাগুলির বিভিন্ন শ্রেণীর যোগিজাতির সংখ্যা নিম্নরূপ পাওয়া গিয়াছে —

সন্ন্যাসী (Devotee) শ্রেণীর

	পুরুষ	স্ত্রী	মোট
গোসাই	১২৯২৭	১১৮৬৯	২৪৭৯৬
ভারতী	৭৪০	৬৭২	১৪১২
গিরী	৪৮৩৯	৪৪৯৬	৯৩৩৫
পুরী	৩০৯০	২৯৬০	৬০৫০
যতী	১৫	২	১৭
যোগি	২৯২৫	৩১৬৯	৬০৯৪
নাথ	২৫৭৪	২৪৩৪	৫০০৮
মোট	২৭১১০	২৫৬০২	৫২৭১২

১৮৯১ ইং সালের (১২৯৮ বাং) লোক গণনায় মধ্য ভারতবর্ষের মাকরাই, বস্তুর, কঙ্কর, নন্দগাও, খৈরাগর, চুলখাদন, কওয়ার্দা, শক্তি, রায়গড়, সরাজড়, বামরা, রায়বাখল, শোনপুর, পাটন ও কালানন্দি করদমিত্র রাজ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর যোগিজাতির সংখ্যা নিম্নরূপ পাওয়া গিয়াছে—

সন্ন্যাসী (Devotee) শ্রেণীর

	পুরুষ	স্ত্রী	মোট
গোসাই	৫৩৭	৫০১	১০৩৮

	পুরুষ	স্ত্রী	মোট
যোগি	৪২৩	৪৭৭	৯০০
নাথ	৩৬১	৩৪৫	৭০৬
মোট	১৩২১	১৩২৩	২৬৪৪

মধ্য ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের যোগিজাতির সংখ্যা—১০২৭৪ জন।

আলোচ্য সনে মধ্য ভারতবর্ষের যোগিজাতির মোট সংখ্যা—৬৫৬৩০ জন।

(ভারত গবর্ণমেণ্টের ১৮৯১ ইংরাজীর লোক গণনার রিপোর্ট হইতে সংগৃহীত)

১৯৩১ ইংরাজীর (১৩৪৮ বাং) লোক গণনায় নিম্নলিখিত স্থানের যোগিজাতির সংখ্যা নিম্নরূপ পাওয়া গিয়াছে —

প্রদেশ	মোট
আজমীর ও মাড়োয়ার	২৯৯৮ জন
বোম্বাই	১৪৫৭ জন
মধ্যভারত	১২৪৯৯ জন
গোয়ালিয়র	১১০৫১ জন
জম্বু ও কাশ্মীর	৫৯৭৭ জন
রাজপুতনা	৭৬২০৪ জন
পশ্চিম ভারত করদরাজ্যে	১৭৪০ জন
মোট	১১১৯২৬ জন

(Census of India 1931, Vol I. Part II)

ভারতবর্ষে যোগিজাতির সংখ্যা

১৮৯১ ইংরাজীর লোকগণনায় ভারতবর্ষে যোগিজাতি।

[ভারত সরকারের ১৮৯১ ইংরাজীর লোকগণনার রিপোর্ট হইতে সংগৃহীত।]

বোম্বাই ও করদরাজ্য— ১৬৮২৩ জন

সিন্ধু ও খয়েরপুর	১২০৭ জন
মধ্যপ্রদেশ ও করদরাজ্য	৬৯৯৪ ,,
হায়দরাবাদ	৫৮৩৯ ,,
বরদা	১৫৩৮ ,,
মহীশূর	৯৪০৮ ,,
কাশ্মীর	৬১৯৯ ,,
রাজপুতনা	৪৯২৬২ ,,
মোট	৯৭২৭০ জন

(Census of India 1891)

বঙ্গদেশে	৩৪৩৭৭৬
বিহার উড়িষ্যায়	৫৫৪৯৯
আসামে	১৭৭৭৪৬
মধ্যভারতবর্ষে	৬৫৬৩০
করদরাজ্যে	৭১৯৮
সর্ব্বমোট	৭৪৭১১৯

১৯০১ ইংরাজীর লোকগণনায় ভারতবর্ষে যোগিজাতি।

ভারত সরকারের ১৯০১ ইংরাজীর লোকগণনার রিপোর্ট হইতে সংগৃহীত)

প্রদেশ	পুরুষ	স্ত্রী	মোট
আজমীর	৪৮২	৮৭৮	১৩৬০
আন্দামান	১৮	*	১৮
বেলুচিস্থান	৪৩	৪	৪৭
বেরার	৮০০	৮১২	১৬১২
বোম্বে	৫৭৪০	৫২০৬	১০৯৪৬
ব্রহ্মদেশ	৭৫	*	৭৫

প্রদেশ	পুরুষ	স্ত্রী	মোট
মধ্যপ্রদেশ	৪৭৫৩	৪৭৬১	৯৫১৪
কুর্গ	৪৫	৩৫	৮০
মাস্ত্রাজ	৮৯৮৪	৯৩২৯	১৮৩১৩
পাঞ্জাব	৩৯৩৮৩	৩৬৩৮৮	৭৫৭৭১
বরদা	১৫৯	১৩৩	২৯২
হায়দরাবাদ	৩১৬৪	২১৯৬	৫৩৬০
মহীশূর	৭৪৯৩	৭১৯০	১৪৬৮৩
রাজপুতনা	১৫১৫২	১৩২০৯	২৮৩৬১
ত্রিবাঙ্কুর	৪৪	৪১	৮৫
আসাম	৮১৩৩২	৮০৩১৮	১৬১৬৫০
বাংলা	১৮৮২৯৫	১৮৬৬১১	৩৭৪৯০৬
মোট	৩৫৫৯৬২	৩৪৭১১১	৭০৩০৭৩

নিম্নলিখিত স্থানে শুধুমাত্র নাথধর্ম্মী যোগিজাতির সংখ্যা নিম্নরূপ পাওয়া গিয়াছে

প্রদেশ	পুরুষ	স্ত্রী	মোট
আজমীর	৭	৪	১১
বেরার	১০২৪	৭৯৪	১৮১৮
বোম্বে	২৯	২২	৫১
মধ্যভারত	৫৯৩০	৪৬৮২	১০৬১২
কাশ্মীর	৩৬৯	৩৯২	৭৬১
রাজপুতনা	১৭২৪১	১৪৯৬৯	৩২২১০
মোট	২৪৬০০	২০৮৬৩	৪৫৪৬৩
সর্ব্বমোট	৩৮০৫৬২	৩৬৭৯৭৪	৭৪৮৫৩৬

(Census of India 1901. Vol. I A. Part II)

ডক্টর শ্রীমতী কল্যাণী মল্লিক বলেন—"১৯০১ খৃষ্টাব্দের লোকগণনায় ভারতে ৪৫,৪৬৩ নাথযোগীর সংখ্যা দেখা যায়, তৎপরে পৃথকভাবে ইহাদের সংখ্যা নির্ণয় করা হয় নাই" (নাথপন্থ— ১ পৃঃ)।

উপরোক্ত সরকারী বিবরণীতে দেখা যাইতেছে আলোচ্য সনে শুধু নাথ-ধর্ম্মাবলম্বী যোগিজাতির সংখ্যা ছিল ৪৫,৪৬৩ জন এবং অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী যোগিজাতির সংখ্যা ছিল ১০৩০৭৩। সর্ব্বমোট সংখ্যা ছিল ১৪৮৫৩৬।

১৯১১ ইংরাজীর লোকগণনায় ভারতবর্ষে যোগিজাতি

[ভারত সরকারের ১৯১১ ইংরাজীর লোকগণনার রিপোর্ট হইতে সংগৃহীত]

প্রদেশ	পুরুষ	স্ত্রী	মোট
আজমীর ও মাড়োয়ার	১৩৮১	১১৫৩	২৫৩৪
বিহার ও উড়িষ্যা	১৭৭১৬	১৭৬০৫	৩৫৩২১
বোম্বাই	২৬৯৬	২০০৬	৫২৯৬
মধ্যপ্রদেশ	৭৭৫৩	৭৬৪৯	১৫৪০২
বেরার	১১৬৪৪	১১৫৪৬	২৩১৯০
পাঞ্জাব	৪৪৮৮৭	৩৮৫২৫	৮৩৪১২
মধ্যভারতীয় এজেন্সি	৭৮০৬	৭২৯৪	১৫১০০
হায়দরাবাদ	৩২৮৮	২৬১৯	৫৯০৭
কাশ্মীর	৩১২৫	২৪২৮	৫৫৫৩
মহীশূর	৭৫৮৭	৭৪৭৪	১৫০৬১
রাজপুতনা	৪০৬৪৪	৩৬৪০৮	৭৭০৫২

[Census of India 1911. Vol. I, Part II]

বঙ্গদেশ	৩৬১,১৪১
আসাম	১৬৯০৯৭
সর্ব্বমোট	৮১৪০৬৬

১৯২১ ইংরাজীর লোকগণনায় ভারতবর্ষে যোগিজাতি।

প্রদেশ	পুরুষ	স্ত্রী	মোট
পাঞ্জাব ও দিল্লী	৩৭৯০৬	৩২১৮৭	৭০০১৩
রাজপুতনা এজেন্সী ও আজমীর মাড়োয়ার	৩৪১৯৩	২৯৮২৩	৬৪০১৬
মোট	৭২০৯৯	৬২০১০	১৩৪১০৯

আলোচ্য সনে আসাম, বাঙ্গালা ও রাজপুতনার সংখ্যা নিম্নরূপ ছিল—

পুরুষ	স্ত্রী	মোট
৩৪১২৫৬	৩২০২০৪	৬৬১৪৬০

(Census of India 1921, Vol. I, Part II)

আলোচ্য সনে সমগ্র ভারতের মোট সংখ্যা— ৭৯৫৫৬৯ জন।

সমগ্র ভারতে বস্ত্রবয়নকারী ও রংকারী যোগিজাতির সংখ্যা—১৮৯১ ইংরাজী

[ভারত সরকারের ১৮৯১ ইং লোকগণনার রিপোর্ট হইতে সংগৃহীত]

১৮৯১ ইংরাজীর লোকগণনানুসারে সমগ্র ভারতে বস্ত্রবয়নকারী ও রংকারী যোগিজাতির সংখ্যা ছিল— ৪২৪২১৯ জন।

আলোচ্য সনে আসামে ঐ শ্রেণীর যোগিজাতির সংখ্যা ছিল—১৭৭৭৪৬ জন।

আলোচ্য সনে বঙ্গদেশে ঐ শ্রেণীর যোগিজাতির পুরুষের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল— ৩৭১০ জন এবং স্ত্রীলোকের সংখ্যা ছিল— ৩৪৮৮ জন, সর্ব্বমোট— ৭১৯৮ জন।

আসাম বাঙ্গালার সংক্ষিপ্তসার

আসামের সংক্ষিপ্তসার

সন	লোকসংখ্যা
১৮৭১	১৬২০৭২
১৮৮১	১৭২৫৭৬
১৮৯১	১৭৭৭৪৬
১৯০১	১৬১৬৫০
১৯১১	১৬৯০৯৭
১৯২১	১৬১৪৪১

বঙ্গদেশের সংক্ষিপ্তসার

১৮৯১	৩৪৩৭৭৬
১৯০১	৩৭৪৯০৬
১৯১১ ●	৩৬১১৪১
১৯২১	৩৬৬০২১
১৯৩১	৩৮৪৬৩৪

ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্তসার

১৮৯১	৭৪৭১১৯
১৯০১	৭৪৮৫৩৬
১৯১১	৮১৪০৬৬
১৯২১	৭৯৫৫৬৯

একাদশ অধ্যায়

আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনীর বার্ষিক অধিবেশনের মাননীয় সভাপতি-গণের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা।

এই অধ্যায়ে আমরা আসাম-বঙ্গ যেগি-সম্মিলনীর মাননীয় সভাপতি মহোদয়গণের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা আলোচনার চেষ্টা করিব। ১৩১৭ বঙ্গাব্দে সম্মিলনীর জন্মাবধি আজ পর্য্যন্ত ইহার ত্রিশটি সাধারণ অধিবেশন, একটি প্রতিনিধি-সভা ও দুইটি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছে। ১৩৫২ সালে বরিশালের কাউখালিতে ইহার ৩৬শ বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তৎপর আজ পর্য্যন্ত ইহার আর কোনও অধিবেশন আহূত হয় নাই। বিশ্বব্যাপী নিদারুণ অস্বাভাবিক পরিস্থিতি, দেশবিভাগ ও তাহা হইতে উদ্ভূত প্রতিকূল অবস্থাসমূহ এবং উৎসাহী কর্ম্মীর অভাব প্রভৃতিই ইহার কারণ। কতিপয় অপরিহার্য্য কারণে ২৩শ, ৩২শ, ৩৩শ ও ৩৪শ বার্ষিক অধিবেশনও বন্ধ ছিল। ৩০টী সাধারণ অধিবেশন, একটি প্রতিনিধি-সভা ও দুইটি বিশেষ অধিবেশন সহ সর্ব্বমোট ইহার ৩৩টী অধিবেশন হইয়াছে। এই ৩৩টী অধিবেশনের সভাপতি প্রত্যেক বার বিভিন্ন ব্যক্তি নির্ব্বাচিত না হইয়া, একই ব্যক্তি একাধিকবার নির্ব্বাচিত হওয়াতে মোট কুড়ি জন মাননীয় ব্যক্তি ঐ ৩৩টি অধিবেশনের সভাপতিত্ব করিয়াছেন। আমরা এখানে এই কুড়ি জন মাননীয় সভাপতির সংক্ষিপ্ত জীবনেতিহাস লিপিবদ্ধ করিলাম।

---

(১) অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি,যে কয়েকজন মাননীয় সভাপতির জীবনকথা আমরা তাঁহাদের বা তাঁহাদের বংশধর ও আত্মীয় স্বজনের নিকট পুনঃ পুনঃ পত্র দিয়াও সংগ্রহ করিতে পারি নাই। সেজন্য তাঁহাদের জীবনী আমাদের ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা হইতে অসম্পূর্ণ ভাবে লিখিত হইল।

আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনীর সভাপতিগণ (মৃত)

কৃষ্ণসুন্দর মজুমদার, বি-এল, উকিল

পরম ভাগবত স্বর্গীয় কৃষ্ণসুন্দর মজুমদার, বি-এল, উকিল মহাশয় নোয়াখালি জিলার অন্তর্গত দালাল বাজার নামক গ্রামে ১২৬৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল, ৺চৈতন্যকৃষ্ণ মজুমদার। তিনি দালাল বাজারের সুবিখ্যাত জমিদার রায়বাবুদের এষ্টেটে সামান্য বেতনে চাকুরি করিতেন। অসচ্ছল অবস্থা সত্ত্বেও চৈতন্যকৃষ্ণ জ্যেষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণসুন্দর এবং আরও দুইটী পুত্রের শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ সচেতন ছিলেন। কৃষ্ণসুন্দর স্থানীয় বিদ্যালয়ে কিঞ্চিৎ লেখাপড়া শিখিয়া উচ্চশিক্ষা লাভার্থ চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়সে ঢাকা সহরে গমন করেন। তখন রেল বা ষ্টীমারের প্রচলন হয় নাই। বালক কৃষ্ণসুন্দর উচ্চ-শিক্ষার বলবতী আকাঙ্ক্ষা লইয়া পদব্রজে ও নৌকাযোগে বিপদসঙ্কুল দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া ঢাকা সহরে উপনীত হইলেন। কঠোর পরিশ্রম ও একাগ্রতা গুণে মেধাবী বালক কৃতিত্বের সহিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিলেন। প্রবেশিকা পরীক্ষার এই অভাবনীয় ফলে উৎসাহিত হইয়া কৃষ্ণসুন্দর নব উদ্যমে কলেজে ভর্ত্তি হইলেন; দারিদ্র্য তাঁহার যাত্রাপথে বাধার সৃষ্টি করিতে পারিল না। তাঁহার পিতৃদেব তাঁহার শিক্ষার ব্যয় বহন করিতে পারিলেন না। সুতরাং কৃষ্ণসুন্দর গৃহশিক্ষকতা করিয়া অর্থ উপার্জ্জন পূর্ব্বক কলেজীয় শিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। তাঁহার অধ্যবসায় ও অদম্য উৎসাহের নিকট দারিদ্র্য আত্মসমর্পণ করিল। ঢাকার জমিদারপুত্র রূপবাবু ও রঘুবাবুর গৃহশিক্ষকতা করিয়া তিনি যাহা উপার্জ্জন করিতেন তাহা দিয়াই কোন মতে পড়ার খরচ চালাইতেন। বহুবিধ প্রতি-বন্ধকতা ও বিপদ আপদ সত্ত্বেও তিনি কৃতিত্বের সহিত বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। নোয়াখালি জিলার মধ্যে তিনিই হইলেন প্রথম গ্রাজুয়েট। সুতরাং

তাঁহাকে দেখিবার জন্ত বহু দুরবর্ত্তী গ্রাম হইতে কত চেনা-অচেনা হিন্দু-মুসলমান দালাল বাজারে আসিয়া ভিড় করিতে লাগিল। অঙ্কশাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল; সুতরাং তাঁহার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনা বুঝিয়া অনেক বদান্ত ব্যক্তি মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে অর্থসাহায্য প্রদান করিতেন। বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কৃষ্ণসুন্দর বি-এল পড়িতে আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে দালাল বাজারের স্বনামধন্য স্বজাতীয় জমিদার রায় বাহাদুর চন্দ্রকিশোর রায় মহোদয় অগ্রজপ্রতিম কৃষ্ণসুন্দরকে অর্থসাহায্য প্রদান পূর্ব্বক শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁহার সহায়তা করিয়াছিলেন। রায় বাহাদুরের এই বদান্যতার কথা কৃষ্ণসুন্দর ভাবীজীবনে কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিতেন। তিনিও উত্তরকালে অনেক দুঃস্থ দরিদ্র স্বজাতীয় পুত্রকে আহার-বাসস্থান দিয়া তাহাদিগকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি নিজে দারিদ্র্যের কঠোর আঘাত পাইয়াছিলেন বলিয়াই দরিদ্র ছাত্রগণের দুঃখদুর্গতি অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। দুঃখ না পাইলে দুঃখীর দুঃখ কেহ বুঝিতে পারে কি?

বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কৃষ্ণসুন্দর নোয়াখালি টাউনে জজকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করিলেন। দুই এক বৎসরের মধ্যেই তিনি আইন ব্যবসায়ে বিলক্ষণ যোগ্যতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়া বেশ প্রসার-প্রতিপত্তি লাভ করিলেন এবং তাঁহার আয়-উপার্জ্জনও যথেষ্ট হইতে লাগিল। এই সময় সরকার বাহাদুর মুন্সেফি পদ গ্রহণ করার জন্ত তাঁহাকে অনুরোধ জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ ও অর্থার্জ্জন সীমাবদ্ধ হইবে ভাবিয়া তিনি গবর্ণমেন্টের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। ইহার পর তাঁহার জীবনে এক অভাবনীয় পরিবর্ত্তন আসিয়া উপস্থিত হইল। মাত্র ২৮ বৎসর বয়সে কর্ম্মজীবনের উত্থানমুখে কৃষ্ণসুন্দর তাঁহার প্রিয়তমা পত্নীকে হারাইয়া সংসারের প্রতি অনেকটা আসক্তিশূন্য হইয়া পড়িলেন। সাধ্বী স্ত্রীর বিয়োগ-ব্যথা ভুলিতে না পারিয়া তিনি উদাসীনভাবে নির্জ্জনে দিন কাটাইতে লাগিলেন। আস্তে আস্তে তাঁহার ভাবধারার পরিবর্ত্তন হইল।

তিনি ভগবৎ-ধ্যানে আত্মনিয়োগ করিয়া কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্যে আত্মোপলব্ধির চেষ্টা করিতে এবং নিরামিষাশী হইয়া গৃহী সন্ন্যাসীর ন্যায় সংযত জীবন যাপন করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে কয়েক বৎসর নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিবার পর তিনি আত্মীয়স্বজনের পীড়াপীড়িতে দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করিতে বাধ্য হন এবং সেই অবধি তিনি একাধারে সংসারী ও যোগী হইয়া নির্লিপ্তভাবে বিষয়রস আস্বাদন করিতে থাকেন। প্রতি রবিবার ও একাদশী তিথিতে তিনি পূর্ণ মৌনভাব অবলম্বন করিয়া ভগবচ্চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন। দৈনন্দিন জীবনেও তিনি কৃষ্ণনাম জপে ও নামসংকীর্ত্তনে বিভোর হইয়া পড়িতেন। তাঁহার ভাববিগলিত অশ্রুধারা ও আত্মসমাধিজনিত পুলক-শিহরণ অবলোকন করিয়া অতি পাষণ্ডের হৃদয়ও দ্রবীভূত হইয়া যাইত। তাঁহার আচরণের মধ্যে কপটতা ছিল না। তিনি যাহা বিশ্বাস করিতেন কার্য্যেও তাহাই আচরণ করিতেন। কাহারও নিন্দা বা প্রশংসায় তিনি বিচলিত হইতেন না। আদর্শ বৈষ্ণব হওয়াই ছিল তাঁহার জীবনের লক্ষ্য।

প্রগাঢ় শ্রদ্ধার সহিত তিনি বৈষ্ণব গ্রন্থরাজি এবং শ্রীমদ্ভাগবতগীতা, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া পাণ্ডিত্য লাভ করেন। সমগ্র গীতা তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। গীতার উপদেশ তিনি কর্ম্মজীবনে পালন করিতে চেষ্টা করিতেন। কৃষ্ণসুন্দরের ধর্ম্মানুরাগের ও পাণ্ডিত্যের খ্যাতি বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল। কাশিমবাজারের মহারাজা বৈষ্ণবকুলতিলক স্বর্গীয় মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহোদয় কর্ত্তৃক আহূত বৈষ্ণব মহাসভায় বহুবার বিশেষভাবে নিমন্ত্রিত হইয়া কৃষ্ণসুন্দর বৈষ্ণব ধর্ম্মের উদারতা, নাম-মাহাত্ম্য এবং শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত প্রেমধর্ম্ম সম্বন্ধে সারগর্ভ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিয়া সমাগত গৌর-ভক্তবৃন্দের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিলেন। নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব হইলেও ধর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি কোনরূপ সংকীর্ণতা পোষণ করিতেন না। আদর্শ বৈষ্ণবের মতই তিনি সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বী লোকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতেন এবং সকল

ধর্ম্মের মূল অনুসন্ধান করিয়া সত্য নির্দ্ধারণে তৎপর হইতেন। তিনি সময় সময় ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় যোগদান করিতেন এবং ব্রাহ্মগণের সহিত ধর্ম্মালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন। আবার কখনও কখনও তিনি মুসলমান ফকির ও দরবেশের সহিত একাসনে উপবিষ্ট হইয়া গীতা ও কোরাণের মূল সূত্রগুলির গভীর আলোচনায় তন্ময় হইয়া পড়িতেন। তিনি নিজকে সর্ব্বদা 'তৃণাদপি সুনীচ' মনে করিতেন এবং বৈষ্ণবীয় দৈন্য তাঁহার আচরণে প্রকাশ পাইত। সাধু-সন্ন্যাসী বা কোন ভক্তের সহিত সাক্ষাৎ হইলেই তিনি সাষ্টাঙ্গে ভূমিতে লুটাইয়া পড়িয়া শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেন।

কৃষ্ণসুন্দর স্বকীয় বাসভবনে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। আনন্দ-উৎসবে নিত্য মুখরিত থাকিত তাঁহার 'দেবভবন'; বহু সাধু-সন্ন্যাসীর শুভাগমন হইত তাঁহার দেবালয়ে। বৈষ্ণব-আপ্যায়ন ও বৈষ্ণব-সেবা ছিল তাঁহার নিত্যধর্ম্ম। তাঁহার দেবালয়ে সমাগত সাধু-পর্য্যটকেরা কৃষ্ণসুন্দরের অভ্যর্থনা ও আতিথেয়তায় মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। তাঁহার শ্রদ্ধাভক্তি, আতিথেয়তা ও ধর্ম্মপরায়ণতার খ্যাতি হরিদ্বার পর্য্যন্ত সাধুমহলে প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল। পরবর্ত্তী কালে বিগ্রহের নিত্য সেবায় এবং সাধু-বৈষ্ণবদের আতিথেয়তায় যাহাতে কোনরূপ বিঘ্ন না ঘটে, সেইজন্য তিনি প্রভূত সম্পত্তি দেবোত্তররূপে দান করিয়া গিয়াছেন।

সাংসারিক জীবনেও কৃষ্ণসুন্দর সমধিক উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। ওকালতি ব্যবসায়ে তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়া হাতিয়াদ্বীপে এক বিরাট তালুক খরিদ করেন। নোয়াখালি টাউনে তিনি পর পর যে দুইখানি ত্রিতল অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা মেঘনার প্রবল তরঙ্গাঘাতে তাঁহার ওকালতি-জীবনেই নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। তারপর দালাল বাজারেই ঘোষ বাবুদের কাছারিবাড়ী খরিদ করিয়া সেখানে ত্রিতল একটি "দেবনিবাস" ইমারত

স্থাপন পূর্ব্বক কর্ম্মজীবনের অবসানে দান ধ্যান ও ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্য দিয়া জীবনের শেষ দিনগুলি সেখানেই অতিবাহিত করেন।

জ্ঞান ও কর্ম্মের অপূর্ব্ব সমন্বয় হইয়াছিল কৃষ্ণসুন্দরের জীবনে। প্রাচুর্য্যের মধ্যে থাকিয়াও তিনি বিষয়বিমুগ্ধ ছিলেন না। দানধর্ম্মে-আতিথেয়তায়, আর্ত্তের সেবায়, পরোপকারিতায় অর্থব্যয় করিতে তিনি কখনও কুণ্ঠিত হইতেন না। তিনি ভোগী ছিলেন না, তিনি ছিলেন ত্যাগী। "কা বা বিমুক্তি-র্ব্বিষয়ে বিরক্তিঃ"— এই শাস্ত্রবাণীর দৃষ্টান্ত তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি বিষয়ী হইয়াও বিষয়বিরাগী ছিলেন।

স্বজাতির দুঃখদুর্দ্দশা দেখিয়া তিনি ব্যথিত ও বিচলিত হইতেন। শিক্ষাই জাতীয় উন্নতির একমাত্র উপায় ও পথপ্রদর্শক—ইহাই ছিল তাঁহার বিশ্বাস; সুতরাং তিনি অনেক দুঃস্থ ছাত্রকে অর্থসাহায্য প্রদানপূর্ব্বক যোগিজাতির মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা করিয়া বিদ্যোৎসাহিতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। পরমভাগবত ও স্বজাতিপ্রেমিক কৃষ্ণসুন্দর স্বজাতিকে যেমন ভালবাসিতেন, জাতিও তাঁহাকে ততোধিক ভালবাসিতেন। সম্মিলনীর শৈশবাবস্থায়ও তাঁহার নাম পূর্ব্ববঙ্গে সুপরিচিত ছিল। তাই জাতিমাতৃকা ১৩১৮ সালে তাঁহার ভক্ত সন্তানকে সম্মিলনীর দ্বিতীয় অধিবেশনের (স্থান আড়িয়ল, ঢাকা) সভাপতি পদে বরণ করিয়া তাঁহার প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তারপর ১৩৩১ সালে মুর্শিদাবাদ জিলার অন্তর্গত সাগরদীঘি নামক স্থানে সম্মিলনীর যে পঞ্চদশ অধিবেশন আহূত হয় তাহাতেও আমরা কৃষ্ণসুন্দরকে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিতে দেখিয়াছি। তখন তাঁহার বয়স ছিল প্রায় ৬৭ বৎসর। তৎকালে এই বৃদ্ধের স্বজাতিসেবার বলবতী আকাঙ্ক্ষা এবং তাঁহার যুবজনোচিত উৎসাহ ও উদ্যম দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছিলাম। আমরা আরও মুগ্ধ হইয়াছিলাম তাঁহার জ্ঞানগর্ভ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং জাতিগঠনমূলক মৌখিক ভাষণ শ্রবণ করিয়া।

কৃষ্ণসুন্দর ছিলেন সংযমী, মিতাচার, মিতাহার ও নিয়মনিষ্ঠ। তাঁহার ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা ছিল অতুলনীয়। তিনি জীবনে কখনও কঠিন রোগে আক্রান্ত হন নাই। অসুখবিসুখে তিনি ঔষধ সেবন করিতেন না। নামামৃত পানেই আরোগ্য লাভ করিতেন। মৃত্যু জীবের স্বাভাবিক পরিণতি হইলেও মৃত্যুর প্রকারভেদ আছে। কেহ মৃত্যুর ভয়াবহ করালমূর্ত্তি কল্পনা করিয়া ভীত ও শঙ্কিত হয়; আবার কেহ মৃত্যুকে অনন্তধামের সোপান মনে করিয়া সানন্দে ইহাকে আলিঙ্গন করিয়া থাকে। পুণ্যাত্মা কৃষ্ণসুন্দর ১৩৪৯ বঙ্গাব্দে আষাঢ়ের শুক্ল দ্বিতীয়ার রথযাত্রার শুভলগ্নে জাগতিক সুখদুঃখের পরিসমাপ্তি করিয়া ৮৫ বৎসর বয়সে মৃত্যুকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক চিরাকাঙ্ক্ষিত নিত্যধামে প্রস্থান করেন।

[৺কৃষ্ণসুন্দরের পৌত্র শ্রীশচীনন্দন মজুমদার, বি, এস-সি প্রেরিত উপকরণ অবলম্বনে লিখিত]

৺হরিপ্রসাদ নাথ, মোক্তার

আসাম প্রদেশের গোয়ালপাড়া টাউনে ইঁহার নিবাস ছিল। ১৩১ বঙ্গাব্দে ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত টেংরা নামক স্থানে সম্মিলনীর যে তৃতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়, হরিপ্রসাদ বাবু তাহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন আসামের যোগিজাতির মধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রথম আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনীর বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি সাতিশয় সদাশয় ও স্বজাতিবৎসল ছিলেন। জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে ইনি দরিদ্র জনসাধারণের দুঃখমোচনে সর্ব্বদাই অগ্রসর হইতেন। বদান্যতা ও আতিথেয়তা গুণে তিনি সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন এবং উদারতা ও চরিত্রমাধুর্য্যে তিনি স্থানীয় জনসাধারণের প্রিয়ভাজন হইয়াছিলেন। গোয়ালপাড়া জিলার মধ্যে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ মোক্তার বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। মোক্তারি করিয়া তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন পূর্ব্বক ধনশালী হন। যোগিজাতির মধ্যে

তিনিই বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম আন্তর্গণিক বিবাহের প্রচলন করেন। ১৩২৭ বঙ্গাব্দের ১৭ই পৌষ তারিখে ইনি পরলোকপ্রাপ্ত হন।

৺হরেন্দ্রনারায়ণ নাথ

৺হরেন্দ্র নারায়ণ আসাম গোয়ালপাড়া টাউনের অধিবাসী ছিলেন। তিনি বঙ্গাব্দ ১২৬৪ সালে গোয়ালপাড়ার এক বর্দ্ধিষ্ণু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি চিন্তাশীল ও ধর্ম্মভাবাপন্ন ছিলেন। তিনি বুদ্ধিমান ও মেধাবী হইলেও লেখাপড়ায় বেশী দূর অগ্রসর না হইয়া অতি অল্প বয়সে ডেপুটী কমিশনার অফিসে কেরাণীর পদ গ্রহণ করিয়া চাকুরি করিতে থাকেন। সততা, সত্যবাদিতা ও কর্ত্তব্যপরায়ণতার গুণে তিনি সামান্য কেরাণীর পদ হইতে হেড্ক্লার্কের পদে উন্নীত হন। গোয়ালপাড়া জিলার অন্তর্গত বিজনী এষ্টেটের তদানীন্তন দেওয়ান ৺বরদানাথ হালদার হরেন্দ্র বাবুর কর্ম্মতৎপরতা ও সচ্চরিত্রতা দেখিয়া অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে উক্ত এষ্টেটের সহকারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। তদনুসারে তিনি অসময়ে সরকারি চাকুরি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ১৯০৯ সালে বিজনী গমন করেন। সুনাম ও সুখ্যাতির সহিত তিনি তের বৎসর বিজনী রাজএষ্টেটে চাকুরি করিয়া বার্দ্ধক্যবশতঃ অবসর গ্রহণ করেন। তিনি কখনও কর্ত্তব্যে অবহেলা করিতেন না। নির্ভীকতা, তেজস্বিতা, কর্ম্মকুশলতা, ন্যায়পরতা প্রভৃতি গুণে তিনি সকলের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। এই দীর্ঘশ্মশ্রু লম্বকায় ও গম্ভীরাকৃতি ঋষিকল্প ব্যক্তি চরিত্রমাধুর্য্যে সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিলেন। বহু সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত থাকিয়া তিনি স্থানীয় জনসাধারণের কল্যাণসাধন করিয়া গিয়াছেন। সংযম ও মিতাচারিতা অনুশীলন করিয়া তিনি দীর্ঘজীবন লাভ করিয়াছিলেন। বৃদ্ধ বয়সেও তিনি যুবকের ন্যায় উৎসাহী, শ্রমসহিষ্ণু ও কর্ম্মক্ষম ছিলেন। সুদীর্ঘ ৪০ বৎসর কাল তিনি নিয়মিত-

ভাবে যোগ অভ্যাস ও হিন্দুশাস্ত্র আলোচনা করিয়াছিলেন। একাদিক্রমে যোগ অভ্যাস করাতে তিনি বার্দ্ধক্যেও বেশ স্বাস্থ্যবান্ ও কর্ম্মপটু ছিলেন এবং যৌগিক ক্রিয়ার অনুশীলনফলে দুরারোগ্য পিত্তশূল ব্যাধি হইতে আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন। তিনি সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক ছিলেন। ধর্ম্মতত্ত্বালোচনায়, নাম সংকীর্ত্তনে এবং ধর্ম্মগ্রন্থ অধ্যয়নে তিনি একেবারে আবিষ্ট হইয়া পড়িতেন এবং কীর্ত্তনের সময় কৃষ্ণপ্রেমে মুগ্ধ হইয়া দুই বাহু উত্তোলন করিয়া নৃত্য করিতে থাকিতেন।

যোগিজাতির কল্যাণসাধনেও তিনি পশ্চাৎপদ ছিলেন না। আসামবাসী যোগিগণের মধ্যে শিক্ষা ও সদাচারের বহুল প্রচলনমানসে তিনি অনুপম ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন। স্বজাতির মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে তিনি সর্ব্বদাই যত্নবান ছিলেন। গোলাঘাট, বরনগর, রহা, চুটিয়াপাড়া প্রভৃতি আসামের বিভিন্ন স্থানে আহূত আসাম প্রাদেশিক সম্মিলনীর ও আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনীর অধিবেশনে সভাপতিরূপে বা প্রধান উদ্যোক্তা হিসাবে তিনি ঐ সকল অধিবেশনে যোগদান পূর্ব্বক জ্ঞানগর্ভ অভিভাষণ ও উপদেশ দানে সকলের উৎসাহ ও আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। ১৩৩০ সালে বরিশাল জিলার অন্তর্গত ঝালকাটী বন্দরে সম্মিলনীর যে ১৪শ বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে যোগিজাতি আসামের এই বরেণ্য-নেতাকে সভাপতিরূপে বরণ করিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করেন। আজীবন স্বজাতির হিতসাধন ও কল্যাণকামনা করিয়া ১৩৫ বঙ্গাব্দের ১লা জ্যৈষ্ঠ তারিখে ৯০ বৎসর বয়সে এই পুরুষসিংহ পরলোক প্রাপ্ত হন।

ডাঃ ৺জগচ্চন্দ্র নাথ, এল, এম্, এস্

সম্মিলনীর উষাযুগে যে সকল স্বজাতিপ্রাণ মহাত্মা ইহার নেতৃত্ব করিয়াছিলেন, ডাক্তার জগচ্চন্দ্র তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। আমরা তাঁহার জন্মতারিখ সংগ্রহ করিতে পারি নাই। বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত সমুদ্রগ

গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল ৺পার্ব্বতীচরণ নাথ। কৃষ্ণনগর গোয়াড়ী বাজারে তাঁহাদের বেশ বড় রকমের দেশী কাপড়ের দোকান ছিল। তাঁহার পিতা ৺পার্ব্বতীচরণ নাথ তৎকালে সর্ব্বত্র বিশেষতঃ স্বজাতি-মহলে প্রসিদ্ধ বস্ত্রব্যবসায়ী বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। গোয়াড়ীর পার্ব্বতী নাথের দোকান সর্ব্বজন-পরিচিত ছিল। জগচ্চন্দ্র ডাক্তারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গোয়াড়ী বাজারে ডিস্পেন্সারি স্থাপন করিয়া চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করেন। গোয়াড়ী টাউনে আগে থেকেই জগৎবাবুদের যে সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল, তাহারই বলে চিকিৎসা ব্যবসায়ে অতি অল্পকালের মধ্যেই জগচ্চন্দ্রের প্রসার বাড়িয়া গেল। গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর ও পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলে তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ডাক্তার বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। ভদ্রতা, অমায়িকতা, অভিজ্ঞতা, সেবাপরায়ণতা প্রভৃতি যে সকল গুণ চিকিৎসকের পক্ষে একান্ত আবশ্যক, সেই সমস্ত গুণেই জগচ্চন্দ্রের চরিত্র বিভূষিত ছিল। এই জন্যই তিনি অচিরকাল মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। অর্থের চেয়ে রোগীর নিরাময়তার দিকেই তাঁহার বেশী দৃষ্টি থাকিত। তিনি রোগীর বা তাহার অভিভাবকের নিকট হইতে বেশী টাকা আদায় করিবার নিমিত্ত কখনও কোনও কৌশল অবলম্বন করিতেন না। নিঃস্ব, দরিদ্র রোগীদের কাছ থেকে ভিজিটের টাকা বা ঔষধের দাম আদায় করা ত দূরের কথা, অনেক সময় নিজের পকেট হইতে তাহাদের পথ্যাদি ক্রয় করিয়া দিতেন,—এইরূপ দয়াপূর্ণ ছিল তাঁহার হৃদয়। চিকিৎসাবিদ্যায় তাঁহার নিপুণতা দেখিয়া ও তাঁহার সুমধুর ব্যবহারে আকৃষ্ট হইয়া নদীয়ার মহারাজ তাঁহাকে গৃহচিকিৎসকরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সৌম্য-শান্ত-গম্ভীর-মূর্ত্তি জগচ্চন্দ্র জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন।

জগচ্চন্দ্রের ও তাঁহার বংশের খ্যাতি যোগিজাতির মধ্যে অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তারলাভ করিয়াছিল। পূর্ব্ববঙ্গের ও উত্তরবঙ্গের যে সকল স্বজাতীয় লোক

তীর্থদর্শনোপলক্ষে নবদ্বীপধামে আগমন করিতেন, গোয়াড়ী বাজারে জগচ্চন্দ্রের ডিস্পেন্সারির পাশ দিয়াই তাহাদিগকে যাতায়াত করিতে হইত। এই সূত্রে অনেকে তাঁহার সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ পাইতেন এবং জগচ্চন্দ্রের আতিথেয়তা ও স্বজাতিবৎসলতার কথা আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে প্রচার করিতেন। তা'ছাড়া ১৯০১ সালের সেন্সাস্ উপলক্ষে যোগিজাতির সামাজিক মানমর্য্যাদা উন্নয়নের জন্য কলিকাতায় যে আন্দোলন সৃষ্ট হইয়াছিল তাহাতে মেডিকেল কলেজের ছাত্র জগচ্চন্দ্র ভারতবাবু প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সহিত সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই কারণেও তাঁহার সুনাম বঙ্গীয় যোগিসমাজের মধ্যে প্রচারিত হইয়া পড়ে। জগচ্চন্দ্রের স্বজাতিসেবায় পরিতুষ্ট হইয়া যোগিজাতি ১৩২০ সালে তাঁহাকে সম্মিলনীর চতুর্থ অধিবেশনের (চট্টগ্রাম অধিবেশনের) সভাপতি নির্ব্বাচন করিয়া তাঁহার প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করেন। এই অধিবেশনের পর জগচ্চন্দ্র ন্যূনাধিক এক বৎসর জীবিত ছিলেন। ১৩২১ বাঙ্গালার ১৭ই মাঘ ইনি পরলোকগমন করেন।

৺বংশীবদন নাথ, উকিল

বাংলা ১২৭৮ সালের ২০শে কার্ত্তিক স্বর্গীয় বংশীবদন নাথ, উকিল মহাশয় চট্টগ্রাম জিলার মীরেশ্বরী থানার অন্তর্গত ছোট কমলদহ গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল ৺কুলচন্দ্র নাথ। শৈশবকালেই বংশীবদনের বুদ্ধিমত্তার ও প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। বাল্যকাল হইতেই লেখাপড়া শিখিবার প্রতি তাঁহার বিশেষ আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। তিনি অপরাপর বালকের ন্যায় সর্ব্বদা খেলাধূলায় আসক্ত না থাকিয়া সময় পাইলেই নির্জ্জন স্থানে যাইয়া পাঠে মগ্ন হইতেন। অল্প বয়সেই বংশীবদন পাঠশালার পাঠ সমাপন করিয়া মধ্য-বাংলা পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ করেন। তাঁহার পিতৃদেব কুলচন্দ্র নাথ মহাশয় মেধাবী পুত্রকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করিতে অভিলাষী হইলেন। সেই সময় ইংরাজী শিক্ষা দেশে এক নবযুগ ও

নবচেতনা আনয়ন করিয়াছিল। তৎকালে যাঁহারা ইংরাজী শিক্ষা লাভ করিতেন, তাঁহারা সমাজে ও দেশে বিশেষভাবে সম্মানিত ও আদরণীয় হইতেন। সুতরাং বংশীবদন উচ্চশিক্ষা-লাভ-মানসে স্বগ্রাম হইতে ৩২ মাইল দূরবর্ত্তী চট্টগ্রাম টাউনে গো-শকটারোহণে গমন করেন; তখনও পূর্ব্ব বাঙ্গালায় রেলগাড়ীর প্রবর্ত্তন হয় নাই; অতএব সে একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ বলিলেও হয়।

চট্টগ্রাম সহরে বর্ত্তমান চক্‌বাজারের অনতিদূরে তৎকালে দরিদ্র অসহায় নাথ ছাত্রদের জন্য একটি ছোট ছাত্র-নিবাস ছিল। বংশীবদন উক্ত ছাত্র-নিবাসে অবস্থান করিয়া কাজিমালি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। এই বিদ্যালয় হইতে বাংলা ১২৯৬ সালে অর্থাৎ ইংরাজী ১৮৮৯ সনে এন্‌ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তিলাভ করেন। তিনি খুব প্রতিভাশালী ও মেধাবী ছাত্র ছিলেন এবং ছাত্রজীবনে প্রত্যেক শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া আসিয়াছিলেন। ১২৯৮ বঙ্গাব্দে বংশীবদন



চট্টগ্রাম কলেজ হইতে কৃতিত্বের সহিত এফ. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তখন চট্টগ্রাম কলেজকে এফ. এ. কলেজ বলা হইত। যাঁহাদের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ছিল, তাঁহারা উক্ত কলেজ হইতে এফ. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় বি. এ. পড়িতে যাইতেন। এফ. এ. পাশ করিয়া বংশীবদন জাতীয় আন্দোলনে যোগদান করেন এবং কিছু দিনের জন্য শিক্ষকতা করিতে থাকেন। পরে তিনি তদীয় পিতৃদেবের উদ্যোগে ও একান্ত আগ্রহে শিক্ষকতা ছাড়িয়া আইন পড়িতে আরম্ভ করেন এবং যথা সময়ে পি. এল. পাশ করিয়া প্রথমে কিছু দিনের জন্য ফটিকছড়ি কোর্টে ওকালতি করেন এবং পরে চট্টগ্রাম টাউনে আসিয়া স্থায়ীভাবে আইন ব্যবসা করিতে থাকেন।

বংশীবদন অতি বিনয়ী, সত্যবাদী, ধর্ম্মভীরু ও দেবতুল্য লোক ছিলেন।

ওকালতি করিতে গিয়াও তিনি কখন মিথ্যার আশ্রয় লইতেন না। পাছে মিথ্যার শরণাপন্ন হইতে হয় এই ভয়ে তিনি দোতরফা মোকর্দ্দমা গ্রহণ করিতেন না। সাধারণ উকিলের মত তিনি অর্থলোভী ছিলেন না বা মক্কেলকে শোষণ করিবার চেষ্টা করিতেন না। মক্কেলেরা মোকর্দ্দমা খরচ বাবদ তাঁহার নিকট যাহা জমা রাখিয়া যাইতেন, তিনি তাহা হইতে ঠিক ন্যায্য খরচ কাটিয়া লইতেন এবং যাহা উদ্বৃত্ত থাকিত তাহা মক্কেলদিগকে প্রত্যর্পণ করিতেন। বিভিন্ন প্রকারের সত্য-মিথ্যা খরচ দেখাইয়া তাহাদের টাকা আত্মসাৎ করিতেন না। ইহাতে তাঁহার নিস্পৃহতা ও সাধুতাই প্রমাণিত হয়।

নানাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বংশীবদন প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। জ্যোতিষশাস্ত্রেও তাঁহার বেশ অধিকার ছিল। চট্টগ্রামের অনেক খ্যাতনামা জ্যোতিষী জ্যোতিষ গণনায় তাঁহার নিকট পরাভব স্বীকার করিয়াছিলেন। জ্যোতিষ গণনায় ও ঠিকুজি কোষ্ঠির বিচারে তাঁহার পারদর্শিতা দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইত। তিনি অসাধারণ স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন ছিলেন। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায় তিনি অনর্গল মুখস্থ বলিতে পারিতেন। এতাদৃশ পণ্ডিত হইয়াও তিনি পাণ্ডিত্যাভিমানী ছিলেন না। আচারে ব্যবহারে তিনি সরল, বিনয়ী ও নিরভিমান ছিলেন।

শেষজীবনে বংশীবদন সর্ব্বদা ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠে নিরত থাকিতেন। শ্রীমদ্ভাগবত গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবত— এই দুই মহাগ্রন্থই ছিল তাঁহার নিত্যসহচর। তিনি প্রায় পাঁচ শত টাকার ধর্ম্মগ্রন্থ ক্রয় করিয়া অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বংশীবদনের সাংসারিক জীবনও বেশ শান্তিময় ছিল। সতী-সাধ্বী রমণীরত্ন জয়তারা দেবীকে সহধর্ম্মিণীরূপে পাইয়া তিনি যথার্থই সুখী হইতে পারিয়াছিলেন। তাঁহাদের পবিত্র দাম্পত্যপ্রণয়ে সংসার ও জীবন মধুময় হইয়া উঠিয়াছিল। পত্নীর পাতিব্রত্য ও সেবাপরায়ণতায় বিমুগ্ধ বংশীবদনকে সংসারের কোনও তাপ স্পর্শ করিতে পারে নাই।

জাতীয় আন্দোলনের প্রথম যুগে যাঁহারা যোগিজাতির উন্নয়ন প্রচেষ্টার পথ-প্রদর্শক ছিলেন, বংশীবদন ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। বিগত ১৩২১ সালে আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনীর ফেণী অধিবেশনের সভাপতিরূপে তিনি আত্মবিস্মৃত জাতির মনে যে প্রেরণা জাগাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যোগিজাতি তাহা কখনও বিস্মৃত হইবে না। তিনি ছিলেন জাতিমাতৃকার ও চট্টলা-সুন্দরীর সুযোগ্য সন্তান। ১৩৩২ বঙ্গাব্দের ১৬ই কার্ত্তিক অর্থাৎ ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের ২রা নবেম্বর তারিখে বংশীবদন আত্মীয়স্বজনকে শোকসাগরে ভাসাইয়া অমর-ধামে প্রস্থান করেন। তিনি মাত্র ৫৪ বৎসর কাল এই মরজগতে জীবিত ছিলেন।

(৺বংশীবদনের পুত্র শ্রীহরেন্দ্রকুমার নাথ, বি-এ, প্রেরিত উপকরণ অবলম্বনে লিখিত)

নাথবন্ধু ৺হরিমোহন নাথ, মোক্তার

যোগিজাতির একনিষ্ঠ সেবকগণের মধ্যে নাথবন্ধু হরিমোহনের নাম সমধিক উল্লেখযোগ্য। তিনি প্রাণ দিয়া, দরদ দিয়া জাতিকে ভালবাসিতেন। লাঞ্ছিত যোগিজাতির গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, ইহার মর্য্যাদা বাড়াইবার জন্য নাথবন্ধু জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। সুতরাং জাতির কল্যাণ কামনায় ধ্যাননিমগ্ন এই মহাতাপসের জীবন-কথা জানিবার জন্য উৎসুক হওয়া স্বাভাবিক। আমরা তাঁহার আত্মচরিত হইতে সার সংগ্রহ করিয়া তাঁহার বৈচিত্র্যময় ও ঘটনাবহুল জীবনকাহিনী অল্প পরিসরের মধ্যে এখানে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত নিজামপুর পরগণার ডোমখালি গ্রামে ১২৮০ সালের ২৪ অগ্রহায়ণ সোমবার তারিখে এক অবস্থাপন্ন সম্ভ্রান্ত পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল ৺জগন্নাথ নাথ মহাজন ও মাতার নাম ছিল ৺কালীতারা দেবী। বাল্যকালে লেখাপড়ার দিকে হরিমোহনের খুব আগ্রহ ছিল। তৎকালে শিক্ষালাভ করিবার সুযোগ সুবিধা না থাকিলেও

তিনি পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে প্রথমতঃ নিম্ন প্রাইমারী পরীক্ষায় এবং পরে ১৮৯৩ সালে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তখন তাঁহার বয়স উনিশ বৎসর। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় পাশ করিয়া তখন মোক্তারি পড়িবার সুবিধা ছিল। সুতরাং হারমোহন ঘরে বসিয়া মোক্তারি পড়িতে আরম্ভ করিলেন এবং ১৮৯৫ সালে মোক্তারি পরীক্ষা দিবার জন্য তিনি পদব্রজে বাড়ী হইতে নোয়াখালি— তথা হইতে ষ্টীমারে বরিশাল— বরিশাল হইতে খুলনা এবং খুলনা হইতে ট্রেনে কলিকাতায় গিয়া পৌঁছিলেন। বিপদসঙ্কুল নিঃসঙ্গ যাত্রাপথে যুবক হরিমোহনের এই দুঃসাহসিকতা, অধ্যবসায় ও কষ্টসহিষ্ণুতা তাঁহার গৌরবোজ্জ্বল কর্ম্মময় ভবিষ্যজ্জীবনেরই সূচনা করে। উৎকট জাতিবিদ্বেষের সেই অতীত যুগে তিনি অনেক ঘুরাঘুরি ও লাঞ্ছনা ভোগের পর মীর্জ্জাপুর ষ্ট্রীটস্থ কোন বোর্ডিংএ আহার বাসস্থানের স্থান সংগ্রহ করিতে পারিলেন। সেখানে থাকিয়া তিনি মোক্তারি পরীক্ষা দিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সেবার অকৃতকার্য্য হইলেও তিনি দমিত হইলেন না। ১৮৯৬ সালে আবার পরীক্ষা দিয়া তিনি সাফল্য লাভ করিলেন। শিক্ষা ও সভ্যতার আলোকে আলোকিত কলিকাতাতেও তথাকথিত অনাচরণীয় জাতিসম্ভূত পরীক্ষার্থী হরিমোহন তথাকথিত উচ্চ জাতীয়গণের নিকট যে সমাদর লাভ করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার তরুণ হৃদয় ব্যথিত হইয়াছিল এবং তাঁহার এই লাঞ্ছনা ভোগই স্বজাতির বিশেষতঃ স্বজাতীয় ছাত্রগণের দুঃখ দুর্দ্দশা ঘুচাইবার বলবতী স্পৃহা ভুক্তভোগী হরিমোহনের কোমল-কঠোর হৃদয়ে জাগাইয়া দিয়াছিল। এইরূপে তাঁহার চিত্তক্ষেত্রে স্বজাতি-প্রীতির বীজ উপ্ত হইয়াছিল।

কলিকাতা হইতে পাশ করিয়া আসিয়া ১৮৯৬ সালে হরিমোহন চট্টগ্রাম ফৌজদারী আদালতে মোক্তারি করিতে আরম্ভ করেন। প্রতিভা, তেজস্বিতা ও নির্ভীকতা গুণে জাতিবিদ্বেষজনিত যাবতীয় অন্তরায় অতিক্রম করিয়া তিনি অচিরকাল মধ্যে একজন প্রতিষ্ঠাবান মোক্তার বলিয়া খ্যাতি লাভ করিলেন।

মোকর্দ্দমা পরিচালনায় তাঁহার যোগ্যতা ও নিপুণতায় আকৃষ্ট হইয়া স্বজাতীয় ও ভিন্ন জাতীয় বহু মক্কেল তাঁহাকে পাইবার জন্য ব্যগ্র হইত। অল্পকাল মধ্যেই মোক্তারি ব্যবসায়ে তাঁহার সুনাম ও সুখ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। ক্রমশঃই তাঁহার প্রতিপত্তি ও জনপ্রিয়তা বাড়িয়া গেল এবং স্বাভাবিক কর্ম্ম-প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া তিনি চিটাগাং এসোসিয়েশন, কংগ্রেস, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, হিন্দুমিলন মন্দির, চিটাগং ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোং, চিটাগং ন্যাশন্যাল কটন মিল ইত্যাদি অনেক জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং অনেক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপূর্ণ পদে আসীন থাকিয়া তিনি যোগ্যতা ও কর্ম্মতৎপরতার পরিচয় দিয়াছিলেন। এক কথায় চট্টগ্রামে এমন কোন প্রতিষ্ঠান ছিল না যাহার সহিত হরিমোহন বিশিষ্ট কর্ম্মীরূপে সম্বন্ধযুক্ত ছিলেন না। প্রথমতঃ নিজামপুর পরগণা হইতে তিনি কংগ্রেসে যোগদান করেন; তারপর কর্ত্তব্যপরায়ণতা, দেশপ্রাণতা ও কর্ম্ম-কুশলতা গুণে তিনি সামান্য কংগ্রেস সদস্য হইতে ১৯৩০ সালে চট্টগ্রাম জিলার কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত হন। পল্লীউন্নয়নের কার্য্যেও আমরা হরিমোহনের কর্ম্মনিপুণতার পরিচয় পাই। তিনি নিজামপুর সমিতির সেক্রেটারীরূপে পল্লীসংস্কারে মনোযোগী হইয়া রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ করাইয়া ও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া পল্লীবাসী জনগণের অশেষ উপকার সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার দয়াবতী মাতৃদেবীর সঞ্চিত দুই হাজার টাকা হাতে পাইয়া তিনি ১৯১৩ সালে কমর আলি চৌধুরীর হাটে 'কালীতারা' মধ্য ইংরাজী স্কুল স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয় অদ্যাপি হরিমোহনের বিদ্যোৎসাহিতার ও তাঁহার জননী স্বর্গীয়া কালীতারা দেবীর বদান্যতার সাক্ষীরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। এইরূপে হরি-মোহন অনুপম ত্যাগ স্বীকার করিয়া ও স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া একনিষ্ঠভাবে জনগণের যে সেবা করিয়াছিলেন, তাহার জন্য তিনি জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকলের স্বতঃস্ফূর্ত্ত শ্রদ্ধা ও সম্মান অর্জ্জন করিয়া বরণীয় হইয়াছিলেন।

হরিমোহন ছিলেন অক্লান্ত কর্ম্মী। জাতিসেবায় তাঁহার দান ও ত্যাগ ছিল অতুলনীয়। জীবনের শ্রেষ্ঠাংশ তিনি যোগিজাতির সেবায় নিয়োগ করিয়া এই দুঃস্থ দুর্গতি ও নির্য্যাতিত জাতির উদ্ধারে এবং উহার সামাজিক মান-উন্নয়নে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। তাঁহার সুনিপুণ পরিচালনে সম্মিলনী প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছিল। মণিকাঞ্চন সংযোগের ন্যায় আচার্য্য ও নাথবন্ধু সম্মিলনে সম্মিলনী অপূর্ব্ব শ্রীমণ্ডিত হইয়াছিল এবং জাতীয় আন্দোলনের তরঙ্গে সমগ্র আসাম ও বঙ্গ যে তরঙ্গায়িত হইয়াছিল তাহা অস্বীকার করিবার যো নাই। জাতির দুঃখে তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়াছিল; তাই তরুণ বয়স হইতেই তিনি জাতিসেবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৯০১ সালে রিজলী সাহেবের সেন্সাস্ রিপোর্ট প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল তাহাতে তরুণ হরিমোহন নোয়াখালি লক্ষ্মীপুরের উকিল শ্রীযুক্ত ভারতবাবু, নদীয়া-কৃষ্ণনগরের স্বর্গীয় ডাঃ জগচ্চন্দ্র নাথ, কলিকাতা-ভবানীপুরের স্বর্গীয় ডাঃ আশুতোষ নাথ প্রমুখ ব্যক্তিগণের সহিত সমবেত হইয়া তাহাতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। জাতীয় আন্দোলনের সেই উষাযুগে হরিমোহন ব্যাকুলভাবে জাতিসেবার সহকর্ম্মী খুঁজিতেছিলেন; এমন সময় ১৩১১ সালে সুদূর নাইনিতাল হইতে স্বর্গীয় অরবিন্দ বাবুর যোগিসখা পত্রিকার প্রতিষ্ঠা ও প্রকাশ এবং ১৩১৭ সালে কুমিল্লা হইতে শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বাবুর সম্মিলনী প্রতিষ্ঠার সংবাদে তিনি উৎফুল্ল ও অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিলেন। চিরজীবন তিনি এই দুই প্রতিষ্ঠানের সহিত সক্রিয় সংযোগ রক্ষা করিয়া চলিয়াছিলেন। যোগিজাতিকে সদ্ভাব, প্রীতি ও একতার সূত্রে আবদ্ধ করিয়া একটা শক্তিশালী অখণ্ড জাতিতে পরিণত করাই ছিল হরিমোহনের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। যোগিসখার প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় ৺অরবিন্দ বাবুর ও সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বাবুর মধ্যে একদা যে মতভেদ ঘটিয়াছিল ১৩২৫ সালে কলিকাতায় সম্মিলনীর নবম অধিবেশন উপলক্ষে যে সকল স্বজাতিহিতৈষী ব্যক্তি সেই মতানৈক্য দূর করিয়া

সমন্বয় সাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে হরিমোহনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি চট্টগ্রাম হইতে বেনারস যাইয়া চার্জ্জলিষ্ট দস্তখত করিয়া অরবিন্দ বাবুর নিকট হইতে যোগিসখার ভার গ্রহণ পূর্ব্বক অশ্রুসিক্ত পত্রিকা-প্রতিষ্ঠাতার কাছে সাশ্রুনয়নে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন—"আমি যতদিন বাঁচিয়া থাকিব ততদিন আপনার (অরবিন্দ বাবুর) যোগিসখা বন্ধ হইতে দিব না।" দৃঢ়চেতা হরিমোহন তাঁহার প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া গিয়াছেন। জাতির সেবাই ছিল নাথবন্ধুর জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত। সম্মিলনী ও তাহার মুখপত্র যোগিসখাকে তিনি প্রাণাপেক্ষাও ভাল বাসিতেন। তাই তিনি প্রাণের সমস্ত রস নিংড়াইয়া সম্মিলনী ও পত্রিকাকে লালন ও রক্ষণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সুনিপুণ পরিচালনায় সম্মিলনী যেন ফলপুষ্প সুশোভিত বিশাল মহীরুহে পরিণত হইয়া যোগিজাতীয় লক্ষ লক্ষ নরনারীর প্রাণে আশার সঞ্চার করিয়াছিল। বাঙ্গালা ১৩১৬ সাল হইতে ১৩৪০ সাল পর্য্যন্ত তিনি সম্মিলনীর সম্পাদক থাকিয়া নিঃস্বার্থভাবে ও অশেষ প্রকারে জাতির সেবা করিয়া গিয়াছেন। যোগিজাতি এই সেবাব্রতীর অনুপম ত্যাগের কথা কখনও বিস্মৃত হইবে না। কত যে প্রতিকূল ঝড়ঝাপ্টার ভিতর দিয়া সম্মিলনীরূপ তরীখানিকে তাঁহাকে চালাইতে হইয়াছিল তাহা তাঁহার সমসাময়িক কর্ম্মিগণ বিলক্ষণ অবগত আছেন। চিত্তের দৃঢ়তা ও নির্ভীকতাগুণে নাথবন্ধু সমস্ত প্রতিকূল অবস্থা অতিক্রম করিয়া জয়ী হইয়াছিলেন।

নাথবন্ধুর নির্ভীকতা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা ও স্বজাতিপ্রাণতা ছিল অসাধারণ। যশোদা-উদ্ধারের রোমাঞ্চকর ঘটনার ভিতর দিয়া আমরা তাঁহার এই সমস্ত গুণের পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হই। ১৯২৫ সালে তৃতীয় পক্ষের উস্কানিতে হিন্দু মুসলমানের মিলনাকাশ যখন ঘনঘটাসমাচ্ছন্ন, সেই দুর্য্যোগপূর্ণ দিনে যোগিজাতীয়া রমণী দরিদ্রা যশোদা কতিপয় দুর্বৃত্ত মুসলমান কর্ত্তৃক অপহৃতা হয়। স্বজাতীয়া ভগিনীর এই বিপৎপাতে নাথবন্ধু অস্থির হইয়া পড়েন এবং তাহাকে

উদ্ধার করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হন। বিপদের বোঝা মাথায় লইয়া এই নির্ভীক .পুরুষ যশোদার উদ্ধার সাধন পূর্ব্বক এবং আইন অনুসারে উক্ত দুর্বৃত্ত-গণের সমুচিত শাস্তিবিধান করিয়া যে ভাবে বিপন্না রমণীকে সসম্মানে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন তাহা কাহারও অবিদিত নাই। নাথবন্ধুর আত্মসম্মান-বোধ ছিল প্রবল। যোগিজাতির অসম্মানে ও অবমাননায় তাঁহার চিত্ত চঞ্চল সমুদ্রের ন্যায় বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিত। "হ'তে পারি দীন মোরা, নহি কভু হীন"—ইহাই ছিল তাঁহার বলবতী ধারণা। কাশীবাসী জনৈক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শ্যামাচরণ কবিরত্ন মহাশয় বৈদ্য, কায়স্থ, যোগী ও মাহিষ্য জাতির পক্ষে গ্লানিজনক তথ্য পরিপূর্ণ "জাতিতত্ত্ব" নামক একখানি পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ করেন। ইহাতে যোগিজাতির মধ্যে তুমুল বিক্ষোভ উপস্থিত হয়। তদনুসারে নাথবন্ধু সম্মিলনীর সম্পাদক হিসাবে চট্টগ্রাম ফৌজদারী আদালতে উক্ত কবিরত্ন মহাশয়ের বিরুদ্ধে মানহানির মোকর্দ্দমা আনয়ন করেন। আইনের ফাঁকে কবিরত্ন মহাশয় নিষ্কৃতি পাইলেও এই মোকর্দ্দমা উপলক্ষে আমরা নাথবন্ধুর স্বজাতিপ্রিয়তার ও যোগি-জাতির সঙ্ঘবদ্ধতার যে পরিচয় পাইয়াছি তাহা অতুলনীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার আত্মসম্মানবোধের পরিচয় আরও পাই আমরা সুরমা উপত্যকাবাসী যোগিজাতির বহিরঙ্গ জাতির অন্তর্ভুক্তি বিষয়ে। এই অন্তর্ভুক্তির প্রতিবাদকল্পে শ্রীহট্ট জিলার অন্তর্গত সিংহবীজ নামক স্থানে ১৩৪১ সালে সম্মিলনীর এক বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। তাহাতে নাথবন্ধু নির্ভীকভাবে ও ওজস্বিনী ভাষায় গবর্ণমেণ্টের নীতির যে তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন এবং শ্রীহট্ট ও কাছাড় জিলার স্বজাতীয়গণের মনে আত্মসম্মানজ্ঞান জন্মাইয়া তাহা-দিগকে যে ভাবে উদ্বোধিত ও অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন তাহা অবিস্মরণীয়। নাথবন্ধুর সেই তেজোময়ী মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা আজও যেন আমাদের কর্ণপটহে নিনাদিত হইতেছে।

তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল নির্ভীকতা ও দৃঢ়চিত্ততা। তাঁহার এই

দুই গুণের প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাই আমরা যোগিজাতির মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলন সম্পর্কে। যোগিজাতির মধ্যে বিধবা বিবাহের প্রবর্ত্তন করিবার প্রস্তাব ক্রমান্বয়ে আনীত হয় ১৩৩৫ সালে সম্মিলনীর খুলনা অধিবেশনে এবং ১৩৩৮ সালে চৌমুহানী অধিবেশনে। এই প্রস্তাবের পক্ষে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের ও পূর্ব্ববঙ্গের কতিপয় প্রতিপত্তিশালী বিশিষ্ট নেতা। নাথবন্ধু ছিলেন এই প্রস্তাবের ঘোর বিরোধী। চৌমুহানী অধিবেশনে বিধবা বিবাহ সম্পর্কে তুমুল আন্দোলন ও বাদ-প্রতিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিগণের সম্মুখেও নাথবন্ধু তাঁহার নীতি হইতে বিন্দুমাত্র স্খলিত হন নাই। তিনি নির্ভীকভাবে ও তেজস্বিতার সহিত তাঁহার মতে অটল থাকিয়া সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিলেন। তিনি যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিতেন ও সমাজের মধ্যে মঙ্গলকর বলিয়া অনুমান করিতেন, তাহাই দৃঢ়তার সহিত ও একনিষ্ঠভাবে সম্পাদন করিতে চেষ্টা করিতেন।

"বাগ্মিতা ছিল নাথবন্ধু হরিমোহনের আর এক অসাধারণ বৈশিষ্ট্য।" "এরূপ শক্তিশালী কোন বাগ্মী যোগিজাতির মধ্যে কখনও জন্মগ্রহণ করিয়াছে কিনা জানি না। বক্তা হিসাবে তাঁহাকে সুরেন্দ্রনাথ বা বিপিনচন্দ্রের পর্য্যায়ে ফেলিলেও বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। শ্রোতৃমণ্ডলী মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিত এবং কখনও বা তাহার বীররস-প্রধান আবেগময়ী বক্তৃতা শুনিয়া উত্তেজিত ও অনুপ্রাণিত হইত; আবার কখনও বা তাঁহার মর্ম্মস্পর্শী করুণরস-বহুল বক্তৃতা শুনিতে শুনিতে ভাবাবিষ্টের ন্যায় অশ্রুবর্ষণ করিতে থাকিত।" "তিনি যাহা বলিতেন তাহা অনুভব করিতেন; তাঁহার অনুভবের বস্তু তাঁহার প্রাণের অন্তস্তল হইতে ওজস্বিনী ভাষার বাহনে গঙ্গাধারার ন্যায় বহির্গত হইয়া সকলের মর্ম্মস্থলকে স্পর্শ করিত। যাহা তিনি বর্ণনা করিতেন, শ্রোতারা তাহা যেন চক্ষুর সাক্ষাতে জাজ্বল্যমান দেখিতে পাইত।"

নাথবন্ধু স্বজাতিসেবায় আত্মনিয়োগ করিলেও, তিনি অনুদার বা সঙ্কীর্ণ-

চেতা ছিলেন না। বৃহত্তর হিন্দুসমাজের সহিত তাঁহার যোগসূত্র অক্ষুণ্ণ ছিল নানা প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া তিনি দেশের সেবাকার্য্যে সর্ব্বদাই নিরত থাকিতেন। যোগিজাতির ন্যায় দুঃস্থ, দুর্গত, নিপীড়িত ও নিষ্পেষিত অন্যান্য জাতির উন্নয়নে তিনি সর্ব্বদাই হস্তপ্রসারণ করিতেন এবং তাঁহাদের হৃদয়ে আত্মচেতনা জাগাইতে চেষ্টিত হইতেন। তিনি বলিতেন—"যখন আমরা জাতির স্বার্থের সহিত অন্য জাতির স্বার্থের তুলনা করিব, তখন আমার জাতির স্বার্থ বড়; আর যখন জাতির স্বার্থের সহিত দেশের স্বার্থ তুলনা করিব, তখন দেশের স্বার্থ জাতির স্বার্থ হইতে অনেক বড়।" ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র প্রধানতঃ নিবদ্ধ থাকিলেও তাঁহার চিত্ত আকাশের মতই প্রশস্ত ও উদার ছিল। তিনি বহু গুণের অধিকারী ছিলেন। তাঁহার অমায়িকতা, সরলতা, নিরহঙ্কারতা, আতিথেয়তা, পরদুঃখকাতরতা সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিত। কোমল ও কঠোর গুণের সংমিশ্রণে তাঁহার চরিত্র অপূর্ব্ব রূপ ধারণ করিয়াছিল।

হৃদয়ের রক্ত দিয়া তিনি যে সম্মিলনীর পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছিলেন, তাহার বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতিরূপে তিনি আমাদিগকে যে তেজোময়ী বাণী শুনাইয়া গিয়াছেন তাহার ঝঙ্কার আজও শূন্যে মিলাইয়া যায় নাই। তিনি ১৩২২ সালে কুমিল্লা টাউনে সম্মিলনীর ৬ষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশনে এবং ১৩৩২ সালে বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত দাঁইহাটের ১৬শ অধিবেশনে পৌরোহিত্য করেন। ১৩৪৬ সালের বৈশাখ হইতে ১৩৪৭ সালের বৈশাখ পর্য্যন্ত যোগিসখার সম্পাদক-রূপে তিনি জাতির সেবা করিয়া গিয়াছেন। এইরূপে মন দিয়া, ধন দিয়া, প্রাণ দিয়া আমরণ দেশের, দশের তথা জাতির সেবা করিয়া এই কর্ম্মবীর ১৩৫০ বঙ্গাব্দের ১৩ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুতে জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকলেই যেন পরম প্রিয়জন হারাইয়া শোকে মুহ্যমান হইয়াছিল। তাঁহার বার্ষিক সপিণ্ডীকরণোপলক্ষে ১৩৫১ সালের ২রা চৈত্র তারিখে

তাঁহার ডোমখালি গ্রামস্থিত বাসভবনে আচার্য্য অম্বিকাচরণের সভাপতিত্বে সম্মিলনীর ৩৫শ বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশন উপলক্ষে নাথবন্ধুর সুযোগ্য পুত্রগণ পিতৃদেবের পবিত্র স্মৃতি অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য তাঁহার প্রস্তর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। আমরা তাঁহার মূর্ত্তিবিগ্রহের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি।

(শ্রীবঙ্গচন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য কাব্যবিনোদ লিখিত "নাথবন্ধু হরিমোহন" পুস্তক অবলম্বনে সঙ্কলিত)

৺অরবিন্দবন্ধু নাথ, এফ. টি. এস্.

চব্বিশ পরগণা জিলার বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত রুদ্রপুর গ্রামে ১২৮৪ সালের ১৬ই আষাঢ় তারিখে অরবিন্দবন্ধু নাথ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল বিশ্বনাথ নাথ ও মাতার নাম পুষ্পলতা দেবী। অরবিন্দের পিতার আর্থিক অবস্থা সুচ্ছল ছিল না; সুতরাং পাঠদ্দশায় তাঁহাকে কঠোর দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিতে হয়। গ্রাম্য পাঠশালা হইতে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি একাদশ বৎসর বয়সে রুদ্রপুর হইতে অনতিদূর-বর্ত্তী লণ্ডন মিশন স্কুলে অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। স্কুলের বাইবেল পরীক্ষায় বরাবর কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া তিনি অর্দ্ধ বেতনে উক্ত স্কুলে পড়িবার সুযোগে পান। লণ্ডন মিশন স্কুল হইতে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি প্রথমতঃ বারাশত মহকুমার আজিজনগর মধ্য ইংরাজী স্কুলে এবং পরে হাদিপুর মধ্য ইংরাজী স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া চাকুরি করেন। শিক্ষকতা কার্য্যে সুনাম অর্জ্জন করিয়া তিনি ছাত্রগণের ও স্কুলের পরিচালকবর্গের প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন। কিন্তু স্বল্প বেতনে শিক্ষকতা করিয়া পরিবার পতিপালনে অসমর্থ হইয়া অরবিন্দ নাথ অন্য চাকুরির সন্ধান করিতে লাগিলেন। শিয়ালদহ ষ্টেশনে হিসাব পরীক্ষকের অফিসে তিনি

মাসিক মাত্র পনর টাকা বেতনে একটা চাকুরি পাইলেন। এই সামান্য বেতনে তাঁহার অভাব মিটিবে কেমন করিয়া? এই সময় কাঁকীনাড়া নিবাসী যজ্ঞেশ্বর দেবনাথ মহাশয়ের সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটিল। যজ্ঞেশ্বরবাবু তখন গোরক্ষপুরে রেলওয়ে বিভাগে একটা বড় চাকুরিই করিতেন। তিনি উত্তর প্রদেশের সৌ জংসনে বি. এন্. ডব্লিউ রেল অফিসে অরবিন্দকে ৩০৲ টাকা বেতনে একটা চাকুরি যোগাড় করিয়া দিলেন। স্বীয় কার্য্যদক্ষতার গুণে ক্রমশঃ পদোন্নতি লাভ করিয়া তিনি মাসিক ৬০৲ টাকা বেতন পাইতে লাগিলেন। অতঃপর তিনি বদলী হইয়া বেলিয়ায় আগমন করেন। বেলিয়া সহরে এক মাহেন্দ্রক্ষণে তাঁহার সহিত যোগিসখার প্রথম সম্পাদক অধরচন্দ্র নাথ ও প্রথম প্রকাশক হৃষীকেশ নাথ মহাশয়ের শুভসম্মিলন ঘটিল।

বাল্যকাল হইতেই অরবিন্দের মনে স্বজাতিসেবার স্পৃহা বলবতী হইয়া উঠিয়াছিল। বিভিন্ন জিলার স্বজাতীয়গণের মধ্যে সংযোগসূত্র স্থাপন মানসে তিনি একখান পত্রিকা প্রচারের পরিকল্পনা করিতে থাকেন। দয়াময় ভগবান্ এই হতভাগ্য জাতির কল্যাণ সাধনের যে বাসনা তাঁহার অন্তঃকরণে জাগাইয়া দিয়াছিলেন তাহা চরিতার্থ করিবার সুযোগ তিনি পাইলেন বেলিয়ায় আগমন করিয়া। বেলিয়াতেই ত্রিরত্নের মিলনে জাতীয় আন্দোলনের সূত্রপাত হইল। অরবিন্দবাবুর প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া অধরবাবু ও হৃষীকেশবাবু যোগিসখা পত্রিকার প্রকাশে ও প্রচারে উৎসাহী হইলেন। যোগিসখার প্রথম তিন সংখ্যা বেলিয়া হইতে প্রকাশিত হইল। পরে উহা ভারতচন্দ্র নাথ, মহিমচন্দ্র নাথ ও নীরদবরণ নাথ মহাশয়গণের তত্ত্বাবধানে

কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইতে লাগিল। পরে ১৩২৫ সালে কলিকাতায় সম্মিলনীর নবম অধিবেশন উপলক্ষে অরবিন্দবাবু কতকগুলি সর্ত্তে তাঁহার প্রাণোপম 'সথা'কে সম্মিলনীর হস্তে সমর্পণ করেন। সেই হইতে 'যোগিসখা আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনীর মুখপত্ররূপে যোগিজাতির সেবা করিয়া আসিতেছে। জাতির মধ্যে সদ্ভাব, প্রীতি ও একতা স্থাপনের যে মহদুদ্দেশ্যে অরবিন্দ যোগিসখার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। তিনি যে মহৎ কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন, তজ্জন্য যোগিজাতি তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে।

অরবিন্দ আবাল্য দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। তাই তিনি দরিদ্র ছাত্রগণের মর্ম্মবেদনা বুঝিতেন। স্বজাতীয় দরিদ্র ছাত্রগণের সাহায্যার্থে তিনি অনাথ-নাথভাণ্ডারের প্রতিষ্ঠা করেন। যোগিজাতির মধ্যে সংস্কৃত শিক্ষার বহুল প্রচলন মানসে তিনি তাঁহার ইষ্টগুরু যোগিরাজ দেবপ্রতিপালক স্বামীর অনুপ্রেরণায় ও অর্থানুকূল্যে কাশীধামে দেবনাথচতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। এই চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়নপূর্ব্বক বহু স্বজাতীয় ছাত্র কৃতবিদ্য হইয়া জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইতে সমর্থ হইয়াছেন। জাতির চিন্তাই ছিল তাঁহার জীবনের সর্ব্বপ্রধান চিন্তা। যোগিজাতির সম্মান ও মর্য্যাদা রক্ষা করিতে ও তাহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপালন করিতে তিনি কখনই পশ্চাৎপদ থাকেন নাই। জাতিসেবার যে উজ্জ্বল আদর্শ তিনি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে।

একনিষ্ঠ সমাজসেবা ও স্বজাতিপ্রীতির জন্য অরবিন্দ সর্ব্বজন-পরিচিত ও সর্ব্বজনমান্য হইয়াছিলেন। যোগিসমাজ তাঁহার বহুগুণের পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে দুইবার আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনীর বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতির সম্মানজনক পদ প্রদান করেন। ১৩২৪ সালে ময়মনসিং জিলার অন্তর্গত নেত্রকোণা সহরে সম্মিলনীর যে অষ্টম বার্ষিক অধিবেশন আহূত হয়, অরবিন্দ-

তাঁহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। তারপর ১৩৩৮ সালে নোয়াখালি জিলার অন্তর্গত চৌমুহানী বন্দরে সম্মিলনীর যে বিরাট ২২শ অধিবেশন হয়, তাহারও সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন অরবিন্দ। যোগিজাতির যাঁহারা স্তম্ভস্বরূপ, তাঁহারাই ছিলেন চৌমুহানী অধিবেশনের আহ্বায়ক ও উদ্যোক্তা। এই অধিবেশনে বিধবা বিবাহের পক্ষে ও বিপক্ষে যে তুমুল বাদানুবাদ হয়, সভাপতি অরবিন্দবাবু নির্ভীকভাবে তাহার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন সেদিন তাঁহার অনমনীয়তা দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইয়াছিল। অরবিন্দ যাহা সঙ্গত বলিয়া বুঝিতেন, কোনমতেই তাহা হইতে বিচ্যুত হইতেন না। দৃঢ়প্রতিজ্ঞতাই ছিল তাঁহার চরিত্রের বিশিষ্ট গুণ।

বহু সদগুণে তাঁহার চরিত্র সুশোভিত ছিল। সাধুতা, সত্যবাদিতা, কর্ত্তব্য পরায়ণতা, সময়নিষ্ঠতা ও কার্য্যতৎপরতার গুণে তিনি চাকুরিজীবনে সমধিক উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বহু স্বজাতীয় বেকার যুবকের অন্নসংস্থান করিয়া দিয়া তাহাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছিলেন। সামান্য কেরাণীর পদ হইতে তিনি কর্ত্তব্যনিষ্ঠতার গুণে আর. কে. রেলওয়ের ডিভিসন্যাল হেড্ক্লার্ক ও একাউণ্ট্যাণ্ট পদে উন্নীত হইয়া সর্ব্বশেষে কাশীধামে বদলী হইয়া আসেন এবং এখানেই পরিণত বয়সে সসম্মানে অবসর গ্রহণ করেন। অরবিন্দের ন্যায় উৎসাহী ও অক্লান্ত কর্ম্মী আমাদের মধ্যে অতি বিরল। তাঁহার সংগঠন শক্তিও ছিল অসাধারণ। তাঁহার কর্ম্মতৎপরতায় আকৃষ্ট হইয়া অনেক প্রতিষ্ঠান তাঁহাকে সদস্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিল।

অরবিন্দ জাতির জন্য যাহা করিয়া গিয়াছেন জাতি তাহা কখনই বিস্মৃত হইবে না। যোগিজাতির মধ্যে শিক্ষার ও উপবীতের বহুল প্রচলনের জন্য তিনি প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তিনিই জাতিকে উন্নতির পথে আগাইয়া দিয়া গিয়াছেন। আমৃত্যু তিনি জাতির মঙ্গলের জন্য সাধনা ও কামনা করিয়াছিলেন। কিন্তু সকলকেই মরিতে হইবে; কেহই অমর হইয়া ধরাতলে আসে

নাই। জগতের সেই চিরন্তনী নীতি অনুসারে ১৩৪৪ সালের ২৯শে অগ্রহায়ণ বুধবার তারিখে অরবিন্দের ধর্ম্মময় ও কর্ম্মময় জীবনের অবসান ঘটে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৬২ বৎসর। তিনি গত হইয়াছেন; কিন্তু-যোগিজাতি এই ত্যাগী কর্ম্মীর কীর্ত্তিকাহিনী চিরদিন স্মরণ রাখিবে এবং তাঁহার অবদান জাতীয় ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকিবে। "কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।"

আচার্য্য অম্বিকাচরণ

জন্ম— ২৭শে জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৪ সাল।

মৃত্যু— ১লা চৈত্র, ১৩৫৮ সাল।

পূর্ব্বকথা :—যে কৃতী পুরুষের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে যোগিজাতির ইতিবৃত্তি-মূলক এই গ্রন্থ উৎসর্গ করা হইল, সেই আচার্য্য অম্বিকাচরণ এই জাতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নয়নকল্পে নিজের জীবন নিঃশেষে নিবেদন করিয়া গিয়াছেন। অর্দ্ধ-শতাব্দী পূর্ব্বে আসাম ও বাংলার যোগিজাতির সাংস্কৃতিক ও আর্থিক জীবন এবং সামাজিক পদমর্য্যাদা এমন এক শোচনীয় দশায় উপনীত হইয়াছিল যে, আজ দীর্ঘ দিনের ব্যবধানে আমরা তাহা সম্যক্ ধারণা করিতেই পারিব না। এ যুগের কিশোর ও তরুণ যাহারা, তাঁহাদের পক্ষে ইহা ধারণা করা নিশ্চয়ই সহজ হইবে না যে, এখন হইতে পঁচিশ ত্রিশ বৎসর আগে এমন কি রাজধানী কলিকাতার বুকে বিভিন্ন কলেজের ছাত্রাবাসে হিন্দুজাতির সকল শ্রেণীর বিদ্যার্থীর সমমর্য্যাদায় অবস্থান করিবার অধিকার ছিল না। ফলে, অনুন্নত জাতির পরমবান্ধব কর্ণেল ইউ, এন্, মুখার্জ্জির প্রচেষ্টায় ও গবর্ণমেণ্টের অর্থানুকূল্যে কয়েকটা অনগ্রসর শ্রেণীর বিদ্যার্থীদের জন্য গুটিকয়েক স্বতন্ত্র ছাত্রা-বাস গড়িয়া উঠিয়াছিল। যুগের হাওয়া ফিরিয়াছে, এখন আর "বারো রাজ-পুতের তেরো হাড়ি"র মতন হিন্দুসমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য স্বতন্ত্র

মেস্ বা ছাত্রাবাসের প্রয়োজন হইতেছে না। হিন্দুসমাজের সঙ্কীর্ণতা ও অনুদারতা শনৈঃ শনৈঃ লোপ পাইতেছে। সুখের কথা, সন্দেহ নাই।

বলা বাহুল্য সে কালের যোগিজাতিকে এই ধরনের বিবিধ মর্য্যাদাহানিকর অবস্থার মধ্যে কাল কাটাইতে হইত। আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনীর নেতৃত্বে আচার্য্য অম্বিকাচরণের প্রাণে জাগিয়া উঠিয়াছিল হিন্দুসমাজের এই যুক্তিহীন কুসংস্কার ও অনুদার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে গভীর বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ। এই পটভূমিকায় বিচার না করিলে আচার্য্যদেবের জীবন ও চরিত্রের সবটুকু মহত্ত্ব আমরা কিছুতেই অবধারণ করিতে পারিব না।

বংশ-পরিচয় :— ঢাকা বিক্রমপুর যোগিসমাজে সায়তার "পণ্ডিত পরিবার" ধনে, মানে ও কৌলীন্যে সর্ব্বত্র সুপরিচিত। পণ্ডিত পরিবার সমগ্র সায়তা গ্রামে পরিব্যাপ্ত ছিল। পণ্ডিতবাড়ীর দুর্গোৎসব সে কালে ঐ অঞ্চলে বিশেষ আকর্ষণের বস্তু ছিল। এই উৎসব প্রতি বৎসর মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইত। উহা এই পরিবারে বহুদিন যাবৎ কুলধর্ম্ম হিসাবে প্রতিপালিত হইয়াছে। অতিথি, অভ্যাগত বা ভিক্ষুক কখনও পণ্ডিতবাড়ী হইতে ক্ষুণ্ণমনে ফিরিয়া যায় নাই। অসহায় ও বিপন্ন ব্যক্তিরা এই বাড়ীর আনুকূল্য সর্ব্বদাই লাভ করিত।

এই পরিবারে আচার্য্যদেবের জন্ম। তাঁহার পিতা পণ্ডিত বৈকুণ্ঠ নাথ ঐ অঞ্চলে স্বনামধন্য পুরুষ ছিলেন। সে যুগের নর্ম্যাল ত্রৈবার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি ঢাকা সহরের প্রাচীনতম বিদ্যালয়— কিশোরীলাল জুবিলী স্কুলে সুনামের সহিত দীর্ঘকাল শিক্ষকতা করেন। ঢাকার ব্রাহ্ম স্কুলে ও জগন্নাথ স্কুলেও তিনি কিছুকাল শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। পত্রিকা-সম্পাদন ও পরিচালন কার্য্যেও বৈকুণ্ঠ নাথ যোগ্যতার পরিচয় দিয়া যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি "প্রতিভা" "ঢাকা-প্রকাশ" ও "সাপ্তাহিক ঢাকা গেজেটের" সম্পাদক ছিলেন। ঢাকার প্রাচীনতম পুস্তকালয় 'রিপণ লাইব্রেরী' পণ্ডিত বৈকুণ্ঠ নাথেরই কীর্ত্তি। এক সময়ে শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যা পুস্তক রচয়িতা হিসাবেও তাঁহার খ্যাতি ও

প্রতিপত্তি সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সঙ্গীতশিল্পে নৈপুণ্য, অতিথি-বাৎসল্য ও বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব প্রভাবে বৈকুণ্ঠ নাথ সকলের প্রীতি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। কাহাকেও পীড়ন করিয়া কিম্বা কাহারও বিরুদ্ধে নালিশ করিয়া পাওনা টাকা আদায় করা তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ ছিল।

আচার্য্যদেবের জননী রাজেশ্বরী দেবীও খুব দয়াবতী, দেবদ্বিজে ভক্তিমতী ও বিবিধ সদগুণের আধার ছিলেন।

জন্মসূত্রে এই প্রসিদ্ধ পণ্ডিত পরিবারের ঐতিহ্য ও কুলধর্ম্ম এবং মতাপিতার বহুগুণের উত্তরাধিকার লাভ করিয়া আচার্য্য দেব স্বকীয় চরিত্রকে মহিমোজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিলেন।

শিক্ষা ও কর্ম্মজীবন ঃ— কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আচার্য্যদেব কিছুকাল ঢাকা জিলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ে সুনামের সহিত শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। অতঃপর বি-এল পাশ করিয়া তিনি ঢাকা জজকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেন। আইন ব্যবসায়ে প্রসার প্রতিপত্তি লাভ করিলেও অন্তরধর্ম্মে ইহাকে তিনি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে পারেন নাই। তাঁহার ধারণা ছিল, আইন ব্যবসায়ে মানুষের সত্যনিষ্ঠা ক্ষুণ্ণ হয়। তিনি ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে আইন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন এবং ১৯২১ খৃষ্টাব্দে মহাত্মা গান্ধী প্রবর্ত্তিত অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাব ও প্রেরণায় উহা ত্যাগ করেন। এই সময় তিনি যে খদ্দর ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছিলেন, জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত আর উহা ত্যাগ করেন নাই। ওকালতি ত্যাগের পর আচার্য্যদেব রিপন লাইব্রেরীর পরিচালন কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন।

কর্ম্মজীবনে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি স্বজাতি-সেবায় ব্রতী হইয়াছিলেন। আইনব্যবসায়ে লিপ্ত থাকাকালে আশানুরূপ অবসর মিলিত না। এখন বইএর ব্যবসায়ে মরসুমের ২।৩ মাস ব্যতীত বৎসরের অন্য সময়ে বেশ অবকাশ পাইতে লাগিলেন। কাজের চাপ যখনই একটু কম মনে করিতেন, তখনই তিনি

"যোগিসখা" পত্রিকার প্রসার ও সম্মিলনীর উদ্দেশ্য ও বাণী প্রচারকল্পে আসাম ও বাঙ্গালার সুদূর নিভৃত অঞ্চলে বাহির হইয়া পড়িতেন। ভ্রমণের ব্যয় বাবদ তিনি সম্মিলনী বা পত্রিকার ভাণ্ডার হইতে এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করিতেন না। এই সময়ে কত অনাথ ও অসহায় বিদ্যার্থী ও কর্ম্মার্থী তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া জীবনে মানুষ হওয়ার পথ পাইয়াছে।

যোগিজাতির কল্যাণসাধন যেন এসময়ে তাঁহার জপমন্ত্র হইয়া উঠিয়াছিল। আসাম ও বাঙ্গালার স্বজাতিমহলে কোথায় মানহানি, অন্যায়, অবিচার হইতেছে, কোথায় নারীহরণ বা উপবীতহরণ কিংবা এই ধরনের আর কোনও গ্লানিকর উপদ্রব, আর কোথায় বা দুর্ভিক্ষ কিংবা অন্যবিধ দৈবদুর্ব্বিপাক উপস্থিত হইয়াছে, তাহার সন্ধান লওয়া ও প্রতীকারের উপায় উদ্ভাবন করাই ছিল তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্য। স্বজাতির বিপদ-আপদে তিনি অস্থির হইয়া পড়িতেন। সংসারের চিন্তা না করিয়া, পরিবারের ভাবনা না ভাবিয়া, রোগযন্ত্রণা উপেক্ষা করিয়া সন্ন্যাসী আচার্য্যদেব কর্ত্তব্যের আহ্বানে ও বিপন্নের উদ্ধারে ছুটিয়া যাইতেন। কোনও বাধানিষেধ তিনি গ্রাহ্য করিতেন না। তিনি দুঃস্থ ও বিপন্নের দুঃখে অশ্রুমোচন করিতেন এবং নিরাশ প্রাণে ও ভগ্নহৃদয়ে আশার সঞ্চার করিতেন। জাতির মানমর্য্যাদা, সম্মানহানির সংবাদে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতেন। যশোদাহরণের মোকর্দ্দমায় শ্যামাচরণের বিরুদ্ধে আনীত মানহানির মামলায়, ঢাকার দাঙ্গায়, যোগিজাতির অনুন্নত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্তির বেলায়, নোয়াখালির সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় আমরা তাঁহার উদ্বেগ, অশান্তি ও চিত্ত-চাঞ্চল্যের বিলক্ষণ পরিচয় পাইয়াছিলাম। সুদূর আসাম প্রান্ত কিংবা নিভৃত মেদিনীপুরের অথবা চট্টগ্রামের নিভৃত পল্লীবাসী স্বজাতিবান্ধবদের দুঃখদৈন্যে বিচলিত হইয়া তাঁহাকে আমরা সম্মিলনীর বক্তৃতামঞ্চে বহুবার অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে দেখিয়াছি; কিন্তু নিজের দুঃখকষ্টের জন্য কখনও তাঁহাকে বিষাদগ্রস্ত দেখিয়াছি বলিয়া ত মনে পড়ে না। জীবনের শেষভাগে চরম অর্থকষ্ট ও

মানসিক দুঃখশোকের মধ্যেও আচার্য্যদেবের হৃদয়ে দৈন্যের গ্লানি দেখা যায় নাই। অল্প সময়ের ব্যবধানে তাঁহার স্ত্রী-বিয়োগ ও সুযোগ্য পুত্রের অকালমৃত্যু আত্মীয় অনুগতদের বঞ্চনা, জীবিকানির্ব্বাহের জন্য কঠোর পরিশ্রম, দুঃখ-দুর্দ্দশার এইরূপ চরম বিপর্য্যয় আমরা তাঁহার জীবনে অনেক দেখিয়াছি। কিন্তু তাঁহাকে কখনও মুসড়াইয়া পড়িতে দেখি নাই। এমনি প্রবল আত্ম-মর্য্যাদাবোধ ছিল আচার্য্যদেবের।

পারিবারিক জীবন:— আচার্য্যদেবের পারিবারিক জীবন প্রথম দিকে বেশ সুমধুর ও প্রীতিস্নিগ্ধ ছিল। সাতটী কন্যা ও তিনটী পুত্রের পিতা তিনি। কন্যাগণ সকলেই জীবিত। পুত্রদের মধ্যে মধ্যম নারায়ণচন্দ্র ১৩৫৪ সালের ভাদ্রমাসে কলিকাতায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়। জ্যেষ্ঠ অমলকুমার ও কনিষ্ঠ পবিত্রকুমার বর্ত্তমানে আচার্য্যদেবের নবনির্ম্মিত ভবনে (২৪ পরগণার গাইঘাটা নামক স্থানে) অবস্থান করিতেছে। আচার্য্যদেবের পতিব্রতা সহধর্ম্মিণী সুশীলা সুন্দরী দেবী অতিশয় পরদুঃকাতরা ও অতিথিপরায়ণা রমণী ছিলেন। ১৩৫৫ সালের ১লা কার্ত্তিক জগদ্দলে জামাতৃভবনে ৬০ বৎসর বয়সে এই পুণ্যশীলা মহিলা শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, স্ত্রীর মৃত্যুকালে আচার্য্যদেব কাছে থাকিতে পারেন নাই। বলা বাহুল্য, জীবনের অন্তিমপর্ব্বে সুযোগ্য পুত্র ও সতীসাধ্বী পত্নীর বিয়োগব্যথা আচার্য্যদেবের হৃদয়ে বিষম আঘাত হানিয়াছিল। জরাজীর্ণ দেহ ও ব্যথাহত মন লইয়া জীবনের শেষ কয়টী বৎসর কি ভাবে যে তাঁহার কাটিয়া গিয়াছে, তাহা তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধব ভিন্ন জগতে আর কেই বা জানে? আচার্য্যদেবের শেষ জীবনের ছবি মনে পড়িলে অশ্রু সংবরণ করা কঠিন হইয়া পড়ে।

স্বজাতিসেবা:— আচার্য্যদেবের ন্যায় একনিষ্ঠ স্বজাতিসেবক একান্তই বিরল। জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধ্যায় তিনি আসাম ও বাঙ্গালার স্বজাতিবান্ধবদের কল্যাণকর্ম্মে—গৌরব প্রতিষ্ঠা ও মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠায় নিয়োগ করিয়াছিলেন।

তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে যাঁদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে, তাঁহারা জানেন যে, স্বজাতির সেবাব্রতে এত বেশী সময় ব্যয় না করিয়া যদি তিনি বৈষয়িক ব্যাপারে আত্মনিয়োগ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে এই বইএর ব্যবসায়ে তাঁহার উন্নতি অবধারিত ছিল। কিন্তু তাহা হইবার নয়। স্বজাতি-সমাজকে দৃঢ়ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা যাঁহার জীবনের স্বপ্ন-সাধ ছিল, তিনি কেমন করিয়া স্বার্থপর ও আত্মতান্ত্রিক জীবন যাপন করিবেন? যোগিজাতির বিভিন্ন গণ্ডী সমাজের মধ্যে সদ্ভাব, সম্প্রীতি ও মিলন প্রতিষ্ঠা এবং সর্ব্বস্তরে শিক্ষা ও সংস্কৃতির আলোক বিকীরণে তিনি সর্ব্বদাই অগ্রণী ছিলেন। আসাম ও বাংলায় এমন একটি জিলাও আছে কিনা সন্দেহ যেখানকার স্বজাতিবহুল অঞ্চলে আচার্য্যদেব অন্ততঃ একটিবারও পদার্পণ করেন নাই।

আচার্য্যদেব সম্মিলনী ও যোগিসখা পত্রিকার জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কয়েক বৎসর যাবৎ তিনি যোগিসখা পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন এবং কয়েক বৎসর ধরিয়া সম্মিলনীর স্থায়ী সভাপতিরূপে অক্লান্ত ভাবে জাতির সেবা করিয়াছিলেন। আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনী তাঁহার অকৃত্রিম স্বজাতিপ্রীতি ও অন্যবিধ গুণগ্রামে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে প্রথমে "আচার্য্য" ও পরে সম্মিলনীর "মহোপদেষ্টা"—এই শ্রদ্ধা ও সম্মানসূচক উপাধি প্রদান করেন। সম্মিলনী আজ পর্য্যন্ত আর কোন কর্ম্মীকে এবম্বিধ গৌরবসূচক উপাধিতে ভূষিত করেন নাই। যোগ্য কর্ম্মীর ইহাই যোগ্য পুরস্কার। আচার্য্যদেবের জাতি-সেবা ছিল অতুলনীয়। কিন্তু তজ্জন্য তিনি কোনদিন সম্মান বা প্রশংসা খুঁজেন নাই, প্রতিদানও চাহেন নাই। তাঁহার নিঃস্বার্থ সেবায় মুগ্ধ, পরিতুষ্ট ও উপকৃত স্বজাতি তাঁহার শিরে সম্মানের অজস্র লাজ বর্ষণ করিতে কদাপি কুণ্ঠিত হয় নাই। সম্মিলনীর প্রায় প্রত্যেক অধিবেশনেই উপস্থিত থাকিয়া তিনি মঙ্গলপ্রতীক শিবের ন্যায় উহার সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতেন। জাতির পরম প্রিয়ভাজন আচার্য্যদেব ১৩২৭ সালে জাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান আসাম-

বঙ্গ যোগি-সম্মিলনীর ১১শ অধিবেশনের (কৃষ্ণনগর, নদীয়া), ১৩৩৭ সালে ২১শ অধিবেশনের (নৈহাটী, ২৪ পরগণা), ১৩৪১ সালে বিশেষ অধিবেশনের (সিংহবীজ, শ্রীহট্ট), ১৩৪৫ সালে ২৮শ অধিবেশনের (চট্টগ্রাম টাউন) এবং ১৩৫১ সালে চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত "নাথবন্ধু" হরিমোহনের জন্মপল্লী ডোমখালিতে অনুষ্ঠিত ৩৫শ অধিবেশনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। এতদ্ব্যতীত বহু জিলা ও মহকুমা যোগিসমিতির বার্ষিক অধিবেশনেও তিনি সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। আচার্য্যদেব ছিলেন সম্মিলনীরূপ মহাবৃক্ষের কাণ্ডস্বরূপ। তাঁহার মৃত্যুতে বৃক্ষ আজ তেজ-বৃদ্ধি-সৌন্দর্য্যবর্জ্জিত। সেনানীর পতনে সৈন্যগণ যেন ছত্রভঙ্গ—অবসাদগ্রস্ত। সেই কেন্দ্রশক্তি আজ কোথায়? জাতির ভাগ্যে এই নিদারুণ দুর্ভাগ্য কেন ঘটিল?

জনসেবা :—গীতার একনিষ্ঠ সাধক আচার্য্যদেব ছিলেন প্রকৃতই কর্ম্মযোগী তাঁহার সেবাব্রত শুধু যোগি সমাজের গণ্ডীমধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। নিষ্কাম কর্ম্মসাধনায় রত হইয়া এবং সমস্ত কামনা-বাসনা-লালসা পরিত্যাগ করিয়া তিনি জনসেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে আর্ত্ত ও দুঃস্থের সেবায় তিনি সর্ব্বদাই অগ্রসর হইতেন। সেবাদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াই তিনি ঢাকা সেবাশ্রমের সহিত নিবিড়ভাবে জড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন। প্রথমে সহকারী সম্পাদক ও পরে সম্পাদকরূপে তিনি বহুকাল নিষ্ঠা সহকারে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সেবাকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি স্বহস্তে কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত রোগীর পরিচর্য্যা করিতেন। মৃত সৎকারেও তিনি সব সময়ে অগ্রণী ছিলেন। জাতিভেদের যুক্তিহীন অন্ধ সংস্কার আচার্য্য দেবের মনে কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। তথাকথিত অস্পৃশ্য শ্রেণীর বহু বিদ্যার্থীকে তিনি স্বগৃহে আহার-বাসস্থান দিয়াছেন। সেবাশ্রমের কার্য্যে অনেক সময় তাঁহাকে প্রভূত অর্থব্যয় করিতেও হইয়াছে। কখনও কখনও তিনি সেবাশ্রমের পক্ষে স্বেচ্ছাসেবকরূপে তীর্থাদিতে গমন করিয়া দুর্গত ও রোগাক্রান্ত

তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে যাঁদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে, তাঁহারা জানেন যে, স্বজাতির সেবাব্রতে এত বেশী সময় ব্যয় না করিয়া যদি তিনি বৈষয়িক ব্যাপারে আত্মনিয়োগ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে এই বইএর ব্যবসায়ে তাঁহার উন্নতি অবধারিত ছিল। কিন্তু তাহা হইবার নয়। স্বজাতি-সমাজকে দৃঢ়ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা যাঁহার জীবনের স্বপ্ন-সাধ ছিল, তিনি কেমন করিয়া স্বার্থপর ও আত্মতান্ত্রিক জীবন যাপন করিবেন? যোগিজাতির বিভিন্ন গণ্ডী সমাজের মধ্যে সদ্ভাব, সম্প্রীতি ও মিলন প্রতিষ্ঠা এবং সর্ব্বস্তরে শিক্ষা ও সংস্কৃতির আলোক বিকীরণে তিনি সর্ব্বদাই অগ্রণী ছিলেন। আসাম ও বাংলায় এমন একটি জিলাও আছে কিনা সন্দেহ যেখানকার স্বজাতিবহুল অঞ্চলে আচার্য্যদেব অন্ততঃ একটিবারও পদার্পণ করেন নাই।

আচার্য্যদেব সম্মিলনী ও যোগিসখা পত্রিকার জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কয়েক বৎসর যাবৎ তিনি যোগিসখা পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন এবং কয়েক বৎসর ধরিয়া সম্মিলনীর স্থায়ী সভাপতিরূপে অক্লান্ত ভাবে জাতির সেবা করিয়াছিলেন। আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনী তাঁহার অকৃত্রিম স্বজাতিপ্রীতি ও অন্যবিধ গুণগ্রামে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে প্রথমে "আচার্য্য" ও পরে সম্মিলনীর "মহোপদেষ্টা"—এই শ্রদ্ধা ও সম্মানসূচক উপাধি প্রদান করেন। সম্মিলনী আজ পর্য্যন্ত আর কোন কর্ম্মীকে এবম্বিধ গৌরবসূচক উপাধিতে ভূষিত করেন নাই। যোগ্য কর্ম্মীর ইহাই যোগ্য পুরস্কার। আচার্য্যদেবের জাতি-সেবা ছিল অতুলনীয়। কিন্তু তজ্জন্য তিনি কোনদিন সম্মান বা প্রশংসা খুঁজেন নাই, প্রতিদানও চাহেন নাই। তাঁহার নিঃস্বার্থ সেবায় মুগ্ধ, পরিতুষ্ট ও উপকৃত স্বজাতি তাঁহার শিরে সম্মানের অজস্র লাজ বর্ষণ করিতে কদাপি কুণ্ঠিত হয় নাই। সম্মিলনীর প্রায় প্রত্যেক অধিবেশনেই উপস্থিত থাকিয়া তিনি মঙ্গলপ্রতীক শিবের ন্যায় উহার সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতেন। জাতির পরম প্রিয়ভাজন আচার্য্যদেব ১৩২৭ সালে জাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান আসাম-

বঙ্গ যোগি-সম্মিলনীর ১১শ অধিবেশনের (কৃষ্ণনগর, নদীয়া), ১৩৩৭ সালে ২১শ অধিবেশনের (নৈহাটী, ২৪ পরগণা), ১৩৪১ সালে বিশেষ অধিবেশনের (সিংহবীজ, শ্রীহট্ট), ১৩৪৫ সালে ২৮শ অধিবেশনের (চট্টগ্রাম টাউন) এবং ১৩৫১ সালে চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত "নাথবন্ধু" হরিমোহনের জন্মপল্লী ডোমখালিতে অনুষ্ঠিত ৩৫শ অধিবেশনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। এতদ্ব্যতীত বহু জিলা ও মহকুমা যোগিসমিতির বার্ষিক অধিবেশনেও তিনি সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। আচার্য্যদেব ছিলেন সম্মিলনীরূপ মহাবৃক্ষের কাণ্ডস্বরূপ। তাঁহার মৃত্যুতে বৃক্ষ আজ তেজ-বৃদ্ধি-সৌন্দর্য্যবর্জ্জিত। সেনানীর পতনে সৈন্যগণ যেন ছত্রভঙ্গ— অবসাদগ্রস্ত। সেই কেন্দ্রশক্তি আজ কোথায়? জাতির ভাগ্যে এই নিদারুণ দুর্ভাগ্য কেন ঘটিল?

জনসেবা :—গীতার একনিষ্ঠ সাধক আচার্য্যদেব ছিলেন প্রকৃতই কর্ম্মযোগী তাঁহার সেবাব্রত শুধু যোগি সমাজের গণ্ডীমধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। নিষ্কাম কর্ম্মসাধনায় রত হইয়া এবং সমস্ত কামনা-বাসনা-লালসা পরিত্যাগ করিয়া তিনি জনসেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে আর্ত্ত ও দুঃস্থের সেবায় তিনি সর্ব্বদাই অগ্রসর হইতেন। সেবাদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াই তিনি ঢাকা সেবাশ্রমের সহিত নিবিড়ভাবে জড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন। প্রথমে সহকারী সম্পাদক ও পরে সম্পাদকরূপে তিনি বহুকাল নিষ্ঠা সহকারে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সেবাকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি স্বহস্তে কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত রোগীর পরিচর্য্যা করিতেন। মৃত সৎকারেও তিনি সব সময়ে অগ্রণী ছিলেন। জাতিভেদের যুক্তিহীন অন্ধ সংস্কার আচার্য্য দেবের মনে কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। তথাকথিত অস্পৃশ্য শ্রেণীর বহু বিদ্যার্থীকে তিনি স্বগৃহে আহার-বাসস্থান দিয়াছেন। সেবাশ্রমের কার্য্যে অনেক সময় তাঁহাকে প্রভূত অর্থব্যয় করিতেও হইয়াছে। কখনও কখনও তিনি সেবাশ্রমের পক্ষে স্বেচ্ছাসেবকরূপে তীর্থাদিতে গমন করিয়া দুর্গত ও রোগাক্রান্ত

তীর্থযাত্রীদের সেবাশুশ্রূষায় আত্মনিয়োগ করিতেন। তাঁহার জীবনের আদর্শ ছিল— "......to love, not to be loved; to give, not to get; to serve, not to be served"। তিনি পরকে ভালবাসিতেন, কিন্তু বিনিময়ে কাহারও ভালবাসা খুঁজেন নাই; তাঁহার সব কিছুই পরার্থে দান করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু প্রতিদানে কিছুই চাহেন নাই; তিনি মন দিয়া, প্রাণ দিয়া, অর্থ দিয়া পরের সেবা করিতেন, কিন্তু সেবার পরিবর্ত্তে সেবার আকাঙ্ক্ষা করিতেন না। তথাপি আপামর সাধারণ সকলেরই স্বতঃস্ফূর্ত্ত শ্রদ্ধা-ভালবাসা তিনি লাভ করিয়াছিলেন। মুক্ত-দীপ্ত-চিত্ত লইয়া তিনি আদর্শ সেবাব্রতীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন মহামানবতার একনিষ্ঠ পূজারী।

ধর্ম্মমত ও চরিত্র :— মানবকল্যাণমূলক সেবা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত থাকার ফলে ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার মনে এক পরমোদার ভাব বদ্ধমূল হইয়াছিল। প্রাচীন নাথাচার্য্যদের প্রচারিত সার্ব্বভৌম ও সর্ব্বজনীন ধর্ম্মমতের প্রতি তিনি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন। গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কথিত উদার মতবাদের প্রতিও তাঁহার নিষ্ঠার অন্ত ছিল না। প্রতিদিন নিয়মিতভাবে গীতা পাঠ করিতে করিতে সমগ্র গীতাশাস্ত্র তাঁহার কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছিল। গীতার কর্ম্মযোগের আদর্শে তাঁহার সমগ্র জীবন অনুজীবিত হইয়াছিল। ভগবান্ সর্ব্বভূতে বিরাজমান, 'সর্ব্বভূতান্তরাত্মা' তিনি—গীতার এই সার কথা আচার্য্যদেব মনে প্রাণে বিশ্বাস করিতেন এবং সর্ব্বত্র সাগ্রহে প্রচার করিতেন। এই মতবাদে গভীর অনুরাগ ছিল বলিয়া তিনি ক্ষমাশীল, সহিষ্ণু, বীতক্রোধ, ভয়লেশহীন এবং ঈর্ষা-দ্বেষশূন্য হইতে পারিয়াছিলেন।

আচার্য্যদেব ছিলেন শক্তিমান্ পুরুষ। আত্মশক্তিতে তাঁহার বিশ্বাস ছিল অটুট। কাহারও মনের দুর্ব্বলতা তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। দুর্ব্বল মরা প্রাণেও তিনি আত্মশক্তি জাগাইতে চেষ্টা করিতেন।

ক্লৈব্যং মাস্ম গম পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয় দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥ ২।৩

গীতার এই তেজোগর্ভা বাণী তিনি প্রায়ই আবৃত্তি করিতেন এবং অপরকেও শুনাইতেন। ১৩৫২ সালে কাউখালির অধিবেশন যখন নানা কারণে পণ্ড হইবার উপক্রম হইয়াছিল, নির্দ্দিষ্ট দিনে অধিবেশন হইবার যখন কোনই সম্ভাবনা ছিল না, তখন এই দৃঢ়চিত্ত তেজস্বী পুরুষ অসুস্থ শরীর লইয়া বরিশালে চলিয়া যান এবং যাইবার সময় সম্মিলনীর সম্পাদক ও পত্রিকার কার্য্যাধ্যক্ষ প্রমথবাবুকে বলিয়া যান—"আপনি প্রস্তুত হইতে থাকুন—যোগিসখা বিলি করিতে আরম্ভ করুন—নির্দ্দিষ্ট দিনে কাউখালি বন্দরে অধিবেশন হইবেই জানিবেন।" আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া আচার্য্যদেবের বাক্য কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল। তারপর ১৩৫৮ সালে মুর্শিদাবাদ জিলার অন্তর্গত বিকলনগর গ্রামের শ্রীবলরাম নাথের পৈতা ছেঁড়া ফৌজদারী মোকর্দ্দমা উপলক্ষে তিনি সম্মিলনী-সম্পাদককে ঐরূপ উপদেশই দিয়াছিলেন—"আপনি ঘটনাস্থলে চলিয়া যান; মোকর্দ্দমা রুজু করা চাইই; অর্থের জন্য ভাবিবেন না; অর্থ জুটিবেই।" যেখানে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন, সেখানে তাঁহার সাথে রিক্তহস্তে বা সামান্য অর্থ লইয়া যাইবার সময় নৈরাশ্য প্রকাশ করিলে তিনি তিরস্কার করিয়া বলিতেন—"ভয় পান কেন? কর্ত্তব্যে অগ্রসর হউন; ভগবান্ সহায় হইবেন।" এইরূপই ছিল তাঁহার ভগবানে বিশ্বাস ও আত্মশক্তিতে দৃঢ় প্রত্যয়। অবস্থার প্রতিকূলতা আচার্য্যদেবের দৃঢ় চিত্ততার কাছে আত্মসমর্পণ করিত।

আচার্য্যদেব অন্যায়ের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে পশ্চাৎপদ হইতেন না। যাহা তিনি সত্য ও সঙ্গত বলিয়া বুঝিতেন, অকুণ্ঠিতচিত্তে তাহাই করিতেন; নিন্দা-প্রশংসার কোনই তোয়াক্কা রাখিতেন না। একবার 'হ্যাঁ' বা 'না' বলিলে তিনি কখনই তাহা উল্টাইতেন না। "কর্ত্তব্য বুঝিব যাহা নির্ভয়ে করিব তাহা"—ইহাই ছিল তাঁহার নীতি। তিনি ছিলেন নির্ভীক ও তেজস্বী পুরুষ। রুক্ষ

ও আসামের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত তিনি অনেকবার নগ্নপদে, রিক্তহস্তে, নিঃসহায় অবস্থায় পরিভ্রমণ করিয়াছেন। কখনও অর্থের সন্ধান করেন নাই; সঙ্গী খুঁজেন নাই, পোষাক পরিচ্ছদের ভাবনা ভাবেন নাই, আত্মশক্তি হইতে বিচ্যুত হন নাই। স্ববিক্রমসহায় সিংহ কি কখনও বন হইতে বনান্তরে যাইবার সময় ভয় পায়? একাকিত্বের কথা চিন্তা করিয়া শঙ্কিত হয়? পথের ক্লেশ স্মরণ করিয়া নিরুৎসাহ হয়?

একোঽহং অসহায়োঽহং কৃশোঽহং ন পরিচ্ছদঃ।
স্বপ্নেঽপ্যেবং বিধা চিন্তা মৃগেন্দ্রস্য ন জায়তে॥

মহাত্মা গান্ধীর অহিংসা আদর্শের প্রতিও তাঁহার নিষ্ঠা ছিল অপরিসীম। সত্যনিষ্ঠা, কর্ত্তব্যে অটল দৃঢ়তা, ধর্ম্মভীরুতা, ত্যাগপরায়ণতা, উদার মানবতা, স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি গভীর ভালবাসা তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল। আচার্য্যদেবের চারিত্রিক মেরুদণ্ড ছিল অনমনীয়। কোমল ও কঠোর উভয় উপাদানে তাঁহার চরিত্র অপরূপ মহিমায় গড়িয়া উঠিয়াছিল।

শুনিয়াছি, পিতৃবিয়োগের পর (১৯২২ খৃঃ) অশৌচ উপলক্ষে সেই যে তিনি জুতা ও ছাতা ব্যবহার ত্যাগ করিয়াছিলেন, জীবনে আর কখনও উহা ধারণ করেন নাই। এই ঘটনায় আচার্য্যদেবের অসাধারণ পিতৃভক্তির ও দৃঢ়চিত্ততার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি কখনও আত্ম-প্রচার করিতে চাহিতেন না। আচার্য্যদেব তাঁহার নিজের ফটো তোলার বা প্রকাশের ঘোর বিরোধী ছিলেন। উহাকে তিনি আত্মপ্রচারণার একটা কৌশল বলিয়াই মনে করিতেন। এরূপ নির্লোভ ও নিরহঙ্কার নেতা সমাজের অলঙ্কার স্বরূপ।

আসামবাসী যোগিজাতির প্রতি বিশেষ অনুরাগ:—

আচার্য্যদেবের জীবন-কথা আলোচনা করিতে গিয়া একটা কথা না বলিলে তাঁহার পরিচয় পূর্ণাঙ্গ হইবে না। আসামের স্বজাতীয়গণের প্রতি আচার্য্যদেবের

রূপ ছিল যেন একটু বেশী। তাহাদের নিরক্ষরতা ও দুঃস্থতার কথা চিন্তা করিয়াই যেন তিনি তাহাদের প্রতি অধিক প্রীতিপ্রবণ হইয়া উঠেন। তাঁহাদের দুঃখ দৈন্য আচার্য্যদেবের অন্তরে গভীর বেদনার সঞ্চার করিত। কি উপায়ে তাহাদের অভাব অনটন দূর করা যাইবে, কি করিলে তাহারা মহত্তর জীবনের আস্বাদন লাভ করিবে, এই চিন্তা অনেক সময় তাঁহাকে বিচলিত করিয়া তুলিত। তিনি আসামের অনুন্নত স্বজাতিবহুল অঞ্চলে পরিভ্রমণ করিয়া তত্রত্য যোগিজাতির মধ্যে জাগরণের সাড়া আনিয়াছিলেন। জীবনের শেষ পর্য্যায়েও তিনি অসুস্থ শরীর লইয়া দুইবার সুদূর দরং জিলায় গমন করেন এবং তথায় বহুদিন অবস্থান করিয়া তত্রত্য স্বজাতি-বান্ধবদের অন্তরে আত্মসম্মান ও একতা-বোধ জাগাইতে চেষ্টা করেন। আসামে অবস্থানকালে তিনি যোগীশ্বর শিবের ত্যাগ ও সাম্যের আদর্শ এবং গীতার উদার বাণী প্রচার করিয়া জনগণের চিত্তে শ্রদ্ধার আসন লাভ করেন। তাঁহার চরিত্রমাধুর্য্য ও প্রচারণায় মুগ্ধ হইয়া, অনেকেই তাঁহাকে গুরুরূপে বরণ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে মহত্তর জীবনের দীক্ষা গ্রহণ করেন। আসামের স্বজাতি-ভাইদের দুঃখকষ্টে তিনি কিরূপ গভীর বেদনা অনুভব করিতেন, তাহা নিম্নলিখিত ঘটনায় পরিস্ফুট হইবে :—

"১৩৫৮।৬ কার্ত্তিক তিনি গাইবাটা হইতে সম্মিলনী-সম্পাদক প্রমথবাবুকে লিখিয়াছিলেন—"আসামের নানা স্থান হইতে দারুণ অন্নকষ্টের বিবরণ জানিয়া এমন অবস্থা হইয়াছে যে, খাইতে বসিলেই তাহাদের দুর্দ্দশা ভাবিয়া চক্ষু অশ্রু-ভারাক্রান্ত হয় ; মুখে গ্রাস তুলিতে ইচ্ছা হয় না। তাই আজ কয়দিন হইল সঙ্কল্প করিয়াছি যে, আগামী রাস-পূর্ণিমা পর্য্যন্ত আমি ভাত ও রুটি খাইব না। প্রতিদিন আসামবাসীদের এই নিদারুণ দুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য ভগবানের নিকট একান্ত মনে প্রার্থনা করিব এবং রাসন্তী পূর্ণিমা তিথিতে সম্পূর্ণ উপবাসী থাকিয়া নাম জপ করিব এবং সন্ধ্যার পর পর্য্যন্ত প্রার্থনা করিয়া ব্রত সাঙ্গ করিব। আমি

সহানুভূতিশীল দয়াবান্ সকলকেই আসামবাসীদের জন্য প্রতিদিন প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করি। আশা করি আপনিও তাহা করিবেন।"

উক্ত ব্রত সমাপনান্তে তিনি আসাম যাত্রার সংকল্প করিয়াছিলেন। "ভগবান্ বাসুদেবঃ সর্ব্বভূতেষবস্থিতঃ"—শেষ বয়সে আচার্য্যদেবের অন্তঃকরণে এই বিশ্বজনীন ভাব যেন মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি পরম-উদার এই ঐশী বাণী আসামের সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া নাথধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত করিবার বাসনা হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই সুমহৎ উদ্দেশ্য সফল হইল না। ভগবান্ তাহার আগেই তাঁহাকে ভবধাম হইতে সরাইয়া লইলেন। ১৩৫৮।১লা চৈত্র তারিখে তিনি সকলের মায়া কাটাইয়া নিত্যধামে চলিয়া গেলেন। তিনি চলিয়া গিয়াছেন—রহিয়াছে তাঁহার পবিত্র স্মৃতি, তাহাই চিরদিন আমাদের হৃদয়ের মর্ম্মর-মন্দিরে পূজিত হইতে থাকিবে। "He lives in fame, who died in virtue's cause." ধর্ম্মের জন্য, সত্যের জন্য, ন্যায়ের জন্য যিনি প্রাণ দেন, তাঁহার মৃত্যু নাই ; তাঁহার কীর্ত্তি চিরকাল বিরাজিত থাকিবে।

জন্মভূমি ত্যাগের পরে ঃ— ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের রাষ্ট্রনৈতিক বিপ্লবে যখন বাংলাদেশ দ্বিখণ্ডিত হইল, তখন আচার্য্যদেব প্রাণে বিষম আঘাত পাইয়াছিলেন। তাঁহার কেমন যেন একটা ধারণা হইয়াছিল যে, পূর্ব্ব পাকিস্তানে হিন্দুর পক্ষে বিশেষতঃ শিক্ষিত ও সংস্কৃতিসম্পন্ন হিন্দুর পক্ষে আর সসম্মানে বসবাস করা সম্ভবপর হইবে না। তাই তিনি দেশ-বিভাগের পর জন্মভূমি সায়েস্তা গ্রাম ও কর্ম্মভূমি ঢাকা নগরী ত্যাগ করিয়া সপরিবারে কলিকাতায় আসিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। কলিকাতায় অবস্থানকালে তাঁহাকে কঠোর পরিশ্রমের—প্রুফ্ রীডারের কার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হয়। এই সময়কার মতন এমন শোচনীয় অর্থসংকটের মধ্যে জীবনে তাঁহাকে পড়িতে হয় নাই।

তিনি স্বয়ং বাস্তত্যাগী। তাই সে সময়ে তিনি ছিন্নমূল বাস্তহারা নরনারীর

প্রাণের বেদনা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি অপটু দেহ ও ভাঙ্গা মন লইয়া কতিপয় বাস্তহারা-উপনিবেশ পরিদর্শনপূর্ব্বক ছিন্নমূল স্বজাতিবৃন্দের মনে আশার সঞ্চার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। পরের জন্য কতটুকু অকৃত্রিম দরদ, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা থাকিলে মানুষ নিজের দুঃখ-কষ্ট ভুলিয়া এই ভাবে কাজ করিতে পারে তাহা ভাবিয়া দেখার বিষয়। আচার্য্যদেব ছিলেন ভোলানাথের মতন আপনভোলা কর্ম্মপাগল। নবদ্বীপের ওপারে স্বরূপগঞ্জে ১৩৫৬ সালে বাস্তহারা নাথসমিতির যে প্রথম অধিবেশন হইয়াছিল, সেই সভায় আচার্য্যদেবের সভাপতির ভাষণে তাঁহার ঐ সময়কার অন্তরের সুগভীর জ্বালা কতকটা অভিব্যক্ত হইয়াছিল।

কলিকাতায় অবস্থানকালেই আচার্য্যদেব ২৪ পরগণার গাইঘাটা নামক স্থানে একখণ্ড জমি সংগ্রহ করিয়া কোনও মতে একখানা বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিতে পারিয়াছিলেন। সেখানেই তিনি জীবনের শেষ কয়টি দিন অতিবাহিত করেন। গাইঘাটার এই বাড়ীতেই আচার্য্য অম্বিকাচরণ অন্তিম নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

অমর স্মৃতি ঃ— আচার্য্য অম্বিকাচরণ আজ অমরধামে। আসাম ও বাংলার যোগিসমাজ তাঁহাকে কোনো কালে ভুলিতে পারিবে না। তাঁহার সৌম্য কান্তি, প্রীতিমধুর হাসি ও অনাড়ম্বর খদ্দরের শুভ্রশুচি বেশভূষা বহুকাল তাঁহার অন্তরঙ্গদের স্মৃতিপটে আঁকা থাকিবে। সুখের কথা এই যে, যে জাতির উন্নতি বিধানের জন্য তিনি জীবনব্যাপী সাধনা ও ত্যাগ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, সে জাতি আজ আর পিছনে পড়িয়া নাই। আসাম ও বাংলার জাতিসমূহের মধ্যে আজ যোগিজাতি একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে। জীবনের শেষভাগে আচার্য্যদেব তাঁহার সাধনার এই আশানুরূপ সাফল্য দেখিয়া নিশ্চয়ই অসীম তৃপ্তি লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার বিয়োগ-ব্যথাতুর সহকর্ম্মী ও আত্মীয়-বান্ধবদের চিত্তে আজ ইহাই পরম সান্ত্বনা। আচার্য্যদেব চলিয়া গেলেন. আমরা রহিলাম তাঁহার জন্য অশ্রু বিসর্জন করিতে। বিগত

অশ্রু আর কে মুছাইবে? কে আর নিরাশ প্রাণে আশার সঞ্চার করিবে? কে আর ক্ষতস্থানে কোমল হাত বুলাইয়া দিবে? তিনি আজ সংসারের শোক-দুঃখ-জ্বালা-যন্ত্রণার পরপারে। ভগবান তাঁহার কর্ম্মক্লান্ত আত্মার শান্তিবিধান করুন।

৺ভূষণচন্দ্র নাথ, এম-এ, বি-ই-ডি,

আমরা মহাপ্রাণ ভূষণচন্দ্র নাথের বাল্যজীবনের বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই। দুঃখের বিষয় তাঁহার বংশ পরিচয়ও আমাদের অজ্ঞাত। তবে অনেক সময় তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার মধুর স্বভাব ও বিনয়নম্র ব্যবহার দেখিয়া আমরা যাহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম, তাহাতে মনে হয় তিনি সদ্বংশজাত ও সৎস্বভাব মাতাপিতার বংশধর ছিলেন। তিনি সম্ভবতঃ বঙ্গাব্দ ১২৯৩ সালের বৈশাখ মাসে ২৪ পরগণা জিলার অন্তর্গত মুলটী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মেধাবী ও বুদ্ধিমান্ ছাত্র ছিলেন। এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কলিকাতায় কলেজে পড়িতে আরম্ভ করেন। কলিকাতা হইতে আই-এ ও বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় খিলাৎ ইন্‌ষ্টিটিউশনের শিক্ষক নিযুক্ত হন। এই সময় কলিকাতা রামমোহন লাইব্রেরী হলে ১৩২৫ সালে সম্মিলনীর নবম অধিবেশন হয়। ভূষণবাবুর প্রভাব প্রতিপত্তিতেই সমগ্র খিলাৎ ইন্‌ষ্টিটিউশন প্রতিনিধিগণের বাসস্থানের জন্য পাওয়া গিয়াছিল। অরবিন্দ বাবুর প্রধান সহকারীরূপে উক্ত অধিবেশনে তিনি খুব কর্ম্মতৎপরতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তারপর মজঃফরপুর জেলার অন্তর্গত হাজিপুর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ প্রাপ্ত হইয়া তিনি কলিকাতা ছাড়িয়া চলিয়া যান। হাজিপুর হইতেই তিনি বি, ই, ডি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী ভাষার পরীক্ষক নিযুক্ত হন। সুযোগ্য শিক্ষক ও চরিত্রবান্ মানুষ হিসাবে ভূষণ বাবু ছাত্রমহলে এবং জনসাধারণ ও স্কুল কমিটীর নিকট বেশ প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন

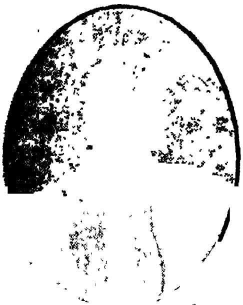
করিয়াছিলেন। হাজিপুরে অবস্থানকালে কি ভাবে তিনি পাবনা সৎসঙ্গ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের নজরে পড়িয়া যান। পরে ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ভূষণবাবু হাজিপুরের প্রধান শিক্ষকের সম্মানজনক পদ পরিত্যাগ করেন এবং বহু ছাত্র ও অভিভাবকের অনুরোধ উপরোধ উপেক্ষা করিয়া গুরুর আহ্বানে সৎসঙ্গ আশ্রমের স্কুল বিভাগে নামমাত্র বেতনে প্রধান শিক্ষকের পদে কাজ করিতে আরম্ভ করেন। সেই অবধি ভূষণচন্দ্র সপরিবারে সৎসঙ্গ আশ্রমে বাস করিয়া অতি সরলভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। গুরুর আদেশে তিনি জীবনের যাবতীয় আশা-ভরসায় জলাঞ্জলি দিয়া কঠোর দারিদ্র্যকে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন এবং আদর্শ শিক্ষাব্রতী হিসাবে শিক্ষাদান কার্য্যেই জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ভূষণবাবুর এই আত্মত্যাগ অতুলনীয় এবং গুরুভক্তির চরম নিদর্শন। সৎসঙ্গে ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র কলেজ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছিলেন এবং প্রিয় শিষ্য ভূষণচন্দ্রকে উহার অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। এই জন্য তিনি ভূষণবাবুকে এম-এ পরীক্ষা দিতে উৎসাহিত করেন। ভূষণবাবুও গুরুর আদেশক্রমে তপস্বীর মত এম-এ পাঠে রত হইলেন এবং যথাকালে ইংরাজী ভাষায় এম-এ পরীক্ষা দিয়া কৃত-কার্য্যতা লাভ করিলেন। ধন্য ভূষণবাবুর অধ্যবসায়, উৎসাহ ও পাঠানুরাগ! কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার গুরুদেবের উদ্দেশ্য পূর্ণ হইল না। দন্তোৎপাটন জনিত রোগে আক্রান্ত হইয়া ভূষণচন্দ্র পঞ্চাশ বৎসর বয়সে ১৩৪৩।১৯শে আষাঢ় তারিখে আশ্রমবাসীকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া কালগ্রাসে পতিত হইলেন।

ভূষণবাবু কায়মনোবাক্যে জাতির সেবা করিয়াছিলেন। তিনি যোগিজাতির পরম হিতাকাঙ্ক্ষী বান্ধব ছিলেন। তাঁহার অমায়িকতায় ও সরলতায় মুগ্ধ হইয়া অরবিন্দবাবু ভূষণচন্দ্রকে স্বীয় অনুজের মত স্নেহ করিতেন। হাজিপুরে অবস্থান সময়ে তিনি অরবিন্দ পরিচালিত যোগিসখার সম্পাদক নিযুক্ত হইয়া কয়েক বৎসর দক্ষতার সহিত পত্রিকার সম্পাদনা করিয়াছিলেন। ১৩৩৪ সালে কাছাড়

জিলার নরসিংহপুর গ্রামে সম্মিলনীর যে বিরাট অষ্টাদশ অধিবেশন হইয়াছিল ভূষণবাবু তাহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। গুরুর ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হইয় তিনি যে ভাষণ দিয়াছিলেন, তাহা সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল। ভূষণ বাবু নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া অনন্তধামে চলিয়া গিয়াছেন সত্য; কিন্তু তাঁহা অমায়িকতা, নিরহঙ্কারতা, মিষ্টভাষিতা ও স্বজাতিবৎসলতা চিরকাল সকলে চিত্ত অধিকার করিয়া থাকিবে।

৺দীননাথ লস্কর, মোক্তার

কাছাড় জিলার অন্তর্গত বোয়ালীপার গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত বংশে ১২৭ বঙ্গাব্দে ৺দীননাথ লস্কর মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি উচ্চশিক্ষিত ন হইলেও বিদ্যানুরাগী, অধ্যবসায়ী ও পরম স্বজাতিহিতৈষী ছিলেন। ইনি হাইলা



কান্দী আদালতে মোক্তারি করিতেন। মোক্তারি ব্যবসায়ে তিনি প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়া আর্থিক উন্নতি সাধনে সমর্থ হন। সুরমা উপত্যকার যোগিগণে সামাজিক অবস্থার উন্নয়নকল্পে তিনি অকুণ্ঠিতভাবে অর্থ ও সামর্থ্য ব্যয় করিতেন। মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি আন্তরিকতার সহিত স্বজাতির ও স্বদেশে সেবা করিয়া গিয়াছেন। স্থানীয় সরকারি ও বেসরকারি বহু প্রতিষ্ঠানের তিনি বিশিষ্ট কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন। ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে নদীয়া জিলার অন্তর্গত ভেড়ামারা নামক স্থানে সম্মিলনীর ২১শ বার্ষিক অধিবেশন আহূত হয়; যোগি-জাতি লস্কর মহাশয়কে এই অধিবেশনের সভাপতি নির্ব্বাচন করিয়া তাঁহার যোগ্যতার প্রতি সমাদর প্রদর্শন করেন।

১৩৪০ বঙ্গাব্দের ২৪শে আশ্বিন তারিখে ইঁহার পরলোকপ্রাপ্তি হয়।

আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনীর সভাপতিগণ (জীবিত)

শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ, এম-এ, বিদ্যাবাচস্পতি, ভাগবতভূষণ

কুলপাবন ভগীরথ তপস্যাপ্রভাবে সুরধুনী গঙ্গাকে ভূতলে আনয়ন পূর্ব্বক তাহার পবিত্র সলিলে যেমন শাপদগ্ধ কুলপুরুষগণের উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন, সেইরূপ রাধাগোবিন্দ নাথ, এম-এ, মহোদয় সম্মিলনীরূপ মুক্তিগঙ্গা আনয়ন করিয়া তাহার প্রেম ও প্রীতির পুণ্য ধারায় লাঞ্ছিত, নিপীড়িত ও অভিশপ্ত যোগিজাতির সামাজিক গ্লানি ও কুসংস্কার বিধৌত করিয়া জাতির অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। সম্মিলনীরূপ যে মহাবৃক্ষ তিনি রোপণ করিয়াছিলেন, ফলপুষ্প-সুশোভিত সেই বৃক্ষের শীতল ছায়ায় উপবেশন করিয়া যোগিজাতি আজ তাহার সদ্ভাব, প্রীতি ও একতার মধুময় ফল আস্বাদন পূর্ব্বক রোপণকারীকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছে।

জাতির অশেষ কল্যাণ সাধক শ্রীরাধাগোবিন্দবাবুর জীবনকাহিনী জানিবার আকাঙ্ক্ষা সকলের পক্ষেই স্বাভাবিক। তাই আমরা তাঁহার কর্ম্মবহুল জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদান করিলাম।

শ্রীরাধাগোবিন্দবাবু ১২৮৫ বঙ্গাব্দের ২০শে মাঘ তারিখে নোয়াখালি জিলার অন্তর্গত বসুদুহিতা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ৺চন্দ্রমণি নাথ এবং মাতার নাম ৺ব্রজসুন্দরী দেবী।

বিদ্যালয়ে ও কলেজে অধ্যয়নকালে শ্রীরাধাগোবিন্দবাবু অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি দালাল বাজারের বিখ্যাত জমিদার রায়বাবুদের বাড়ীতে অবস্থান করিয়া তত্রত্য মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় হইতে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার পূর্ব্বক মধ্য ইংরাজী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং বৃত্তি লাভ করেন। তারপর ১৯০০ খৃষ্টাব্দে নোয়াখালি জিলা স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে তৃতীয় এবং গণিতে প্রথম স্থান অধিকার

করেন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ঢাকা কলেজ হইতে তিনি এফ্-এ পরীক্ষা দিয়া চতুর্দ্দশ স্থান অধিকার করিয়া বৃত্তি লাভ করেন। অতঃপর ১৯০৪ সালে কলিকাতা জেনারেল্ এসেম্বলি (বর্ত্তমানে স্কটিশচার্চ্চ কলেজ) কলেজ হইতে তিনি গণিতে অনার্স পাইয়া বি-এ পাশ করেন এবং বি-এতে কলেজের মধ্যে ফিজিক্সে (পদার্থ বিজ্ঞানে) প্রথম স্থান অধিকার করাতে কলেজ হইতে একটা পুরস্কার লাভ করেন। ১৯০৫ সালে তিনি গণিতে দ্বিতীয় বিভাগে এম-এ পাশ করিয়া পঞ্চম স্থান অধিকার করেন।

এম্-এ পাশ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীরাধাগোবিন্দবাবু কলিকাতা সেণ্ট্রাল কলেজে এবং ইহার অল্প কিছুদিন পরেই সি. এম্. এস্. (বর্ত্তমানে সেণ্টপল) কলেজে বিজ্ঞান ও গণিতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি একই সময়ে উভয় কলেজে অধ্যাপনা করিতেন। পরে ১৯০৮ সালে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে বিজ্ঞান ও গণিতের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া কলিকাতা ছাড়িয়া কুমিল্লা গমন করেন। গণিত শাস্ত্রে তাঁহার পাণ্ডিত্য ও অধ্যাপনা কার্য্যে তাঁহার বিশেষ নৈপুণ্য লক্ষ্য করিয়া কলেজ কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে ১৯২৯ সালে কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ এবং ১৯৩১ সালে অধ্যক্ষের পদ প্রদান করেন। অধ্যক্ষের দায়িত্বপূর্ণ পদের কর্ত্তব্য সুষ্ঠুভাবে ও কৃতিত্বের সহিত পালন করিয়া এবং চরিত্র-মাধুর্য্য, হৃদয়ের ঔদার্য্য, অসাধারণ কর্ত্তব্যনিষ্ঠতা, শিক্ষাদান কার্য্যে সমধিক পটুতা ও অভিজ্ঞতা গুণে ছাত্র ও অধ্যাপকমণ্ডলীর আন্তরিক শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়া তিনি ১৯৪৩ সালের ৩০শে এপ্রিল তারিখে অবসর গ্রহণ করেন এবং কুমিল্লাস্থিত স্বভবনে বাস করিতে থাকেন। কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণকালে কলেজের ছাত্র ও অধ্যাপকবৃন্দ, কলেজ কাউন্সিলের সদস্যগণ, কুমিল্লা টাউনের গণ্য-মান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তাঁহাকে যে বিদায় সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন তাহাতে তৎপ্রতি তাঁহাদের সকলেরই আন্তরিক শ্রদ্ধা অভিব্যক্ত হইয়াছিল। কুমিল্লায় অবস্থানকালে ভক্ত ও সুপণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দবাবুর প্রতি সকলেই ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিত

এবং তাঁহার গুণে আকৃষ্ট হইয়া অনেকে দূরদূরান্তর হইতে তাঁহার দর্শনপ্রয়াসী হইয়া আগমন করিত। অবসর গ্রহণের পর তিনি বেশী দিন কুমিল্লায় বাস করিতে পারেন নাই। ১৯৪৩ সালেই তিনি নাথব্যাঙ্কের তদানীন্তন-ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীক্ষেত্রনাথ দালাল, এম-এ, বি-এল মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত চৌমুহানী কলেজের অধ্যক্ষ ও গণিতের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া তথায় গমন করেন। অতঃপর নোয়াখালির সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার ফলে তিনি ১৯৪৬ সালে চৌমুহানী ছাড়িয়া কলিকাতায় চলিয়া আসেন।

অধ্যাপনা কালে শ্রীরাধাগোবিন্দবাবু শুধু কলেজের প্রাত্যহিক কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন না। তিনি অবসর সময়ে কঠোর পরিশ্রম সহকারে কয়েকখানি স্কুলপাঠ্য ও কলেজপাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন করেন। যথা—জ্যামিতি, বীজগণিত ও পাটীগণিত। ইহার তিনখানি পুস্তকই টেক্স্ট বুক কমিটী কর্ত্তৃক অনুমোদিত ও বাঙ্গালার বাহিরেও কয়েক প্রদেশে পাঠ্যরূপে নিরূপিত হয়। তাঁহার প্রণীত সলিড্ জিওমেট্রি ও কনিক্ সেক্সন্ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক অনুমোদিত ও আই-এ পরীক্ষার্থীদের পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হয়। ইহাতে শ্রীরাধাগোবিন্দবাবুর বিদ্যোৎসাহিতা ও শিক্ষানুরাগিতারই পরিচয় পাওয়া যায়।

কুমিল্লায় অবস্থান কালে তিনি প্রেম-ভক্তি-প্রধান বৈষ্ণবধর্ম্মের অনুরাগী হইয়া উঠেন এবং দীর্ঘদিন একান্তমনে বৈষ্ণবধর্ম্ম অনুশীলন ও বৈষ্ণবগ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। বৈষ্ণবোচিত সাধনমার্গে অগ্রসর হইয়া তিনি যে প্রভূত জ্ঞান অর্জ্জন ও শক্তি সঞ্চয় করেন তাহার ফলে বিস্তৃত ভূমিকা ও 'গৌরকৃপাতরঙ্গিনী' টীকা সমন্বিত বিশাল শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ সম্পাদন করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। তৎসম্পাদিত শ্রীগ্রন্থ বৈষ্ণবসাহিত্য ভাণ্ডারের অমূল্য সম্পদ্। ইহা বৈষ্ণবজগতে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে। আমরা জানি অর্থ বা যশঃলাভের আশায় বা পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিবার আকাঙ্ক্ষায় তিনি এই গ্রন্থ-সম্পাদনে

প্রবৃত্ত হন নাই। মহাপ্রভু-প্রচারিত ধর্ম্ম ও তাঁহার বাণী প্রচার করাই তাঁহার গ্রন্থ-সম্পাদনের একমাত্র উদ্দেশ্য। অর্থ বা যশোলিপ্সু ব্যক্তির লেখনীপ্রসূত বাণী এত মধুময়ী হইতে পারে না। বৈষ্ণবশাস্ত্রে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যের পুরস্কারস্বরূপ সিঁথি (২৪ পরগণা) বৈষ্ণবসম্মিলনী এক সম্বর্দ্ধনা সভায় তাঁহাকে 'ভাগবতভূষণ' উপাধি প্রদান করিয়াছেন। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ভূমিকা ও তাঁহার সম্পাদিত চরিতামৃত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা এম্‌-এ পরীক্ষার পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট আছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

শ্রীরাধাগোবিন্দবাবু সুসাহিত্যিক। বাঙ্গালার সুবিখ্যাত মাসিক প্রবাসী ও ভারতবর্ষ এবং দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকায় তাঁহার অনেক জ্ঞানগর্ভ, সুচিন্তিত ও সুপাঠ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। রামকৃষ্ণ মিশন ভারতের মধ্যে সুবৃহৎ প্রতিষ্ঠান। তৎকর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দবাবু ইংরাজীতে দুইটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহার একটী—Srichaitanya Movement—রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত 'The Cultural Heritage of India' গ্রন্থে কয়েক বৎসর আগে প্রকাশিত হইয়াছে এবং তাঁহার আর একটী নূতন প্রবন্ধ—'The Achintya Bhedabheda School of Vedanta' উক্ত গ্রন্থের নূতন সংস্করণের তৃতীয় খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে। পত্রিকা সম্পাদনেও আমরা তাঁহার নৈপুণ্য ও পারদর্শিতার পরিচয় পাইয়াছি। তিনি ক্রমান্বয়ে যোগিসখা, সম্মিলনী, সমাজ, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া, গৌরাঙ্গ এবং সাধনা পত্রিকার সম্পাদকতা করেন। সাধনা পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ পড়িয়া নবদ্বীপের পণ্ডিতসমাজ তাঁহাকে 'বিদ্যাবাচস্পতি' উপাধি প্রদান করেন। বিভিন্ন অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন সময়ে বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিবার জন্য আহূত হইয়া তিনি পরম উদার বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারের সহায়তা করিয়াছেন।

কলিকাতার বিদ্বৎসমাজে ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকমণ্ডলীর নিকট শ্রীরাধাগোবিন্দবাবু সুপরিচিত। পি-এচ-ডি উপাধি প্রার্থিগণ বিশেষ

বিশেষ বিষয়ে গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে সমর্পণ করিলে তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য সেই সেই বিষয়ে পাণ্ডিত্যসম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে লইয়া পরীক্ষক বোর্ড গঠিত হইয়া থাকে। শ্রীরাধাগোবিন্দবাবু বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক একদা এইরূপ বোর্ডের সদস্য মনোনীত হইয়াছিলেন।

এক্ষণে আমরা শ্রীরাধাগোবিন্দবাবুর সামাজিক জীবনের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি। তিনি যে সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহার দৈন্য ও দুরবস্থা দেখিয়া তিনি বড়ই মর্ম্মাহত হইয়া পড়েন। তাই যোগিসমাজের সংস্কার ও যোগিজাতির উন্নয়নের জন্য তিনি বদ্ধপরিকর হন। কলিকাতায় অবস্থানকালে শ্রীপাঁচকড়িলাল নাথ—এ্যাডভোকেট, শ্রীনরেন্দ্রনাথ দালাল—এ্যাডভোকেট, শ্রীইন্দুভূষণ নাথ, ৺হীরালাল নাথ, ৺অতুলচন্দ্র নাথ প্রমুখ স্বজাতিহিতৈষী উদীয়মান নেতৃগণের সহযোগে তিনি সমাজোন্নতির বহু পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ঐ সকল পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সাতিশয় যত্নবান্ হন এবং সভা-সমিতির অনুষ্ঠান করিয়া তাঁহার উদ্দেশ্য কলিকাতা ও উহার বাহিরে প্রচার করিতে চেষ্টা করেন। পরম স্বজাতিহিতৈষিতা ও স্বজাতিপ্রীতির জন্য তিনি কলিকাতার স্বজাতিমহলে এমন সুপরিচিত হইয়া পড়েন যে সকলেই তাঁহার নামে আনন্দিত ও অনুপ্রাণিত হইত। জাতির মান-মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তিনি সর্ব্বদাই অকুণ্ঠিতভাবে অগ্রসর হইয়াছেন। ১৯১০ সালের লোক-গণনার প্রাকালে তিনি 'বঙ্গীয় যোগিজাতি' এবং 'Yogis of Bengal' পুস্তকদ্বয় প্রণয়ন ও প্রকাশ করিয়া যোগিজাতির পবিত্রতা ও শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন পূর্ব্বক এই জাতি সম্বন্ধে সেন্সাস্ পরিচালকগণের ভ্রান্ত ধারণা বিদূরিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

আসাম-বাঙ্গালার যোগিজাতির মধ্যে ব্যাপকভাবে সামাজিক আন্দোলন চালাইবার জন্য এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরে একতা-সদ্ভাব-স্থাপন ও শিক্ষা বিস্তারের প্রধান উদ্দেশ্যে তিনি কলিকাতা হইতে কুমিল্লা যাইয়া ১৩১৭ সালে আসাম

বঙ্গ যোগি-সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠা এবং উহার মুখপত্ররূপে সম্মিলনী পত্রিকা প্রচার করেন। "সঙ্ঘশক্তিঃ কলৌ যুগে"—ইহাই সম্মিলনী প্রতিষ্ঠার মূলীভূত কারণ। ১৩১৭ সালের ৬ই কার্ত্তিক কুমিল্লা সহরে সম্মিলনীর যে প্রথম অধিবেশন হয় তিনিই তাহার সভাপতিত্ব করেন। কুমিল্লার সূতিকাগৃহে জাত সম্মিলনী অধুনা পূর্ণাবয়ববিশিষ্ট হইয়া যোগিজাতির অশেষ কল্যাণসাধন করিতেছে। অনেক সঙ্কট-মুহূর্ত্তে আমরা সম্মিলনীর বহু বিঘোষিত সঙ্ঘশক্তির উপকারিতা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি। এজন্য যোগিজাতি শ্রীরাধাগোবিন্দবাবুর নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে।

সম্মিলনীর সুশৃঙ্খল কার্য্য পরিচালনার জন্য মুদ্রাযন্ত্রের আবশ্যকতা অনুভব করিয়া তিনি কুমিল্লা সহরে শঙ্কর প্রেস্ প্রতিষ্ঠা করেন। যৌথ কারবারের প্রতি লোকের স্পৃহা ও আগ্রহ জন্মানই বোধ হয় ছিল এই প্রেসপ্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্দেশ্য। তিনিই ছিলেন এই প্রেসের রক্ষক ও প্রধান অংশীদার। তাঁহারই চেষ্টায় ও আগ্রহে উক্ত প্রেস্ এক্ষণে সম্মিলনীর অধিকারে আসিয়াছে।

শিক্ষার বহুল প্রচলন ব্যতীত জাতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সম্ভবপর নহে; ইহা বুঝিতে পারিয়া শ্রীরাধাগোবিন্দবাবু তাঁহার পরিচালনাধীনে একটী ধনভাণ্ডার স্থাপন করিয়া বহু দরিদ্র ছাত্রকে অর্থ সাহায্য দান করিয়াছিলেন। আজ যোগি-জাতির মধ্যে যে শিক্ষার সমধিক প্রচলন হইয়াছে তাহার প্রেরণা আসিয়াছে শ্রীরাধাগোবিন্দবাবুর এই প্রচেষ্টা হইতে।

শ্রীরাধাগোবিন্দবাবু যোগিজাতির অলঙ্কার-স্বরূপ। সহৃদয়তা, অমায়িকতা, বিদ্যাবত্তা, স্বজাতিবৎসলতা প্রভৃতি গুণে তিনি সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছেন। তিনি যোগিজনসাধারণের মধ্যে সমধিক পরিচিত। সকলেই তাঁহার নাম অতি শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিয়া থাকে। যোগিজাতির অধঃপতনে নিতান্ত ব্যথিত ও মর্ম্মাহত হইয়া যাঁহারা উহার উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, শ্রীরাধাগোবিন্দবাবুর নামই তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জাতি তাঁহার অনুপম ত্যাগ ও অতুলনীয় অবদানের কথা ভুলিতে পারিবে না। তাই যোগি-

জাতি তাহাদের পরম আদরের ধন শ্রীরাধাগোবিন্দকে তাহাদের একমাত্র প্রতিষ্ঠান আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনীর বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি পদে একাধিকবার নির্ব্বাচন করিয়া তাঁহার প্রতি তাহাদের অন্তরের শ্রদ্ধা ও সম্মান জ্ঞাপন করিয়াছেন। ১৩১৭ সালে তিনি সম্মিলনীর প্রথম অধিবেশনের (স্থান—কুমিল্লা), ১৩৩৫ সালে ১৯শ অধিবেশনের (স্থান—খুলনা টাউন), ১৩৪০ সালে ২৪শ অধিবেশনের (স্থান—চুয়াডাঙ্গা, নদীয়া) এবং ১৩৫৭ সালে বিশেষ অধিবেশনের (স্থান—কলিকাতা ইউনিভারসিটী ইন্‌ষ্টিটিউট্) সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। একেবারে নির্ব্বিরোধে তিনি এই সকল অধিবেশনের সভাপতির পদ লাভ করেন। ইহাতে তাঁহার জনপ্রিয়তার সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। গুরুতর কার্য্যে ব্যাপৃত থাকাতে তিনি সম্মিলনীর ও স্বজাতির সহিত তাঁহার স্থূলদেহের ঘনিষ্ঠ সংযোগ বর্ত্তমানে রক্ষা করিতে অসমর্থ হইলেও, তিনি অন্তরের সহিত প্রতিনিয়ত যোগিজাতির কল্যাণ কামনা করিয়া থাকেন। তাঁহার "Social death" (সামাজিক মৃত্যু) হইলেও, সঙ্কটমুহূর্ত্তে তিনি জাতির আহ্বানে সাড়া না দিয়া স্থির থাকিতে পারেন না। অত্যধিক মানসিক পরিশ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্যহানিও ঘটিয়াছে সত্য। তিনি এখন কলিকাতায় অবস্থান করিতেছেন এবং তাঁহার পরমপ্রিয় শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের পরিবর্দ্ধিত সংস্করণের সম্পাদনে এবং অন্যান্য ধর্ম্মগ্রন্থ প্রণয়নে ব্যাপৃত আছেন।

অল্প পরিসরের মধ্যে শ্রীরাধাগোবিন্দবাবুর জীবনকথা বর্ণনা করা সম্ভবপর নহে। উপরোক্ত বর্ণনা হইতে তাঁহার চরিত্রের ও কার্য্যের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাইবে মাত্র। তিনি যোগিজাতির পরম বান্ধব; সুতরাং তাঁহার স্মৃতি-বিগ্রহ জাতির মানসমন্দিরে চিরকাল পূজিত হইতে থাকিবে।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ দালাল, এ্যাড্‌ভোকেট।

শ্রীনরেন্দ্রবাবু বসিরহাট (২৪ পরগণা) নিবাসী স্বর্গীয় হরিমোহন দালাল মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র। ১২৯৪ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

বাল্যকালে তিনি বসিরহাটে প্রাথমিক পাঠ সমাপন করিয়া কলিকাতায় অসিয়া অধ্যয়ন করিতে থাকেন। ১৯০৫ সালে জেনারেল এসেম্বলি ইনষ্টিটিউশন হইতে সুখ্যাতির সহিত প্রথম বিভাগে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ঐ স্কুলের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া স্কুল হইতে মাসিক ১০৲ দশ টাকা হিসাবে বৃত্তি প্রাপ্ত হন। তারপর জেনারেল এসেম্বলি ইনষ্টি-টিউশন হইতে ১৯০৭ সালে প্রথম বিভাগে এফ্-এ পরীক্ষায় এবং ১৯০৯ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি. এস-সি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯১২ সালে ইউনিভারসিটি 'ল' কলেজ হইতে বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আলিপুর জজ আদালতে ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন। ১৯২০ সাল হইতে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করিতেছেন। ১৯৪৮ সালে তিনি স্বাধীন ভারতের সুপ্রীম কোর্টেও প্র্যাক্‌টিস্ করিবার সনদ প্রাপ্ত হন।

কিশোর বয়স হইতেই তিনি স্বজাতির উন্নতিকল্পে আত্মনিয়োগ করেন। ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াও তিনি ছাত্রাবস্থায় অমায়িক ও অহঙ্কারশূন্য ছিলেন। দরিদ্র ছাত্র ও স্বজাতীয়গণের জন্য তিনি ক্লেশ অনুভব করিতেন এবং তাহাদের দুঃখমোচনে যত্নবান্ হইতেন। স্বর্গীয় অরবিন্দবন্ধু নাথ মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত "অনাথনাথ ভাণ্ডারের" পরিপুষ্টির জন্য এবং দরিদ্র অসহায় বিধবা ও দুঃস্থ স্বজাতীয় ছাত্রগণের সাহায্যের নিমিত্ত উল্টাডাঙ্গা অঞ্চলের স্বজাতীয়গণের বাড়ীতে বাড়ীতে মুষ্টিতণ্ডুল সংগ্রহোদ্দেশ্যে ভিক্ষার ঝুলি হাতে করিয়া ঘুরিতে তিনি কুণ্ঠা বোধ করিতেন না। ছাত্রাবস্থায় তিনি শ্রীরাধাগোবিন্দবাবু পাঁচকড়িবাবু, ইন্দুবাবু প্রভৃতি তৎকালীন কলিকাতাবাসী ও প্রবাসী অন্যান্য স্বজাতীয় ছাত্রগণের সহযোগিতায় "যোগিহিতৈষিণী সভা" (ছাত্র-বিভাগ) নামে একটি সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে তিনি ঐ সমিতির সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। শ্রীনরেন্দ্রবাবু ও তাঁহার সহকর্ম্মী যে সকল ছাত্র এই প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠা করেন তাঁহাদিগকে জাতীয় আন্দোলনের অগ্রদূত

এবং প্রতিষ্ঠানটিকে জাতীয় উন্নতির পথপ্রদর্শক বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। এই ছাত্রকর্ম্মিগণ জাতির মনে যে আত্মসম্বিৎ জাগাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন তজ্জন্য যোগিজাতি ইঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ। তাঁহারা বাধাবিঘ্নের জঙ্গল কাটিয়া যে পথ পরিষ্কার করিয়াছিলেন প্রধানতঃ তাহাই অনুসরণ করিয়া পরবর্ত্তী কর্ম্মিগণ জাতিকে উন্নতির লক্ষ্যে চালিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। যে আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনী আজ ছয় লক্ষ যোগিজাতির আশা-ভরসার স্থলরূপে বিরাজ করিতেছে, তাহার প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প গৃহীত হয় উল্লিখিত যোগিহিতৈষিণী সভার এক অধিবেশনে। ১৯০৮ সালে শ্রীরাধাগোবিন্দবাবু কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া কুমিল্লায় গমন করিয়া ১৩১৭ বঙ্গাব্দে আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠা করেন। নরেন্দ্রবাবু প্রথম হইতেই উক্ত সম্মিলনীর অন্যতম কর্ম্মী হিসাবে সম্মিলনীর কার্য্যে যোগদান করেন। স্বর্গীয় অরবিন্দবাবু প্রতিষ্ঠিত যোগিসখা পত্রিকাকে শ্রীরাধাগোবিন্দবাবু সম্মিলনীর মুখপত্র করিতে চাহিলে অরবিন্দবাবু বিশ্বাস করিয়া তাঁহার স্নেহের ধন 'সখা'কে সম্মিলনীর হাতে ছাড়িয়া দিতে অসম্মত হন; সুতরাং রাধাগোবিন্দ বাবু তাঁহারই সম্পাদনায় সম্মিলনীর মুখপত্ররূপে 'সম্মিলনী' পত্রিকা প্রকাশ ও প্রচার করিতে বাধ্য হন। অতঃপর ১৩২৫ সালে কলিকাতা রামমোহন লাইব্রেরী হলে আহূত সম্মিলনীর নবম অধিবেশনের বিষয়-নির্ব্বাচনী সভায় উভয়পক্ষের মতভেদ দূরীকরণ মানসে এবং যোগিসখাকে সম্মিলনীর মুখপত্ররূপে গ্রহণ করিবার জন্য সমবেত নেতৃগণের মধ্যে যে বিতর্ক উপস্থিত হয় তাহাতে নরেন্দ্রবাবু প্রধান অংশ গ্রহণ করেন এবং প্রধানতঃ তাঁহার চেষ্টায় মতভেদের মীমাংসা হয় এবং অরবিন্দবাবু কতিপয় সর্ত্তাধীনে যোগিসখাকে সম্মিলনীর হস্তে সমর্পণ করিতে স্বীকৃত হন। তখন হইতে যোগিসখা অফিস কাশীধাম হইতে কলিকাতায় আনীত হয় এবং নরেন্দ্রবাবু পত্রিকার তত্ত্বাবধায়ক মনোনীত হন। এই সময় নরেন্দ্রবাবু বয়সে তরুণ হইলেও, উক্ত অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি

রূপে তিনি নিপুণভাবে অধিবেশনের কার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। নবম অধিবেশনে তিনি কর্ম্মকুশলতার যে পরিচয় দেন, তাহাতে তিনি বেশ সুনাম ও প্রতিপত্তি অর্জ্জন করেন। তাঁহার যোগ্যতায় ও জাতিসেবার আগ্রহে মুগ্ধ হইয়া যোগিজাতি তাঁহাকে ১৩২৬ সালে ঢাকা জিলার সিরাজদীঘা বন্দরে আহূত সম্মিলনীর দশম অধিবেশনের সভাপতি নির্ব্বাচিত করেন। কিন্তু ভীষণ ঝটিকাবর্ত্তহেতু সিরাজদীঘা বন্দর বিধ্বস্ত হওয়াতে উক্ত অধিবেশন স্থগিত রাখিতে হয়। তারপর তাঁহাকে ১৩৩৩ সালে সম্মিলনীর ১৭শ অধিবেশনের (স্থান রামরাজাতলা, হাওড়া) * ১৩৪২ সালে ২৫শ অধিবেশনের (স্থান—বগুড়া টাউন) এবং ১৩৪৩ সালে ২৭শ অধিবেশনের সভাপতি নির্ব্বাচন করিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করেন। বিভিন্ন অধিবেশনে পঠিত তাঁহার জ্ঞানগর্ভ ভাষণ হইতে তাঁহার চিন্তাশীলতার, স্বজাতিবৎসলতার ও উদারমনস্বিতার পরিচয় পাওয়া যায়।

জনসাধারণের কার্য্যেও নরেন্দ্রবাবুর সেবার অবদান নগণ্য নহে। জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রেই তিনি কার্য্যনিপুণতা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠতা ও তেজস্বিতার পরিচয় দিয়াছেন। বিগত ১৯২৭ সালে তিনি ২৯নং মাণিকতলা ওয়ার্ড হইতে কলিকাতা করপোরেশনের (পৌরসভার) কাউন্সিলারের (সদস্যের) পদপ্রার্থী হইয়া স্বাধীনভাবে (অর্থাৎ কোন পার্টি বা দলভুক্ত না হইয়া) ভোট প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হন। বিপুল ভোটাধিক্যে নরেন্দ্রবাবু কংগ্রেস-মনোনীত প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাস্ত করিয়া কাউন্সিলার নির্ব্বাচিত হইলে কলিকাতা করপোরেশনের তদানীন্তন মেয়র দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত মহাশয় তাঁহাকে মাল্যভূষিত করিয়া সোল্লাসে তাঁহাকে আলিঙ্গন করেন। নরেন্দ্রবাবুও সেনগুপ্তের একান্ত অনুরোধে কংগ্রেস ক্রীডে স্বাক্ষর করিয়া কংগ্রেস দলভুক্ত হন। প্রবল

* দ্রষ্টব্য—১৩৪২ বৈশাখ মাসে ২৩শ অধিবেশন, ১৩৪২ চৈত্র মাসে ২৬শ অধিবেশন এবং ১৩৪৩ চৈত্র মাসে ২৭শ অধিবেশন আহূত হয়।

কংগ্রেসদলের নিরপেক্ষ হইয়াও যে নরেন্দ্রবাবু ভোটযুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার জনপ্রিয়তাই প্রমাণিত হয়। পরে ১৯৩০ ও ১৯৩৩ সালে আরও দুইবার তিনি বহু ভোটাধিক্যে কাউন্সিলার নির্ব্বাচিত হন। ১৯৩৬ সালে সামান্য ভোটে পরাজিত হইলেও ১৯৩৯ সালের বাই-ইলেকশনে তিনি আবার বহু সংখ্যক ভোট পাইয়া কাউন্সিলার নির্ব্বাচিত হন এবং ১৯৪০ সালের সাধারণ নির্ব্বাচনেও তিনি কলিকাতা পৌরসভার সদস্যপদ লাভ করেন। এই সময় আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনীর পক্ষ হইতে নরেন্দ্রবাবুকে অভিনন্দনপত্র দেওয়া হয়। ১৯৪৪ সালের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত তিনি সুখ্যাতি, সততা ও নির্ভীকতার সহিত পৌরসভার নানাবিধ জনহিতকর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। পৌরসভার সদস্যরূপে তিনি বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ, রাস্তাদির সংস্কার, বৈদ্যুতিক আলোক সংস্থাপন, ড্রেনের অব্যাধ জলনির্গমন, বৈদ্যুতিক শক্তি পরিচালিত বৃহৎ নলকূপ খনন, প্রসূতি-আগার স্থাপন ইত্যাদি বহুবিধ জনকল্যাণজনক কার্য্যসাধন করিয়া ওয়ার্ডের উন্নতি বিধান করেন। এই কারণে তিনি জনসাধারণের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন।

১৯৩০ ও ১৯৪০ সালের সেন্সাসে (লোকগণনায়) নরেন্দ্রবাবু মাণিকতলা ওয়ার্ডের সেন্সাস্ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হইয়া বিশেষ দক্ষতার সহিত কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন এবং গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে বিশেষ প্রশংসাপত্র পাইয়াছিলেন। ১৯৫১ সালে তিনি স্বাধীন বাংলার বিধানসভার সদস্যপদ-প্রার্থী হইলে বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটী তাঁহাকে মাণিকতলা ওয়ার্ড হইতে কংগ্রেস প্রার্থীরূপে মনোনীত করেন; কিন্তু ১৯৫০ সালের হিন্দু-মুসলমানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে সমস্ত মুসলমান ভোটার মাণিকতলা ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যায় এবং মুসলমান পরিত্যক্ত বাড়ীগুলি পূর্ব্ব-বঙ্গের উদ্বাস্তু হিন্দুগণ দখল করিয়া তথায় বাস করিতে থাকেন। এই সকল উদ্বাস্তু হিন্দু ভোটারতালিকা-ভুক্ত হইয়া কংগ্রেসের বিরোধিতা করিতে আরম্ভ করেন। তাহার ফলে

কংগ্রেসপ্রার্থী নরেন্দ্রবাবুর পরাজয় এবং তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী কম্যুনিষ্ট প্রার্থীর জয়লাভ ঘটে।

নরেন্দ্রবাবু বহু প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং এখনও আছেন। তিনি বহুদিন উল্টাডাঙ্গা হাইস্কুলের ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট, উল্টাডাঙ্গা সরদাপ্রসাদ ইন্‌ষ্টিটিউশনের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন এবং বর্ত্তমানে বসিরহাট কলেজের গভর্ণিং বডির ভাইস্‌প্রেসিডেণ্ট এবং বসিরহাট হরিমোহন (তাঁহার পিতৃদেব) গার্লস্ হাই-স্কুলের কার্য্য-পরিচালক সমিতির সদস্য আছেন। তিনি বসিরহাট গার্লস্ হাইস্কুলের বিল্ডিং ফাণ্ডে পনর হাজার টাকা এবং বসিরহাট হাইস্কুলের নূতন গৃহাদি নির্ম্মাণকল্পে পাঁচ শত টাকা দান করিয়া বদান্যতা ও বিদ্যোৎসাহিতার পরিচয় দিয়াছেন।

কলিকাতায় নাথ-সম্মিলনী প্রতিষ্ঠিত হইলে নরেন্দ্রবাবু উহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়া যোগিজাতির হিতানুষ্ঠানে রত হন। ১৯৫০ সালের সেন্সাস্ (লোকগণনা) উপলক্ষে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট যোগিজাতিকে অনুন্নতজাতির অন্তর্ভুক্ত করিলে তিনি প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের নিকট এই অন্তর্ভুক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন এবং এই বিষয়ে সচেতন হইবার জন্য সকলকেই উৎসাহিত করেন। যাহা হউক সদাশয় গবর্ণমেণ্ট অনুন্নত শ্রেণীর তালিকা হইতে যোগিজাতির নাম খারিজ করিয়া দেন।

যোগিজাতির মধ্যে উচ্চশিক্ষা প্রবর্ত্তন করিবার জন্য নরেন্দ্রবাবু সর্ব্বদাই উৎসাহী ও আগ্রহান্বিত। প্রধানতঃ তাঁহারই উদ্যোগে তদীয় পিতৃদেব উল্টা-ডাঙ্গায় দরিদ্র যোগিছাত্রগণের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়া দেন। বসিরহাটের অন্যতম জমিদার স্বর্গীয় সারদাপ্রসাদ দালাল মহাশয় নরেন্দ্রবাবুরই পরামর্শে ও প্রেরণায় নাথছাত্রগণের জন্য বসিরহাট টাউনে ঈশান (সারদাবাবুর পিতৃদেবের নাম) বোর্ডিং প্রতিষ্ঠা করেন। সুদের টাকা হইতে বোর্ডিং-এর ব্যয়নির্ব্বাহার্থ তিনি নরেন্দ্রবাবুর হাতে ষাট হাজার টাকার কোম্পানির

কাগজ ট্রাষ্ট স্বরূপ অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। তিনি ঐ ট্রাষ্টের ম্যানেজিং ট্রাষ্টী আছেন।

ছাত্রাবস্থা হইতেই তিনি সাহিত্যচর্চ্চা করিয়া আসিতেছেন। যোগিসখার তিনি নিয়মিত লেখক ছিলেন। সমাজ-সংস্কারমূলক ও চিন্তাশীলতার পরিচায়ক বহু প্রবন্ধ ও কবিতা লিখিয়া তিনি জাতীয় পত্রিকার সেবা করিয়াছেন। সম্মিলনীর সভাপতিরূপে তিনি যে সমস্ত অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার চিন্তাশীলতা, মনস্বিতা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিতার পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ সকল অভিভাষণে তিনি জাতীয় উন্নতির সুনির্দ্দিষ্ট পন্থা প্রদর্শন করিয়া নানা গঠনমূলক কার্য্যের ইঙ্গিত করিয়াছেন। বিভিন্ন সময়ে যোগিসখায় প্রকাশিত তাঁহার প্রবন্ধ ও কবিতা সঙ্কলিত করিয়া এবং আরও কতকগুলি জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি "অবসর-গাথা" প্রকাশ করিয়াছেন। 'অমৃতবাজার', 'আনন্দবাজার', 'যুগান্তর', 'লোক সেবক' প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকায় তাঁহার পুস্তকখানির উচ্চ প্রশংসা প্রকাশিত হইয়াছিল। উক্ত পুস্তক পাঠে বুঝা যায়—তিনি গীতার ভক্ত ও গীতার নিয়মিত পাঠক। গীতার নিষ্কাম কর্ম্মযোগই যেন তাঁহার অনুসরণীয়। "অবসর গাথায়" প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী তাঁহার নির্ভীকতা, তত্ত্বদর্শিতা, ঈশ্বর-নির্ভরতা, স্বাধীনচিত্ততা, স্পষ্টবাদিতা ইত্যাদি গুণের পরিচয় প্রদান করে।

তাঁহার পিতৃদেবের মৃত্যুর পর হইতে নরেন্দ্রবাবু অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে এবং স্বার্থবুদ্ধি পরিশূন্য হইয়া পিতৃপরিত্যক্ত বিশাল সম্পত্তির পরিচালনা করিতেছেন। তাঁহার সুপরিচালনায় তাঁহাদের এষ্টেটের সমধিক উন্নতি সাধিত হইয়াছে। বৈষয়িক জীবনে তিনি তাঁহার পিতার ন্যায়ই নির্ভীক ও তেজস্বী। তিনি যাহা সত্য ও ন্যায় বলিয়া বুঝিতে পারেন জনমতের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তাহা সম্পাদন করিতে পশ্চাৎপদ হন না। বিদ্বান হইয়াও তিনি নিরহঙ্কার—ধনী হইয়াও আড়ম্বরশূন্য। সততা, সত্যনিষ্ঠতা ও কর্ত্তব্যপরায়ণতা তাঁহার নিকট আদরণীয়। সাংসারিক জীবনে উন্নতি লাভ করিতে মিতব্যয়িতা

ও শ্রমশীলতা তাঁহার মতে একান্ত অবলম্বনীয়। স্পষ্টবাদিতা তাঁহার চরিত্রের বিশেষ লক্ষণ। অপ্রিয় সত্য বলিতেও তিনি কুণ্ঠিত হন না।

ভারত স্বাধীনতা লাভ করিলেও, তথাকথিত উচ্চ জাতীয় ব্যক্তিরাই ইহার কর্ণধার। আত্মীয়পোষণ প্রবৃত্তি তাঁহাদের মধ্যে এতই বলবতী যে, অন্যান্য জাতির আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবার ও তাহাদের ন্যায্য অধিকার লাভ করিবার সুযোগ সুবিধা খুবই কম। স্বাধীন ভারতে যতদিন জাতিভেদ প্রথা লোপ না পায়, ততদিন দেশীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট সঙ্ঘবদ্ধভাবে আবেদন নিবেদন করিয়া নিজেদের অধিকার আদায় করিবার নিমিত্ত যোগিজাতিকে কেন্দ্রীভূত শক্তি নিয়োগ করিতে হইবে—ইহাই নরেন্দ্রবাবুর সুচিন্তিত অভিমত। এই কারণেই তিনি ১৯৫০ সালে প্রাদেশিক বিধান পরিষদের সদস্য-পদপ্রার্থী হইয়াছিলেন।

শ্রীভারতচন্দ্র নাথ, উকিল,

স্বজাতিবৎসল শ্রীভারতচন্দ্র নাথ নোয়াখালি জিলার অন্তর্গত রামগঞ্জ থানার মন্নিমপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ৺রামানন্দ নাথ ও মাতার নাম সুভদ্রা দেবী। তিনি ইংরাজী ১৮৯৬ সালে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় এবং ১৮৯৮ সালে এফ্-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তৎপরে ঢাকা কলেজে বি-এ পড়িবার সময় খৃষ্টান মিশনারীদের পরিচালিত বাইবেলের পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ভারতচন্দ্র কলিকাতা জেনারেল এসেম্বলী কলেজে অবৈতনিক ছাত্র হিসাবে অধ্যয়ন করিবার সুযোগ লাভ করেন। কলেজে পড়িবার সময় ছাত্রাবস্থাতেই তিনি কলিকাতায় জাতীয় আন্দোলনের সৃষ্টি করেন এবং জীবনের ভবিষ্যৎ উন্নতির আশায় জলাঞ্জলি দিয়া ঐ আন্দোলনেই জড়িত হইয়া পড়েন। ছাত্রজীবনে তিনি যে ত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন ও স্বজাতি-প্রাণতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা সত্যই অতুলনীয়। প্রধানতঃ এই দুইটি

গুণ ভারতচন্দ্রের চরিত্রে অদ্যাপি উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার স্বজাতি-বৎসলতার দুইটী দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদত্ত হইল।

কুমিল্লা জজ্ আদালতের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল ৺নীলকৃষ্ণ দেবনাথ মহাশয়ের ভাগিনেয় চন্দ্রকান্ত দেবনাথ মহাশয় দারোগাগিরি পরীক্ষার অনুমতির জন্য ১৮৯৯ সালে কুমিল্লার ম্যাজিষ্ট্রেট হ্যারিস সাহেবের নিকট দরখাস্ত করেন। দুঃখের বিষয় সাহেব তথাকথিত উচ্চজাতীয় কতিপয় হিংসাপরায়ণ উকিল-মোক্তারের কু-পরামর্শে বিভ্রান্ত হইয়া চন্দ্রকান্ত 'যুগী' জাতীয় সুতরাং অসম্ভ্রান্ত এই মিথ্যা অজুহাতে তাঁহার দরখাস্ত অগ্রাহ্য করেন। সাপ্তাহিক বসুমতী পত্রিকায় প্রকাশিত এই সংবাদ ভারতচন্দ্রের দৃষ্টিগোচর হইলে তিনি বিচলিত হইয়া পড়েন। তিনি ম্যাজিষ্ট্রেটের এই অন্যায় আদেশের প্রতিবাদকল্পে কলিকাতার ভবানীপুর, শ্যামবাজার, চীনাবাজার প্রভৃতি অঞ্চলের বিশিষ্ট স্বজাতীয়গণকে আহ্বান করিয়া সুবিখ্যাত পদ্মচন্দ্র নাথ মহাশয়ের পুত্র চন্দ্র-কুমার নাথ মহাশয়ের বাড়ীতে এক সভায় অধিবেশন করেন। হ্যারিস সাহেবের আচরণের এবং কুমিল্লার অভিজাত সম্প্রদায়ের ব্যবহারের নিন্দা ও সমালোচনা করিয়া যে সকল প্রস্তাব এই সভায় গৃহীত হয়, তিনি তাহার প্রতিলিপি বাঙ্গালার ছোট লাট সাহেবের সমীপে এবং বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানের স্বজাতীয় বিশিষ্ট গণ্যমান্য ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণের নিকট ক্রমাগত পাঠাইয়া তুমুল আন্দোলন আরম্ভ করিয়া দিলেন। তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টায় স্বজাতিবহুল নানাস্থানে প্রতিবাদ-সভার অধিবেশন হইল এবং ঐ সকল সভায় গৃহীত প্রস্তাবাবলীর নকল লাট সাহেবের দরবারে পড়িতে লাগিল। ইহার ফলে ছোট লাট সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেট হ্যারিস সাহেবের আদেশ নাকচ করিয়া দিয়া চন্দ্রকান্ত দেবনাথকে দারোগাগিরি পরীক্ষা দিবার অনুমতি দিলেন। ভারতচন্দ্রের ছাত্রজীবনের আন্দোলন এইরূপে সাফল্যমণ্ডিত হইল।

গভর্ণমেণ্টের লোকগণনা (সেন্সাস্ অপারেশন) উপলক্ষেও জাতির মান

মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ভারতচন্দ্র কম চেষ্টা ও পরিশ্রম করেন নাই। ইংরাজ আমল হইতে প্রতি দশ বৎসর অন্তর ভারতে লোক-গণনা চলিয়া আসিতেছে। ইংরাজী ১৮৯১ সালের ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী লোকগণনার বিবরণীতে সমস্ত জাতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়। ঐ সকল বিবরণীতে যোগিজাতি নিকৃষ্ট জাতি বলিয়া বর্ণিত এবং এই জাতি সম্বন্ধে অনেক গ্লানিজনক ও মিথ্যা বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। এই কারণে যোগিজাতির মধ্যে বিষম চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। সুতরাং ১৯০১ সালের সেন্সাস্ উপলক্ষে ভারতচন্দ্র প্রসিদ্ধ সমাজসংস্কারক বিষ্ণুচন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য, ডাক্তার জগচ্চন্দ্র নাথ, এল, এম্, এস্, ভবানীপুর নিবাসী অটলচন্দ্র নাথ, 'যোগিহিতৈষিণী' সভার সদস্যগণ এবং কলিকাতার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সহযোগে রিজলী সাহেবের 'জাতিমালা' সংশোধনের জন্য এক মুদ্রিত আবেদন-পত্র সেন্সাস্ কমিশনার রিজলী সাহেবের সমীপে প্রেরণ করেন এবং যোগিজাতির নামের ঘরে 'যুগী' শব্দের পরিবর্ত্তে 'যোগী' এবং স্ত্রীলোকদিগের উপাধি 'দেবী' লিখিবার আদেশের জন্য বঙ্গদেশের লাট সাহেবের এবং সেন্সাস্ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট গেইট সাহেবের নিকট মেমোরিয়াল দাখিল করেন। তিনি শুধু ইহাতেই ক্ষান্ত থাকেন নাই। অনুরূপ আবেদন-পত্র ও মেমোরিয়াল সেন্সাস্ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট পাঠাইবার জন্য তিনি বঙ্গ ও আসামের বহু গণ্যমান্য ও শিক্ষিত ব্যক্তির সহিত অক্লান্তভাবে পত্রালাপ করিতে লাগিলেন। সুখের বিষয় ভারতচন্দ্রের চেষ্টা ফলবতী হইল। যোগিজাতির নামের ঘরে "যোগী" এবং তাহাদের স্ত্রীলোকের "দেবী" উপাধি লিখিবার আদেশ পাওয়া গেল। এইরূপে ভারতচন্দ্র জীবনের ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া স্বজাতির সেবা করিয়া আসিতেছেন।

ভারতচন্দ্র একনিষ্ঠ সমাজসেবক, নীরব কর্ম্মী ও অমায়িক ভদ্রলোক। লোকগণনা উপলক্ষে যোগিজাতির শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিবার জন্য তাঁহাকে অনেক পুরাতত্ত্বের আলোচনা করিতে হয়। এই আলোচনার ফলে তিনি

যোগিসখা পত্রিকায় যোগিজাতি সম্বন্ধে প্রত্নতাত্ত্বিক প্রবন্ধ ধারাবাহিক প্রকাশ করিতে সমর্থ হন। জাতিসেবার এই পুরস্কারস্বরূপ সমগ্র যোগিজাতি তাঁহাকে আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনীর নবম বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি নির্ব্বাচন করিয়া তাহাকে সম্মানিত করিয়াছিলেন। ১৩২৫ বঙ্গাব্দের ২রা কার্ত্তিক কলিকাতা রামমোহন লাইব্রেরী হলে এই অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৪৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে তিনি সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন। বঙ্গ-বিভাগ সত্ত্বেও তিনি বাসস্থান পরিত্যাগ করেন নাই। এখনও তিনি লক্ষ্মীপুরে ওকালতি ব্যবসায় করিয়া স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জন করিতেছেন। এই বৃদ্ধবয়সেও তিনি স্বজাতির কল্যাণকামনায় রত আছেন এবং স্বজাতীয় নেতৃগণের সহিত সংযোগ-সূত্র অক্ষুণ্ণ রাখিয়া জাতিসেবার প্রেরণা যোগাইতেছেন। সমাজসংস্কার ও জাতিগঠন কার্য্যে আমরা ভারতচন্দ্রের অপরিমেয় অবদান বিস্মৃত হইতে পারিব না। "সেই ধন্য নরকুলে লোকে যারে নাহি ভুলে"।

শ্রীইন্দুভূষণ নাথ

২৪ পরগণা জেলার বসিরহাট টাউনের নিকটবর্ত্তী আড়বালিয়া নামক গ্রামে ১২৮৮ সালের ২৪শে পৌষ তারিখে একটি সাধারণ গৃহস্থ ঘরে শ্রীইন্দুবাবু জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে পড়াশুনার দিকে তাঁহার খুব আগ্রহ ছিল। অতি অল্প বয়সেই তিনি রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণ পাঠ সমাপ্ত করেন এবং প্রাথমিক ও মধ্য-বাঙ্গালা পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া তাহার তিন বৎসরের মধ্যে তদানীন্তন বাঙ্গালার উচ্চতম নর্ম্মাল ত্রৈবার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তারপর তিনি ইংরাজী পড়িবার সঙ্কল্প করেন; কিন্তু তখনকার এফ-এ পর্য্যন্ত পড়িয়া পারিবারিক নানা অসুবিধার জন্য পড়া ছাড়িতে বাধ্য হন। ঐ সময়ে কলিকাতার একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে তাঁহার বিবাহ হয় এবং তিনি গার্হস্থ্য-জীবনে প্রবিষ্ট হন। কর্ম্ম-জীবনের প্রথম হইতেই তিনি শিক্ষকতা কার্য্যে ব্রতী

হন। তাঁহার কাব্যানুরাগে মুগ্ধ হইয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে বোলপুর শান্তিনিকেতনে শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন; কিন্তু পারিবারিক কারণে ইন্দুবাবু আশ্রমে বাস করিতে অসমর্থ হওয়ায় উক্ত পদ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তথাপি রবীন্দ্রনাথের অনুগ্রহে দীর্ঘদিন যাবৎ তাঁহার আশ্রমিক বিদ্যালয়ের সহিত ইন্দুবাবুর যোগ ছিল এবং সেখানেই মহাত্মা গান্ধীর সহিত তাঁহার আলাপ করিবার সুযোগও ঘটিয়াছিল। তিনি কিছুদিন যাবৎ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সদস্য ছিলেন এবং বাঙ্গালায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সঙ্কলন-বিভাগে প্রায় আট বৎসর নিযুক্ত ছিলেন। এই সময়ে লর্ড কার্জ্জন কর্ত্তৃক বঙ্গ-বিভাগের ফলে যে আন্দোলন সুরু হয়, ইন্দুবাবু তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া পড়েন এবং ঐ সময়কার বিপ্লবীগণের সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে। সুবিখ্যাত বিপ্লবী স্বর্গীয় রাসবিহারী বসু ছিলেন তাঁহার সহপাঠী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু। শিক্ষকতা নির্দ্দোষ ও পবিত্র বৃত্তি হইলেও উহাতে উদরান্নের সংস্থান হওয়া কঠিন। এই কারণে ইন্দুবাবু শিক্ষকতা ছাড়িয়া কোন ব্যবসায় অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করেন। এই সময়ে স্বর্গীয় পি. সি. রায় মহাশয়ের সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে এবং তাঁহারই প্রেরণায় ব্যবসা-বাণিজ্য দ্বারা অর্থোপার্জ্জনে তাঁহার আগ্রহ জন্মে। সেই কারণে তিনি শিক্ষকতা পরিত্যাগ করিয়া হাজারিবাগ জিলার কোদারমা নামক স্থানে অভ্র ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ঐ সময়ে প্রথম মহাযুদ্ধের সুযোগে তাঁহার সেই ব্যবসায়ে বেশ উন্নতি হয়। তখন ঐ ব্যবসায়টিকে লিমিটেড কোম্পানীতে পরিণত করিয়া তিনি তাহার ম্যানেজিং ডিরেক্টর নিযুক্ত হন। কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যে বিশ্বব্যাপী মন্দার জন্য তাঁহার কারবার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়ে; সুতরাং তিনি কারবারটি হস্তান্তর করিতে বাধ্য হন। অতএব তাঁহাকে আবার শিক্ষকতা অবলম্বন করিতে হয়। সম্প্রতি তিনি শিক্ষকতা হইতে অবসরগ্রহণ করিয়াছেন। বিদায় উপলক্ষে বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ ও ছাত্রবৃন্দ তাঁহাকে বিশেষ সুখ্যাতিপূর্ণ বিদায়সম্বর্দ্ধনা-পত্র দান করিয়াছেন।

অতি অল্প বয়সেই তিনি যোগিজাতির অনুন্নত অবস্থা লক্ষ্য করিয়া নিরতিশয় ব্যথা অনুভব করিতেন। সেইজন্য তিনি ছাত্রাবস্থায় যোগিজাতির উন্নতিকর আন্দোলনের অন্যতম প্রবর্ত্তক স্বর্গীয় বিষ্ণুচন্দ্র নাথ মহাশয়ের পরিচয় লাভ করিয়া স্বজাতিসেবার সুযোগ অন্বেষণ করেন। তাঁহারই প্রভাবে ইন্দু-বাবুর অন্তরে স্বজাতিপ্রীতির সঞ্চার হয়। তদবধি তিনি তৎকালীন বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের ও উদীয়মান ছাত্র-নেতৃগণের সহিত মিলিত হইয়া যোগিজাতির নানা হিতানুষ্ঠানে নিরত থাকেন। তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টায় রাধাগোবিন্দবাবু, নরেন্দ্রবাবু, পাঁচকড়িবাবু প্রভৃতি তদানীন্তন কলিকাতাবাসী ও প্রবাসী যোগিজাতির ছাত্রগণ একত্র হইয়া বঙ্গীয় যোগিহিতৈষিণী সভার ছাত্রবিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। রাধাগোবিন্দবাবু ইহার সভাপতি, নরেন্দ্রবাবু সহঃ সভাপতি ও ইন্দুবাবু সম্পাদক মনোনীত হন। তারপর রাধাগোবিন্দবাবু ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া কুমিল্লায় গমন করেন এবং ১৩১৭ সালে আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠা করিয়া জাতির উন্নয়ন আন্দোলন প্রচলন করিতে উৎসাহী হন। ইন্দুবাবু প্রথম হইতেই সম্মিলনীর সদস্য ও বিশিষ্ট কর্ম্মী নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

ইতিপূর্ব্বে ১৩১১ সালে স্বর্গীয় অরবিন্দবন্ধু নাথ মহাশয় তাঁহার কর্ম্মস্থান পশ্চিম অঞ্চলের বালিয়া জিলা হইতে "যোগিসখা" পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রকাশ করিতে থাকেন। মোহাচ্ছন্ন জাতির মধ্যে জাগরণ আনয়ন করাই ছিল এই পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য। ইন্দুবাবু উক্ত পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষ হইতেই উহাতে সুচিন্তিত প্রবন্ধ ও কবিতা নিয়মিত ভাবে লিখিতে থাকেন। প্রায় একই সময়ে "যোগিসখা" ও সম্মিলনীর মুখপত্ররূপে "সম্মিলনী" পত্রিকা প্রকাশিত হইতে লাগিল। ইহার ফলে যোগিসখার প্রতিষ্ঠাতা অরবিন্দ-বাবুর ও সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠাতা রাধাগোবিন্দবাবুর মধ্যে সময় সময় যে মতভেদ দৃষ্ট হইত তাহা সমগ্র জাতির উন্নতির পরিপন্থী বিবেচিত হওয়াতে ১৩২৫ সালে

কলিকাতায় আহূত সম্মিলনীর নবম অধিবেশন উপলক্ষে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের আন্তরিক চেষ্টায় উভয় পক্ষের মধ্যে বিদ্যমান মতভেদ বিদূরিত হইলে যোগি-সখাই সম্মিলনীর মুখপত্ররূপে গৃহীত হয়। এই মিলন-চেষ্টায় ইন্দুবাবু প্রধান অংশ গ্রহণ করেন। নূতন ব্যবস্থাক্রমে নরেন্দ্রবাবু পত্রিকার তত্ত্বাবধায়ক, স্বর্গীয় অম্বিকাবাবু সম্পাদক ও ভবেন্দ্রবাবু কার্য্যাধ্যক্ষ মনোনীত হন। ইহার কিছুদিন পর পত্রিকা-সম্পাদক অম্বিকাবাবু পত্রিকা-সম্পাদনের সম্পূর্ণ ভার ইন্দুবাবুকে অর্পণ করিয়া প্রচার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। ইন্দুবাবুও বিশেষ দক্ষতার সহিত পত্রিকা সম্পাদকের কার্য্য করিতে থাকেন। এতদিন যোগিসখা পত্রিকায় শুধু সামাজিক প্রবন্ধ আলোচনাই প্রকাশিত হইত, রাজনৈতিক আলোচনার স্থান ইহাতে ছিল না। ইহার মূলে ছিল নরমপন্থী সমাজ-নেতৃগণের কুণ্ঠা ও ভয়। পত্রিকাখানিকে যুগোপযোগী করিবার জন্য ইন্দুবাবু সম্মিলনীর ত্রয়োদশ বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতিরূপে প্রদত্ত অভিভাষণে সম্মিলনী ও পত্রিকায় রাষ্ট্রনৈতিক আলোচনা আরম্ভ করিবার প্রয়োজনীয়তা সমর্থন করেন। তদনুসারে বরিশালে সম্মিলনীর চতুর্দ্দশ অধিবেশনে বিশেষ তর্কবিতর্কের পর সম্মিলনী ইন্দুবাবুর উক্ত সঙ্গত ও সময়োপযোগী প্রস্তাব গ্রহণ করেন। যুবক-গণ জাতির মেরুদণ্ড ও ভাবী আশা-ভরসার স্থল হইলেও সম্মিলনীর অধিবেশনে স্বাধীন মত ব্যক্ত ও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবার তাঁহাদের তেমন সুযোগ সুবিধা ছিল না। রক্ষণশীল প্রবীণ নেতৃগণ যেন তরুণদিগকে এড়াইয়া চলিবারই চেষ্টা করিতেন। কিন্তু জাতির কার্য্যে অংশ গ্রহণ করিবার জন্য তরুণচিত্ত ক্রমশঃই উদগ্রীব ও আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিল। সুতরাং আমাদের তরুণগণ ১৩৩৬ সালে ইন্দুবাবুর একান্ত চেষ্টায় আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনীর সহযোগীরূপে আসাম-বঙ্গ যোগি-যুবসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করেন। পত্রিকা-সম্পাদনে ও সম্মিলনীর কার্য্যে তিনি বিশেষ দক্ষতা, বুদ্ধিমত্তা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠতার পরিচয় দিয়া সকলের সম্মান-ভাজন হইয়াছিলেন। এই জন্য সম্মিলনীর কার্য্যশৃঙ্খলার জন্য নিয়মাবলী

রচনা করিবার ভার যোড়শ বার্ষিক অধিবেশনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে ইন্দুবাবুর উপর অর্পণ করা হয়। তাঁহারই রচিত নূতন নিয়মাবলী ১৩৩৫ সালে খুলনার ঊনবিংশ অধিবেশনে পরিগৃহিত হয়। অদ্যাবধি সেই নিয়মাবলী অনুসারেই সম্মিলনীর কার্য্য পরিচালিত হইতেছে। ইন্দুবাবু বিশেষ যোগ্যতার সহিত পত্রিকা-সম্পাদকের কর্ত্তব্য পালন করিতে থাকিলেও পত্রিকায় স্বাধীন মতামত প্রকাশ প্রসঙ্গে কোন কোন বিশিষ্ট নেতার সহিত তাঁহার মতভেদ ঘটে। তজ্জন্য স্বাধীনচেতা ইন্দুবাবু পত্রিকা-সম্পাদকের পদ পরিত্যাগ করেন। ইহার পর সম্মিলনীর কার্য্যে আর বিশেষ অসুবিধা ঘটে নাই। ১৩৩৮ সালে সম্মিলনীর চৌমুহানী অধিবেশনে বিধবা-বিবাহ সম্পর্কে রক্ষণশীল ও সংস্কারপন্থী নেতৃগণের মধ্যে যে বিষম মতভেদ ঘটে তাহা সমাজের সর্ব্ব শরীরে ব্যাপৃত হইয়া পড়াতে যে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয় তাহাতে সকলেই সন্ত্রস্ত হইয়া উঠেন। সুখের বিষয় ধৈর্য্যশীল ও শান্তিপ্রিয় ইন্দুবাবু কতিপয় বিশিষ্ট নেতার সহায়তায় এই অপ্রীতিকর ব্যাপারের স্থায়ী মীমাংসা করিতে সমর্থ হন।

ইন্দুবাবু দরিদ্র ছিলেন; সুতরাং তিনি দরিদ্র স্বজাতির দুঃখদুর্দ্দশা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া স্বজাতিসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। দীর্ঘকাল যাবৎ স্বজাতির সেবা করিয়া বর্ত্তমানে তিনি বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহার সহকর্ম্মিগণের মধ্যে কেহ পরলোকগত হইয়াছেন, কেহ অবসর গ্রহণ করিয়াছেন এবং কেহ উদাসীন হইয়া রহিয়াছেন; কিন্তু তিনি অদ্যাবধি সম্মিলনী ও পত্রিকার সহিত যোগসূত্রটী অবিচ্ছিন্ন রাখিয়া চলিতেছেন।

শ্রীক্ষেত্রনাথ দালাল, এম-এ, বি-এল

যে সকল কৃতী সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়া জাতিমাতৃকার ক্রোড় অলঙ্কৃত করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে শ্রীক্ষেত্রবাবুর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি বঙ্গাব্দ ১২৯৭।২১শে অগ্রহায়ণ এবং ইংরাজী ১৮৯০।৬ই ডিসেম্বর তারিখে

নোয়াখালি জিলার অন্তর্গত কোয়াবিয়া নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম শ্রীনবকুমার দালাল এবং মাতার নাম শ্রীসন্ধ্যামালা দেবী।

বাল্যকালে ক্ষেত্রনাথ বিদ্যানুরাগী ও প্রতিভাশালী ছাত্র ছিলেন। স্থানীয় মধ্যবাঙ্গালা বিদ্যালয়ে তাঁহার বিদ্যারম্ভ হয়। ১৯০৬ সালে তিনি মধ্যবাঙ্গালা পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তিলাভ করিয়া প্রথমতঃ নোয়াখালি জিলা স্কুলে ভর্ত্তি হন এবং সেখানে অষ্টম শ্রেণী পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া কুমিল্লা জিলা স্কুলে পড়িতে আরম্ভ করেন। কুমিল্লা হইতে ক্ষেত্রনাথ ১৯১১ সালে ম্যাট্রিকিউলেশন পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া মাসিক ২০৲ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হন। অতঃপর ঢাকা কলেজ হইতে ১৯১৩ সালে প্রথম বিভাগে আই-এ পরীক্ষায় এবং ১৯১৫ সালে অর্থশাস্ত্রে সম্মানের সহিত বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মাসিক ৩০৲ টাকা বৃত্তিলাভ করেন। প্রবাদ আছে— "Success begets success." ছাত্রজীবনে এইরূপ অভাবনীয় সাফল্য লাভে ক্ষেত্রনাথ যে খুবই আনন্দিত ও উৎসাহিত হইয়াছিলেন এবং ভাগ্যদেবীও যে এই উদ্যোগী ও প্রতিভাবান্ ছাত্রের সম্মুখে তাহার ভবিষ্যজ্জীবনের এক উজ্জ্বল গৌরবময় আলেখ্য আঁকিয়া ধরিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। জীবনালেখ্যের এই উজ্জ্বল চিত্র সন্দর্শনে পুলকিত ও আশান্বিত যুবকের পাঠানুরাগ উত্তরোত্তর বাড়িয়া গেল এবং জীবনে উন্নতি সাধনের বলবতী স্পৃহা তাঁহাকে উদ্বোধিত করিল। অতএব তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। ১৯১৭ সালে ঢাকা কলেজ হইতে অর্থশাস্ত্রে এম-এ পরীক্ষায় এবং ১৯২০ সালে বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি ছাত্রজীবনের শেষ করিয়া কর্ম্মজীবনের পথ খুঁজিতে লাগিলেন। আমরা দেখিতেছি— তিনি বি-এ ও এম-এ উভয় পরীক্ষাতেই অর্থশাস্ত্র পাঠ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। অর্থনীতির দিক দিয়া দেশের সেবা করিবার পরিকল্পনা তাঁহার এই পাঠ্য-বিষয় নির্ব্বাচনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল বলিয়া অনুমিত হইতেছে। সুনির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্যবিহীন ব্যক্তি

জীবনে উন্নতিলাভে সমর্থ হয় না। কথিত আছে— "A man without ambition is but a helm without rudder." আশা-উদ্দেশ্যহীন মানুষ জীবন সমুদ্রে শুধু ভাসিয়া বেড়ায়— কূল পায় না।

বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ক্ষেত্রনাথ নোয়াখালি জজকোর্টে ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন। নোয়াখালি স্বজাতিবহুল জিলা। এই জিলায় প্রায় ৬৫ হাজার যোগিজাতির বাস। তাঁহাদের অধিকাংশই বস্ত্রব্যবসায়ী ও বস্ত্র-উৎপাদনকারী। দরিদ্র বস্ত্রবয়নকারীরা প্রচুর পরিমাণে যে বস্ত্র উৎপাদন করিত তাহার লভ্যাংশের অধিকাংশই যাইত মুনাফাখোর মহাজনের ঘরে। সুতরাং তাঁহাদের দারিদ্র্যের সমাধান হইত না। বস্ত্রবয়নকারীদের নিকট উচ্চমূল্যে সূতা ও রং বিক্রয় করিয়া এবং অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে তাহাদের উৎপাদিত বস্ত্র ক্রয় করিয়া মহাজনেরা লাভবান্ হইত; কিন্তু বস্ত্রশিল্পীগণের অসচ্ছলতা থাকিয়াই যাইত। বলা বাহুল্য মূলধনের একান্ত অভাবই স্বজাতীয়গণের এই অসচ্ছলতার মূলীভূত কারণ। তাহাদের দুঃখ দুর্গতি নিবারণকল্পে এবং বস্ত্রব্যবসায়ের সুনিয়ন্ত্রণ উদ্দেশ্যে কতিপয় স্বজাতিহিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি চৌমুহানী নাথ সমিতি এবং এইরূপ কয়েকটী অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলেন। ইহাতে বয়নজীবী স্বজাতীয়গণের কিঞ্চিৎ উপকার সাধিত হইলেও প্রকৃত সমস্যার সমাধান হয় নাই। অর্থনীতিবিদ্ ক্ষেত্রনাথ ইহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন; সুতরাং দরিদ্র স্বজাতীয়গণের দুঃখদুর্দ্দশা নিবারণের মুখ্য উদ্দেশ্য লইয়া তিনি কতিপয় স্বজাতিনিষ্ঠ ও প্রতিষ্ঠাবান্ ব্যক্তির সহায়তায় ও সহযোগিতায় ১৯২৬ সালে নোয়াখালি টাউনে নোয়াখালি নাথব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করেন এবং তিনিই উহার ম্যানেজিং ডিরেক্টর নির্ব্বাচিত হন। সে দিন নোয়াখালিবাসী যোগিজাতির মধ্যে যে আশা, আনন্দ ও উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছিল তাহা অভূতপূর্ব্ব। ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সকলেই অবস্থানুসারে এই ব্যাঙ্কের অংশ ক্রয় করিয়া এবং কত আশা আকাঙ্ক্ষা লইয়া ইহার ভিত্তি

স্থাপন করিয়াছিল। এই ব্যাঙ্কপ্রতিষ্ঠা দিবসটী যোগিজাতির ইতিহাসে একটা স্মরণীয় দিন। ব্যাঙ্কটী সগৌরবে দণ্ডায়মান থাকিলে ইহার প্রতিষ্ঠা দিবসটি সমুজ্জল অক্ষরে জাতির ইতিহাসে লিখিত থাকিত। ব্যাঙ্কের ক্রমোন্নতিতে উৎসাহিত হইয়া ইহার পরিচালকবর্গ এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর ক্ষেত্রবাবু ১৯২৬ সালের ৪ঠা নবেম্বর তারিখে ভারতের শ্রেষ্ঠ বাণিজ্য কেন্দ্র কলিকাতায় ইহার একটী শাখার প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই সময় হইতে ক্ষেত্রবাবু ওকালতি ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া ব্যাঙ্কের কার্য্যেই আত্মনিয়োগ করিলেন। তিনি বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন— শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতিসাধন ব্যতিরেকে দেশের অর্থসমস্যার সমাধান হইবে না এবং প্রচুর অর্থ ব্যতীত শিল্প-বাণিজ্যের পুষ্টিসাধনও সম্ভবপর নহে। এই কারণেই বোধ হয় তিনি ব্যাঙ্ক-জগতে নিজের কর্ম্মক্ষেত্র বাছিয়া লইয়াছিলেন। যিনি যে ভাবে দেশের ও সমাজের সেবা করেন, তিনিই আমাদের নমস্য। দেশের আর্থিক উন্নতি সাধনই যখন ব্যাঙ্কারের মুখ্য উদ্দেশ্য, তখন ব্যাঙ্কারও আমাদের নমস্য।

কলিকাতা মহানগরীতে ১৩৫নং ক্যানিং ষ্ট্রীটে নোয়াখালি নাথ ব্যাঙ্কের শাখা প্রতিষ্ঠিত হইল। অল্প দিনের মধ্যেই ব্যাঙ্ক যখন মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে সমর্থ হইল, তখন ব্যাঙ্কের পরিচালকবর্গ উহার 'নাথ ব্যাঙ্ক' নামকরণ করিয়া উহাকেই হেড অফিসে পরিণত করিলেন। পরিচালকবর্গের বিশেষতঃ ম্যানেজিং ডিরেক্টর ক্ষেত্রবাবুর কার্য্যনৈপুণ্যে নাথ ব্যাঙ্ক শীঘ্রই প্রসার-প্রতিপত্তি লাভ করিয়া তপশীলভুক্ত দেশীয় ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার পূর্ব্বক সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিল। সেই গৌরবময় দিনে নাথ ব্যাঙ্ক মধ্যাহ্ন-ভাস্করের ন্যায় নিজের সুনাম-সুখ্যাতির অজস্র কিরণধারা চারিদিকে ছড়াইয়া দিল। ম্যানেজিং ডিরেক্টর ক্ষেত্রবাবুও ব্যাঙ্ক জগতে সমধিক প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া সর্ব্বজন পরিচিত হইয়া উঠিলেন। নাথ ব্যাঙ্কের দ্রুত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা, আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্য প্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশের বিভিন্ন

বাণিজ্য-কেন্দ্রে ইহার শাখা প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহাতে আমরা ক্ষেত্রবাবুর অসাধারণ সংগঠনী শক্তির ও কার্য্যতৎপরতার পরিচয় পাইয়া থাকি। অচির-কাল মধ্যে নাথ ব্যাঙ্ক এতই জনপ্রিয়তা অর্জ্জনে সমর্থ হইল যে উহার আদায়ীকৃত মূলধন ৫৪ লক্ষ টাকা এবং মোট আমানত ১০ কোটী টাকার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

দেশে শিল্প-বাণিজ্য গড়িয়া তুলিতে হইলে বা শিল্পবাণিজ্যের প্রতিষ্ঠানগুলির পরিপুষ্টি সাধন করিতে হইলে সুপরিচালিত ব্যাঙ্কের নিতান্ত প্রয়োজন। ক্ষেত্রবাবু চিরপোষিত পরিকল্পনা রূপায়িত করিবার জন্য নাথ ব্যাঙ্কের সহায়তায় লিলুয়া নামক স্থানে ইউনাটেড আয়রন্ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানির প্রতিষ্ঠা করিয়া উহার ম্যানেজিং ডিরেক্টর রূপে বিশেষ দক্ষতার সহিত কোম্পানির কার্য্য পরিচালনা করেন। উক্ত কোম্পানির সম্পত্তির মূল্য ৫০ লক্ষ টাকার উর্দ্ধে। অধুনা ইন্সিওরেন্স কোম্পানির প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা কাহারও অজানা নাই। ভারতের ন্যায় দরিদ্র দেশে ইহার প্রয়োজনীয়তা সমধিক। মধ্যবিত্ত জনসাধারণের মধ্যে সঞ্চয়স্পৃহা জন্মাইবার প্রধান উদ্দেশ্যে ক্ষেত্রবাবু কলিকাতায় ন্যাশনেল সিটি ইন্সিওরেন্স কোম্পানির প্রতিষ্ঠা করিয়া অর্থনীতিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করেন। তিনিই উহার তত্ত্বাবধায়ক বা ম্যানেজিং ডিরেক্টর নির্ব্বাচিত হন। ইষ্টার্ণ চেম্বার অব্ কমার্সের প্রতিষ্ঠা ক্ষেত্রবাবুর অন্যতম কীর্ত্তি। বাণিজ্য-জগতের সহিত সংযোগসূত্র স্থাপন এবং শিল্প-বাণিজ্যের মালিক ও পরিচালকগণের সহিত ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই তিনি চেম্বার অব কমার্সের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য ছিল নাথ ব্যাঙ্কের প্রসার-বৃদ্ধি ও উহার অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন। উহাতে আরও পরিচয় পাই আমরা ক্ষেত্রবাবুর অসাধারণ প্রতিভার ও দূরদর্শিতার।

ক্ষেত্রবাবুর সমাজসেবাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দুঃস্থ-দুর্গত ও বিপন্নের উদ্ধার সাধনে তিনি সর্ব্বদাই অগ্রসর হইতেন। ১৯৪৬ সালে সাম্প্রদায়িক

দাঙ্গার ফলে যখন নোয়াখালি জিলার জনসাধারণ উৎপীড়িত ও উৎখাত হইয়াছিল, তখন তিনি "নোয়াখালি আর্ত্তত্রাণ এবং পুনর্বসতি" কমিটীর প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাহার প্রেসিডেণ্টরূপে লক্ষাধিক টাকা সংগ্রহপূর্ব্বক কমিটীর ফাণ্ডে অর্পণ করেন। জাতির জনক মহাত্মাজী দাঙ্গাবিধ্বস্ত অঞ্চল পরিদর্শন মানসে নোয়াখালি গমন করিলে ক্ষেত্রবাবু তাঁহার নোয়াখালি পরিক্রমার সুব্যবস্থা করিতে সহায়তা করেন এবং দাঙ্গাপীড়িত জনগণের সাহায্যার্থে ও পুনর্ব্বসতিকল্পে ৫৪ হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া মহাত্মাজীর হস্তে সমর্পণ করিয়া সকলের প্রশংসাভাজন হন।

জাতি ও সমাজগঠনে শিক্ষার সমধিক প্রচলন একান্ত আবশ্যক বুঝিয়া ক্ষেত্রবাবু নোয়াখালি জিলার প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র চৌমুহানি নামক স্থানে প্রথম শ্রেণীর কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে উহার কার্য্যপরিচালক সমিতির প্রেসিডেণ্ট মনোনীত হন। নোয়াখালি জিলার সর্ব্বত্র দুর্ভিক্ষ রোধকল্পে তিনি লক্ষাধিক টাকা সংগ্রহ করিয়া "চৌমুহানি কলেজ আর্ত্তত্রাণ ভাণ্ডার" স্থাপনপূর্ব্বক জনসাধারণের কল্যাণসাধন করেন।

উপরোক্ত উদাহরণসমূহ হইতে আমরা অনুমান করিতে পারি যে, ক্ষেত্রবাবু ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার সর্ব্ববিধ উদ্দেশ্য সাধনে যত্নপর হইয়াছিলেন। ব্যাঙ্কের সাহায্যে তিনি নানাবিধ কল্যাণকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে বিরত হন নাই। দুঃস্থ ও আর্ত্তের দুঃখ নিবারণ, দরিদ্র মেধাবী ছাত্রকে বৃত্তি দান, শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি বিধানে মূলধন প্রদান ইত্যাদি বহু প্রকার সমাজ ও দেশহিতকর কার্য্যে অর্থ নিয়োজিত করিয়া তিনি ব্যাঙ্কের সার্থকতা সম্পাদন করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন।

নাথ ব্যাঙ্কের গৌরববৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহার প্রতিষ্ঠাতা ক্ষেত্রবাবুও গৌরবভাজন ও সর্ব্বজনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। নাথ ব্যাঙ্ক যোগিজাতির গৌরববৃদ্ধি করিয়াছিল এবং তিনিও উহার প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা হিসাবে সুনাম ও

সুযশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ১৩৫২ বঙ্গাব্দে বরিশাল জিলার অন্তর্গত কাউখালি বন্দরে আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনীর যে ৩৬শ অধিবেশন আহুত হইয়াছিল, যোগিজাতি এই কৃতী ও যশস্বী পুরুষকে তাহার সভাপতি পদে নির্ব্বাচন করিয়া তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সম্মিলনীর স্থায়ী সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি কয়েক বৎসর জাতির সেবায় সম্মিলনীর পরিচালকবর্গের সহযোগিতা করিয়াছিলেন।

শ্রীশরচ্চন্দ্র নাথ, বি-এল

খুলনা জিলার বাগেরহাট মহকুমার অন্তর্গত রহিমাবাদ গ্রামে শ্রীশরচ্চন্দ্র ১৩০৪ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ৺রাইচরণ নাথ ও মাতার নাম ৺সুখদা দেবী। বাল্যকাল হইতেই শরৎবাবুর স্বজাতিসেবার দিকে আগ্রহ পরিদৃষ্ট হইত। লেখাপড়াতেও তিনি উত্তম ছাত্র বলিয়া পরিগণিত হইতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলির প্রত্যেকটীই তিনি প্রথম উদ্যমে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি ১৯১৭ সালে বাগেরহাট স্কুল হইতে ম্যাট্রীক পরীক্ষায়, ১৯১৯ সালে দৌলতপুর কলেজ হইতে আই-এ পরীক্ষায়, ১৯২১ সালে গবর্ণমেন্ট সংস্কৃত কলেজ কলিকাতা হইতে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৯২৫ সালে বিশ্ববিদ্যালয় ল-কলেজ হইতে বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বাগেরহাটে ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন। তের বৎসর ওকালতি করিয়া তিনি কর্ত্তব্যপরায়ণতা, মিষ্টভাষিতা ও অমায়িকতা গুণে প্রসার প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষে আইন ব্যবসায়ে তিনি বীতস্পৃহ হইয়া ব্যবসায়ের দিকে আকৃষ্ট হন। ১৯৩৭ সালে শরৎবাবু বাগেরহাট টাউনে 'সাধনা প্রেসে'র প্রতিষ্ঠা করিয়া দীর্ঘকাল হইতে অনুভূত একটি স্থানীয় অভাব দূর করেন। তিনি আজও বেশ সুনাম ও সুখ্যাতির সহিত উক্ত প্রেস পরিচালনা করিতেছেন। জাতিসেবা তাঁহার জীবনের অন্যতম-প্রধান কর্ত্তব্য। তিনি পাঠদশা হইতেই স্বজাতিহিতকর গঠনমূলক কার্য্যের প্রতি বিশেষ অনুরাগী।

বাগেরহাট নাথ-সমিতির পুনর্গঠন, উহার পরিপুষ্টিসাধন ও সুদক্ষ পরিচালন-কার্য্যে শরৎবাবুর কার্য্যতৎপরতা ও স্বজাতি-হিতৈষিতার পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ, এম-এ, বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয়ের সভাপতিত্বে ১৩৩৫ সালে খুলনা সহরে সম্মিলনীর যে ১৯শ অধিবেশন হইয়াছিল তাহার প্রধান উদ্যোক্তা ও কর্ম্মকর্ত্তাই ছিলেন শরৎবাবু। খুলনা জিলার ব্রাহ্মণরাংদিয়া গ্রামের স্বজাতীয়া বালবিধবা সরোজিনীর হরণকাহিনী যোগিসখার নিয়মিত পাঠকগণ হয়তো স্মরণ করিতে পারেন। অপহৃতা বিধবার উদ্ধারসাধন, ধৃত আসামীগণের বিরুদ্ধে মোকর্দ্দমা পরিচালন এবং মোকর্দ্দমায় জয়লাভ— এই সমস্তই হইয়াছিল শরৎবাবুর প্রাণপণ চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে। যুবক শরৎবাবুর স্বজাতিপ্রাণতা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠতা, অকুতোভয়তা প্রভৃতি গুণে প্রীত ও আকৃষ্ট হইয়া আসাম-বঙ্গ যোগি-যুব-সম্মেলন তাঁহাকে ১৩৪০ সালে চুয়াডাঙ্গা অধিবেশনের সভাপতিপদে বরণ করিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করেন। স্বজাতিহিতকর কার্য্যে শরৎবাবুর উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত উৎসাহ, উদ্যম ও তৎপরতা দেখিয়া আসাম-বঙ্গের যোগিজন-মণ্ডলী তাঁহাকে ১৩৪৮ সালে ঢাকা জিলার অন্তর্গত শিবালয় নামক স্থানে আহূত সম্মিলনীর ৩১শ অধিবেশনের সভাপতি পদে নির্ব্বাচন করিয়া তাঁহার যোগ্যতা ও গুণবত্তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। যাঁহারা কর্ম্মীপুরুষ তাঁহারা কখনও কর্ম্মের চাপে কাতর হন না বা কর্ম্মভয়েও ভীত হন না। অক্লান্তভাবে কর্ম্ম করিয়াও তাঁহারা অবসন্ন হন না, বরং কর্ম্মোন্মাদনাই লাভ করেন। নিজেদের বিশাল ব্যবসায় পরিচালন ও তত্ত্বাবধান করিয়াও শরৎবাবু কখনও স্বজাতি-সেবার সুযোগ হারান নাই বা সময়াভাবের অজুহাত দেখাইয়া কদাপি জাতির প্রতি কর্ত্তব্যসাধনে বিরত থাকেন নাই। তাই বিগত ১৩৪৮ সালে সম্মিলনী পত্রিকা-সম্পাদনের যে দায়িত্ব তাঁহাকে অর্পণ করেন তিনি তাহা হৃষ্টচিত্তেই গ্রহণ করেন এবং ১৩৫৮ সাল পর্য্যন্ত উক্ত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করিয়া সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন।

দেশবিভাগের পূর্ব্বে স্বগ্রামের উন্নতি ও সংস্কার সাধনে এবং জনহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠানে শরৎবাবুর উৎসাহ ও আগ্রহ কম ছিল না। তদীয় গুরুদেবের পরামর্শে ও সহযোগিতায় তিনি নিজগ্রাম রহিমাবাদে 'সুধর্ম্মামঠ' ও গোবিন্দজীর মন্দির ও 'ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করিয়া জনসাধারণের মধ্যে ধর্ম্মভাববৃদ্ধির ও শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা করেন। বড়ই গৌরবের বিষয় হিন্দু-মহাসভার সর্ব্বভারতীয় সুপ্রসিদ্ধ নেতা ডাঃ মুঞ্জে উক্ত মঠ ও মন্দির উদ্বোধন করেন। তারপর আমাদের ছাত্রদের নৈতিক অধঃপতনে মর্ম্মাহত হইয়া ছাত্রসমাজের চারিত্রিক উন্নতিমানসে শরৎবাবু বাগেরহাট টাউনে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের আদর্শে একটি 'ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করিয়া দশ বৎসর পর্য্যন্ত উহার পরিচালনা করেন। তিনি সুবক্তা, উৎসাহী কর্ম্মী ও একনিষ্ঠ সমাজসেবী। রাজনীতিতে তিনি কংগ্রেসপন্থী। তিনি আন্তরিকভাবে কংগ্রেসের সেবা করিয়াছেন। স্থানীয় কংগ্রেসের গঠন ও আন্দোলনমূলক কার্য্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছেন এবং কংগ্রেসের সাম্য ও উদারতার বাণী অনেক সময় গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে প্রচার করিয়া বেড়াইয়াছেন।

অধ্যাপক শ্রীরামচরণ নাথ, এম-এ, বি এল

বরিশাল জিলার কৃষ্ণকাটী গ্রামে একটি সম্ভ্রান্ত মধ্যবিত্ত পরিবারে ১৩০৭ সালের কার্ত্তিক মাসে শ্রীরামচরণ নাথ মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ৺হরিচরণ নাথ মহাশয় অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী, দৃঢ়চেতা ও উদারহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন। শৈশবে নিকটবর্ত্তী পাদ্রী শিবপুর মিশনারী এম-ই স্কুল হইতে কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া রামবাবু বরিশাল সহরে আই-এ পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন এবং প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে বরিশাল ধর্ম্মরক্ষিণী সভা হইতে প্রথম বিভাগে সংস্কৃত কাব্যের আদ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তারপর কলিকাতায় স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ হইতে বি-এ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ (বঙ্গ

সাহিত্যে) ও আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষাতেই তিনি যোগ্যতার পরিচয় দেন।

শৈশব হইতেই সাহিত্যচর্চ্চায় তাঁহার অনুরাগ দেখা যায়। স্কুল ও কলেজ জীবনে বিতর্ক ও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় তিনি বিশেষ শক্তির পরিচয় দেন। এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর, ১৩৩৫ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের একটি বিশেষ রচনা প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইয়া রামবাবু "নারীচরিত্রে কবি হেমচন্দ্র" প্রবন্ধ রচনার জন্য হেমচন্দ্র স্বর্ণপদক এবং "মাইকেলের ছন্দ" প্রবন্ধ রচনার জন্য জ্ঞানশরণ চক্রবর্ত্তী রৌপ্যপদক লাভ করেন। 'প্রবাসী', 'পঞ্চপুষ্প', 'প্রবর্ত্তক', 'বিশ্ববাণী' এবং 'যোগিসখা' পত্রিকায় তাঁহার বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

আইন ব্যবসায়ের প্রতি তাঁহার অন্তরের অনুরাগ না থাকায় রামবাবু বি-এল পাশ করিয়াও অধ্যাপনাকেই জীবনের প্রিয়তম ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। কলিকাতার কতিপয় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে এবং রিপণ কলেজ স্কুলে বাংলা-ভাষা ও সাহিত্যের প্রধান শিক্ষকরূপে তিনি কয়েক বৎসর যোগ্যতার সহিত অধ্যাপনা করেন। অতঃপর যুদ্ধের আতঙ্কে যখন ১৯৪২ সালের শেষভাগে উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর সহরে রিপণ কলেজের শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন রিপণ কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ রামবাবুকে উক্ত শাখা কলেজের বাংলা সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপকরূপে প্রেরণ করেন। তদবধি তিনি দিনাজপুর সুরেন্দ্রনাথ কলেজেই অধ্যাপনাব্রতে নিযুক্ত আছেন। দেশবিভাগের ফলে উক্ত কলেজ ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং সম্প্রতি উহা রাজসাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকাভুক্ত হইয়াছে। দেশবিভাগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রামবাবু দীর্ঘকাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যা-লয়ের অধীনে বাংলাভাষার পরীক্ষক ও প্রধান পরীক্ষকের সহকারী (Scrutiniser) রূপে কাজ করিয়াছেন। অতঃপর তিনি ঢাকা ও রাজসাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ বাংলার পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়া কাজ করিতেছেন।

স্কুল-কলেজে অধ্যয়নকালেই রামবাবু বরিশালের স্বজাতি-সমাজের বহুবিধ

উন্নয়নকার্য্যে ব্রতী হন। বরিশালের উকিল শ্রীযুক্ত হরিচরণ নাথ ও চন্দ্রকুমার নাথ এবং ঝালকাটীর প্রবীণ স্বজাতিপ্রেমিক ৺বঙ্গবিহারী হালদার মহোদয়গণের প্রেরণা, উপদেশ ও পরামর্শই তখন এই তরুণ কর্ম্মীর প্রধান সম্বল ছিল। অতঃপর কলিকাতার বৃহত্তর ক্ষেত্রে একনিষ্ঠভাবে স্বজাতিসেবার সুযোগ লাভ করিয়া তিনি বিশিষ্ট সমাজনেতৃগণের ও কর্ম্মিবৃন্দের সংস্পর্শে আসেন এবং ক্রমশঃ স্বজাতিসেবার উচ্চতর অধিকার লাভ করিতে থাকেন। ১৩৩৮ সালে তিনি সম্মিলনীর নোয়াখালি-চৌমুহানী অধিবেশনে আসাম-বঙ্গ যোগি-যুব-সঙ্ঘের সভাপতিত্ব করেন। উক্ত অধিবেশনে এই তরুণ সভাপতি যে সময়োপযোগী জ্ঞানগর্ভ ভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন তাহা প্রবীণ সমাজপতিগণের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল। এরূপ শান্ত-নম্র, ধীর, চিন্তাশীল ও সুপণ্ডিত কর্ম্মী আমাদের মধ্যে বিরল। তাঁহার চরিত্র-মাধুর্য্য ও কর্ম্মনিষ্ঠতায় প্রীত ও আকৃষ্ট হইয়া যোগিজাতি তরুণ রামবাবুকে ১৩৪৭ সালে সম্মিলনীর ৩০শ বার্ষিক অধিবেশনের (স্থান—রংপুর শাঁখারিপাড়া) সভাপতি নির্ব্বাচন করিয়া তাঁহার প্রতি সমাদর প্রদর্শন করেন। অতঃপর রামবাবু সম্মিলনীর ৩৬শ বার্ষিক অধিবেশনে (বরিশাল কাউখালিতে) অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিত্ব করেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে তিনি যে মৌখিক বক্তৃতা প্রদান করেন তাহা যেমন পাণ্ডিত্যপূর্ণ তেমনি হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। তিনি কয়েক বৎসর "যোগিসখা" পত্রিকার সম্পাদক এবং উক্ত পত্রিকার সম্পাদকীয় বোর্ডের সদস্যরূপেও কাজ করেন। সম্মিলনীর শিক্ষাসচিবরূপেও তিনি কিছুকাল কাজ করিয়াছেন। কলিকাতা যোগিছাত্র সংসদ ও যোগিছাত্র শিক্ষা পরিষদের সঙ্গেও তাঁহার অন্তরঙ্গ যোগ ছিল। কলিকাতায় অবস্থানকালে তিনি আসাম ও বাংলার বিভিন্ন জিলায় স্বজাতি-বান্ধবদের আহ্বানে বহু সভাসমিতিতে যোগদান করিয়া তাহাদের মনে আত্মচেতনা ও আত্মোন্নতি-কামনা জাগাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। সম্মিলনীর বার্ষিক অধিবেশনের কয়েকটীতে তিনি সক্রিয় অংশ

গ্রহণ করিয়া সেই সেই অধিবেশনকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে সহায়তা করিয়াছেন। দীর্ঘদিন যাবৎ তিনি সম্মিলনীর ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্য আছেন।

দিনাজপুর অবস্থানকালে তাঁহারই প্রেরণায় ও উদ্যোগে রংপুর-কোচবিহার-জলপাইগুড়ি যোগিসমিতি, মালদহ যোগিসমিতি এবং দিনাজপুর-পূর্ণিয়া-দার্জ্জিলিং যোগিসমিতি গঠিত ও পরিচালিত হয়।

আমরা বহুবার তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার চিন্তাধারার যে পরিচয় পাইয়াছি তাহাতে মনে হয় তিনি সংস্কারকামী ও প্রগতিবাদী। তিনি সভাপতিরূপে যে সমস্ত ভাষণ প্রদান করিয়াছেন তাহা হইতে আমাদের এই উক্তি সমর্থিত হইতে পারে :—

কাউথালি অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে তিনি বলিয়াছিলেন—"বীর্য্যশুল্কা বসুন্ধরা" অর্থাৎ বিশ্বের যে কোন বড় অধিকার বীর্য্যের দ্বারা, প্রতিভা ও যোগ্যতার দ্বারা অর্জ্জন করতে হয়—'ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ'। ভিক্ষার পথ আরামের ও আয়াসের হ'তে পারে, কিন্তু গৌরবের কোনো কালেই নয়। তারপর উপরোক্ত অভিভাষণেই আবার তিনি বলিয়াছেন—সম্মিলনীর উদ্যম সার্থক হবে জাতিকে গতানুগতিক পন্থা চিনিয়ে দিয়ে নয়—নূতন যুগে কল্যাণ-পথে চলবার সঙ্কেত জানিয়ে দিয়ে। এ যুগে ব্যক্তি হিসাবে বা জাতি হিসাবে বেঁচে থাকতে হ'লে পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ঘটনা প্রবাহের সাথে সমান তালে পা ফেলে চলতে হবে; নইলে পতন ও ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।

তারপর রংপুর-কোচবিহার-জলপাইগুড়ি যোগিসমিতির ২য় বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতিরূপে তিনি যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন তাহাতেও তাঁহার উদার মনোভাবেরই পরিচয় পাওয়া যায় :—

(ক) অখণ্ড ভারতবর্ষে অখণ্ড স্বাধীনতাই আমাদের কাম্য। দেশকে খণ্ডিত করিয়া, একাধিক 'আলষ্টার' সৃষ্টি করিয়া বিদেশীর দুরভিসন্ধি সফল হইতে দেওয়া জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে প্রত্যেক ভারতবাসীর পক্ষেই মহাপাপ বলিয়া আমি জানি।

(খ) আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত—ব্রহ্ম থেকে তৃণগাছি পর্য্যন্ত সকল পদার্থে 'সর্ব্বভূতান্তরাত্মা' ঈশ্বরের অনুভূতি যে ধর্ম্মের মূলমন্ত্র, যে ধর্ম্মে জীবমাত্রেই শিবের প্রতিমা, সেই পরমোদার ধর্ম্ম স্বীকার করিয়া যাহারা মানুষের স্পর্শকে অপবিত্র মনে করে, মানুষের 'প্রাণের ঠাকুর'কে ঘৃণা করে, তাঁহাদের অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য নহে কি? মানুষ হইয়া মানুষকে কুকুরেরও অধম জ্ঞান করিলে ভগবান্ তাহা সহ্য করিবেন কিরূপে? হিন্দুর দুর্গতির মূলে রহিয়াছে এই ঘোর সঙ্কীর্ণতা—এই অমার্জ্জনীয় অপরাধ।

শ্রীপ্রমথনাথ নাথ, বি-এ

আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনীর পরিচালকগণের অন্যতম প্রমথনাথ খুব সম্ভবতঃ বাংলা ১২৯৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে নদীয়া জিলার অন্তর্গত দামুড়হুদা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ৺দীননাথ নাথ ও মাতার নাম জগন্মোহিনী দেবী। তাঁহার পিতার অবস্থা আদৌ সচ্ছল ছিল না। সুতরাং দারুণ দুঃখকষ্টের ভিতর দিয়া তাঁহার বাল্যজীবন অতিবাহিত হয়। লেখাপড়ায় তাঁহার খুব আগ্রহ ছিল। অতএব কঠোর দারিদ্র্যসত্ত্বেও তাঁহার শিক্ষালাভের বাসনা দমিত হয় নাই। অধ্যবসায়, শ্রমশীলতা ও বুদ্ধিমত্তার গুণে তিনি ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে স্থানীয় বিদ্যালয় হইতে মধ্য ইংরাজী পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া জনৈক সদাশয় আত্মীয়ের সাহায্যে চুয়াডাঙ্গা হাই স্কুলে অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। ১৯০৮ সালে চুয়াডাঙ্গা স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া তিনি কলিকাতা সি. এম্. এস্ কলেজে আই-এ ক্লাশে ভর্ত্তি হন। তখন শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ, এম-এ মহাশয় উক্ত কলেজের গণিতের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহারই চেষ্টায় প্রমথনাথ ঐ কলেজে অর্দ্ধ-অবৈতনিক ছাত্ররূপে গৃহীত হন। কলিকাতায় অবস্থান কালে তিনি যে সকল সদাশয় স্বজাতিবৎসল ব্যক্তিগণের নিকট অর্থানুকূল্য লাভ করিয়াছিলেন এবং নানাভাবে উপকার প্রাপ্ত হইয়া-

ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে পরম বিদ্যোৎসাহী ৺হরিমোহন দালাল, জমিদার প্রসিদ্ধ পুস্তক ব্যবসায়ী ৺অতুলচন্দ্র নাথ, দরিদ্র ছাত্র-বন্ধু ৺হীরালাল নাথ, নীরব দাতা পাঁচুগোপাল নাথ (ভবানীপুর) এবং তৎকালে ছাত্র শ্রীইন্দুভূষণ নাথ মহাশয়-গণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তখন কলিকাতায় কলেজে পড়ুয়া যোগি-জাতীয় ছাত্রের সংখ্যা ছিল অতি নগণ্য; যে সকল ছাত্র কলেজে পড়িতেন তাঁহাদের মধ্যে তেমন যোগাযোগ ছিল না। স্বজাতিমহলে সুপরিচিত শ্রীনরেন্দ্রবাবু, শ্রীইন্দুবাবু, ৺ভূষণবাবু, শ্রীভবেন্দ্রবাবু—এঁরা সকলেই তখন কলেজের ছাত্র ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই স্বজাতি ও জাতীয় পত্রিকার দিকে প্রমথনাথের প্রবল আকর্ষণ ছিল। কলিকাতায় অধ্যয়ন কালে উপরোক্ত স্বজাতিবৎসল ছাত্রগণের এবং শ্রীযুক্ত পাঁচকড়িলাল নাথ (তখন আইন ক্লাশের ছাত্র), ৺হীরালাল নাথ, ৺অতুলচন্দ্র নাথ, ৺মণিভূষণ নাথ প্রমুখ স্বজাতি হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার স্বজাতিসেবার আকাঙ্ক্ষা আরও বলবতী হইয়া উঠে। নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়া পড়াশুনা চালাইয়া তিনি ১৯১১ সালে সি. এম্. এস্ কলেজ হইতে আই-এ পরীক্ষায় এবং ১৯১৪ সালে রিপণ কলেজ হইতে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াই প্রমথনাথ স্বগ্রামস্থ নবপ্রতিষ্ঠিত হাই স্কুলে সামান্য বেতনে শিক্ষকতা করিতে আরম্ভ করেন। তখনকার দিনে চেষ্টা করিলে তিনি হয়তো অন্য বিভাগে মোটা বেতনের চাকুরি যোগাড় করিতে পারিতেন; তাহা না করিয়া তিনি সহজলভ্য শিক্ষকতাই গ্রহণ করিলেন স্বজাতিসেবার সুযোগ লাভ করিবার প্রধান উদ্দেশ্যে; তাছাড়া শিক্ষকতাই তাঁহার ন্যায় শান্তিপ্রিয় ও নিরীহপ্রকৃতি ব্যক্তির পক্ষে অধিকতর বাঞ্ছনীয়। দামুড়হুদা স্কুলে ৪।৫ বৎসর চাকুরি করিয়া তিনি চুয়াডাঙ্গা হাই স্কুলে শিক্ষকতা করিতে আরম্ভ করেন। এখানে বিশেষ সুনাম ও সুখ্যাতির সহিত একাদিক্রমে তিনি দীর্ঘ তেইশ বৎসর শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। তিনি অদ্যাপি শিক্ষকতা কার্য্যেই

ব্রতী আছেন। শিক্ষকতাকে তিনি ঠিক চাকুরি হিসাবে গ্রহণ করেন নাই, জীবনের ব্রত হিসাবেই গ্রহণ করিয়াছেন। পঠন-পাঠনে তাঁহার নিপুণতা, ঐকান্তিকতা ও আন্তরিকতা হেতু তিনি সর্ব্বত্রই সুযোগ্য শিক্ষক বলিয়া সম্মানিত হইয়াছেন।

চুয়াডাঙ্গায় অবস্থান কালে প্রসিদ্ধ ত্যাগী কর্ম্মী আচার্য্য অম্বিকাচরণের সহিত প্রমথবাবুর পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা ঘটে। স্বজাতিসেবার প্রেরণা তিনি আচার্য্যদেবের কাছ থেকেই সমধিকভাবে লাভ করেন। প্রমথবাবু আচার্য্যদেবকে জাতিসেবার দীক্ষাগুরু বলিয়াই সম্মান করিতেন এবং সর্ব্বদাই সেই মৃত মহাত্মার পবিত্র স্মৃতির প্রতি ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া থাকেন। আচার্য্যদেবের ত্যাগাদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া প্রমথবাবু সম্মিলনীর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। গুণগ্রাহী সম্মিলনী তাঁহার জাতিসেবার কার্য্যে প্রীত হইয়া তাঁহাকে আসাম, নওগাঁ জিলার অন্তর্গত রহা নামক স্থানে ১৩২৮ সালে আহূত সম্মিলনীর ১২শ অধিবেশনের সভাপতির গৌরবজনক পদ প্রদান করেন। অতঃপর তিনি ১৩৩২ সালে সম্মিলনীর দাঁইহাট অধিবেশনে যোগিসখার সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত ইন্দুবাবুর স্থলে যোগিসখা পত্রিকার সম্পাদক ও কার্য্যাধ্যক্ষ মনোনীত হন। অশেষ পরিশ্রমে তিনি পত্রিকার গ্রাহক সংগ্রহ পূর্ব্বক পত্রিকাকে ঋণমুক্ত করিয়াছিলেন এবং ঋণমুক্ত অবস্থাতেই রাখিয়াছিলেন। তাঁহার কার্য্যদক্ষতায় আরও পরিতুষ্ট হইয়া সম্মিলনী ১৩৪০ সালে চুয়াডাঙ্গা অধিবেশনে তাঁহাকে সুপ্রসিদ্ধ কর্ম্মবীর নাথবন্ধু হরিমোহন নাথ মহাশয়ের স্থলে সম্মিলনী-সম্পাদক নিযুক্ত করেন। সেই অবধি তিনি অক্লান্তভাবে সম্মিলনীর কার্য্য পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন। এযাবৎ সম্মিলনীর যতগুলি অধিবেশন হইয়াছে তন্মধ্যে তিনি কৃষ্ণনগর, সাগরদীঘি, দাঁইহাট, খুলনা, ভেড়ামারা, নৈহাটী, চুয়াডাঙ্গা, বগুড়া, লক্ষ্মীগঞ্জ বাজার, শাঁখারিপাড়া, শিবালয়, কাউখালি এই বারোটা অধিবেশনের উদ্যোক্তা ছিলেন। তিনি কখনও একাকী এবং কখনও আচার্য্যদেবের সহিত

আসাম, পূর্ববঙ্গ, উত্তরবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সমস্ত জিলাতেই সম্মিলনীর বাণী ও উদ্দেশ্য প্রচারার্থ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি সম্মিলনীর কার্য্যে আচার্য্যদেবের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন। আচার্য্যদেবের সান্নিধ্য ও সাহচর্য্য লাভের এত বেশী সৌভাগ্য প্রমথবাবু ভিন্ন অন্য কাহারও হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। এই দুইজন মিলিয়া মিশিয়া সম্মিলনীকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

বালুরঘাট দুর্ভিক্ষ, খুলনার দুর্ভিক্ষ ও ঝটিকাবর্ত্ত, মেদিনীপুরের জলপ্লাবন, ভোলা মহকুমার ঝটিকাবর্ত্ত, কাঁথি মহকুমার জলপ্লাবন ও ঝটিকাবর্ত্ত— এই সকল প্রাকৃতিক দুর্দৈব উপলক্ষে তিনি ঘটনাস্থলে পরিভ্রমণ করিয়া বিপন্ন স্বজাতীয়গণের মধ্যে অর্থ ও বস্ত্র বিতরণ করিয়াছিলেন। আসাম সুরমা উপত্যকাবাসী যোগি-গণের বহিরঙ্গ জাতির অন্তর্ভুক্তি এবং নোয়াখালির সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তাঁহার আমলকার সর্ব্বপ্রধান ঘটনা। উপরোক্ত অন্তর্ভুক্তির প্রতিবাদকল্পে ১৩৪১ সালে শ্রীহট্ট জিলার অন্তর্গত সিংহবীজ নামক স্থানে সম্মিলনীর যে বিরাট বিশেষ অধি-বেশন হইয়াছিল তাহাতে তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার এবং অন্যান্য কতিপয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির অবিশ্রান্ত প্রচার ও অক্লান্ত আন্দোলনের ফলে আসাম গবর্ণমেণ্ট সুরমা উপত্যকার যোগীদের নাম বহিরঙ্গ জাতির তালিকা হইতে খারিজ করিয়া দেন। ১৩৪৬ সালে নোয়াখালি জিলায় যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সঙ্ঘটিত হয়, তাহাতে যোগিজাতির লোকেরাই বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। আচার্য্যদেব দুইবার এবং প্রমথবাবু একবার দাঙ্গাবিধ্বস্ত অঞ্চলের প্রায় সত্তরখানি স্বজাতি-প্রধান গ্রাম পরিদর্শন করিয়া দুঃস্থ ও বিপন্ন স্বজাতীয়দের মধ্যে প্রায় চারি হাজার টাকা বিতরণ করেন।

দেশবিভাগের অবশ্যম্ভাবী ফলে পূর্ব্ব-পাকিস্তানের স্বজাতিবর্গ ছিন্ন-ভিন্ন ও দিশেহারা হইয়া পড়িল। সম্মিলনীর দৃঢ় ভিত্তি টলিয়া গেল ; ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত পত্রিকা কোন গতিকে অস্তিত্বটুকু রাখিয়া বজায় শেষে অচলপ্রায় হইয়া উঠিল

সকলেই যেন তখন রণক্লান্ত সৈনিকের মত অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। দেশ-বিভাগের পর আচার্য্যদেব ও প্রমথবাবু স্থানচ্যুত স্বজাতীয়গণের পুনর্বসতির জন্য কিছুদিন চেষ্টা করিয়া নিদারুণ অর্থাভাববশতঃ হতোদ্যম হইয়া পড়িলেন। আচার্য্যদেবই ছিলেন সম্মিলনীর প্রাণ। তাঁহার মৃত্যুতে প্রমথবাবু ভগ্নাংশ হইলেন; সম্মিলনীর কাজে আর পূর্ব্বের মত আত্মনিয়োগ করিতে পারিলেন না। যাহাহউক তিনি নিজের সব ভাবনা ভুলিয়া এবং ব্যক্তিগত জীবনের সুখসাচ্ছন্দ্য বিসর্জ্জন দিয়া যেরূপ একনিষ্ঠতার সহিত জাতির সেবা করিয়াছেন, তাহাতে জাতির ইতিহাসে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

বলা বাহুল্য যে তাঁহার কর্ম্মঠ হস্তের নিপুণতার জন্যই বিশ্বব্যাপী নিদারুণ অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যেও দীর্ঘকাল সম্মিলনী ও যোগিসখা সচল ছিল। তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া জনমত গঠন করিয়া এবং অর্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক দীর্ঘকাল সম্মিলনী ও পত্রিকার পুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন।

শ্রীচন্দ্রশেখর ভৌমিক, এ্যাডভোকেট

ইনি আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনীর বর্ত্তমান অস্থায়ী সভাপতি। তিনি বহুদিন কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিয়া প্রচুর অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। বিগত ১৩৪২ বঙ্গাব্দে আসাম প্রদেশের দরং জিলার অন্তর্গত ঘোড়াবান্ধা নামক স্থানে সম্মিলনীর যে ২৬শ বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়, তিনি তাহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন।

শ্রীসুরেশচন্দ্র নাথ মজুমদার

১৩১৬ বঙ্গাব্দের ১৭ই ফাল্গুন তারিখে কাছাড় জিলার লালা গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম ৺সূর্য্যমণি নাথ মজুমদার ও মাতার নাম ৺শোভনা বালা দেবী। বাল্যকাল হইতেই তিনি স্বজাতিসেবা ও জনসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৩৩৫ সালে ইনি আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনীর কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটীর

সদস্য ও ইহার সহঃ সম্পাদক, ১৩৪১ সালে ইহার ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্য শ্রীহট্ট জিলার সিংহবীজে আহূত ইহার বিশেষ অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতি সম্পাদক এবং সুরমাভেলি নাথ-এমারজেন্সি ভাণ্ডারের সভাপতি; ১৩৪২ সা আসাম-বঙ্গ যোগি-যুবসঙ্ঘের ৭ম বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি, ১৩৪৫ সা আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনীর ২৯শ বার্ষিক অধিবেশনের (স্থান : লক্ষ্মীগঞ্জ গোয়াল পাড়া) সভাপতি নির্ব্বাচিত হন এবং সুনাম ও নিষ্ঠার সহিত কার্য্যসম্পাদ করেন। এই সময় সুরেশবাবু অনূ্যন উনত্রিশ বর্ষ বয়স্ক ছিলেন। ইনি আসাম বঙ্গ যোগি-সম্মিলনীর সর্ব্বকনিষ্ঠ সভাপতি। এত অল্প বয়সে আর কোনও নেত এরূপ সম্মানজনক পদ লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহার সেবাপরায়ণতা কর্ত্তব্যপরায়ণতা, কর্ম্মনিপুণতা, দৃঢ়চিত্ততা, নির্ভীকতা, তেজস্বিতা, সত্যবাদিতা স্পষ্টবাদিতা ও স্বজাতি-বৎসলতা গুণে মুগ্ধ হইয়া জাতি তাঁহার ন্যায় তরুণ যুবব অথচ সুদক্ষ ও অক্লান্ত কর্ম্মীকে উক্ত লোভনীয় ও বাঞ্ছনীয় পদ প্রদান করিয় তাঁহাকে সম্মানিত করেন। সভাপতিরূপে তিনি সম্মিলনীর বাণী প্রচারের জন্য আসাম-বঙ্গের (পূর্ব্ববঙ্গ বা পূর্ব্বপাকিস্তানসহ) অনেক জিলাতে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা ষ্টেট, উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গ এবং আসামের বহু স্থানে বহুবার সম্মিলনীর বাণী প্রচার উদ্দেশ্যে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহারই চেষ্টায় বিভিন্ন স্থানে বহু পল্লীসমিতি গড়িয়া উঠিয়াছিল।

দেশের ও দশের কাজেও সুরেশবাবুর দান উপেক্ষণীয় নহে। কংগ্রেসের প্রথম অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি স্থানীয় কংগ্রেসের সম্পাদকরূপে কংগ্রেসে যোগদান করেন। ইনি স্থানীয় প্রেসিডেন্ট পঞ্চায়েত, আসাম প্রাথমিক শিক্ষক সম্মিলনীর ১ম বার্ষিক অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ও ইহার প্রথম সম্পাদক ছিলেন। সুরেশবাবু স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত কালীচরণ বালিকা বিদ্যালয় কমিটীর সেক্রেটারি, জজ্ আদালতের এসেসার, লালা ট্রেডিং কো-অপারেটিভ সোসাইটির ডিরেক্টার বোর্ডের সদস্য ও ইহার হিসাব তদন্ত

কমিটীর সদস্য ও অনারারী সেক্রেটারী এবং আরও কয়েকটি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের বিশিষ্ট কর্ম্মকর্ত্তা।

সুরেশবাবু উচ্চশিক্ষিত না হইলেও তাঁহার জ্ঞান-সাধনা বিশেষ প্রশংসনীয়। যোগিজাতির ঐতিহ্য ও নাথধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার গবেষণা ও অনুসন্ধিৎসা আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে। রাজগুরু যোগিবংশ সঙ্কলন করিয়া তিনি ভারতের সমগ্র যোগিজাতির মুখোজ্জল করিয়াছেন। এই গ্রন্থে আমরা তাঁহার অধ্যবসায়, শ্রমশীলতা ও অনুসন্ধিৎসার যে পরিচয় পাই, তাহা আমাদের মধ্যে অতুলনীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই অমূল্য গ্রন্থের উপাদান সংগ্রহে তাঁহাকে অন্যূন পনর বৎসর কঠোর পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। গ্রন্থখানি সুরেশবাবুর নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে। অধ্যক্ষ শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ, এম-এ, বিদ্যাবাচস্পতি আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনীর কলিকাতার বিশেষ অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণে এ সম্বন্ধে বলেন—"জাতীয় ঐতিহ্যের উদ্ঘাটন এবং প্রচার ছিল সম্মিলনীর অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য। এই বিষয়ে আমাদের স্বজাতীয় অপেক্ষা অপর জাতীয় কয়েকজন মনীষীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণায় অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। অক্লান্তকর্ম্মা স্বজাতিসেবক শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র নাথ মজুমদার মহাশয় তাঁহার রাজগুরু যোগিবংশ নামক গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের পাণ্ডুলিপিতে সে সমস্ত তথ্য বিশেষ নিপুণতার সহিত সন্নিবেশিত করিয়াছেন। আমি এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি দেখিয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছি। ইহা যে আমাদের জাতির একটি অমূল্য সম্পদ এবং সমগ্র ভারতের সংস্কৃতির দিক দিয়া দেখিতে গেলে ইহা যে ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের একটি বিশেষ অঙ্গ আমার মনে এই ধারণা দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু অর্থাভাববশতঃ তিনি এই অমূল্য গ্রন্থখানি প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না। সম্মিলনী অগ্রণী হইয়া যদি এই গ্রন্থখানি প্রকাশিত করাইতে পারে, আমার বিশ্বাস ইহা দ্বারা আমাদের মহদুপকার সাধিত হইবে।"

সুরেশবাবু একজন সুলেখক। প্রবাসী, উদ্বোধন, সঞ্জীবনী, প্রতিধ্বনি,

প্রবর্ত্তক ও যোগিসখায় তাঁহার বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার প্রণীত জাতিভেদ, ব্রাত্য সংস্কার ব্যবস্থা প্রভৃতি গ্রন্থ পণ্ডিতসমাজে প্রশংসা অর্জন করিয়াছে। তাঁহার 'প্রাথমিক সাহিত্য চয়ন' আসাম গভর্ণমেণ্ট আসাম রাজ্যের সর্ব্বপ্রকার স্কুলের ৩য় মানের পাঠ্যরূপে অনুমোদন করিয়াছিলেন। ইহা দীর্ঘ কয়েক বৎসর পাঠ্যতালিকাভুক্ত ছিল। তাঁহার 'প্রাথমিক মানসাঙ্ক শিক্ষা' নিম্ন ও মধ্য স্কুলের লাইব্রেরীর পাঠ্যরূপে আসাম গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াছিল।

[আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনীর সাধারণ সম্পাদক শ্রীপ্রথমনাথ নাথ, বি-এ কর্ত্তৃক লিখিত]

দ্বাদশ অধ্যায়

স্বর্গীয় সমাজনেতৃবৃন্দ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ

"উদয়ের পথে শুনি কার বাণী, ভয় নাই ওরে ভয় নাই ;
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।"

ঋষি অম্বিকাচরণ একদা বলিয়াছিলেন—"প্রশ্ন হইতে পারে বর্ত্তমান যুগে প্রণষ্ট গৌরবের ইতিহাস রচনার আবশ্যকতা কি ? * * * * * মৃত মহাত্মাদের কীর্ত্তিকাহিনী গাহিয়া আর লাভ কি ? ধনী, মানী, জ্ঞানী, গুণী, ভাগ্যবানেরা ইহার উপকারিতা উপলব্ধি করিতে নাও পারেন ; কিন্তু অসহায় জনসাধারণের পক্ষে ইহাই একমাত্র সহায়, দুর্ব্বল হৃদয়ের অমোঘ শক্তির উদ্বোধক, নিরাশ হৃদয়ের মহতী আশার সঞ্চারক, সে বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।"

বাস্তবিক পক্ষে যে সব মৃত নেতৃবৃন্দের চেষ্টায় যোগিজাতির জনসাধারণের মধ্যে প্রাচীন ইতিহাস ও প্রাচীন সাহিত্য স্মরণের স্পৃহা জাগিয়াছে, যাঁহাদের চেষ্টায় আত্মবিস্মৃত যোগিজাতির পুনরুত্থানের সূচনা হইয়াছে, যাঁহাদের প্রচেষ্টায় শিক্ষাদীক্ষায় পশ্চাৎপদ জাতির মধ্যে আত্মমর্য্যাদাবোধ জন্মিয়াছে, যাঁহাদের কৃপায় ছিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে মিলনের সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে, সে সব পরলোকগত খ্যাত ও অখ্যাতনামা নেতৃবৃন্দের জীবনেতিহাস প্রণয়ন একান্ত আবশ্যক। জাতিকে জাগাইয়া রাখিতে হইলে এবং ভবিষ্যৎ বংশধরগণকে স্বজাতিপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করিয়া জাতীয় আন্দোলনের ধারা অক্ষুন্ন রাখিতে হইলে এইরূপ জীবনেতিহাস প্রণয়ন একান্ত আবশ্যক। এরূপ ইতিহাস প্রণীত না হইলে জাতীয় আন্দোলনের যজ্ঞাগ্নি নির্ব্বাপিত হওয়ার আশঙ্কা আছে। আসুন আমরা বিশ্বপ্রেমিক হওয়ার পূর্ব্বে স্বজাতিপ্রেমিক হইবার চেষ্টা করি।

এই অধ্যায়ের তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য কয়েকবার যোগিসখায় বিজ্ঞাপন দিয়াছি। ইহাতে ফলোদয় হইতেছে না দেখিয়া বিভিন্ন স্থানে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে বহুবার পত্রাদি লিখিয়া যে কতিপয় মৃত বিশিষ্ট ব্যক্তির জীবনী সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি তাহাই এবং পুরাতন যোগিসখা অনুসন্ধান করিয়া যে সকল উপাদান সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহাই অবলম্বনপূর্ব্বক কতকগুলি জীবনী লিপিবদ্ধ করিয়া এখানে প্রকাশ করিলাম।

এই সব অসুবিধার জন্য এই অধ্যায়টি যথাযথভাবে লিখিতে পারা গেল না। সকলের ব্লকও সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই। এই অধ্যায়ের জন্য সংগৃহীত কয়েকটি ব্লক মরিচা পড়িয়া নষ্ট হইয়া যাওয়ায় প্রকাশ করা গেল না। আগামীবারে আমরা অধ্যায়টি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করার চেষ্টা করিব।

৺বিষ্ণুচরণ নাথ ভট্টাচার্য্য— হুগলী জিলার গঙ্গাতীরস্থ ডুমুরদাহ গ্রামে ১২৫৫ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে ইঁহার জন্ম হয়। ভারতের তদানীন্তন বড়লাট লর্ড কার্জণের প্রধান মন্ত্রী রিজলী সাহেব বিষ্ণুচন্দ্রকে বঙ্গীয় যোগিসমাজ সংস্কারক আখ্যা দিয়াছিলেন (কলিকাতা হইতে রিজলী সাহেবের লিখিত ৩১।১২।১৯০১ ইংরাজির ৯২০নং সরকারীপত্র দ্রষ্টব্য)। তাঁহার প্রণীত হঠযোগ ও যোগশিক্ষা-সোপান পাঠ করিয়া জার্ম্মাণীর সুপ্রসিদ্ধ লিপজিগ নগরের লাইব্রেরীর কর্ত্তৃপক্ষ উচ্চ প্রশংসাজ্ঞাপক পত্র দিয়াছিলেন। বিখ্যাত সমাজ-সংস্কারক বলিয়া তিনি যোগিজাতির মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। চিকিৎসা শাস্ত্রেও তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল।

১৩১৭ বাঙ্গালার ৩০শে পৌষ তারিখে এই মহাত্মা পরলোকগমন করেন।

৺কৃষ্ণচন্দ্র নাথ— হাওড়া জিলার অন্তর্গত আন্দুল মোহিয়াড়ী গ্রামে কৃষ্ণচন্দ্রের নিবাস ছিল। যোগিজাতির জাগরণের উষাযুগে যে সব বীর নেতা হৃদয়ের রক্ত দিয়া এই জাতির সেবা করিয়াছিলেন, কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। কতিপয় সঙ্গী সমভিব্যাহারে উপবীত প্রচার মানসে ইনি পূর্ব্ববঙ্গে

যাত্রা করেন। ১২৮৪ সালের ২৪শে ফাল্গুন তারিখে ফরিদপুর জেলার লোনসিংহ গ্রামের সাত জন স্বজাতিকে সর্ব্বপ্রথম উপনয়ন সংস্কার করাইয়া নৌকাযোগে ফিরিবার পথে গোয়ালন্দের অনতিদূরে প্রবল ঝড়বৃষ্টিতে নৌকা জলমগ্ন হওয়ায় ইনি ও ব্রাহ্মণকুলতিলক ৺রামকুমার ন্যায়রত্ন মহাশয় প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহাদের সঙ্গীরা দৈবানুগ্রহে জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আনুমানিক ৫০ বৎসর বয়সে তাঁহার পরলোকগমন ঘটে।

৺মণিমোহন নাথ— ২৪ পরগণা জিলার দমদমার নিকটবর্ত্তী দিগলা গ্রামে ১৮৩২ খৃঃ অব্দের ১২ই এপ্রিল তারিখে ইঁহার জন্ম হয়। মণিমোহনও যোগিজাতির জাগরণের উষাযুগের অন্যতম-প্রধান নেতা ছিলেন। ইনিও কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে লোনসিংহ গিয়াছিলেন এবং নৌকাডুবি হইতে কোনও প্রকারে প্রাণরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শেষজীবনে ইনি নিজের জীবনী লিখিয়া তৎকালীন জাতীয় আন্দোলনের একটা সুস্পষ্ট ধারণা দিয়া গিয়াছেন। ১৩২১ বাঙ্গালার ৬ই মাঘ তারিখে অন্যূন ৮০ বৎসর বয়সে এই মহাত্মা নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন।

৺অধরচন্দ্র নাথ— ২৪ পরগণা জিলার দত্তপুকুর গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। যোগিসখা প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে অধরচন্দ্র অরবিন্দের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন। অধরচন্দ্রই যোগিসখার প্রথম সম্পাদক। ১৩৩৪ বাঙ্গালার ২৪শে অগ্রহায়ণ তারিখে ইনি পরলোকগমন করেন।

রাজা **৺গৌরকিশোর রায়চৌধুরী**— সম্রাট সাহজাহানের সময় (১৬২৯—১৬৫৮) ইঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা ফরিদপুর জিলার কার্ত্তিকপুরে বাস করিতেন। তৎপর ইঁহারা ত্রিপুরা জিলার ঘড়িয়ানা এবং তথা হইতে বর্ত্তমান নোয়াখালির বাজারে বসতি স্থাপন করেন। "পূর্ব্ববঙ্গের যোগিজাতি মাত্রেই নোয়াখালি জিলার দালাল বাজারের রায়বংশের বিশেষ সম্বর্দ্ধনা করিয়া থাকে এবং তাঁহা-

দিগকেই স্বজাতির মুখপত্র বলিয়া বিবেচনা করে। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মং ভাগে যোগিবংশীয় ব্রজবল্লভ রায় মেঘনা নদীর তীরবর্ত্তী ইংরেজ বণিকে চরপাতার কুটীর দালাল এবং তাঁহার কনিষ্ঠ রাধাবল্লভ রায় তথাকার যাচনদা ছিলেন। ব্রজবল্লভের পুত্র বাপ্তা কাপড়ের ব্যবসায় চালাইয়া ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে কোম্পানী বাহাদুরের নিকট হইতে রাজা উপাধি এবং নিষ্কর (লাখরাজ ভূসম্পত্তি লাভ করেন। এখনও তদ্‌বংশধরগণ এই ভূসম্পত্তি ভোগ-দখ করিতেছেন" (বিশ্বকোষ—১৬শ ভাগ, যু্রোচ্য)। কোন সময়ে এই বংশীয়দে উপাধি দালাল ছিল ; তদনুসারে দালাল বাজারের এবং এই বংশের লক্ষ্মীনারায় নাথের নামানুসারে লক্ষ্মীপুরের নামকরণ করা হইয়াছে। বৃন্দাবনে দালা কুঞ্জের পত্তন, চট্টগ্রাম বিভাগের শ্রেষ্ঠতম দালালের দীঘি খনন, রাস্তাঘাট নির্ম্মা বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা, দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর দান প্রভৃতি জনহিত কার্য্য এই বংশীয়দের বিশেষত্ব।

৺**কাশীনাথ নাথ**— ত্রিপুরা জিলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার অন্তর্গত চাতলপাড় গ্রামে ১২০৩ বঙ্গাব্দে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি স্থানীয় সমাজে জাতীয় জাগরণের অন্যতম বীর নেতা ছিলেন। বিভিন্ন সমাজেও তাঁহা অসাধারণ প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। কাশীনাথ পিতৃপরিত্যক্ত বিশাল সম্পত্তি অধিকারী হন। বৈষয়িক জীবনের প্রথমেই তিনি তীর্থপর্য্যটনে বহির্গত হ এবং শ্রীবৃন্দাবনে একটী দেবালয় নির্ম্মাণ ও পাকা কূপ খনন করাইয়া তাহ দেবোদ্দেশে উৎসর্গ করেন। দয়া, পরদুঃখকাতরতা ও সহানুভূতিশীলতা গুণে তিনি সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। দীন-দুঃখী ও দরিদ্রদিগকে তিনি অকাতরে অন্ন বিতরণ করিতেন। বিপন্নের উদ্ধারে, আর্ত্তের সেবায় ও স্বজাতির উপকারসাধনে তিনি প্রচুর অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। ১২৮৬ সালে ৮৩ বৎসর বয়সে এই মহাত্মা মানবলীলা সম্বরণ করেন। (চূণ্টা প্রকাশ—১৩৩৬ পূজা-সংখ্যা হইতে সার সংগ্রহ)

৺কাশীচন্দ্র দেবনাথ— ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত বরদাখাতে ইসলামপুরে ১২৪৫ সালে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি জাতি-তত্বপূর্ণ "জ্ঞানতত্বসারযোগ ও নিগূঢ় সারতন্ত্র" নামক একখানি বই লিখিয়াছিলেন। ইহাতে সৃষ্টির উৎপত্তি-বিবরণ, অনাদি ও আদির জন্মকথা, দেবতাদের জন্মকথা, যোগিজাতির উৎপত্তি-বিবরণ ও দ্বাদশপন্থী যোগীদের বিবরণ আছে। ১৩০৬ সালের ১৫ই অগ্রহায়ণ ইনি পরলোকগমন করেন।

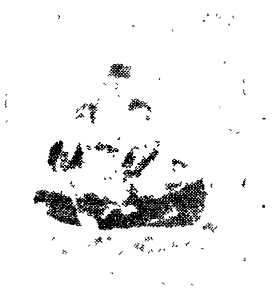
রায় **৺চন্দ্রকুমার রায়বাহাদুর**— ১২৬১ সালের ১০ই পৌষ নোয়াখালির দালাল বাজারের রায়-উপাধিক সুপ্রসিদ্ধ জমিদার বংশে ইঁহার জন্ম হয়। দাতব্য চিকিৎসালয় ও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, বহু জলাশয় খনন, মেঘনা রাস্তা নির্ম্মাণ, চরবংশীতে লোকের বসতি স্থাপন এবং এখানকার শাসন-সংস্কার প্রভৃতি বহুবিধ জনহিতকর কার্য্য করিয়া ইনি জনসমাজে ও রাজদ্বারে বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ১৮৯৮ খৃঃ অব্দে ইনি রাজসরকার হইতে রায় বাহাদুর উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। ইনি প্রথম শ্রেণীর অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। ১৩০৯ সালের ৬ই ফাল্গুন তারিখে ইনি পরলোকগমন করেন।

পণ্ডিত **৺লোচনমণি নাথ লস্কর**— কাছাড় জিলার বোয়ালীপার গ্রামে আনুমানিক ১৮৪৮ খৃঃ অব্দে ইঁহার জন্ম হয়। কাছাড়ের জাতীয় আন্দোলনের ইনি একজন শ্রেষ্ঠ নেতা ছিলেন। সামাজিক বিবিধ সংস্কার ও শিক্ষাপ্রচার দ্বারা ইনি স্থানীয় লোকের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন। ১৩১৪ সালের বৈশাখে ইনি পরলোকগমন করেন।

৺নবীনচন্দ্র নাথ, কবিরত্ন— ইনি খুলনা জিলার অধিবাসী ছিলেন। ১২৪৫ সালে ইঁহার জন্ম হয়। সংস্কৃত ও আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষাপ্রচার, সমাজে দাহ প্রথার প্রবর্ত্তন, উপনয়ন সংস্কার প্রভৃতি বহু সামাজিক সংস্কারের তিনি অন্যতম নেতা ছিলেন। ইনি জজ আদালতের জুরারও ছিলেন। ১৩১৫ সালের ১৫ই অগ্রহায়ণ ইনি লোকান্তরিত হন।

৺শীতলচন্দ্র নাথ বিদ্যাভূষণ— যশোহরের গঙ্গানন্দপুরে ১২২৮ বাঙ্গালায় ইহার জন্ম হয়। ইহার পিতার নাম ছিল ৺মাধবচন্দ্র বিশ্বাস। ইনি যশোহর আদালতের অন্যতম খ্যাতনামা উকীল ও পরম স্বজাতিহিতৈষী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার সম্পাদিত 'নাথবংশ' একখানি উপাদেয় জাতীয় গ্রন্থ। ১৩১৮ বাং ১৮ই আষাঢ় তারিখে ৯০ বৎসর বয়সে ইহার মৃত্যু হয়।

৺রামচরণ নাথ মাঝারভুঞা— কাছাড় জিলার অন্তর্গত শিলচরে ১২৬০ বঙ্গাব্দের ১৭ই চৈত্র তারিখে ইহার জন্ম হয়। ইনি জাতীয় আন্দোলনের এক জন প্রধান নেতা ছিলেন। শিক্ষাপ্রচার দ্বারা তিনি স্থানীয় জনসমাজের মহৎ উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রেরণায় অনেকেই বিদ্যার্জ্জনে সক্ষম হয়। আসামের যোগি-জাতির মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিয়া আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৩১৮ বাঙ্গালার ১০ই ভাদ্র ইনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন।



৺পীতাম্বর নাথ— ত্রিপুরা জিলার মুরাদাবাদ থানার অন্তর্গত উড়িশ্বর গ্রামে ইহার জন্ম হয়। ইনি পরম স্বজাতিহিতৈষী ছিলেন। বৃদ্ধ বয়সেও ইনি যুবকের ন্যায় উৎসাহ উদ্যম লইয়া জাতীয় সংস্কার কার্য্যে নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। ১৩১৮ বাং ২৫শে আশ্বিন ইনি মানবলীলা সম্বরণ করেন।

৺কালীপ্রসাদ দেবনাথ— আনুমানিক ১২২১ সালে ত্রিপুরা জিলার বিদ্যাকুট গ্রামে ইহার জন্ম হয়। ইহার অলৌকিক যোগবলে জনসাধারণ বিস্মিত হইত। জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে অনেক হিন্দু তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহার শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ শিষ্যগণের মধ্যে শ্রীকেদারচন্দ্র চক্রবর্ত্তী পিতা মৃত নবকিশোর চক্রবর্ত্তী, শ্রীগৌরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সাং বিদ্যাকুট প্রভৃতি এবং কায়স্থ

শিষ্যগণের মধ্যে শ্রীচিন্তামণি দে, পিতা মৃত শাচুনচন্দ্র দে, শ্রীকৈলাসচন্দ্র দে, পিতা মৃত নবীনচন্দ্র দে, শ্রীকামিনী কুমার দে, পিতা মৃত রামসুন্দর দে প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ১৩২০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষভাগে ইনি পরলোকগমন করেন।

৺অর্জ্জুনচন্দ্র নাথ— নিবাস বাদুরপুর, পোঃ তালসহর, জিলা ত্রিপুরা। ইনি সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি ইঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিল। ইঁহার সমাধি আজও পর্য্যন্ত পূজিত হইতেছে।

৺কালীচরণ নাথ— নিবাস উসিউড়া, পোঃ সুলতানপুর, জিলা ত্রিপুরা। ইনিও সিদ্ধা ছিলেন। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি অনেকেই ইঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

৺নিকুঞ্জবিহারী বিশ্বাস— ১২৬৯ সালের ২৭শে শ্রাবণ যশোহরের গঙ্গানন্দপুরে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি বিদ্যোৎসাহী স্বজাতিহিতৈষী প্রসিদ্ধ উকিল ছিলেন। ১৩০৮ বাঙ্গালার জ্যৈষ্ঠ মাসে ৩৮ বৎসর বয়সে অকালে ইনি কালগ্রাসে পতিত হন।

৺সুরেন্দ্রকুমার রায়, জমিদার— নোয়াখালির দালাল বাজারের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার বংশে ১২৮৫ সালের ৫ই চৈত্র ইঁহার জন্ম হয়। দানশীল, স্বদেশ ও স্বজাতিহিতৈষী, ন্যায়পরায়ণ ও সঙ্গীতানুরাগী বলিয়া তিনি সুপরিচিত ছিলেন। ১৩২০ সালের ১৬ই আষাঢ় তারিখে ইনি মাত্র ৩৫ বৎসর বয়সে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন।

৺রাজকিশোর নাথ— ১২৭৭ সালের ২২শে মাঘ তারিখে কাছাড় জিলার গাঙ্গপার ধূমকর (হাইলাকান্দি) গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। উপনয়ন সংস্কার প্রচলন, জাতীয় সমিতি প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি স্বজাতিহিতকর কার্য্য করিয়া তিনি সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ১৩২১ সালের ২রা কার্ত্তিক ইনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

৺দশরথ নাথ— ময়মনসিংহ জিলার মহকুমা কিশোরগঞ্জের অন্তর্গত গোবিন্দপুরে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি স্বজাতিহিতৈষী, ন্যায়পরায়ণ, দানশীল ও সৌভাগ্যশালী ব্যক্তি ছিলেন। ১৩২১ বাং ৩রা বৈশাখ ৭৩ বৎসর বয়সে ইনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

৺রুক্মিণীকান্ত নাথ— নদীয়া জিলার অন্তর্গত এনায়েতপুর বাড়াদী গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি প্রথমতঃ সুবিখ্যাত জমিদার ৺হরিমোহন দালাল মহাশয়ের এষ্টেটে এবং পরে প্রসিদ্ধ পুস্তক ব্যবসায়ী এস্. কে. নাথ ও জি. সি. নাথের পুস্তকালয়ে চাকুরি করেন। দরিদ্র ছাত্রগণের প্রতি তিনি খুব সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি কিছুদিন 'সমাজ' পত্রিকার কার্য্যাধ্যক্ষরূপে দক্ষতার সহিত ইহার পরিচালনা করেন। ১৩২৭ সালের ৩১শে জ্যৈষ্ঠ ইনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

৺কৃষ্ণমোহন ভৌমিক— ত্রিপুরা জিলার খোষঘর গ্রামে ১২৪৩ সালে ইঁহার জন্ম হয়। তিনি আজীবন শিক্ষাপ্রচারে ব্রতী ছিলেন। ইনি স্থানীয় উপনয়ন সংস্কার আন্দোলনের প্রধান নায়ক ছিলেন। ১৩২৭ বাং ২৮শে পৌষ ইনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

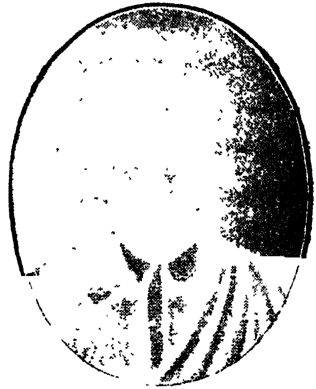
৺সুরেন্দ্রকুমার দেবনাথ— খুলনা জিলায় ইঁহার নিবাস ছিল। স্থানীয় সামাজিক আন্দোলনের প্রধান নেতাগণের মধ্যে সুরেন্দ্রকুমার ছিলেন অন্যতম। ১৩২৭ বাং ৩০শে আষাঢ় তারিখে ৪০ বৎসর বয়সে ইহার মৃত্যু ঘটে।

৺মহাভারত নাথ— রঙ্গপুর জিলার অন্তর্গত গোবিন্দগঞ্জের রহিমপুর গ্রামে ইঁহার নিবাস ছিল। বারেন্দ্র যোগিসমাজে উপনয়ন সংস্কার, শিক্ষা প্রচার, সভাসমিতি গঠন প্রভৃতি কার্য্যের দ্বারা তিনি স্থানীয় নাথ-সমাজের প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। ১৩২৮ বাং ২৭শে মাঘ তারিখে ইঁহার মৃত্যু হয়।

৺সুলভা দেবী— আসামের নওগাঁ জিলার অন্তর্গত দিঘলদড়ি গ্রামে ১৩০৮ বাঙ্গালায় ইঁহার জন্ম হয়। আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনীর রহা অধিবেশনে

ইনি চিরজীবন অবিবাহিতা থাকিয়া জাতীয় কার্য্যে আত্মোৎসর্গ করিবার অভিপ্রায় ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু দুরন্ত কাল তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে দেয় নাই। ১৩২৯ বাঙ্গালার ২০শে বৈশাখ তারিখে ২১ বৎসর বয়সে ইনি অকালে কালগ্রাসে পতিত হন।

৺কালীচরণ নাথ মজুমদার— নিবাস লালা, কাছাড় জন্ম ১২৩৬ বাঙ্গালা। ইনি স্বজাতিহিতৈষী ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি জনহিতকর কার্য্যের তিনি অন্যতম নেতা ছিলেন। গভর্ণমেণ্ট সাহায্যপ্রাপ্ত কালীচরণ মধ্য-বঙ্গ বালিকা বিদ্যালয় এখনও তাঁহার স্মৃতি বহন করিতেছে। ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ৯ই শ্রাবণ তারিখে ৯৩ বৎসর বয়সে ইনি পরলোকগমন করেন।



পণ্ডিত **৺বৈকুণ্ঠ নাথ**— ঢাকার বিক্রমপুরস্থ কেদারপুর গ্রামে ১২৫৬ বঙ্গাব্দে ইঁহার জন্ম হয়। সমাজসেবা ও অতিথিসেবা ইঁহার শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ছিল এবং উদারতা ও বিদ্যোৎসাহিতা ইঁহার চরিত্রের মহৎ গুণ ছিল। ইনি ইঁহার উপার্জ্জিত প্রচুর অর্থ জনসেবায় ব্যয় করিয়া ধনের প্রকৃত সদ্ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। আদর্শ শিক্ষাব্রতী হিসাবে ইনি প্রভূত সম্মান অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ইঁহার লিখিত ব্যাখ্যা পুস্তক সর্ব্বত্র সমাদৃত হইত। তিনি যোগ্যতার সহিত কতিপয় বাঙ্গালা পত্রিকার সম্পাদনা করিয়াছিলেন। সুগায়ক বলিয়াও তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। ঢাকার প্রসিদ্ধ 'রিপণ লাইব্রেরী' ইঁহারই প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার বংশ সায়তা গ্রামের 'পণ্ডিত বংশ' বলিয়া খ্যাত। ১৩২৯।২৬শে বৈশাখ ইনি পরলোকগমন করেন।

৺ঈশ্বরচন্দ্র নাথ মজুমদার— ১২৬৯ বঙ্গাব্দের ১০ই চৈত্র ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত টাঙ্গাইলের সঞা গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। স্থানীয় সমাজের রীতি-নীতি সংশোধন ও উপবীতের পূর্ণ প্রচলনের জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। ১৩২৯ বাং ২রা চৈত্র তারিখে ইনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

৺হরিমোহন দালাল—২৪ পরগণা জিলার অন্তর্গত বসিরহাট টাউনে ১২৫৫ বঙ্গাব্দে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ৺গুণনাথ দালাল এবং মাতার নাম লক্ষ্মীমণি দেবী এবং পিতামহ ৺হলধর দালাল। অল্প বয়সে পিতৃহীন হওয়াতে তিনি ইংরাজী শিক্ষার তেমন সুযোগ লাভ করিতে পারেন নাই সত্য, কিন্তু অসাধারণ বিদ্যানুরাগিতার গুণে তিনি সাংসারিক জীবনের উপযোগী বাংলা শিক্ষা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বাল্যকালে পিতৃহীন হইয়া তিনি তাঁহার তৃতীয় পিতৃব্য কর্ত্তৃক লালিত পালিত হন এবং তাঁহারই নিকট বৈষয়িক কার্য্যাদি শিক্ষা করেন। পিতৃব্যের শিক্ষাগুণে ও স্বাভাবিক প্রতিভা বলে বৈষয়িক কার্য্য পরিচালনে যোগ্যতা ও নিপুণতা লাভ করেন। তিনি ছিলেন দীর্ঘ-গৌরবর্ণ দেহ ও সুপ্রশস্ত-ললাট-বিশিষ্ট। ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য, তেজস্বিতা, ন্যায়পরায়ণতা প্রভৃতি ভাগ্যবান্ পুরুষের যাবতীয় লক্ষণ তাঁহার আকৃতি ও প্রকৃতিতে বিদ্যমান ছিল। তাঁহার বিষয়বুদ্ধি ও সাধারণ জ্ঞান ছিল অসাধারণ। তিনি ন্যায় পথ হইতে কখনও বিচ্যুত হন নাই। তিনি ছিলেন কর্ম্মবীর। ন্যায়সঙ্গত কর্ম্মই ছিল তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। তিনি বলিতেন কর্ম্মহীন মানুষ পশুর সমান। ঐকান্তিক কর্ম্মোৎসাহিতার গুণেই তিনি উন্নতির উচ্চতর সোপানে অধিরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। "উদ্যোগীনং পুরুষসিংহ মুপৈতি লক্ষ্মীঃ" তাঁহার জীবনে এই বাক্যের সার্থকতা দেখিতে পাওয়া যায়। লবণের ব্যবসায় ও সুদূর ইউরোপের সহিত পাটের বেলিং ব্যবসায়ে তাঁহার নাম সুপরিচিত ছিল। তিনি নিয়মানুবর্ত্তী, অধ্যবসায়ী, কষ্টসহিষ্ণু ও অসম সাহসিক ছিলেন। সুন্দরবন অঞ্চলের দুর্গম জঙ্গল কাটাইয়া

আবাদ প্রস্তুত করিতে তাঁহাকে একাদিক্রমে ছয় মাস কাল শ্বাপদসঙ্কুল বনে থাকিতে হইয়াছিল। ইহাতে তাঁহার নির্ভীকতা ও দুর্দ্দম কর্ম্মলিপ্সার পরিচয় পাওয়া যায়।

তিনি কলিকাতা কলু-টোলাবাসী গোপাললাল শীলের মেদিনীপুর জেলাস্থিত ৮১ মৌজার অর্দ্ধাংশ খরিদ করিয়া তাহার শৃঙ্খলাবিধান করিতে ও সুশাসনে আনিতে যেরূপ বুদ্ধিমত্তা, দূরদর্শিতা ও নিপুণতার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা সত্যই প্রশংসনীয়।

মাতাপিতার প্রতি তাঁহার অগাধ ভক্তি ছিল। তাঁহার মাতৃদেবী লক্ষ্মীমণি দেবীর শ্রাদ্ধোপলক্ষে তিনি সাত হাজার কাঙ্গালীকে বস্ত্র ও নানাবিধ মিষ্টান্ন এবং প্রত্যেককে চারি আনা পয়সা বিতরণপূর্ব্বক পরম নিষ্ঠার সহিত দরিদ্র নারায়ণের সেবা করিয়াছিলেন। ঐ শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত বক্তিগণকে ও কাঙ্গালী-দিগকে ভোজন করাইতে আশি মণ ময়দা ও তদনুরূপ চাউল ও অন্যান্য মিষ্টান্ন দ্রব্য খরচ হইয়াছিল। তিনি তাঁহার মাতৃদেবীর স্মৃতিরক্ষার্থে বসিরহাট সহরে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের তিনখানি পাকাগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। তাঁহার পিতৃদেবের স্মৃতিরক্ষার্থে স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ের গৃহ নির্ম্মাণের উদ্দেশ্যে এবং তাঁহার পিতামহ ৺হলধর দালালের স্মৃতিরক্ষার্থে Haladhar Dalal Female Hospital-এর জন্য বসিরহাট সহরে ১৫০০০৲ পনর হাজার টাকা ব্যয় করেন। বাংলার তদানীন্তন গভর্ণর লর্ড কারমাইকেল বসিরহাটে শুভাগমন করিলে তাঁহাকে এই বদান্যতা ও দানশীলতার জন্য বিশেষভাবে সম্বর্দ্ধিত করেন।

তাঁহার অসাধারণ ব্যক্তিত্বের জন্য তিনি জীবনে সম্মান ও অর্থ লাভ করিয়াছিলেন। তিনি স্বজাতির পরমহিতৈষী ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন শিক্ষাই জাতীয় উন্নতির মূল। এই জন্য তিনি যোগিজাতির মধ্যে উচ্চশিক্ষা বিস্তারের নিমিত্ত বহু স্বজাতীয় দরিদ্র মেধাবী ছাত্রগণের আহার বাসস্থানের সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার অর্থানুকুল্যে বহু ছাত্র তাঁহার

কলিকাতার গদীতে আহার বাসস্থান পাইয়া উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া জীবনে উন্নতির পথ প্রশস্ত করিয়াছেন। দরিদ্র যোগিসমাজে কন্যার বিবাহে পণপ্রথা প্রচলনের তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন। পুত্র-কন্যার বিবাহে তিনি ইহার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার কোন গোঁড়ামি ছিল না। কর্ম্মই ছিল তাঁহার নিকট একমাত্র ধর্ম্ম। ১৩৩২ বঙ্গাব্দের ১০ই শ্রাবণ তারিখে ৭৭ বৎসর বয়সে এই মহাত্মা তাঁহার কাশীধামস্থিত ভবনে সজ্ঞানে মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার সুযোগ্য তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দালাল, এড্ভোকেট মহাশয় যোগিসমাজে সুপরিচিত। তিনিই এখন পিতার পরিত্যক্ত বিশাল সম্পত্তির প্রধান পরিচালক।

৺কালীচন্দ্র নাথ, উকিল— ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত চাঁদপুরের বিষকাটালী গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। তিনি সর্ব্বপ্রথম আসাম গোয়ালপাড়ার সুপ্রসিদ্ধ নেতা ৺হরিপ্রসাদ নাথ, মোক্তার মহাশয়ের দৌহিত্রী চারুবালাকে বিবাহ করিয়া আন্তর্গণিক্ বিবাহের পথ প্রদর্শন করেন। কালীচন্দ্র ও তাঁহার সুযোগ্যা বিদুষী পত্নী চারুবালা উভয়ে একই বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতেন। তিনি অমায়িক, মিষ্টভাষী ও চরিত্রবান্ পুরুষ ছিলেন। ১৩৩০ বাং ১লা আষাঢ় তারিখে তিনি অকালে কালগ্রাসে পতিত হন।

৺হরিশ্চন্দ্র নাথ— চট্টগ্রাম জিলার মিরেশ্বরী থানার ওয়াহেদপুর গ্রামে ইঁহার নিবাস ছিল। কার্য্যোপলক্ষে বিদেশে অবস্থানকালে তিনি উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিয়া দেশে ফিরিলে ১৩৩০ বাং ৬ই মাঘ তারিখের এক সভায় নেতৃবৃন্দ রায় দান করেন যে উপবীত ত্যাগ করিয়া আগামী ১০ই মাঘ তারিখে সর্ব্বসমক্ষে হরিশ্চন্দ্রকে পুনরায় উপবীত গ্রহণ করিতে হইবে। সে দিন হরিশ্চন্দ্র মহাযোগে বসিয়া সাধনোচিত ধামে মহাপ্রস্থান করেন।

৺পার্ব্বতীচরণ নাথ, কবিরাজ— খুলনা জিলার চুলকাঠি গ্রামে ১২৮৭ সালে ইঁহার জন্ম হয়। শিক্ষাপ্রচার, জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে দরিদ্র ছাত্রগণকে অর্থ ও

অন্ন দান, দরিদ্র রোগীকে ঔষধ ও পথ্য দান, বিভিন্ন তীর্থভূমিতে নিরন্নদের অন্ন দান প্রভৃতি জনহিতকর ও পুণ্যজনক কার্য্য করিয়া ইনি সুনাম অর্জ্জন করেন। ১৩৩২ বাং ১৯শে অগ্রহায়ণ ৪৫ বৎসর বয়সে ইনি পরলোকগমন করেন।

৺আনন্দরাম নাথ— আসামের নগাঁও জিলার ছরাইবাহী মৌজার বড়-ভগীয়া গ্রামে ১৩১৭ বাং ইহার জন্ম হয়। অতি অল্প বয়সেই নানা স্বজাতি-হিতকর অনুষ্ঠানের প্রতি তাঁহার আকর্ষণ দৃষ্ট হইত। আসাম যোগি-সম্মিলনীর ৫ম বার্ষিক অধিবেশনে শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও স্বেচ্ছাসেবকরূপে মাতৃসেবায় নিযুক্ত হইয়া (১৩৩২ বাং ২৯শে চৈত্র) অধিবেশনস্থলেই একদিনের কলেরা রোগে ১৫ বৎসর বয়সে ইনি পরলোকগমন করেন।

কবিরাজ **৺রসরাজ নাথ—** মুর্শিদাবাদ জিলার অন্তর্গত ব্রাহ্মণী গ্রামে ইহার নিবাস ছিল। ইনি আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনীর পঞ্চদশ বার্ষিক অধিবেশনের অনুষ্ঠাতা ছিলেন এবং ইহার যাবতীয় ব্যয় নিজে বহন করিয়াছিলেন। তিনি নানাভাবে স্বজাতি ও জনসাধারণের কল্যাণ সাধন করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে ইহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি একজন সুনিপুণ অভিজ্ঞ কবিরাজ বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার বাহিরেও তাঁহার চিকিৎসার খ্যাতি বিস্তার লাভ করে। চিকিৎসা ব্যবসায়ে তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়া ধনশালী হইয়াছিলেন। ইনি খুব নিষ্ঠাবান ও দেব-দ্বিজে ভক্তিসম্পন্ন ছিলেন। ১৩৩৩ সালে কবিরাজ মহাশয় তীর্থযাত্রা করেন। বদরিকা আশ্রম হইতে গৃহে প্রত্যাগমনকালে ২০শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে তিনি পথিমধ্যে প্রাণত্যাগ করেন।

৺নীরদবরণ নাথ— বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত নবগ্রামে ইহার নিবাস ছিল। যোগিসখা-প্রতিষ্ঠা ও প্রচার-কার্য্যে ইনিও অরবিন্দের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন। ইনি যোগিসখার প্রথম কার্য্যাধ্যক্ষ। প্রধানতঃ ইহারই যত্নে ও উৎসাহে যোগিসখা ক্রমশঃ প্রসার লাভ করে। জাতীয় উন্নতির পথ-প্রদর্শক-

-গণের মধ্যে নীরদবরণের নাম উল্লেখযোগ্য। ইং ১৯২৪।৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ইনি পরলোকগমন করেন।

৺মণিভূষণ নাথ— ১৮৮৩ সালে নদীয়ার কৃষ্ণনগরে ইহার জন্ম হয়। ইহার চেষ্টার ফলে আসাম-বঙ্গের বাহিরেও কয়েকটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ৺কাশীধাম দেবনাথ চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠার তিনি একজন প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। ৺কাশী বিশ্বনাথ প্রিন্টিং ওয়ার্কসের তিনি ছিলেন পরিচালক ও স্বত্বাধিকারী।

১৯২৫ সালের ৮ই মে তারিখে ইনি বিশ্বনাথের পবিত্র ক্রোড়ে চিরবিশ্রাম লাভ করেন।

পণ্ডিত **৺রাসমোহন নাথ—** ঢাকা বিক্রমপুরের লৌহজঙ্গ গ্রামে ১২৭৪ সালে ইহার জন্ম হয়। পাবনা জিলার অন্তর্গত সিরাজগঞ্জ টাউনে ইনি শিক্ষকতা করিতেন। স্বজাতিহিতৈষী ও ছাত্রবৎসল শিক্ষকরূপে তিনি অশেষ যশ অর্জ্জন করেন। ইনি অনেক স্কুল-পাঠ্যের ব্যাখ্যাকার ছিলেন। তাঁহার কৃত কয়েকখানি গ্রন্থ স্কুল-পাঠ্যরূপে অনুমোদিত হইয়াছিল। ১৩৩৪ সালের ৪ঠা অগ্রহায়ণ তিনি সজ্ঞানে পরলোকগমন করেন।

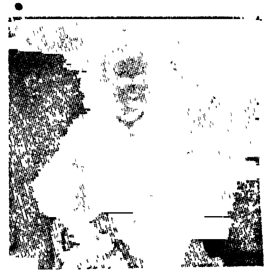
৺বঙ্কিমচন্দ্র বরা— কামরূপ জিলার সংসারী নামক স্থানে ১২৯৪ বাঙ্গালায় ইহার জন্ম হয়। আসাম উপত্যকার অন্যতম বিশিষ্ট স্বজাতিহিতৈষী বলিয়া তাঁহার বিশেষ খ্যাতি আছে। আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনীর রহা অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক, যোগিসখার সহঃ সম্পাদক, কামরূপ যোগি-সম্মিলনীর সম্পাদক এবং আরও কয়েকটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠানের ইনি বিশিষ্ট কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন। ১৩৩৪ বাং ১৪ই বৈশাখ প্রায় ৪০ বৎসর বয়সে ইনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

৺ঈশানচন্দ্র নাথ, আয়ুর্ব্বেদবিনোদ— ময়মনসিংহ জিলার সেরপুরের বাণেশ্বরদী গ্রামে ১২৭০ সালের ২৫শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে ইনি জন্মগ্রহণ করেন।

ইনি স্থানীয় সমাজে উপবীত প্রচলনের সর্ব্বপ্রধান উদ্যোগী ও অগ্রণী ছিলেন। তাঁহার নেতৃত্বে এই অঞ্চলের স্বজাতিসমাজ নানা ভাবে উন্নত ও গৌরবান্বিত হইয়াছে। ১৩৩৫ বাং ১০ই আশ্বিন তারিখে ইনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

৺সত্যচরণ নাথ, বি-এ— খুলনা জিলার ভৈরব নদের তীরবর্ত্তী কর্ণপুর গ্রামে ১২৯৯ সনের মাঘ মাসে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার অমায়িক মধুর ব্যবহার, সদা সহাস্য বদন এবং স্বজাতির জন্য তাঁহার প্রাণপাত পরিশ্রম সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিল। যোগিজাতির ইতিহাস প্রণয়নে ইনি উৎসাহী হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। ১৩৩৫ বাঙ্গালার ১৩ই অগ্রহায়ণ তিনি অকালে কালগ্রাসে পতিত হন।

৺বঙ্গবিহরী হালদার— ইনি বরিশাল জিলার অন্তর্গত ঝালকাঠির অধিবাসী। ১২৭৭ সালের ৫ই ফাল্গুন তারিখে তাঁহার জন্ম হয়। আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনীর সৃষ্টির সময় হইতে মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত হালদার মহাশয় মনে প্রাণে ইহার কল্যাণ চিন্তা করিয়া গিয়াছেন। তিনি স্থানীয় কয়েকটি সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের বিশিষ্ট কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন। ১৩৩৬ বাং ৭ই মাঘ ইনি পরলোকগমন করেন।



৺কৃষ্ণচন্দ্র নাথ— রাজসাহী জিলার সুরপুর গ্রামে ১২৩২ বাঙ্গালায় ইঁহার জন্ম হয়। ইনি স্বজাতিসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া স্থানীয় সামাজিক বহু কুরীতির সংস্কার সাধন করেন। ১৩৩৬ বাং ১২ই শ্রাবণ তারিখে প্রায় ১০৪ বৎসর বয়সে ইনি পরলোকগমন করেন।

৺নবকুমার নাথ— নবকুমার চট্টগ্রাম জিলার দক্ষিণকাট্টলী গ্রামে ১২৭৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। স্থানীয় সমাজে শিক্ষাবিস্তার ও বিবিধ সংস্কার

দ্বারা এই দরিদ্র জাতিকে উন্নতির পথে অগ্রসর করার জন্য তিনি আজীবন চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। ১৩৩৬ বাং ১৩ই আশ্বিন তারিখে ইনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

৺উত্তমচন্দ্র নাথ— ২৪ পরগণার হাজিপুরে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ১৩ই অক্টোবর ইঁহার জন্ম হয়। ইনি বঙ্গীয় সরকারের দায়িত্বপূর্ণ আবগারী ইন্‌স্‌পেক্টার পদে নিযুক্ত থাকিয়াও নানাভাবে স্বজাতির সেবা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। তিনি কিছুদিন যোগিসভার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। ১৩৩৬ বাং ৩১শে আষাঢ় ৬৩ বৎসর বয়সে ইনি পরলোকগমন করেন।

৺গোপীচরণ নাথ— ইনি কাছাড় জিলার বিক্রমপুরে ১২৮৭ বাং ৩০শে



ফাল্গুন তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনী সৃষ্টির পর হইতে আসাম প্রদেশে যাঁহারা জাতীয় জাগরণ ও অনুপ্রেরণা আনয়ন করেন গোপীচরণ তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার আর্থিক সাহায্যে অনেক স্বজাতিযুবক উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে সমর্থ হইয়াছেন। আসাম পুলিশ বিভাগে ইনি পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। ১৩৩৬ বাং ২৮শে আষাঢ় তারিখে কোন অজ্ঞাত কারণে তিনি আত্মহত্যা করেন।

৺কেশবচন্দ্র নাথ— শ্রীহট্ট জিলার অন্তর্গত করিমগঞ্জের নরসিংহপুরে ইঁহার নিবাস ছিল। শ্রীহট্টের আধুনিক পুরোহিত আন্দোলনের ও উপনয়ন সংস্কারের তিনি অন্যতম নেতা ছিলেন। স্থানীয় বাজারের ভিন্ন জাতীয় লোকদের সহিত স্বজাতিদের মতভেদ উপস্থিত হইলে জাতির সম্মান রক্ষার জন্য তিনি তাঁহার জমিতে নিজ ব্যয়ে এক বাজার স্থাপন করেন। উহা এখনও নাথবাজার নামে খ্যাত। ১৩৩৬ বাংলায় ইনি পরলোকগমন করেন।

৺কৃষ্ণহরি মজুমদার, এম-এ— নোয়াখালি জিলার হাজিপুর গ্রামে ইঁহার নিবাস ছিল। ইনি কৃতিত্বের সহিত গণিত শাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে (তৃতীয় স্থান) এম-এ পাশ করিয়া ভারত সরকারের ইনকাম ট্যাক্স অফিসার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। দায়িত্বপূর্ণ পদে থাকিয়াও তাঁহার অকৃত্রিম স্বজাতিপ্রীতি শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। ১৩৩৭ বাঙ্গালার ৪ঠা পৌষ ইনি অকালে কালগ্রাসে পতিত হন।

৺হরিমোহন নাথ— ১২৭৫ সালের ১৪ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে নোয়াখালি জিলার রামগঞ্জ থানার পরকোট গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি আজীবন স্বজাতিহিতৈষী, পরম বিদ্যোৎসাহী এবং ছাত্রবৎসল শিক্ষক ছিলেন। স্বগ্রামে মধ্য-ইংরাজী স্কুল প্রতিষ্ঠা তাঁহার জীবনের সর্ব্বশেষ কীর্ত্তি। ১৩৩৭ বাং ১৯শে ফাল্গুন ইনি পরলোকগমন করেন।

কবিরাজ **৺মদনমোহন নাথ**—১২৮৩ সালে বরিশাল জেলার পিরোজপুর মহকুমার ছোনাউটা গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। তিনি বাল্যকাল হইতেই স্বজাতিহিতৈষী, পরোপকারী ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। স্থানীয় নানাবিধ জনহিতকর কার্য্যে তিনি অগ্রণী ছিলেন। ১৩৩৭ সালের ৪ঠা চৈত্র ইনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

৺হরিচরণ নাথ— বরিশালের কৃষ্ণকাঠিতে ১২৭৯ সালে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি যে শুধু একজন স্বজাতিহিতৈষী ছিলেন এমন নহে, স্থানীয় জনসাধারণের সুখ সুবিধার জন্য জলাশয় প্রতিষ্ঠা, রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ প্রভৃতি কার্য্যে তিনি বিশেষ উদ্যোগী ও অগ্রণী ছিলেন। ১৩৩৯ বাং ২৮শে পৌষ তারিখে ৬০ বৎসর বয়সে ইনি পরলোকগমন করেন।

৺বিষ্ণুধর দেবনাথ— উত্তর-বঙ্গ যোগি-সমাজ সংস্কার কার্য্যে যাঁহারা সর্ব্বাগ্রগণ্য ছিলেন নাথ মহাশয় তাঁহাদের অন্যতম। তিনি উত্তর-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনীর সম্পাদক ছিলেন। ১৩৪০ বাং ৪০ বৎসর বয়সে ইনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

৺যশোদাকুমার ভৌমিক, বি-এ— ইনি নোয়াখালি জিলার ঘাটলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। যোগিসমাজের উদীয়মান নেতৃগণের মধ্যে ইনি ছিলেন অন্যতম। ইনি নোয়াখালি সহরের আদালতে সেরেস্তাদার ছিলেন। সততার জন্য ইনি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ১৩৪০বাং ২৯শে বৈশাখ ইনি অকালে কালগ্রাসে পতিত হন।

৺হরিপদ নাথ— বর্দ্ধমান জিলার কাটোয়ায় ইঁহার নিবাস ছিল। ইনি যে কেবল শুধু পরম স্বজাতিহিতৈষী ছিলেন এমন নহে, জনহিতকর কার্য্যেও তিনি অগ্রণী ছিলেন। কাটোয়াতে বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব নিবারণের জন্য কূপ খনন প্রভৃতি জনহিতকর কার্য্য করিয়া ইনি সাধারণের প্রীতি ও শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৩৪০ বাং ১৬ই পৌষ ইনি পরলোক-গমন করেন।

কবিরাজ **৺গোবিন্দচন্দ্র পণ্ডিত**— ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত টাঙ্গাইল মহকুমার বাঙ্গড়া গ্রামে নিষ্ঠাবান পুরোহিতবংশে ইঁহার জন্ম হয়। পৌরোহিত্যে ইঁহার গভীর জ্ঞান ছিল। বৃদ্ধ বয়সেও তিনি যুবজনোচিত উৎসাহে জাতীয় উন্নতিজনক কার্য্যের নেতৃত্ব করিয়া গিয়াছেন। ১৩৪০ বাং ২৪শে শ্রাবণ তারিখে ইনি লোকান্তরে গমন করেন।

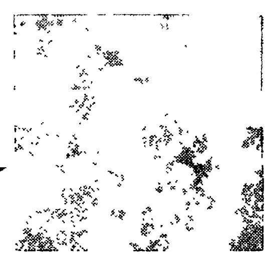
৺জয়চন্দ্র নাথ— ত্রিপুরা জিলার সরাইলে ১৩০৬ সালে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনী ও যোগিসখা পত্রিকার হিসাব পরীক্ষক ছিলেন। তিনি হুগলি জিলার অন্তর্গত রিসড়া মিউনিসিপালিটির হেড্ ক্লার্ক ছিলেন। ১৩৪১।২৩শে আষাঢ় ৩৫ বৎসর বয়ক্রম কালে ইনি লোকান্তরিত হন।

৺আনন্দচন্দ্র নাথ— ইনি নোয়াখালি জিলার চৌমুহনীর নিকটবর্ত্তী পল্লীর অধিবাসী ছিলেন। স্বজাতির উন্নতিই ছিল তাঁহার জীবনের লক্ষ্য। স্থানীয় প্রত্যেকটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্য তিনি আন্তরিকভাবে কঠোর

পরিশ্রম করিতেন। ১৩৪১ বাং ৫ই বৈশাখ মাত্র ৩৫ বৎসর বয়সে ইনি লোকান্তরিত হন।

৺ভোগদত্ত নাথ— কামরূপ জেলার বরনগরে ইহার নিবাস ছিল। তিনি বরনগর যোগি-সম্মিলনীর সম্পাদক ছিলেন। ১৩৪১ বাং ২৬শে ফাল্গুন ইনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

৺শশিভূষণ নাথ সাহা— নদীয়া জিলার ভেড়ামারায় ইহার নিবাস ছিল। ১২৯০ সালের ১৩ই ভাদ্র তারিখে তাঁহার জন্ম হয়। ইনি আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনীর ভেড়ামারা অধিবেশনের উদ্যোক্তা ও অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন। তাঁহার অকৃত্রিম স্বজাতি-প্রেম, নির্ভীকতা ও কর্ম্মোৎসাহ দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইত। তিনি কোন ডিগ্রীধারী না হইলেও তাঁহার জ্ঞান, বুদ্ধি, বিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞতা সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিত। বুদ্ধিবলে ও পরিশ্রম



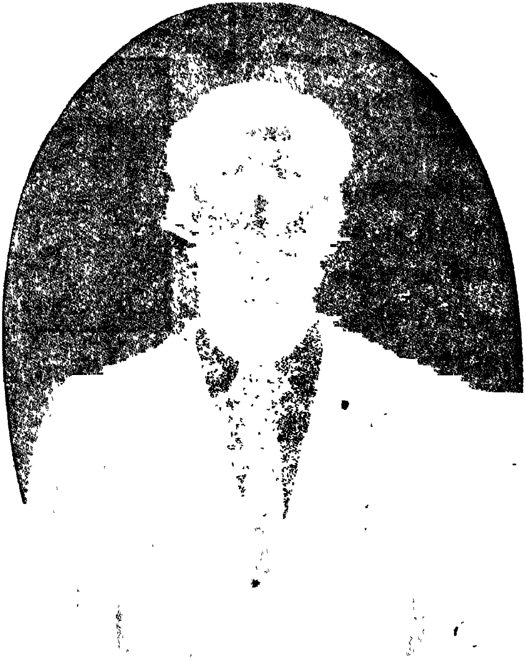
গুণে তিনি ব্যবসাক্ষেত্রে বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ১৩৪১ বাং ২৭শে চৈত্র তারিখে ইনি পরলোক গমন করেন।

৺নারায়ণ নাথ লস্কর— কাছাড়ের মুক্তাছড়ায় ইহার বাসস্থান ছিল। জনহিতকর নানাবিধ কার্য্য করিয়া ইনি সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি শেষ জীবনে গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রমে নিত্যানন্দ দাস বৈষ্ণব নামে খ্যাত হইয়া প্রায় ৭৫ বৎসর বয়সে লোকান্তর গমন করেন।

৺রামকুমার নাথ, বিদ্যাবিনোদ— ১২৬৫ সালের ১লা বৈশাখ ইহার জন্ম হয়। কলিকাতার নারিকেলডাঙ্গায় ইহার নিবাস ছিল। জাতীয় জাগরণের ঊষা-যুগে স্বজাতিপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়া যাঁহারা জাতির পরম হিতসাধনে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন রামকুমার তাঁহাদের অনুব্রত সহচর ছিলেন। ইনি

'মণিমোহন জীবনী' নামে পরম উপাদেয় গ্রন্থ সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। এই গ্রন্থে জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস অতি সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ আছে যোগিসখায় সহিতও তিনি বহুদিন নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৩৪১ বাং ১ বৈশাখ ৭৬ বৎসর বয়সে ইনি লোকান্তর গমন করেন।

৺দুলালচন্দ্র নাথ চৌধুরী— কাছাড় জিলার মুক্তাছড়া গ্রামে ইহার জন্ম হয়। ইনি আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনীর সহঃ সম্পাদক, সুরমা উপত্যক



যোগি-সম্মিলনীর সভাপতি এবং উত্তর-বঙ্গ যোগিসমাজ-সংস্কারক ছিলেন যোগিজাতির কল্যাণ-সাধনায় দুলালচন্দ্র জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন

১৩৪২ সালের ৮ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে মাত্র ৩৪ বৎসর বয়সে ইনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

৺নারায়ণ নাথ— ত্রিপুরারাজ্যের ধর্ম্মনগরের ইছাই সোনাপুরে ইঁহার নিবাস ছিল। ১২৭৩ বাং ১৯শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি স্বজাতিহিতকর নানাবিধ কার্য্য করিয়া ১৩৪২ বাং ১১ই বৈশাখ তারিখে পরলোক গমন করেন।

৺কার্ত্তিকচন্দ্র নাথ— ইনি হুগলী শ্রীরামপুরের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী এবং কে, সি, নাথ এণ্ড কোং-এর স্বত্বাধিকারী ছিলেন। আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনী ও যোগিসখার কার্য্যে সহায়তা করিয়া তিনি উহার পুষ্টি সাধনের জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। ১৩৪২ বাং ৩০শে ভাদ্র তারিখে ৫১ বৎসর বয়সে ইনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

৺দীননাথ নাথ মাষ্টার— শ্রীহট্ট জিলার কুলাউড়া থানার সাগরনাল গ্রামে ইঁহার নিবাস ছিল। ১২৮২ বাং ১৫ই আশ্বিন ইঁহার জন্ম হয়। ইনি পরম স্বজাতিহিতৈষী ছিলেন। ১৩৪২ বাং ১২ই ভাদ্র তারিখে ইনি পরলোকগত হন।

৺লক্ষ্মীচরণ নাথ— ১২৭৯ বাং ২০শে আশ্বিন তারিখে কাছাড় জিলার অন্তর্গত করিমগঞ্জের নরসিংহপুরে ইহার জন্ম হয়। নানাভাবে স্বজাতির সেবা করিয়া ইনি যশস্বী হইয়াছিলেন। মোক্তারী ব্যবসায়েও তাঁহার বেশ খ্যাতি ছিল। সুরমা উপত্যকার স্বজাতি-সাধারণকে অনুন্নত তালিকাভুক্ত করাই মঙ্গলজনক ভাবিয়া তিনি শেষ জীবনে এ সম্বন্ধীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। ১৩৪২ বাং ৯ই আশ্বিন তারিখে ইনি পরলোক গমন করেন।

৺লোকনাথ নাথ—শ্রীহট্টে ইঁহার নিবাস ছিল। অকৃত্রিম স্বজাতিহিতৈষী, সুবক্তা ও বিশিষ্ট কর্ম্মী বলিয়া তাঁহার বেশ খ্যাতি ছিল। স্বজাতিহিতকর প্রত্যেক কার্য্যেই তাঁহার কর্ম্মতৎপরতার পরিচয় পাওয়া যাইত। ১৩৪৩ বাং ২৩শে বৈশাখ ৬৫ বৎসর বয়সে ইনি কাল-গ্রাসে পতিত হন।

'মণিমোহন জীবনী' নামে পরম উপাদেয় গ্রন্থ সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। এই গ্রন্থে জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস অতি সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ আছে। যোগিসখার সহিতও তিনি বহুদিন নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৩৪১ বাং ৯ই বৈশাখ ৭৬ বৎসর বয়সে ইনি লোকান্তর গমন করেন।

৺দুলালচন্দ্র নাথ চৌধুরী— কাছাড় জিলার মুক্তাছড়া গ্রামে ইহার জন্ম হয়। ইনি আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনীর সহঃ সম্পাদক, সুরমা উপত্যক



যোগি-সম্মিলনীর সভাপতি এবং উত্তর-বঙ্গ যোগিসমাজ-সংস্কারক ছিলেন। যোগিজাতির কল্যাণ-সাধনায় দুলালচন্দ্র জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

১৩৪২ সালের ৮ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে মাত্র ৩৪ বৎসর বয়সে ইনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

৺নারায়ণ নাথ— ত্রিপুরারাজ্যের ধর্ম্মনগরের ইছাই সোনাপুরে ইঁহার নিবাস ছিল। ১২৭৩ বাং ১৯শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি স্বজাতিহিতকর নানাবিধ কার্য্য করিয়া ১৩৪২ বাং ১১ই বৈশাখ তারিখে পরলোক গমন করেন।

৺কার্ত্তিকচন্দ্র নাথ— ইনি হুগলী শ্রীরামপুরের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী এবং কে, সি, নাথ এণ্ড কোং-এর স্বত্বাধিকারী ছিলেন। আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনী ও যোগিসখার কার্য্যে সহায়তা করিয়া তিনি উহার পুষ্টি সাধনের জন্য বিশেষ-ভাবে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। ১৩৪২ বাং ৩০শে ভাদ্র তারিখে ৫১ বৎসর বয়সে ইনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

৺দীননাথ নাথ মাষ্টার— শ্রীহট্ট জিলার কুলাউড়া থানার সাগরনাল গ্রামে ইঁহার নিবাস ছিল। ১২৮২ বাং ১৫ই আশ্বিন ইঁহার জন্ম হয়। ইনি পরম স্বজাতি-হিতৈষী ছিলেন। ১৩৪২ বাং ১২ই ভাদ্র তারিখে ইনি পরলোকগত হন।

৺লক্ষ্মীচরণ নাথ— ১২৭৯ বাং ২০শে আশ্বিন তারিখে কাছাড় জিলার অন্তর্গত করিমগঞ্জের নরসিংহপুরে ইঁহার জন্ম হয়। নানাভাবে স্বজাতির সেবা করিয়া ইনি যশস্বী হইয়াছিলেন। মোক্তারী ব্যবসায়েও তাঁহার বেশ খ্যাতি ছিল। সুরমা উপত্যকার স্বজাতি-সাধারণকে অনুন্নত তালিকাভুক্ত করাই মঙ্গলজনক ভাবিয়া তিনি শেষ জীবনে এ সম্বন্ধীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব করিয়া-ছিলেন। ১৩৪২ বাং ৯ই আশ্বিন তারিখে ইনি পরলোক গমন করেন।

৺লোকনাথ নাথ— শ্রীহট্টে ইঁহার নিবাস ছিল। অকৃত্রিম স্বজাতি-হিতৈষী, সুবক্তা ও বিশিষ্ট কর্ম্মী বলিয়া তাঁহার বেশ খ্যাতি ছিল। স্বজাতি-হিতকর প্রত্যেক কার্য্যেই তাঁহার কর্ম্মতৎপরতার পরিচয় পাওয়া যাইত। ১৩৪৩ বাং ২৩শে বৈশাখ ৬৫ বৎসর বয়সে ইনি কাল-গ্রাসে পতিত হন।

৺সারদা প্রসাদ দালাল— ইনি বসিরহাটের (২৪ পরগণা) প্রসিদ্ধ জমিদার ছিলেন। ১২৭৬ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে ইহার জন্ম হয়। সতের বৎসর কাল প্রত্যহ তাঁহার বাড়ীতে চারি পাঁচশত দরিদ্র নারায়ণের সেবা হইত। জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সহস্র সহস্র বুভুক্ষু নরনারী তাঁহার দানে পরিতৃপ্ত হইয়াছে। তিনি চৌদ্দ হাজার টাকা ব্যয়ে তাঁহার পিতার নামে বসিরহাটে ঈশান বোর্ডিং স্থাপন করিয়া ইহাকে বিঘ্নবিহীন করার জন্য ইহার নামে ৬০ হাজার টাকার ক্যাস সার্টিফিকেট ক্রয় করিয়া দিয়া গিয়াছেন। ইহা স্বজাতিকল্যাণের মুখ্য উদ্দেশ্যে স্থাপিত হইলেও এখানে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকল দরিদ্র মেধাবী ছাত্রকেই শিক্ষার সুযোগ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। ১৩৪৩ বাং ২৭শে আষাঢ় তারিখে ইনি ইহলীলা সম্বরণ করেন।

কবিরাজ **৺রসিকলাল দেবনাথ**—১২৬৩ সালের বৈশাখ মাসে খুলনা জেলার কার্ত্তিকদিয়া গ্রামে ইহার জন্ম হয়। কবিরাজী ব্যাবসায় দ্বারা তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া ইহার অধিকাংশ জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে দরিদ্রের কল্যাণের জন্য ব্যয় করিয়াছিলেন। ১৩৩৩ বাং রাসপূর্ণিমার দিন ৮০ বৎসর বয়সে ইনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

৺শচীন্দ্রকুমার রায়, জমিদার— নোয়াখালির দালাল বাজারের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার বংশে ১২৮৮ সালের ১৭ই মাঘ তারিখে ইহার জন্ম হয়। ইনি নোয়াখালি নাথব্যঙ্কের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও উহার ডিরেক্টারবোর্ডের সভাপতি এবং নোয়াখালি জেলা বোর্ডের মেম্বার ছিলেন। রায় পরিবারের অন্যান্য জমিদারের ন্যায় ইনিও নানাবিধ জনহিতকর কার্য্য করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। ১৩৪৪ বাং ২৪শে ফাল্গুন ইনি পরলোক গমন করেন।

পণ্ডিত **৺নারায়ণ নাথ আঝারভুঞা**— কাছাড়ের সৈদবন্দে ইহার নিবাস ছিল। ১২৬৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে ইহার জন্ম হয়। ইনি কাছাড়

যোগি-সমাজের অন্যতম জনপ্রিয় নেতা ছিলেন। ১৩৪৪ বাং ১১ই কার্ত্তিক ৭৮ বৎসর বয়সে ইনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

৺গোলাপমণি নাথ মজুমদার—কাছাড়ের লালায় ইঁহার নিবাস ছিল। ইনি আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনীর আজীবন সদস্য, হাইলাকান্দি লোকাল বোর্ডের সদস্য, স্থানীয় পঞ্চায়েত সভার সভাপতি এবং আরও কয়েকটি জনহিত-কর প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন। ১৩৪৪ বাং ২৬ শে বৈশাখ ৬৯ বৎসর ৪ মাস বয়সে ইনি পরলোক গমন করেন।



৺কুঞ্জমণি নাথ ধামান্দি বড়ভুঞা—১২৭৬ বাং কাছাড়ের হাইলাকান্দিতে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনীর আজীবন সদস্য ও স্থানীয় যোগি-সমাজের অন্যতম নেতা ছিলেন। ১৩৪৪ বাং ২৮শে বৈশাখ ইনি ইহলোক ত্যাগ করেন।



কুঞ্জমণি নাথ ধামান্দি বড়ভুঞা

৺মতিলাল দালাল—খুলনা জিলার বামুন্দিয়ায় ইঁহার নিবাস ছিল। জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে দরিদ্র ছাত্রগণকে অর্থ সাহায্য করিয়া, অনাথা বিধবা ও দুস্থদের অন্ন দান করিয়া তিনি তাঁহার প্রভূত ধনের সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। ১৩৪৬ বাং ২৪শে অগ্রহায়ণ তারিখে ইনি পরলোক গমন করেন।

কবিরাজ **৺মাণিকচন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য**—যশোহর জিলার অন্তর্গত ঝিকরগাছার নিকট খেদাপাড়া গ্রামে ইঁহার বাসস্থান ছিল। তিনি স্থানীয় সমাজের একজন বিশিষ্ট সমাজপতি ছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় সামাজিক নানা

কুসংস্কার দূর হইয়াছিল। ১৩৪৬ বাং ২রা ফাল্গুন তারিখে ৮০ বৎসর বয়সে ইনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

৺রত্নেশ্বর ভূঞা—দরঙ্গ জিলার ছিপাঝারে (মঙ্গলদৈ) ইঁহার নিবাস ছিল। আসাম উপত্যকার যে সব স্বজাতিহিতৈষী স্বজাতির স্বার্থ রক্ষার জন্য বিশেষভাবে ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন, ইনি তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। ১৯১২ সনে ইনি উপবীত সংস্কার গ্রহণ করায় সমাজচ্যুত হইয়াছিলেন। ১৩৪৭ সনের ভাদ্র মাসের ১০ই তারিখে ইনি পরলোক গমন করেন।

৺সুন্দর নাথ চৌধুরী— ১২৭০ বঙ্গাব্দে শ্রীহট্ট জিলার কুমড়ি গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। শিক্ষাবিস্তারের জন্য তিনি কাদিরপুর মধ্যইংরাজী স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। দরিদ্রের ঘরে জন্মিয়াও তিনি পরিশ্রম ও অধ্যবসায়বলে লক্ষপতি হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৩৪৭ বাং ৭ই কার্ত্তিক অশীতিবর্ষ বয়সে ইনি অমরধামে প্রস্থান করেন।



সুন্দরনাথ চৌধুরী

৺নীলকণ্ঠ পণ্ডিত— ইনি রাজসাহী জিলার অন্তর্গত পাথরঘাটা গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনীর বগুড় অধিবেশনের তিনি অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক ছিলেন। তিনি রাজসাহী জিলা-সমিতি গঠন করিয়া জাতীয় উন্নতির সূত্রপাত করেন। ১৩৪৭ বা' ২৩শে কার্ত্তিক ৭০ বৎসর বয়সে ইনি পরলোক গমন করেন।

৺লক্ষ্যমণি নাথ বড়ভুঞা— ১২৯৮ সালের ১২ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে কাছাড়ে নরসিংহপুরে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনীর আজীব সদস্য ও স্থানীয় স্বর্ণলক্ষ্মী হাইস্কুল কমিটীর সম্পাদক ছিলেন। প্রধানতঃ তাঁহার

চেষ্টায় উক্ত হাইস্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৩৪৭ বাং ২৪শে ফাল্গুন ইনি মানবলীলা সম্বরণ করেন।

সাধু ৺খুদীরাম নাথ— ১২৯৮ বাং ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত গোয়ালন্দের বাণীবহ গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি পরম স্বজাতিহিতৈষী ও ধার্ম্মিক ছিলেন। ইঁহার হিন্দু-মুসলমান অনেক শিষ্য ছিল। ১৩৪৮ বাং ৫০ বৎসর বয়সে ইনি তিরোহিত হন।

৺গোপীবল্লভ বিশ্বাস— নদীয়া জিলার তারাগুনিয়ায় ১২৮৯ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে ইঁহার জন্ম হয়। বিভিন্ন জাতীয় প্রতিষ্ঠানের বিশিষ্ট কর্ম্মকর্ত্তা হিসাবে বিশ্বাস মহাশয় যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি যখন যে প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিতেন তখন তাঁহারই প্রাণস্বরূপ হইয়া উহাকে প্রাণবন্ত করিয়া তুলিতেন। বহুদিন তারাগুনিয়া মধ্যইংরাজী স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি সুদক্ষ শিক্ষক বলিয়া পরিচিত ও সম্মানিত হইয়াছিলেন। ইনি সুরসিক, সুলেখক ও সুবক্তা ছিলেন। গীতা, ভাগবৎ ও বৈষ্ণব গ্রন্থে তাঁহার সুগভীর জ্ঞান ছিল। ১৩৪৮।১৪ই ভাদ্র ইনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

পণ্ডিত ৺শরচ্চন্দ্র নাথ—১৮৫৮ ইংরাজী জানুয়ারী মাসে শ্রীহট্ট জিলার অন্তর্গত হবিগঞ্জের বগাডুবি গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। শিক্ষা প্রচার, সঙ্ঘ গঠন, উপনয়ন সংস্কার, পুরোহিত সংস্কার প্রভৃতি আন্দোলন দ্বারা তিনি স্থানীয় সমাজের পরমোপকার সাধন করিয়াছিলেন। ১৩৪৯ বাং ১৬ই কার্ত্তিক ৮২ বৎসর বয়সে ইনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

৺চন্দ্রকুমার নাথ— ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত চাঁদপুরের হিন্দুলি (বসুর তালুক) গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। তিনি বি-এসসি, বি-এল পরীক্ষায় পাশ করিয়া শিক্ষকতা কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। শিক্ষা প্রচার ও শিক্ষাদানই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। ১৩৪৯ বাং ২রা শ্রাবণ ৫৩ বৎসর বয়সে ইনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

৺রাধিকা প্রসাদ নাথ, বি-এ—নদীয়া জিলার অন্তর্গত ইনাতপুর বাড়দি গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। বিদ্যোৎসাহিতা ইঁহার চরিত্রের মহৎ গুণ ছিল। ৺রাধিকা বাবু ব্রহ্ম সরকারের একাউন্টেণ্ট ছিলেন। তিনি একজন মেধাবী ছাত্র ছিলেন। মধ্য ইংরাজী ও এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া তিনি বৃত্তি লাভ করেন। জাপানী আক্রমণের সময় তথা হইতে দেশে ফিরিবার পথে হাইলাকান্দি (কাছাড়) হাসপাতালে ১৩৪৯ বাং ২৬ শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়।

৺মহেন্দ্রমোহন নাথ লস্কর—কাছাড় জিলার অন্তর্গত লালা গ্রামে ১২৮৭ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনীর সহঃ সভাপতি ছিলেন। পৌরোহিত্যে তাঁহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি সম্মিলনী হইতে "ক্রিয়াকাণ্ড বিশারদ" উপাধি লাভ করেন। ১৩৪৯ বাং জ্যৈষ্ঠ মাসে তিনি পরলোক গমন করেন।

৺যাত্রানাথ লস্কর—কাছাড় জিলার হাইলাকান্দির মুক্তাছড়া গ্রামে ১৭৯২ শকাব্দাতে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি কাছাড়ের আধুনিক পুরোহিত আন্দোলনের অন্যতম নেতা ও আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনীর আজীবন সদস্য ছিলেন। ১৩৪৯ বাং ভাদ্র মাসের ঝুলন পূর্ণিমা দিবসে ৮০ বৎসর বয়সে ইনি লোকান্তর গমন করেন।

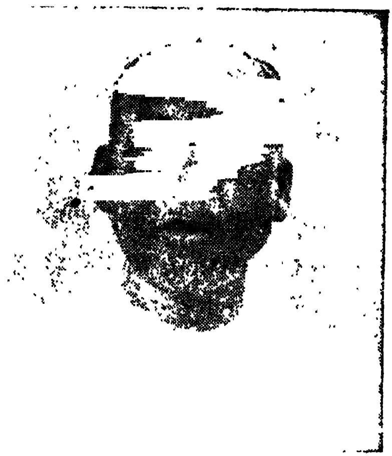


যাত্রানাথ লস্কর

৺গোলকচন্দ্র নাথ বড়ভুঞা—১২৭৩ সালের আষাঢ় মাসে কাছাড় জিলার অন্তর্গত শিলচরের বড়খলা গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। তিনি দীর্ঘকাল কাছাড় যোগি-সম্মিলনীর সভাপতি ছিলেন। বিধর্ম্মীগণের হাত হইতে কাছাড়ের চন্দ্রগিরি শিবালয়ের উদ্ধারকার্য্যে তিনি নেতৃত্ব করিয়াছেন। ১৩৪৯ বাং ২৭শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে ৭৬ বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন।

৺কালীপদ নাথ—হুগলী জিলায় শ্রীরামপুরে ইহার নিবাস ছিল। জাতীয় আন্দোলনের উষাযুগ হইতে তিনি ইহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। প্রথম উপনয়ন সংস্কার আরম্ভ হইলে ইনি বসিরহাট, যশোহর, ২৪পরগণা ও খুলনা জিলা ভ্রমণ করিয়া এই সংস্কার গ্রহণের পক্ষে জনমত গঠন করেন। ১৩৪৯ বাং ১৩ই আশ্বিন ৬৫ বৎসর বয়সে ইহার মৃত্যু হয়।

৺রাজেন্দ্রলাল নাথ—কাছাড়ের দুধপাতিল গ্রামে ১২৮৭ বাং ১৭ই আশ্বিন তারিখে ইহার জন্ম হয়। আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনী প্রতিষ্ঠার পর হইতে আসামে যে সব জনপ্রিয় নেতা সম্মিলনীর বার্ত্তা প্রচার করিয়া জাগরণ সৃষ্টি করিয়াছিলেন রাজেন্দ্রলাল তাঁহাদের অন্যতম। তিনি কয়েক বৎসর আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনীর সহঃ সভাপতি ছিলেন। তিনি স্কুল সমূহের সাবইনস্পেক্টার ও ডেপুটী ইনস্পেক্টার রূপে সুনামের সহিত কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। ১৩৪৯ বাং ১২ই কার্ত্তিক শিলচর সহরে ইনি প্রাণত্যাগ করেন।



কবিরাজ **৺বৈদ্যনাথ সরকার**— ১২৯০ সালের ৩০শে বৈশাখ তারিখে যশোহর জিলার সাঁকোগ্রামে ইহার জন্ম হয়। স্থানীয় জনসমাজে তাঁহার বিশেষ প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল। তাঁহার তেজস্বিতা, উদারতা, স্বদেশ ও স্বজাতি-প্রীতি প্রভৃতি গুণ সকলকে মুগ্ধ করিত। ১৩৫০ বাঙ্গালার ২৮শে অগ্রহায়ণ ৬১ বৎসর বয়সে ইনি লোকান্তরিত হন।

কবিরাজ ৺বনমালীচরণ নাথ— খুলনা জিলার অন্তর্গত ভাড়াসিমুলিয়া গ্রামে ইঁহার নিবাস ছিল। চিকিৎসাশাস্ত্রে তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল। শ্রেষ্ঠ ও সুবিজ্ঞ কবিরাজ বলিয়া তিনি বেশ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। স্থানীয় ভিন্ন সমাজেও তাঁহার বেশ প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল। ইনি স্বজাতির পরম হিতৈষী ছিলেন। ১৩৫০ বাং ৭ই কার্ত্তিক ৮০ বৎসর বয়সে ইনি লোকান্তর গমন করেন।

৺গগনচন্দ্র নাথ— চট্টগ্রাম জিলার মিরেশ্বরী থানার অন্তর্গত বাঘখোলা গ্রামে ১২৭৩ সালে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষাই জাতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির মূল এই বিশ্বাসে তিনি আজীবন শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তিনি শিক্ষাব্রতী ছিলেন। ১৩৫০ বাং ৭ই শ্রাবণ ৭৭ বৎসর বয়সে ইনি লোকান্তরিত হন। অধ্যাপক দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ, এম-এ তাঁহার সুযোগ্য পুত্র।

কবিরাজ ৺রূপচরণ নাথ— ইনি ১২৬২ বাঙ্গালায় শ্রীহট্ট সহরে জন্মগ্রহণ করেন। স্বজাতি-বাৎসল্য, অতিথি-পরায়ণতা প্রভৃতি গুণে তিনি ভূষিত ছিলেন। তিনি একজন সুবিখ্যাত কবিরাজ ছিলেন। ১৩৩০ সালে তিনি পরলোক গমন করেন।

৺কুলকচন্দ্র নাথ পুরকায়স্থ— কাছাড় জিলার অন্তর্গত হাইলাকান্দির বিষ্ণুপুর গ্রামে ইঁহার নিবাস ছিল। ১২৮৭ বাং ৩রা চৈত্র তারিখে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনীর আজীবন সদস্য ছিলেন। ১৩৫০ বাং ২৭শে কার্ত্তিক ইনি পরলোক গমন করেন।

৺নবেন্দ্রকিশোর রায়, জমিদার— নোয়াখালির দালালবাজারের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার বংশে ১২৭৭ সালের ১৫ই শ্রাবণ ইঁহার জন্ম হয়। রায় মহাশয় নাথব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম ছিলেন এবং স্থানীয় পল্লীসমবায় ব্যাঙ্ক তাঁহারই কীর্ত্তি। স্থানীয় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় কমিটীর সভাপতি, আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনীর চৌমুহানী অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি, ঢাকার বিজয়কৃষ্ণ

আশ্রমের ট্রাষ্টি এবং অন্যান্য কয়েকটি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের তিনি বিশিষ্ট কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার মত সুপণ্ডিত ও সুবিজ্ঞ ব্যক্তি খুব কম দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি সাম্যবাদী ও সংস্কারপন্থী ছিলেন। বড় জমিদার হইয়াও তিনি নিরহঙ্কার ছিলেন এবং নিতান্ত সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিতেন। ১৩৫১।১৪ই কার্ত্তিক ইনি পরলোকপ্রাপ্ত হন।

৺নন্দকুমার মহাজন— ইনি চট্টগ্রামের জমিদার ছিলেন। ১২৮৪ সালের ১৬ই বৈশাখ তাঁহার জন্ম হয়। তিনি মহাপীঠ সীতাকুণ্ডে আশ্রম ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া সেবায়েৎ নিযুক্ত করিয়া গিয়াছেন। তথাকার প্রতি মেলায় তিনি নিরন্ন নরনারীকে অন্ন দান করিতেন। অনেক দরিদ্র স্বজাতি তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় ও সাহায্যে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। ১৩৪৭ বাং ২৩শে ফাল্গুন ইনি পরলোক গমন করেন।



৺কমলেশ্বর নাথ— আসাম গোয়ালপাড়ায় ইহার নিবাস ছিল। ইনি আসামের যোগিজনজাগরণের অন্যতম নেতা ছিলেন। আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনীর সহঃ সভাপতি, আসাম যোগি-সম্মিলনীর সভাপতি এবং আরও কতিপয় নির্ভরযোগ্য জাতীয় প্রতিষ্ঠানের তিনি বিশিষ্ট কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন। প্রবীণ মোক্তার হিসাবেও তাঁহার বেশ খ্যাতি ছিল।

৺যোগেন্দ্রচন্দ্র নাথ, বি-এ —আসাম গোয়ালপাড়ায় ইহার নিবাস ছিল। ইনি একজন উৎসাহী কংগ্রেসকর্ম্মী ছিলেন। কংগ্রেসের পৃষ্ঠপোষকতায় ইনি আসাম বিধান-সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

৺যোগেন্দ্রচন্দ্র নাথ— গোয়ালপাড়া জিলায় খুটাঘাটে ইঁহার নিবাস ছিল। ইনি আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনীর ২৯শ বার্ষিক অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক, স্থানীয় লোকালবোর্ডের মেম্বার ও খুটাঘাট নাথ-সমিতির সম্পাদক ছিলেন। ১৩৫১ বাং ১৯শে চৈত্র তারিখে ইনি অকালে কালগ্রাসে পতিত হন।

৺সন্ধ্যারাণী দেবী— ইনি নাথবন্ধু হরিমোহনের সহধর্ম্মিণী। স্বামীর আদর্শের প্রতি ইনি ছিলেন অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীলা। এই জন্যই তিনি স্বামীসহ জাতীয় বাণী প্রচারে সভাসমিতিতে যোগদান করিয়া পরমানন্দ লাভ করিতেন। ১৩৫১ বাং ১৫ই অগ্রহায়ণ ৬২ বৎসর বয়সে ইনি লোকান্তরিতা হন।

৺রাধানাথ সন্ন্যাসী— কাছাড় জিলার অন্তর্গত সুনাই থানার মাঝির গ্রামে ইঁহার নিবাস ছিল। ১৮৬০ খৃঃ অব্দে স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া মাসাধিক কালের কঠোর পরিশ্রমে ইনি প্রসিদ্ধ ভুবনতীর্থ আবিষ্কার করেন এবং কিছুদিন তিনি ঐ তীর্থের মোহান্তপদে অধিষ্ঠিত থাকেন। তৎপর সন্ন্যাসীবাবার অনুপস্থিতির সুযোগে যোগিজাতি বিদ্বেষিগণের কুচক্রান্তে গোপালদাস নামক এক পশ্চিমা ব্রাহ্মণ তথায় প্রতিষ্ঠিত হন। পরে আদালতের বিচারে রাধানাথ উক্ত তীর্থের দুই আনা অংশ প্রাপ্ত হন, কিন্তু মনদুঃখে তিনি আর তথায় যান নাই। প্রতি বৎসর শিবচতুর্দ্দশী উপলক্ষে এখানকার মেলায় বহু জনসমাগম হয়।

পণ্ডিত **৺সুরেন্দ্র নাথ ষড়দর্শনাচার্য্য**— ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত লাকসামের দৌলতগঞ্জে ১৩০৫ বাং ১৩ই ভাদ্র তারিখে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি প্রাচীন ভারতের দর্শনশাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হইতে পণ্ডিত মহাশয় আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, কাব্য, ব্যাকরণ, সাংখ্য, বেদান্ত, বৈষ্ণব দর্শনতীর্থ, জ্যোতির্ভূষণ উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। বিভিন্ন শাস্ত্রে তাঁহার যেমন গভীর পাণ্ডিত্য ছিল, তেমনই তাঁহার গভীর স্বজাতি প্রেম ছিল। ১৩৩৪ বাং ১৭ই চৈত্র বৃহস্পতিবার তিনি অকালে কালগ্রাসে পতিত হন।

পণ্ডিত ৺**বিশ্বনাথ নাথ**—আনুমানিক ১২৪৫ বাং ইঁহার জন্ম হয়। ইনি গোয়ালপাড়া জিলার খুটাঘাট যোগি-সম্মিলনীর সভাপতি ছিলেন। এতদঞ্চলে উপবীত সংস্কার, পুরোহিত আন্দোলন, পণপ্রথা নিবারণ প্রভৃতি আন্দোলনের তিনিই সর্ব্বাগ্রে নেতৃত্ব করেন এবং নানা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সফলকাম হন। ১৩৫২ বাং ১০ই অগ্রহায়ণ তারিখে ইনি শতাধিক বৎসর বয়সে অমর-ধামে প্রস্থান করেন।

৺**পীতাম্বর নাথ**—ময়মনসিংহ জিলার মীর্জাপুর গ্রামে তাঁহার পৈত্রিক বসতবাটী ছিল। তিনি ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। তিনি একজন সুলেখক এবং স্বজাতি-ছাত্রের পরম বান্ধব ছিলেন। তাঁহার কৃত বহু পুস্তক স্কুলের পাঠ্য তালিকাভুক্ত ছিল। ১৩৫২ বাং ২৮শে মাঘ ৬৩ বৎসর বয়সে ইনি পরলোক গমন করেন।

৺**কালীপদ নাথ**—ইনি শেষ বয়সে কলিকাতার উপকণ্ঠস্থিত বরাহনগরে বাস করিতেছিলেন। ইনি বহুদিন যোগিসখার কার্য্যাধ্যক্ষ থাকিয়া দীর্ঘকাল নিঃস্বার্থভাবে ইহার কার্য্য পরিচালনায় নিযুক্ত ছিলেন। ২১।২।৪৫ ইং ইনি পরলোক গমন করেন।

৺**হুকুমচাঁদ নাথ ভক্ত**—১২৮২ সালে জলপাইগুড়ি জিলার জোড়পাকড়ী গ্রামে ইহার জন্ম হয়। মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব্বে ইনি এককালীন এক হাজার টাকা যোগিসখার উন্নতির জন্য দান করিয়া সমগ্র জাতির কৃতজ্ঞতাভাজন হন। ১৩৫২ বাং ১৪ই কার্ত্তিক ইনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

৺**বনমালী নাথ**, বি-এল— ইনি চট্টগ্রাম নাথ এসোসিয়েসনের সম্পাদক ছিলেন। জাতিসেবায় তিনি নাথবন্ধুর দক্ষিণ হস্তস্বরূপ কার্য্য করিতেন। আইন ব্যবসায়েও তাঁহার বেশ সুনাম ছিল। ২৮।৮।৪৫ ইং তারিখে ইনি অকালে কালগ্রাসে পতিত হন।

৺**মোহিনীমোহন চৌধুরী**— ইনি নোয়াখালি জিলার পূর্ব্বচন্দ্রপুরের

জমিদার ছিলেন। চৌধুরী মহাশয় চৌমুহনী নাথ সমিতির সভাপতি, নাথ-ব্যাঙ্কের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও ডিপুটী চেয়ারম্যান, সেসন জজ আদালতের স্পেশাল জুরার, তালতলা জমিদারী এষ্টেটের রিসিভার ও অন্যান্য কয়েকটি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের বিশিষ্ট কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন। চরিত্রগুণে তিনি সকলের প্রিয়ভাজন হইয়াছিলেন। ১৯৪৩ ইং ৮ই জুন ৬০ বৎসর বয়সে ইনি পরলোক-গমন করেন।

উপেন্দ্র মোহন নাথ, এম-এসসি, বি-এল— নিবাস লালা, কাছাড়। জন্ম—১৩১১ বাং ভাদ্রমাসের জন্মাষ্টমী তিথি। ইনি শিলচর জজকোর্টের উকীল এবং উদীয়মান সমাজনেতা ছিলেন। তাঁহার যেরূপ গভীর পাণ্ডিত্য ছিল, তেমনই গভীর স্বজাতিবাৎসল্য ও স্বদেশপ্রেম ছিল। ১৩৫১ বাং ১৮ই চৈত্র তারিখে ইনি অকালে কালগ্রাসে পতিত হন।

৺যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, বার-এট-ল— ইনি চট্টগ্রামের জমিদার ও কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রীত্রিপুরাচরণ চৌধুরী মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি বিলাত হইতে ব্যারিষ্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। যোগেশচন্দ্র ধর্ম্মভীরু ও নিরীহ প্রকৃতির লোক ছিলেন। অল্পদিনের অভিজ্ঞতার ফলে আইন ব্যবসায়ের কূট কৌশল ও দ্বন্দ্ব-প্রতিদ্বন্দ্বিতা তাঁহার বড়ই বিরক্তিকর বোধ হইতে লাগিল। এই জন্য তিনি ব্যারিষ্টারি পরিত্যাগ করিয়া বৈষয়িক কার্য্যে মনোনিবেশ করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় অল্প বয়সেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

৺রাজকুমার নাথ—রাজসাহী জেলার অন্তর্গত নওগাঁ মহকুমার সুরপুর গ্রামে ইহার জন্ম হয়। স্থানীয় স্বজাতিমহলে শিক্ষা বিস্তার এবং অন্য নানাবিধ কুসংস্কার দূরীকরণ প্রভৃতি জনহিতকর কর্ম্মে তিনি অগ্রণী ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৯ বৎসর হইয়াছিল।

রায় সাহেব **৺রজনীকান্ত নাথ**— বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত চাগ্রাম

নামক গ্রামে তাঁহার বাসস্থান ছিল। তিনি প্রথমতঃ সামান্য বেতনে সামান্য চাকুরি লইয়া রেলওয়ে বিভাগে প্রবেশ লাভ করেন। পরে অধ্যবসায়, কর্ত্তব্য-পরায়ণতা, কার্য্যদক্ষতা গুণে বি-এন রেলওয়ের এ্যাকাউন্ট্যান্ট পদে উন্নীত হইয়া খড়গপুরে অবস্থান করিতে আরম্ভ করেন। জনহিতকর কার্য্যে ও প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি সর্ব্বদাই যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিতেন। খড়গপুরে অবস্থান-কালে তিনি স্থানীয় অনেক প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক বা সভাপতি মনোনীত হইয়া খুব প্রভাব প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ১৯৩৯ সালের ১লা জুলাই তারিখে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

৺মতিলাল সরকার, বি-এল— যশোহর জিলার অন্তর্গত ঝাঁপা গ্রামে তাঁহার আদি বাস ছিল। তিনি প্রথমতঃ মুন্সেফি পদে নিযুক্ত হইয়া সাব্‌জজ পদে উন্নীত হন। পৈতৃক পল্লীভবন পরিত্যাগ করিয়া চাকুরিজীবনে তিনি কৃষ্ণনগর আমিনবাজারে এক সুবৃহৎ বাসভবন নির্ম্মাণ এবং তৎসহ দেবালয় ও স্বজাতির মধ্যে সংস্কৃত শিক্ষার উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ এক চতুষ্পাঠীর প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি অপুত্রক ছিলেন। সমস্ত সঞ্চিত অর্থ দিয়া তিনি ৩২০০০৲ টাকার গভর্ণমেণ্ট পেপার ক্রয় করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তৎসম্পাদিত উইল অনু-সারে গভর্ণমেণ্ট পেপারের সুদ হইতে দেবালয় ও চতুষ্পাঠীর ব্যয় নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। দুঃখের বিষয় চতুষ্পাঠী উঠিয়া গিয়াছে। দেবালয় এখনও বর্ত্তমান আছে। আমিনবাজারের সরকার বাড়ী ও উচ্চ চূড়াবিশিষ্ট দেবমন্দির সর্ব্বজন-পরিচিত। আনুমানিক ১৮৯৫ সালে তিনি পরলোক গমন করেন।

সতী **৺রাধাকিশোরী**— ঢাকা বিক্রমপুরের পাইকপাড়া গ্রামে রাধা-কিশোরীর স্বামীগৃহ ছিল। প্রবাসে সতীর স্বামী আবর্ত্ত নাথ যে মুহূর্ত্তে প্রাণ ত্যাগ করেন ঠিক সে মুহূর্ত্তে রাধাকিশোরীর গাত্র রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। আমার স্বামী আর ইহলোকে নাই একথা বলিতে বলিতে সতী সংজ্ঞাহীনা হইয়া পড়েন। তৎপর চতুর্থ রজনী শেষে তিনি অমরধামে প্রস্থান করেন।

৺সুরেন্দ্রচন্দ্র নাথ—শ্রীহট্টের কুলাউড়া থানার অন্তর্গত জাব্দা গ্রামে আনুমানিক ১২৮৭ বঙ্গাব্দে ইহার জন্ম হয়। তৎপর তিনি ত্রিপুরাষ্টেটের ধর্ম্মনগরে বাসস্থান পরিবর্ত্তন করেন। সুরেন্দ্রনাথ স্বজাতিহিতৈষী ছিলেন। স্থানীয় উপনয়ন সংস্কার আন্দোলনের তিনি অন্যতম প্রধান নেতা ছিলেন। সর্ব্বপ্রকার জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে তাঁহার কর্ম্মনিপুণতা দৃষ্ট হইত। ১৩৫৩ বাং ১৪ই বৈশাখ তারিখে ইনি ইহধাম পরিত্যাগ করেন।

৺গোপালচন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী— ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত রাজবাড়ী মহকুমার রতনদিয়া গ্রামে ইঁহার নিবাস ছিল। ইনি আজীবন স্বজাতির হিত-কল্পে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। তিনি নিজ ব্যয়ে রতনদিয়া গ্রামে একটি মধ্যইংরাজী স্কুল এবং ছাত্রদের বিশুদ্ধ পানীয় জলের জন্য একটি ইদারা স্থাপন করেন। এই ন্যায়নিষ্ঠ সচ্চরিত্র অমায়িক পরোপকারী মহাত্মা ১১৯ বৎসর বয়সে ১৩৫৩ বাং ৩০শে শ্রাবণ তারিখে পরলোক গমন করেন।

৺কৃষ্ণরাম চমুবা মৌজাদার—কামরূপ জিলার অন্তর্গত বরবংশর মৌজার শরাইঘাটা গ্রামে ১৯০৩ সনের ৭ই মার্চ্চ তারিখে ইহার জন্ম হয়। ইনি স্থানীয় জনপ্রিয় জননায়ক ছিলেন। আসাম প্রদেশে যাঁহারা জাতীয় জাগরণ সৃষ্টি করেন মৌজাদার মহাশয় তাহাদের অন্যতম ছিলেন। ইঁহার পিতা ৺হলিরাম চমুরাও সম্মানজনক মৌজাদার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১১।১১।৪৬ ইং তারিখে ৺কৃষ্ণরাম ইহলোক ত্যাগ করেন।

৺সদানন্দ নাথ— ১৩১৫ বাঙ্গালার পৌষ মাসে শ্রীহট্ট জিলার অন্তর্গত বালাগঞ্জের বড়ধিরাই গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। জনহিতকর কার্য্য করিয়া ইনি খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। সদা প্রফুল্লচিত্ততা তাঁহার সদানন্দ নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিল ১৩৫৩ বাঙ্গালার ২৪শে আশ্বিন ইনি পরলোক গমন করেন।

৺কোটীচাঁদ নাথ— ইনি ১২৮৬ সালের বৈশাখ মাসে শ্রীহট্ট সহরের

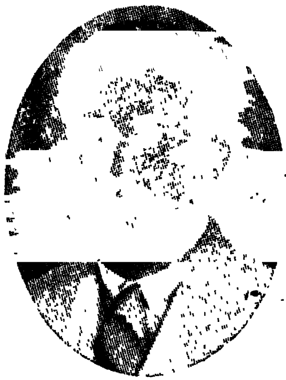
সন্নিকটে দেবপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন বিশিষ্ট সমাজনেতা ছিলেন। ১৩৫৩ বাং ৯ চৈত্র তারিখে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায় স্বীয় বাড়ীতে তিনি প্রাণ বিসর্জ্জন দেন।

৺পিপলচন্দ্র নাথ—ইনি আসামের নওঁগা জিলার অধিবাসী। নওঁগা যোগি-সম্মিলনীর সাধারণ সম্পাদক এবং অন্যান্য কয়েকটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠানের তিনি বিশিষ্ট কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন। আনুমানিক ৬৫ বৎসর বয়সে ইনি পরলোক গমন করেন।

ডাক্তার ৺বিপিনবিহারী নাথ বাগচী—নিবাস শিয়াসদী, ঢাকা (বিক্রমপুর)। ১২৭৪।৯ কার্ত্তিক তিনি জন্মগ্রহণ করেন। চিকিৎসা ব্যবসায়ে তিনি বিশেষ সুনাম ও পারদর্শিতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। এই পেশার মাধ্যমে তিনি দেশের ও দশের বিশেষ করিয়া রুগ্ন, দুঃস্থ ও আর্ত্তের সেবায় নিজকে আজীবন নিয়োজিত রাখিয়াছিলেন। তিনি ডাক্তারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের হাসপাতালে চাকুরি গ্রহণ করেন। পরে চিকিৎসানৈপুণ্য বশতঃ সরকারি চাকুরি প্রাপ্ত হইয়া নোয়াখালি জিলার ফুলগাজি, পরে রামগঞ্জ এবং সর্ব্বশেষে নোয়াখালি সদর হাসপাতালে বদলী হইয়া আসেন। এখানে ৩৫ বৎসর চাকুরি করিবার পর তিনি অবসর গ্রহণ করেন। তিনি কালাজ্বরে বিশেষজ্ঞ থাকায় অবসর গ্রহণের পরেও পুনরায় সরকারী চাকুরীতে নিয়োজিত হয়ে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করেন। চরিত্রমাধুর্য্যে ও ব্যবহারে তিনি সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিলেন।



৺কামিনীকুমার নাথ, এম-এ, বি-এল— কাছাড় জিলার হাইলাকান্দিতে ১৩০১ বাং ৫ই ভাদ্র ইঁহার জন্ম হয়। দায়িত্বপূর্ণ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও তাঁহার প্রাণে জনসেবার প্রেরণা ছিল। তাঁহার জীবন ও চরিত্রে এমন একটি মাধুর্য্য ও অমায়িক ভাব বিদ্যমান ছিল যে যিনিই একবার তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন তিনিই আর তাঁহাকে ভুলিতে পারেন নাই। ১৩৫৭ বাং ৫ই ভাদ্র তিনি পরলোক গমন করেন।



৺কামিনীকুমার নাথ

৺প্যারীসুন্দরী দেবী—১২৯১ বঙ্গাব্দের ৩০শে আশ্বিন তারিখে নোয়াখালি জিলার তালিবপুরে ইঁহার জন্ম হয়। শ্রীপাদ রাধা-গোবিন্দ যখন পাঠশালার ছাত্র সে সময় ৭ম বর্ষ বয়সে তাঁহার সহিত প্যারীসুন্দরীর বিবাহ হয়। এই পুণ্যশীলা রমণী নিতান্ত সরলস্বভাবা গৃহকার্য্যে সুনিপুণা ও সদা সহাস্যবদনা ছিলেন। তাঁহার নিকট আপন-পর ভেদাভেদ ছিল না। তিনি সকলকে অপত্যনির্ব্বিশেষে যত্ন করিতেন। তাঁহার গৃহ হইতে কখনও অভ্যাগত বিমুখ হয় নাই। ১৩৫৮ বাং ১১ই ভাদ্র তারিখে ইনি পরলোক গমন করেন।

৺সুশীলাসুন্দরী দেবী—ইনি আচার্য্য অম্বিকাচরণ নাথ মহাশয়ের সহ-ধর্ম্মিণী ছিলেন। ঢাকা সায়তা গ্রামের পণ্ডিতবংশের ইনি কুললক্ষ্মীস্বরূপিণী ছিলেন। তিনি অতিথি অভ্যাগতের প্রতি শ্রদ্ধাবতী, দেবদ্বিজের প্রতি ভক্তিমতী এবং দীনদুঃখীর প্রতি দয়াবতী ছিলেন। নিজের ভোগবিলাসের দিকে তাঁহার লক্ষ্য ছিল না; তিনি আত্মীয়-স্বজন ও গুরুজনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানেই সর্ব্বদা রত থাকিতেন। দয়া, পরদুঃখকাতরতা ও সেবাপরায়ণতা গুণে তিনি সকলের স্নেহভালবাসা ও শ্রদ্ধা-ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। দেশের কাজে, দশের কাজে

স্বজাতির কাজে ইনি স্বামীদেবতাকে সর্ব্বদাই উৎসাহিত করিতেন। এই পুণ্য-শীলা দয়াবতী রমণী ১৩৫৫।১ কার্ত্তিক জগদ্দলে জামাতৃভবনে পরলোকগতা হন।

৺তারকচন্দ্র নাথ—১২৯৬ সালের ১৬ই ভাদ্র বগুড়া জিলার তেলকুপী গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। তিনি সারাজীবন স্বজাতি-হিতকল্পে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। কালইল যোগি-সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি বগুড়া ও রংপুর জিলার যোগিদিগকে একতা বদ্ধ করিতে চেষ্টা করেন। উপনয়ন প্রচার ও শিক্ষাবিস্তারে তিনি বিশেষ উদ্যোগী ও উৎসাহী ছিলেন। স্বজাতীয় অনেক দরিদ্র ছাত্রের লেখাপড়া শিখিবার ব্যবস্থা তিনি নিজব্যয়ে করিয়া দিয়াছিলেন।



তিনি সুচিকিৎসক বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। চিকিৎসা ব্যবসায়ে তিনি যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি সদাচারী ও সত্যনিষ্ঠ ছিলেন। ১৩৫৮।১৪ বৈশাখ ইনি পরলোক গমন করেন।

প্রমীলাসুন্দরী দেবী—ইনি শ্রীহট্ট জিলার সুনামগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত ঘুঙ্গিরগাঁও নিবাসী সুপণ্ডিত ৺কাশীনাথ নাথ (মাষ্টার) মহাশয়ের কন্যা ছিলেন। উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি পিতার অদ্ভুত স্মৃতিশক্তির অধিকারিণী হন। স্বামিগৃহে আসিয়া তিনি ধর্ম্মপরায়ণতা, দয়ালুতা ও অতিথিপরায়ণতা গুণে সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিলেন। কুলদেবতা ৺মদন গোপালের সেবায় তিনি আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। স্বামীর প্রতি তিনি প্রগাঢ় ভক্তি পোষণ করিতেন। তিনি ঐকান্তিকী প্রার্থনাবলে উৎকট রোগাক্রান্ত স্বামীর রোগ স্বশরীরে আকর্ষণ পূর্ব্বক স্বামীর জীবনরক্ষা করিয়াছিলেন এবং নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। নিয়মিতভাবে তিনি যোগিসখা পাঠ করিতেন এবং জাতির সুখ-দুঃখে তিনি হর্ষ-বিষাদ অনুভব করিতেন। ১৩৪৮।৫ কার্ত্তিক এই সতীসাধ্বী রমণী পরলোক গমন করেন।

৺শশিভূষণ সরকার, এম-এ, বি-এল—ইনি সাবজজ ৺মতিলাল সরকার মহাশয়ের কনিষ্ঠ সহোদর ছিলেন। তিনিও অগ্রজের ন্যায় মেধাবী ছাত্র ছিলেন। উভয় ভ্রাতাই ছিলেন খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার লালমোহন ঘোষ ও মনোমোহন ঘোষের সহপাঠী। অতি অল্প বয়সে শশিভূষণের মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুর দিন তাঁহার মুন্সেফি পদের নিয়োগপত্র আসিয়া উপস্থিত হয়। যশোহর জিলার অন্তর্গত ঝাঁপা গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন।

৺বিপিনচন্দ্র নাথ রায়— ইনি স্বর্গীয় সাবজজ মতিলাল নাথ সরকার মহাশয়ের ভাগিনেয় ছিলেন। যশোহর জিলার অন্তর্গত উজলপুর গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কৃষ্ণনগর জজকোর্টে রেকর্ড-কীপারের চাকুরি করিতেন। সরলতা ও কর্ত্তব্যপরায়ণতাগুণে তিনি সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি জীবনে উৎকোচ গ্রহণ করেন নাই। অবসর গ্রহণকালে তাঁহার বিদায়সভায় জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট্, মুন্সেফ, উকিল, মোক্তার সকলেই উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। ইনিই ছিলেন সাবজজ মতিবাবুর এষ্টেটের প্রথম একৃসিকিউটার (Executor)।

৺ভীষ্মদেব নাথ— নদীয়া জিলার কৃষ্ণনগর রাজার চকে তিনি বাস করিতেন। তিনি উকিলের মুহুরিগিরি করিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। স্বজাতির হিত চিন্তা ও কল্যাণ-সাধনই ছিল তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য। ১৩২৭ সালে কৃষ্ণনগরে সম্মিলনীর যে একাদশ বার্ষিক অধিবেশন হয়, ভীষ্মদেব নাথই ছিলেন তাহার প্রধান উদ্যোক্তা।

৺বনচারী নাথ প্রামাণিক— ইনি যশোহর জিলার অন্তর্গত পাতিবিলা গ্রামে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঐ অঞ্চলের একজন বড় জোতদার ছিলেন। পরোপকারিতা প্রভৃতি গুণে তিনি সকলের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। সমাজের বিস্তৃতি ও আচার ব্যবহারের উন্নতিকল্পে তিনি

বিভিন্ন সমাজে পুত্রকন্যার বিবাহ দিয়া আন্তর্গণিক বিবাহের প্রচলন করেন। ১৯৩৪ সালে তিনি পরলোক গমন করেন।

৺যতীন্দ্রমোহন নাথ, বি-এ— ইনি ছিলেন যশোহর জিলার অন্তর্গত খেদাপাড়া গ্রাম নিবাসী ৺যোগীন্দ্রনাথ নাথ মহাশয়ের পুত্র ও ৺শশিভূষণ সরকার, এম-এ, বি-এল মহাশয়ের দৌহিত্র। ছাত্রাবস্থায় তিনি অত্যন্ত মেধাবী ও উন্নতিশীল ছিলেন। কৃষ্ণনগর কলেজ হইতে তিনি সম্মানের সহিত বি-এ পাশ করেন। দারিদ্র্যবশতঃ আর পড়াশুনা করিতে অসমর্থ হইয়া তিনি সরকারী চাকুরির চেষ্টা করেন এবং সাব্ রেজিষ্ট্রারের পদ প্রাপ্ত হন। কর্ম্মজীবনে সততা ও তেজস্বিতা গুণে তিনি সকলের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। ইনি শেষ জীবনে হাওড়ার ডিষ্ট্রীক্ট সাব রেজিষ্ট্রারের পদ লাভ করিয়া অবসর গ্রহণ করেন। অবশেষে তিনি কলিকাতায় এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় শোচনীয়ভাবে গত ১৯৫১ সালের পৌষ মাসে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

৺বিপিনবিহারী পণ্ডিত— নদীয়া জিলার চুয়াডাঙ্গা মহকুমার অন্তর্গত হাটবাড়াদী গ্রামের বিখ্যাত পণ্ডিতবংশে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধিতা ও স্বজাতি-হিতৈষিতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বাংলা, সংস্কৃত ও পার্শী ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। পৌরোহিত্যে তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। তিনি তেজারতি ও মহাজনী কারবারে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ অর্থ তিনি মাতাপিতার দানসাগর শ্রাদ্ধে এবং পুষ্করিণী খনন, বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি বহুবিধ সৎকার্য্যে ব্যয় করিয়াছিলেন। তিনি সংসারী হইয়াও নির্লিপ্ত ছিলেন। তাঁহার ন্যায় তেজস্বী, স্পষ্টবাদী ও কর্ম্মঠ লোক বিরল। ১৯১৭ সালের আশ্বিন মাসে ৬২ বৎসর বয়সে তিনি স্বর্গারোহণ করেন।

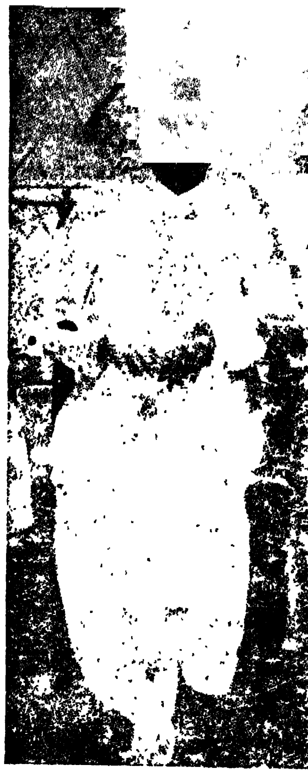
৺রাইচরণ নাথ— খুলনা জিলার বাগেরহাট মহকুমার অন্তর্গত রহিমাবাদ গ্রামে ১২৫৭ সালে ইহার জন্ম হয়। অল্প বয়সে তাঁহার পিতৃবিয়োগ

হওয়াতে ইনি স্কুল ছাড়িয়া সংস্কৃত ও আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়া চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করেন। সুচিকিৎসক হিসাবে তিনি বেশ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তারপর চিকিৎসা ব্যবসায় ছাড়িয়া তিনি বাগেরহাট সহরে বস্ত্র ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। সততা ও বিশ্বস্ততাগুণে তিনি এই ব্যবসায়ে সমধিক উন্নতি লাভ করেন এবং তাঁহার ও তাঁহার পুত্র-পৌত্রগণের সুনিপুণ পরিচালনায় এই ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানটি বাগেরহাট সহরে একটি শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। তিনি ভাগ্যবান্ ও পুরুষকারসম্পন্ন ছিলেন। এরূপ ধর্ম্মানুরাগী বিদ্যোৎসাহী, স্বজাতিহিতৈষী, অতিথিপরায়ণ, কষ্টসহিষ্ণু এবং ধীর-শান্ত-অমায়িক মানুষ সমাজের অলঙ্কারস্বরূপ। বিদ্যার্থীদের আশ্রয়দান, সভাসমিতির অনুষ্ঠান, উপবীতের বহুল প্রচলন, আন্তর্গণিক বিবাহ-প্রবর্ত্তন ইত্যাদি বহুবিধ সমাজ-হিতকর কার্য্যে তিনি সর্ব্বদাই উৎসাহী ও উদ্যোগী ছিলেন। শেষ বয়সে তিনি উত্তর-ভারতের প্রায় সমস্ত তীর্থ পর্য্যটন করিয়া ১৩৫৫ সালে জ্যৈষ্ঠ মাসে ৯৬ বৎসর বয়সে শেষ নিশ্বাস পরিত্যাগ করেন। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র নাথ, বি-এল মহাশয় সম্মিলনীর একজন বিশিষ্ট কর্ম্মী।

৺কৃষ্ণসুন্দর চৌধুরী—নোয়াখালি জিলার যোগিসমাজ-সংস্কারকগণের মধ্যে ৺কৃষ্ণসুন্দর চৌধুরী মহাশয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার পিতার নাম ছিল ৺কৃষ্ণদাস নাথ। ১২৯৯ বঙ্গাব্দের ১৩ জ্যৈষ্ঠ তারিখে তিনি ভুলুয়া পরগণার অন্তর্গত দামোদরপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অনেক জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত থাকিয়া স্বগ্রামের ও স্বজাতির উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। দাদপুর ইউনিয়ন বোর্ডের ভাইস্ প্রেসিডেণ্টরূপে তিনি প্রাথমিক স্কুল প্রতিষ্ঠা, বহু রাস্তা নির্ম্মাণ ইত্যাদি বহু জনকল্যাণজনক কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে ১২ বৈশাখ তাঁহার বাসভবনে আহূত নোয়াখালি-জিলা-যোগিসম্মিলনীর ১৫শ বার্ষিক অধিবেশনে "নোয়াখালি নাথ ব্যাঙ্ক" প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৩৩৩ সালে উক্ত ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রতিষ্ঠাকাল হইতে চৌধুরী মহাশয় ৬ বৎসর ঐ ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর ছিলেন। পরহিতৈষিতা ও চরিত্রমাধুর্য্যে তিনি সকলের শ্রদ্ধা ও সম্মান অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের ৭ আষাঢ় তারিখে ইনি স্বীয় বাসভবনে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

৺লোচনমণি নাথ—ইনি কাছাড় জিলার শিলচর টাউনের নিকটবর্ত্তী বেরেঙ্গা গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ১২৮৫।১১ শ্রাবণ তারিখে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই স্বজাতিসেবার দিকে তাঁহার আগ্রহ পরিলক্ষিত হইত। তিনি আজীবন নীরবে জাতির সেবা করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের দায়িত্বপূর্ণ সাব্-রেজিষ্ট্রার পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও তিনি অনলসভাবে যোগিজাতির সামাজিক উন্নয়ন ও জাতীয় পত্রিকা যোগিসখার বহুল প্রচার জন্য চেষ্টা করেন। তাঁহার যে সমস্ত কবিতা ও প্রবন্ধ সখায় প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে তাঁহার চিন্তাশীলতা, কবি-প্রতিভা ও সমাজ-সংগঠন-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।


লোচনমণি নাথ

জাতির সম্মান রক্ষা করিবার জন্য তিনি অনেক সময় যে নির্ভীকতা ও ত্যাগশীলতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন তাহা অনুকরণীয়। প্রত্নতাত্ত্বিক বিষয়েও তাঁহার

জ্ঞানের গভীরতা সামান্য ছিল না। স্বজাতি ও স্বদেশের কল্যাণ চিন্তাই ছিল তাঁহার চির জীবনের প্রধান কামনা। পরম স্বজাতিহিতৈষী এই মহাত্মা ১৩৫৭।৯ শ্রাবণ তারিখে পরলোকগত হন।

৺কৃষ্ণকুমার নাথ পণ্ডিত— নোয়াখালি জিলার সুধারাম থানার অন্তর্গত হুগলী গ্রামে ইনি ১২৮৫ বঙ্গাব্দের ২০শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল তারাচাঁদ নাথ গায়েন এবং মাতার নাম ছিল কাঞ্চন-মালা দেবী। তিনি বাঙ্গালা ভাষায় সুপণ্ডিত এবং একজন প্রতিষ্ঠাবান্ তান্ত্রিক সিদ্ধা ছিলেন। স্বগ্রামে রাস্তা নির্ম্মাণ, পুকুর খনন, স্কুল প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বহু জনহিতকর কার্য্য সাধন করিয়া তিনি সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। প্রচুর বিষয়-সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও তিনি গৃহসন্ন্যাসীর ন্যায় অনাড়ম্বর জীবন অতিবাহিত করিতেন। এই মহাত্মা ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের ১৩ই পৌষ তারিখে ৫৯ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।

৺শিবচন্দ্র নাথ— কলিকাতা শ্যামবাজার ২৫ নং বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীটে ইহার নিবাস ছিল। ঐ অঞ্চলের তিনি একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। কলিকাতা মুর্গীহাটায় (ক্যানিং ষ্ট্রীট) ইহার পুস্তকের দোকান ছিল। তৎকালীন পুস্তক ব্যবসায়ীগণের মধ্যে তিনিই ছিলেন আদিম ও সর্ব্বপ্রধান। স্বনামধন্য স্বর্গীয় পদ্মচন্দ্র নাথ মহাশয় ইহারই পুস্তকের দোকানে কর্ম্মচারীরূপে কার্য্য করিয়া পুস্তক ব্যবসায়ে অভিজ্ঞতা লাভ করেন। শিবচন্দ্র খুব নিষ্ঠাবান ও ধর্ম্মোৎসাহী ছিলেন। তাঁহার বাড়ীতে প্রায়ই পূজাপার্ব্বণের অনুষ্ঠান হইত।

৺পদ্মচন্দ্র নাথ— প্রসিদ্ধ পুস্তক ব্যবসায়ী ৺পদ্মচন্দ্র নাথের নাম সুপরিচিত। হাওড়া জিলার অন্তর্গত আন্দুলমৌড়ী গ্রামে ইহার পৈত্রিক বাসভূমি ছিল। তিনি প্রথম জীবনে ৺শিবচন্দ্র নাথের পুস্তকের দোকানে কর্ম্মচারীরূপে কার্য্য করিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করেন তাহার বলে ও স্বীয়

অধ্যবসায়গুণে পরে ৪৬ নং পুরাতন চীনা বাজার ষ্ট্রীটে স্বাধীনভাবে পুস্তকালয় স্থাপন করেন। "দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে এই পুস্তকালয়ের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। পুস্তক ব্যবসায়ে তিনি প্রভূত উন্নতি লাভ করেন। শ্যামবাজার বলরাম ঘোষের ষ্ট্রীটস্থ তাঁহার নিজস্ব বসতবাড়ীর পার্শ্ব দিয়া যে রাস্তা গিয়াছে তাঁহার নাম 'পদ্মনাথের লেন'। ৮ নং পদ্মনাথ লেন্‌স্থিত তাঁহার বাড়ীখানি "যোগীশ্বর শিবলিঙ্গ" নামক শিবঠাকুরের নামে দেবোত্তর করা আছে। অতঃপর ১২৯৫ সালের ২রা জ্যৈষ্ঠ তারিখে উল্টাডাঙ্গা ১৮নং হরিশ নিয়োগী রোডে উক্ত যোগীশ্বর শিবলিঙ্গের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহার এক প্রপৌত্র শ্রীপরেশচন্দ্র নাথ উহার বর্ত্তমান সেবাইত। জাতিসেবাতেও পদ্মচন্দ্র অগ্রণী ছিলেন। যোগিজাতির জাতীয় আন্দোলনের প্রথম ভাগে পদ্মচন্দ্রের কীর্ত্তি অতুলনীয়। বহু অর্থ ব্যয় ও শক্তি নিয়োগ করিয়া তিনি জাতির গৌরব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। জাতীয় ইতিহাসের মূল পুঁথি "বল্লালচরিত" তাঁহারই দ্বারা আবিষ্কৃত ও তাঁহারই অর্থে অনূদিত ও মুদ্রিত হয়। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র ৺চন্দ্রকুমার নাথ এ বিষয়ে তাঁহার প্রধান সহায় ছিলেন।

৺সূর্য্যকুমার নাথ ও গণেশচন্দ্র নাথ—ইঁহাদের আদি নিবাস ছিল হুগলি জিলার অন্তর্গত আরামবাগে। তাঁহাদের পিতার নাম ছিল ৺নবীনচন্দ্র নাথ। তিনি অতি দরিদ্র ছিলেন। বাল্যে ইঁহারা অতি অল্প বেতনে ৺পদ্মচন্দ্র নাথের পুস্তকের দোকানে চাকুরি করিয়া কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়া ক্যানিং ষ্ট্রীটে স্বতন্ত্র পুস্তকের দোকান স্থাপনপূর্ব্বক অল্পদিনের মধ্যেই পুস্তক ব্যবসায়ে সমধিক উন্নতিলাভ করেন। এস্, কে, নাথ ও জি, সি, নাথের পুস্তকের দোকান তৎকালে সর্ব্বজন-পরিচিত ছিল। ক্যানিং ষ্ট্রীটে—'গণেশ পুস্তকালয়' ও 'নাথ এণ্ড কোং' নামে তাঁহাদের আরও দুইখানি পুস্তকের দোকান ছিল। সূর্য্যকুমার ও গণেশচন্দ্র দুই সহোদর পরস্পরের সহিত প্রগাঢ় স্নেহে আবদ্ধ ছিলেন। অধ্যবসায়, শ্রমশীলতা, মিতব্যয়িতা প্রভৃতি গুণ থাকিলে মানুষ যে সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে তাহার

প্রকৃষ্ট উদাহরণ সূর্য্যকুমার নাথ ও গণেশচন্দ্র নাথ। তাঁহারা উভয়েই পরম সদাশয় ও স্বজাতিহিতৈষী ছিলেন। পূজাপার্ব্বণে স্বজাতি-সেবায় ও ছাত্র-সাহায্যে তাঁহারা অর্থের সদ্ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। কলিকাতা গৌরীবেড় লেনে তাঁহারা বাস করিতেন। সূর্য্যকুমার অনুমান ৫০ বৎসর বয়সে এবং গণেশচন্দ্র অনুমান ৬০ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন। গণেশচন্দ্র নিঃসন্তান থাকায় তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি ৬ নং গৌরীবেড় লেনে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত 'শ্রীশ্রীরাধাকান্ত জিউ' যুগল বিগ্রহের নামে দেবোত্তর করিয়া গিয়াছেন। সূর্য্যকুমারের তিন পৌত্র বর্ত্তমানে ঐ দেবমন্দিরের রক্ষক ও বিগ্রহের সেবক।

৺পরাণচন্দ্র নাথ—ইনি ছিলেন সুবিখ্যাত পুস্তক ব্যবসায়ী ৺সূর্য্যকুমার নাথের পুত্র ও ৺গণেশচন্দ্র নাথের ভ্রাতুষ্পুত্র। পিতা ও পিতৃব্যের মৃত্যুর পর পরাণচন্দ্র সমস্ত পৈতৃক সম্পত্তি ও ব্যবসায়ের মালিক হন; কিন্তু কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণের উৎকট ব্যাধির চিকিৎসার ব্যয়ে ও তাঁহাদের অকালমৃত্যুতে তিনি ঋণগ্রস্ত ও ভগ্নহৃদয় হইয়া পড়েন। তারপর নানা দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনায় তিনি অকালে অনুমান ৩৮।৩৯ বৎসর বয়সে ১৩৩৫ সালের ২৯ চৈত্র তারিখে মৃত্যুমুখে পতিত হন। পরাণচন্দ্র অতি ধীর, শান্ত ও অমায়িক প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার স্বজাতিহিতৈষিতা অতি প্রশংসনীয়। ১৩২৫ সালে যখন যোগিসখার অফিস্ কাশীধাম হইতে কলিকাতায় স্থানান্তরিত হয় তখন তাঁহারই উৎসাহ ও অর্থানুকূল্যে নিঃসম্বল পত্রিকার মুদ্রণ ও প্রকাশ সম্ভবপর হইয়াছিল। যোগিসখার সঙ্কটমুহূর্ত্তে পরাণবাবুর এই বদান্যতা অতুলনীয়।

৺নেপালচন্দ্র নাথ— জাতীয় আন্দোলনের প্রথম যুগে যাঁহারা যোগিজাতির মধ্যে আত্মচেতনা আনিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন নেপালচন্দ্র ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। ১২৪৯ সালের ২৫শে ভাদ্র তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ৺কৈলাসচন্দ্র নাথ কলিকাতা শ্যামবাজারের অধিবাসী ছিলেন। নেপালচন্দ্র উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে না পারিলেও সাংসারিক জীবনের উপযুক্ত ইংরাজী ও

বাঙ্গালা শিক্ষা তিনি যথেষ্টই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। চাকুরি অপেক্ষা তিনি ব্যবসায়ই বেশী পছন্দ করিতেন। এন্‌গ্রেভিং-এর ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া তিনি বিশেষ খ্যাতি ও উন্নতি লাভ করেন। কলিকাতার বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও পরিবারের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইয়াছিলেন যেমন, কলিকাতার ঠাকুর পরিবার, জষ্টিস্ আমীর আলী, পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন—জজ, খিদির-পুরের নবাব পরিবার ইত্যাদি। কলিকাতার যোগি-সমাজের মধ্যে নেপালচন্দ্রের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল এবং সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। ৺বিষ্ণুচন্দ্র নাথ প্রমুখ বিশিষ্ট নেতৃগণ যখন বর্দ্ধমানে সমাজ-আন্দোলনে ব্রতী হন, তিনিও তখন ৺পদ্মচন্দ্র নাথ, ৺চন্দ্রকুমার নাথ, ৺সূর্য্যকুমার নাথ, ৺গোপালচন্দ্র নাথ, ৺গণেশচন্দ্র নাথ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সহিত মিলিত হইয়া কলিকাতা, হাওড়া, ২৪ পরগণা, হুগলি প্রভৃতি অঞ্চলে সমাজ-সংস্কার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। উপনয়নের বহুল প্রচলনে তিনি খুব উৎসাহী ছিলেন। তিনি ন্যায়নিষ্ঠ, সত্যপরায়ণ ও ধর্ম্মভাবাপন্ন ছিলেন। অত্যধিক ধর্ম্মানুরাগ বশতঃ তিনি প্রৌঢ় বয়সেই সংসারে নিস্পৃহ হইয়া উঠেন এবং গৈরিক বেশ ধারণ করিয়া ও নিরামিষাশী হইয়া স্বগৃহে প্রতিষ্ঠিত বাণেশ্বর শিবের পূজায় ও সেবায় সর্ব্বদা রত থাকিতেন। আমৃত্যু এইরূপ সরল ও ধর্ম্মময় জীবন যাপন করিয়া তিনি ৮৬ বৎসর বয়সে ১৩৩৫ সালের ১১ জ্যৈষ্ঠ তারিখে মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার সুযোগ্য সপ্তম পুত্র শ্রীযুক্ত ভবেন্দ্রলাল নাথ, বি, এস-সি যোগিসমাজে সুপরিচিত।

৺কৈলাসচন্দ্র নাথ—কলিকাতার অনতিদূরে দক্ষিণে কোদালিয়া নামক গ্রামে ১২১৭ বঙ্গাব্দে কৈলাসচন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ৺গোরাচাঁদ নাথ ও মাতা ৺আহ্লাদেবী অতি ধর্ম্মপরায়ণ সাধারণ দরিদ্র গৃহস্থ ছিলেন। ছয় বৎসর বয়সে কৈলাসচন্দ্র পিতার সহিত কলিকাতায় আসিয়া বাগবাজারে বাস করিতে আরম্ভ করেন। এখানেই তিনি ইংরাজী, বাঙ্গালা ও পারশী ভাষায় বেশ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তিনি বিদেশাগত জাহাজসমূহে অর্ডার

সাপ্লাইয়ের কাজ করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সূত্রে বহু ইংরাজ কর্ম্মচারী ও জাহাজের ক্যাপ্‌টেনদের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে। উক্ত ব্যবসায়ে উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিয়া তিনি শ্যামবাজার অঞ্চলে (বর্ত্তমান ৩নং দেবনারায়ণ দাস লেন্) বাড়ী খরিদ করিয়া তাহাতে বাস করিতে থাকেন। সুবর্ণ বণিক সম্প্রদায়ের সুবিখ্যাত ৺গৌরমোহন আঢ্যের সহিত কৈলাসচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ অরিয়েণ্টাল সেমিনারি নামক স্কুল প্রতিষ্ঠায় তিনি গৌরমোহন আঢ্যের সহযোগী ছিলেন। তিনিই ঐ স্কুলের প্রথম অবৈতনিক গ্রন্থরক্ষক বা লাইব্রেরিয়ানরূপে বহুদিন স্কুলের সহিত সংযুক্ত ছিলেন। তাঁহারই প্রচেষ্টায় বহু ইংরাজ ক্যাপ্টেন ও কর্ণেল ঐ স্কুল পরিদর্শন করিতে আসিতেন এবং অবৈতনিকভাবে স্কুলের ইংরাজীর অধ্যাপনা কার্য্যও করিয়া যাইতেন। এই কারণেই অতি অল্প দিনের মধ্যে ওরিএণ্টাল সেমিনারি স্কুলের সুনাম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। কৈলাসচন্দ্র অতি ধর্ম্মপরায়ণ, সত্যবাদী ও পরদুঃখকাতর ছিলেন। তাঁহার ন্যায় নীরব দাতা অতি বিরল। দীনদুঃখীর দুঃখমোচনে তিনি সর্ব্বদাই মুক্তহস্ত ছিলেন। তিনি নিরন্নকে অন্নদান ও বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান করিয়া তাহাদের অভাব মোচন করিতেন। সততা, নির্লোভতা ও কর্ত্তব্যপরায়ণতার গুণে তিনি সকলের বিশেষতঃ উল্লিখিত ধনাঢ্য গৌরমোহন আঢ্য মহাশয়ের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। ১৩১০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে ৯৩ বৎসর বয়সে তিনি নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন। কৈলাসচন্দ্র ছিলেন যোগিসমাজ-সংস্কারক ৺নেপালচন্দ্র নাথের পিতা ও যোগিসখার ভূতপূর্ব্ব কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীভবেন্দ্রলাল নাথের পিতামহ।

৺কৃষ্ণকুমার নাথ—ঢাকা জিলার অন্তর্গত অধুনা পদ্মানদীর গর্ভে বিলুপ্ত কাওয়ালীপাড়া গ্রামে ১২৫১ বঙ্গাব্দে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে ৺কৃষ্ণকুমার নাথ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ৺উদয়চন্দ্র নাথ প্রসিদ্ধ কবিরাজ ছিলেন। এই পরিবার পরে বিক্রমপুর পরগণার পাঁচগাও গ্রামে আসিয়া বসতি স্থাপন করে।

পাবনা জিলার সিরাজগঞ্জে কোন জুটমিলে কৃষ্ণচন্দ্রের চাকুরিজীবন সুরু হয়। অতঃপর ২৪ পরগণা জিলার অন্তর্গত জগদ্দলে উক্ত কোম্প্যানির জুট অফিসে আসিয়া প্রায় ৪০ বৎসর বিশ্বস্ততার সহিত চাকুরি করেন। সিরাজগঞ্জে অবস্থানকালে তিনি কতিপয় প্রবাসী স্বজাতীয় সহকর্ম্মীর সহযোগে 'জ্ঞানদায়িনী' এম-ই স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন এবং আমরণ উহার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন। তিনি ছিলেন পরম স্বজাতিহিতৈষী ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি। বহু স্বজাতীয় ছাত্র তাঁহার অর্থানুকূল্যে শিক্ষালাভে সমর্থ হইয়াছিল। চাকুরিজীবনে তিনি জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে বহু লোকের চাকুরির সংস্থান করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারা আজও শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার নাম স্মরণ করিয়া থাকে।

জাতিসেবার কাজে তিনি কখনও পশ্চাৎপদ ছিলেন না। বিক্রমপুর যোগি-সম্মিলনী প্রতিষ্ঠার তিনি অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ এবং বৈষ্ণবশাস্ত্রে তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল। তিনি ১৯ বৎসর বয়স হইতে নিরামিষ-ভোজনে অভ্যস্ত ছিলেন।

তিনি সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর সততা ও বিশ্বস্ততার সহিত চাকুরি জীবন অতি-বাহিত করিয়া এবং দেশের গ্রামে যাইয়া অবসর জীবন যাপন পূর্ব্বক ৯৭ বৎসর বয়সে বাংলা ১৩৪৮ সালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

৺নবীনচন্দ্র নাথ— বাংলা ১২৪৩ সালে যশোহর জিলার অন্তর্গত আষাঢ় (বর্ত্তমানে ২৪ পরগণা জিলার অন্তর্গত) গ্রামে ৺নবীনচন্দ্র নাথ এক দরিদ্র সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ছিল ৺বিষ্ণুচরণ নাথ। নবীনচন্দ্র একজন কৃতী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার জীবনী হইতে এই শিক্ষা পাওয়া যায় যে, পরিশ্রমী, মিতব্যয়ী, অধ্যবসায়ী ও সত্যনিষ্ঠ হইলে মানুষ দরিদ্র অবস্থা হইতে জীবনে উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতে সমর্থ হয়। আষাঢ় গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া ব্যবসায় ব্যপদেশে তিনি যৌবনে সিদ্রাণী গ্রামে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। এখানে সুতা ও কাপড়ের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া

তিনি ক্রমশঃ ধনশালী হইয়া উঠেন। বস্ত্র ব্যবসায়ে উত্তরোত্তর প্রসারতা ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়া তিনি আরও বহুবিধ ব্যবসায় আরম্ভ করেন। তারপর তিনি চাকদহ থানার অন্তর্গত মনসাপোতা নিবাসী পাঠকবাবুদের ১নং তৌজীর জমিদারী স্বত্ব ক্রয় করেন। সততা, অতিথিপরায়ণতা ও পরদুঃখকাতরতা গুণে নবীনচন্দ্র সকলের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। ১৩১৮ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে ৭৫ বৎসর বয়সে তিনি পরলোক প্রাপ্ত হন। তাঁহার চতুর্থ পুত্র জমিদার অহিভূষণ নাথ মহাশয় রাণাঘাট টাউনের অধিবাসী। তিনি এতদঞ্চলে সুপরিচিত।

৺অটলচন্দ্র হালদার— বরিশাল জিলার অন্তর্গত স্বরূপকাঠী থানার অধীন শশীদ গ্রামের বিখ্যাত হালদার পরিবারে ১২৯৪ সালে ইনি জন্মগ্রহণ



করেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল ৺কৃষ্ণকিশোর হালদার। অটলবিহারী বিদ্যানুরাগী, স্বজাতিবৎসল ও পরোপকারী ছিলেন। দরিদ্র ছাত্রগণের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য তিনি নিজ ব্যয়ে বাড়ীতে একটী উচ্চ প্রাইমারী স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার বৃহৎ তালুক হইতে যে আয় হইত তাহার অধিকাংশই তিনি গ্রামের উন্নতিকল্পে ব্যয় করিতেন। বস্ত্র ব্যবসায়েও তিনি সমধিক উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। কাউখালি (বরিশাল) বন্দরের ইনি একজন শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ী ছিলেন। ১৩৪৬ সালে ৫২ বৎসর বয়সে ইনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

৺দ্বারকানাথ নাথ (দালাল)— ইনি উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ঢাকা জিলার অন্তর্গত বিক্রমপুর পরগণার জিন্দালগাঁও গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা বেশ সঙ্গতিসম্পন্ন ছিলেন। বাল্যকালে দ্বারকানাথের মেধা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া গেলেও তিনি লেখাপড়ার দিকে আগ্রহান্বিত ছিলেন না। পাঠশালার পড়া শেষ হইতে না হইতেই তিনি ব্যবসায় শিখিবার জন্য

বরিশাল জিলার অন্তর্গত ঝালকাঠি বন্দরস্থিত নিজেদের সুবৃহৎ আড়তদারি কার্য্যে যোগদান করেন এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে পারদর্শিতা লাভ করিয়া নিপুণভাবে উক্ত ব্যবসায় চালাইতে থাকেন। যৌবনের প্রারম্ভে তিনি একবার ব্যবসায়ে অনেক টাকা লোকসান দিয়া ফেলেন। ইহার ফলে অন্যান্য ভাইদের সহিত তাঁহার মনোমালিন্য ঘটে; তজ্জন্য অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া তিনি ২০।২১ বৎসর বয়সে ভাগ্যান্বেষণে একেবারে রিক্তহস্তে কলিকাতায় আগমন করেন। বড়-বাজারে আসিয়া তিনি জনৈক কাপড়ের দালালের অধীনে চাকুরি করিতে আরম্ভ করেন। দালালি ব্যবসায়ে ক্রমশঃ বেশ নৈপুণ্য লাভ করিয়া তিনি স্বাধীনভাবে ব্যবসায় আরম্ভ করেন এবং সততা, বুদ্ধিমত্তা ও অধ্যবসায় গুণে অল্পকাল মধ্যেই প্রসার প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিতে সমর্থ হন। ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থাগম হওয়াতে প্রথম মহাযুদ্ধের প্রায় ৮।১০ বৎসর পর কলিকাতার বড়বাজার অঞ্চলে তিনি ন্যূনাধিক একলক্ষ টাকা ব্যয়ে সুবৃহৎ ত্রিতল অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন। সম্পূর্ণ নিঃসম্বল অবস্থায় কলিকাতায় আসিয়া এই ভাবে অর্থার্জ্জন করা কম কৃতিত্বের কথা নহে। ধর্ম্মকার্য্যেও তাঁহার মতিগতি ছিল। তিনি শাস্ত্রনিষ্ঠ, সদালাপী ও সদাচারসম্পন্ন ছিলেন। আয়ের প্রতি টাকায় তিনি দুই আনা করিয়া আলাহিদা করিয়া রাখিয়া দিতেন। এই সঞ্চিত অর্থ তিনি গোপনে সৎকার্য্যে ব্যয় করিতেন। শ্রীধাম নবদ্বীপে ইনি তাঁহার গুরুদেবের নামে একটী আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। ইহা তাঁহার ধর্ম্মপ্রাণতা ও গুরুভক্তির নিদর্শন। প্রচুর অর্থের অধিকারী হইয়াও তিনি সরল, অনাড়ম্বর ও ধর্ম্মময় জীবন যাপন করিতেন। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তিনি প্রায় ৬০ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন।

৺মহেন্দ্রনাথ নাথ— বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত বাঘনাপাড়া গ্রামের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে মহেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে তিনি লেখাপড়া শিখিবার তেমন সুযোগ পান নাই। সামান্য প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়া

তিনি পৈত্রিক বস্ত্রব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। শ্রমশীলতা ও অধ্যবসায় গুণে তিনি ব্যবসায়ে উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিতে লাগিলেন। তারপর কিছু অর্থাগম হইলে তিনি অধিকতর উন্নতি প্রচেষ্টায় রাজসাহী জিলার অন্তর্গত নওগাঁ টাউনে গমন করেন। এখানে সমধিক উন্নতি সাধন পূর্ব্বক তিনি প্রচুর ভূসম্পত্তি ক্রয় করেন এবং নওগাঁ টাউনেই গৃহনির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে থাকেন। মধ্য বয়সে তিনি বেশ ধর্ম্মানুরাগী হইয়া উঠিলেন; বিষয় সম্পত্তির দিকে তাঁহার আর তেমন আকর্ষণ রহিল না। সাধনভজনে নিরত থাকিয়া তিনি গৃহী সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। নওগাঁ টাউনে অবস্থানকালে তাঁহার মধ্যম পুত্রের মৃত্যু ঘটে। নিদারুণ পুত্রশোক তিনি অবিচলিতভাবে সহ্য করেন। "জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যু ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ"—গীতার এই বাণী তিনি বিশ্বাস করিতেন। অতঃপর শেষ বয়সে তিনি নওগাঁ ছাড়িয়া কৃষ্ণনগরে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। এখানেও তিনি নির্লিপ্তভাবেই জীবন যাপন করিতেন। তিনি ছিলেন মিতাহারী, সংযমী ও নিষ্ঠাবান। স্বজাতিহিতকর কার্য্যেও তাঁহার উৎসাহ পরিদৃষ্ট হইত। যোগিজাতির মধ্যে শিক্ষার ও উপনয়নের বহুল প্রচলনে তিনি অতি যত্নবান ছিলেন। সত্যবাদী, নির্ভীক ও স্বধর্ম্মনিষ্ঠ বলিয়া তিনি সকলের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। ১৩৩০ সালের ১৫ই মাঘ তারিখে ৮৬ বৎসর বয়সে ইনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন। শ্রীযুক্ত পাঁচকড়িলাল নাথ, বি-এল, এ্যাডভোকেট ও শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রচন্দ্র নাথ, বি-এ,—তাঁহার দুই সুযোগ্য পুত্র যোগিজাতির পরিচিত।

৺গৌরহরি নাথ— কলিকাতার ভবানীপুরের এক মধ্যবিত্ত ভদ্র পরিবারে ইনি আনুমানিক ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল ৺বলরাম নাথ। ভবানীপুরস্থিত লণ্ডন মিশন কলেজ হইতে গৌরবাবু কৃতিত্বের সহিত এণ্ট্রান্স ও এফ্-এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বি-এ পড়িতে আরম্ভ করেন; কিন্তু পিতার আকস্মিক মৃত্যুর জন্য বৃহৎ পরিবারের ভার তাঁহার

উপর আসিয়া পড়ে। সুতরাং তিনি পড়াশুনা ত্যাগ করিয়া জনৈক খুল্লতাতের সহায়তায় ডেরাডুন গভর্ণমেণ্ট সার্ভে অফিসে চাকুরি পাইয়া তথায় বাইতে বাধ্য হন। কয়েক বৎসর সেখানে চাকুরি করিবার পর তিনি পাব্লিক ওয়ার্কস্ ডিপার্টমেণ্টের অধীনে ভারত গভর্ণমেণ্টের বিল্ডিংস সুপারভাইজার নিযুক্ত হইয়া কলিকাতায় আগমন করেন এবং এই চাকুরিতেই তিনি পেন্সন প্রাপ্ত হন। স্বজাতি-হিতকর কার্য্যে তিনি পশ্চাৎপদ ছিলেন না। চাকুরি হইতে অবসর লইয়া তিনি উপনয়ন আন্দোলনে যোগদান করেন। উপনয়ন সংস্কারের পক্ষপাতী হইলেও তিনি ব্রাহ্মণত্বের গোড়ামি অপেক্ষা মনুষ্যত্বের আদর্শকেই জাতীয় উন্নতির অনুকূল বলিয়া মনে করিতেন। উচ্চশিক্ষা ও সদুপায়ে উপার্জ্জিত অর্থই সামাজিক মর্য্যাদা লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়—ইহাই ছিল তাঁহার বিশ্বাস। চাকুরি অপেক্ষা তিনি ব্যবসাবাণিজ্যই বেশী পছন্দ করিতেন। বিহারের অন্তর্গত রোটাস্‌গড় নামক স্থানে একটী লাইমষ্টোন্ কারবারের এবং হাজারিবাগ জিলার কোদারমা নামক স্থানে একটী অভ্রের কারবারের সহিত তিনি বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। শিক্ষা ও সচ্চরিত্রতার জন্য তিনি ভদ্রসমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন এবং ঐকান্তিক কর্ম্মনিষ্ঠার জন্য অনেক উচ্চ-পদস্থ ইংরাজ ও দেশীয় রাজকর্ম্মচারীর শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। তিনি ধীরশান্ত-গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন। ইংরাজী ১৯৩৯ সালে প্রায় ৮০ বৎসর বয়সে দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে তিনি পরলোক গমন করেন।

ডাক্তার **৺আশুতোষ নাথ**:— ১৮৫৮ সালে বা তাহার কিছু পূর্ব্বে কলিকাতা ভবানীপুরের এক মধ্যবিত্ত ভদ্র পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল ৺পঞ্চানন নাথ। সাধারণ শিক্ষায় আশুবাবু কিছুদূর অগ্রসর হইয়া গভর্ণমেণ্ট ক্যাম্বেল মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হন এবং যথাসময়ে ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ভবানীপুর অঞ্চলে চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করেন। চিকিৎসা-নৈপুণ্য হেতু তিনি শীঘ্রই একজন বিচক্ষণ ডাক্তার বলিয়া

পরিগণিত হন এবং দয়া, অমায়িকতা ও সচ্চরিত্রতা গুণে তিনি জনসাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। রোগনির্ণয়ে ও উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগে তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়া তদানীন্তন প্রসিদ্ধ সরকারী ডাক্তার ব্রাডন সাহেবও তাঁহার চিকিৎসা বিদ্যার ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। চিকিৎসা ব্যবসায়ে তিনি প্রচুর অর্থলাভ করিয়া ভবানীপুর অঞ্চলে একজন মান্য-গণ্য ব্যক্তি বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। যোগিজাতির সামাজিক উন্নয়নকল্পে ডাক্তার আশুবাবু ৺কৃষ্ণচন্দ্র দালাল, ৺মনিমোহন নাথ, ৺বিষ্ণুচন্দ্র নাথ এবং তদীয় দীক্ষাগুরু দেবপ্রতিপালক স্বামী মহারাজ প্রমুখ প্রসিদ্ধ নেতৃগণের সহিত জাতীয় আন্দোলনে যোগদান করেন। বিগত ১৯০১ সালে জনগণনার (সেন্সাসের) সময় যোগিজাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন উদ্দেশ্যে ও রিজলী সাহেবের সেন্সাস্ রিপোর্টের প্রতিবাদকল্পে তিনি নোয়াখালির উকিল শ্রীযুক্ত ভারতবাবু ও কুমুদিনীবাবু, ত্রিপুরার মহিমবাবু, ময়মনসিং-এর উকিল মহেশবাবু এবং নদীয়া কৃষ্ণনগরের ডাক্তার জগৎবাবু, কলিকাতার অটলবাবু ও শরৎবাবু প্রভৃতি সুশিক্ষিত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের সহযোগে মেট্রোপলিটান কলেজে (বর্ত্তমান বিদ্যাসাগর কলেজে) যে যোগিহিতৈষিণী সভা আহ্বান করেন সর্ব্বসম্মতিক্রমে তিনি উহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। এই সভা হইতেই যোগিজাতির মধ্যে স্থায়ী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। আশুবাবু যোগিজাতির উন্নতিকর প্রথম আন্দোলনের একজন শ্রদ্ধাভাজন নেতা হইলেও পারিবারিক জীবনে তিনি সুখী হইতে পারেন নাই। তাঁহার শেষ বয়সে তাঁহার একমাত্র পুত্রের অকাল-মৃত্যুতে তিনি অত্যন্ত কাতর ও ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পড়েন এবং প্রায় ৬০ বৎসর বয়সে পরলোক প্রাপ্ত হন। তিনি দেশব্যাপী আন্দোলন প্রতিষ্ঠা করিয়া জাতির যে মহৎ উপকার করিয়া গিয়াছেন, তজ্জন্য যোগিজাতি চিরকাল তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে।

৺হীরালাল নাথঃ— যোগিজাতির শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তিগণের মধ্যে

৺হীরালালবাবুর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। সম্ভবতঃ ১৮৬৫ সালে কিম্বা তাহার কাছাকাছি সময়ে তিনি কলিকাতার একটি প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী বংশে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যে মাতৃ-পিতৃহীন হইয়া তিনি লেখাপড়ার সুযোগ না পাইয়া উচ্ছৃঙ্খল ও লক্ষ্যহীন জীবন যাপন করিতে থাকেন। কিন্তু তিনি চরিত্রভ্রষ্ট হন নাই। প্রতিভাবলে তিনি যৌবনে ব্যায়ামকৌশলে ও বংশীবাদনে বিলক্ষণ দক্ষতা অর্জ্জন করেন। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ষ্টার থিয়েটারের কন্‌সার্ট পার্টিতে তিনি ছিলেন অন্যতম বংশীবাদক। এই সূত্রে তিনি ষ্টার থিয়েটারের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় অমৃতলাল বসু, অমৃতলাল মিত্র, কাশীবাবু প্রমুখ সুবিখ্যাত নাট্যকারগণের সান্নিধ্য ও বন্ধুত্ব লাভ করিয়া তৎকালীন নাট্য সমাজের অনেক ব্যক্তির নিকট সুপরিচিত হন। তারপর তিনি গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশ করিয়া একটি লৌহশিল্পের ব্যবসায়ে জীবিকা অর্জ্জন করিতে থাকেন। গার্হস্থ্য জীবনেই তিনি স্বীয় বাসস্থল গৌরীবেড়ের অনেক যুবককে ব্যায়াম শিক্ষা প্রদান করতঃ স্থানীয় সর্ব্ব-সাধারণের নিকট "মাষ্টার মহাশয়" বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। স্বদেশী আন্দোলনের অগ্নিযুগে তিনি ক্রমশঃ বিপ্লবীদলে আকৃষ্ট হইয়া পড়েন এবং সুপ্রসিদ্ধ 'অনুশীলন সমিতি'র অধীনে ও তাঁহার পরিচালনায় গৌরীবেড়েয় একটি গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সকল গুপ্ত সমিতি বা আখড়ার উপর পুলিশের খরদৃষ্টি ছিল। কিন্তু হীরুবাবু বুদ্ধিকৌশলে গোয়েন্দা পুলিশের প্রখর দৃষ্টি এড়াইয়া তাঁহার শিষ্যগণকে ব্যায়াম শিক্ষা দিতেন। পরে সরকারী আদেশে অনুশীলন সমিতির কার্য্য রহিত হওয়াতে তাঁহার গুপ্ত সমিতিও বন্ধ হইয়া যায়। এই সূত্রে তিনি সুপ্রসিদ্ধ ব্যায়ামকৌশলী বিপ্লবী নেতা পুলিন দাস প্রভৃতির সহিত বিশেষভাবে পরিচিত হন। অতঃপর তিনি বিপ্লববাদীদের সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া যোগিজাতির উন্নতিকর আন্দোলনে যোগদান করেন। তদানীন্তন সমাজহিতকর সমস্ত কার্য্যেই তিনি ছিলেন অগ্রণী ও প্রধান সহায়। দুঃস্থ, দরিদ্র ছাত্রগণের সাহায্য-সংস্থানে এবং বিপন্ন বিধবা

রমণীগণের দুঃখ নিবারণে তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত ভাবেই অগ্রসর হইতেন। আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দবাবুর যাবতীয় সমাজ-হিতকর কার্য্যে হীরুবাবু ছিলেন প্রধান সহায়। একটি দুঃসাহসিক কার্য্যের জন্ম হীরুবাবু যোগিজাতির কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছিলেন। ঐ সময়ে স্বর্গীয় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পাদকত্বে প্রকাশিত 'নায়ক' পত্রিকায় যোগিজাতির পক্ষে গ্লানিকর একটি প্রবন্ধ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইতেছিল। শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দবাবু উহার প্রতিবাদ পাঠাইলে 'নায়ক'-সম্পাদক তাহা প্রকাশ করিলেন না। তখন রাধাগোবিন্দবাবু নিরুপায় হইয়া প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক 'হিতবাদী'তে তাঁহার প্রতিবাদ পাঠাইয়া দেন। 'হিতবাদী'তে উহা প্রকাশিত হইলেও 'নায়ক' পত্রিকার উক্ত গ্লানিকর প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতেই লাগিল 'নায়ক'-সম্পাদকের ঐ অবৈধ আচরণে মর্ম্মাহত হইয়া তেজস্বী হীরুবাবু 'নায়ক'-অফিসে হঠাৎ একদিন প্রবেশ করিয়া পাঁচকড়িবাবুকে এমন শাসাইয়া দিলেন যে পাঁচকড়িবাবু ভয়ে ঐ গ্লানিকর লেখার জন্ম ত্রুটি স্বীকার করিলেন এবং ঐরূপ লেখা আর কখনও প্রকাশ করিবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন। এমনই ছিল হীরুবাবুর ব্যক্তিত্ব, এমনই ছিল তাঁহার সৎসাহস এবং এমনই ছিল স্বজাতির প্রতি তাঁহার আন্তরিক আকর্ষণ। তাঁহার স্বজাতি-সেবার তুলনা নাই। প্রায় ৫৫ বৎসর বয়সে এই আদর্শ সমাজসেবী ১৩২৭ সালের ১৭ শ্রাবণ তারিখে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন।

৺দীনবন্ধু চৌধুরীঃ—চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত চন্দ্রনাথ ধামের অনতি-দূরবর্ত্তী শিবপুর নামক গ্রামে ৺দীনবন্ধু চৌধুরী মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল অভয়াচরণ চৌধুরী। তিনি আজীবন শিক্ষাব্রতী ছিলেন। তৎকালীন এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি সীতাকুণ্ড মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতে আরম্ভ করেন। তারপর উক্ত মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে উন্নীত হইলে তিনি তাহাতেও শিক্ষকরূপে

কার্য্য করেন। তিনি বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। বহু দরিদ্র ছাত্র তাঁহার উৎসাহে ও অর্থানুকূল্যে বিদ্যাশিক্ষার পথে অগ্রসর হইতে পারিয়াছিল। নিজ বাটীতে একটি অবৈতনিক প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি স্থানীয় বালিকাদিগের শিক্ষার পথ সুগম করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রবধূ এই বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রীরূপে ইহার পরিচালনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মত অমায়িক, বিনয়ী, ধর্ম্মপ্রাণ ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি তদঞ্চলে নিতান্তই বিরল ছিল। তাঁহার চরিত্রমাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া সকলেই তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মানের চক্ষে দেখিতেন। তিনি অল্প বয়সেই প্রভুপাদ ৺প্রাণগোপাল গোস্বামী মহাশয়ের নিকট বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া আমরণ নিরামিষ ভোজন ও শুদ্ধাচার পালন করিয়াছিলেন। বিগত ১৯৪৬ ইং অক্টোবর মাসে প্রায় ৬২ বৎসর বয়সে তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন।

৺ভোলানাথ নাথ :—ইনি কলিকাতা বরাহনগরের অধিবাসী ছিলেন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জানুয়ারী তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল ৺ঠাকুরদাস নাথ ও মাতার নাম ৺নৃত্যকালী দেবী। শৈশবে পিতৃহীন ও আত্মীয়স্বজন কর্তৃক পৈতৃক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত ও প্রতারিত হইয়া তিনি নিঃস্ব ও সহায়হীন হইয়া পড়েন। মাতাকে লইয়া অনেকদিন অতিকষ্টে দিন যাপন করিয়া অবশেষে তিনি অকূলে কূল পাইলেন। অল্প বয়সে তিনি কাশীপুর গান্ এণ্ড শেল ফ্যাক্টরীতে একটি চাকুরি সংগ্রহ করেন। ঐ চাকুরিতে উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিয়া এবং অবসর সময়ে একটা ব্যবসায় পরিচালনা করিয়া তিনি ক্রমশঃ অর্থশালী হইয়া উঠিলেন। তাঁহার শ্রমশীলতা, অধ্যবসায় ও পুরুষকারে আকৃষ্ট হইয়া ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি প্রসন্না হইলেন। দরিদ্র ভোলানাথ এখন মান্য-গণ্য হইয়া সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন। তাঁহার বাড়ী হইল, সম্পত্তি হইল এবং ব্যবসায়ও বেশ গড়িয়া উঠিল। জীবনে অশেষ দুঃখ পাইয়া তিনি দুঃখীর দুঃখ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই দীনদুঃখীর অভাব মোচনে ও জন-

কল্যাণসাধনে তিনি অর্থব্যয় করিতে লাগিলেন। শিশুসদন ও রাস্তা নির্ম্মাণকল্পে তিনি বরাহনগর মিউনিসিপ্যালিটিকে কয়েক সহস্র টাকা প্রদান করেন। উক্ত মিউনিসিপ্যালিটি 'ভোলানাথ নাথ ষ্ট্রীট্' নামে একটি রাস্তার নামকরণ করিয়া তাঁহার বদান্যতার পুরস্কার প্রদান করেন। শেষ বয়সে তিনি সংসারবিরাগী হইয়া পড়েন। ১৩৪২ সালে শ্রীশ্রী৺কৈলাসেশ্বর জিউর মন্দির ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি সম্পত্তির অধিকাংশই বিগ্রহের শ্রীচরণে উৎসর্গ করিয়া ভগবচ্চিন্তায় দিন অতিবাহিত করিতে থাকেন। বিগত ১৩৫৩ বঙ্গাব্দের ১৪ই কার্ত্তিক তিনি পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স প্রায় ৭৯ বৎসর হইয়াছিল।

৺সারদাপ্রসাদ নাথ ঃ—২৪ পরগণা জিলার অন্তর্গত হাজিনগর গ্রামে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ২২শে মে তারিখে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ৺শশিভূষণ নাথ ও মাতার নাম মহামায়া দেবী। পঠদ্দশায় তিনি মেধাবী ও অধ্যবসায়ী ছাত্র ছিলেন। স্বাবলম্বী হইয়া জীবনে উন্নতিলাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার হৃদয়ে বাল্যকাল হইতেই বলবতী হইয়া উঠে। অল্প বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া তিনি ডাক্তারী পড়িবার জন্য ক্যাম্বেল মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হন; কিন্তু শবব্যবচ্ছেদ করিতে যাইয়া মনে ঘৃণার উদ্রেক হওয়াতে তিনি ডাক্তারী পড়া পরিত্যাগ করিয়া মাত্র ১৮ বৎসর বয়সে কর্ম্মজীবনে প্রবেশ করেন। কৃষ্ণনগরের স্বনামধন্য ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার ৺রামেশ্বর নাথ মহাশয়ের দৌহিত্রী কালীকুমারী দেবীর সহিত তিনি পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হন।

হাজিনগর হইতে কলিকাতায় আসিয়া তিনি প্রথমতঃ এক বিলাতী সওদাগরী অফিসে চাকুরি গ্রহণ করেন। ইংরাজী ভাষায় তাঁহার বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি এবং ইংরাজীতে অনর্গল কথাবার্ত্তা বলিবারও বেশ ক্ষমতা ছিল। এই কারণে তিনি সাহেবদের সুনজরে পড়িয়া যান। শ্রমশীলতা, নিয়মানু-বর্ত্তিতা, সময়নিষ্ঠতা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা, মিষ্টভাষিতা, কর্ম্মতৎপরতা প্রভৃতি

গুণে তিনি সাহেব প্রভুদের প্রিয়ভাজন হইয়া উঠেন এবং তাহার ফলে ক্রমশঃই তাঁহার পদোন্নতি হইতে থাকে। ক্রমে ক্রমে তাঁহার ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বাড়িয়া উঠিল এবং অচিরকাল মধ্যে তিনি উক্ত সওদাগরী অফিসের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া দক্ষতার সহিত কার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। হল এণ্ড এণ্ডারসন কোং-র কারবার যে বিশাল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছিল, তাহার মূলে ছিল সারদাবাবুর কঠোর পরিশ্রম ও অসাধারণ অধ্যবসায়। ব্যক্তিগত উন্নতিতেই তিনি সন্তুষ্ট থাকিতেন না। তিনি অনেক বেকার যুবকের চাকুরির সংস্থান করিয়া দিয়া তাহাদিগকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছিলেন। দীনদুঃখীর অভাবমোচনে ও দুঃখনিবারণে তিনি সর্ব্বদাই মুক্তহস্ত ছিলেন। কোন প্রার্থীকে তিনি কোনদিন বিমুখ করেন নাই। স্বকীয় পুরুষকার ও অধ্যবসায়বলে তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। স্বোপার্জ্জিত অর্থব্যয়ে তিনি কলিকাতা বেনেপুকুর অঞ্চলে বৃহৎ বাসভবন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং বিশাল জমিদারীর অধীশ্বর হইয়াছিলেন। পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়ী হইলে যে জীবনে উন্নতিলাভে সমর্থ হওয়া যায় তাহার দৃষ্টান্ত সারদাবাবু দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি বহুদিন অনরারি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে আসীন থাকিয়া যোগ্যতার সহিত কর্ত্তব্যপালন করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর হইতে তিনি রক্তের চাপাধিক্যজনিত রোগে ভুগিতেছিলেন। এই রোগেই ইংরাজী ১৯৩৯ সালের ২৯ শে আগষ্ট তারিখে প্রায় ৫৬ বৎসর বয়সে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

৺নারায়ণচন্দ্র নাথ, জমিদার— ২৪ পরগণা জিলার অন্তর্গত শ্যামনগরের সন্নিহিত গাড়ুলিয়া নামক স্থানে আনুমানিক ১২৭৫ বঙ্গাব্দে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি বাল্যকালে পরিশ্রমী, অধ্যবসায়ী ও বিদ্যানুরাগী ছিলেন বটে, কিন্তু উচ্চশিক্ষা লাভের কোন সুযোগ তাঁহার ঘটে নাই। যৌবনের প্রারম্ভেই তিনি সংসারে জড়িত হইয়া পড়েন।

শ্বশুরের মৃত্যুর পর তিনি প্রভূত ভূসম্পত্তির ও জমিদারীর উত্তরাধিকারী হন। তারপর নিজের অধ্যবসায় ও পরিশ্রমগুণে সম্পত্তির পরিমাণ ও জমিদারির আয়তন বৃদ্ধি করিয়া একজন শ্রেষ্ঠ জমিদার বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। তিনি বদান্য ও প্রজাবৎসল জমিদার ছিলেন। বর্দ্ধমান জিলার খেসারীর নিকটবর্ত্তী আমেদপুর গ্রামে তাঁহার শ্বশুরালয়স্থিত ৺জয়-দুর্গা দেবীর ভগ্ন মন্দিরের সংস্কার সাধন করিয়া তিনি তথায় বিগ্রহ ও নাটমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া নিত্যপূজার প্রবর্ত্তন করেন। কাশীর দেবনাথ চতুষ্পাঠীতে তাঁহার দান নিতান্ত নগণ্য ছিল না। তিনি বিদ্যোৎসাহী ও স্বজাতিবৎসল ছিলেন। উপযুক্ত দুই পুত্রের অকালমৃত্যুজনিত শোকে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ২৫শে ভাদ্র প্রায় ৫৪ বৎসর বয়সে তিনি অকালে কালগ্রাসে পতিত হন।

৺শশিভূষণ স্থানপতি, উকিল:— ২৪ পরগণা জিলার অন্তর্গত গোপালপুর গ্রামে এক দরিদ্র পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। অতি শৈশবে পিতৃহীন হওয়াতে শশিভূষণকে জীবনে অনেক বাধা-বিঘ্ন ও দুঃখকষ্টের সম্মুখীন হইতে হয়। দুঃখদৈন্যের ঘাত-প্রতিঘাতে তাঁহার চরিত্র ও মন দৃঢ়ভাবে গঠিত হইয়াছিল এবং লেখাপড়া শিখিয়া মানুষ হইবার বলবতী আকাঙ্ক্ষা তাঁহার শিশুমনে জন্মলাভ করিয়াছিল। লেখাপড়া শিখিবার প্রবল আগ্রহে তিনি কৃষ্ণনগরে আসিয়া ৺মতিলাল সরকার সাব্‌জজ মহাশয়ের শরণাপন্ন হইলে সরকার মহাশয় তাঁহার পড়াশুনার সুবন্দোবস্ত করিয়া দেন। কৃষ্ণনগর হইতে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রথমতঃ তিনি বসিরহাট যাইয়া ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন। চরিত্রগুণে এখানে তিনি সকলের প্রশংসাভাজন হইয়া উঠেন। বসিরহাট নিবাসী কবি ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। বসিরহাট হইতে তিনি ওকালতি ব্যবসায় উপলক্ষে নোয়াখালি জিলার অন্তর্গত সন্দ্বীপে গমন করেন। সন্দ্বীপ সহর একদা বঙ্গোপসাগরের জলোচ্ছ্বাসে প্লাবিত

হইলে শশিভূষণ ভগ্ন কুটীরের চাল অবলম্বন করিয়া ভাসিতে থাকেন এবং কয়েকদিন পর সংজ্ঞাহীন অবস্থায় জনৈক কৃষক কর্ত্তৃক উদ্ধারপ্রাপ্ত হইয়া বাঁচিয়া যান। এই দুর্ঘটনার পর তিনি সন্দ্বীপ ছাড়িয়া জলপাইগুড়ি প্রস্থান করিলেন এবং ওকালতি ব্যবসায়ে সবিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া অচিরকাল মধ্যে যশস্বী হইয়া উঠিলেন। উদারতা, বদান্যতা ও ন্যায়পরায়ণতা গুণে তিনি জনপ্রিয় ও সকলের প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন। স্থানীয় উকিলগণ তাঁহাকে উকিলসভার সভাপতি মনোনীত করিয়া তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। জলপাইগুড়ি পিপ্‌লস্ কো-অপারেটিভ্‌ ব্যাঙ্ক এবং বহু চা বাগান-পরিচালক সমিতির সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁহার পরিচালনাধীনে ঐ সকল প্রতিষ্ঠান সমধিক উন্নতি লাভ করিয়াছিল। দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনেও তিনি অংশ গ্রহণ করিতেন। স্বনামধন্য দেশবন্ধু দাশ জলপাইগুড়ি যাইয়া বহুবার তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বজাতি-সেবাতেও তিনি পশ্চাৎপদ ছিলেন না। তাঁহার স্বজাতিবাৎসল্য অনুকরণীয়। তিনি অনেক নিঃস্ব দরিদ্র ছাত্রকে অর্থ সাহায্য প্রদানপূর্ব্বক তাহাদিগকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়া গিয়াছেন। তিনি ছিলেন নীরব দাতা; তিনি আত্মপ্রচার ভাল বাসিতেন না। তাঁহার বৈচিত্র্যময় জীবন শিক্ষাপ্রদ। জীবনের শেষভাগে তিনি কলিকাতায় আগমন করেন। এখানেই ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে তাঁহার কর্ম্মবহুল জীবনের অবসান হয়।

৺ক্ষীরোদচন্দ্র নাথ, উকিল ঃ— ফেনীর নিকটবর্ত্তী সিলোনিয়া গ্রাম ইঁহার জন্মস্থান। চট্টগ্রাম কলেজ হইতে এফ্‌-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কিছুদিন ফুলগাজী হাই স্কুলে শিক্ষকতা করেন। তারপর ওকালতি পরীক্ষায় পাশ করিয়া ইনি ফেনীর উকিলবারে যোগদান করেন। ফেনীর প্রধানতম উকিলদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। ক্ষীরোদবাবু বহুদিন দালালবাজার ষ্টেটের উকিল নিযুক্ত ছিলেন। জাতীয় কার্য্যেও তাঁহার আগ্রহ ও উৎসাহ ছিল।

১৩২১ বঙ্গাব্দে ফেনী টাউনে সম্মিলনীর যে ৫ম অধিবেশন আহূত হয়, তিনিই ছিলেন তাহার প্রধান উদ্যোক্তা। যশোদাহরণ ও শ্যামাচরণের মোকর্দ্দমা উপলক্ষে তিনি নিয়মিতভাবে চট্টগ্রাম কোর্টে উপস্থিত থাকিয়া মোকর্দ্দমা পরিচালনে নাথবন্ধু হরিমোহন নাথ মহাশয়ের সহায়তা করিতেন। দরিদ্র ছাত্রগণের তিনি বন্ধুস্থানীয় ছিলেন। জ্যোতিষশাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। আনুমানিক ১৩৫৮ বঙ্গাব্দে তিনি দেহত্যাগ করেন।

শ্রীমদ্ তারানন্দস্বামী মহারাজ ঃ—চট্টগ্রামের চাঁনগা গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্ব্ব নাম ছিল শ্রীজয়চন্দ্র নাথ। একটী সন্তান লাভের পর তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। সীতাকুণ্ড শঙ্কর মঠের প্রতিষ্ঠাতৃদের মধ্যে তিনিও ছিলেন একজন প্রধান উদ্যোগী। শঙ্কর মঠ ত্যাগ করিয়া ইনি হাল্‌দা ও কর্ণফুলী নদীর সঙ্গমস্থলে "মহাকালী যোগাশ্রম" নামে এক আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। এই আশ্রমেই তিনি সমাধি-প্রাপ্ত হন। প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে তাঁহার তিরোভাব উৎসবে জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে বহু লোক সমবেত হইয়া যজ্ঞাদি দর্শনে ও প্রসাদ গ্রহণে আনন্দ লাভ করিয়া থাকে।

শ্রীমদ্ স্বামী ভুমানন্দ সরস্বতী ঃ—১৮১১ শবাব্দের ৬ই শ্রাবণ তারিখে চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত ফতেয়াবাদ গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। তাঁহার সংসারাশ্রমের নাম ছিল শ্রীভুবনচন্দ্র নাথ। তিনি ছিলেন চিরকুমার। সংসারে বীতস্পৃহ হইয়া তিনি সন্যাস ব্রত অবলম্বন করেন এবং প্রব্রজ্যা গ্রহণ পূর্ব্বক কৈলাস ব্যতীত ভারতবর্ষের সমস্ত তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। অবশেষে জ্ঞানগরিমায় ও যোগসাধনায় সমধিক উন্নতি লাভ করিয়া তিনি ভূস্বর্গ কাশ্মীরের প্রসিদ্ধ 'নারায়ণ মঠের' মোহান্ত পদে বৃত হন। সময়ে সময়ে চট্টগ্রামে আসিয়া ইনি সমাজ-সংস্কারমূলক কার্য্যে নাথবন্ধু হরিমোহনবাবু প্রমুখ সমাজ-নেতৃগণকে উপদেশাদি প্রদান করিতেন এবং পৌরোহিত্য সমস্যার সমাধানে শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য কাব্যবিনোদ মহাশয়কে উৎসাহ দিতেন। শুনা যায়

কাশ্মীরের মঠ হইতে বহির্গত হইয়া তিনি কৈলাস উদ্দেশে যাত্রা করিয়াছিলেন ; তদবধি তাঁহার আর কোন সংবাদ জানা যায় নাই।

৺কৃষ্ণবন্ধু নাথ :—চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত ফতেয়াবাদ গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার চরিত্রমুগ্ধ দেশবাসীর নিকট তিনি কৃষ্ণ সাধু নামে পরিচিত ছিলেন। সমাজ-সংস্কার কার্য্যে তিনি আচার্য্য অম্বিকাচরণ, নাথবন্ধু হরিমোহন প্রমুখ সমাজ-নেতৃগণের সহিত সহযোগিতা করিতেন। উদারতা, অমায়িকতা, স্বজাতিবৎসলতা প্রভৃতি গুণে তিনি সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিলেন। খদ্দর আন্দোলনের যুগে তিনিই সর্ব্বপ্রথম চট্টগ্রাম বিভাগের খদ্দর প্রচলনের জন্য মীর্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে দোকান খুলিয়া বসেন। এই কারণে তিনি তদানীন্তন খদ্দরভক্ত দেশনেতৃগণের প্রিয়পাত্র হন এবং তাঁহার দোকান তাঁহাদের মিলন কেন্দ্রে পরিণত হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কবিকুল-ভাস্কর ৺শশাঙ্কমোহন সেন মহাশয়ই ইঁহার দোকানের নামকরণ করিয়াছিলেন—"চট্টলাভাণ্ডার"। ইনি কলিকাতার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে দার-পরিগ্রহ করিয়া আন্তর্গণিক বিবাহের প্রচলনে উৎসাহ প্রদর্শন করেন। ১৩৪৭ সালের ২০ শে মাঘ ৪৯ বৎসর বয়সে তিনি কলিকাতা ভবানীপুরে উদরীরোগে লোকান্তরিত হন।

৺মহেশচন্দ্র নাথ :—ফেনী সাবডিভিসনাল টাউনের সংলগ্ন সহদেবপুর গ্রামে ইঁহার বাড়ী। তৎকালে সমগ্র বেদরাবাদ পরগণাতে 'বাবু' বলিলে একমাত্র ইঁহাকেই বুঝাইত। বাস্তবিকই ইঁহার সুদর্শন আকৃতি, মনোরম প্রকৃতি, পোষাক-পরিচ্ছদ, চলন-বলন সব-কিছুতেই একটা মার্জ্জিত ভাব সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিত।

ইনি অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। প্রথমতঃ একাই ইনি বহু অর্থব্যয়ে টাউনের সীমান্তে "ফেনী মধ্য ইংরেজী স্কুল" প্রতিষ্ঠা করেন। পরে উপযুক্ত কমিটী গঠন করিয়া, স্কুলের সমস্ত দায়িত্ব কমিটীর উপর ছাড়িয়া দেন। অদ্যাবধি সেই স্কুল সুশৃঙ্খলভাবে চালিত হইয়া তাঁহার স্মৃতি রক্ষা করিতেছে।

ইঁহার মৃত্যুর পর স্কুল কমিটী ইঁহার স্মৃতির সম্মানার্থে শোকসভার অনুষ্ঠান করিয়া একদিন স্কুল বন্ধ রাখিয়া ও শ্রাদ্ধের জন্য ইঁহার পুত্রদের হস্তে নগদ ১০০৲ টাকা দান করিয়া যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

বিদেশাগত স্কুল কলেজের দরিদ্র স্বজাতিছাত্রকে জায়গীর লইয়া দিয়া এবং বহু স্বজাতিছাত্রকে নিজ বাড়ীতে মেস করিয়া থাকিতে গৃহাদি দিয়া উচ্চশিক্ষার পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন।

ইনি একজন নৈষ্ঠিক ধর্ম্মভীরু লোক ছিলেন। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিয়া স্নান-সন্ধ্যা-পূজা, গীতা-ভাগবত-পাঠ করা ইঁহার নিত্য কর্ম্ম ছিল; ভুলেও কোন দিন ইনি এই নিয়ম ভঙ্গ করেন নাই। দুই পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া তিনি লোকান্তরিত হইয়াছেন। মুন্সেফ শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জবিহারী চৌধুরী, এম-এ, বি-এল মহাশয় ইঁহার জামাতা।

৺হরেকৃষ্ণ চৌধুরী, চট্টগ্রাম ঃ— ৺হরেকৃষ্ণ চৌধুরী মহাশয় ছিলেন একজন স্বনামধন্য পুরুষকারসম্পন্ন পুরুষ। দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া অধ্যবসায়বলে যাঁহারা জীবনে উন্নতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে চৌধুরী মহাশয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যাঁহারা দারিদ্র্যকে অভিশাপ মনে করিয়া ভাগ্যবিধাতার উপর যাবতীয় দোষ আরোপপূর্ব্বক নিশ্চেষ্ট হইয়া কাল হরণ করেন, তাঁহারা চৌধুরী মহাশয়ের জীবনী হইতে প্রেরণা লাভ করিতে পারিবেন।

৺হরেকৃষ্ণ চৌধুরী মহাশয় চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত মাদার্শা গ্রামের এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল ৺রাধামোহন চৌধুরী ও মাতার নাম স্বর্গীয়া প্রভাবতী দেবী। তাঁহার পিতা অতি দরিদ্র ছিলেন এবং কাপড়ের সামান্য দোকান করিয়া কায়ক্লেশে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। সুতরাং হরেকৃষ্ণবাবু বাল্যকালে লেখাপড়া শিখিবার সুযোগ না পাইয়া পিতৃ-ব্যবসায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হন। বাল্যকালেই তাঁহার

শ্রমশীলতা, সত্যবাদিতা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই সকল সদগুণ প্রভাবেই তিনি উত্তরজীবনে সমধিক উন্নতিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

যৌবনে পদার্পণ করিয়া চৌধুরী মহাশয় মাত্র ৪০৲ টাকা মূলধন লইয়া কলিকাতায় আসেন এবং অনেক ব্যবসায়ীর সহিত মিশামিশি করিয়া তিনি ব্যবসায় সম্বন্ধে প্রচুর অভিজ্ঞতা লাভ করেন। ব্যবসায়ের মধ্যেও অনেক রহস্য আছে ; তাহা অবগত হইতে না পারিলে ব্যবসায়ে কৃতকার্য্যতা লাভ করা যায় না। হরেকৃষ্ণবাবু এই রহস্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি অচিরাৎ ব্যবসায়-জগতে বেশ প্রতিষ্ঠিত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ এক সুতা ব্যবসায়ীর সহিত ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া চট্টগ্রামে সুতা চালান দিতে থাকেন। এই ব্যবসায়ে তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিলেন। তারপর ক্রমান্বয়ে চট্টগ্রাম সহরে তামাকের, সোনারূপার ও কাঠের ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া ধনশালী হইয়া উঠিলেন। তখন হইতে তিনি চট্টগ্রাম জিলার মধ্যে "হরেকৃষ্ণ মহাজন" নামে সুপরিচিত হইলেন।

ধনবান্ ব্যক্তি ধন প্রয়োগেরও অজস্র পন্থা আবিষ্কার করিতে পারেন। চৌধুরী মহাশয় চট্টগ্রাম টাউনে ৭.৮ খানা ইমারত নির্ম্মাণ করিলেন এবং আস্তে আস্তে বহু সহস্র টাকার জমিদারি খরিদ করিয়া চট্টগ্রাম জিলার মধ্যে একজন বিখ্যাত জমিদার বলিয়া পরিগণিত হইলেন। বিপুল ধনের অধিকারী হইয়া ও বিশাল জমিদারির অধীশ্বর হইয়াও তিনি অতি সরল, নিরহঙ্কার ও বিলাসশূন্য ছিলেন। অমায়িকতা ও উদারতার গুণে তিনি জনসাধারণের ও প্রজাবর্গের শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

অতঃপর তিনি প্রচুর অর্থব্যয়ে একখানা জাহাজ ক্রয় করেন। এই পণ্যযাত্রী জাহাজ সাধারণতঃ ব্রহ্মদেশে যাতায়াত করিত। জাহাজের ব্যবসায়েও তিনি বেশ লাভবান্ হইয়া উঠিলেন। ভাগ্যদেবী তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্না হইলেন ; সুতরাং সকল দিক থেকেই তাঁহার প্রচুর অর্থাগম হইতে লাগিল। তিনি

ব্যবসায়ের আস্বাদন পাইয়াছিলেন ; সুতরাং পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রদিগকেও ব্যবসায়ে দীক্ষিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীত্রিপুরাচরণ চৌধুরী মহাশয় কলিকাতার ব্যবসায়ী মহলে সুপরিচিত ; তিনি একজন প্রতিষ্ঠাবান্ ব্যবসায়ী।

চৌধুরী মহাশয় দৃঢ়চিত্ত, ধৈর্য্যশীল ও শক্তিমান্ পুরুষ ছিলেন। ১৯২৬ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে তাঁহার চট্টগ্রামের দোকান লুন্ঠিত হইয়াছিল ; উহাতে তাঁহার লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি হইয়াছিল। তিনি তজ্জন্য কিছুমাত্র বিচলিত বা ভগ্নহৃদয় না হইয়া নবীন উৎসাহে আবার ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন এবং অচিরকাল মধ্যে পূর্ব্বক্ষতির পূরণ করিয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করিলেন। ১৯৩২ সালে এই কৃতী পুরুষ পরলোক গমন করেন। তিনি অধ্যবসায়, পুরুষকার ও আত্মবিশ্বাসের যে দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন তাহা অনেক নিরাশ প্রাণে আশা ও প্রেরণার সঞ্চার করিবে।

৺মহিমচন্দ্র নাথ :—নোয়াখালি জিলার অন্তর্গত ভাটিয়ালপুর গ্রামে ১৮৭৭ সালে ৺মহিমচন্দ্র নাথ জন্মগ্রহণ করেন। গ্রামের গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় মহিমচন্দ্রের বাল্যশিক্ষা আরম্ভ হয়। তিনি প্রতিভাবান ছাত্র ছিলেন। সেই জন্য তিনি গুরুমহাশয়ের বিশেষ প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। সদাশয় গুরুমহাশয়ের প্রযত্নে বালক মহিমচন্দ্র নারায়ণপুর মধ্য বাংলা সার্কেল স্কুল হইতে বৃত্তিলাভ করিয়া নোয়াখালি জিলা স্কুলে ভর্ত্তি হন। অতঃপর তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে এফ্-এ পড়িতে আরম্ভ করেন। এফ্-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর উক্ত কলেজেই বি-এ পড়িতে রত হন। সমাজসেবায় অত্যধিক সময় ক্ষেপণ করাতে তিনি বি-এ পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সুতরাং অভিভাবকগণের ইচ্ছানুসারে তিনি আইন পড়িবার জন্য ঢাকা গমন করেন। কিন্তু আইন ব্যবসায় তাঁহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ প্রতীয়মান হওয়াতে তিনি আইন ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিয়া পুনরায় বি-এ পড়িতে লাগিলেন। এই সময়ে প্রসিদ্ধ সমাজনেতা শ্রীযুক্ত ভারতচন্দ্র

নাথ বিদ্যার্থী হইয়া কলিকাতায় অবস্থান করিতেছিলেন। মহিমচন্দ্র তাঁহার প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন এবং ৺অরবিন্দ বাবু, ৺নীরদবাবু প্রমুখ স্বজাতিহিতৈষী ব্যক্তিগণের সহকর্ম্মীরূপে যোগিসখা পত্রিকার প্রচারকল্পে সহায়তা করিতে লাগিলেন। সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বাবুর সহিতও তিনি প্রচারকার্য্যে কখনও কখনও গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাতায়াত করিতেন।

মহিমচন্দ্র বুঝিতে পারিয়াছিলেন, শিক্ষাই উন্নতির মূল। এই জন্য তিনি শিক্ষকতাকে জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। চাটখিল, লক্ষ্মীপুর, ফেনী প্রভৃতি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে তিনি সুশিক্ষক বলিয়া পরিচিত ও সম্মানিত হইয়াছিলেন। তাঁহার বিদ্যোৎসাহিতা ও শিক্ষানুরাগিতা পরিদর্শন করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে নোয়াখালি-রামগঞ্জ থানার স্কুল সাবইন্‌স্পেক্টরের পদ প্রদান করেন। বিদ্যালয় পরিদর্শন উপলক্ষে তিনি নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া শিক্ষার প্রচার করিতে থাকেন এবং পরকোট, দশঘরিয়া প্রভৃতি স্বজাতিবহুল গ্রামে মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। কালে দশঘরিয়া মধ্য-ইংরাজী স্কুল উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে উন্নীত হয় এবং পরম বিদ্যোৎসাহী বৃদ্ধ মহিমবাবুই উক্ত উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপন করিবার গৌরব ও সম্মান লাভ করেন।

তিনি পরম ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। শেষ বয়সে তিনি পরিব্রাজকরূপে ভারতের নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া ইংরাজী ও সংস্কৃতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের ভাবধারা বক্তৃতা ও প্রচার করিতেন। সরলতা, সদাশয়তা, স্বজাতি-হিতৈষিতা বিদ্যোৎসাহিতা প্রভৃতি বহু সদগুণ মহিমচন্দ্র উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৯৩৮ সালে তিনি পরলোক গমন করেন। তদবধি তাঁহার গুণমুগ্ধ আত্মীয়স্বজন তাঁহার পুণ্যস্মৃতি রক্ষার্থে "মহিমচন্দ্র সাহায্য ভাণ্ডার" প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রতি বৎসর কয়েকটী দরিদ্র মেধাবী প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী ছাত্রকে "মহিম-বৃত্তি" প্রদান করিয়া আসিতেছেন।

পরিশিষ্ট (১)

গ্রন্থের মুদ্রণকল্পে যে সকল সদাশয় ব্যক্তি অন্যূন ২৫৲ টাকা দান করিয়াছেন নিম্নে তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল। আর যাঁহারা পুনঃ পুনঃ অনুরোধ সত্ত্বেও জীবনী পাঠান নাই, তাঁহাদের নামের দক্ষিণ পার্শ্বে কেবল টাকার পরিমাণই মুদ্রিত হইল :—

১। শ্রীযুক্ত চারুভূষণ দালাল, জমিদার, বসিরহাট, ২৪পরগণা— ১২৫৲

ইনি সুপ্রসিদ্ধ বদান্যবর ৺সারদাপ্রসাদ দালাল মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র। চারুবাবু বিনয়ী, নম্র ও মিষ্টভাষী। তাঁহার বিদ্যোৎসাহিতা, স্বজাতিপ্রীতি ও পরদুঃখকাতরতা সুপরিচিত। দরিদ্র ছাত্রগণের প্রতি ইনি বেশ সহানুভূতি-সম্পন্ন। তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া বাড়ীতে একটা পাঠাগারের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার জ্ঞানলিপ্সার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। পিতৃ-প্রতিষ্ঠিত 'ঈশান বোর্ডিং'-এর পরিচালনার জন্য গঠিত বোর্ড অব ট্রাষ্টীর তিনি জনৈক সদস্য।

২। শ্রীযুক্ত হরিচরণ নাথ, বি-এ, এজেন্ট, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, জলপাইগুড়ি— ২৫৲

ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত দাবারা গ্রাম ইঁহার জন্মস্থান। ইনি বি-এ পাশ করিবার পর সামান্য ১৮৲ টাকা বেতনে ব্যাঙ্কে চাকুরি করিতে আরম্ভ করেন। পরে কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, শ্রমশীলতা ও অধ্যবসায় গুণে ক্রমশঃ তাঁহার পদোন্নতি লাভ হয়। ব্যাঙ্কে চাকুরি করিতে করিতে তিনি English Institute of Bankers, London-এর Associate Examination কৃতিত্বের সহিত পাশ করিয়া উন্নতির উচ্চ স্তরে আরোহণ করিয়াছেন। ইনি সরল, কর্ত্তব্যপরায়ণ ও স্বজাতিনিষ্ঠ।

৩। পণ্ডিত শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দেবনাথ, কাব্যরত্ন, ঘনশ্যামপুর, পোঃ চুলকাটী, জিলা খুলনা— ২৫৲

পণ্ডিত অবিনাশচন্দ্র একজন একনিষ্ঠ শিক্ষাব্রতী। ইনি বাল্যকালে খুব মেধাবী, অধ্যবসায়ী ও শ্রমশীল ছাত্র ছিলেন। উনিশ বৎসর বয়স হইতে ইনি শিক্ষকতা করিতেছেন। গুরুট্রেণিং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি গ্রামের ইউ, পি, স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ লাভ করেন। পরে গৃহে অধ্যয়ন পূর্ব্বক তিনি ব্যাকরণের আদ্য-মধ্য ও কাব্যের আদ্য-মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং 'নবদ্বীপ বঙ্গ-বিবুধ-জননী সভা' হইতে কাব্যরত্ন উপাধি লাভ করেন। ইনি বর্ত্তমানে চুলকাটী ঘনশ্যামপুর হাই স্কুলে শিক্ষকতা করিতেছেন। পণ্ডিত মহাশয়ের ন্যায় অদ্ভুত স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি নাথ-সমাজে বিরল। দেশের ও সমাজের প্রধান প্রধান ঘটনা এবং খ্যাতনামা ব্যক্তিগণের বংশতালিকা ও জন্ম-মৃত্যু তারিখ তাঁহার নখদর্পণে। স্বজাতির কাজে ইনি সর্ব্বদাই অগ্রণী। স্কুল সাব্-ইন্স্পেক্টর শ্রীমান নিরঞ্জন দেবনাথ, এম-এ, বি-টি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং শ্রীমান্ রামপ্রসাদ দেবনাথ, বি-এ তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র।

৪। ডাক্তার কালীচরণ নাথ, এম-বি, পোঃ খুজুটীপাড়া, বীরভূম— ২৫৲

বরিশাল জিলার অন্তর্গত কুষ্টকাঠী গ্রাম ইঁহার জন্মস্থান। স্বজাতিমহলে সুপরিচিত অধ্যাপক রামচরণ নাথ, এম-এ, বি-এল মহাশয় কালীচরণবাবুর মধ্যম অগ্রজ। ইনি বঙ্গবাসী কলেজ হইতে বি. এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আর, জি, কর মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হন। এখান হইতে ১৯৩১ সালে এম-বি ডিগ্রী লাভ করিয়া ১৯৩৩ সাল হইতে বীরভূম জিলার খুজুটিপাড়া রাধাগোবিন্দজিউ দাতব্য চিকিৎসালয়ে চিকিৎসকের কার্য্য করিতেছেন। সুদীর্ঘ ২০ বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলে তিনি চিকিৎসা ব্যবসায়ে বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন এবং বীরভূমের নান্নুর, বোলপুর প্রভৃতি অঞ্চলে সুচিকিৎসক ও সুদক্ষ অস্ত্র চিকিৎসক বলিয়া সুপরিচিত হইয়াছেন।

৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী দেবনাথ, খাজুরা, জিঃ খুলনা— ২৫

ইনি একজন পুরুষকারসম্পন্ন ব্যক্তি। অতি শৈশবে ইনি পিতৃহীন হন। অধ্যবসায়বলে মধ্য ইংরাজী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কিছুকাল শিক্ষকতা করেন এবং পরে বস্ত্র ব্যবসায়ে মনোযোগী হন। কঠোর পরিশ্রম, ধৈর্য্য ও বুদ্ধিবলে সামান্য মূলধনের সাহায্যে তিনি আজ প্রচুর অর্থের মালিক হইয়াছেন। স্বজাতির উন্নতিমূলক কার্য্যে তিনি সর্ব্বদাই অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন।

৬। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রকুমার দেবনাথ, বারুইপাড়া, খুলনা— ২৫৲

দেবেন্দ্রবাবু একজন অভিজ্ঞ শিক্ষাব্রতী। বাল্যকালে তিনি খুব পরিশ্রমী, অধ্যবসায়ী ও শিক্ষানুরাগী ছাত্র ছিলেন। তিনি ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ম্যাট্রিক ও ১৯১৬ সালে আই-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কঠোর দারিদ্র্যবশতঃ তিনি বি-এ অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং শিক্ষকতা করিতে আরম্ভ করেন। মশ্‌নী হাই স্কুলে চাকুরি করিতে করিতে তিনি বি-এ পরীক্ষা দেন কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে উহাতে অকৃতকার্য্য হন। তিনি যোগ্যতার সহিত বিভিন্ন এম-ই স্কুলের প্রধান শিক্ষকরূপে কার্য্য করিয়া বর্ত্তমানে স্বগ্রামের নিকটবর্ত্তী চাকশ্রী এম-ই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত আছেন। তাঁহার মত ছাত্রবৎসল শিক্ষক একান্ত বিরল। স্বজাতির উন্নতিজনক কার্য্যে তিনি সর্ব্বদাই উৎসাহী ও অগ্রণী।

৭। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র নাথ, ডি. এস্. সি, এফ্. এল্. আই, এফ. আর. আই. সি, এফ. আই. সি, নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়— ২৫৲

ঢাকা জিলার অন্তর্গত হাস্নারা গ্রামে ডাঃ মাধবচন্দ্র নাথ ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাল্যকালে মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ম্যাট্রিকিউলেশন হইতে এম. এস-সি পর্য্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় পরীক্ষাতেই তিনি কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। ১৯৩৭ সালে ইনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

হইতে ডি. এস-সি উপাধি লাভ করেন এবং ১৯৪৫ সাল পর্য্যন্ত উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপকতা করিয়া ১৯৪৬ সালে নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইওকেমিষ্ট্রি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া তথায় গমন করেন। তিনি এখনও নাগপুরে সুনাম ও সুখ্যাতির সহিত অধ্যাপনা করিতেছেন। সম্প্রতি তিনি ভারত সরকারের শিক্ষা-মন্ত্রীপ্রদত্ত বিশেষ বৃত্তি ৬ মাসের জন্য লাভ করিয়া ইংলণ্ড ও আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগার পরিদর্শন জন্য ১৯৫৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আমেরিকা গমন করেন। আমেরিকা হইতে রাসায়ন শাস্ত্রে নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া তিনি ইংলণ্ডের লণ্ডন ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনান্তে ১৯৫৩।১৫ আগষ্ট নাগপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

৮। শ্রীযুক্ত হরিপদ দালাল, বসিরহাট, ২৪ পরগণা— ৩৫৲

ইনি বসিরহাট টাউনের একজন নাম-করা ব্যবসায়ী। অধ্যবসায় ও পরিশ্রম বলে তিনি অতি সামান্য অবস্থা হইতে ব্যবসায়ে সমধিক উন্নতি লাভ করিয়া ধনশালী হইয়াছেন।

৯। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ দালাল, বসিরহাট, ২৩ পরগণা— ২৫৲

ইনি পরম স্বজাতিহিতৈষী ব্যক্তি। বসিরহাট টাউনের ইনিও একজন খ্যাতনামা ব্যবসায়ী। স্থানীয় জনসাধারণের কাজে তিনি বেশ উৎসাহী। বসিরহাট মিউনিসিপ্যালিটির ইনি জনৈক কমিশনার। অমায়িকতা গুণে ইনি বেশ জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াছেন।

১০। শ্রীযুক্ত ডাঃ গৌরহরি গোস্বামী, নাস্‌রিগঞ্জ, সাহাবাদ— ২৫৲

ইনি পুরুষকারসম্পন্ন ব্যক্তি। ইঁহার আদি বাসস্থান বর্দ্ধমান জিলা। তদন্তর তিনি সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত কারমাটারে বসতি স্থাপন করেন। উৎকট জাতি-বিদ্বেষের যুগে অন্যূন ৪০ বৎসর পূর্ব্বে তিনি চিকিৎসা ব্যবসায়ে অর্থোপার্জ্জন মানসে বিহারের বহুস্থানে বৃথা ভ্রমণ করিয়া অবশেষে নাস্‌রিগঞ্জে

চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করেন। এখানে ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্না হন। তিনি অল্পকাল মধ্যে সুচিকিৎসক বলিয়া পরিচিত হন এবং খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করেন। চিকিৎসা-ব্যবসায়ে তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়া পুত্র-কন্যা ও ভাগিনেয়দিগকে উচ্চ শিক্ষা প্রদান করেন। শিক্ষাহিসাবে তাঁহার পরিবারবর্গের সকলেই বেশ অগ্রসর। তাঁহার মধ্যম পুত্র শ্রীরত্নেন্দু গোস্বামী, এম-এ, বি-এল আরা জিলা-আদালতের একজন প্রতিষ্ঠাবান্ উকিল।

১১। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র নাথ, ষ্টেশন রোড, ভালুকা রোড, মালদহ— ২৫৲

পূর্ব্ব-পাকিস্তানের কুষ্টিয়া জিলার অন্তর্গত জেথালা গ্রামে ইঁহার পৈতৃক বাসস্থান। ইনি প্রথমতঃ রেলওয়ে বিভাগে সামান্য চাকুরি লইয়া প্রবেশ করেন। তারপর টেলিগ্রাফি পাশ করিয়া বুকিং ক্লার্কের চাকুরি করিতে করিতে কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়গুণে ষ্টেশন মাষ্টারের পদে উন্নীত হইয়াছেন।

১২। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ নাথ, দমদম, ২৪ পরগণা— ২৫৲

আমরা নগেন্দ্রবাবুর সঠিক পরিচয় সংগ্রহ করিতে পারি নাই। যতদূর জানি, তিনি সহৃদয়, দানশীল ও স্বজাতিহিতৈষী ব্যক্তি। প্রয়োজনের সময়ে ইনি যথাসাধ্য অর্থ সাহায্যদানে পরাঙ্মুখ হন নাই। শুনিতে পাই, তিনি অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন দৈব ঔষধ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং তাহার বলে কঠিন রোগাক্রান্ত বহু রোগীর আরোগ্য বিধান করিয়া সকলের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন এবং সমধিক প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। দমদমার একটী রাস্তা তাঁহার নামানুসারে "নগেন্দ্রনাথ রোড" নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহাতে তাঁহার জনপ্রিয়তারই পরিচয় পাওয়া যায়।

১৩। শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র নাথ, আজিমগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ— ২৫৲

রামচন্দ্রবাবু নাম প্রচার করিতে অনিচ্ছুক। তিনি আজীবন শিক্ষাব্রতী। আজিমগঞ্জ সহরে সুশিক্ষক বলিয়া তাঁহার খ্যাতি আছে। তিনি নীরব কর্ম্মী এবং সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিয়া থাকেন। ইনি স্বল্পভাষী হইলেও

মিষ্টভাষী এবং উদার ও পরোপকারী। স্বজাতির প্রতি কর্ত্তব্যের আহ্বানে ইনি পশ্চাৎপদ থাকেন না।

১৪। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ, রাণাঘাট, নদীয়া— ২৫৲

ঢাকা জিলার অন্তর্গত বাহেরাখোলা নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিচরণ দেবনাথ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবেন্দ্রবাবু একজন পরোপকারী ও স্বজাতিহিতৈষী যুবক। দেশ বিভাগের পূর্ব্বে তিনি স্বগ্রামে স্বল্প মূলধন লইয়া ব্যবসায় আরম্ভ করেন এবং পরিশ্রম ও অধ্যবসায়গুণে শীঘ্রই উহাতে উন্নতি লাভ করিয়া ধনশালী হইয়া উঠেন। স্থানীয় কো-অপারেটিভ সোসাইটীর সেক্রেটারীরূপে কয়েক বৎসর কাজ করিয়া তিনি জনসাধারণের উপকার সাধনপূর্ব্বক খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করেন। দেশ বিভাগের পর তিনি গ্রাম ছাড়িয়া আসিয়া রাণাঘাট টাউনের সন্নিকট রামনগর আইসতলা গ্রামে বসতিস্থাপন করিয়াছেন। তিনি রাণাঘাট টাউনে শ্রীহরি বস্ত্রালয় নামে একটী প্রতিষ্ঠান স্থাপনপূর্ব্বক অতি যোগ্যতার সহিত সুতা ও কাপড়ের ব্যবসায় পরিচালনা করিতেছেন। তাঁহার এই প্রতিষ্ঠানের অধীনে অনেক স্বজাতীয় ও ভিন্ন জাতীয় বস্ত্রবয়নকারী অশেষ প্রকারে উপকৃত হইতেছে। দেবেন্দ্রবাবু পরম বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি। তিনি রামনগর গ্রামে দেড় হাজার টাকা মূল্যের দুই বিঘা জমি দান করিয়া তাঁহার পিতার নামানুসারে "হরিচরণ বিদ্যাপীঠ" নামক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া দিয়াছেন। তিনিই ঐ স্কুল কমিটীর প্রেসিডেণ্ট। উত্তরাধিকার সূত্রে সেবাপরায়ণতা ও ধর্ম্মানুরাগিতা লাভ করিয়া ইনি প্রতি বৎসর নিজব্যয়ে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর নামকীর্ত্তন ও মহোৎসব অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছেন।

১৫। ডাঃ বেণীমাধব নাথ, এল. এম্. এফ., বড়পেটা রোড, কামরূপ—৩১৲

ডাঃ বেণীবাবু ময়মনসিং জিলার অন্তর্গত কুষ্টিয়া গ্রামের অধিবাসী। কালীহাতী হাই স্কুল হইতে ১৯৪০ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি ময়মনসিং

লিটন মেডিকেল স্কুলে ভর্ত্তি হন। তিনি ১৯৪৫ সালে ডাক্তারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৯৪৬ হইতে ১৯৪৮ সাল পর্য্যন্ত ময়মনসিং ডিস্ট্রীক্ট বোর্ডের মেডিকেল অফিসার হিসাবে দক্ষতার সহিত চাকুরি করেন। তারপর পাকিস্তান ত্যাগ করিয়া অদ্যাবধি বড়পেটা রোডে বিশেষ সুনামের সহিত ডাক্তারি করিতেছেন। বড়পেটা রোডে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত "নাথ ফার্ম্মেসি" বিশেষ সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে। তিনি নিখিল-আসাম বাস্তুত্যাগী সমিতির বড়পেটা শাখার সভাপতি রূপে কাজ করিয়া এবং সমাজহিতকর বহু প্রতিষ্ঠানের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থাকিয়া জনসাধারণের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন। তাঁহার স্বজাতিহিতৈষিতা ও পরোপকারিতা অনুকরণীয়। তিনি আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনীর ও আসাম যোগি-সম্মিলনীর আজীবন সদস্য। চিকিৎসা ক্ষেত্রেও ডাঃ বেণীবাবু বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করিয়া প্রতিষ্ঠাবান্ হইয়াছেন।

১৬। শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন ভৌমিক, আগরতলা, ত্রিপুরা রাজ্য— ২৫৲

ত্রিপুরা জিলার ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নিকটবর্ত্তী উলচাপাড়া গ্রামে প্রসিদ্ধ ভৌমিক পরিবারে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতৃদেব ৺দীননাথ ভৌমিক মহাশয় তদঞ্চলে সকলের সুপরিচিত অতি প্রতিষ্ঠাবান্ ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন। প্যারীমোহনবাবু পিতার কণিষ্ঠ পুত্র। তিনি অল্প বয়সেই ব্যবসায়ে খুব খ্যাতি অর্জ্জন করেন। তাঁহার ধর্ম্ম-প্রবণতা ও দানশীলতা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দেশবিভাগের পর তিনি সপরিবারে আগরতলায় আসিয়া বনমালীপুরস্থিত স্বীয় বাসভবনে অবস্থান করিতে থাকেন। আগরতলাতেও প্যারীবাবু সুতার ব্যবসায়ে বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন এবং উক্ত ব্যবসায়ে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তিনি অতিথিপরায়ণ ও স্বজাতিহিতৈষী। জাতীয় কার্য্যে তিনি সর্ব্বদাই অগ্রণী। ত্রিপুরারাজ্য শৈবসম্মিলনীর তিনি বর্ত্তমান কোষাধ্যক্ষ।

১৭। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ ভৌমিক, আগরতলা, ত্রিপুরা রাজ্য— ২৫৲

ইনি একজন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ও ধনাঢ্য ব্যক্তি। দেশবিভাগের পর ইনিও ত্রিপুরাস্থিত বাসভূমি পরিত্যাগ করিয়া আগরতলায় বসতি স্থাপন করিয়াছেন।

১৮। ডাঃ উপেন্দ্রচন্দ্র নাথ, এম্-বি, আগরতলা, ত্রিপুরা রাজ্য— ৩০৲

ডাঃ উপেন্দ্রবাবু একজন সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক। দেশবিভাগের পর তিনি নোয়াখালি জিলার লক্ষ্মীপুরস্থিত স্বীয় বিশাল বাসভবন পরিত্যাগ করিয়া আগরতলায় অবস্থান করিতেছেন। এখানেও তিনি চিকিৎসা ব্যবসায়ে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ইনি স্বর্গীয় উমাকান্ত নাথ মহাশয়ের পুত্র এবং কন্‌সারভেটার অব ফরেষ্ট শ্রী জে. সি. নাথ মহাশয়ের ভ্রাতা।

১৯। মেজর ডাক্তার সুরেন্দ্রচন্দ্র নাথ, এম্-বি, বেহালা, ২৪ পরগণা—৪৫৲

ডাঃ সুরেন্দ্রবাবু একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক। রোগনির্ণয়ে ইঁহার অদ্ভুত ক্ষমতা। বেহালা বাজারস্থিত "সাওদার্ণ মেডিকেল হল" নামক চিকিৎসা-ভবনের তিনিই স্বত্বাধিকারী।

২০। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র ভৌমিক, কুমিল্লা— ৫০৲

ইনি ছাপাখানার কার্য্যে বেশ অভিজ্ঞ। আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনীর নিজস্ব কুমিল্লা শঙ্কর প্রেস্ ভাড়া লইয়া বিগত কয়েক বৎসর হইতে উহার পরিচালনা করিতেছেন।

২১। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র অধিকারী, দিনহাটা, কুচবিহার— ২৫৲

হেমবাবু দেশবিভাগের পর রংপুর জিলার অন্তর্গত স্বগ্রাম শাঁখারিপাড়া পরিত্যাগ করিয়া দিনহাটায় বসতি স্থাপন করিয়াছেন। তিনি একজন অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী। ব্যবসায়ে তিনি বেশ উন্নতি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় উৎসাহী, মিষ্টভাষী, পরোপকারী ও স্বজাতিবৎসল ব্যক্তি অতি বিরল। তিনি দিনহাটা মহকুমা কংগ্রেস্ কমিটীর সেক্রেটারী। অক্লান্তভাবে কংগ্রেসের সেবা করিয়া তিনি স্থানীয় জন-সাধারণের প্রিয়ভাজন হইয়াছেন ও যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ

করিয়াছেন। স্থানীয় প্রায় সমস্ত জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত হেমবাবু ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। যোগিজাতির দুঃখদারিদ্র্য ও নিরক্ষরতা দূর করিয়া তাহাদের সামাজিক মান উন্নয়নের জন্য তিনি সর্ব্বদাই সচেষ্ট।

২২। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন নাথ, বাটরহাট, কামরূপ— ২৫৲

যতীন্দ্রবাবু একজন স্বজাতিহিতৈষী যুবক। তিনি স্বজাতির উন্নতিজনক কার্য্যে সর্ব্বদাই মুক্তহস্ত। তিনি বেশ বুদ্ধিমান, অধ্যবসায়ী ও কর্ত্তব্যপরায়ণ ব্যক্তি। খুব সুনাম ও সুখ্যাতির সহিত ইনি বহু দিন হইতে গভর্ণমেণ্ট কনট্রাকটর রূপে কার্য্য করিয়া আসিতেছেন।

২৩। শ্রীযুক্ত উমাকালী নাথ, ৩ কলেজ রোড্, নিউ দিল্লী— ২৫৲

তিনি সম্ভবতঃ কলিকাতা ভবানীপুরের অধিবাসী। তাঁহার সবিশেষ পরিচয় আমরা পাই নাই; তবে তাঁহার বদান্যতা ও স্বজাতিহিতৈষিতার পরিচয় আমরা পাইয়াছি। মনে হয় তিনি একজন সরকারি কর্ম্মচারী।

২৪। শ্রীযুক্ত রমণীমোহন দেবনাথ, বাপুপাং, ডিগবয়, অপার আসাম—২৫৲

২৫। শ্রীঅমরেন্দ্র নারায়ণ নাথ, গোয়ালপাড়া, আসাম— ২৫৲

ইনি আসামের সুপ্রসিদ্ধ নেতা এবং আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনীর বিশিষ্ট কর্ম্মী ৺হরেন্দ্র নারায়ণ নাথ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। অমরেন্দ্রবাবু গোয়ালপাড়া গভর্ণমেণ্ট হাই স্কুল হইতে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পুলিশ-বিভাগে চাকুরী গ্রহণ করেন। বহুদিন যোগ্যতার সহিত পুলিশ সাব্‌ইন্‌স্পেক্টরের চাকুরী করিয়া সার্কেল ইন্‌স্পেক্টরের পদে উন্নীত হন। এই পদে তিনি সুনাম ও সুখ্যাতির সহিত কর্ত্তব্য পালন করিয়া অবসর গ্রহণ পূর্ব্বক এক্ষণে গোয়ালপাড়া টাউনে স্বগৃহে বাস করিতেছেন। তিনি অমায়িকতা, স্বজাতিপ্রিয়তা, মিষ্টভাষিতা, পরোপকারিতা প্রভৃতি গুণে সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন।

২৬। শ্রীমণীন্দ্রকুমার নাথ, রাণাঘাট, নদীয়া— ২৫৲

নদীয়া জিলার অন্তর্গত হবিবপুর গ্রাম ইঁহার জন্মস্থান। ইনি রাণাঘাট

রেলবাজারে অবস্থিত 'মাতৃ-মন্দির' নামক জুয়েলারী সপের স্বত্বাধিকারী। সততা ও বিশ্বাসপরায়ণতা গুণে মণীন্দ্রবাবু জুয়েলারি ব্যবসায়ে প্রসার প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিয়া যোগ্যতার সহিত কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন। তিনি এই ব্যবসায়ে বিশেষ আর্থিক উন্নতি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার সদাশয়তা, দানশীলতা ও স্বজাতিবৎসলতা উল্লেখযোগ্য। আরও দুইটী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি তাহাও দক্ষতার সহিত পরিচালনা করিতেছেন।

২৭। শ্রীব্রজেন্দ্রলাল হালদার, ঝালকাটী, বরিশাল— ২৫৲

ব্রজেন্দ্রবাবু বরিশাল জিলার সুপ্রসিদ্ধ স্বজাতি নেতা শ্রীরাধাবল্লভ হালদার মহাশয়ের পুত্র। তিনি পাকিস্তানে অবস্থান করিয়া যোগ্যতার সহিত নিজেদের ব্যবসায় পরিচালনা করিতেছেন। বরিশাল জিলার অন্তর্গত ঝালকাটী বন্দরে এবং ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত চরমুগুরিয়া বন্দরে অফিস্ স্থাপন করিয়া ইনি বহুদিন যাবৎ উক্ত দুই জিলায় বর্ম্মা শেল কোম্পানির পেট্রল্ সরবরাহের কনট্রাক্টরের কার্য্য করিতেছেন। ঢাকেশ্বরী কটন মিলস্ হইতে উৎপন্ন বস্ত্র বিক্রয়ের ইনি একজন বিশিষ্ট এজেন্ট। অধ্যবসায় ও সততা গুণে ব্রজেন্দ্রবাবু যেমন যথেষ্ট সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন তেমনি প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়া ধনশালী হইয়াছেন। তাঁহার উদারতা ও স্বজাতিবৎসলতা অনুকরণীয়।

২৮। শ্রীশ্রীশচন্দ্র নাথ, বি-এ, বি-এল, এ্যাড্‌ভোকেট, আসাম হাইকোর্ট, গৌহাটী— ২৫৲

শ্রীশবাবু ইংরাজী ১৯১৬ সালে শ্রীহট্ট জিলার হবিগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত শাইলগাছি গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পাঠ্যদশায় তিনি একজন মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ১৯৩৪ সালে তিনি সায়েস্তাগঞ্জ হাই স্কুল হইতে ম্যাট্রিকিউলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সরকারি বৃত্তি লাভ করেন। ১৯৩৬ সালে শ্রীহট্ট মুরারীচাঁদ গভর্ণমেণ্ট কলেজ হইতে আই-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সিনিয়র সরকারী বৃত্তি প্রাপ্ত হন এবং ১৯৩৮ সালে কলিকাতা রিপন কলেজ হইতে

ইংরাজীতে অনার্স সহ বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তারপর তিনি ১৯৪১ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ল' কলেজ হইতে আইন পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া 'মহারাজ মণীন্দ্রনাথ নন্দী' বৃত্তি লাভ করেন। শ্রীশবাবু আসাম সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় পাশ করিয়া ১৯৪২ সালে আসাম সিভিল সার্ভিসে যোগদান করেন। ১৯৪৫ সালে তিনি 'সার্ভে ও সেটেলমেণ্ট' পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৯৫১ সাল পর্য্যন্ত সরকারী বিভিন্ন উন্নত পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া যোগ্যতার সহিত কর্ত্তব্য পালন করেন। ১৯৫১ সালে তিনি আসাম সিভিল সার্ভিসে ইস্তাফা দেন এবং ১৯৫২ সালে আসাম হাইকোর্টের 'চেম্বার' পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আসাম হাইকোর্টে এ্যাড্ভোকেট হিসাবে যোগদান পূর্ব্বক আইন ব্যবসায় করিতে আরম্ভ করেন। বর্ত্তমানে তিনি আসাম হাইকোর্টের খ্যাতনামা এ্যাড্ভোকেটদের মধ্যে অন্যতম।

শ্রীশবাবু বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত ঘনিষ্টভাবে জড়িত ছিলেন এবং এখনও আছেন। তিনি শ্রীহট্ট ও কাছাড় জিলার কয়েকটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটীর সভাপতি নিযুক্ত হইয়া যোগ্যতা ও বিদ্যোৎসাহিতার বিশেষ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

২৯। শ্রীমহিম চন্দ্র রায়, উকিল— ২৫৲

ইনি ত্রিপুরা জিলার কস্‌বা থানার অন্তর্গত চান্দাইসার গ্রামে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল রামলোচন রায় ও মাতার নাম সাবিত্রী দেবী।

বাল্যকালে মহিমবাবু গ্রাম্য বিদ্যালয়ে পাঠ সমাপন করিয়া ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ঢাকা কলেজ হইতে আই-এ পরীক্ষার পর রাজসাহী সারদা পুলিশ ট্রেনিং সেণ্টার হইতে ট্রেনিংপ্রাপ্ত হইয়া ১৯১৪ খৃঃ অব্দে প্রথমতঃ ঢাকার মুন্সীগঞ্জ মহকুমার পুলিশ ইন্‌স্পেক্টার নিযুক্ত হন। পুলিশ বিভাগে চাকুরী করিবার

সময় তিনি চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী জিলার স্বজাতিবহুল বহু গ্রামে পরিভ্র- করিবার এবং তত্রত্য স্বজাতীয়গণের অবস্থা স্বচক্ষে পরিদর্শন করিয়া যথে অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ পান।

অল্প কয়েক বৎসর পুলিশ বিভাগে চাকুরী করিবার পর মহিমবাবু ত্রিপুরা- রাজ্যের 'ষ্টেট্‌-ল' পাশ করিয়া ১৯১৭ খৃঃ অব্দে ত্রিপুরা রাজ্যের ধর্ম্মনগর মহকুমায় ওকালতি ব্যবসায় আরম্ভ করেন। অদ্যাবধি উক্ত ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকিয়া তিনি প্রভূত যশঃ ও সম্মান এবং অশেষ প্রতিপত্তি ও প্রচুর ধনসম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি ধর্ম্মনগর কোর্টের উকিল বার-লাইব্রেরীর প্রেসিডেন্ট পদে আসীন এবং স্থানীয় কয়েকটি সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন। মহিমবাবুর স্বজাতিহিতৈষিতা প্রশংসনীয়। যোগিজাতির মধ্যে শিক্ষার বহুল প্রচলন, আন্তর্গণিক বিবাহের প্রবর্ত্তনে এবং সমাজ-সংস্কার- বিধানে তিনি সর্ব্বদাই অগ্রণী। বহু দরিদ্র ছাত্র তাঁহার নিকট ভরণপোষণ পাইয়া এবং গ্রন্থাদি সাহায্য লাভ করিয়া জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। মহিম- বাবুর বিদ্যোৎসাহিতা ও ধর্ম্মনিষ্ঠা অনুকরণীয়। তিনি ভারতের প্রধান প্রধান তীর্থগুলি একাধিক বার সস্ত্রীক পর্য্যটন করিয়াছেন। তৎকৃত 'সামবেদীয় তর্পণ- বিধি' তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠার পরিচায়ক। তাঁহার গুণবতী ও পতিব্রতা ভার্য্যা শ্রীযুক্তা সূক্ষ্মমণি দেবী সর্ব্বদা ধর্ম্মানুষ্ঠানে সহায়তা করিয়া স্বামীর জীবন শান্তিম করিয়াছেন। উত্তর-প্রদেশ রাজ্যের সরকারী গেজেটেড্ ডাক্তার তাঁহা একমাত্র পুত্র শ্রীপুলিন বিহারী রায়, এম্-বি, বি-এস্ ও উচ্চশিক্ষিত জামাতৃগ তাঁহার বংশের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন।

৩০। শ্রীযুক্ত ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ নাথ, পোঃ বিথারি, ২৪ পরগণা— ২৫৲

যে সকল ব্যক্তি দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া জীবনে উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ নাথ মহাশয়ের নাম উল্লেখ যোগ্য। তাঁহার আদি নিবাস ছিল খুলনা জিলার সাতক্ষীরা মহকুমার অন্তর্গ

অল্প বয়সে তাঁহার পিতৃবিয়োগ ঘটে। পিতার মৃত্যুর পর ... পরগণা জিলার অন্তর্গত বিথারি গ্রামে আসিয়া ১৩২৪ ... আরম্ভ করেন। অর্থোপার্জ্জন অপেক্ষা তিনি ... কামনা করিয়া থাকেন। উদারতা, দয়ালুতা ও চিকিৎসা ... চিকিৎসা ব্যবসায়ে প্রসার প্রতিপত্তি লাভ করিয়া যশঃ, ... অর্থ—সব কিছুই অর্জ্জন করিয়াছেন। তিনি বিদ্যোৎসাহী ও স্বজাতিব... ভদ্রতা ও অমায়িকতা গুণে তিনি সকলেরই সম্মানভাজন হইয়াছেন।

পরিশিষ্ট (২)

গ্রন্থের মুদ্রণকল্পে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ প্রত্যেকে এককালীন অন্যূন ... দশ টাকা প্রদান করিয়াছেন :—

১। শ্রীদাশরথি নাথ, 36/C, Irwin Road, নিউ দিল্লী।

২। শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার নাথ, C/o. Provision office, Ordn... Factory, মুরাদনগর, মীরাট, ইউ. ...

৩। শ্রীহেমচন্দ্র দাস, Power Channel Division, পোঃ চি... জিঃ সম্বলপুর, উ...

৪। শ্রীধরণীধর নাথ, খাগড়াবাজার, পোঃ খাগড়া, জিঃ মুর্শিদাবা...

৫। শ্রীএচ. কে. নাথ দাস, C/o. সুদামা ফার্ম্মেসি, ১৩৮ ক্যাল... রোড, পোঃ বেলপা...

৬। শ্রীবিরিঞ্চিকুমার মুহুরি, সুপারভাইজিং ষ্টেশনমা... কা... পূর্ণিয়া

৭। শ্রীপরেশচন্দ্র নাথ, মূলাজোড় জেনারেটিং ষ্টেশন, পোঃ শ্যা...নগর, ২৪পরগণা